

Hilarius

De Trinitate (ত্রিত্ব প্রসঙ্গ)

লাতিন পাঠ্যের [লিংক](#)

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2025

AsramScriptorium [বাইবেল](#) - [উপাসনা](#) - [খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণ](#)

[AsramSoftware](#) - [Donations](#)

[Maheshwarapasha](#) - Khulna - Bangladesh

First digital edition : April 25, 2024

Version 1.1 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন করে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় **শেষ সংস্করণ চেক করুন।**

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে **এখানে** ক্লিক করুন।

সাধু হিলারিউস

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু হিলারিউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’

শব্দার্থ

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

১ম পুস্তক

২য় পুস্তক

৩য় পুস্তক

৪র্থ পুস্তক

৫ম পুস্তক

৬ষ্ঠ পুস্তক

৭ম পুস্তক

৮ম পুস্তক

৯ম পুস্তক

১০ম পুস্তক

১১শ পুস্তক

১২শ পুস্তক

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
প্রভা (প্রভা পুস্তক)
ইশা (ইশাইয়া)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
হো (হোশেয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

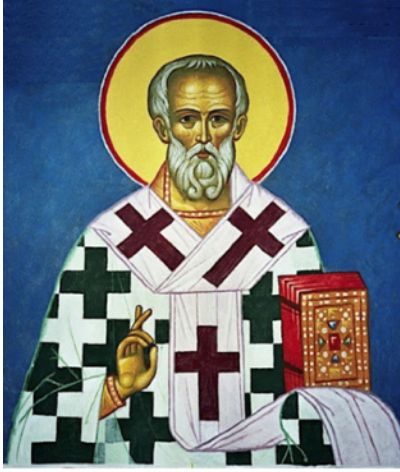
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

ভূমিকা

সাধু হিলারিউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু হিলারিউস ('হিলারিউস' লাতিন নামের অর্থই আনন্দ) আকুইতানিয়ায় অবস্থিত [পিক্তাবিউম](#) শহরে (বর্তমানকালীন ফ্রান্সে অবস্থিত পোয়াতিয়ে শহরে) আনুমানিক ৩১৫



সালে সম্ভ্রান্ত বংশের সম্ভবত-পৌত্তলিক এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একথা নিশ্চিত যে তাঁকে তখনই বাপ্টিস্ম দেওয়া হয় যখন তিনি বিবাহিত, ও আব্রা নামক একটি কন্যার পিতা। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে নিশ্চিত কোনও খবর নেই, কিন্তু তাঁর লেখাগুলো থেকে অনুমান করা যায়, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন।

আনুমানিক ৩৫০ সালে পোয়াতিয়ের বিশপের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে হিলারিউসই বিশপ-পদে মনোনীত হন। তাতে ধর্মশিক্ষা ও পালকীয় দায়িত্ব ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গুরু হয় যা আদর্শ পালক রূপে তাঁর ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করবে; এবিষয়ে তিনি নিজেই 'দ্রিত্ব প্রসঙ্গ' লেখার ৮ম পুস্তকের ১ম অধ্যায়ে ব্যক্ত করেন তাঁর বিবেচনায় আদর্শ পালকের জীবনধারণ কেমন হওয়া উচিত। কালক্রমে এ নতুন বিশপের সুখ্যাতি চারদিকে বিস্তার লাভ করে, ও আনুমানিক ৩৫৪ সালে সাধু মার্টিন পোয়াতিয়েতে এলে বিশপ হিলারিউস তাঁকে মণ্ডলীর সেবাকর্মের প্রাথমিক পদে নিযুক্ত করেন।

ইতিমধ্যে, সেই ৪র্থ শতাব্দীতে, যথেষ্ট ভ্রান্তমত, বিশেষভাবে আরিউসেরই প্রবর্তিত ভ্রান্তমত আবির্ভূত হলে খ্রিস্টমণ্ডলীর যথার্থ বিশ্বাস বিপদের সম্মুখীন, কেননা সেই আরিউস এমনটা প্রচার করত, পুত্র-ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের সহ-অনন্তকালীন নন অর্থাৎ পুত্র শূন্য থেকে সৃষ্ট একটা জীব মাত্র। বাস্তবিকই ৩২৫ সালে রোম-সম্রাট কনস্টান্টিনাস বিশ্বাস সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধান করার জন্য [নিকেয়ায়](#) (বর্তমানকালীন তুরস্কে অবস্থিত ইজ্জনিক শহরে) একটা ধর্মীয় মহাসভা আহ্বান করেন, ও তেমন মহাসভা

আরিউসের মতবাদ ভ্রান্তমত বলে নিন্দিত করে এটা ঘোষণা করে যে, পিতা ও পুত্র সমসত্তার অধিকারী।

বিশপ হিলারিউস যেখানে বাস করতেন, সেই গাল্লিয়ার (তথা ফ্রান্সের) খ্রিস্টমণ্ডলী মধ্যপ্রাচ্যের উপরোল্লিখিত ধর্মীয় সমস্যা দ্বারা তখনও আক্রান্ত হয়নি, কিন্তু অবস্থা-পরিস্থিতির তখনই পরিবর্তন হলো যখন কনস্টান্টিনুসের মৃত্যুতে আরিউসপন্থী তাঁর সন্তান কনস্টান্টিউস রোম-সম্রাট পদে রাজ্যভার গ্রহণ করার পর মাগ্নেস্তিউস নামক রাজপদ-দখলকারী সেনাপতির বিদ্রোহ দমন করার জন্য হঠাৎ করে রাজ্যের পশ্চিমা এলাকায় গিয়ে ৩৫৩ সালে **আরেনাতে** (বর্তমান দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত আর্ল) শহরে একটা ধর্মসভা আহ্বান করে সম্মিলিত বিশপগণকে সেই বিশপ আথানাসিউসকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে নিন্দিত করতে বাধ্য করেন যিনি নিকেয়া-মহাসভায় যথার্থ খ্রিস্টবিশ্বাসের সবচেয়ে উদ্যগী সমর্থক হয়েছিলেন। যে বিশপগণ বিশপ আথানাসিউসকে নিন্দিত করতে সম্মত হননি তাঁরা বিশপ পদ থেকে পদচ্যুত হন; একই প্রকারে, ৩৫৫ সালে, **মিলানে** অনুষ্ঠিত মহাসভায় যে যে বিশপগণ সম্রাট কনস্টান্টিউসের আদেশ মান্য করতে সম্মত হননি তাঁদেরও পদচ্যুত করা হয়।

বিশপ হিলারিউস সেই দু'টো মহাসভায় যোগ দেন কিনা একথা অজানা, কিন্তু তিনি যে নিকেয়া-মহাসভার সমর্থক তাতে কোন সন্দেহ নেই যেহেতু তিনি নিজের একটা লেখায় বলেন, তিনি সবসময় নিকেয়া-মহাসভার সমর্থক হয়েছিলেন। যাই হোক, ৩৫৫ সালের শেষের দিকে, আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে দাঁড়াবার লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগে **প্যারিসে** ধর্মসভা আহ্বান করা হয় এবং উপস্থিত বিশপগণ সম্রাটের সমর্থন করা বিশপগণ থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন; এর ফলে বিচ্ছিন্ন বিশপগণ হিলারিউসকে অভিযুক্ত করলে ও তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন অগ্রাহ্য করলে তিনি ৩৫৬ সালে **ফ্রিগিয়া** অঞ্চলে (আজকালের তুরস্কের একটা অঞ্চলে) নির্বাসিত হন।

সেখানে অবস্থান করতে করতে তিনি প্রাচ্য খ্রিস্টমণ্ডলীগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে গ্রীক খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংসর্গের ফলে সমৃদ্ধ গ্রীক ঐশতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হন। এ নির্বাসনকালে তিনি ‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’, ‘মহাসভা প্রসঙ্গ’, ‘বালেন্স ও উর্সাকিউসের বিপক্ষে’, ‘সম্রাট কনস্টান্টিউসের কাছে আবেদন’ ও ‘কনস্টান্টিউসের বিপক্ষে’ লেখাগুলো রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে ‘মথি-সুসমাচারের ব্যাখ্যা’, ‘সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা’, ও নানা ধর্মীয় সঙ্গীতও উল্লেখযোগ্য।

৩৫৯ সালে তিনি আজকালের বাঘদাদের নিকট স্থান [সেলেউকিয়া](#)-মহাসভায় যোগ দেন; ও যথার্থ ধর্মবিশ্বাস ক্ষেত্রে রোম-সম্রাটের সহযোগিতা বজায় রাখার প্রত্যাশায় ৩৬০ সালে রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী [কনস্টান্টিনোপলিসে](#) (আজকালের ইস্তানবুলে) যাত্রা করেন, কিন্তু রোম-সম্রাট তাঁর আবেদন গ্রাহ্য না করলেও তবু তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন; যাত্রাপথে তিনি কিছু দিন রোমে থেকে সম্ভবত পোপ লিবেরিউসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

৩৬১ সালে তাঁর সহযোগিতায় সাধু মার্টিন একটা মঠ স্থাপন করে গাল্লিয়ায় সন্ন্যাস-জীবন প্রবর্তন করেন; একই সালে বিশপ হিলারিউস প্যারিসে এমন আঞ্চলিক ধর্মসভা ঘোষণা করেন যা দ্বারা নিকেয়া-মহাসভার সমর্থিত যথার্থ খ্রিস্টবিশ্বাস আরও শক্তিশালী করা হয়।

৩৬৭ সালে তিনি পোয়াতিয়েতে মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিস্টমণ্ডলী তাঁকে মণ্ডলীর আচার্য বলে সম্মানিত করে, ও ১৩ই জানুয়ারীতে তাঁর পর্ব পালন করে।

‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’

‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’ হলো সাধু হিলারিউসের প্রধান লেখা যা বিশেষভাবে আরিউসের ভ্রান্তমত খণ্ডন করতে অভিপ্রেত। লেখার শিরনাম সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে কেননা বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি শিরনাম হিসাবে ‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’ এর বদলে ‘বিশ্বাস প্রসঙ্গ’ উপস্থাপন করে। আজকালের বিশেষজ্ঞগণ প্রায়ই ‘বিশ্বাস প্রসঙ্গ’ শিরনামের সমর্থনকারী; কিন্তু তাসত্ত্বেও বহু শতাব্দীর প্রথা রক্ষার্থে লেখার নাম হিসাবে এখনও সাধারণত ‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’ নাম গ্রহীত।

বিশপ হিলারিউসের রচনা-শৈলী যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও অলঙ্কার-প্রিয়; লাতিন ভাষায় বাইবেলের বিখ্যাত অনুবাদক সাধু যেরোম (৩৪৭-৪২০) তাঁর লেখার কায়দা খুবই প্রশংসা করেন কিন্তু একাধারে একথাও বলেন যে, ‘তিনি মাঝে মাঝে এমন দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগ করেন যা কম শিক্ষিত পাঠকদের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়’; তাঁর লেখার কাঠিন্য ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যাখ্যাতাগণও তাঁর দীর্ঘ বাক্য ছাড়া তাঁর অতিরিক্ত তাত্ত্বিক ভাষা ও উহ্য শব্দ প্রয়োগও উল্লেখ করেন, যার ফলে তিনি যা বলতে চান তা সময় সময় পাঠকের পক্ষে অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্পষ্টতার একটা কারণ আছে, কেননা প্রাচীন লাতিন লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এমন গ্রীক ধর্মতত্ত্বের সম্মুখীন যা লাতিন

ভাষী জগতে পূর্বে প্রচলিত ছিল না, এবং এর ফলে সেই নতুন তত্ত্ব ও ধারণা উপস্থাপন করার জন্য তিনি প্রাচীন অনুপযোগী শব্দ ব্যবহার করতে বা নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে বাধ্য। এমনকি এক্ষেত্রে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন, কেননা সেপ্রসঙ্গে, অন্য একটা লেখায়, তিনি বলেন, ‘আমি এমন গুরুত্বপূর্ণ ও অদ্ভুত বিষয় লিখতে বাধ্য যা আজ পর্যন্ত তা লিখতে কেউই চেষ্টা করেননি এমনকি কেউই তা উল্লেখও করেননি’। তবু এক্ষেত্রে একথা স্মরণযোগ্য যে তাঁর আগেকার লাতিন খ্রিস্টীয়ান লেখকদের মধ্যে তিনি রচনা-ভঙ্গি ক্ষেত্রে সাধু **কিপ্রিয়ানুস** দ্বারা ও নতুন শব্দ প্রয়োগ ক্ষেত্রে **তের্তুল্লিয়ানুস** দ্বারা উপকৃত ও প্রভাবান্বিত হলেন।

পাঠক / পাঠিকা নিজেই লক্ষ করবেন, এই বাংলা অনুবাদে বর্গাকার বন্ধনী [] প্রায়ই উপস্থিত: তেমন বন্ধনীতে অন্তর্ভুক্ত শব্দ বা বাক্য বিশপ হিলারিউসের লেখা নয়, অনুবাদকেরই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক সহায়িকা যাতে পাঠক / পাঠিকা সাথে সাথে অর্থাৎ টীকা-বিভাগে না গিয়েও অস্পষ্ট শব্দের বা বাক্যের অর্থ জানতে পারেন।

বাইবেল-উদ্ধৃতির কথাও উল্লেখযোগ্য, কেননা বিশেষভাবে পুরাতন নিয়ম ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বচনগুলো আজকালে প্রচলিত বাইবেলের সঙ্গে তত মিল রাখে না। এর কারণ এটা যে, সেইকালে লাতিন ভাষার বাইবেলের স্থিরীকৃত কোন পাঠ্য তখনও ছিল না; বস্তুতপক্ষে ‘ভুলগাতা’ বলে পরিচিত লাতিন বাইবেল বিশপ হিলারিউসের মৃত্যুর পরেই সাধু যেরোম দ্বারা অনূদিত হয়। সেজন্য বিশপ হিলারিউসের বাইবেল-উদ্ধৃতিসমূহ ভুলগাতার সঙ্গেও মেলে না, আজকালের অনুবাদসমূহের সঙ্গেও মেলে না। অন্য কথায়, বিশপ হিলারিউস, হয় নিজেই গ্রীক বাইবেল থেকে সরাসরিই লাতিন ভাষায় অনুবাদ করছিলেন, না হয় তাঁর অঞ্চলে প্রচলিত অস্থায়ী কোন না কোন লাতিন পাঠ্য ব্যবহার করছিলেন। তাই টীকা-বিভাগে তেমন উদ্ধৃতিগুলো ‘ভুলগাতা পাঠ্য’ নয়, ‘লাতিন পাঠ্য’ বলেই চিহ্নিত।

আরিউসের ভ্রান্তমতের বিপক্ষে তাঁর অবিচল সংগ্রামের জন্য বিশপ হিলারিউস সাধু আথানাসিউসের সমকক্ষ বলে পরিগণিত (যেহেতু মিশরে অবস্থিত আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু আথানাসিউসও সাধু হিলারিউসের কয়েক বছর পূর্বে খ্রিস্টমণ্ডলীর পূর্বাঞ্চলে আরিউসের ভ্রান্তমতের বিপক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন ও সেবিষে যথেষ্টও লিখেছিলেন: তাঁর ‘**বাণীর মনুষ্যত্বধারণ**’ লেখা দ্রঃ); এজন্য তিনি ‘পশ্চিমা জগতের আথানাসিউস’ ও ‘আরিউসপন্থীদের হাতুড়ি’ বলে আখ্যায়িত।

‘শব্দার্থ’

উপরেও বলা হয়েছে, ‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’ লেখায় সাধু হিলারিউস ভ্রান্তমতপন্থীদের, বিশেষভাবে সেই আরিউসপন্থীদেরই বিপক্ষে মণ্ডলীর স্বীকৃত খ্রিষ্টতত্ত্ব উপস্থাপন করেন যারা খ্রিষ্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে চিনে নিত না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষভাবে পিতা ও পুত্র সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলো ব্যবহার করেন :

- ‘যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়’ (লাতিন ভাষায় *innascibilis* (ইনাস্কিবিলিস) বাক্যটা সবসময় সেই পিতা ঈশ্বরকে নির্দেশ করে যিনি অনন্তকালীন।

- ‘একমাত্র জনিত ঈশ্বর’ : এ সংজ্ঞা দ্বারা সাধু হিলারিউস পুত্র-ঈশ্বরকে নির্দেশ করেন। বস্তুত, যোহন ১:১৪ ও অন্যান্য পদ ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে ‘একমাত্র জনিতজন’ এর কথা উল্লেখ করে। এতে সাধু হিলারিউস বাইবেল ভিত্তি করে আরিউসপন্থীদের দেখান, যিনি পিতা ঈশ্বরের একমাত্র জনিতজন, যিনি তাঁর বাণী (যোহন ১:১), পরাক্রম ও প্রজ্ঞা (১ করি ১:২৪), সেই পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর।

- ‘অনন্তকালীন জন্ম’ : এ সংজ্ঞা দ্বারা সাধু হিলারিউস কুমারী হতে জন্ম থেকে পিতা হতে সেই জন্মকে পৃথক করেন যা অনন্তকালীন। অর্থাৎ কুমারী থেকে জন্ম নেবার আগেও পুত্র অনন্তকালীন সর্বযুগের পূর্বে পিতা থেকে জনিত বলে বিদ্যমান ছিলেন; অর্থাৎ পিতা যেমন অনন্তকালীন, তেমনি পুত্রও অনন্তকালীন, এর ফলে পুত্রও পিতার মত অনন্তকালীন ঈশ্বর। সাধু হিলারিউসের ভাষায় ‘অনন্তকালীন’ বলতে ‘অনাদি-অনন্ত’, ‘অনন্তকালস্থায়ী’, বা ‘সনাতন’ বোঝায়।

- ‘অবস্থান করা’ : ঈশ্বর ক্ষেত্রে এ বিশেষ সংজ্ঞা ‘অনন্তকালীন ভাবে ঈশ্বর বলে বিরাজমান হওয়া’ বোঝায়, যেমন, ‘খ্রিষ্ট ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করেন’ (৬ অধ্যায় দ্রঃ); অথবা, ‘পুত্র পিতার সঙ্গে অবস্থান করেন’ বলতে ‘পুত্র পিতার সঙ্গে ঈশ্বরত্বের অধিকারী’ বোঝায়। তাই, ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে, এ দ্বারাও ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর বলে স্বীকৃত।

- ‘রূপ’ : শব্দটা সাধারণ অর্থে অনুধাবনযোগ্য নয়; অর্থাৎ, ‘রূপ’ শব্দটা যে ‘আকার’, ‘চেহারা’ ও এধরনের অন্যান্য শব্দের সমার্থক শব্দ তা নয়। প্রকৃতপক্ষে প্লেটোর সময় থেকে জ্ঞানবিদ্যা ও ঐশতত্ত্ববিদ্যায় ‘রূপ’ শব্দটা যেকোন কিছুই এমন মূল বৈশিষ্ট্য বা ‘ছাপ’ বুঝাত যা স্বর্গে স্থিত : উদাহরণ স্বরূপ, সব ধরনের গাছপালা স্বর্গীয় একক ‘গাছ-রূপের’ অধিকারী; সব ধরনের মাছ স্বর্গীয় একক ‘মাছ-রূপের’ অধিকারী; ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সাধু হিলারিউস বলেন, ঈশ্বর ও খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে ‘রূপ’ শব্দটা স্বরূপেরই

সমার্থক শব্দ ; সুতরাং, ‘রূপে ঈশ্বর হয়েও তিনি [অর্থাৎ খ্রিষ্ট] ...’ (ফিলি ২:৬ দ্রঃ) বাক্যটির একমাত্র অর্থ হলো ‘স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও তিনি ...’। উভয় শব্দ ‘অবস্থা’ শব্দেরও শামিল : ‘অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ...’। অতএব, ঈশ্বর ও খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে ‘রূপ’ ও ‘স্বরূপ’ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো পিতা ও পুত্র উভয়েই ঈশ্বরত্বের অধিকারী। তাই এক্ষেত্রেও সাধু হিলারিউস আরিউসপন্থীদের দেখান, পিতা যেমন, পুত্রও তেমনি ঈশ্বর।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিভু প্রসঙ্গ

বারোটা পুস্তক

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

১ম পুস্তক

এই প্রথম পুস্তক হলো সমস্ত লেখার ভূমিকাস্বরূপ। ১-১৪, ৩৭ ও ৩৯ অধ্যায়ে সাধু হিলারিউস বিশ্বাস অভিমুখে নিজের যাত্রা বর্ণনা করেন; কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাতাদের বিমত রয়েছে: কেউ কেউ মনে করেন, এই বর্ণনায় সাধু হিলারিউস নিজের নয় কিন্তু বিশ্বাস-যাত্রায় সকল বিশ্বাসীর সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা বলেন; অন্য কেউ সাধু হিলারিউসের নিজেরই বিশ্বাস-যাত্রার কথা ব্যক্ত করেন।

১৫-১৯ অধ্যায়ে তিনি বিশেষভাবে আরিউস ও সাবেল্লিউসেরই ভ্রান্তমত খণ্ডন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কারণ যিনি পুত্র ও ঈশ্বর, আমাদের সেই ত্রাণকর্তাকে সৃষ্টজীব বলে ঘোষণা করায় আরিউস তাঁকে নিম্নপদস্থই করে; অন্যদিকে সাবেল্লিউস এমনটা সমর্থন করে যে, খ্রিস্টকে পুত্র, প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করায় আমরা আসলে একই ঈশ্বরের নানা নাম মাত্রই উচ্চারণ করি; অর্থাৎ পিতা ও পুত্র একমাত্র ব্যক্তি। সুতরাং, আরিউস হোক বা সাবেল্লিউস হোক দু'জনেই ত্রিত্বকে অস্বীকার করে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর শাস্ত্র-প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজের বিষয়ে দেখিয়েছেন, তিনি সনাতন ত্রিত্ব, সেজন্য সাধু হিলারিউস সেই শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই ত্রিত্ব-রহস্যকে যথার্থ সত্য বলে ঘোষণা করেন: এ সত্য মেনে না নেওয়া শাস্ত্রকেই মেনে না নেওয়ার শামিল। যখন ঈশ্বর বলেন, তাঁর এক পুত্র আছেন, তখন তাঁর সেই পুত্র আছেন; তাই ঈশ্বর-রহস্য সম্পর্কে মানুষকে স্বীকার ও ঘোষণা করতে হবে, ঈশ্বর এক, ও একাধারে তিনি ত্রিত্ব। এমনকি রহস্যটা একেবারে মানব-বোধের অতীত বলেই মানুষের বিশ্বাস দৃঢ়তর হওয়া চাই। সেজন্য ভ্রান্তমতপন্থীরা যা করে, অর্থাৎ তারা যে নিজেদের বুদ্ধির ধারণক্ষমতা অনুসারে ঈশ্বরের রহস্যগুলোকে গণ্ডিবদ্ধ করতে ও শাস্ত্রের বহিরাগত যুক্তি দ্বারা ঐশ্বরিক শাস্ত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করে, তা বিশ্বস্ত খ্রিস্টিয়ানদের কাছে নিন্দার বিষয়।

২০-৩৬ অধ্যায় গোটা লেখার কার্যসূচী স্বরূপ, ও লেখাটার সবচেয়ে প্রধান ঐশাতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ উপস্থাপন করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮				

১। যখন আমি মানবজীবনের যথার্থ ও ধর্মসম্মত এমন তাৎপর্য অনুসন্ধান করছিলাম যা প্রকৃতি থেকে প্রণোদিত বা প্রজ্ঞাবানদের গবেষণা থেকে উৎসারিত যাতে করে আমি আমাদের কাছে মঞ্জুর করা উপলব্ধি-শক্তির ঐশ্বরিক দানের যোগ্য কোন না কোন ফলাফল লাভ করতে পারি, তখন আমার মনে অনেক বিষয় এসে উপস্থিত হল যা সাধারণ ধারণা অনুসারে জীবনকে উপকারী ও সেইসঙ্গে আকাঙ্ক্ষণীয় বলে পরিগণিত। বিশেষভাবে সেই বিষয়ই আমার মনের সামনে এসে উপস্থিত হল যা অতীতকালেও যেমন সবসময় সবচেয়ে বড় কামনার বস্তু বলে গণ্য ছিল, তেমনি আজকালেও সেইভাবে গণ্য, তথা কর্মমুক্তিতে কাটা সময় ও সেইসঙ্গে ঐশ্বর্য। তবে এমনটা মনে হয় যে, একটা অপর একটা ছাড়া মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলেরই উৎস হয়, কেননা দারিদ্র্য-অবস্থায় কর্মমুক্তিতে কাটা সময় কেমন যেন জীবন থেকে নির্বাসনই বলে উপলব্ধি করা হয়, ও মনের অশান্তির মধ্যে যে ঐশ্বর্য, তা তো নিজেই এমন দুর্বিপাক যা মহত্তর লজ্জাবোধ দ্বারা আরও বেশি কষ্টকর হয়ে ওঠে, সেই যে লজ্জা মানুষ তখনই ভোগ করে যখন সে সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত ও অন্বেষিত বিষয়াদি অধিকার করার পর তা সবই হারিয়ে ফেলে। আর সেই ঐশ্বর্য ও কর্মমুক্তিতে কাটা সেই সময় দু'টোই জীবনের উচ্চতম ও উৎকৃষ্ট যত বিলাসিতাকে ধারণ করলেও তবু সেই বিষয় দু'টো পশুদের সাধারণ কামনা-বাসনা থেকে তত ভিন্ন মনে হয় না, সেই যে পশুগুলো তৃণপূর্ণ ছায়াময় চারণভূমিতে ঘোরাফেরা করতে করতে শ্রম থেকে রক্ষা ও সেইসঙ্গে খাদ্যের প্রচুর্যও উপভোগ করে। কেননা নিশ্চিন্তে সময় কাটানো ও প্রাচুর্য ভোগ করা যদি শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধতম মানবজীবনধারণ বলে গণ্য হয়, তাহলে এমনটা দাঁড়ায় যে, অনুভূতির দিক দিয়ে স্থায়ী স্থায়ী ভিন্নতা মেনে নিলেও তবু চেতনাবিহীন সমস্ত পশু-জগতেরও ও আমাদেরও বিষয়বস্তু একই; কেননা [মানুষ ও পশু] তারা সবাই প্রকৃতির মঞ্জুর করা সেই উদার

বদান্যতা ও সুখময় অবসরকাল ভোগ করতে করতে শ্রমে-কষ্টে অধিকার করার দুশ্চিন্তা ছাড়াই জীবন উপভোগ করার পূর্ণ সুযোগ পায়।

২। আমার ধারণায়, গোটা মানবজাতি পশুদের অবিবেচক জীবনে এই মৌনসম্মতি নিজ থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও অন্যদের বেলায় নিন্দা করেছে শুধু এই কারণে যে, খোদ প্রকৃতিই তাদের এমনটা শিখিয়েছে যে, শুধু নিজ নিজ লোভ ও অলসতা তুষ্ট করার জন্যই যে তারা জন্ম নিয়েছে ও গৌরবময় কর্মকীর্তি বা শুভকর্মের উচ্চ লক্ষ্যের উদ্দেশ্য ছাড়াই যে তারা জীবনে উপনীত হয়েছে তেমনটা ধারণ করা মানবজাতির পক্ষে অযোগ্য; এমনকি, এই জীবন যে অমরতার দিকে অগ্রগতির ক্ষমতা ছাড়া মঞ্জুর করা হয়েছে এমনটাও ধারণ করা অযোগ্য; কেননা জীবন তেমনিই হলে তবে সেই জীবন ঈশ্বরের দান বলে বিবেচিত হওয়া নিঃসন্দেহেই যোগ্য নয় যেহেতু কষ্টভোগী ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সেই জীবন শিশুকালের শূন্য মন থেকে বার্ষিক্যকালের প্রলাপ পর্যন্ত নিজেকে নিজেতেই অপচয় করে। বরং এটাই বিশ্বাস্য যে, মানুষ খোদ প্রকৃতি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ধৈর্য, মিতাচার ও সহিষ্ণুতা এমন সদৃশ বিষয়ে শিক্ষালাভ ও সেই অনুযায়ী কর্মসাধনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নীত করেছে এব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যে, ন্যায় জীবন ধারণ মানে ন্যায় কর্মসাধন ও ন্যায় চিন্তাধারণ (ক), এবং এব্যাপারেও নিশ্চিত হয়ে যে, অমর ঈশ্বর যে কেবল মৃত্যুর উদ্দেশ্যেই জীবনকে দান করেছেন তা নয়, কেননা এমন কেউই নেই যে এমনটা ভাবতে পারে যে, মঙ্গল দানকারী যিনি, তিনি জীবনের আনন্দময় অনুভূতিকে মৃত্যুবরণের দুঃখময় আতঙ্কের লক্ষ্যে মঞ্জুর করেছেন।

৩। অথচ, ত্রুটিমুক্ত বিবেক রক্ষা করা ও জীবনের কষ্ট দূরদর্শিতা দ্বারা এড়ানো বা বুদ্ধি সহকারে তা ফাকি দেওয়া বা ধৈর্যের সঙ্গে তা সহ্য করা সম্পর্কে তাদের পরামর্শকে যদিও আমি নির্বুদ্ধিতা ও অপদার্থতা বলে চিহ্নিত করতাম না, তথাপি তেমন মানুষেরা যে মঙ্গলময় ও সুখী জীবন ধারণের লক্ষ্যে উপযুক্ত পথদিশারী হবে তা মনে হচ্ছিল না, কেননা তাদের আদেশগুলো ছিল মানবীয় আবেগ অনুযায়ী এমন মামুলি উক্তি মাত্র যা পশুদের সহজাত প্রবৃত্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম; এবং যে কেউ তা বুঝে তাতে অবাধ্য হত, তাকে অবশ্যই এমন অযৌক্তিক আচরণে পতিত হতে হত যা পাশব যুক্তিহীনতার

চেয়েও নিম্নতর। তাছাড়া, যা কিছু অবহেলা করলে লজ্জা ও কষ্ট উপস্থিত হয়, আমার প্রাণ যে শুধু সেই সমস্ত কিছু করতে আগ্রহী ছিল তা নয়, বরং সেই ঈশ্বর ও পিতাকেই জানতে আগ্রহী ছিল যিনি এই মহাদান মঞ্জুর করেছিলেন, যাঁর কাছে প্রাণ মনে করছিল সে সম্পূর্ণরূপে ঋণী, যাঁকে সেবা করা প্রাণের সত্যকার সম্মান, যাঁতে প্রাণের সমস্ত আশা-প্রত্যাশা স্থিত, যাঁর মঙ্গলময়তার আশ্রয়ে প্রাণ এই আবেগপূর্ণ জীবনের সমস্ত কষ্টের মধ্যে একেবারে নিরাপদ ও পরিচিত বন্দরেই যেন বিশ্রাম করতে পারত। তাই আমার প্রাণ তেমন কিছু উপলব্ধি করার বা জানবার প্রবল বাসনায় উদ্দীপ্ত ছিল।

৪। কেননা সেই প্রাচীনদের অনেকে অনিশ্চিত দেব-দেবীর বহুসংখ্যক পরিবারকে প্রবেশ করাত, এবং এব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে যে দিব্য প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ ও নারী লিঙ্গ কার্যকর, সেই ভিত্তিতে তারা সেগুলোর উদ্ভব ও দেবতাগুলো থেকে উৎপন্ন দেবতাগুলোর পরম্পরার কথা বর্ণনা করত। অন্য কেউ এমন ধারণা প্রচার করত যে, মহত্তর ও নিম্নতর এমন দেবতা ছিল যারা প্রভাবের দিক দিয়ে ভিন্ন (ক)। কেউ না কেউ দেব-দেবীর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করত ও তাদের উপাসনা এমন স্বরূপেই সীমাবদ্ধ করত যা তাদের মতে ভাগ্য-চালিত স্পন্দন ও সংঘর্ষের ফলে অস্তিত্বশীল (খ)। অন্য দিকে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করায় সেকালে প্রচলিত ধারণা পালন করত, কিন্তু ঈশ্বরকে মানব-কর্মকাণ্ডের প্রতি উদাসীন বলে ঘোষণা করত। আরও, কেউ না কেউ পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের পদার্থগুলোতে সৃষ্টবস্তুগুলোর দেহগত ও দৃশ্যগত আকার পূজা করত; এবং অবশেষে কেউ না কেউ নিজ নিজ দেব-দেবীকে মানুষদের অথবা গৃহপালিত বা বন্য পশুদের অথবা পাখী বা সাপদের সাদৃশ্যের মধ্যে বসবাস করাত এবং বিশ্বপ্রভু ও অস্বীমত্বের পিতা যিনি তাঁকে ধাতু বা পাথর বা কাঠনির্মিত সেই সঙ্কীর্ণ কারাবাসে সীমাবদ্ধ করত (গ)। তেমন মানুষকে সত্যের প্রবর্তক বলা অযোগ্যই, কেননা তারা যদিও তাদের ধর্মনীতির অযৌক্তিকতা, অশ্লীলতা ও অভক্তিতে এক ছিল, তথাপি তাদের যুক্তিহীন ধারণাসমূহের মুখ্য বিষয়াদি ক্ষেত্রে একমত ছিল না। তাই তাদের এসমস্ত দাবির মধ্যে আমার প্রাণ বিহ্বল হওয়া সত্ত্বেও আমার মন এখনও সেই লাভজনক পথ ধরে চলতে প্রভাবিত যা প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভের জন্য আবশ্যিক; আমার প্রাণ এও মানতে পারত না যে, ঈশ্বর নিজে যা সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রতি উদাসীনতা ঈশ্বরে

যোগ্যরূপে আরোপণীয় ; এও মানতে পারত না যে, দেব-দেবী লিঙ্গবিশিষ্ট এবং জনক ও জনিতজনের বহু পরম্পরা ও উদ্ভব ঈশ্বরত্বের দিব্য ও মহৎ স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমার মন বরং এতে নিশ্চিত ছিল যে, যা ঐশ্বরিক ও অনন্তকালীন তা এক [অর্থাৎ ঈশ্বর আদৌ লিঙ্গবিশিষ্ট নন], কেননা যা কিছু স্বয়ংঅস্তিত্বশীল তা এমন কিছু রাখতে পারে না যা তার নিজের চেয়ে মহৎ। ফলে সর্বশক্তিমত্তা ও অনন্ততা কেবল একজনেরই অধিকার, কেননা সর্বশক্তিমত্তায় যে প্রবল ও দুর্বল শক্তি একসাথে থাকবে, এবং অনন্ততায় যে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কিছু থাকবে তা হতে পারে না। তবে ঈশ্বরে তা-ই মাত্র পূজনীয় যা অনন্ত ও সর্বশক্তিমণ্ডিত।

৫। আমার মন তেমন ধারণা ও সদৃশ ধারণাগুলোতে চিন্তাশ্রিত থাকতে থাকতে আমি দৈবাৎ সেই পুস্তকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হলাম যেগুলো হিব্রু ধর্মের পরম্পরা অনুসারে মোশি ও নবীদের দ্বারা লেখা হয়েছিল (ক); সেগুলোতে এই বচনগুলো উল্লিখিত যা অষ্টা ঈশ্বর নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে উচ্চারণ করেছিলেন, তথা, ‘আমি সেই আছি যিনি আছি’ (খ); আরও, ‘তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: যিনি আছেন তিনিই আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন’ (গ)। ঈশ্বর সম্পর্কে তেমন সূক্ষ্ম সংজ্ঞাতে আমি একেবারে বিস্মিত হয়েছিলাম, কেননা সেই সংজ্ঞা ঐশ্বরস্বরূপের বোধাতীত জ্ঞানকে এমন বচনে ব্যক্ত করে যা মানব বুদ্ধির জন্য অধিক উপযোগী। কেননা ঈশ্বর ক্ষেত্রে যা স্বকীয়, সেবিষয়ে সেই “আছেন” শব্দটার চেয়ে অধিক উপলব্ধ শব্দ নেই, কেননা স্বয়ং যা “আছে”, তা যে “নেই” তা বলা যায় না, তা যে শুরু হয়েছিল, তা-ও বলা যায় না; কিন্তু অক্ষয়শীল সুখের প্রভাবে যা চিরস্থায়ী, তা অস্তিত্বহীন হতে পারেনি, পারবেও না, কেননা যা কিছু ঐশ্বরিক তার উদ্ভবও হতে পারে না, তার বিনাশও হতে পারে না। সুতরাং, যেহেতু ঈশ্বরের অনন্ততা কোন মতেই নিজের অনন্ততা অস্বীকার করতে পারে না, সেজন্য এই একমাত্র বিষয় প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে যোগ্যই ছিল, তথা “তিনি আছেন”, কেননা এটাই তাঁর অক্ষয়শীল অনন্ততার প্রমাণ।

৬। [ঈশ্বরের] তেমন অস্বীমত্বের সংজ্ঞা ক্ষেত্রে ‘আমি সেই আছি যিনি আছি’ (ক) বচনটা একেবারে উপযোগী মনে হল। কিন্তু তাছাড়া আমাদের পক্ষে তাঁর মহত্ত্ব ও পরাক্রমের

ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধি করা দরকার ছিল। কেননা যিনি সতত বিরাজমান হয়ে কখনও কোন এক সময়ে উদ্ভূত হননি যখন অস্তিত্ব তাঁরই স্বকীয়, তখন আমরা এমন উক্তিও শুনতে পাই যা তাঁরই যোগ্য ও যা অনন্ত ও পবিত্র স্বয়ং ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত; তিনিই তো বলেন, ‘তিনি নিজের করতলে আকাশমণ্ডল ও নিজের বিঘতে পৃথিবী ধারণ করে রাখেন’ (খ); আরও, ‘স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ; আমার জন্য তোমরা কোথায় গৃহ গৈঁথে তুলবে? কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান? আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?’ (গ)। গোটা আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের করতলে, গোটা পৃথিবী তাঁর বিঘতে ধারণ করা রয়েছে। তবে ঈশ্বরের যে বাণী ধার্মিক মানুষের বুদ্ধির জন্য যতই উপযোগী, তবু সেই বাণী ক্ষণস্থায়ী শ্রোতার কাছে যেমন উপযোগী, তার চেয়ে সেই বাণী তারই কাছে গভীরতর অর্থ প্রকাশ করে যে ধৈর্যের সঙ্গে বাণীটা অধ্যয়ন করে। কেননা যে আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের করতলে ধারণ করা রয়েছে, তা তাঁর সিংহাসনও বলে বর্ণিত, এবং যে পৃথিবী তাঁর বিঘতে রয়েছে, তা তাঁর পাদপীঠও বলে উল্লিখিত। সেই সিংহাসন ও সেই পাদপীঠ বসা অবস্থায় মানুষের অঙ্গভঙ্গি থেকে নেওয়া উদাহরণ মাত্র, তাই এমনটা লেখা হয়নি যে সেই সিংহাসন ও সেই পাদপীঠ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, তিনি দেহগত দিক দিয়ে স্থানে স্থানে বিস্তৃত, কেননা যা তাঁর সিংহাসন ও পাদপীঠ, তা সেই অসীম সর্বশক্তিমত্তা দ্বারা তাঁর নিজের করতলে ও বিঘতেও ধারণ করা রয়েছে। বরং সেই সবকিছু এজন্যই লেখা হয়েছে যাতে সমস্ত সৃষ্টবস্তুর উদ্ভবে ঈশ্বর সেগুলোর অভ্যন্তরে ও বাইরেও, অতিবিদ্যমান ও অন্তঃবিদ্যমানও ব’লে, ও সেগুলোর চারদিকে বিদ্যমান ও সবকিছুর অন্তঃস্থিতও ব’লে জ্ঞাত হতে পারেন, কেননা সেই যে করতল ও বিঘত ধারণ করে রাখে, তা তাঁর বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রভাব প্রকাশ করে; অন্য দিকে সেই সিংহাসন ও সেই পাদপীঠ বসা অবস্থায় ব্যক্তির অবলম্বন হিসাবে অভ্যন্তরে স্থিত সেই একমাত্রজনের প্রতি বাইরের সমস্ত বস্তুর অধীনতা প্রকাশ করে যিনি, সেইসব কিছুর বাইরে থাকতেই নিজের করতলে সবই ঘিরে রাখেন, পাছে যা তাঁর নিজের অধিকার, তিনি সেই বহির্জগতের অভ্যন্তরে বসবাস করেন। এইভাবে ঈশ্বর অভ্যন্তর থেকে ও বাইরে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন ও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখেন; কেননা অসীম হওয়ায় তিনি সবকিছুতে বর্তমান, ও অসীম যিনি, তাঁর মধ্যে সবই

অন্তর্ভুক্ত। তেমন ভক্তিময় চিন্তায়ই আমার সত্যাত্মবোধী প্রাণ আনন্দ পেত। কেননা এমনটা মনে হচ্ছিল, ঈশ্বরের মহত্ত্ব তাঁর সৃষ্টবস্তুগুলোর মানসিক শক্তির চেয়ে এতই উচ্চ ছিল যে, মানুষের সীমিত মন ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করার ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টায় যতই দূরে নিজেকে প্রসারিত করছিল, তবু যে সীমাবদ্ধ প্রকৃতি সংগ্রাম করছিল ও যে সীমাহীন অসীমতা তার আয়ত্তের অতীতে রয়েছে, সেই দু'টোর মধ্যকার ফাঁক আদৌ কমে যাচ্ছিল না। তেমনটাই আমি ভক্তি সহকারে ভাবছিলাম, এমন সময় এসমস্ত বিষয় নবীর স্পষ্ট কথা দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছিল, ‘তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি নেমে যাই, সেখানেও তুমি আছ। যদি উষার আগে আমার পাখা ধরি ও সমুদ্রের অতীতে বসবাস করি, সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করবে ও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখবে’ (ঘ)। এমন কোন স্থান নেই যা ঈশ্বরবিহীন, এমন কোন স্থান নেই যা ঈশ্বরে স্থিত নয়; তিনি স্বর্গে আছেন, পাতালে আছেন, যত সমুদ্রের অতীতেও আছেন। তিনি অভ্যন্তরে রয়েছেন, বাইরে সর্বস্থানেও রয়েছেন। তাই তিনি সবই ঘিরে রাখেন, তাঁকে সবই দ্বারাও ঘিরে রাখা হয়; তিনি সবকিছুতে উপস্থিত না হলে তবে এমন বস্তু নেই যেখানে তিনি উপস্থিত।

৭। অতএব, যেহেতু আমার প্রাণ তেমন সীমাহীন অসীমতাকে নিজের পিতা ও স্রষ্টা বলে উপাসনা করত, সেজন্য যদিও আমার প্রাণ তেমন উদার ও অতল মনকে উপলব্ধি থেকে আনন্দ করত, তবু অধিক আগ্রহী বাসনার সঙ্গে তার অসীম ও সনাতন প্রভুর প্রকৃত রূপ জানবার অন্বেষণ করত যাতে এমনটা বিশ্বাস করতে পারত যে, সেই অপরিমেয় ঈশ্বরত্ব নিজের প্রজ্ঞার সৌন্দর্যের অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন। তাই ভক্তিময় প্রাণ নিজের দুর্বলতা দ্বারা হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হতে হতে ঈশ্বর সংক্রান্ত অতিসুন্দর উক্তির নমুনা নবীর কণ্ঠ থেকে জানতে পারল, ‘বস্তুত বিশ্বকর্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য ও সৃষ্টবস্তুগুলোর সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, যিনি প্রজন্মসমূহের স্রষ্টা’ (ক)। মহাকর্মের স্রষ্টা মহাকর্মে, ও অতিসুন্দর বস্তুগুলোর নির্মাতা অতিসৌন্দর্যে উপস্থিত। যেহেতু কর্মকাণ্ডটা আমাদের চিন্তা-ধারণার অতীত, সেজন্য সবই নির্মাতা দ্বারা অতিক্রান্ত। তাই আকাশ, বায়ুমণ্ডল, পৃথিবী ও সমুদ্র সুন্দর, গোটা বিশ্বও সুন্দর, যেহেতু সেই গ্রীকেরাও

এতে একমত যারা বিশ্বের সুন্দর বিন্যাস থেকে সেই বিশ্বকে κόσμος [কসমস] অর্থাৎ ‘অলঙ্কার’ বলে অভিহিত করে। কিন্তু যখন আমাদের চিন্তা বিশ্বের এই সৌন্দর্যকে প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমান করতে পারে, এই প্রবৃত্তি এমন যা আমরা নানা পাখি ও জন্তুতে দেখতে পাই যেগুলোর কণ্ঠ আমাদের বোধমাত্রার অতীত হলেও তবু তাদেরই পক্ষে স্পষ্ট অর্থ বহন করে যদিও তারা তা ব্যক্ত করতে অক্ষম, ও যেহেতু সমস্ত কথনে কোন না কোন চিন্তা-ধারণার অভিব্যক্তি উপস্থিত, সেজন্য উপরোল্লিখিত কণ্ঠে তাদের নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট একটা অর্থ অবশ্যই রয়েছে, তখন এই বিশ্বময় সৌন্দর্যের প্রভু কি তাঁর চারদিকের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেই অতিসুন্দর বলে স্বীকৃতি পাবেন না? কেননা যদিও তাঁর সনাতন কান্তির দীপ্তি আমাদের মনের শ্রেষ্ঠ প্রভাবও অতিক্রান্ত করে, তবু তিনি যে সুন্দর, আমাদের মন তা না দেখে ব্যর্থ হতে পারে না। সত্যি, আমাদের স্বীকার করতে হয়, ঈশ্বর অতিসুন্দর, ও এমন সৌন্দর্যেই সুন্দর যা আমাদের বোধশক্তির অতীত হলেও তবু আমাদের উপলব্ধিতে অবশ্যই উপলব্ধ।

৮। তাই তেমন ভক্তিময় চিন্তা-ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ও তেমন তত্ত্ব অধ্যয়নে পুষ্ট হয়ে আমার প্রাণ ভরসাভরে বিশ্রাম করত; প্রাণ উপরোক্ত সেই গৌরবময় সিদ্ধান্তে কেমন যেন শান্তিময় প্রহরা-উচ্চঘরে স্থিত হয়ে বিশ্রাম করত, এবিষয় স্বীকার ক’রে যে, তার প্রকৃত স্বরূপ তার নিজের স্রষ্টাকে একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে তাকে সক্ষম করছিল, সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি মহৎ বা ক্ষুদ্রতম হোক না কেন সেটাই তার একমাত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি; সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি হলো এই দৃঢ় ধারণা যে, ঈশ্বরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই মহত্ত্ব বিশ্বাস করা সম্ভব। কেননা বিশ্বাস প্রয়োজনীয় ধর্মীয় সত্যগুলো উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের সনাতন সর্বশক্তিমানতার অস্বীমত্ব মানব উপলব্ধি অতিক্রম করে।

৯। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনার নিচে সহজাত এমন প্রত্যাশা রয়েছে যা আমার বিশ্বাস-ঘোষণা দৃঢ় করত; এতে ছিল এমন অক্ষয়শীল সুখ যা পরবর্তীকালে ঈশ্বর ও ধর্মময় জীবনধারণ সংক্রান্ত ভক্তিময় চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অর্জন করার কথা; এটাই সেই মজুরি যা বিজয়ী যোদ্ধার অপেক্ষায় রয়েছে। কেননা যদি প্রাণ মৃত্যু দ্বারা ধ্বংস হত ও শারীরিক জীবনের বিলুপ্তিতে নিভিয়ে যেত, তবে ঈশ্বর বিষয়ে সঠিক ধারণা পোষণ করায়ও কোন

ফল থাকত না। বস্তুতপক্ষে খোদ যুক্তিই এমনটা সমর্থন করত যে, শুধুমাত্র জীবন-প্রত্যাহার ও অনন্ত মৃত্যুর অপেক্ষায় মানুষকে ঈশ্বরের চিন্তা ও সুবুদ্ধির আদৌ অংশী নয় এমন জীবনে নিষ্ক্ষেপ করা ঈশ্বরকে মানায় না; জগতে স্থান নেবার লক্ষ্যে মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করাও ঈশ্বরকে মানায় না যদি সেই জগতে প্রবেশ করার পর মানুষ মরে। কেননা সৃষ্টির একমাত্র যুক্তির ভিত্তি অনুসারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল যাতে যা অস্তিত্বহীন তা যেন অস্তিত্ব পায়; কিন্তু যা অস্তিত্বমণ্ডিত ছিল তা যেন অস্তিত্বহীন হয়, তা আদৌ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল না।

১০। অথচ আমার প্রাণ একদিকে নিজের ভয়তে ও অন্যদিকে দেহেরও ভয়তে ভারাক্রান্ত ছিল। ঈশ্বর বিষয়ে প্রাণ তো দৃঢ় প্রত্যয় রাখত ও ভক্তিময় স্বীকারোক্তি রক্ষা করত বটে, কিন্তু নিজের বিষয়ে ও দেহ-আবাসের বিষয়ে প্রাণের মধ্যে এমন গভীর উদ্বেগ স্থান নিতে লাগল যে, প্রাণের বিবেচনায় প্রাণও দেহের বিলপ্তির অংশী হবে। তেমন অবস্থায় থাকাকালে প্রাণ বিধান ও নবীদের শিক্ষা ছাড়া সুসমাচারের ও প্রেরিতদূতদের উপস্থাপিত তত্ত্ব বিষয়েও শিক্ষালাভ করল, তথা, ‘আদিতে ছিলেন বাণী: বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর তাঁকে ব্যতীত কিছুই হয়নি। তাঁর মধ্যে যা কিছু হয়েছিল, তা ছিল জীবন, আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো; অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস, অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি। ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন; তাঁর নাম যোহন; তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে। তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন। বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো, যা জগতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে। তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না। কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন: তারা রক্ত থেকে নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই সঞ্চারিত। এবং বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বসবাস করলেন। আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা

পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ' (ক)। এখানে মন নিজের সহজাত ক্ষমতার অতীত উপলব্ধিতে অগ্রসর হয়ে তাকে এমনটা শেখানো হয় যা ঈশ্বর বিষয়ে সে যা কল্পনা করত তা তার চেয়েও অনেক বেশি। বাস্তবিকই সে এমনটা শেখে যে তার স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর; সে এমনটা শোনে যে বাণী ছিলেন ঈশ্বর, আর সেই বাণী আদিতে ছিলেন ঈশ্বরের কাছে। মন এটাও বোঝে যে, জগতের আলো জগতে বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু জগৎ তাঁকে চিনল না, তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না; কিন্তু যারা নিজেদের বিশ্বাস গুণে তাঁকে গ্রহণ করে তারা ঈশ্বরসন্তান হবার জন্য অগ্রসর হয়, কেননা তারা মাংসের আলিঙ্গনের ফলে অথবা রক্তগত বা দেহগত বাসনার ফলে নয়, ঈশ্বর থেকেই তারা সঞ্জাত; অবশেষে মন এটাও শেখে যে, বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, এবং আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম, অনুগ্রহ ও সত্যে মিলিত এমন গৌরব যা পিতা থেকে নেমে আসা সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব হওয়ায় সিদ্ধতাবিশিষ্টই গৌরব।

১১। এই পর্যায়ে আমার কম্পিত ও উদ্বিগ্ন মন এমন প্রত্যাশা খুঁজে পেল যা তার কল্পনার অতীত। সর্বপ্রথমে মন পিতা ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞানলাভে এগিয়ে আসে; পরে মন এমনটা শেখে যে, প্রকৃতিগত যুক্তির আলোতে সে যে অনন্ততা, অস্বীমত্ব ও সৌন্দর্যকে তার আপন স্রষ্টাকে আরোপ করত, তা ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিতজনেরও অধিকার ছিল। তাতে মন নিজের বিশ্বাস বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মধ্যে ছড়িয়ে দিল না, কেননা মন এমনটা শুনল যে তিনি হলেন ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর; মন ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরকে ভিন্ন স্বরূপ আরোপ করার ভুলভ্রান্তিতেও পতিত হয়নি, কেননা সে এমনটা শিখেছে যে তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ। তাছাড়া আমার মন সেই ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরে যুক্তি-বিরুদ্ধ কিছুও অনুভব করেনি, কেননা তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বর বলে প্রকাশিত হলেন। মন দেখল যে, এই বিশ্বাসের পুরস্কার মহৎ হলেও তবু যারা এই পরিভ্রাণদায়ী বিশ্বাস-জ্ঞান অর্জন করে, সংখ্যায় তারা খুবই অল্প, কেননা তাঁর আপনজনেরাও তাঁকে গ্রহণ করল না, যদিও যারা তাঁকে গ্রহণ করে তারা ঈশ্বরসন্তান হতে এমন জন্ম দ্বারা উপনীত হয় যা মাংসগত নয় বরং বিশ্বাসজনিত জন্ম। মন এও শিখল যে, যারা ঈশ্বরসন্তান হয়ে ওঠে তারা

বাধ্যতার জোরে তা হয় না, তাদের বরং তা হবার অধিকার দেওয়া হয়, কেননা ঈশ্বরের দান সকলের কাছে অর্পিত হলেও তবু তা উত্তরাধিকার সূত্রে আবশ্যকীয় ভাবে প্রদত্ত নয়, তা বরং এমন পুরস্কার যা স্বাধীন ইচ্ছার ফলেই অর্জনীয়। এবং এই যে সত্য অনুসারে যে কেউ ইচ্ছা করে, সে ঈশ্বরসন্তান হতে পারে, সেই সত্য পাছে আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা টলমান করে (কেননা আমাদের জীবনের বাধা-বিঘ্ন প্রত্যাশাকে কষ্টকর করে, বাসনা নিঃশেষিত হয় ও বিশ্বাস দুর্বল হয়), সেজন্য বাণী-ঈশ্বর মাংস হলেন যাতে বাণী-হওয়া-ঈশ্বরের মাধ্যমে আমাদের মাংস বাণী-ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এবং পাছে আমরা এমনটা ভাবি যে এই মাংস-হওয়া-বাণী ছিলেন বাণী-ঈশ্বর থেকে ভিন্ন অন্য কিছু অথবা পাছে এমনটাও ভাবি যে তাঁর মাংস ছিল আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন দেহের একটা মাংস, সেজন্য তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করলেন যাতে তাঁর বসবাসের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে বসবাসকারী ঈশ্বর বলে জ্ঞাত হন, এবং আমাদের মাঝে তাঁর বসবাস গুণে তিনি যেন এমন মাংস-হওয়া-ঈশ্বর বলে জ্ঞাত হন যিনি আমাদের মাংস ছাড়া ভিন্ন মাংস হলেন না। তাছাড়া, যদিও তিনি আমাদের মাংস আপন করে নিতে প্রসন্ন হলেন তবু তিনি মাংস হয়ে নিজের ঈশ্বরত্ব বর্জন করেননি, কেননা অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ হয়ে পিতার একমাত্র জনিতজন হওয়ায় তিনি নিজের [ঐশ্বরিক] বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও আমাদের [মানবীয়] বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে সত্যকার [অর্থাৎ তিনি সিদ্ধতাবিশিষ্ট ঈশ্বর ও সত্যকার মানুষ]।

১২। আমার মন তেমন ঐশ্বরিক রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্বকে আনন্দিত মনে গ্রহণ করল, কেননা মন মাংসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, বিশ্বাসের মাধ্যমে নতুন জন্মলাভে আহুত হচ্ছিল, স্বর্গীয় নবজন্ম অর্জন করার লক্ষ্যে তার উপর স্বাধীনতা ও প্রভাব ন্যস্ত করা হচ্ছিল, আপন পিতা ও স্রষ্টার ভালবাসা বিষয়ে সচেতন ছিল, এবং এবিষয়েও নিশ্চিত ছিল যে, তিনি শূন্য থেকে যে সৃষ্টিজীবকে জীবনে আহ্বান করেছিলেন, তাকে বিনাশ করবেন না। তাছাড়া মন অনুমান করতে পারত, এই সমস্ত সত্য মানুষের মানসিক দৃষ্টির উপরে কতই না উর্ধ্বস্থিত, কেননা সাধারণ অভিমত সংক্রান্ত যুক্তি স্বর্গীয় সঙ্কল্প তলিয়ে দেখতে অক্ষম, নিজে থেকে কোন কিছুও সৃষ্টি করতে অক্ষম। ঈশ্বরের যে মহৎ কর্মকাণ্ড সনাতন পরাক্রমের মহিমা অনুসারে সাধিত, তা

ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয় বরং বিশ্বাসের অনন্ততার উপরে নির্ভর করে; সেজন্য ঈশ্বর যে আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন ও মাংস-হওয়া-বাণী যে আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, তেমন কথা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েও আমার মন তা বিশ্বাস করতে অসম্মত ছিল না, বরং এটাই মনে রাখত যে, বিশ্বাস করলে তবেই সে তা উপলব্ধি করতে পারত।

১৩। এবং পাছে মন জাগতিক যুক্তির কোন না কোন ভ্রান্তিতে বিঘ্নিত হয়, সেই লক্ষ্যে ভক্তিময় বিশ্বাস-স্বীকার ক্ষেত্রে মন সিদ্ধ বিশ্বস্ততা বিষয়ে এমন শিক্ষা পায় যা প্রেরিতদূত দ্বারা ঐশ্বরিক উক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত, ‘দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিস্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মাথা। তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রিস্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ: কেননা বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। এবং অপরাধের কারণে ও আমাদের দেহ পরিচ্ছেদিত না হওয়ার কারণে মৃত অবস্থায় এই তোমাদের ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন; সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন; মাংস[-বস্তু] থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে যত কর্তৃত্বের উপরে নিজেতেই বিজয়ী হয়ে তিনি নিজেতে ভরসা রাখায় প্রকাশ্যে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন’ (ক)। স্থিতমূল বিশ্বাস তত্ত্ববিদ্যার অসংখ্য ও অসার জিজ্ঞাসা প্রত্যাখ্যান করে; সত্য মানবীয় ভুল-ভ্রান্তির প্রতারণাময় ফন্দি-ফিকির দ্বারা নিঃশেষিত হতে ও মিথ্যার বন্দি হতে অস্বীকার করে। যে সীমা আমাদের সাধারণ যুক্তিকে বিঘ্নিত করত, সত্য ঈশ্বরকে সেই সীমায় সীমাবদ্ধ করবে না, খ্রিস্ট বিষয়ে ‘জগতের আদিম শক্তিগুলো’

অনুসারে বিচার করবে না, সেই যে খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, এবং যেহেতু সনাতন পরাক্রমের অসীমতা তাঁর মধ্যে রয়েছে, সেজন্য সনাতন অসীমতার পরাক্রম পার্থিব মনের যত প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে। আমার মন তাঁরই বিষয় ভাবছিল যিনি নিজের ঈশ্বরত্বের স্বরূপে আমাদের আকর্ষণ করতে করতে এখন থেকে বাহ্যিক বিধিপালনের বন্ধন খুলে দিলেন ও সেই প্রতীকমূলক বিধানের বৈষম্যে মাংস-ছেদন-বিশিষ্ট নয় এমন ধর্মরীতিতে আমাদের প্রবেশ করাননি বরং যাঁর সঙ্কল্প এমন যাতে আমাদের আত্মা রিপু থেকে পরিচ্ছেদিত হয়ে পাপ-বিরতির মাধ্যমে দেহের সহজাত সমস্ত কার্যক্ষমতা পরিশুদ্ধ করে যাতে করে আমরা বাস্তবিকভাবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সমাহিত হয়ে অনন্ততার জীবনে ফিরে যেতে পারি (যেহেতু জীবনে নবজন্ম হলো প্রাক্তন জীবনের মৃত্যুস্বরূপ), ও অমরতার উদ্দেশ্যে পুনরায় জন্ম নেবার জন্য আমাদের পাপকর্মের উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ ক'রে যেন মৃত্যু থেকে তাঁর সঙ্গে অমরতার উদ্দেশ্যে জাগরিত হতে পারি, সেইভাবে যেইভাবে তিনি নিজেও আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য নিজের অমরতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি পাপময় মাংস ধারণ করলেন যেন আমাদের মাংস ধারণ করায় অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন, এমন মাংস যাতে তিনি পাপ করায় এমন নয় বরং যা ধারণ করায় আমাদের অংশী হলেন। নিজের মৃত্যু দ্বারা তিনি সেই মৃত্যুদণ্ড মুছে দিলেন যেন নিজেতে আমাদের মানবজাতির নতুন সৃষ্টি দ্বারা তিনি প্রাক্তন বিধানের দেওয়া দণ্ড বাতিল করতে পারেন। তিনি এমনটা দিলেন তাঁকে ত্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে যেন জগৎ যে সমস্ত অভিশাপে দণ্ডিত রয়েছে তিনি ত্রুশের অভিশাপে সেই সমস্ত অভিশাপ বিঁধিয়ে দিয়ে বাতিল করতে পারেন। তিনি মানুষ হিসাবে চরম যন্ত্রণা ভোগ করলেন যেন সমস্ত কর্তৃত্বকে লজ্জায় ফেলে দিতে পারেন। কেননা শাস্ত্রে আগে থেকে এমনটা ঘোষণা করেছিল যে, ঈশ্বর যিনি তাঁকে মরতে হবে যাতে যারা তাঁর উপরে আস্থা রাখে তাদের বিজয় ও জয়যাত্রা এতে স্থিত হয় যে, যিনি অমর ও মৃত্যু দ্বারা পরাভূত হতে পারেন না, তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে যাতে মরণশীল যারা তারা অমরতা লাভ করতে পারে। মানব উপলব্ধির উর্ধ্বে সাধিত ঈশ্বরের এই সমস্ত মহাকীর্তি আমাদের সহজাত কর্মক্ষমতার বোধশক্তির অতীত, কেননা অসীম ও সনাতন যিনি তাঁর কর্মকাণ্ড উপলব্ধি হবার জন্য অসীম বুদ্ধিকে দাবি করে। সুতরাং,

ঈশ্বর যে মানুষ হলেন ও অমর যিনি, তিনি যে সমাহিত হলেন, এই সমস্ত সত্য যেমন মানবীয় বুদ্ধির যুক্তির বাইরে ও পরাক্রমের একক চিহ্ন স্বরূপ, তেমনি, একই প্রকারে, যিনি মানুষ তিনি যে একাধারে ঈশ্বর, যিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি যে অমর, ও যিনি সমাহিত হয়েছিলেন তিনি যে সনাতন, তেমনটাও বোধশক্তির নয় বরং পরাক্রমেরই কর্মফল। তাই আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টে ঈশ্বর দ্বারা সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে উত্থিত হই। কিন্তু, যেহেতু খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বিরাজিত, সেজন্য এখন থেকেই আমরা সেই পিতা ঈশ্বরের একটা অভিব্যক্তি পাই যিনি সেই মৃত খ্রিষ্টে তাঁর সঙ্গে আমাদের উত্থিত করেন। তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, নিজের ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় খ্রিষ্ট যিশু ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নন।

১৪। তেমন নিরাপত্তার শান্ত নিশ্চয়তায় আমার প্রাণ সানন্দে ও প্রত্যাশার সহিত বিশ্রাম নিত ও মৃত্যুর বাধা-বিপত্তিকে এতই অল্প ভয় পাচ্ছিল যে, তার মনে হচ্ছিল মৃত্যু অনন্ত জীবনে পরিণত হয়েছে। এবং তার এই বর্তমান দেহের জীবনও এতই লঘু বোঝা বা কম দুঃখময় মনে হচ্ছিল যে, সেই জীবন সেইভাবে পরিগণিত ছিল যেভাবে বালকেরা বর্ণমালা গণ্য করে, যেভাবে রোগী মানুষেরা নিজেদের ঔষধ, নৌকাডুবির নাবীকেরা নিজেদের সাঁতার কাটা, কিশোরেরা নিজেদের পেশার প্রশিক্ষণ, ভাবী সেনাপতিরা নিজেদের প্রথম যুদ্ধ-সংগ্রাম; অন্য কথায়, সেই জীবন বর্তমান প্রয়োজনীয়তায় এমন সহনীয় অধীনতা বলে গণ্য ছিল যা সুখময় অমরতার পণ বহন করে। আরও, আমার প্রাণ যাতে স্থিতমূল বিশ্বাস রাখত, সেই সমস্ত সত্য প্রচার করত; এটা প্রাণের উপরে ন্যস্ত এমন যাজকীয় দায়িত্ব স্বরূপ যা মানব-পরিব্রাণ লক্ষ করত।

১৫। তেমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে নিজেদের প্রতি আশাবিহীন ও অপরের প্রতি দয়াবিহীন এমন উগ্র ও পাষাণ মানুষদের সাধিত কতগুলো ভুলভ্রান্তি দেখা দিল যারা নিজেদের দুর্বল প্রকৃতিকে ঈশ্বরের প্রবল প্রকৃতির মাপকাঠি করল। তারা যে সীমাহীন বিষয়াদির সীমাহীন জ্ঞানে আরোহণ করেছিল বলে দাবি করছিল এমন নয়, কিন্তু এই দাবি রাখছিল যে, যে যে জ্ঞান পূর্বে অনির্দিষ্ট ছিল, তারা সেই জ্ঞান সাধারণ যুক্তির পরিসীমায় সঙ্কুচিত ক'রে ধর্মক্ষেত্রে তারা নিজেরাই ছিল সালিস। যেখানে ধর্ম হলো

বাধ্যতার সেবাকর্ম, সেখানে নিজেদের দুর্বলতা ভুলে গিয়ে সেই মানুষেরা ঐশ্বরিক বিষয়ে অবিবেচক হয়ে নিজেদেরই বিধিনিয়মের সংস্কারক করে তুলল।

১৬। অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থীদের অসার অনুসন্ধান বিষয়ে আমি কিছু বলব না; তথাপি, আমার এই বক্তব্য যখন সুযোগ দেবে তখন তাদের বিষয়ে নীরব থাকব না। বাস্তবিকই এমন মানুষ রয়েছে (ক) যারা সুসমাচারের বিশ্বাস এমনভাবে দূষিত করে যে একেশ্বরের প্রতি ভক্তির বেশে প্রকৃতপক্ষে সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম অস্বীকার করে। তারা এমনটা জাহির করে যে, [প্রভুর জন্ম] ‘নেমে আসা’ নয় বরং ছিল মানুষে সম্প্রসারণ মাত্র; আরও বলে যে, যিনি কাল অনুসারে আমাদের মাংস ধারণ করে মানবপুত্র ছিলেন, তিনি পূর্বে ছিলেন না, পূর্বে ঈশ্বরের পুত্রও ছিলেন না; তাঁর বেলায় ঈশ্বরের কোন জন্ম হয়নি কিন্তু তিনি ঈশ্বর থেকে সমান ঈশ্বর হলেন, এবং যাতে এমনটা দেখাতে পারে যে তারা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস রক্ষা করে সেজন্য এমনটা বলে যে, মাংসধারণে অবিচ্ছিন্ন এমন ধারাবাহিকতা বর্তমান যা অনুসারে পিতা সেই কুমারীতে নিজেকে প্রসারিত করলেন ও নিজেই নিজের পুত্র বলে জন্ম নিলেন। এই ভ্রান্তমতের বিপরীতে (হ্যাঁ, তারা এজন্যই ভ্রান্তমতপন্থী কারণ যিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন বাণী-ঈশ্বর, সেই খ্রিষ্ট ছাড়া পরিভ্রাণ নেই) অন্য কেউ (খ) তাঁর জন্ম অস্বীকার করে এটাই স্বীকার করে যে, তিনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাদের ধারণায়, তাঁর ‘জন্ম’ এমনটা মেনে নিত যে তিনি সত্যিই ঈশ্বর, কিন্তু ‘সৃষ্টি’ এমনটা প্রমাণিত করত যে, তাঁর ঈশ্বরত্ব মিথ্যা মাত্র; একদিকে তাদের এই ব্যাখ্যা একেশ্বরে বিশ্বাস ক্ষেত্রে চালাকি মাত্র, কিন্তু অন্যদিকে [জন্ম] রহস্য ক্ষেত্রে ধারণাটা আদৌ বহিস্কৃত নয়; কেননা তারা শব্দ ও বিশ্বাস ক্ষেত্রে তাঁর সত্যকার জন্মকে সৃষ্টি-পর্যায়ে নমিত ক’রে তাঁকে একেশ্বর-বিশ্বাস থেকে ছিন্ন করে, যাতে করে তিনি সৃষ্টজীব হিসাবে অস্তিত্ব গ্রহণ ক’রে সেই ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা আদায় করতে না পারেন যা প্রকৃত জন্মলাভে তাঁর কোন অধিকার নেই।

১৭। তেমন উন্মাদ আক্রমণে উত্তর দেবার জন্য আমার প্রাণ জ্বলছিল। প্রাণ এটা ভাবত যে, পরিভ্রাণদায়ী বিশ্বাস বলতে কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়, কিন্তু পিতা হিসাবেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বোঝায়; প্রত্যাশা বলতেও কেবল খ্রিষ্টে প্রত্যাশা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র

হিসাবেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা রাখা বোঝায় ; সৃষ্টজীব হিসাবেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত স্রষ্টা ঈশ্বরেই প্রত্যাশা বোঝায়। আমি বিশেষভাবে নবীদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারাই সেই লোকদের উন্মাদনা ও অজ্ঞতা খণ্ডন করতে অভিপ্রায় করছি যারা সেই সত্যিকারে উপযোগী ও ভক্তিময় একেশ্বর-ধারণা একটা অপব্যর্থতার পর্যায়ে নামায়, হয় এমনটা অস্বীকার ক’রে যে খ্রিষ্টে ঈশ্বর জন্ম নিয়েছেন, না হয় এটাই অগ্রাহ্য ক’রে যে তিনি সত্যকার ঈশ্বর। তাদের লক্ষ্যই, শক্তিশালী সেই সৃষ্টজীবের সৃষ্টি একাকী একটা ঈশ্বরকে বিশ্বাস-রহস্যের অভ্যন্তরে ফেলে রাখবে কেননা, তাদের মতে, ঈশ্বরের জন্ম একেশ্বরে বিশ্বাসকে এমন ধর্মের দিকে আকর্ষণ করে যে ধর্ম বহু-ঈশ্বরকে স্বীকার করে। কিন্তু আমরা যারা দু’টো ঈশ্বরকেও নয় ও একাকী একটা ঈশ্বরকেও নয় এমনটা স্বীকার করতে ঐশ্বরিক ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি, সেই আমরা পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির প্রমাণ হিসাবে সুসমাচারের ও নবীদের বাণী উপস্থাপন করব যাঁরা উভয় আমাদের বিশ্বাস অনুসারে এক কিন্তু একক নন, পরস্পর-মিশ্রিতও নন ; একজন [ঈশ্বর] যে সত্যকার ও একজন [ঈশ্বর] যে মিথ্যা তাও স্বীকার করি না, কেননা পুত্র হওয়ায় ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত সেই ঈশ্বর নিজের পিতা হতে পারেন না ও সেইসঙ্গে নিজের স্বরূপে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন হতে পারেন না।

১৮। এবং তোমরা, যাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও জগতের কাছে ও তার দার্শনিকদের কাছে অজ্ঞাত সত্যের প্রতি আগ্রহ আমার এই লেখা পড়তে উদ্দীপ্ত করবে, সেই তোমাদের পক্ষে পার্থিব মনা মানুষদের ভিত্তিহীন ও দুর্বল অভিমত এড়াতে স্মরণ করা উচিত, ও ধর্মসম্মত একাগ্রতার সঙ্গে কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধকসমূহ নামিয়ে দিতে শেখা উচিত। এক্ষেত্রে নবজনিত বোধশক্তির নবীন কর্মক্ষমতাগুলো একান্ত প্রয়োজন ; এক একজনের পক্ষে এটাই দরকার যে, সে নিজের বিবেক স্বর্গীয় দান দ্বারা আলোকিত করবে। কেননা, যেইভাবে পবিত্র যেরেমিয়া বলেন, সেই অনুসারে তাকে সর্বপ্রথমে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপে স্থান নিতে হবে, কেননা, যেহেতু সে ঈশ্বরের সেই স্বরূপ সম্পর্কে কথা শুনতে যাচ্ছে, সেজন্য সে যেন নিজের ধারণাসমূহ ততখানি প্রসারিত করতে পারে যতখানি তার সেই ধারণা এবিষয়ের যোগ্য হয় ; এক্ষেত্রে সে তো নিজের ইচ্ছামত সীমারেখা স্থির না করে বরং অস্বীমত্ব অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নেবে। আরও, ধন্য

প্রেরিতদূত পিতর নিজের দ্বিতীয় পত্রে যেমন বলেন, সেই অনুসারে তাকে যে ঐশ্বর্যরূপের সহভাগী করে তোলা হয়েছে, সে তেমন বিষয়ে সচেতন হলেও তবু সে ঈশ্বরের স্বরূপকে নিজের স্বরূপের সীমাবদ্ধতা অনুসারে পরিমাপ করবে না, বরং নিজের বিষয়ে ঈশ্বরের উক্তিসমূহ ঈশ্বরের নিজের মহিমময় আত্মপ্রকাশের মাপকাঠি অনুসারেই পরিমাপ করবে। কেননা সে-ই উত্তম ছাত্র যে পুস্তকের মধ্যে নিজের ধারণা না পড়ে পুস্তককেই নিজের ধারণা প্রকাশ করতে দেয়; সে-ই উত্তম ছাত্র যে পুস্তক থেকে পুস্তকের বক্তব্য বের করে ও নিজের বক্তব্য পুস্তকে স্থানান্তরিত করে না; আরও, সে-ই উত্তম ছাত্র, যে পুস্তক খোলার আগে পুস্তকের সঠিক অর্থ নির্ধারণ ক’রে সেই অর্থ পুস্তকে জোর করে আরোপ করে না। অতএব, যেহেতু এই বক্তব্য হবে ঈশ্বর সংক্রান্ত, সেজন্য এসো, ঈশ্বর যে নিজের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এমনটা মেনে নিই, ও তাঁর উক্তির প্রতি ভক্তিময় শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কেননা যিনি নিজের দ্বারা ছাড়া অন্য কারও দ্বারা জ্ঞাত নন, তিনিই নিজের বিষয়ে উপযোগী সাক্ষী।

১৯। ঈশ্বরের স্বরূপ ও জন্ম বিষয়ক এই ব্যাখ্যায় যদি আমরা তুলনার লক্ষ্যে উদাহরণ উপস্থাপন করি, তবে কেউই যেন এমনটা মনে না করে যে, আমাদের উপস্থাপিত উদাহরণ একেবারে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। কেননা ঈশ্বর ও পার্থীবি বিষয়াদির মধ্যে কোন তুলনা হতে পারে না, কিন্তু উর্ধ্বতর বিষয়ের অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের বোধশক্তির দুর্বলতা নিম্নতর বিষয়বস্তু থেকে কোন না কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে বাধ্য করে। দৈনন্দিন অবস্থা-পরিস্থিতি দেখায় কেমন করে সাধারণ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাই অজানা বিষয় ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য আমাদের সক্ষম করে তোলে। সুতরাং আমাদের এমনটা মেনে নিতে হবে যে যেকোন উদাহরণ ঈশ্বর সংক্রান্ত নিখুঁত ব্যাখ্যার চেয়ে বরং মানুষের জন্য সহায়ক বলে গণ্য করা উচিত, কেননা যে অর্থ আমরা অন্বেষণ করছি, সেই উদাহরণ সেই অর্থ পূরণ করে না বরং সেই অর্থ ক্ষেত্রে সহায়ক ধারণা উপস্থাপন করে। যখন কোন উদাহরণ মাৎসময় ও আত্মিক বা দৃশ্যগত ও অদৃশ্যগত বিষয় পাশাপাশি দাঁড় করায়, তখন আমরা যেন না ভাবি যে সেই উদাহরণ অধিকতর ভাবে বড়াই করছে, কেননা প্রকৃতপক্ষে সেই উদাহরণ মানব বোধশক্তির দুর্বলতাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য অর্পণ করতেই অভিপ্রায় করে ও নিখুঁত নয়

এমন অন্য সম্ভাব্য উদাহরণকে অতিরিক্ত নিন্দা থেকে মুক্ত করে। তাই আমি এই দিক-নির্দেশনা অনুসারে আমার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলব: আমি ঈশ্বরের দেওয়া শব্দগুলো উপস্থাপন করব ও সেইসঙ্গে আমার বক্তব্যকে আমাদের পার্থী পরিস্থিতি থেকে নেওয়া ধারণা দ্বারা চিত্রিত করব।

২০। প্রথমত আমি গোটা লেখার বিষয়বস্তু এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে, পুস্তকগুলো যেভাবে সাজানো, সেই অনুসারে যুক্তিসঙ্গত অনুক্রম দ্বারা পাঠকের অধিকতর সুবিধা হতে পারে। তাছাড়া আমি অপূর্ণাঙ্গ ও অবিবেচিত কিছু উপস্থাপন করতেও ইচ্ছা করছিলাম না, পাছে পুস্তকগুলোর এলোমেলোতা অশিক্ষিত লোকদের বিশৃঙ্খল চেচামেচির মত দেখায়। এবং যেমন কেউই খাড়া গিরিচূড়ায় আরোহণ করতে পারে না যদি না স্থানে স্থানে ধরার মত কোন না কোন অবলম্বন না থাকে, তেমনি আমি এখানে আমাদের আরোহণ-পথের প্রাথমিক রূপরেখা অনুক্রম অনুসারে উপস্থাপন করেছি যাতে আমাদের কঠিন উর্ধ্বগামী যাত্রা সহজতর হতে পারে; আমি যে এই পাথুরে পথে ধাপ খোদাই করেছি এমন নয়, শুধু সেই খাড়া পথ খানিকটা সমতল করতে চেষ্টা করেছি যেন পথিক বেশি কষ্ট অনুভব না করে পর্বতচূড়ায় পৌঁছতে পারে।

২১। সুতরাং, এই প্রথম পুস্তকের পরে দ্বিতীয় পুস্তক ঐশপ্রজনন-রহস্য ব্যাখ্যা করে, যাতে যে প্রার্থীরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে তারা যেন সত্যকার নাম-তিনটে বিষয়ে অজ্ঞ না থাকে, সেই নাম-তিনটের অর্থ বিষয়েও যেন বিহ্বল না হয়ে পড়ে কিন্তু ঘটনাটা ও সেটার অর্থ সম্পর্কে উপযুক্তভাবে অবগত হয়, ফলে তারা যেন এতে একেবারে নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে, ব্যবহৃত সেই তিন শব্দে তারা সত্যকার নাম তিনটে পায়, ও সেই তিনটে নামে খোদ সত্য বিরাজিত।

২২। ত্রিত্ব সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত ও সরল বক্তব্যের পরে তৃতীয় পুস্তক প্রস্তাবিত পথে অগ্রসর হয়, অগ্রগতি ধীর হলেও তবু উপযোগী। ঈশ্বরের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে পুস্তকটা বিশ্বাসের বোধশক্তির মধ্যে সেই বচন উপস্থাপন করে যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধীশক্তির অতীত ও স্বয়ং খ্রিষ্ট নিজের বিষয়ে উচ্চারণ করেন, তথা, ‘পিতা আমাতে, আর

আমি পিতাতে আছি' (ক)। এইভাবে মানুষের স্থূল বুদ্ধির অতীত সত্য হলো সেই বিশ্বাসের পুরস্কার যে বিশ্বাস যুক্তি ও জ্ঞান-বিশিষ্ট। কেননা নিজের সম্পর্কে ঈশ্বরের উক্তিকে আমরা সন্দেহ করতে পারি না, এমনটাও ধরে নিতে পারি না যে ভক্তিময় যুক্তি তাঁর প্রতাপ উপলব্ধি করতে অক্ষম।

২৩। চতুর্থ পুস্তক ভ্রান্তমতপন্থীদের তত্ত্বগুলো নিয়ে শুরু করে ও সেই ভুলভ্রান্তিতে আমাদের সম্মতি অস্বীকার করে যা দ্বারা তারা মণ্ডলীর বিশ্বাস নিন্দার বস্তু করে। পুস্তকটা সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বাস-সূত্র উপস্থাপন করে যা সম্প্রতিকালে তাদের কয়েকজন জারি করেছে, এবং তারা যা ঈশ্বরের ঐক্য বলে ডাকে, সেবিষয়ে সমর্থনে ঐশবিধান থেকে তাদের উদ্ধৃত অভিমতের অসততা এমনকি দুষ্কর্মে ব্যক্ত করে। খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব বাদ দিয়ে একেশ্বরকে ঘোষণা করার অভক্তি প্রমাণ করার জন্য, ও খ্রিস্ট একমাত্র জনিত ঈশ্বর হলে তবে ঈশ্বর যে এক নন তেমন বিকৃত বিশ্বাসের দাবিও প্রমাণ করার জন্য পুস্তকটা বিধান ও নবীদের পুরা সাক্ষ্য উপস্থাপন করে।

২৪। পঞ্চম পুস্তক ধারাবাহিকভাবে ভ্রান্তমতের দাবিতে উত্তর দেয়। কেননা তারা মিথ্যায়ই এমনটা ঘোষণা করেছিল যে, তারা যে অর্থে একেশ্বরকে মানত ঠিক সেই অর্থেই বিধান পালন করছিল; তাছাড়া এটাও ঘোষণা করেছিল যে, সেই অর্থে ভিত্তি করে তারা এমনটাও প্রমাণ করেছিল যে, সত্যকার ঈশ্বর একব্যক্তি মাত্র; তারা তেমনটা করেছিল যাতে সত্যকার একেশ্বর বিষয়ে তাদের সেই শেষ সিদ্ধান্ত হাতিয়ার করে খ্রিস্ট প্রভুকে জন্ম-বঞ্চিত করতে পারে, কেননা সেই জন্মই হলো তাঁর উৎপত্তির স্পষ্ট প্রমাণ। তারা যা অস্বীকার করে তার উত্তরে আমি ধাপের পর ধাপ তা স্বীকার করি, কেননা বিধান ও নবীদের বচনগুলো দ্বারা আমি সমর্থন করি যে দু'টো ঈশ্বর নেই ও একাকী এক সত্যকার ঈশ্বরও নেই বরং সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতাকে সমর্থন করি, তাতে আমি একেশ্বর-বিশ্বাস বিকৃত করি না, খ্রিস্টের জন্মও অস্বীকার করি না। আর যেহেতু তারা নাকি বলে যে, সঞ্জাত নয় বরং সৃষ্টই সেই প্রভু যিশু খ্রিস্ট অধিকার ভিত্তিতে নয়, বদান্যতার ফলেই ঐশনাম বহন করে, সেজন্য আমি নবীদের সাক্ষ্য থেকে তাঁর

সত্যকার ঈশ্বরত্ব এমনভাবে প্রমাণিত করেছি যে, তিনি সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকৃত হলে তবে তাঁর সহজাত ঈশ্বরত্বের স্বীকারোক্তিতে এই সত্য অন্তর্ভুক্ত যে, ঈশ্বর এক।

২৫। ষষ্ঠ পুস্তক ভ্রান্তমতের গোটা মিথ্যা-প্রতারণা ব্যক্ত করে। তাদের দাবির সমর্থন জয় করার জন্য তারা অন্য ভ্রান্তমতপন্থীদের অভক্তিময় তত্ত্ব নিন্দা করে, বিশেষভাবে বালেস্তিনুস (ক), সাবেল্লিউস, মানিখেউস (খ) ও হিয়েরাকাসের (গ) ভ্রান্তমত; এবং মণ্ডলীর ভক্তিময় ভাষাকে তাদের নিজেদের নিন্দাজনক উক্তির আবরণ বলে আপন করে নেয়। তারা উল্লিখিত ভ্রান্তমতপন্থীদের ভাষা নিন্দা করে ও বিকৃত করে, ওদের সেই ভাষাকে সংস্কার করে যাতে সেই ভাষা কোন প্রকারে [মণ্ডলীর] ভক্তিময় ভাষার মত দেখায়, যাতে করে বাইরে ভ্রান্তমত নিন্দা করতে করতে [মণ্ডলীর] ভক্তিময় তত্ত্বকে নিঃশেষিত করতে পারে। কিন্তু আমরা তেমন লোকদের এক একজনের ভাষা ও তত্ত্ব স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করি ও তেমন নিন্দিত ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গে সম্মতি ও সহভাগিতা দায়ের অভিযোগে মণ্ডলীকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করি, যাতে করে, যা নিন্দনীয় তা নিন্দা ক’রে ও যা পালনীয় তা শ্রদ্ধা সহকারে পালন ক’রে আমরা তাদের তীব্র অস্বীকারের বস্তু তথা সেই যিশু খ্রিষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র তা পিতার সাক্ষ্যদান দ্বারা, খ্রিষ্টের নিজের দাবি দ্বারা, প্রেরিতদূতদের প্রচার দ্বারা, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দ্বারা, অপদূতদের চিৎকার দ্বারা, ইহুদীদের সেই প্রতিবাদ দ্বারা যা প্রকৃতপক্ষে একটা স্বীকারোক্তি, ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ বিজাতীয়দের স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত করি। তেমনটা করি যেন অজ্ঞাত থাকবার জন্য যা রাখা হয়নি, তা যেন সন্দেহের বিষয় হতে দেওয়া না হয়।

২৬। তারপর, সপ্তম পুস্তক ইতিমধ্যে গৃহীত সিদ্ধ বিশ্বাসের এই ধাপ থেকে শুরু ক’রে এই মহৎ বক্তব্যের শেষ কথা উপস্থাপন করে। প্রথম, অপরাজেয় বিশ্বাসের মজবুত ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ হাতিয়ার করে বক্তব্যটা সাবেল্লিউস ও হেবিওন (ক) ও সত্যকার ঈশ্বরের এই বিরোধীদের মধ্যকার সংগ্রামে যোগ দেয়। খ্রিষ্টের যে পূর্বাস্তিত্বকে সাবেল্লিউস অস্বীকার করত এক্ষেত্রে পুস্তক সাবেল্লিউসের বিপক্ষে, ও খ্রিষ্ট যে সৃষ্টজীব মাত্র তেমন দাবি সমর্থন ক’রে যারা তাকে আক্রমণ করত, এক্ষেত্রে বক্তব্যটা সাবেল্লিউসের সঙ্গে যোগ দেয়। বস্তুতপক্ষে সাবেল্লিউস পুত্রের অনন্ততা উপেক্ষা করত কিন্তু সত্যকার ঈশ্বর

যে মানবদেহে কার্যকর ছিলেন তা বিশ্বাস করত। আমাদের বর্তমান বিরোধীরা এমনটা অস্বীকার ক’রে যে তিনি জন্মলাভ করলেন এই দাবি রাখে যে তিনি সৃষ্ট হয়েছিলেন, তাতে তারা তাঁর সাধিত কর্মকাণ্ডে সত্যকার ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড দেখতে ব্যর্থ হয়। উভয় পক্ষ যা বিষয়ে তর্ক করে আমরা তা বিশ্বাস করি। সাবেল্লিউস এমনটা অস্বীকার করে যে পুত্রই কার্যরত ছিলেন, এতে সে ভুল করে, কিন্তু সে যখন এই দাবি রাখে যে সাধিত সেই কর্মকাণ্ড ছিল সত্যকার ঈশ্বরেরই কাজ, তাতে সে জয়ী হয়। খ্রিষ্ট যে সত্যকার ঈশ্বর যারা তা অস্বীকার করে, মণ্ডলী তাদের উপরে সাবেল্লিউসের বিজয়ের অংশী হয়; কিন্তু যখন সাবেল্লিউস এমনটা অস্বীকার করে যে খ্রিষ্ট যুগগুলোর পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন ও তার বিপক্ষেরা দৃঢ়ভাবে এমনটা প্রমাণ করে যে খ্রিষ্টের সাধিত কর্মকাণ্ড অনন্তকাল থেকেই বিদ্যমান, তখন সেই সাবেল্লিউসের এই অভিমত খণ্ডনে আমরা তার বিপক্ষদের সঙ্গে একমত হই, সেই যে সাবেল্লিউস উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে সত্যকার ঈশ্বরকে স্বীকার করে কিন্তু পুত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। এবং উপরোক্ত আমাদের সেই দুই বিপক্ষ একজোট হয়ে হেবিওনের অভিমত খণ্ডন করে: বস্তুত দ্বিতীয় পক্ষ খ্রিষ্টের অনন্তকালীন অস্তিত্ব প্রমাণ করে, ও প্রথম পক্ষ এমনটা সমর্থন করে যে তাঁর কর্মকাণ্ড সত্যকার ঈশ্বরেরই কাজ। এইভাবে ভ্রান্তমতপন্থীরা একে অপরের উপর জয়ী হতে হতে নিজেরা সবাই পরাজিত হয়, আর এদিকে মণ্ডলী সাবেল্লিউসের বিপক্ষে যেমন, যারা খ্রিষ্টকে সৃষ্টজীব বলে ডাকে তেমনি তাদেরও বিপক্ষে ও হেবিওনের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট হলেন সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর যিনি যুগগুলোর পূর্বে সঞ্জাত ও পরবর্তীকালে মানুষ হিসাবে জনিত।

২৭। বিধান ও নবীদের মধ্য দিয়ে এমনটা প্রথমে প্রমাণ করার পর যে খ্রিষ্টই ঈশ্বরের পুত্র ও, দ্বিতীয়ত, তিনিই যে সত্যকার ঈশ্বর, এমনকি সেই রহস্যময় মিলন ছিল না করেই তেমনটা প্রমাণ করার পর, যখন আমরা সুসমাচারের প্রমাণ দ্বারা বিধান ও নবীদের সমর্থন করতে অগ্রসর হই ও তাঁদের মধ্য দিয়ে এটাও প্রমাণ করি যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ও নিজেই ঈশ্বর, তখন এমন কেউই থাকতে পারে না যে এবিষয়ে সন্দেহ করতে পারে যে, আমরা প্রকৃত ভক্তি ও মজবুত ধর্মতত্ত্বের পথ ধরে চলেছি। তিনি যে ‘পুত্র’ নাম বহন করার অধিকার রাখেন তেমনটা প্রমাণ করার পর, সেই নাম যে সত্যিই

পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যক্ত করে, তা প্রকাশ করা খুবই সহজ কাজ, যদিও একথা স্বীকার্য যে, সাধারণত ‘পুত্র’ নামটা পুত্রত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণের ভিত্তিতেই মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু, যারা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের সত্যকার জন্ম অপব্যখ্যা করে, তাদের চালাকি ও প্রতারণায় কোন অবকাশ না দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা তাঁর সত্যকার পুত্রত্বের প্রমাণ হিসাবে তাঁর সত্যকার ঈশ্বরত্ব ব্যবহার করেছি; এবং সকলের স্বীকৃতি অনুসারে আমরাও তেমনটা দেখাবার জন্য যে যিনি ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নাম বহন করেন তিনি সত্যিকারে ঈশ্বর, সেই লক্ষ্যে আমরা তাঁর নাম, তাঁর জন্ম, তাঁর স্বরূপ, তাঁর পরাক্রম ও তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করেছি। তাতে আমরা প্রমাণ করেছি যে তাঁর নাম সত্যিই তাঁর ব্যক্তিত্বের সঠিক সংজ্ঞা, তাঁর ‘পুত্র’ নাম হলো তাঁর জন্মের প্রমাণ, তাঁর জন্মলাভে তিনি নিজের ঐশ্বর্যরূপ বজায় রাখলেন ও সেই স্বরূপের সঙ্গে নিজের অধিকার বজায় রাখলেন, এবং সেই অধিকার তাঁর চেতনাপূর্ণ ও ইচ্ছাকৃত আত্মস্বীকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করল। আমি এক একটা বিষয়ের জন্য সুসমাচার ভিত্তিক এমন প্রমাণ উপস্থাপন করলাম যেগুলো দেখায় কেমন করে তাঁর আত্মস্বীকৃতি তাঁর প্রতাপ ব্যক্ত করে, কেমন করে তাঁর প্রতাপ তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে, কেমন করে তাঁর স্বরূপ জন্মসূত্রেই তাঁর অধিকার ও তাঁর জন্ম থেকে তিনি সেই ‘পুত্র’ নাম বহনে অধিকার রাখেন। এইভাবে ঈশ্বরনিন্দা সম্পর্কে কোন অপবাদ স্তব্ব করে দেওয়া হল, কেননা স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজের মুখের স্বীকারোক্তিতে আমাদের শিখিয়েছেন যে, তাঁর নাম, তাঁর জন্ম, তাঁর স্বরূপ ও তাঁর প্রতাপ যেমনটা দেখায়, তেমনি ঈশ্বরত্বের সত্যকার অর্থে তিনি সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর।

২৮। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম পুস্তক আমাদের বিশ্বাসের এই দাবি সপ্রমাণ করে এসেছে যে খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র ও সত্যকার ঈশ্বর। এদিকে অষ্টম পুস্তক একমাত্র ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রমাণ নিয়ে শুরু করে এমনটা দেখায় যে তেমন তত্ত্ব ঈশ্বরের পুত্রের জন্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও এমনটাও ঘোষণা করে যে, তেমন জন্ম ঈশ্বরত্বে দু’জন ঈশ্বরের কথা অনুপ্রবেশ করায় না। পুস্তকটা প্রথমে সেই কুতর্ক ব্যক্ত করে যা দ্বারা এই ভ্রান্তমতপন্থীরা যা অস্বীকার করতে পারত না তা কমপক্ষে এড়াতে চেষ্টা করেছিল তথা, পিতা ও পুত্র ঈশ্বরের সত্যকার অস্তিত্ব স্বীকার; পুস্তকটা তাদের অকেজো ও হাস্যকর অবকাশ নিশ্চিহ্ন

করে যা তারা কতিপয় শাস্ত্র-বচনের জন্য ব্যবহার করত, যেমন, বিশ্বাসী সবাই ছিল একমন একপ্রাণ (ক), আরও, যে পৌঁতে ও যে জল দেয়, তারা এক (খ) এবং আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে (গ); এখানে ঈশ্বরত্বের ঐক্য নয়, ইচ্ছা ও মনেরই ঐক্য ব্যক্ত হয়। তেমন বচনগুলোর প্রকৃত অর্থ থেকে আমরা দেখাই যে সেই বচনগুলো ঐশ্বরিক জন্মের বাস্তবতার সঙ্গেই জড়িত, এবং তারপর আমাদের প্রভুর সমস্ত স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করে আমরা প্রেরিতদূতদের ভাষায় ও পবিত্র আত্মার নিজের উক্তিগুলোতে পিতা হিসাবে ও একমাত্র জনিত পুত্র হিসাবে ঈশ্বরের মহিমার গোটা ও নিখুঁত রহস্য প্রকাশ করি। কেননা যেহেতু একজন পিতা আছেন, সেজন্য আমরা জানি যে, একজন পুত্রও আছেন; সেই পুত্রে পিতা আমাদের কাছে প্রকাশিত, তাই একমাত্র জনিতজন হিসাবে তাঁর জন্ম ও তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর, এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

২৯। বিশ্বাস যে প্রমাণ এনে দেয় ও তা যথেষ্ট বলে মনে করে, পরিত্রাণ সংক্রান্ত আবশ্যকীয় বিষয়াদি ক্ষেত্রে তেমন প্রমাণ উপস্থাপন করা যথেষ্ট নয়। আমরা বিপক্ষের প্রমাণের শূন্যতা সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করায় যদি আমাদের বিশ্বাসকে তাদের প্রমাণিত অযৌক্তিকতা খণ্ডনের উপর প্রতিষ্ঠিত না করি, তবে আমাদের দাবিসমূহ পরীক্ষাসিদ্ধ না হলে সেই দাবিগুলো আমাদের নিজেদের কথার অর্থ ভুলধারণায় পরিণত হয়ে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্টও হতে বাধ্য করতে পারে। সেজন্য নবম পুস্তকের উদ্দেশ্যই সেই সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করা যা দ্বারা ভ্রান্তমতপন্থীরা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম অসিদ্ধ বলে দেখাতে চেষ্টা করে; সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা জগৎপত্তনের সময় থেকে আবৃত ঐশপ্রকাশের রহস্য জানে না ও এমনটাও ভুলে যায় যে, সুসমাচারের বিশ্বাস [খ্রিষ্ট সম্পর্কে] ঈশ্বর ও মানুষ উভয় কথাই ঘোষণা করে। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর, তিনি যে পিতার সঙ্গে যেমন, পুত্র তেমনি ঈশ্বরের সদৃশ ও ঈশ্বরের সমকক্ষ, তিনি যে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ও তেমন জন্মাধিকার সূত্রে সত্যকার আত্মা বলে স্বয়ং বিদ্যমান, এসমস্ত তত্ত্ব অস্বীকার করার জন্য তারা সাধারণত আমাদের প্রভুর এমন উক্তি উত্থাপন করে যেমন, আপনারা

আমাকে মঙ্গলময় বলছেন কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর (ক); এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি এ, যে লোকটা তাঁকে ‘মঙ্গলময়’ বলছিল, তাকে ভৎসনা করায় ও কেবল ঈশ্বরকেই মঙ্গলময়তা আরোপ করায় তিনি সেই ঈশ্বরেরই মঙ্গলময়তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত বলে দেখান যিনি একাই মঙ্গলময় ও সেই সত্যকার ঈশ্বরত্ব থেকেও নিজেকে বিযুক্ত বলে দেখান যে ঈশ্বরত্ব কেবল ঈশ্বরেরই অধিকার। এই বচনের সঙ্গে তাদের ঈশ্বরনিন্দাজনক যুক্তি অন্য একটা বচন যোগ করে তথা, ‘এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং ঘাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে’ (খ)। তাদের মতে তিনি এখানে এমনটা স্বীকার করেন যে, পিতাই অনন্য সত্যকার ঈশ্বর, ও তিনি নিজে সত্যকার ঈশ্বর নন, ঈশ্বরও নন, কেননা [তাদের মতে] ‘অনন্য সত্যকার ঈশ্বর’ স্বীকারোক্তি তাঁকেই মাত্র লক্ষ করে যিনি তেমন উক্তির উপর অধিকার রাখেন। এবং তারা দেখায় যে, খ্রিস্টের এই বচন ক্ষেত্রে তাদের ধারণা খুবই স্পষ্ট; বাস্তবিকই তিনি বলেছিলেন, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন (গ)। তিনি যে পিতার কর্ম কেবল অনুকরণই করতে পারেন, তা তাদের মতে হলো খ্রিস্টের স্বরূপের দুর্বলতার প্রমাণ। সর্বশক্তিমত্তা ও এমন একজনের কর্ম যা অন্যজনের পূর্বকর্মের উপর নির্ভর করে, এ দুইয়ের মধ্যে তুলনা করা চলে না; এমনকি খোদ যুক্তিও সক্ষম হওয়া ও অক্ষম হওয়ার মধ্যকার বৈষম্য সমর্থন করে। ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে তিনি নিজে পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে বলেন, পিতা আমার চেয়ে মহান (ঘ)। তেমন সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি যত দ্বিধা স্তব্ধ করে দেয়, কেননা, তারা বলে, যিনি তেমন দাবি ত্যাগ করেন, তাঁর উপরে ঈশ্বরের মর্যাদা ও স্বরূপ আরোপ করা ঈশ্বরনিন্দা ও উন্মাদনার নামান্তর। তিনি সত্যকার ঈশ্বরের গুণাবলি থেকে এতই বঞ্চিত যে তিনি নিজে নিজের বিষয়ে এই বলে সাক্ষ্যদান করেন, কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন (ঙ)। যে ছেলে পিতার গোপন কথা জানে না, তেমন অজ্ঞতার জোরে সে অবশ্যই সেই পিতা সম্পর্কে আপনজন নয় যিনি সেই গোপন কথা জানেন; জ্ঞান ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ স্বরূপ এমন পরাক্রম ও প্রতাপের অংশী হতে পারে না যা একাই অজ্ঞতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত।

৩০। তাই আমরা সেই অধিক অভক্তিময় ভুলভ্রান্তি ব্যক্ত করছি যা তারা খ্রিষ্টের উক্তির অর্থ বিকৃত ও দূষিত করায় সমর্থন করে। খ্রিষ্টের উপরোল্লিখিত উক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা আগে স্থির করি তিনি কোন্ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, কোন্ সময় কথা বলছিলেন, কোন্ সীমিত জ্ঞান প্রদান করতে ইচ্ছা করছিলেন; তাতে আমরা এমনটা করি যাতে অবস্থা-পরিস্থিতিই বচনগুলো ব্যাখ্যা করে, অর্থাৎ আমরা সেই বচনগুলো জোর করে অবস্থা-পরিস্থিতির সঙ্গে মেলাই না। এইভাবে যখন ভিন্নতা উপস্থিত, উদাহরণ স্বরূপ যেমন ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’ (ক) ও ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ (খ) বাক্য দু’টোর মধ্যে, অথবা ‘একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর’ (গ) ও ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’ (ঘ) বাক্য দু’টোর মধ্যে; অথবা যখন উদার এমন কোন বৈসাদৃশ্য উপস্থিত যেমন ‘যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার’ (ঙ) ও ‘তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে জানবে’ (চ) বাক্য দু’টোর মধ্যে, অথবা ‘আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’ (ছ) ও ‘কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন’ (জ) বাক্য দু’টোর মধ্যে, তখন বুঝতে হয় যে তাঁর স্বরূপ ও প্রতাপ সংক্রান্ত ক্রমগত প্রকাশ ও সেটার পূর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্য রয়েছে। দু’টোই একই বক্তার উক্তি, এবং প্রতিটি বচনগুচ্ছের প্রকৃত শক্তি ব্যাখ্যা করলে তবে দেখা যাবে যে খ্রিষ্টের সত্যকার ঈশ্বরত্ব আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কেননা সুসমাচার ভিত্তিক বিশ্বাসের রহস্যের পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে খ্রিষ্টের জন্ম ও তাঁর নাম ক্রমগতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ও এমন অবস্থা-পরিস্থিতির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল যা তিনি নিজে সময়মত ও অবস্থাক্রমে স্থির করেছিলেন।

৩১। দশম পুস্তকের যে লক্ষ্য, তা বিশ্বাসের একই লক্ষ্য। কেননা যেহেতু ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে যে মূর্খতা সুবুদ্ধি বলে বিবেচিত, তারা সেই মূর্খতায় যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত অবস্থা-পরিস্থিতি ও উক্তিগুলো আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঐশ্বর্যরূপ ও পরাক্রমের এমন অপমানজনক অসঙ্গতিতে পৌঁছেছে, সেজন্য আমি এমনটা প্রমাণ করতে বাধ্য যে, তাদের ব্যাখ্যা অভক্তিময়ই অপব্যখ্যা, ও যন্ত্রণাভোগে যা যা ঘটেছিল সেই সমস্ত কিছু স্বয়ং প্রভু দ্বারা তাঁর নিজের প্রকৃত ও নিখুঁত মহিমার প্রমাণ হিসাবে

লিপিবদ্ধ হয়েছিল। নিজেদের অভক্তিময় বর্ণনা করতে করতে তারা নানা উক্তি প্রয়োগে নিজেদের প্রতারণা করে, যেমন ‘আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন’ (ক)। তাদের মতে তিনি তখন অবশ্যই ঈশ্বরের সুখময় ও অক্ষয়শীল জীবন থেকে বেশ দূরে ছিলেন যখন তাঁর প্রাণের উপরে আসন্ন দুর্বিপাকের ভয়ানক আতঙ্ক প্রভুত্ব করছিল ও তিনি কষ্টের চাপে অভিভূত হয়ে ‘পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক’ (খ) এই প্রার্থনা উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ও এতে নিঃসন্দেহে দেখাচ্ছিলেন যে, যা থেকে নিস্তার পাবার জন্য প্রার্থনা করছিলেন সেই সমস্ত পরীক্ষা তিনি সত্যিই ভয় করছিলেন; আরও, তাদের মতে তাঁর গোটা স্বরূপ অন্তর্বেদনায় এতই আচ্ছন্ন ছিল যে, দ্রুশ-ক্ষণে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন? (গ)। ব্যথার চাপে বাধ্য হয়ে তিনি এমন অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, তিনি পরিত্যক্ত; হ্যাঁ, পিতার সহায়তা বঞ্চিত হয়ে তিনি এই বলে আত্মা বিসর্জন দিলেন, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই (ঘ)। তারা নাকি বলে, প্রাণত্যাগের সময়ে যে আতঙ্ক তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল, সেই আতঙ্কই তাঁকে নিজের আত্মাকে পিতা ঈশ্বরের রক্ষায় তুলে দিতে বাধ্য করেছিল, কারণ তাঁর অবস্থার নিরাশাই তাঁকে অন্য একজনের রক্ষায় নিজের আত্মাকে তুলে দিতে বাধ্য করেছিল।

৩২। একেবারে নির্বোধ ও ভক্তিহীন মানুষ হওয়ায় তারা এমনটা বোঝে না যে খ্রিস্টের বাণীগুলো তেমন পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হয়েছিল বিধায় সবসময়ই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল; না, তারা অন্ধরে অন্ধরে সেই বাণী আঁকড়িয়ে ধরে তাঁর সেই বাণীর লক্ষ্য উপেক্ষা করে। বাস্তবিকই, ‘আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন’ (ক) ও ‘এখন থেকে আপনারা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘে করে আসতে দেখবেন’ (খ) বাক্য দু’টোর মধ্যে অধিক প্রশস্ত পার্থক্য রয়েছে; তেমনিভাবে, ‘পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক’ (গ) ও ‘এই যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?’ (ঘ) বাক্য দু’টোর মধ্যেও যথেষ্ট প্রশস্ত পার্থক্য রয়েছে; এবং আরও বেশি প্রশস্ত পার্থক্য রয়েছে ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন?’ (ঙ) ও ‘আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে’ (চ) বাক্য দু’টোর মধ্যে ও ‘পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই’ (ছ) ও ‘পিতা, এদের

ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না' (জ) বাক্য দু'টোর মধ্যে। কিন্তু তারা নিজেদের মন সঙ্কীর্ণ করায় ঐশউক্তিগুলোর অর্থ ধরতে অক্ষম হয়ে নিজেদের অপব্যাক্যার প্রচেষ্টায় অভক্তিতে পতিত হয়। মনের উদ্বিগ্ন ও মনের শান্তির মধ্যে, ত্বরা ও বিলম্বের জন্য প্রার্থনার মধ্যে, কষ্টভোগ ও উৎসাহদানের মধ্যে, নিজের বিষয়ে নিরাশা ও পরের জন্য ভরসাপূর্ণ মিনতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে; এবং ভ্রান্তমতপন্থীরা এতেই নিজেদের অভক্তি দেখায় যে, তারা সেই ঐশউক্তিসমূহ ও খ্রিস্টের সেই ঐশ্বর্যরূপের কথা ভুলে যায় যা উপরোক্ত বাক্যগুলোর এক শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অপরদিকে তারা নিজেদের মনোযোগ স্থিরীকৃত করে সেই কর্মকাণ্ড ও বাণীগুলোতে যা কেবল খ্রিস্টের সেই সেবাকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত যা তিনি পৃথিবীতে সম্পাদন করেছিলেন। সেজন্য আমি প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রাণ ও দেহের রহস্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে সেগুলোর একটাও বাদ পড়ে না থাকে। তারপর, এই ব্যাপারে যুক্তির শান্তশিষ্ট আলো ছড়িয়ে আমি খ্রিস্টের প্রতিটা উক্তি সেই শ্রেণিতে যুক্ত করেছি যা সেই উক্তির অর্থের সঙ্গে মেলে; এইভাবে এমনটা দেখিয়েছি যে, তিনি এমন অটলমান ভরসা, পিছিয়ে যাওয়ার নয় ইচ্ছা ও অপরাজেয় আত্মনির্ভরশীলতার অধিকারী ছিলেন যে, যখন তিনি নিজেকে পিতার হাতে তুলে দিলেন, তখন এতে পরের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাই জড়িত ছিল। তাই সুসমাচারের রহস্যময় শিক্ষা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনা খ্রিস্টের সমস্ত উক্তি ব্যাখ্যা করে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে।

৩৩। সুতরাং, যেহেতু পুনরুত্থানের গৌরবও এই হারানো লোকদের চোখ উন্মুক্ত করেনি ও বিশ্বাসের প্রকাশ্য সীমার মধ্যেও রাখেনি, সেজন্য তারা নিজেদের ভান করা শ্রদ্ধার তলে নিজেদের অভক্তির জন্য একটা অস্ত্র তৈরি করল, এমনকি তারা রহস্যের প্রকাশনাকে ঈশ্বরের প্রতি অপমানে বিকৃত করল। কেননা 'আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর' উক্তি থেকে তারা এমনটা অনুমান করে যে, যেহেতু পিতা যেমন আমাদের তেমনি তাঁর নিজেরও পিতা ও ঈশ্বরও আমাদের ও তাঁরও ঈশ্বর, সেজন্য যখন তিনি স্বীকার করেন যে পিতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক রয়েছে তিনি আমাদের সঙ্গে সেই সম্পর্কের সহভাগিতা করেন, তখন [তারা নাকি বলে যে] তিনি দত্তকপুত্র পাওয়া সত্ত্বেও তার

সেই স্বীকৃতি তাঁকে ঈশ্বরত্ব থেকে বঞ্চিত করে ও তাঁকে সেই স্রষ্টা ঈশ্বরের অধীনস্থ করে তিনি নিজে আমাদের মত যাঁর সৃষ্টজীব ও নিম্নতর অবস্থার অধিকারী। এমনকি, আমাদের এমনটাও অনুমান করতে নেই যে তিনি ঐশ্বররূপের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটারও অধিকারী ছিলেন, কেননা প্রেরিতদূত বলেন, কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে (ক)। কেননা তাদের মতে বশ্যতা অধীনস্থজনের ক্ষমতার অভাব ও প্রভুত্বকারীর ক্ষমতার অধিকার ব্যক্ত করে। একাদশ পুস্তক এবিষয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করে প্রেরিতদূতের উপরোক্ত বাণী থেকে এমন প্রমাণ অর্পণ করে যে, বশ্যতা যে হলো খ্রিষ্টে ক্ষমতার অভাবের প্রমাণ এমন নয়, তা বরং হলো পুত্র ঈশ্বর হিসাবে তাঁর প্রকৃত ঈশ্বরত্বেরই চিহ্ন; আরও, তাঁর পিতা ও ঈশ্বর যে আমাদেরও পিতা ও ঈশ্বর, তা আমাদের পক্ষে সীমাহীন সুবিধা ও তাঁর পক্ষে হানির কারণ নয়, কেননা যিনি মানবীয় অবস্থায় জন্ম নিলেন ও আমাদের মাংসের সমস্ত কষ্ট ভোগ করলেন, তিনি মানুষ হিসাবে আমাদের প্রতিনিধি রূপে ঈশ্বরে গৌরবান্বিত হবার জন্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতার কাছে আরোহণ করলেন।

৩৪। শিক্ষাদানের যেকোন শ্রেণিতে যে পদ্ধতি অনুধাবন করা হয়, আমরা এই লেখায় সেই পদ্ধতি পালন করেছি। প্রথমত সহজ শিক্ষা আসে ও সেইসঙ্গে বিষয়বস্তুর মৌলিক উপবিষয়গুলোর সঙ্গে এমন পরিচিতি উপস্থাপিত যা চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে লব্ধ। পরে ছাত্র নিজের জীবনযাত্রায় গৃহীত প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রমাণ দেয়। সেইভাবে সৈন্যও যখন নিজের নানা অনুশীলনে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত তখনই যুদ্ধ-সংগ্রামে নামে; উকিলও তখনই আদালতের লড়াইতে যোগ দিতে সাহস করে যখন অলঙ্কারশাস্ত্রে শেখানো আবেদন উপস্থাপন ও জবাব দেওয়া ক্ষেত্রে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত; নাবীকও স্বদেশের নিরাপদ নৌবন্দরে অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেই দূরদূরান্তের মহাসাগরের ঝড়ের মধ্যে যাবার জন্য উপযুক্ত বলে স্বীকৃতি পায়। এই যে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ে গোটা বিশ্বাসই শেখানো হয়, এই ক্ষেত্রেও আমরা তেমন পদ্ধতি পালন করে এসেছি। আগে অশিক্ষিত বিশ্বাসীর জন্য

খ্রিস্টের জন্ম, নাম ও ঈশ্বরত্ব বিষয়ে সহজ শিক্ষা উপস্থাপন করা হল, কেননা সেই পর্যায় থেকে আমরা ধীরস্থির ভাবে অগ্রসর হয়েছি যে পর্যন্ত আমাদের পাঠকগণ ভ্রান্তমতপন্থীদের প্রতিটি সূত্র বিনাশ করতে পারে; এবং এখন, অবশেষে, আমরা এই বর্তমান ও গৌরবময় লড়াইতে তাদের দাঁড় করিয়েছি। মানুষদের মন প্রশিক্ষিত নয় এমন যুক্তি দ্বারা অনন্তকালীন জন্ম সংক্রান্ত ধারণা ধারণ করার জন্য শক্তিহীন, কিন্তু ঐশবিষয় অধ্যয়ন দ্বারা তারা সেই রহস্যগুলো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যা সাধারণ চিন্তা-ধারণার সীমার অতীতে রয়েছে। তারা প্রভু যিশু সংক্রান্ত সেই আপাতবিরোধী সত্য বিলীন করতে পারে যা নিজের প্রভাব ও ভান করা শক্তিকে নির্বোধ জাগতিক জ্ঞান থেকে পায়, অর্থাৎ সেই আপাতবিরোধী সত্য যা এমনটা বলে যে, ‘এমন সময় ছিল যখন তিনি ছিলেন না’, বা ‘জন্মাবার আগে তিনি ছিলেন না’, বা ‘তিনি শূন্য থেকে হলেন’; এটা কেমন যেন তাঁর জন্ম এমন প্রমাণ যে তিনি পূর্বে অস্তিত্ববিহীন ছিলেন ও নির্দিষ্ট এক ক্ষণে অস্তিত্বশীল হলেন, এর ফলে কেমন যেন সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে কালের গণ্ডিতে বশীভূত করা যেতে পারত, কেমন যেন খোদ বিশ্বাস ও সেই জন্মের ধারণা প্রমাণ করত যে এমন সময় ছিল যখন তিনি ছিলেন না। সেই অনুসারে তারা, যেহেতু জন্ম এমন কিছু যা অস্তিত্বহীন কিছুকে প্রদান করা হয়, সেজন্য এই ভিত্তিতে তারা এমনটা সমর্থন করে যে তিনি শূন্য থেকে জন্ম নিলেন। তাদের উত্তর দিয়ে আমরা প্রেরিতদূতদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের দেওয়া প্রমাণের জোরে এটাই ঘোষণা ক’রে যে, পিতা অনন্তকালীন ও পুত্র অনন্তকালীন, তাতে দেখাই যে যিনি সবকিছুর ঈশ্বর, তাঁর অস্তিত্ব কোন কোন বস্তুর পরবর্তী নয় বরং সবকিছুর পূর্ববর্তী; এবং আমরা এটাও বলি যে, তাদের ভক্তিহীন যুক্তির দুঃসাহসী আক্রমণ তথা ‘তিনি শূন্য থেকে জন্ম নিলেন’ ও ‘জন্মাবার আগে তিনি ছিলেন না’, এসমস্ত কথা তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিহীন; আরও, আমরা ঘোষণা করি, তিনি যেমন সর্বদাই বিদ্যমান ছিলেন যদিও আমরা সমর্থন করি যে তিনি জন্ম নিলেন, তেমনি তিনি জন্ম নিলেন যদিও আমরা প্রচার করি যে তিনি সর্বদাই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর বেলায় জন্ম-অব্যাহতি নেই কিন্তু সেই জন্ম অনন্ততা-বিশিষ্ট জন্ম, কেননা যদিও জন্মক্ষেত্রে পিতা দরকার, তবু ঈশ্বরত্ব অনন্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

৩৫। নবীদের উক্তির বিষয়ে অজ্ঞ ও স্বর্গীয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে অদক্ষ হওয়ায় ভ্রান্তমতপন্থীরা ‘আপন কর্মকাণ্ডে আপন পথসমূহের সূচনায় প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন’ (ক) বচনকে বিকৃত অর্থে ব্যাখ্যা ক’রে এমনটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, ঈশ্বর হিসাবে খ্রিস্ট জন্ম নেননি বরং সৃষ্টিই হয়েছিলেন, ও এর ফলে তিনি সৃষ্টবস্তুগুলোর স্বরূপের অংশী, যদিও নিজের সৃষ্টি-ধরণ ক্ষেত্রে তিনি সেই সবকিছুর উর্ধ্বে; উপরন্তু তারা বলে, তিনি ঐশজন্মের গৌরবের অধিকারী নন, কেবল শক্তিশালী সৃষ্টজীবেরই গুণাবলির অধিকারী। উত্তরে আমরা নবীন কোন ধারণা বা পূর্বকল্পিত অভিমত অবলম্বন না করে প্রজ্ঞার নিজের সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়েই বচনের প্রকৃত অর্থ ও যুক্তি দেখাব। আমরা এমনটা দেখাব যে, তিনি যে ঈশ্বরের পথসমূহের সূচনায় ও তাঁর কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছিলেন, তা ঐশ্বরিক ও অনন্ত জন্ম সংক্রান্ত প্রমাণে বিকৃত করা চলে না, কেননা এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি ও অনন্তকাল থেকে জন্ম এমন বিষয়দ্বয় যা একেবারে ভিন্ন। যেখানে জন্মের কথা পরিলক্ষিত, সেখানে জন্মের কথা বাদে অন্য বিষয় পরিলক্ষিত নয়; যেখানে সৃষ্টি শব্দটা উল্লিখিত, সেখানে, আগে, সেই সৃষ্টির কারণ উল্লিখিত; এবং যদিও প্রজ্ঞা সমস্ত কিছুর পূর্বে সজ্ঞাত, তবু প্রজ্ঞা বিশেষ কোন না কোন কারণেও সৃষ্টি হয়েছিল; ফলে এমনটা দাঁড়ায় যে, যা সবকিছুর আগে বিদ্যমান ও যা কোন না কোন কিছুর পরে অস্তিত্ব পেতে লাগল, তা একই জিনিস নয়।

৩৬। এই পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে, একমাত্র জনিত ঈশ্বরে আমাদের স্বীকারোক্তি থেকে ‘সৃষ্টি’ শব্দটা প্রত্যাখ্যান করা দরকার, আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যুক্তি ও ভক্তির শিক্ষা উপস্থাপন করার জন্য এগিয়ে যেতে পারি যাতে করে যে পাঠকের ধারণা পূর্ববর্তী পুস্তকগুলো ধৈর্যশীল ও আগ্রহী অধ্যয়ন দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই পাঠক যেন পুরা বিশ্বাস-উপস্থাপনায় উপকৃত হতে পারে। এই উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন এই প্রসঙ্গে ভ্রান্তমতের নিন্দাজনক শিক্ষাও সরিয়ে দেওয়া হলে নবজন্মদানকারী ত্রিত্ব সংক্রান্ত অক্ষুণ্ণ ও অকলুষিত রহস্য প্রেরিতদূতদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের অধিকারসূত্রে পরিব্রাণদায়ী সংজ্ঞায় স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। সেই পরিস্থিতিতে মানুষ এমনিই মানবীয় যুক্তির জোরে ঈশ্বরের সেই আত্মাকে সৃষ্টজীবদের মধ্যে

তালিকাভুক্ত করতে আর দুঃসাহস দেখাবে না, সেই যে আত্মাকে আমরা অমরতার পণ হিসাবে ও ঈশ্বরের অক্ষয়শীল স্বরূপের সাহচর্যের উৎস হিসাবে গ্রহণ করি।

৩৭। আমি তো সচেতন আছি যে তুমিই, হে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর, হবে আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, যাতে আমার সমস্ত বাণী ও মনোভাব তোমারই কথা বলে। কেননা কথা বলার যে দান তুমি আমাকে মঞ্জুর করেছ, তেমন দানের একমাত্র মহা পুরস্কারই আমি যেন তোমার কথা প্রচার করায়ই তোমার সেবা করি, আর তোমার বিষয়ে অজ্ঞ জগতের কাছে ও তোমাকে অস্বীকার করে সেই ভ্রান্তমতপন্থীর কাছে যেন দেখাই যে, তুমি পিতা, অর্থাৎ তুমি একমাত্র জনিত ঈশ্বরেরই পিতা। এই তো আমার ইচ্ছার একমাত্র সঙ্কল্প! বাকি সমস্ত বিষয়ে তোমার সহায়তা ও দয়ার দান প্রার্থনা করা দরকার, যেন তুমি আমাদের বিশ্বাস ও স্তুতিবাদের পাল তোমার আত্মার ফুৎকারে পরিপূর্ণ করে আমাদের শুরু করা বাণীপ্রচারের পথে চালিত কর। কেননা যিনি বলেছেন, যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে (ক), তিনি নিজ প্রতিশ্রুতিতে অবিশ্বস্ত নন। তাই নিঃস্ব যে আমরা, আমাদের যা যা অভাব তা তোমার কাছে যাচনা করব, ও তোমার নবীদের ও প্রেরিতদূতদের বাণী তন্ন তন্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে থাকব, ও সেই সমস্ত দরজায় ঘা দেব যা আমাদের উপলব্ধির কাছে রুদ্ধ। কিন্তু তবুও প্রার্থনা মঞ্জুর করা, সন্মানে উপস্থিত হওয়া, ও দরজা খুলে দেওয়া তোমার উপরেই নির্ভর করে। স্বভাবে আমরা কেমন যেন ঘোর অলসতায় মগ্ন, ও আমাদের বুদ্ধির দুর্বলতাবশত তোমার বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম বটে, কিন্তু তোমার শিক্ষাবাণী অধ্যয়নটা তোমার ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানলাভে আমাদের উপযুক্ত করে, ও বিশ্বাসের প্রতি বাধ্যতা মানবীয় অভিমতের উর্ধ্বে আমাদের উন্নীত করে।

৩৮। এজন্য আমাদের প্রত্যাশাই, তুমি যেন আমাদের কর্মের এ টলমান সূত্রপাত উদ্দীপিত কর, সদা বৃদ্ধিশীল সাফল্য দানে তা স্থিতমূল কর, ও নবীয় ও প্রেরিতিক প্রেরণার সহভাগিতায় আমাদের আহ্বান কর, যাতে তাঁরা যেভাবে কথা বলেছিলেন, আমরা ঠিক সেই অর্থেই তাঁদের বচনগুলি উপলব্ধি করি ও সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য

অনুসারেই তাঁদের বাণী ব্যাখ্যা করি। কেননা আমরা যা যা বলব, তাঁরা তা রহস্যের আবরণেই প্রচার করেছিলেন: তথা, তুমি সেই সনাতন ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালীন একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পিতা; কেবল তুমিই জন্ম ছাড়া, ও কেবল প্রভু যিশু খ্রিষ্টই অনন্তকালীন জন্ম অনুসারে তোমা থেকে সঞ্জাত—সত্য লঙ্ঘন করে তাঁকে দেব-দেবীর সংখ্যায় তালিকাভুক্ত করতে নেই। একমাত্র ঈশ্বর যে তুমি, তিনি যে সেই তোমা থেকে জনিত নন, আমরা এমনটাও প্রচার করব না; তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর যিনি সেই তোমা থেকেই সঞ্জাত যিনি সত্যকার ঈশ্বর ও পিতা, আমরা এর চেয়ে ভিন্ন এমন কথাও স্বীকার করব না। তাই তুমি আমাদের কাছে বাণীগুলোর অর্থ অনাবৃত কর, আমাদের দান কর উপলব্ধির আলো, প্রচারের সূক্ষ্মতা, সত্যের বিশ্বাস; বর প্রদান কর, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা যেন ব্যক্ত করতে পারি, অর্থাৎ আমরা যেন নবীদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা অনুসারে সেই তোমাকেই যিনি অনন্য পিতা ঈশ্বর, ও সেই অনন্য প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে প্রচার করি; আর যারা একথা অস্বীকার করে, সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে আমরা যেন তোমাকে এমন ঈশ্বর বলে সম্মানিত করি যিনি কিন্তু একাকী ঈশ্বর নন, ও তাঁকেও এমন ঈশ্বর বলে ঘোষণা করি যিনি কিন্তু মিথ্যা ঈশ্বর নন।

২ (ক) এখানে গ্রীক স্তোয়া-তত্ত্ববিদ্যার সমর্থিত মূল নীতিবাদ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত।

৪ (ক) এখানে প্রাচীন গ্রীক পুরাণের কথা ইঙ্গিত করা হলো।

(খ) এখানে প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক এপিকুরাসের মতবাদ ইঙ্গিত করা হলো।

(গ) এখানে প্রাচীন ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রকৃতিপূজার কথা নির্দেশ করা হলো।

৫ (ক) সাধু হিলারিউস ঈশ্বর বিষয়ক যে যথার্থ ধারণা খ্রিস্টিয়ান-নয় তত্ত্ববিদ্যায় বৃথা অনুসন্ধান করেছিলেন, তা আদিপুস্তকে ও যোহন-রচিত সুসমাচারে খুঁজে পান।

(খ) যাত্রা ৩:১৪।

(গ) যাত্রা ৩:১৪ লাতিন পাঠ্য।

৬ (ক) যাত্রা ৩:১৪।

(খ) ইশা ৪০:১২।

(গ) ইশা ৬৬:১-২ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) সাম ১৩৯:৭-১০ লাতিন পাঠ্য।

৭ (ক) প্রজ্ঞা ১৩:৫ লাতিন পাঠ্য।

১০ (ক) যোহন ১:১-১৪ লাতিন পাঠ্য।

১৩ (ক) কল ২:৮-১৫ লাতিন পাঠ্য।

১৬ (ক) এখানে সাবেল্লিউস-ভ্রান্তমত নির্দেশিত: লিবিয়া দেশের তলেমাইস শহরের সাবেল্লিউস ৩য় শতাব্দীর ভ্রান্তমতবাদী। এই ভ্রান্তমত অনুসারে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলেন একমাত্র মূলকারকের অভিব্যক্তি: সৃষ্টিকর্ম, মাংসধারণ ও সত্য-বিস্তারের ফলে ঐশ-একত্ব ত্রি-মুখোশ হয়; তাতে যখন ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও ইহুদী জনগণকে বিধান প্রদান করেন তখন পিতা ব'লে, যখন যিশুতে মাংসধারণ করেন তখন পুত্র ব'লে, ও যখন প্রেরিতদূতদের উপরে ও যিশুর সকল শিষ্যদের উপরে নিজের আলো বিস্তার করেন তখন পবিত্র আত্মা ব'লে নিজেকে ব্যক্ত করেন। ২৭২ খ্রিষ্টাব্দে আন্তিওখিয়ায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভা এই মতবাদ নিন্দা করে, ও সেসময় থেকে মতবাদটা হ্রাস পায় ও ব্যঙ্গাত্মক 'পাতৃপাসিও' নামে অভিহিত হয় ('পাতৃপাসিও' লাতিন শব্দের অর্থ হলো: পিতাও [পুত্রের] যন্ত্রণাভোগে যন্ত্রণাভোগ করলেন]। কিন্তু, সাবেল্লিউস বাদে সেই নয়তোস, প্রাক্সেয়া ও হের্মোগেনেস-ও উল্লেখযোগ্য যারা কাথলিক মণ্ডলীর সমর্থিত ত্রিত্ব-তত্ত্বের বিরোধী যেহেতু আক্ষরিক একেশ্বরবাদ সমর্থন করত; তাদের মতবাদ 'মনার্থিয়া' (অর্থাৎ একমাত্র আদি) বলে পরিচিত, কারণ তাদের মতে ঐশবাণীর মাংসধারণটা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা নয় কিন্তু মানবের প্রতি এমন সম্প্রসার যা একটা রশ্মির মত যা সূর্য থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে পৃথিবী থেকে সূর্যের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

(খ) এখানে আরিউসপন্থীদের কথা কলা হচ্ছে। আরিউস আলেক্সান্দ্রিয়ায় (মিশরে) ২৮০ সালে জন্ম নিয়ে বর্তমান তুরস্কে স্থিত কনস্টান্টিনোপলিস শহরে ৩৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করে; একসময় আন্তিওখিয়ার লুকিয়ানুসের শিষ্য ও নিকোপলিসের বিশপ মেলেতিউসের পন্থী হয়ে সে শুরুতে মিশরে ধর্মবিভেদ ঘটিয়েছিল, পরে অনুতপ্ত হয়ে প্রবীণ পদে শ্রেণিভুক্ত হয়েছিল। নিজের বিশপের সঙ্গে পুনরায় বিরোধিতার ফলে দণ্ডিত হয়ে পালেস্তিনা অঞ্চলে ও পরবর্তীকালে নিকোমেদিয়াতে আশ্রয় নেয়। সাধু হিলারিউস আরিউসের ভ্রান্তমতের এ বিষয় উল্লেখ করেন: অজানিত ও সনাতন একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঐশবাণী শূন্য থেকে আগত এবং একসময়ে অস্তিত্বহীন ছিলেন, সমস্ত সৃষ্টজীবদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হয়েও ঐশবাণী একটা সৃষ্টজীব মাত্র; তিনি ঈশ্বরের পুত্র নন কিন্তু দত্তকপুত্র; খ্রিষ্টে ঐশবাণীই যিশুর মানবাত্মার স্থান নেন, ও ঐশত্রিত্বের তিন ব্যক্তি ইচ্ছা-মিলের ফলেই মাত্র ঐক্য বলে সমর্থনযোগ্য।

২২ (ক) যোহন ১০:৩৮।

২৫ (ক) বালেত্তিনুস মিশরীয় একজন জ্ঞানমার্গ-পন্থী দার্শনিক; সে ১৫০ থেকে ১৬০ সাল পর্যন্ত রোমে নিজের ধর্মমত প্রচার করে। তার মতে ঈশ্বরের বাণী হলেন ঈশ্বরের নির্গমন মাত্র (৬ পুস্তক, ৯ দ্রঃ)।

(খ) মানিবাদের প্রবর্তক মানিখেউস বলেও পরিচিত মানি ৩য় শতাব্দীতে পারস্যে স্থিত স্বেসিফোনে (বর্তমানকালীন দক্ষিণ বাগদাদ) জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে মানিবাদ ইহুদী, খ্রিস্টিয়ান, পারস্য ও ভারতীয় নানা মতবাদের এমন সমন্বয় যা ত্রাণ সংক্রান্ত গ্রীক জ্ঞানমার্গ-মতবাদের শীর্ষে স্থান পেয়েছিল। মানিবাদ দ্বৈতবাদ সমর্থন করায় ঐশ্বরিক দু'টো মূলকারণের তথা মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময় মূলকারণের সহ-অস্তিত্ব প্রচার করে; মঙ্গলময় মূলকারণের প্রতীক হলো আলো, ও অমঙ্গলময় মূলকারণের প্রতীক হলো এমন অন্ধকার যা জড়পদার্থের শামিল। মঙ্গলময় মূলকারণ বা ঈশ্বর প্রাথমিক আত্মিক মানুষকে সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু অন্ধকারের শক্তিগুলো দ্বারা পরাজিত হয়ে সেই মানুষকে জড়পদার্থে বন্দি করা হলো। অমঙ্গলময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হয়ে বর্তমান মানুষ কেবল প্রকৃত জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি পেতে পারে; সেই প্রকৃত জ্ঞান হলো সেই সহায়ক যিনি সুসমাচার অনুসারে স্বয়ং পবিত্র আত্মা কিন্তু মানির ধারণায় স্বয়ং মানি। মানুষদের মধ্যে এ মতবাদ-বিস্তারই হলো খোদ মানব পরিভ্রাণ যার প্রতিনিধি হলেন যিশু খ্রিষ্ট, কিন্তু এমন যিশু খ্রিষ্ট যিনি একটা প্রতীক মাত্র যেহেতু মানিই সব। সেকালে মানিবাদ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল; সাধু আগস্তিন নিজেই মনপরিবর্তন করার আগে মানিপন্থী ছিলেন।

(গ) ৩য় শতাব্দীর শেষের দিকে মিশরীয় হিরেরাকাস একটা সন্ন্যাস-সঙ্ঘ স্থাপন করে; তার মতে মাংসের পুনরুত্থান নেই, ও জ্ঞান বয়সের আগে মৃত শিশুরা স্বর্গরাজ্য থেকে বঞ্চিত।

২৬ (ক) প্রথম শতাব্দীর হেবিওন যিশুকে মসীহ বলে স্বীকার করত কিন্তু তাঁকে ঈশ্বর বলে মানত না; অর্থাৎ, তার মতে, খ্রিষ্ট অলৌকিক ভাবে কুমারী থেকে সঞ্জাত হয়েও তবু মানুষ মাত্র।

২৮ (ক) প্রেরিত ৪:৩২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ১ করি ৩:৮।

(গ) যোহন ১৭:২০-২১।

২৯ (ক) লুক ১৮:১৯।

(খ) যোহন ১৭:৩।

(গ) যোহন ৫:১৯।

(ঘ) যোহন ১৪:২৮।

(ঙ) মার্ক ১৩:৩২।

৩০ (ক) যোহন ১৪:২৮।

(খ) যোহন ১০:৩০।

(গ) লুক ১৮:১৯।

(ঘ) যোহন ১৪:৯।

(ঙ) যোহন ১৭:১০।

(চ) যোহন ১৭:৩।

(ছ) যোহন ১৪:১১।

(জ) মার্ক ১৩:৩২।

৩১ (ক) মথি ২৬:৩৮।

(খ) মথি ২৬:৩৯।

(গ) মথি ২৭:৪৬।

(ঘ) লুক ২৩:৪৬।

৩২ (ক) মথি ২৬:৩৮।

(খ) মথি ২৬:৬৪।

(গ) মথি ২৬:৩৯।

(ঘ) যোহন ১৮:১১।

(ঙ) মথি ২৭:৪৬।

(চ) লুক ২৩:৪৩।

(ছ) লুক ২৩:৪৬।

(জ) লুক ২৩:৩৪।

৩৩ (ক) ১ করি ১৫:২৭-২৮।

৩৫ (ক) প্রবচন ৮:২২ লাতিন পাঠ্য।

৩৭ (ক) লুক ১১:৯।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

২য় পুস্তক

১-৫ অধ্যায় : ‘তোমরা যাও, সকল জাতিকে শিক্ষা প্রদান কর কর ; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও’ : সাধু হিলারিউসের মতে প্রভুর এই সুস্পষ্ট আদেশ (মথি ২৮:১৯) হলো বিশ্বাসের সারকথা ; কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীরা সেই আদেশের অর্থ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করে, এমনকি সেটার নিজেদের রুচিমত ব্যাখ্যাও দেয়। এতে সমস্যা এটা যে, তাদের ভ্রান্তমত প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিশ্বাসী মানুষ শাস্ত্রের কথা বাইরে যেতে বাধ্য ; তাতে মানব ভাষা যা অনির্বচনীয় সেবিষয়ে কথা বলতে বলতে দিশেহারা হয়ে পড়ে ; অথচ ঈশ্বর নিজের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে কথা বলার জন্য মানুষকে যথার্থ ও সহজবোধ্য শব্দ অর্পণ করেছেন, যেমন ‘পিতা’ ও ‘পুত্র’ : এ শব্দ দু’টো এমন যার চেয়ে বেশি স্পষ্ট শব্দ নেই ; অপরদিকে মানুষের ভাষা যা সিদ্ধতা স্বরূপ সেই ঈশ্বরকে টুকরো টুকরো করে, যা সর্বশক্তিমত্তা তার জন্য নিজের নিয়ম তৈরি করে, যা অসীম তা সীমাবদ্ধ করে। এর ফলে মানুষের প্রচেষ্টা সবকিছু উলট পালট করে।

৬-১২ অধ্যায় : যিনি ঈশ্বরকে নিখুঁত ভাবে জানেন, সেই খ্রিষ্ট তাঁকে যথার্থভাবে প্রকাশ করেন ; এই ভিত্তিতেই সাধু হিলারিউস বলেন, ঈশ্বরকে জানবার জন্য মানুষ খ্রিষ্টের কাছে যায়। তবেই মানুষ শাস্ত্রের কথা ব্যবহার করায় ঈশ্বর সম্পর্কে যথার্থ কথা বলবে ; অপরদিকে ভ্রান্তমতপন্থীরা শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কথার চেয়ে নিজেদের বানানো অভিমত ব্যক্ত করে। পুত্রের অনন্তকালীন জন্ম সম্পর্কে অর্থাৎ সনাতন পুত্র যে পিতার জনিত পুত্র, এবিষয়েও ভ্রান্তমতপন্থীদের অভিমত শোনা দরকার হয় না, কারণ যোহনের সুসমাচার সেবিষয়ে শেষ কথা বলে, ‘আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর, ইত্যাদি (যোহন ১:১-৩ লাতিন পাঠ্য) : বাণীটা যতই রহস্যময় তত সত্যাপ্রয়ী যেহেতু শাস্ত্রেরই অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী যার সামনে কোন তত্ত্ববিদ্যা বা দার্শনিকের কোন অভিমত বা ব্যাখ্যা দাঁড়াতে পারে না।

১৩-৩৫ অধ্যায় : বাস্তবিকই যিনি এবাণী রচনা করেছিলেন, সেই যোহন ছিলেন অশিক্ষিত জেলে মাত্র : তাঁকেই খ্রিষ্ট তেমন রহস্যাদি প্রকাশ করেছিলেন। ফলত তাঁর সাক্ষ্য সত্যাপ্রয়ী।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫							

১। বিশ্বাসীদের পক্ষে ঈশ্বরের সেই উক্তি যথেষ্ট হওয়া উচিত যা নিজের সত্যের শক্তি সহ আমাদের কানে তখনই প্রবাহিত যখন সুসমাচার-রচয়িতার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রভু বলেন, সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে শিক্ষা প্রদান কর কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আঞ্জা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত (ক)। মানব পরিভ্রাণের রহস্য সংক্রান্ত কোন্ বিষয়ই বা সেই বাণীতে অন্তর্ভুক্ত নয়? অথবা কোন্ বিষয়ই বিস্মৃত বা অস্পষ্ট রয়েছে? ঈশ্বরের পূর্ণতা যেইভাবে দাবি রাখে, সেই অনুসারে সবই পূর্ণতাপ্রাপ্ত, ঈশ্বরের সিদ্ধতা যেইভাবে দাবি রাখে, সেই অনুসারে সবই সিদ্ধতাপ্রাপ্ত। সেই বচনে যথার্থ সমস্ত শব্দ, সমস্ত কার্যকারিতা, সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুক্রম ও ঐশ্বর্যরূপের অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি বিরাজ করে। তিনি ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে’ অর্থাৎ প্রণেতা, একমাত্র জনিতজন ও সেই দানের স্বীকারোক্তিতে বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন। সবকিছুর প্রণেতা এক। কেননা যাঁর থেকে সবকিছু উদ্ভূত, সেই পিতা ঈশ্বর এক; এবং যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেই একমাত্র জনিতজন এক; এবং সবকিছুর মধ্যে যিনি দানরূপে বিরাজমান, সেই আত্মা এক। অতএব সবকিছু যে যার গুণ ও ভূমিকা অনুসারেই বিন্যস্ত: যাঁর থেকে সবকিছু উদ্ভূত, সেই অধিকার এক; যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, সেই সন্তান এক; সিদ্ধ প্রত্যাশার সেই দান এক। যে পূর্ণতা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় সবকিছু ঘিরে রাখে, সেই পূর্ণতায় কোন অভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা তেমন পূর্ণতায় রয়েছে: সেই অনন্তজনে অসীমতা, সেই প্রতিমূর্তিতে সত্যকার রূপ; সেই দানে উপভোগ (খ)।

২। কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীদের ও ঈশ্বরনিন্দুকদের ভুলভ্রান্তি অবৈধ বিষয়ে জড়িত থাকতে, বিপজ্জনক পর্বতচূড়া আরোহণ করতে, অকথনীয় কথা উচ্চারণ করতে ও নিষিদ্ধ ভূমিতে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য করে। এবং যদিও কেবল বিশ্বাসই দ্বারা আঞ্জাবলি পূরণ করা, পিতাকে উপাসনা করা, তাঁর সঙ্গে পুত্রকে সম্মান করা ও পবিত্র আত্মার প্রাচুর্যে পূর্ণ হওয়া আমাদের কর্তব্য, তবু আমরা আমাদের ভাষার নিছতাকে এমন চিন্তা-ধারণা প্রসারিত করতে বাধ্য যা আমাদের পক্ষে অবর্ণনীয়, ও পরের ভ্রলভ্রান্তিও আমাদের ভুল করতে বাধ্য করে, যার ফলে যা কিছু ভক্তিময় মনের মধ্যে নিহিত হওয়ার কথা, তা আমরা এমন কথনে ব্যক্ত করি যা মানবীয় বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

৩। কেননা অনেকে রুখে দাঁড়িয়েছে যারা সরল-সোজা সেই স্বর্গীয় বাণীর প্রকৃত ও অনন্য অর্থের বদলে নিজ নিজ অপব্যখ্যা উপস্থাপন করেছে; ও কথাগুলোর স্পষ্ট অর্থ অবজ্ঞা করেই তেমনটা করে থাকে। কেননা ভ্রান্তমত শাস্ত্র থেকে নয়, উপলব্ধি থেকেই আসে, এবং বাণী নয়, ব্যাখ্যাই অপরাধ করে (ক)। সত্য কি অবিনশ্বর নয়? আমরা যখন ‘পিতা’ নামটা শুনি, তখন সেই নামের সঙ্গে পুত্রের স্বরূপ কি জড়িত নয়? যাঁর কথা উল্লিখিত, সেই পবিত্র আত্মার কি কোন অস্তিত্ব থাকবে না? কেননা ‘পিতা’ যা, তা পিতায় না থেকে পারে না; ‘পুত্র’ যা, তা পুত্রে অনুপস্থিত হতে পারে না; ‘দান’ হিসাবে যা গৃহীত, তা পবিত্র আত্মায় বিরাজ না করে পারে না। অথচ বাঁকা মনের মানুষ সবকিছু বিভ্রান্ত করে ও কুটিল সমস্যা তুলে ধরে, এমনকি মিথ্যা মিথ্যে দিয়ে কথাগুলোর স্পষ্ট অর্থ উলট-পালট করে; এর ফলে, পুত্র যা, পুত্র থেকে তা কেড়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে, পিতা যা, তা থেকে পিতাকে বঞ্চিত করে। তারা তখনই পিতৃত্ব কেড়ে নেয় যখন এমনটা বলে যে, পুত্র স্বরূপে পুত্র নন; কেননা যখন জনক ও জনিতজন একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তখন পুত্র পিতার স্বরূপের অধিকারী নয়; সেও পুত্র নয় যার সত্তা পিতার সত্তার চেয়ে ভিন্ন ও অসদৃশ। তবে তিনি কেমন করেই বা পিতা হবেন যদি নিজের পুত্রতে নিজের সত্তারই সমান সত্তা ও নিজের স্বরূপের সমান স্বরূপ জনিত না করে থাকেন?

৪। অতএব, যেহেতু সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলোতে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না, সেজন্য তারা নবীন তত্ত্ব ও মানবীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। উদাহরণ স্বরূপ, সাবেল্লিউস পিতাকে পুত্রতে প্রসারিত করেন ও এক্ষেত্রে যে বিশ্বাস, তা বাস্তবতার ব্যাপার নয়, কথনের ব্যাপারেই গণ্য করে, কেননা সে পিতাকে পিতাতে পুত্র ও পুত্রকে পুত্রতে পিতাও করেন। হেবিওন ঈশ্বরের পুত্রের বেলায় মারীয়া থেকে ছাড়া তাঁর আদি মানে না, ও তাঁকে ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত মানুষ নয়, কিন্তু মানুষ থেকে উদ্ভূত ঈশ্বর বলে উপস্থাপন করে; সে এমনটা বলে যে, যিনি পূর্বাস্তিত্বের অধিকারী ও আদিতে ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাসকারী বাণী-ঈশ্বর, মারীয়া তাঁকে বরণ করেননি, কিন্তু বাণীর দ্বারাই তিনি মাংস প্রসব করলেন; সাবেল্লিউসের মতে ‘বাণী’ বলতে পূর্বাস্তিত্বের অধিকারী সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝায় না, কিন্তু কণ্ঠের ধ্বনিত উচ্চস্বর বোঝায়। একই প্রকারে আমাদের বর্তমানকালের কোন না কোন প্রচারক এমনটা বলে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম শূন্য থেকে ও কালের গণ্ডিতে আবির্ভূত হলেন। তারা এমনটা করে পাছে পুত্র পিতা থেকে সঞ্জাত হলে ঈশ্বর পুত্রের পর্যায়ে নমিত হন; তারা এব্যাপারেও যথেষ্ট চিন্তিত যে, পুত্র পিতা থেকে সঞ্জাত হলে তবে পুত্র পিতাকে ঈশ্বরত্ব-বঞ্চিত করেন; তাই তারা ঈশ্বরের পুত্রকে শূন্য থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত সৃষ্টবস্তু বলে বর্ণিত করায় ঈশ্বরকে সাহায্য করতে অভিপ্রেত, যাতে করে ঈশ্বর নিজ থেকে সঞ্জাত ও নিজের স্বরূপের অংশী পুত্র ছাড়া হয়ে একাকী হয়ে নিজের পরম সিদ্ধতায় ঈশ্বর হয়ে থেকে যান। পবিত্র আত্মার দাতা যিনি, তারা যখন তাঁকে সৃষ্টিকর্মের, পরিবর্তনের ও অস্তিত্বহীনতার অধীন করতে দাবি করে, তখন পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত তাদের তত্ত্ব যে আমাদের তত্ত্ব থেকে ভিন্ন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তারা এভাবেই বিশ্বাস-রহস্যের সত্য ও সিদ্ধতা ধ্বংস করে; যেখানে সবকিছু ক্ষেত্রে এক একটি ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে, সেখানে স্বরূপের ভিন্নতা আরোপ করায় তারা ঈশ্বরের ঐক্য ভঙ্গ করে; পুত্র যা, পুত্র থেকে তা কেড়ে নেওয়ায় তারা পিতাকে অস্বীকার করে; এবং যাঁকে আমরা পেয়ে থাকি ও খ্রিষ্ট দান করেছিলেন, নিজেদের অন্ধত্বে তারা সেই পবিত্র আত্মাকেও অস্বীকার করে (ক)। নিজেদের তত্ত্বের পরম যুক্তি বিষয়ে বড়াই করে তারা অপ্রশিক্ষিত মানুষের পতন ঘটায়; প্রকৃত অর্থ থেকে শব্দগুলো অর্থশূন্য করে তারা শ্রোতাদের

প্রতারণা করে, যদিও সেই তিনটে নাম [পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা] সত্যের সাক্ষী হয়ে থাকে। আমি বালেস্তিনুস, মার্কিওন (খ), মানি ও বাকি সকল ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপজ্জনক অভিমত উল্লেখ না করে অগ্রসর হব। সময় সময় তারা কোন না কোন অদক্ষ মানুষের মন দখল করে ও তাদের কথাবার্তার সংক্রামক রোগ সেই মানুষদের আক্রান্ত করে; তাদের শিক্ষার বিষ শ্রোতার মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হলে রোগ যেটাই হোক না কেন, সেই রোগ মারাত্মক।

৫। তাদের অবিশ্বস্ততা আমাদের কঠিন ও বিপজ্জনক অবস্থায় জড়িত করে, কেননা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও অদ্ভুত বিষয়ে আমাদের পক্ষে এমন নির্দিষ্ট কথা ব্যক্ত করা প্রয়োজন যা স্বর্গীয় বচনগুলোর বাইরে। প্রভু বলেছিলেন, সকল জাতিকে ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে’ বাপ্তিস্ম দিতে হবে। বিশ্বাসের শব্দগুলো স্পষ্ট বটে, কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীরা সেই শব্দগুলোর অর্থ সন্দেহজনক করতে অধিক ব্যস্ত। যদিও এর ফলে ঐশাভ্রান্তগুলোকে কিছুই যোগ করা চলে না, তবু ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে তাদের দুঃসাহসকে খর্ব করা আবশ্যিক। যেহেতু দিয়াবলের চতুরতা-প্রণোদিত তাদের সেই শর্ততা তত্ত্বসমূহকে অর্থশূন্য করে কিন্তু সেইসাথে ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা’ সেই নাম তিনটে রক্ষা করে যা সত্য উপস্থাপন করে, সেজন্য আমাদের পক্ষে সেই সত্যের উপর জোর দেওয়া দরকার যা সেই নাম তিনটে বহন করে। তাই আমরা যেভাবে শাস্ত্রে সেই শব্দগুলো পাব, ঠিক সেইভাবেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মর্যাদা ও ভূমিকা ঘোষণা করতে হবে ও সেইভাবে ভ্রান্তমতপন্থীদের জন্য এমন বাধা-বিঘ্ন বসাব যাতে তারা সেই নামগুলো নিজ নিজ ঐশবৈশিষ্ট্য-বঞ্চিত না করে, ও ঠিক সেই নামগুলো দ্বারা সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের বাধ্য করব যাতে তারা সেই নামগুলো নিজ নিজ অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করে। যারা সত্য বিকৃত করে, আলো অন্ধকারময় করে, যা অভিযাজ্য তা ভাগ ভাগ করে, যা অক্ষয়শীল তা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে, যা অবিচ্ছিন্ন তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের সেই বিপক্ষদের মন কেমন ধরনের, তা আমি কল্পনা করতে পারি না। যা সিদ্ধতাবিশিষ্ট তা ছিঁড়িয়ে ফেলা, সর্বশক্তিমত্তার জন্য নিয়ম তৈরি করা, অসীমতাকে সীমাবদ্ধ করা, এসমস্ত কিছু করা তাদের কাছে সামান্য ব্যাপার মনে হতে পারে; কিন্তু আমার দিক দিয়ে, তাদের উত্তর দেওয়া আমাকে দুশ্চিন্তামগ্ন করে, আমার মাথা ঘোরে, আমার ধীশক্তি বিহ্বল হয়; কিন্তু

আমার বক্তব্যে আমি আমার দুর্বলতা নয়, আমার নীরবতাই স্বীকার করব। অথচ এই প্রচেষ্টায় আমার অবশ্যই এই ইচ্ছা উপস্থিত যাতে দুঃসাহস প্রতিরোধ করা হয়, ভুলভ্রান্তি সংস্কার করা হয়, অজ্ঞতা সহায়তা করা হয়। কিন্তু আমার সামনে যা রয়েছে, সেই বিষয়বস্তু এমন অসীম, ও যা করতে সাহস করি তা এমন বোধের অতীত যে, যা ঈশ্বর নিজে আগে উচ্চারণ করেছেন, ঈশ্বরের বিষয়ে তার চেয়ে সূক্ষ্মতর ভাষা ব্যবহার করা কঠিন। তিনিই তো ‘পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা’ নাম তিনটে নির্ধারণ করেছেন; আর সেই নামগুলোই হলো তাঁর স্বরূপের বর্ণনা। এবিষয়ে প্রসারিত অনুসন্ধানের যে ফলাফল, কোন শব্দ তা ব্যক্ত করতে পারে না, কোনা অনুভূতি তা অনুভব করতে পারে না, কোন যুক্তিও তা ধারণা করতে পারে না, কেননা সেই সবকিছু অনির্বচনীয়, দুঃপ্রাপ্য, ধারণাতীত। বিষয়বস্তুর প্রশস্ততা দ্বারা ভাষা ক্ষান্ত হয়, সেটার উজ্জ্বলতার আলো চোখকে অন্ধ করে, বোধশক্তি সেটার সীমাহীন পরিব্যাপ্তি ধারণ করতে পারে না। অথচ আমাদের উপরে যে কর্ম ন্যস্ত করা হয়েছে, সেই প্রয়োজনে, ও এসমস্ত কিছুই ঘাঁর গুণাবলি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমরা এগিয়ে চলব, অনুসন্ধান করব ও কথা বলব; এমনকি, যা কিছু তাঁর দ্বারা নির্ধারণ করা হবে আমরা তা বিশ্বাস করব, তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এটিই আমাদের একমাত্র প্রতিশ্রুতি।

৬। পিতাই তিনি, ঘাঁর থেকে সমস্ত কিছু অস্তিত্ব পেয়ে থাকে। তিনিই খ্রিষ্টে ও খ্রিষ্ট দ্বারা হলেন সবকিছুর উৎস। অন্যান্য সবকিছুর বৈষম্যে তিনি স্বয়ংঅস্তিত্বশীল। তিনি নিজের অস্তিত্ব বাইরে থেকে আনেন না, বরং নিজে থেকে ও নিজেতেই সেই অস্তিত্বের অধিকারী। তিনি অসীম, কেননা এমন কিছু নেই যা তাঁকে ধারণ করে, বরং তিনি সবকিছু নিজেতে ধারণ করেন; তিনি স্থান দ্বারা কখনও সীমাবদ্ধ নন, কেননা তিনি সীমাহীন; তিনি সবসময় কালের পূর্ববর্তী, কেননা কাল তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। তুমি যা ঈশ্বরের শেষ সীমা বলে মনে কর, তোমার মন সেই দিকে ছুটে যাক, কিন্তু তুমি সবসময় দেখবে, তিনি সেখানে আছেন; নিজেকে যতই প্রসারিত কর, তবু সবসময়ই আরও দূরবর্তী এমন দিগন্ত থাকবে যার দিকে নিজেকে প্রসারিত করা দরকার। তোমাকে সবসময়ই তাঁর স্থানের দিকে ছুটতে হবে, যেহেতু তাঁর অস্তিত্ব সীমাহীন। তাঁর বিষয়ে তোমার কথা ব্যর্থ হবে, কিন্তু তাঁর স্বরূপ সীমাবদ্ধ হবে না। আরও, অতীতকালের দিকে

ফের, তুমি দেখবে তিনি সবসময়ই উপস্থিত ; যে অতীতকালে তুমি প্রবেশ করেছ, সংখ্যা যদি সেই কাল ব্যক্ত করতে অক্ষম, তবু ঈশ্বরের অনন্ততা হ্রাস পায় না। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করার জন্য তোমার উপলব্ধি-শক্তি জাগাও, কিছুই পাবে না ; পরিপূর্ণতা হিসাবে তিনি তোমার জন্য কিছুটা রেখেছেন, কিন্তু এই কিছুটা তাঁর পরিপূর্ণতার মধ্যে সবসময়ই অন্তর্ভুক্ত। তাই তুমি সেই পরিপূর্ণতা পাওনি, কেননা তোমার হাতে যা বাকি রয়েছে তা সেই পরিপূর্ণতার একটা অংশ মাত্র ; এমনকি, সেটা একটা অংশও নয়, কেননা তুমি এমন পরিপূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত যা ভাগ ভাগ করতে ব্যর্থ হয়েছ। কেননা ভাগ বলতে এমনটা বোঝায় যে কিছুটার বিভাজন হয়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণতা বিভাজ্য নয়, এবং ঈশ্বর সর্বস্থানে উপস্থিত ও তিনি যেইখানে উপস্থিত হোন না কেন, সেখানে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত। তাই তিনি যুক্তির গন্ডি অতিক্রম করেন যেহেতু তাঁর বাইরে কিছুই নেই ও যেহেতু অনন্ততা অনন্তকাল ধরে তাঁরই। এটি হলো ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত সত্য ; এটি হলো সেই অগাধ স্বরূপের রহস্য যা ‘পিতা’ নামে ব্যক্ত, তথা, ঈশ্বর অদৃশ্য, অনির্বচনীয়, অসীম। তাঁর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নীরব থাকুক, আমাদের উপলব্ধি স্বীকার করুক যে তাঁকে ধারণ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে, যুক্তিও তাঁকে নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল বলে স্বীকার করুক। অথচ, আমরা যেমন বলেছি, ‘পিতা’ শব্দে তাঁর একটা নাম আছে যা তাঁর স্বরূপের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে : তিনি এমন পিতা যার সঙ্গে তুলনা হয় না। মানুষের বেলায় যেমন, তিনি যে সেই অনুসারে বাইরে থেকে পিতৃত্ব গ্রহণ করে তা নয়। তিনি অজনিত, সনাতন, নিজেতেই অনাদি অনন্ত। তিনি কেবল পুত্রের কাছেই জ্ঞাত, কেননা ‘পিতাকে কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। পুত্র ছাড়া পিতাকেও কেউই জানে না’ (ক)। দু’জনে একে অপরকে জানেন, ও তাঁদের পরস্পর জানাটা সিদ্ধ। অতএব, যেহেতু পুত্র ছাড়া কেউই পিতাকে জানে না, সেজন্য এসো, পিতা সংক্রান্ত আমাদের ধারণা প্রকাশকারী সেই পুত্রের ধারণার সঙ্গে এক হোক যিনি একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী।

৭। পিতা সম্পর্কে এসমস্ত কিছু বলার চেয়ে আমার পক্ষে তা উপলব্ধি করা সহজ, কেননা আমি এবিষয়ে সচেতন যে, তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করার জন্য কোন বক্তব্য উপযুক্ত

নয়। আমাদের উপলব্ধি করতে হয় যে তিনি অদৃশ্য, বোধগম্য নন ও সনাতন। কিন্তু তিনি যে স্বয়ংঅস্তিত্বশীল, স্বয়ংউৎপত্তিশীল ও স্বয়ংনির্ভরশীল, তিনি যে অদৃশ্যমান, বোধগম্য নন ও অমর, সেই সবকিছু বলাটা হলো তাঁর সম্মান সম্পর্কে স্বীকৃতি, আমাদের ভাবনার একটা ইঙ্গিত, আমাদের চিন্তা-ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণী, কিন্তু ঈশ্বর যে কি, তা বলতে মানবীয় বক্তব্য অকেজো, শব্দগুলো বাস্তবতাকে ব্যক্ত করতে অক্ষম। যখন তুমি এমনটা শোন যে তিনি স্বয়ংঅস্তিত্বশীল, তখন মানবীয় যুক্তি তেমন স্বতন্ত্রতা বোঝাতে অক্ষম। আমরা এমন বস্তু পেতে পারি যা বহন করে ও এমন বস্তুকে পেতে পারি যা বহন করা হয়, কিন্তু যা কিছু সেইভাবে অস্তিত্বশীল, তা তেমন কিছু থেকে স্বতন্ত্র যা সেটার অস্তিত্বশীলতার কারণ। আরও, যখন তুমি এমনটা শোন যে তিনি স্বয়ংউৎপত্তিশীল, তখন এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না যেখানে জীবনদাতা ও দেওয়া জীবন একই। যখন তুমি এমনটা শোন যে তিনি অমর, তখন এমন কিছু ভাবতে পার যা তাঁর থেকে উৎপন্ন নয় ও যার সঙ্গে খোদ প্রকৃতি সূত্রে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই; এমনকি মরণ সেই একমাত্র বিষয় নয় যা ‘অমর’ শব্দটা ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র বলে দাবি করে। যখন তুমি এমনটা শোন যে তিনি বোধগম্য নন, তখন তেমনটা বলার অর্থই যে তিনি অস্তিত্বমণ্ডিত নন, কেননা তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। যখন তুমি এমনটা বল যে তিনি অদৃশ্য, তখন অস্তিত্বমণ্ডিত যা কিছু অদৃশ্য, তা নিজের অস্তিত্বশীলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। ফলে, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের স্বীকৃতি ভাষার দুর্বলতার শিকার হয়; আমরা যত সূক্ষ্ম ভাষা তৈরি করি না কেন, তা ঈশ্বরের বাস্তবতা ও তাঁর মহত্ত্ব নির্ধারণ করতে পারে না। ঈশ্বর বিষয়ক নিখুঁত জ্ঞান হলো তাঁকে এমন ভাবে জানা যাতে এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে উঠি যে, আমাদের পক্ষে তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া উচিন নয়, কিন্তু নিজেরা তাঁকে বর্ণনা করতে পারি না। বিশ্বাস করা আবশ্যিক, উপলব্ধি করা আবশ্যিক, উপাসনা করা আবশ্যিক; এবং এটাই আবশ্যিক যে, তেমন ভক্তিকর্ম তিনটে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবে।

৮। এখন আমরা গভীর সাগরের ঝড়ের বদলে বন্দরবিহীন তীরের বিপদ বেছে নিয়েছি; তাই নিরাপদে এগোতেও পারি না, পিছিয়ে যেতেও পারি না, কিন্তু আমাদের সামনে যে পথ রয়েছে তা পিছনে যা রয়েছে সেটার চেয়ে অধিকতর অসুবিধা বহন করে। ঈশ্বর যা,

তিনি তা, ও তিনি যেভাবে প্রকাশিত, তাঁকে সেইভাবে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। পুত্র সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মন ভয়তে সঙ্কুচিত হয়; আমি প্রতিটি কথায় কাঁপি পাছে অবিশ্বস্ততায় পতিত হই। কেননা তিনি অজনিতজনের জনিতজন, একক থেকে একক, সত্যকার থেকে সত্যকার, জীবনময় থেকে জীবনময়, সিদ্ধতাবিশিষ্ট থেকে সিদ্ধতাবিশিষ্ট, প্রতাপ থেকে প্রতাপ, প্রজ্ঞা থেকে প্রজ্ঞা, গৌরব থেকে গৌরব, অদৃশ্য ঈশ্বরের সাদৃশ্য, অজনিত পিতার প্রতিমূর্তি। তবে আমরা কেমন করে এমনটা ভাবতে পারি যে, সেই একমাত্র জনিতজন হলেন অজনিতজনের জনিতজন? পিতা স্বর্গ থেকে বারে বারে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন’ (ক)। এতে কোন বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা নেই, কেননা যিনি জনিত করলেন তিনি যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন, ও যিনি জন্ম নিয়েছেন তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও এই সাক্ষ্য বহন করেন, ‘পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি’ (খ)। এটা এমনিই দত্তকের ব্যাপার নয়, কেননা তিনি ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র, ও চিৎকার করে বলেন, যে কেউ আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (গ)। তিনি যে সৃষ্টবস্তুগুলোর মত একটা আদেশের প্রতি বাধ্য হয়ে অস্তিত্ব পেয়েছেন এমনটাও নয়, কেননা একমাত্র জনিতজন সেই ‘এক’ [ঈশ্বর] থেকে উদ্ভূত ও নিজের মধ্যেই জীবন রাখেন যেমন যিনি তাঁকে জনিত করেছেন তিনিও নিজের মধ্যে জীবন রাখেন, কেননা তিনি বলেন, পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন (ঘ)। পুত্রের মধ্যে যে পিতার একটা অংশ রয়েছে এমনটাও নয়, কেননা পুত্র এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, ‘যা কিছু পিতার, তা সবই আমার’; আরও, ‘যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার’ (ঙ), এবং এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত সাক্ষ্যদান করে বলেন, কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে (চ), এবং বস্তুগুলোর প্রকৃতি অনুসারে অংশটা পরিপূর্ণতার অধিকারী হতে পারে না। তিনিই সিদ্ধতাবিশিষ্ট পিতার সিদ্ধতাবিশিষ্ট পুত্র, কেননা ঘাঁর সবকিছু আছে, তিনি তাঁর কাছে তা সবই দিয়েছেন। তবু আমাদের এমনটা ভাবতে নেই যে, যেহেতু পিতা এখনও অধিকার রাখেন সেজন্য তিনি দেননি, অথবা, তিনি পুত্রের কাছে দান করেছেন বিধায় এখন তাঁর আর কিছু নেই।

৯। সুতরাং, তাঁর জন্ম কেমন হয়েছে তা এমন রহস্য যা সেই দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
তেমন রহস্য উদ্ঘাটন ক্ষেত্রে যে কেউ নিজের অক্ষমতার উপর দোষারোপ করে, তবে
পিতা ও পুত্র যে ঠিক পিতা-পুত্র সম্পর্কের অধিকারী তেমন নিশ্চয়তা সত্ত্বেও সে আরও
বেশি কষ্ট পাবে সেই অজ্ঞতার জন্য, যে অজ্ঞতা আমি নিজেও স্বীকার করি, কেননা
আমিও জানি না কিন্তু কোন জানবার দাবি রাখি না; তথাপি সান্ত্বনা পাই। মহাদূতগণ
জানেন না, দূতগণ কিছুই শোনেননি, যুগগুলো সেবিষয়ে কোন ধারণা রাখে না, কোন
নবী উপলব্ধি করেননি, কোন প্রেরিতদূতও তেমনটা জানবার চেষ্টা করেননি, পুত্র
নিজেও তা প্রকাশ করেননি। তেমন আত্মকষ্ট শেষ হোক। তুমি যেই হও যে এই
রহস্যগুলো বিষয়ে অনুসন্ধান করছ, সেই তোমাকে আমি উচ্চতা, বিস্তার ও গভীরতা
ক্ষেত্রে পুনরায় তোমার অনুসন্ধান করতে আদেশ করছি না; কেননা যখন তুমি সৃষ্টবস্তুর
উৎপত্তি সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন কি শান্তশিষ্ট মনে স্রষ্টার জন্ম বিষয়ে অজ্ঞতা মেনে নেবে
না? আমাকে বল, তোমার ইন্দ্রিয়গুলো কি তোমাকে কোন প্রমাণ দেয় যে তোমাকে প্রসব
করা হয়েছিল? তুমি যে পিতা হয়েছিলে, তুমি কি সেটার প্রক্রিয়া বোঝাতে পার? তুমি
কোথা থেকে উপলব্ধি-শক্তি অর্জন করেছ, কেমন করে জীবন পেয়েছ, তোমার যুক্তি-
ক্ষমতা কোথা থেকে আসে, তোমার ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির প্রকৃতি
যে কোথা থেকে আগত, আমি তো এমনটা জিজ্ঞাসা করছি না; আমরা যে সেগুলো
ব্যবহার করি, সেটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে সেগুলো আছে। আমার জিজ্ঞাসা বরং এ : কেমন
করে তুমি সেই সমস্ত কিছু তোমার ছেলেমেয়েকে প্রদান কর? কেমন করে তুমি
ইন্দ্রিয়গুলো কেমন যেন কলম দিয়েছ, তাদের চোখ দু'টো আলোকিত করেছ, তাদের
মধ্যে মনকে প্রবেশ করিয়েছ? তুমি পারলে তবে আমাকে বল। অতএব, তোমার এমন
প্রভাব আছে যা নিজে বোঝা না, তুমি এমন দান প্রদান কর যা উপলব্ধি কর না। তুমি
যখন তোমার নিজের সম্পর্কে শান্তশিষ্ট মনেই অদক্ষ, তখন কেমন করে ঈশ্বরের
ব্যাপারে এত দুঃসাহসের সঙ্গে অজ্ঞ থাকতে পার?

১০। তবে অজানিত সেই পিতাকে শোন, একমাত্র জনিত সেই পুত্রকে শোন। তাঁর এই
কথা শোন, 'পিতা আমার চেয়ে মহান', 'আমি এবং পিতা, আমরা এক', 'যে আমাকে
দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে', 'পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি', 'আমি

পিতা থেকে বেরিয়েছি’, ‘যিনি পিতার বুকে বিরাজমান’, ‘যা কিছু পিতার, তা সবই পুত্রকে দিয়েছেন’, ‘পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন’ (ক)। এই সমস্ত উক্তি থেকে সেই পুত্রকে শোন যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, প্রজ্ঞা, পরাক্রম ও গৌরব। এবার পবিত্র আত্মাকে শোন; তিনি বলছেন, কে তাঁর প্রজন্মের কথা বর্ণনা করবে? (খ)। লক্ষ কর প্রভুর নিজের সাক্ষ্য, পিতাকে কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন (গ)। এই নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ কর, সেই যে অন্ধকার সেই জন্মকে আবৃত রাখে তাতে নিমজ্জিত হও, সেইখানে তুমি সেই অজানিত ঈশ্বরের সঙ্গে ও একমাত্র জনিতজনের সঙ্গে একা থাকবে। শুরু কর, চলতে থাক, অধ্যবসায়ী হও। তুমি যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবে না, তা আমি জানি, কিন্তু তোমার অগ্রগতিতে আমি আনন্দিত হব। কেননা যে কেউ ভক্তি সহকারে সীমাহীন পথে চলতে থাকে, সে শেষ লক্ষ্যে না পৌঁছলেও নিজের প্রচেষ্টার জন্য উপকৃত হবেই। আমাদের উপলব্ধি-ক্ষমতা উপরে উল্লিখিত সমস্ত বচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১১। অজানিতজন থেকে একমাত্র জনিতজন যিনি, জনক থেকে জনিতজন যিনি, জীবনময় থেকে জীবনময় যিনি, সেই পুত্র যার মধ্যে সত্যিকারেই জীবন আছে, তিনি সেই পিতা থেকেই জীবন পান। ‘পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন’ (ক)। তিনি সিদ্ধতাবিশিষ্ট থেকে সিদ্ধতাবিশিষ্ট, কেননা যিনি সম্পূর্ণ, পুত্র সেই সম্পূর্ণজন থেকে সম্পূর্ণতা পান। এটা যে বিচ্ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা এমন নয়, কেননা এক একজন অন্যজনে রয়েছেন, ও ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা পুত্রে বিরাজিত। বোধাতীত বোধাতীত থেকে জনিত, কেননা অন্য কেউ তাঁদের জানে না, কিন্তু এক একজন অন্যজনকে জানেন; অদৃশ্যমান অদৃশ্যমান থেকে জনিত, কেননা পুত্র হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, ও যে কেউ পুত্রকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। এখানে পার্থক্য রয়েছে, কেননা তাঁরা হলেন পিতা ও পুত্র; তাঁদের ঈশ্বরত্ব যে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ভিন্ন তা নয়, কেননা উভয় এক, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, অজানিত এক ঈশ্বর থেকে একমাত্র জনিত এক ঈশ্বর। দু’জন ঈশ্বর আছেন তা নয়, কিন্তু একমাত্রজন থেকে একমাত্রজন; অজানিত দু’জন আছেন তাও নয়, কেননা পুত্র তাঁরই থেকে সঞ্জাত

যিনি সঞ্জাত নন। ভিন্নতাও নেই, কেননা জীবনময় ঈশ্বরের জীবন জীবনময় খ্রিষ্টে রয়েছে। ঈশ্বরত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আমি ততখানি বলতে সিদ্ধান্ত করেছি; আমি যে বিশ্বাসের সারকথা ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হয়েছি তা কল্পনাও করছি না, কিন্তু শুধু এটাই মেনে নিচ্ছি যে, বিষয়বস্তুটা অফুরন্ত। তুমি নাকি বলছ, তবে, যেহেতু এমন কিছু নেই যা বিশ্বাস উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য বিশ্বাস অকার্যকর। না, বরং বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমিকা এটি: যা অনুসন্ধান করা হয়, বিশ্বাস এমনটা স্বীকার করবে যে, সেই বিষয় তার পক্ষে বোধগম্য নয়।

১২। পুত্রের রহস্যময় প্রজনন সম্পর্কে আরও কিছুটা বলা বাকি রয়েছে; বা আরও সূক্ষ্মভাবে কথা বলতে গেলে, কিছুটা নয়, সবকিছুই বলা বাকি রয়েছে। আমি কম্পিত, ব্যাপারটা স্থগিত করি, নিস্তেজ বোধ করি, কোথা থেকে শুরু করব তাও জানি না। পুত্র যে কবে জন্ম নিলেন তা জানি না, ও তাঁর জন্ম বিষয়ে কিছুই না জানা আমার পক্ষে অভ্যস্তিময় ব্যাপার। কাকে অনুন্নয় করব? কাকে আমার সাহায্যে ডাকব? তেমন কঠিন সমস্যা উপস্থাপন করার জন্য আমি কোন্ পুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় শব্দসমূহ টুকে নেব? আমি কি গ্রীকদের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র লুট করে নেব? না। কেননা আমি সেবিষয়ে এটাই পড়েছি, প্রজ্ঞাবান কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? (ক)। তবে এক্ষেত্রে জগতের নকল দার্শনিকেরা ও এই যুগের প্রজ্ঞাবানেরা বোবা, কেননা তারা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি কি সেই বিধানপণ্ডিতের কাছে যাব? সে তো অন্ধকারে রয়েছে, কেননা তার কাছে খ্রিষ্টের ত্রুশ বাধাস্বরূপ। তবে আমি হয় তো কি ভ্রান্তমত উপেক্ষা করতে ও সেবিষয়ে নীরব থাকতে তোমাদের উৎসাহ দেব, এই ভিত্তিতে যে, আমরা যদি বিশ্বাস করি যে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয়েছিল, বধির কানে শুনতে পেয়েছিল, খোঁড়া ছুটে চলেছিল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত পায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছিল, অন্ধ আলো ফিরে পেয়েছিল, জন্মান্ন চোখ অর্জন করেছিল, অপদূতেরা তাড়িত হয়েছিল, পীড়িতরা সুস্থ হয়ে উঠেছিল, মৃতেরা জীবন পেয়েছিল, তাহলে যাঁর কথা আমরা প্রচার করি, তাঁর প্রতি এই ভক্তি প্রদর্শন কি যথেষ্ট? ভ্রান্তমতপন্থীরা এসমস্ত কিছু স্বীকার করে, তাসত্ত্বেও তারা বিনষ্ট হয়।

১৩। তবে এখন এমন কিছু লক্ষ কর যা খোঁড়ার ছুটে চলা, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ, অপদূতদের পলায়ন, ও মৃতদের জীবনের চেয়ে কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। যে সমস্ত সমস্যার কথা আমি ব্যক্ত করে এসেছি, সেই সমস্যার মধ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করার জন্য আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গরিব, অশিক্ষিত ও অশিক্ষিত একজন জেলে; তাঁর হাতে জাল, তাঁর কাপড় ভেজা, পা দু'টো কাদায় মাখা, সবদিক দিয়ে তিনি একজন নাবিক। তোমরা ভেবে বোঝ একাজ দু'টোর মধ্যে কোনটা বড় তথা, মৃতদের উদ্ধৃত করা নাকি অপ্রশিক্ষিত মানুষকে এই তত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করা? কেননা তিনি বলেন, 'আদিতে ছিলেন বাণী' (ক)। সেই আদিতে যা ছিল, তা কী? কালের পর কাল কেটে যায়, কতগুলো শতাব্দী পিছিয়ে পড়ে, কতগুলো যুগ বিলীন হয়। সেই আদির জন্য তোমার ইচ্ছামত একটা তারিখ বেছে নিলেও তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কেননা তিনি তখনও 'ছিলেন'। বিশ্বের দিকে তাকাও, ও সেই বিষয়ে যা লেখা রয়েছে তা বোঝ: 'আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন' (খ)। সুতরাং যা সৃষ্ট হয়, তা সেই 'আদিতে' হয়, এবং যুগগুলো তা-ই ধারণ করে যা ভাবীকালে হবার জন্য আদিতে ধারণকৃত ছিল। কিন্তু অশিক্ষিত, অদক্ষ, কালের চিন্তা থেকে মুক্ত ও যুগগুলোর ব্যাপারে নির্ভীক আমার এই জেলে সমস্ত আদির উপর বিজয়ী। কেননা সেই 'ছিলেন' এমন, যা এখনও আছে, ও তেমন কালের কোন সীমাও নেই, কোন সূচনাও নেই; তিনি [অর্থাৎ বাণী] যে 'হছিলেন' তা নয়, তিনি বরং 'আদিতে ছিলেন'।

১৪। কিন্তু হয় তো আমরা এমনটা দেখব যে, আমাদের সেই জেলে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত শর্তগুলো মানেননি, কেননা তিনি সেই বাণীকে কালের সীমা থেকে মুক্ত করেছেন; এবং যা মুক্ত তা একাকী ও স্বতন্ত্র (ক)। তাই এসো, আমরা পরবর্তী বচনে কান দিই: 'বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে' (খ)। সেই বচনে আমরা এমনটা দেখতে পাই যে, যে বাণী আদির পূর্বেও ছিলেন, সেই বাণী অনাদি হয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং, যে বাণী 'ছিলেন' সেই বাণী 'ঈশ্বরের সঙ্গে' আছেন। আমরা সেই আদির কথা অনুসন্ধান করতে করতে যিনি বর্তমান নন, তিনি কালের স্রষ্টা থেকে কখনও অবর্তমান নন। আমাদের সেই জেলে আপাতত অব্যাহতি পেলেন; কিন্তু তাঁর জন্য বাকি যা এখনও রয়েছে, হয় তো তিনি তাতে টিকে থাকতে পারবেন না।

১৫। এতে তুমি এমনটা বলবে যে, একটা বাণী হলো একটা কণ্ঠের ধ্বনি, বস্তুর নামকরণ ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। এই বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে ও আদিতেই ছিলেন; কেননা যে বচন চিন্তাকে ব্যক্ত করে তা তখনই অনন্তকালীন যখন চিন্তা করেন যিনি তিনি অনন্তকালীন (ক)। আপাতত আমি সেই জেলের হয়ে আমার নিজস্ব একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব যতক্ষণ না আমরা দেখি তিনি নিজের সরলতার বিষয়ে কেমন পক্ষসমর্থন করেন। বাণীর প্রকৃতি এটাই যে, প্রথমত বাণী হলো এমন বিষয় যা হতে পারে, পরে সেই বাণী অতীত ঘটনা হয়ে যায়; বাণীটা ততক্ষণ মাত্র রয়েছে যতক্ষণ সেই বাণী শ্রুত। তবে আমরা কেমন করে ‘আদিতে ছিলেন বাণী’ বলতে পারি যখন একটা বাণী পূর্বেও ছিল না, উচ্চারিত হবার পরেও আর থাকে না? এমনটাও কি বলা যেতে পারে যে, এমন একটা ক্ষণ রয়েছে যখন একটা বাণী বিরাজ করে? বক্তার মুখে যে বাণী, তা যে উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত অস্তিত্বপ্রাপ্ত নয় ও উচ্চারিত হওয়া মাত্রই যে বিনষ্ট হয়, তা শুধু নয়, কিন্তু উচ্চারণ ক্ষণেও বাণীর প্রথম অক্ষরের স্বর থেকে এমন পরিবর্তন শুরু হয় যা শেষ অক্ষরের স্বর উচ্চারিত হলে সমাপ্ত হয়। বহুজনের মধ্যে সাধারণ একজন হিসাবে এটি হলো আমার অভিমত। কিন্তু এবিষয়ে তোমার বিবাদি সেই জেলের নিজস্ব উত্তর আছে। তিনি সর্বপ্রথমে তোমার অমনোযোগিতার জন্য তোমাকে ভৎসনা করবেন। কেননা অনতিদূর শ্রোতা যে তুমি যদিও ‘আদিতে ছিলেন বাণী’ এই প্রথম উক্তি ধরতে অক্ষম হয়ে থাক, তবে পরবর্তী অংশ তথা ‘বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে’ বাক্য সম্পর্কে কেন অভিযোগ তোল? তুমি যা শুনেছিলে তা কি ‘বাণী ছিলেন ঈশ্বরের মধ্যে’? অর্থাৎ বচনটা কি কোন গভীর ভাষণের উক্তি ছিল? অথবা ব্যাপারটা এমনটা হল যে তোমার অমার্জিত ভাষা ‘মধ্যে’ ও ‘সঙ্গে’ এর মধ্যে পার্থক্য মানে না? ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আদিতে যিনি ছিলেন তিনি অন্যজনের ‘মধ্যে’ নয়, ‘সঙ্গেই’ ছিলেন। আমি কিন্তু আপাতত বাক্যের প্রথম শব্দগুলো ভিত্তি করে তর্ক করব না; পরবর্তীতে যা আসে তা নিজের ব্যাপার নিজেই ভাববে। তবে সেই বাণীর ভূমিকা ও নাম শোন: ‘এবং বাণী ছিলেন ঈশ্বর’। এতে কণ্ঠস্বর ও চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি স্তব্ধ হয়। সেই বাণী একটা স্বর নয় বরং একটা বাস্তবতা; একটা বক্তব্য নয় বরং একটা সত্তা; নির্জীব একটা কিছু নয় বরং স্বয়ং ঈশ্বর।

১৬। কিন্তু তেমনটা বলায় আমি কাঁপি, বক্তব্যের সাহস আমাকে স্তব্ধ করে দেয়। আমি শুনছি, ‘এবং বাণী ছিলেন ঈশ্বর’, হ্যাঁ, সেই ঈশ্বর যাঁর বিষয়ে নবীরা শিখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর এক। হে জেলে আমার, ভাবী আতঙ্ক থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য এই মহৎ রহস্য বিষয়ে পূর্ণতর শিক্ষা প্রদান কর। এমনটা দেখাও যে এসমস্ত উক্তি ঈশ্বরের ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, দেখাও যে সেই উক্তিগুলোতে ঈশ্বরনিন্দাজনক বলতে কিছুই নেই, অসার অপব্যখ্যাও নেই, অনন্ততা বিষয়ে কোন অস্বীকৃতিও নেই। তিনি বলে চলেন, ‘আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে’। এই ‘আদিতে তিনি ছিলেন’ উক্তিটা কালের সীমাবদ্ধতা সরিয়ে দেয়, এবং ‘ঈশ্বর’ শব্দটা এমনটা দেখায় যে, তিনি একটা কণ্ঠস্বরের তুলনায় অনেক বেশি; এবং তিনি যে ‘ঈশ্বরের কাছে’, তা প্রমাণ করে যে তিনি কিছুই দখল করেন না, তাঁকেও দখল করা হয় না, কেননা তাঁকে অন্য একজনের মধ্যে কবলিত হয় না; এবং তাঁর বিষয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, তিনি সেই একমাত্র অজনিত ঈশ্বরের কাছে বর্তমান যাঁর থেকে তিনি অনন্য ও একমাত্র জনিত ঈশ্বর বলে উদ্ভূত।

১৭। হে জেলে, আমরা এখনও বাণী সংক্রান্ত তোমার পূর্ণ বর্ণনার অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আদিতে ছিলেন, কিন্তু এমনটাও বলা যেতে পারত যে, হয় তো তিনি আদির পূর্বে ছিলেন না। এবিষয়েও আমি আমার জেলের হয়ে কিছুটা উপস্থাপন করব। যিনি ছিলেন, তিনি না হয়ে পারতেন না; সেই ‘ছিলেন’ এমন যা শর্তহীন ও সীমাহীন। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে জেলে কী বলেন? ‘সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’ (ক)। তাই, বিশ্ব যাঁর দ্বারা হতে লাগল, তাঁকে ব্যতীত যখন কিছু নেই, তখন সবকিছুর প্রণেতা যে তিনি, সেই তিনি অবশ্যই অপরিমেয় অস্তিত্বের অধিকারী। কেননা কাল স্থানে নয়, সময়কালেই সম্প্রসারণের উপলব্ধিযোগ্য ও বিভাজ্য মাপকাঠি। আর যখন সবকিছু তাঁর থেকে হয় ও কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি, তখন কালও তাঁর সৃষ্টি।

১৮। কিন্তু, হে আমার জেলে, এব্যাপারে এমন অভিযোগ তোলা হবে যে, তুমি অবিবেচক ও বাহ্যবিচারহীন, এবং এমনটাও বলা হবে যে, ‘সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’ বাক্যটা নির্দিষ্ট নয়। আছেন সেই অজনিতজন যিনি কারও দ্বারা হননি; সেই পুত্রও আছেন যিনি সঞ্জাত নন এমন একজন দ্বারা জনিত। এই ‘সবই’ শব্দটা ব্যতিক্রম মানে

না এমন কথা, যা অসতর্কই একটা শব্দ। কিন্তু আমরা উত্তর দিতে সাহস না করে বা কোন জবাব সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে নীরব থাকতেই তুমি হঠাৎ করে বলে চল, ‘কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি’ (ক)। তুমি এমনটা ঘোষণা ক’রে যে তাঁর সঙ্গী একজন আছেন, ঈশ্বরত্বের প্রণেতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছ। তাই, ‘কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি’ তোমার এই উক্তি থেকে আমি এটা শিখি যে, তিনি একা ছিলেন না। যাঁর দ্বারা সবই হল তিনি এক, যাঁকে ব্যতীত কিছু হয়নি তিনি অন্যজন। এতে ভ্রষ্টা ও সেই সঙ্গীর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপিত।

১৯। অজানিত সেই অনন্যজন যিনি, সেই প্রণেতার প্রতি শ্রদ্ধা আমাকে উদ্বিগ্ন করে, পাছে ‘সবই বাণী দ্বারা হয়েছিল’ তোমার এই ব্যাপক উক্তি অনুসারে তুমি বাণীকেও সেই ‘সবই’-তে অন্তর্ভুক্ত কর। কিন্তু ‘কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি’ বলায় তুমি আমার ভয় দূর করে দিয়েছ। কিন্তু তবু ‘কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি’ বাক্যটা সমস্যা ও মনের অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তবে এমন কিছু ছিল যা সেই অন্যজন দ্বারা হয়েছিল, যদিও একথা সত্য যে, তা ‘তাঁকে ব্যতীত’ হয়নি। তাই সেই অন্যজন যদি কিছু না কিছু করে থাকেন, তাহলে নির্মাণকর্মের সময়ে বাণী উপস্থিত হলেও তবে ‘সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’ বাক্যটা সত্য নয়। নির্মাণ করা এক জিনিস, নির্মাতার কর্মে যোগ দেওয়া আলাদা জিনিস। হে জেলে, অন্যান্য বিষয়ের বৈষম্যে এবার, এক্ষেত্রে, বলার মত আমার কিছু নেই, তোমাকেই উত্তর দিতে হবে, ‘সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’। এবার আমি বুঝতে পেরেছি। কেননা প্রেরিতদূত এই শিক্ষা দিলেন, ‘দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে, যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, সবই’ তারই দ্বারা ও ‘তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে’ (ক)।

২০। তাই, যখন ‘সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’, তখন আমাদের সাহায্যে এসে আমাদের জানিয়ে দাও সেই কিছু যা তাঁকে ব্যতীত বাদে হয়েছিল। ‘তাঁর মধ্যে যা কিছু হয়েছিল, তা জীবন’ (ক)। যা কিছু ‘তাঁর দ্বারা’ হয়েছিল, তা অবশ্যই ‘তাঁকে ব্যতীত’ হয়নি; কেননা যা কিছু তাঁর মধ্যে হয়েছিল, তাও ‘তাঁর দ্বারা’ হয়েছিল। সবই তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল (খ)। সেই সবই তাঁর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, কেননা তিনি ভ্রষ্টা ঈশ্বর বলে জন্ম নিয়েছিলেন। আরও, যা কিছু তাঁর মধ্যে হয়েছিল, তার কোন কিছু তাঁকে

ব্যতীত হয়নি, কারণ যে ঈশ্বর জন্ম নিচ্ছিলেন তিনি ছিলেন জীবন, ও যিনি ছিলেন জীবন, তিনি যে জন্ম নেবার পরে জীবন হলেন তা নয়। কেননা তাঁর মধ্যে এমন কিছু নেই যা জন্ম-ক্ষণে হল, এমন কিছু নেই যা জন্মের ফলে হল। তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম ও বয়স-পরিপক্বতার মধ্যে কোন সময়কাল নেই। যা কিছু তাঁর মধ্যে হয়েছিল তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি, কেননা তিনিই সেই জীবন যে জীবনে সেই সবই হচ্ছিল। তাছাড়া, ঈশ্বরের পুত্র সেই ঈশ্বর যিনি, তিনি জন্ম গ্রহণ করায়ই ঈশ্বর হলেন, জন্মের পরে নয়। জীবনময় থেকে জীবনময় বলে, সত্যকার থেকে সত্যকার বলে, সিদ্ধতাবিশিষ্ট থেকে সিদ্ধতাবিশিষ্ট বলে জন্ম নেওয়ায় তিনি নিজের সমস্ত পরাক্রমের পূর্ণ অধিকার-সম্পন্ন বলে জন্ম নিলেন। তিনি যে পরবর্তীকালেই এমনটা শিখবেন তাঁর জন্ম কি, তা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল না, তিনি বরং ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে জন্ম নিয়েছিলেন বিধায়ই নিজের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেজন্য তিনি হলেন অজনিতজনের একমাত্র জনিতজন; সেজন্য ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ (গ); সেজন্য যখন আমরা পিতা ও পুত্রকে স্বীকার করি তখন একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করি; সেজন্য ‘যে কেউ আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’; সেজন্য ‘যা কিছু পিতার, তা সবই পুত্রকে দিয়েছেন’; সেজন্য ‘পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন’; সেজন্য ‘পুত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না, পুত্র ছাড়া পিতাকেও কেউই জানে না’; সেজন্য ‘তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে’ (ঘ)।

২১। [বাণীর] এই জীবন হলো মানুষের আলো, এই আলো অন্ধকার উদ্ভাসিত করে। সেই যে ‘প্রজন্মের কথা’ সম্পর্কে ইশাইয়া কথা বলেন (ক), সেই প্রজন্মের কথা বর্ণনা ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতায়, আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সেই জেলে একথা যোগ দেন, অন্ধকার তা ধারণ করেনি (খ)। এখানে প্রকৃতিগত যেকোন বস্তুব্য বন্ধ হয়, বলার তার কিছুই থাকে না; তথাপি যে জেলে প্রভুর বুক মাথা সঁপে দিয়েছিলেন, তিনি রহস্যটা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাষা জগতের ভাষা নয়, কেননা তিনি এমন বিষয়ে কথা বলেন যা জগতের নয়। এসো, বিষয়টা জানি, এমনটাই জানি যদি কথাগুলোর সাধারণ অর্থের চেয়ে অধিক শিক্ষণীয় এমন কিছু থাকে যা তাঁর বাণী থেকে বের করতে পারি। আর যে

সত্য আমরা ব্যক্ত করেছি, তা যদি অন্য কথায় উপস্থাপন করা যেতে পারে, তবে তা প্রকাশিত হোক। আর যদি কিছু না থাকে, কেননা অবশ্যই তেমন কিছুই নেই, তাহলে এসো, জেলের শিক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি ও তাঁর বাণীতে ঈশ্বরেরই বাণী উপলব্ধি করি। এসো, পিতা ও পুত্র, সেই অজনিতজন ও সেই একমাত্র জনিতজন সংক্রান্ত সত্যকার স্বীকারোক্তি আরাধনা করি ও আঁকড়িয়ে ধরি, যাঁর মহিমা অনির্বচনীয় সমস্ত বর্ণনা ও উপলব্ধির অতীত। এসো, যোহনের মত প্রভু যিশুর বুকে নিজেদের সঁপে দিই যাতে আমরাও রহস্যটা উপলব্ধি ও প্রচার করতে পারি।

২২। এই বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ সত্য বলে ঘোষণা করে সুসমাচারের অধিকার, প্রেরিতদূতদের শিক্ষা, ও সেই প্রতারণাপূর্ণ আক্রমণের অসারতা যা দিয়ে ভ্রান্তমতপন্থীরা চারদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করে। ভিত্তি তো যত বাতাস, বৃষ্টি ও জলস্রোতের মুখে অবিচল ও অটল থাকে; ঝড় সেই বিশ্বাসকে পরাভূত করতে পারে না, ফোঁটায় ফোঁটায় জলপতনও গর্ত করতে পারে না, বন্যাও তা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। বিশ্বাসের যথার্থতা এতেই প্রমাণিত যখন অসংখ্য আক্রমণ তা দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়। যেমন কোন না কোন প্রতিকার রয়েছে যা এমনভাবে মিশ্রিত যে, সেগুলো একটামাত্র রোগের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত রোগেরই বিরুদ্ধে কার্যকর, ও তেমন প্রতিকারসমূহ সার্বিক উপযোগিতা রাখে, তেমনি কাথলিক বিশ্বাস বিশেষ কোন অসুস্থতার জন্য নয়, সমস্ত পীড়ার জন্যই উপযোগী ঔষধ; রোগের উগ্রতা সেই বিশ্বাসের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে না, সংখ্যাও তাকে পরাজিত করতে পারে না, জটিলতাও তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। এক ও একই বিশ্বাস একটা শত্রুর উপরে ও সকল শত্রুর উপর জয়ী হয়। এটাই বিস্ময়কর যে একমাত্র সূত্রে সমস্ত রোগের জন্য প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত ও সত্য সংক্রান্ত একটা তত্ত্বমালা মিথ্যার সমস্ত ফন্দি-ফিকির মোকাবিলা করে। ভ্রান্তমতপন্থীরা একত্রে সমবেত হোক ও প্রতিটি ভ্রান্তমত এগিয়ে আসুক: তারা এমনটা শুনুক যে, অজনিত এক ঈশ্বর সেই পিতা আছেন ও সিদ্ধতাবিশিষ্ট জনকের সিদ্ধতাবিশিষ্ট এক সন্তান ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত এক পুত্র আছেন; এমনটাও শুনুক যে, পুত্র পিতার ক্ষুদ্রকরণের মাধ্যমে নয় বা তাঁর হাসকরণের মাধ্যমে জনিত হননি, কিন্তু সবকিছুর অধিকারী যিনি, তিনি সবকিছুর অধিকারী পুত্রকে জনিত করলেন; এমন পুত্র যিনি পিতা থেকে

সম্প্রসারিত বা প্রবাহিত নন কিন্তু সবদিক দিয়ে ও সবকিছুতে সেই পিতা থেকে সঞ্জাত, যিনি যা কিছুতে উপস্থিত তাতে অনন্তকালীন ভাবে বর্তমান; এমন পুত্র যিনি কাল থেকে স্বাধীন ও যুগগুলো থেকে মুক্ত, কারণ তাঁর দ্বারা সবই হয়েছে; এমনকি তিনি এমন কোন একটা সৃষ্টবস্তুতে সীমাবদ্ধ হতে পারতেন না যা তাঁর নিজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তেমনটাই সেই কাথলিক ও প্রেরিতিক বিশ্বাস যা সুসমাচার আমাদের শিখিয়েছে ও যা আমরা স্বীকার করি।

২৩। সেই সাবেল্লিউসের সাহস হলে তবে সে-ই এমনটা সমর্থন করুক যে পিতা ও পুত্র একই ব্যক্তি, ও যিনি দু'টো নামে অভিহিত তিনি একমাত্র ব্যক্তি; এবং এইভাবে তার পক্ষে সেই দু'জন একক স্বরূপ না হয়ে বরং একক ব্যক্তিই হোক। সে সুসমাচার থেকে সাথে সাথে শুনুক, একবার বা দু'বার নয়, কিন্তু বারে বারে বহুবার: ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন হয়েছি ^(ক); সে শুনুক, 'পিতা আমার চেয়ে মহান' ^(খ); সে শুনুক, 'আমি পিতার কাছে যাচ্ছি', 'পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি', 'পিতা, আমাকে গৌরবান্বিত কর', ও 'আপনি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র' ^(গ)। সেই হেবিওন সেই বিশ্বাস শুধিয়ে নিতে চেষ্টা করুক যা কুমারীর গর্ভের পূর্বে ঈশ্বরের পুত্রকে কোন জীবন অনুমোদন করে না ও কেবল মাংস হিসাবে তাঁর জীবন শুরু হওয়ার পরে মাত্রই তাঁর মধ্যে বাণী দেখে। সে এসমস্ত বচন আবার পড়ুক, 'পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর', 'আদিতে ছিলেন বাণী: বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর'; আরও, 'সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল'; আরও, 'তিনি জগতে ছিলেন, ও জগৎ তাঁর দ্বারা হয়েছিল, ও জগৎ তাঁকে চেনেনি'। সেই যে প্রচারকেরা যাদের প্রেরিতিক অধিকার নতুন ধরনেরই অধিকার তথা নকল খ্রিষ্টেরই প্রেরিতিক অধিকার, তারা এগিয়ে আসুক ও ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিদ্রূপ ও অপমান বর্ষণ করুক। তাদের এই বচনগুলো শুনতে হবে, 'আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি'; আরও, 'পুত্র পিতার বুকে বিরাজমান'; আরও, 'আমি এবং পিতা, আমরা এক'; আরও, 'আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন' ^(ঘ)। অবশেষে তারা এতে সেইভাবে ঈর্ষান্বিত হলে যেভাবে ইহুদীরা হয়েছিল যে, খ্রিষ্ট পিতাকে নিজের পিতা বলে দাবি করায় নিজেকে তাঁর সমকক্ষ করলেন, তবে

তাদের তা-ই শুনতে হবে যা তিনি সেই ইহুদীদের বলেছিলেন, আমার কাজেই এই বিশ্বাস রাখ যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি (৬)। এইভাবে যা আমাদের একমাত্র অটল ভিত্তি, বিশ্বাসের আমাদের একমাত্র সুখময় শৈল, তা পিতরের মুখে স্বীকৃত হয়েছিল, আপনি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র (৭)। কুটিল চতুরতা বা তিক্ত প্রতারণা যত অভিযোগ দ্বারা সত্যকে আক্রমণ করুক না কেন, পিতরের এই স্বীকারোক্তির উপরে ভর করেই আমরা আমাদের জবাব দাঁড় করাই।

২৪। যা কিছু বাকি রয়েছে, তাতেই পিতার ইচ্ছার ব্যবস্থা প্রকাশিত। সেই কুমারী, সেই জন্ম, সেই দেহ; তারপর সেই ত্রুশ, সেই মৃত্যু, পাতালে অবরোহণ: এসমস্ত বিষয়ই আমাদের পরিভাণ। মানবজাতির খাতিরে ঈশ্বরের পুত্র কুমারী ও পবিত্র আত্মা থেকে জন্ম নিলেন। তেমন প্রক্রিয়ায় তিনি নিজের সেবাকর্ম সম্পাদন করলেন; তাঁর আপন পরাক্রম দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরেরই সেই পরাক্রম দ্বারা যা কুমারীর উপরে ছায়া বিস্তার করেছিলেন তিনি নিজের দেহের সূত্রপাত বুনলেন ও মাংসে আপন জীবনের প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করলেন। তিনি এমনটা করলেন যাতে মানুষ হয়ে কুমারী থেকে মাংসের স্বরূপ নিজেতে ধারণ করেন ও তেমন মিশ্রণ দ্বারা সমস্ত মানবজাতির এক পবিত্রিত দেহ অস্তিত্ব গ্রহণ করতে পারে; যাতে সেইভাবে, যে দেহ তিনি ধারণ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, সেই দেহ দ্বারা যেন সবাই তাঁর মধ্যে আশ্রয় পেতে পারে, ও, অন্যদিকে, তিনিও যেন নিজের যা অদৃশ্য ছিল তা দ্বারা সবার মধ্যে পুনর্গঠিত হতে পারেন। এইভাবে, যে লজ্জা মানবজাতির সূচনা চিহ্নিত করে, ঈশ্বরের অদৃশ্য প্রতিমূর্তি সেই লজ্জা অস্বীকার করেননি, ও গর্ভধারণ, প্রসব, কান্না, দোলনা ও আমাদের স্বরূপের অন্য সকল নিম্নাবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন।

২৫। তেমন প্রসন্নতার জন্য কোন্ যোগ্য প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে? ঈশ্বর থেকে অনির্বচনীয় ভাবে সজ্জাত সেই অনন্য একমাত্র জনিত ঈশ্বর পবিত্রা কুমারীর গর্ভে প্রবেশ করে মানবীয় ক্ষুদ্র দেহখানির রূপ ধারণ করলেন। যিনি বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, যাঁর মধ্যে ও যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়, তিনি মানবীয় প্রসবের নিয়ম অনুসারে আবির্ভূত হন; যাঁর কণ্ঠে মহাদূতগণ ও দূতগণ কম্পিত হন ও স্বর্গ ও পৃথিবী ও এজগতের সমস্ত পদার্থ

বিগলিত হয়, তাঁকে শিশুর কান্নায় শোনা হয়। অদৃশ্যমান ও বোধের অতীত যিনি, যাকে দৃষ্টি ও অনুভূতি ও স্পর্শন পরিমাপ করতে অক্ষম, তাঁকে একটা দোলনায় কাপড়ে জড়ানো হয়েছিল। যে কেউ এসমস্ত কিছু ঈশ্বরের অযোগ্য বলে গণ্য করে, তবে তেমন প্রসন্নতা ঈশ্বরের মহিমাকে যত কম মানায়, সে গৃহীত উপকারের জন্য মহত্তর ঋণে ঋণী বলে নিজেকে স্বীকার করুক। যাঁর দ্বারা মানুষ হয়েছিল, তেমন মানুষ হওয়ায় লাভ করার মত তাঁর কিছুই ছিল না, আমরাই এতে লাভবান হয়েছি যে, ঈশ্বর মাংস হলেন ও আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, অর্থাৎ তিনি একজনের মাংস নিজেতে ধারণ করায় সকল মাংসকে নিজের বাসস্থান করলেন। তাঁর নমিত হওয়াটা হলো আমাদের উন্নত মর্যাদা, তাঁর প্রতি যে অপবাদ, তা হলো আমাদের সম্মান। ঈশ্বর হয়ে তিনি মাংসকে নিজের আবাস করলেন, অপরদিকে আমরা মাংস থেকে ঈশ্বরে পুনরায় নবীকৃত হলাম।

২৬। কিন্তু দৈবাৎক্রমে পাছে কার না কার খুঁতখুঁতে মন সেই দোলনা ও কান্না দ্বারা এবং সেই জন্ম ও গর্ভধারণ দ্বারা আটকিয়ে পড়ে, সেজন্য সেই সবকিছু যা ধারণ করে, সেই সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে মর্যাদা আরোপ করা উচিত, যাতে আমরা তাঁর আত্মঅবমাননার কাছে এমন মনোভাবের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারি যা তাঁর রাজত্ব করার দাবিতে পূর্ণ, ও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষেত্রে যেন তাঁর মর্যাদার কথা না ভুলে যাই। তাই এসো, একটু দেখি তাঁর গর্ভধারণের সময়ে কে কে পরিচর্যা করেছিল। এক স্বর্গদূত জাখারিয়ার কাছে কথা বলেন; বন্ধ্যাকে উর্বরতা প্রদান করা হয়; যাজক ধূপ-স্থান থেকে বোবা অবস্থায় বের হন; যোহন তখনও মাতৃগর্ভে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতেই নিজের কণ্ঠ ধ্বনিত করেন, এক দূত মারীয়াকে আশীর্বাদ করেন ও এমন প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি কুমারী অবস্থায় ঈশ্বরের পুত্রের মা হবেন। নিজের কুমারীত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে তিনি তেমন কঠিন ব্যাপারে কম্পান্বিত হন; সেই দূত তাঁকে ঈশ্বরের মহাকর্মের কথা এই বলে ব্যাখ্যা করেন, ‘পবিত্র আত্মা তোমার উপর নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে’ (ক)। উর্ধ্ব থেকে নেমে এসে পবিত্র আত্মা কুমারীর গর্ভ পবিত্রিত করলেন ও সেই গর্ভে ফুঁ দিয়ে (কেননা আত্মা যদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায় (খ)) মানুষের মাংসময় স্বরূপের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন এবং শক্তি ও পরাক্রম দ্বারা তেমন বিদেশী স্থান অধিকার করলেন (গ)। এবং পাছে মানব দেহের দুর্বলতার

কারণে কোন ব্যর্থতা না দেখা দেয়, সেজন্য পরাৎপরের পরাক্রম কুমারীর উপরে নিজের ছায়া বিস্তার করল ও সেইভাবে কেমন যেন তাঁর চারদিকে একটা মেঘ ছড়িয়ে তাঁর দুর্বলতায় শক্তি সঞ্চার করল, যেন সেই ছায়া তথা ঈশ্বরের শক্তি আত্মার প্রজনন-পরাক্রম গ্রহণ করার জন্য তাঁর দেহকে বলবান করে তুলতে পারে। এটিই গর্ভধারণের মর্যাদা।

২৭। এবার এসো, পরবর্তী সেই প্রসব, কান্না ও দোলনার মর্যাদা দেখি। এক দূত যোসেফকে বলেন, কুমারী প্রসব করবেন ও যে পুত্র জন্ম নেবেন লোকে তাঁকে ইমানুয়েল তথা ‘আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর’ বলে ডাকবে। আত্মা নবীদের মধ্য দিয়ে সেই বিষয় পূর্বঘোষণা করেন ও সেই দূত সেবিষয়ে সাক্ষ্য দেন: যিনি জন্ম নেন তিনি আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। নবীন তারার আলো পণ্ডিতদের জন্য আকাশ থেকে দীপ্তি ছড়ায়, স্বর্গীয় চিহ্ন স্বর্গের প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলে। এক দূত রাখালদের এমন সংবাদ দেন যে বিশ্বত্রাতা সেই খ্রিষ্ট প্রভু জন্ম নিয়েছেন। বহুসংখ্যক স্বর্গীয় দূতবাহিনীর দল সেই শিশুর জন্মের স্তুতিগান করতে সমবেত হয়; সেই দিব্য সজ্জের আনন্দ মহাকর্মের সিদ্ধি ঘোষণা করে। তারপর ‘স্বর্গে ঈশ্বরের গৌরব’ ও ‘মর্তে সদীচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি’ (ক) প্রচারিত হয়। এবার পণ্ডিতেরা আসেন ও কাপড়ে জড়ানো শিশুকে আরাধনা করেন; অসার জ্ঞান সংক্রান্ত নিগূঢ় অনুষ্ঠানরীতি পালনে সারা জীবন কাটাবার পর তাঁরা দোলনায় শোয়ানো শিশুর সামনে হাঁটুপাত করেন; এইভাবে দোলনার নিম্নতা সেই পণ্ডিতদের দ্বারা আরাধনা করা হয়; শিশুর কান্না স্বর্গদূতদের স্বর্গীয় আনন্দ দ্বারা সম্মান গ্রহণ করে; নবীর দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করেন যিনি, সেই আত্মা, তিনি, সংবাদদানকারী সেই দূত, নবীন তারার আলো, সবাই মিলে শিশুর পরিচর্যা করেন। এইভাবে পবিত্র আত্মার নেমে আসাটা ও পরাৎপরের পরাক্রমের ছায়া-বিস্তার সেই জন্মের সূচনা ঘটিয়েছিল। যা উপলব্ধি করা হয় তা এক জিনিস, যা দেখা হয় তা অন্য জিনিস; চোখ একটা জিনিস দেখে, প্রাণ অন্য জিনিস দেখে। কুমারী প্রসব করেন: যাকে প্রসব করা হয় তিনি ঈশ্বর। শিশু কেঁদে ওঠেন: সেই দূতদের কণ্ঠ শোনা যায় যারা প্রশংসাগান করেন। সেই কাপড় ময়লা হয়: ঈশ্বরকে আরাধনা করা হয়। তাই তিনি মাংসের নিম্নতা ধারণ করতে করতে ঐশপ্রভাবের মর্যাদা আদৌ হ্রাস পায় না।

২৮। তেমনটাও হল তাঁর বাকি জীবনকাল ধরে। বাস্তবিকই তিনি মানব আকারে যত সময় কাটালেন, সেই সমস্ত সময় ধরে ঈশ্বরের কাজ পূরণ করে চললেন। প্রতিটি কাজ বর্ণনা করার মত সময় নেই, তথাপি এটাই বলা যথেষ্ট হোক যে, তিনি যে নানা ধরনের পরাক্রম-কর্ম ও নিরাময়-কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেই সবকিছুতে সুস্পষ্ট বিষয় এটাই যে, তিনি মাংসধারণে মানুষ, কিন্তু কর্মসাধনে ঈশ্বর বলে প্রকাশিত।

২৯। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে নীরব থাকাও উচিত নয়, কথা বলাও দরকার নেই; কিন্তু যারা কোন কারণেই এবিষয়ে অজ্ঞ, তাদের খাতিরে আমাদের চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। তাঁর বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই, যেহেতু তাঁর বিষয়ে এটা স্বীকার করতে হয় যে তিনি পিতা ও পুত্র থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন। আমার দিক দিয়ে আমি মনে করি যে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা সঠিক নয়। তিনি তো আছেন যেহেতু [ঈশ্বর দ্বারা] তাঁকে দান করা হয়েছে, [আমাদের দ্বারা] গ্রহণ করা হয়েছে, এখনও [আমাদের দ্বারা] ধরে রাখা হয়; আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সংযুক্ত, ও পিতা ও পুত্রকে সত্যকার স্বীকৃতি থেকে বিযুক্ত করা সম্ভব নয়; পুরো বিশ্বাসের একটা অংশ বাদ দিলে পুরোটাই অপূর্ণ হয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তের অর্থ কি, তবে সে ও আমরা প্রেরিতদূতের এই বাণী পাঠ করে থাকি, ‘কেমনা তোমরা ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, ‘আব্বা, পিতা’ (ক)। আরও, ‘যাঁর মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না’ (খ); আরও, ‘কিন্তু আমরা এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি’ (গ); আরও, ‘তোমরা কিন্তু মাংসে নয়, আত্মায়ই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু খ্রিস্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিস্টের নয়’ (ঘ); আরও, ‘আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিস্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন’ (ঙ)। তাই যেহেতু তিনি আছেন, তাঁকে দান করা হয়েছে ও এখনও ধরে রাখা হয়, ও তিনি ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত, সেজন্য

সেই ঈশ্বরনিন্দুকদের কথা বন্ধ হোক। যখন তারা জিজ্ঞাসা করে, কার দ্বারা তিনি আছেন? কোন্ লক্ষ্যে তিনি আছেন? তাঁর স্বরূপ কী ধরনের? তখন আমরা উত্তরে বলি যে, তিনি তাঁর দ্বারা আছেন যাঁর দ্বারা ও যাঁর থেকে সবই আছে, ও তিনিই ঈশ্বরের সেই আত্মা যিনি বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের দান। আমাদের উত্তরে যদি সেই লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়, তবে সেই প্রেরিতদূতেরা ও নবীরাও অসন্তুষ্ট হবেন যাঁরা তাঁর বিষয়ে ঠিক সেইভাবে কথা বলেছিলেন যেইভাবে আমরা বলেছি। তাছাড়া, সেই উত্তরে পিতা ও পুত্রও অসন্তুষ্ট হবেন।

৩০। আমার বিবেচনায় যে কারণে কোন না কোন মানুষ অজ্ঞতায় থাকে ও সন্দেহ পোষণ করতে থাকে, সেই কারণ এটা হলো যে, তারা এমনটা লক্ষ্য করে যে, এই যে তৃতীয় নাম অর্থাৎ যে নামটা পবিত্র আত্মা বলে অভিহিত, সেই নাম প্রায়ই পিতা ও পুত্রকে ইঙ্গিত করে। এক্ষেত্রে কোন আপত্তি তোলা দরকার হয় না; কেননা পিতা হোন বা পুত্র হোন, উভয়ই আত্মা ও পবিত্র।

৩১। কিন্তু সুসমাচারে যা পাঠ করা হয় তথা, ‘কারণ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’ (ক), সেই শব্দগুলো অর্থ ও লক্ষ্য ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পরীক্ষার যোগ্য। কেননা প্রতিটি উক্তির পূর্ববর্তী একটা কারণ রয়েছে ও একটা লক্ষ্যও রয়েছে যা উক্তির অর্থ অনুযায়ী উপলব্ধি করা দরকার পাছে ‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’ উক্তির জোরে আমরা পবিত্র আত্মার নাম শুধু নয়, তাঁর কর্মকাণ্ড ও তিনি নিজে যে দান, তাও অস্বীকার করি। একদিন প্রভু সামারীয় এক নারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, কারণ তিনি মানবজাতির দ্রাণকর্তা হবার জন্যই এসেছিলেন। জীবনময় জলের বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে কথা বলার পর, সেই নারীর পাঁচটা স্বামীর কথাও উল্লেখ করার পর, ও সেই লোকের কথাও উল্লেখ করার পর যে নারীর স্বামী নয়, সেই নারী উত্তরে বলেছিল, প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, আর আপনারা কিনা বলে থাকেন, উপাসনা করার স্থান যেরুশালেমেই আছে (খ)। তাতে প্রভু উত্তরে বলেছিলেন, নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুশালেমেও নয়। তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা

করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে। কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়; কারণ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ (গ)। দেখা যাচ্ছে, তার মন পরম্পরাগত ঐতিহ্যে পূর্ণ হওয়ায় সেই নারী মনে করছিল, ঈশ্বরকে হয়, সামারিয়ায় যেমন, একটা পর্বতে, না হয়, যেরুশালেমে যেমন, একটা মন্দিরে আরাধনা করতে হবে (ঘ); কেননা বিধানের প্রতি অবাধ্য হয়ে সামারিয়া উপাসনার জন্য পর্বতের উপরে স্থিত একটা স্থান বেছে নিয়েছিল, অপরদিকে ইহুদীরা শলোমনের স্থাপিত মন্দিরকেই নিজেদের ধর্মের আবাস বলে গণ্য করত; এবং উভয় দলের তেমন অনুমান একটা পর্বতচূড়ায় বা একটা ঘরের খিলালে সেই ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করছিল যিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন ও যাঁর বাইরে কিছু নেই। অতএব, যেহেতু ঈশ্বর অদৃশ্যমান, বোধের অতীত, অপরিমেয়, সেজন্য প্রভু এমনটা বললেন যে, সেই সময় এসেছিল যখন ঈশ্বরকে পর্বতেও নয় মন্দিরেও নয় উপাসনা করতে হবে। কেননা আত্মাকে সীমাবদ্ধ বা গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না; তিনি সর্বস্থানে ও সর্বকালে বর্তমান, ও সমস্ত অবস্থা-পরিস্থিতিতে নিজের পূর্ণতায় বর্তমান। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, তারাই প্রকৃত উপাসক, যারা আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করে। এবং যারা আত্মার শরণে আত্মা-ঈশ্বরকে উপাসনা করবে, তারা তেমন উপাসনাকর্মের খাতিরে একজনকে, তেমন শ্রদ্ধা নিবেদনের খাতিরে অন্যজনকে পাবে। কেননা সেই দু'জনের এক একজন উপাসকের সঙ্গে ভিন্ন সম্পর্ক রাখে। ‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’ উক্তিটা পবিত্র আত্মাকে নাম-বঞ্চিতও করে না, তিনি যে আমাদের কাছে দান, তাও অস্বীকার করে না। যে নারী ঈশ্বরকে পর্বতে বা মন্দিরে সঙ্কুচিত করত, তাকে এমনটা বলা হয়েছিল যে সবকিছু ঈশ্বরে রয়েছে ও ঈশ্বর নিজেতে রয়েছেন; এবং অদৃশ্যমান ও বোধের অতীত যিনি, তাঁকে অদৃশ্য ও বোধের অতীত উপায়েই উপাসনা করা দরকার। সেই দান ও সম্মান যে কী ধরনের, তা তখনই স্পষ্টভাবে দেখানো হলো যখন খ্রিষ্ট এমনটা শেখালেন যে, আত্মা হওয়ায় ঈশ্বরকে আত্মার শরণে উপাসনা করা দরকার, এবং এমনটা প্রকাশ

করলেন আত্মার শরণে আত্মা-ঈশ্বরকে উপাসনায় উপাসকদের জন্য কেমন স্বাধীনতা ও জ্ঞান সঞ্চিত ও উপাসনার কেমন অসীমতা রয়েছে।

৩২। প্রেরিতদূতের বাণীতে একই বিষয় পরিলক্ষিত, প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা (ক)। নিজের উক্তির অর্থ স্পষ্ট করার জন্য তিনি অস্তিত্বশীল সেই আত্মার মধ্যে ও যাঁর আত্মার যিনি অধিকারী ও অধিকার তাঁরই মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন; কেননা ‘তিনি’ ও ‘তাঁর’ শব্দদ্বয় অর্থে ভিন্ন। তাই যখন তিনি বলেন ‘প্রভুই সেই আত্মা’, তখন তিনি ঈশ্বরের অসীমতা প্রকাশ করেন; যখন ‘যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা’ উক্তিটা যোগ করেন, তখন তিনি তাঁরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যিনি ঈশ্বরেরই, কেননা তিনিই ‘প্রভুর আত্মা’, ও ‘যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা’। প্রেরিতদূত তাঁর নিজের বক্তব্যের খাতিরে নয়, কিন্তু বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্যই তেমন কথা উচ্চারণ করেন। কেননা পবিত্র আত্মা সর্বস্থানে এক: তিনি সকল পিতৃকুলপতিদের ও নবীদের ও বিধানের গোটা সঙ্ঘকে আলোকিত করছিলেন, মাতৃগর্ভে থাকতেই সেই যোহনকে উদ্দীপিত করছিলেন ও প্রেরিতদূতদের ও অন্যান্য বিশ্বাসীদের কাছে প্রদত্ত হচ্ছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের কাছে ন্যস্ত সত্য চিনে নিতে পারেন।

৩৩। আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ কী, এসো, প্রভুর নিজের বাণী থেকে তা শুনি। তিনি বলেন, ‘তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না’ (ক); কেননা ‘আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি যদি যাই, তাহলে আমি সেই সহায়ক তোমাদের কাছে পাঠাব’ (খ); আরও, ‘আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি সত্যের আত্মা’ (গ); ‘তিনি পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন’ (ঘ)। এই সমস্ত কথা বলা হয়েছিল

যাতে এমনটা দেখানো হয় যে বহুজন [স্বর্গরাজ্যে] প্রবেশ করবে, এবং ব্যক্ত করে সেই দাতার সদৃশতা ও সেই দানের উদ্দেশ্য ও শর্ত। অর্থাৎ কিনা, যেহেতু আমাদের দুর্বলতা পিতা ও পুত্রকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়, সেজন্য পবিত্র আত্মার দান ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে একপ্রকার বন্ধন স্থাপন ক’রে ঈশ্বরের মাংসধারণ কঠিন রহস্য বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস আলোকিত করে।

৩৪। আমাদের পরবর্তী ধাপ হলো এই দানের পরাক্রম ও ভূমিকা বিষয়ে প্রেরিতদূতের বাণী শোনা। তিনি বলেন, কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা ‘আব্বা, পিতা!’ বলে ডেকে উঠি (ক); আরও, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে বলতে কেউ বলে না ‘যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু’, এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না ‘যিশু প্রভু’ (খ); আরও, বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক। কিন্তু প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন করেন (গ)। এই উক্তিতে আমরা সেই দানের লক্ষ্য ও ফলাফলের সূক্ষ্ম বিবৃতি পাই; এবং তাঁর উৎপত্তি, তাঁর কর্মক্রিয়া ও তাঁর পরাক্রম সংক্রান্ত তেমন বর্ণনার পর আমি বুঝি না এক্ষেত্রে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে।

৩৫। সুতরাং এসো, তেমন মহৎ দান ব্যবহার করি, ও তেমন অতি প্রয়োজনীয় দান বিষয়ে অভিজ্ঞতা করতে সচেষ্ট থাকি। কেননা উপরে উল্লিখিত কথায় প্রেরিতদূত

বলেন, আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি (ক)। তাই জ্ঞানলাভের লক্ষ্যেই তাঁকে মঞ্জুর করা হয়। মানব দেহের কর্মশক্তিগুলো অনুশীলন করা না হলে সেগুলো নিষ্কর্মা হত। আলো বা দিন যদি না থাকত, তবে চোখ নিজের কর্মক্রিয়া পূরণ করতে পারত না; কণ্ঠ বা শব্দের অনুপস্থিতিতে কান নিজের কর্মক্রিয়া সম্পর্কে কিছুই জানত না; কোন গন্ধ ঘ্রাণ না করলে নাসারন্ধ্র দু'টোও নিজেদের কর্মক্রিয়া বিষয়ে অজ্ঞ হত। এবং তেমনটা প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ কারণজনিত ত্রুটির জন্য হত না, কিন্তু এজন্যই হত যে, ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার বাহ্যিক কারণের উপস্থিতিতেই সম্ভব হয়। তেমনি ঘটে মানবাত্মার বেলায়: বিশ্বাসগুণে সে যদি সেই দান তথা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে না থাকে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তার একপ্রকার জ্ঞান থাকবেই বটে, কিন্তু জ্ঞানের আলোই তার থাকবে না। খ্রিষ্টে যে দান, তা এক, তবু সেই দান অর্পিত ও সম্পূর্ণরূপেই অর্পিত; তা কারও কাছে অস্বীকৃত নয়, ও প্রত্যেকজনের চাহিদা অনুসারেই তা দেওয়া হয়; প্রত্যেকজনের স্বেচ্ছাকৃত যোগ্যতা অনুসারেই তা মানুষের অন্তরে বাস করে। এ দান জগতের সমাপ্তি পর্যন্তই আমাদের সঙ্গে থাকে, এ দান হল আমাদের প্রত্যাশার সন্তুনা, এ দান হল ভাবীকালের মঙ্গলদানগুলির পূর্ণতার অগ্রিমদান, এ দান হল আমাদের মনের আলো, আমাদের অন্তরের প্রভা। তেমন পবিত্র আত্মাকেই আমাদের অন্বেষণ ও অর্জন করতে হয়, তারপর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির প্রতি বাধ্যতা দ্বারা তাঁকে ধরে রাখতে হয়।

১ (ক) মথি ২৮:২৯-২০ লাতিন পাঠ্য।

(খ) 'তেমন পূর্ণতায় রয়েছে: সেই অনন্তজনে অসীমতা, সেই প্রতিমূর্তিতে সত্যকার রূপ; সেই দানে উপভোগ': সাধু হিলারিউসের ঐশ্বরিক সংক্রান্ত এই সংজ্ঞার অর্থ এ: ঈশ্বর যে মানুষের জানার অতীত, তা সেই পিতাতে রয়েছে যিনি অনাদি; ঈশ্বর যে মানুষের উপলব্ধির অতীত, তা সেই পুত্রে রয়েছে যিনি পিতার প্রতিমূর্তি; এবং ঈশ্বরের জ্ঞান সেই পবিত্র আত্মায় রয়েছে যিনি বিশ্বাসের দান।

৩ (ক) পবিত্র শাস্ত্রে কোন ভ্রান্তমত নেই, কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীরা শাস্ত্রের বাণী জুড়ে ব্যাপ্ত সত্যের বদলে নিজেদের অভিমত উপস্থাপন করে শাস্ত্রের প্রকৃত বাণী বিকৃত করে।

৪ (ক) যারা পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করত, আরিউসপন্থীদের কথা বাদে কনস্টান্তিনোপলিসের বিশপ মাকিদনিউস (৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ) এর পন্থীরা উল্লেখযোগ্য যারা মাকিদনীয় বলে পরিচিত। তারা বাণীর ঈশ্বরত্ব মেনে নিত কিন্তু পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত। এজন্য তারা ‘প্লেউমাতোমাখী’ (অর্থাৎ আত্মার বিরোধী) বলেও পরিচিত।

(খ) এখানে মার্কিওন-পন্থীদের নির্দেশ করা হলো : মার্কিওন ছিল ২য় শতাব্দীর একজন গ্রীক-জ্ঞানমার্গপন্থী। তারা তিনটে মূলধারণা সমর্থন করত : মঙ্গলময় এক ঈশ্বর ; ‘দেমিউর্গস’ [অর্থাৎ নির্মাতা বা স্রষ্টা] নামক এক আত্মা যিনি ঈশ্বরের নিম্নতর কিন্তু প্রভাবশালী ও ন্যায়বান ; আরও, তাদের মতে জড়পদার্থ স্বভাবতই অমঙ্গলকর। এ ভ্রান্তমতপন্থীরা পুরাতন ও নূতন নিয়মের সমস্ত পুস্তক অস্বীকার করত ; সাধু পলের শুধু কয়েকটা পত্র ও তাদের নিজস্ব একটা সুসমাচার মানত।

৬ (ক) মথি ১১:২৭ লাতিন পাঠ্য।

৮ (ক) মথি ৩:১৭।

(খ) যোহন ১০:৩৮।

(গ) যোহন ১৪:৯।

(ঘ) যোহন ৫:২৬।

(ঙ) যোহন ১৬:১৫; ১৭:১০।

(চ) কল ২:৯।

১০ (ক) যোহন ১৪:২৮; ১০:৩০; ১৪:৯; ১৬:২৮; ১০:৩৮; ১:১৮; ১৬:১৫ দ্রঃ; ৫:২৬।

(খ) ইসা ৫৩:৮ লাতিন পাঠ্য।

(গ) মথি ১১:২৭ লাতিন পাঠ্য।

১১ (ক) যোহন ৫:২৬।

১২ (ক) ১ করি ১:২০।

১৩ (ক) যোহন ১:১।

(খ) আদি ১:১ লাতিন পাঠ্য।

১৪ (ক) অর্থাৎ, বাণী একাকী ও স্বতন্ত্র হলে তবে এটা দাঁড়ায়, তিনি জনিত নন।

(খ) যোহন ১:১।

১৫ (ক) সাধু হিলারিউস সেই ‘হেবিওন-পন্থীদের’ দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যারা এ ভ্রান্তমত সমর্থন করত যে, বাণী হলেন পিতার সেই উচ্চারিত বাণী যা দ্বারা পিতার অনন্তকালীন সঙ্কল্প প্রকাশিত।

১৭ (ক) যোহন ১:৩।

১৮ (ক) যোহন ১:৩।

১৯ (ক) কল ১:১৬।

২০ (ক) যোহন ১:৪ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) কল ১:১৬ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১০:৩০।

(ঘ) যোহন ১৪:৯; ১৬:১৫ দ্রঃ; ৫:২৬; মথি ১১:২৭ লাতিন পাঠ্য; কল ২:৯।

২১ (ক) ইশা ৫৩:৮।

(খ) যোহন ১:৫।

২৩ (ক) মথি ১৭:৫ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ১৪:২৮।

(গ) যোহন ১৪:১২; ১১:৪১; ১৭:৫; মথি ১৬:১৬।

(ঘ) যোহন ১৭:৫; ১:১; ১:৩; ১৬:২৮; ১:১৮; ১০:৩০; ১৪:১১।

(ঙ) যোহন ১০:৩৮ দ্রঃ।

(চ) মথি ১৬:১৬।

২৬ (ক) লুক ১:৩৫।

(খ) যোহন ৩:৮ দ্রঃ।

(গ) সাধু হিলারিউস এখানে যে পবিত্র আত্মার কথা বলছেন তিনি হলেন ঈশ্বরের বাণী। কেননা, যদিও ‘উর্ধ্ব থেকে নেমে এসে পবিত্র আত্মা কুমারীর গর্ভ পবিত্রিত করলেন’ বাক্যটা ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তিকেও লক্ষ্য করতে পারে, তবু পরবর্তীতে যা লেখা আছে তথা ‘মানুষের মাংসময় স্বরূপের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন এবং তাঁর যা পরকীয় ছিল তা তিনি নিজের প্রভাব দ্বারা অধিকার করলেন’, এমন বাক্য কেবল ঈশ্বরের বাণীকেই লক্ষ্য করতে পারে। ‘ফুৎকার’ অর্থ অনুসারে ‘পবিত্র আত্মা’ নামটা অবশ্যই ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তিকে নির্দেশ করে; কিন্তু আত্মিক সত্তা হিসাবে ‘পবিত্র আত্মা’ নামটা গোটা ত্রিত্বকে আরোপণীয়। প্রাচীন

পিতৃগণের মধ্যে অন্যান্য পিতৃগণও দূতের কথা ব্যাখ্যা করেছেন (পালক ৫৮:২; যুস্তিনাস, ২য় পক্ষসমর্থন ১০:১; আথানাসিউস-লিখিত বাণীর মাংসস্বরূপ ধারণ)।

২৭ (ক) লুক ২:১৪ লাতিন পাঠ।

২৯ (ক) গা ৪:৬।

(খ) এফে ৪:৩০ লাতিন পাঠ্য।

(গ) ১ করি ২:১২।

(ঘ) রো ৮:৯ লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) রো ৮:১১।

৩১ (ক) যোহন ৪:২৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ৪:১৯-২০।

(গ) যোহন ৪:২১-২৪ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) সামারীয়রা গারিজিম পর্বতে ও ইহুদীরা যেরুশালেমের মন্দিরে ঈশ্বরকে উপাসনা করত।

৩২ (ক) ২ করি ৩:১৭।

৩৩ (ক) যোহন ১৬:১২।

(খ) যোহন ১৬:৭ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১৬:১৬।

(ঘ) যোহন ১৬:১৩-১৪।

৩৪ (ক) রো ৮:১৪-১৫।

(খ) ১ করি ১২:৩ লাতিন পাঠ্য

(গ) ১ করি ১২:৪-১১।

৩৫ (ক) ১ করি ২:১২।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৩য় পুস্তক

৩য় পুস্তকটা প্রধানত পিতা ও পুত্রের সমসত্তা প্রমাণ করতে অভিপ্রায় করে ; বিষয়টা সাধু যোহনের সুসমাচারের দু'টো বচন দ্বারা প্রমাণিত, তথা, 'আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন' (১৪:১১) ও শেষ ভোজের সময়ে যিশুর দীর্ঘ প্রার্থনা (যোহন ১৭:১-২৬)। সাধু হিলারিউস এটা মেনে নেন যে, একটা বস্তু যে একই সময়ে অন্য একটা বস্তুর ভিতরে ও বাইরে থাকবে, তা বোঝা মানব বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয় ; কিন্তু তিনি এও বলেন যে, মানুষের পক্ষে যা বোধগম্য নয়, তা যে অসম্ভব তা নয়, কেননা যিশুর অলৌকিক কর্মও বোধগম্য ছিল না অথচ সম্ভবই হয়েছিল।

পরবর্তীকালীন ঐশতত্ত্বে এ রহস্য 'περιχώρησις' (পেরিখোরেসিস ; লাতিন ভাষায় 'circumincessio', কির্কুমিন্কেসিও) ধারণা দ্বারা চিহ্নিত ; গ্রীক শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা নিজেদের মধ্যে অবিরত পারস্পরিক ঘোরাঘুরি বা গমনাগমন করে থাকেন ; লাতিন শব্দের অর্থ হলো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার অবিরত পারস্পরিক গমনাগমন। প্রাচীন শব্দ দু'টো এটা তুলে ধরতে অভিপ্রেত যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা অবিরত পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬																

[১] 'আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন' (ক), প্রভুর এই উক্তি আমার মন বিহ্বল করে, ও তেমনটা অস্বাভাবিক নয়, কেননা মানব বুদ্ধি বচনটার যুক্তি বোঝে না। এমনটা অসম্ভব মনে হয় যে, একটা বস্তু একই সময়ে অন্য একটা বস্তুর ভিতরে ও বাইরে থাকবে। যাঁদের বিষয়ে আমরা কথা বলছি, যেহেতু এটাই নিয়ম যে, তাঁরা [তথা পিতা ও পুত্র] পৃথক ভাবে বসবাস না করলেও যে যার পৃথক অস্তিত্ব ও অবস্থা বজায়

রাখেন, সেজন্য এটাও অসম্ভব যে, তাঁরা পারস্পরিক ভাবে এমনভাবে একে অপরকে ধারণ করতে পারবেন যার ফলে একজন অন্যজনকে অবিরতই ধারণ করবেন ও অবিরতই ধারণকৃত হবেন সেই অন্যজন দ্বারা যাঁকে তিনি ধারণ করেন। এ এমন সমস্যা যা মানুষের বুদ্ধি কখনও সমাধান করবে না, মানব অনুসন্ধানও ঐশ্বরিক অস্তিত্বের এই অবস্থার জন্য কখনও সন্তোষজনক উদাহরণ পাবে না। কিন্তু মানুষ যা বুঝতে পারে না, তা ঈশ্বরের কাছে বোধগম্য। আমি এমনটা বলতে চাই না যে, বচনটা ঈশ্বরেরই বচন হওয়ায় তা আমাদের কাছে সাথে সাথে বোধগম্য। তাই আমাদের কর্তব্যই সেই ‘আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’ বচনকে জানা ও বোঝা, তথাপি আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্য এই সত্যকে উপলব্ধির উপরে নির্ভর করে যে, ঐশ্বরিক সত্যমালা ভিত্তিক যুক্তি যুক্তির শেষ সিদ্ধান্তসমূহকে প্রমাণিত করতে পারে, যদিও সেই সিদ্ধান্তসমূহ বিশ্বের নিয়মের পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে।

২। এই অধিক কঠিন সমস্যা সমাধান করার জন্য আগে আমাদের সেই জ্ঞান অর্জন করতে হয় যা ঐশশাস্ত্র পিতা ও পুত্র সম্পর্কে অর্পণ করে, তবেই পরিচিত ও জানা বিষয়ে কথা বলছি যেন, আমরা মহত্তর সূক্ষ্মতার সঙ্গে কথা বলতে পারব। আগেকার পুস্তকে যেইভাবে আলোচনা করেছিলাম, সেই অনুসারে পিতা কাল, স্থান, রূপ ও মানবীয় সমস্ত প্রকার ধারণাকে অতিক্রম করেন। তিনি সবকিছুর বাইরে ও সবকিছুর ভিতরে; তিনি সবকিছু নিজেতে ধারণ করেন কিন্তু কোন কিছু দ্বারা ধারণকৃত হতে পারেন না; তিনি বৃদ্ধি ও হ্রাস জনিত পরিবর্তনের অক্ষম, তিনি অদৃশ্যমান, বোধের অতীত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সিদ্ধতাবিশিষ্ট, সনাতন, কারও কাছ থেকে কিছুই ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁর থেকে আগত কিছু থাকলেও তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে থাকেন।

৩। তাই অজানিত সেই তিনি কালের পূর্বে নিজের জন্য নিজ থেকে একটি পুত্রকে জনিত করলেন; তেমনটা যে তিনি পূর্ব-অস্তিত্বশীল কোন পদার্থ থেকে করলেন তা নয়, কেননা সবকিছু পুত্র দ্বারা হয়; শূন্য থেকেও তা করলেন না, কেননা পুত্র পিতা থেকে হলেন; প্রসবের মধ্য দিয়েও নয়, কেননা ঈশ্বরে পরিবর্তনও নেই, শূন্যতাও নেই; নিজ থেকে কাটা বা দীর্ঘ বা প্রসারিত এমন একটা অংশ হিসাবেও নয়, কেননা ঈশ্বর আবেগসাপেক্ষ

নন ও দেহবিহীন, ও কেবল আবেগবিশিষ্ট ও দেহবিশিষ্ট একটা জীবের সঙ্গেই সেইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারত, এবং, প্রেরিতদূত সেইভাবে বলেন, খ্রিষ্টের মধ্যে ‘ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে’ (ক)। তিনি বোধাতীত ভাবে, অনির্বচনীয় ভাবে, কাল ও যুগগুলোর পূর্বে, নিজেতে যা অজানিত ছিল, তা থেকে সেই একমাত্র জনিতজনকে জনিত করলেন ও ভালবাসা ও পরাক্রম দ্বারা নিজের পূর্ণ ঈশ্বরত্বকে তাঁকে মঞ্জুর করলেন; এবং এইভাবেই তিনি অজানিত, সিদ্ধতাবিশিষ্ট, সনাতন পিতার একমাত্র জনিত, সিদ্ধতাবিশিষ্ট, সনাতন পুত্র। কিন্তু তাঁর ধারণ করা দেহ অনুযায়ী যে গুণাবলির তিনি অধিকারী, তা হলো আমাদের পরিভ্রাণের লক্ষ্যে তাঁর সদীচ্ছার ফল। কেননা ঈশ্বরের পুত্র বলে অদৃশ্যমান, দেহবিহীন ও বোধগম্য নয় হওয়াতে তিনি পদার্থের ও নিম্নতার ততটুকু আপন করে নিলেন, নিজেকে আমাদের উপলব্ধি-শক্তির উপলব্ধ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল। তাতে তিনি যে নিজের বৈশিষ্ট্যসমূহ ছেড়ে দিচ্ছিলেন এমন নয়, তিনি বরং আমাদের দুর্বলতার প্রতি প্রসন্নতাই দেখাচ্ছিলেন।

৪। অতএব, সিদ্ধতাবিশিষ্ট পিতার সিদ্ধতাবিশিষ্ট পুত্র ও অজানিত ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত সন্তান হওয়ায় যিনি তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছেন যিনি সবকিছুর অধিকারী, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আত্মা থেকে আত্মা, আলো থেকে আলো হওয়ায় তিনি ভরসার সঙ্গে বলেন, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি (ক)। কেননা পিতা যেমন আত্মা, তেমনি পুত্রও আত্মা; পিতা যেমন ঈশ্বর, তেমনি পুত্রও ঈশ্বর, পিতা যেমন আলো, তেমনি পুত্রও আলো। তাই পিতাতে যত গুণাবলি বর্তমান, সেগুলো হলো সেই গুণাবলির উৎস যেগুলো পুত্রেও বর্তমান; অর্থাৎ, যিনি সম্পূর্ণরূপে পিতা, সেই পিতা থেকে তিনি জন্ম নেন যিনি সম্পূর্ণরূপে পুত্র; এমন পুত্র যাকে বাইরে থেকে আনা হয়নি, কেননা পুত্রের পূর্বে কিছুই ছিল না; এমন পুত্র যিনি শূন্য থেকে নন, কেননা পুত্র ঈশ্বর থেকে; আংশিক এমন পুত্র নন, কেননা ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা পুত্রে বিরাজিত; নানা দিক দিয়েও পুত্র নন, কিন্তু সবদিক দিয়েই পুত্র; তিনি, প্রতাপের অধিকারী যিনি, তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী পুত্র; তেমনটা কেমন হয়েছে, তাঁকে জনিত করেছেন যিনি, তিনিই মাত্র তা জানেন। যা পিতাতে রয়েছে, তা পুত্রেও রয়েছে; যা সেই অজানিতজনে রয়েছে, তা সেই একমাত্র জনিতজনেও রয়েছে। একজন অন্যজন থেকে, ও সেই দু’জন এক; দু’জন যে

এক হয়েছে তা নয়, কিন্তু একজন সেই অন্যজনে, কেননা যা উভয়ে রয়েছে তা একই। পিতা পুত্রে রয়েছেন, কেননা পুত্র সেই পিতা থেকে; পুত্র পিতাতে রয়েছেন, কেননা পুত্র যা, তা অন্য কোথাও থেকে আগত নয়; একমাত্র জনিতজন অজনিতজনে রয়েছেন, কেননা একমাত্র জনিতজন সেই অজনিতজন থেকে। তাই, পরস্পর ভাবে, এক একজন অন্যজনে রয়েছেন, কেননা অজনিত পিতাতে সবই যেমন সিদ্ধতাবিশিষ্ট, তেমনি একমাত্র জনিতজনে সবই সিদ্ধতাবিশিষ্ট। এটাই সেই ঐক্য যা পুত্রে ও পিতাতে বর্তমান, এটাই সেই পরাক্রম, এটাই সেই ভালবাসা, এটাই সেই প্রত্যাশা, এটাই সেই সত্য, পথ ও জীবন পিতার পরাক্রমকে নিন্দা করবে না, ও তাঁর জন্মের রহস্য ও প্রতাপ দ্বারাও পুত্রের মূল্য হ্রাসীকৃত করবে না। অজনিত পিতাকে কোন কিছু সঙ্গে তুলনা করতে নেই, সেই একমাত্র জনিতজনকে সেই পিতা থেকে কাল বা প্রতাপ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন করতে নেই। পুত্র-ঈশ্বর যে ঈশ্বর থেকে, তা-ই স্বীকার করতে হয়।

৫। তেমন প্রতাপসমূহই ঈশ্বরে রয়েছে; সেই প্রতাপগুলো এমন যা আমাদের উপলব্ধির যুক্তির পক্ষে বোধগম্য নয়; তথাপি তাঁর কর্মকাণ্ডের নিশ্চিত প্রমাণের জোরে বিশ্বাস তা মেনে নেয়। আমরা কেবল আত্মিক বিষয়ে নয়, দেহগত বিষয়েও সেই কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করব; সেই কর্মকাণ্ড তাঁর জন্মের একটা উদাহরণে নয়, কিন্তু উপলব্ধ ঘটনার বিস্ময়েই প্রকাশিত। গালিলেয়ায় সেই বিয়ের দিনে জল আঙুররস হয়েছিল। যা দ্বারা জলের নিঃস্বাদতা বিলীন হল ও আঙুররসের পুরা স্বাদ আবির্ভূত হল, তেমনটা বর্ণনা করার মত আমাদের কি ভাষা বা উপায় আছে? সেটা মিশ্রণ ছিল না, ছিল সৃষ্টি, এমন সৃষ্টি যা নিজ থেকে শুরু হল তা নয়, কিন্তু এমন কিছু যা অন্য কিছুতে রূপান্তরিত। উগ্র পদার্থ যোগ করার ফলে যে দুর্বল একটা তরল পদার্থ হল, তাও নয়; না, অস্তিত্বশীল একটা কিছু গেল ও যা ছিল না, তা হতে লাগল। বর তো উদ্বিগ্ন ছিল, বাড়ির সবাই বিহ্বল ছিল, বিয়ের উৎসবের মিল বিপন্ন ছিল। যিশুর কাছে অনুরোধ রাখা হয়। তিনি যে পায়ে উঠে দাঁড়ান বা ব্যস্ততা দেখান তা নয়; তিনি শান্তশিষ্ট ভাবে কাজটা সম্পাদন করেন। জল জালাগুলোতে ঢালা হয়, আঙুররস পাট্রে তুলে আনা হয়। জল যে ঢেলেছিল, তার দেওয়া প্রমাণ তারই প্রমাণ-বিরুদ্ধ যে আঙুররস তুলে এনেছিল। যারা জল ঢেলেছিল তারা মনে করছিল জল তুলে আনা হবে; যারা তুলে এনেছিল তারা মনে করছিল

আঙুররস ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। জল ঢালা ও আঙুররস তুলে আনা, এ দুইয়ের মধ্যকার সময়কাল এমন কোন ভূমিকা রাখেনি যার ফলে সেই তরল পদার্থের প্রকৃতি জন্মও নিয়েছে ও বিনষ্টও হয়েছে। ঘটনার সামনে দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধি-শক্তি দু'টোই পরাজিত, কিন্তু যা কিছু করা হয়েছে, তাতে ঈশ্বরের পরাক্রম উপলব্ধি করা হয়।

৬। সেই পাঁচখানি যবের রুটির বেলায় একই ধরনের ঘটনা বিস্ময় সৃষ্টি করে। সংখ্যায় রুটির বৃদ্ধিতে পাঁচ হাজার মানুষ ও অসংখ্য জ্বীলোক ও ছেলেমেয়ের ক্ষুধা পরাজিত হয়; ব্যাপারটা যে কেমন ঘটেছে, তা আমাদের দৃষ্টিশক্তি এড়ায়। পাঁচখানা যবের রুটি অর্পণ করা হয় ও ছেঁড়া হয়; প্রেরিতদূতেরা সেই রুটিগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে সেই রুটির নবসৃষ্ট অংশগুলো তাঁদের হাতে পর পর বর্তমান হয় (ক)। যে রুটি তাঁরা ছিঁড়ে দিচ্ছেন, তা কম হয় না, অথচ তাঁদের হাত সেই অংশগুলোতে সবসময় ভরতে থাকে। প্রক্রিয়া এত শীঘ্রই ঘটে যে দৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হয়; তোমার চোখ দিয়ে তুমি অংশগুলোতে ভরা হাত দেখতে পাচ্ছ, ও সেইসঙ্গে এও দেখতে পাচ্ছ যে, অন্য হাতে যা রয়েছে তা হ্রাস পায় না; ও তেমনটা ঘটতে ঘটতে অংশগুলোর টিপি বাড়তে থাকে। যারা ছেঁড়ে তারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, যারা খায় তারাও খেতে ব্যস্ত; ক্ষুধার্তরা তৃপ্তি পায়, ও বাকি টুকরোগুলোতে বারোটা বুড়ি ভরে যায়। চোখ বা উপলব্ধি-শক্তি আবিষ্কার করতে পারে না তেমন লক্ষণীয় আশ্চর্য কাজ কেমন করে সাধিত। যা ছিল না, তা হয়; যা বোঝা যায় না তা দেখা যায়। বাকি শুধু এটাই রয়েছে যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সবই পারেন।

৭। ঈশ্বরের সাধিত অলৌকিক কাজগুলোতে কোন প্রতারণা নেই, খুশি করার বা প্রবঞ্চিত করার গুণ কোন ইচ্ছাও নেই। ঈশ্বরের পুত্রের এই কর্মগুলো আত্মপ্রদর্শনের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়নি; অসংখ্য দূতবাহিনী যাঁর সেবা করেন, তিনি মানুষকে কখনও ভোলান না। আমাদের যা কিছু আছে, যাঁর দ্বারা তা সবই হয়েছিল, সেখানে আমাদের নিজস্ব কীবা ছিল যা তাঁর দরকার ছিল? আমরা যারা এখন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, এখন লালসায় তৃপ্ত, এখন বিপ্লবের ও রক্তপাতের দোষে ভারাক্রান্ত, ও এখন খানাপিনার ফলে মাতাল, যাঁকে মহাদূত, প্রভুত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও পরাক্রম নিদ্রা না গিয়ে অন্য কর্মে

ব্যস্ত না থেকে, অপরাধ না করে সনাতন ও অক্লান্ত কণ্ঠস্বরে প্রশংসা নিবেদন করেন, তিনি কি আমাদের প্রশংসা দাবি করলেন? তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন কারণ অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে তিনি সেই সমস্ত স্বর্গবাহিনীকে নিজেতে সৃষ্টি করলেন, তাঁদের জগৎ নির্মাণ করলেন, যুগগুলোকে রচনা করলেন, জ্যোতিষ্কগুলো যে যার স্থানে বসালেন, পৃথিবী স্থাপন করলেন, অতলের ভিত শক্ত করলেন; হ্যাঁ, তিনিই কালের এক সময়ে জন্ম নিলেন, মৃত্যুকে পরাভূত করলেন, পাতালদ্বার উলটিয়ে দিলেন, নিজের জন্য এমন জনগণকে জয় করলেন যারা তাঁর আপন সহউত্তরাধিকারী হবে, মাংসকে অবক্ষয় থেকে অনন্ততার গৌরবে স্থানান্তর করলেন। সুতরাং, সেসময় এমন কিছু ছিল না যা তিনি আমাদের কাছ থেকে পেয়ে লাভবান হবেন, যা তাঁকে এই সমস্ত রহস্যময় ও অনির্বচনীয় কর্মের মহিমা আপন করে নিতে তাড়না দেবে। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের শঠতা ও নির্বুদ্ধিতার ভুলভ্রান্তি আগে থেকে দেখে, এবং এটাও জেনে যে, অবিশ্বাস ঈশ্বরের নিজেরই বিষয়ে বিচার সম্পাদন করতে দুঃসাহস দেখাবে, সেজন্য তিনি নিজের প্রতাপের নানা ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের স্পর্ধা নিঃশেষ করলেন।

৮। বাস্তবিকই জাগতিক মনা বহু বিবেচক মানুষ রয়েছে যাদের বুদ্ধি ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা, যারা আমাদের প্রচার তথা ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, সত্য থেকে সত্য, সিদ্ধতাবিশিষ্ট থেকে সিদ্ধতাবিশিষ্ট, এক থেকে এক তেমন প্রচার বিষয়ে তর্ক করে কেমন যেন আমরা অসম্ভব বিষয়ে শিক্ষাদান করি। তারা তাদের বিশ্বাসকে এমন কতগুলো সিদ্ধান্তের উপর দাঁড় করায় যা তারা যুক্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করল, যেমন, ‘এক থেকে কিছুই জন্ম নিতে পারে না, কেননা প্রতিটি জন্মের জন্য দু’জন ব্যক্তি দরকার’; আরও, ‘এই পুত্র যদি একজন থেকে জন্ম নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর জনকের একটা অংশ পেয়েছেন: তিনি একটা অংশ হলে তবে সেই দু’জনের একজনও সিদ্ধতাবিশিষ্ট নন, কেননা পুত্র যাঁর থেকে আগত, তিনি সেই পিতা থেকে কিছু না কিছুর অভাবী, এবং যিনি অন্যজনের একটা অংশ হন, তেমন একজনে পূর্ণতা থাকতে পারে না; তাই সেই দু’জনের কেউই সিদ্ধতাবিশিষ্ট নন, কেননা জনক যিনি, তিনি নিজের পূর্ণতা হারিয়েছেন, ও জনিতজন যিনি, তিনি সেই পূর্ণতা পাননি।’ এটা হলো জগতের সেই প্রজ্ঞা যা ঈশ্বর দ্বারা নবীদের সময় থেকেও পূর্বদৃষ্ট হয়েছিল ও সেই নবী দ্বারা এই বচনে নিন্দিত হয়েছিল, আমি

প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা ধ্বংস করব ও বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি প্রত্যাখ্যান করব (ক)। এবং প্রেরিতদূত বলেন, প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিভ্রাণ সাধন করবেন। কেননা ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করে, কিন্তু আমরা এমন ত্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিস্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী (খ)।

৯। সুতরাং, মানবজাতির দায়িত্ব-ভার তাঁরই হাতে ন্যস্ত হওয়ায় ঈশ্বরের পুত্র প্রথমে মানুষ হলেন যাতে মানুষ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে; যাতে আমাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে তিনি আমাদের কাছে ঐশ্বরিক বিষয়ে সাক্ষী হন ও মাংসের দুর্বলতা দ্বারা দুর্বল ও মাংসময় এই আমাদের কাছে পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচার করেন, যাতে করে তিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন; বাস্তবিকই তিনি বলেন, আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে এসেছি (ক)। তিনি নিজে যে তেমনটা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়, বরং তেমনটা করলেন যেন আপন পিতার ইচ্ছার ফলস্বরূপেই নিজের বাধ্যতা প্রকাশ করতে পারতেন, কেননা তাঁর নিজের ইচ্ছা হলো পিতার ইচ্ছা পালন করা। এটা হলো পিতার ইচ্ছা পূরণ করার তাঁর সেই ইচ্ছা যা বিষয়ে তিনি এই কথায় সাক্ষ্যদান করেন, পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, কারণ তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মাংসের উপর অধিকার দিয়েছ। এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে। তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে

গৌরবান্বিত করেছি। পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর। যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি (খ)। তিনি স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত কথায় সেই গোটা কর্মভার প্রকাশ করলেন যার জন্য তাঁকে নিযুক্ত ও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তবু স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত হয়েও সেই কথাগুলো হলো দিয়াবলের কুটিল প্ররোচনার বিরুদ্ধে বিশ্বাসের সত্য রক্ষাস্বরূপ। সুতরাং এসো, প্রতিটি বচনের প্রভাব ব্যক্ত করতে ছুটে চলি।

১০। তিনি বলেন, ‘পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন’। তিনি বলেন, সেই দিন বা সেই সময় নয়, সেই ক্ষণই এসেছে। ক্ষণ হলো দিনের একটা অংশ। এ কোন্ ক্ষণ হবে? অবশ্যই, এটা হলো সেই ক্ষণ যা বিষয়ে তিনি শিষ্যদের সুস্থির করার জন্য যন্ত্রণাভোগের সময়ে কথা বলেছিলেন, মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে (ক)। তাই এটাই সেই ক্ষণ যে ক্ষণে তিনি পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হবার জন্য প্রার্থনা করেন যেন তিনি নিজে পিতাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন। কিন্তু তাঁর কথার অর্থ কি? যিনি গৌরবান্বিত করতে যাচ্ছেন, তিনি কি সেই গৌরব পাবার প্রত্যাশা করছেন? যিনি সম্মান আরোপ করতে যাচ্ছেন, তিনি কি নিজের জন্য সম্মান দাবি করছেন? ও যা তিনি দাবি করছেন, তিনি কি সেই বিষয়ে অভাবী? এখন জগতের সেই জ্ঞানীরা, গ্রীসের সেই প্রজ্ঞাবানেরা ছুটে এসে নিজেদের নকল প্রজ্ঞায় সত্যকে অবজ্ঞা করুক। তারা জিজ্ঞাসা করুক, ‘কেমন করে, কবে, কেন?’ অর যখন তারা কোন উত্তর পায় না, তখন এসো, আমরাই তাদের এ বলি যে, ‘জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য’ (খ)। এজন্যই আমরা আমাদের মূর্খতায় এমন বিষয় বুঝি যা জগতের প্রজ্ঞাবানদের কাছে বোধগম্য নয়। প্রভু বলেছিলেন, ‘পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে’: এতে তিনি যন্ত্রণাভোগের ক্ষণ প্রকাশ করছিলেন, কেননা এই কথাগুলো ঠিক সেই ক্ষণেই উচ্চারিত হয়েছিল; তারপর তিনি একথাও যোগ করে বলেন, ‘তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর’। কিন্তু কেমন করে পুত্রকে গৌরবান্বিত করা হবে? তিনি কুমারী থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, দোলনা ও শিশুকাল থেকে তিনি পরিপক্ব মানুষে বেড়ে উঠেছিলেন; তিনি নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা,

ক্লান্তি ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে মানব জীবন অতিবাহিত করেছিলেন ; এখনও তাঁর উপর থুথু ফেলা হবে, তাঁকে কশাঘাত করা হবে ও ত্রুশে দেওয়া হবে। কিন্তু কেন? এসব কিছু নির্ধারণ করা হয়েছিল যেন আমরা এতে নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি ছিলেন প্রকৃত মানুষ। কিন্তু ত্রুশের লজ্জা তো আমাদের নয় ; আমাদের তো কশাঘাতে দণ্ডিত করা হয় না, থুথুতেও কলুষিত করা হয় না। পিতা পুত্রকে গৌরবান্বিত করেন : কেমন করে? তাঁকে ত্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কী হল? সূর্য অস্ত না গিয়ে পালিয়ে গেল। কেনই বা আমি বলি সূর্য পালিয়ে গেল? সে তো একটা মেঘের পিছনে সরে যায়নি, কিন্তু নিজের কক্ষপথ ত্যাগ করল, ও তার সঙ্গে জগতের সমস্ত পদার্থ খ্রিষ্টের মৃত্যুকে অনুভব করল। তেমন অপরাধের সঙ্গী না হবার জন্য তারানক্ষত্র সেই দৃশ্যের দর্শক না হবার জন্য নিজেদের নিভিয়ে দিয়েই সরে গেল। কিন্তু পৃথিবী কী করল? যিনি মৃত্যুবরণ করছিলেন, তাঁকে আবদ্ধ করায় নিজেকে অক্ষম বলে প্রতিবাদ করতে করতে বৃক্ষের উপরে ঝোলা প্রভুর ভারে কাঁপতে লাগল। এমনটা কি হতে পারে যে, পাথর ও শৈলরাজি তাঁর জন্য বিশ্রাম-স্থান দিতে অস্বীকার করে? হ্যাঁ, করে ; কিন্তু সেগুলো ফেটে যায়, নিজের প্রকৃতিগত কাঠিন্য হারিয়ে ফেলে, ও স্বীকার করে যে, পাথরের গায়ে কাটা সেই সমধি-মঞ্জুষা নিজ থেকে ফেটে গিয়ে, যে দেহকে তার সংরক্ষণ করার কথা, সে তা নিজের মধ্যে স্থান দিতে পারে না।

১১। তারপর কী হল? যিনি সেনাদলের শতপতি ও ত্রুশের রক্ষক, তিনি বলে ওঠেন, ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন (ক)। তেমন পাপার্থ যজ্ঞের মধ্যস্থতায় সৃষ্টি মুক্তিলাভ করে, শৈলরাজি নিজেদের কাঠিন্য ও শক্তি হারায়। যারা তাঁকে ত্রুশে বিঁধিয়ে দিয়েছে তারা স্বীকার করে যে, তিনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। এসবকিছুর পরিণতি ঘোষণাকে সত্য বলে সমর্থন করে : প্রভু বলেছিলেন, ‘তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর’। ‘তোমার’ শব্দটা দ্বারা তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি নামে শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। আমরা অনেকেই ঈশ্বরের পুত্র, তিনি অন্য অর্থেই পুত্র। কেননা তিনি দত্তকের জোরে নয়, উৎপত্তির জোরেই তিনি ঈশ্বরের সত্যকার ও আপন পুত্র, নামে শুধু নয়, সত্যিকারে ; সৃষ্ট নয়, জন্মসূত্রেই পুত্র। তাই তিনি গৌরবান্বিত হওয়ার পর, স্বীকারোক্তি সত্যকে অর্জন করল ; শতপতি তাঁকে সত্যকার ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলে স্বীকার করলেন,

যেন কোন বিশ্বাসী সেই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ না করে যা নির্যাতকদের একজন অস্বীকার করেননি।

১২। কিন্তু কেউ না কেউ এমনটা ভাবতে পারে যে, তিনি যে গৌরব প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এবং তিনি যে মহত্তর একজন দ্বারা গৌরব প্রত্যাশা করেন, তাতে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তবে এমন কেইবা অস্বীকার করবে যে পিতাই মহত্তর, জনিতজনের তুলনায় জনকই মহত্তর, পুত্রের চেয়ে পিতাই মহত্তর, প্রেরিতজনের চেয়ে প্রেরণকর্তাই মহত্তর, ও যে বাধ্য হয় তার চেয়ে যে ইচ্ছা প্রকাশ করে সে-ই মহত্তর? তিনি নিজেই নিজের সাক্ষী হবেন: পিতা আমার চেয়ে মহান (ক)। এটা এমন বিষয় যা অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হয় পাছে অদক্ষ মানুষদের কাছে পিতার সম্মান পুত্রের গৌরব দুর্বল করে। যে গৌরব পুত্র প্রার্থনা করেন, সেই খোদ গৌরবই তেমন দুর্বলকরণ নিষেধ করে; কেননা ‘পিতা, তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর’ প্রার্থনাটা ‘যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন’ সমাপ্তিতে সিদ্ধিলাভ করে। তাই তেমন গৌরব গ্রহণ করার পর যিনি সেটার বিনিময়ে গৌরবই ফিরিয়ে দেন, সেই পুত্র দুর্বল নন। কিন্তু সেবিষয়ে অভাবী না হলে কেনই বা তিনি সেই প্রার্থনা অর্পণ করলেন? এমন কেউই নেই যে, তার যা অভাব, সেটা বাদে অন্য বিষয়ে অনুরোধ রাখে। তবে কি এমনটা হতে পারে যে পিতাও অভাবী? অথবা এমনটা কি হতে পারে যে তিনি না ভেবেই নিজের গৌরব দিয়ে দিলেন যার জন্য তাঁর প্রয়োজন হলো, পুত্র তাঁকে সেই গৌরব ফিরিয়ে দেবেন? না। সেই একজন কখনও অভাবী ছিলেন না, অন্যজনের পক্ষেও তা প্রার্থনা করার কোন দরকার ছিল না, অথচ এক একজন অন্যজনকে তা দিয়ে দেবেন। তাই সেই প্রার্থনা যাতে গৌরব দেওয়া হয় ও বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, সেই প্রার্থনা পিতার কাছ থেকে অপহরণও নয়, পুত্রের দুর্বলতাও নয়, বরং সেই একমাত্র ঈশ্বরত্বের পরাক্রমের প্রমাণ যা উভয়েতে বর্তমান: পুত্র প্রার্থনা করেন যেন তিনি পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হন, পিতা যে পুত্র দ্বারা গৌরবান্বিত হন, তা পিতা নিজের নিম্নতা বলে গণ্য করেন না; বরং দেওয়া ও গ্রহণ করা গৌরব-বিনিময় পিতা ও পুত্রে বর্তমান পরাক্রমের ঐক্য ঘোষণা করে।

১৩। এবার জানতে হবে সেই গৌরব কী ও কার কাছ থেকে আগত। ঈশ্বর যে পরিবর্তন সাপেক্ষ নন, সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত : তাঁর অনন্ততা কোন দ্রুতি বা সংস্কার, কোন লাভ বা ক্ষতি মানে না। এটা কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি যা, তিনি সর্বদাই তা। তিনি সর্বদাই যা, তিনি যে কোন এক সময় তা হবেন না, তা তাঁর প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি যা বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী ও যা বিষয়ে তাঁর ভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তিনি কেমন করে সেই গৌরব গ্রহণ করে নিতে পারেন? কেননা এমন নবীন গৌরবও নেই যা তিনি অর্জন করতে পারেন, এমন কোন গৌরবও নেই যা তিনি হারিয়ে ফেলে পুনরায় উদ্ধার করবেন। এতে আমরা নিশ্চল, দাঁড়াতে বাধ্য। কিন্তু সুসমাচার-রচয়িতা আমাদের বুদ্ধির দুর্বলতা একা ফেলে রাখেন না; কেননা বিনিময়ে পুত্র যে কোন গৌরব পিতাকে ফিরিয়ে দেবেন, তা দেখিয়ে তিনি বলেন, তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মাংসের উপর অধিকার দিয়েছ। এটিই অনন্ত জীবন : তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে (ক)। তাই পিতাকে যে আমাদের কাছে জ্ঞাত করা হয়েছে, তাতেই পিতা পুত্র দ্বারা গৌরবান্বিত হন। এবং সেই গৌরব এটা যে, নিজে মাংস হয়ে পুত্র তাঁর কাছ থেকে সমস্ত মাংসের উপরে অধিকার পেলেন, এবং নশ্বর, দৈহিক ও মরণশীল এই আমাদের কাছে অনন্ত জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব-ভারও পেলেন। আমাদের জন্য অনন্ত জীবন সাধিত কোন কর্মের ফল নয়, পরাক্রমেরই ফল ছিল; সেই অনন্ততার গৌরব নতুন সৃষ্টি দ্বারা নয়, কিন্তু কেবল ঈশ্বর-জ্ঞান দ্বারাই অর্জনীয় ছিল। তাই ঈশ্বরের গৌরবে কিছুই যোগ করা হচ্ছিল না; তাঁর সেই গৌরব এমনভাবে হ্রাসীকৃত হচ্ছিল না যার ফলে তা পুনরায় পূরণ করা দরকার হত; কিন্তু তিনি পুত্রের মাধ্যমে এই আমাদের সাক্ষাতে গৌরবান্বিত হন যারা অজ্ঞ, নির্বাসিত, কলুষিত, আশাবিহীন ভাবে মৃত ও বিধানবিহীন ভাবে অন্ধকারভুক্ত; তিনি আবার গৌরবান্বিত হন এই কারণে যে, পুত্র সমস্ত মাংসের উপরে তাঁর নিজের কাছে পিতার দেওয়া পরাক্রম দ্বারা আমাদের উপরে অনন্ত জীবন মঞ্জুর করবেন। তবে পুত্রের এই কর্মের দ্বারা পিতা গৌরবান্বিত হন। ফলত, যখন পুত্র সবই পেয়েছেন, তখন পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন; এবং একই প্রকারে, যখন পুত্র দ্বারা সমস্ত কিছু হয়, তখন পিতা গৌরবান্বিত হন। গৃহীত গৌরব

এইভাবে বিনিময়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পুত্রের সমস্ত গৌরব পিতারই হয়, কারণ পুত্র সবই পিতা থেকে পেয়েছেন; কেননা সেবাকর্মীর সম্মান প্রেরণকর্তার সম্মানার্থেই হয়, যেভাবে জনকের সম্মান জনিতজনের সম্মানার্থে হয়।

১৪। কিন্তু সেই জীবনের অনন্ততা কি? তিনি নিজেই বলেন, তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে (ক)। এখানে কি কঠিন কিছু আছে ও শব্দ সংক্রান্ত অসুবিধা আছে? জীবন হলো সত্যাকার ঈশ্বরকে জানা; কিন্তু একাই জ্ঞান জীবনকে দান করে না। তাই এতে প্রয়োজন আর কি আছে? ‘এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে’। ‘অনন্য সত্যকার ঈশ্বর’ উক্তি পুত্র দ্বারা পিতাকে দেয় সম্মান প্রদান করা হয়; কিন্তু যখন তিনি ‘যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ’ বলেন, তখন পুত্র সত্যকার ঈশ্বরত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন না। বিশ্বাসীদের স্বীকারোক্তি কোন বিচ্ছেদ মানে না, কারণ জীবনের আশা উভয়েতেই রয়েছে; এমনকি, সত্যকার ঈশ্বর তাঁরই থেকে অবিচ্ছেদ্য যাঁর নাম বিশ্বাস-সূত্রের স্বীকারোক্তিতে পিতার পরে উল্লিখিত। তাই যখন আমরা ‘তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে’ উক্তিটা পড়ি, তখন ‘প্রেরণকর্তা’ ও ‘প্রেরিতজন’ শব্দদ্বয়ে বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছেদের এমন কোন সূত্র নেই যা পিতার ও পুত্রের সত্যকার ঈশ্বরত্বের মধ্যে পার্থক্য সমর্থন করে, কিন্তু সেই উক্তি জনক ও জনিতজন হিসাবে তাঁদের ভক্তিময় স্বীকৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে।

১৫। তবে পুত্র পিতাকে এই উক্তিতে সম্পূর্ণরূপে গৌরবান্বিত করেন, ‘তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি’। পিতার সমস্ত প্রশংসা পুত্র থেকেই নির্গত, কেননা যেখানে পুত্র গৌরবান্বিত, সেখানে পিতাই প্রশংসিত, কারণ পিতা যা ইচ্ছা করেন, পুত্র সেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হিসাবে জন্ম নেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাব কুমারীর প্রসবে উপস্থিত। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হিসাবে দৃশ্যমান, কিন্তু সেই মানুষের কর্মে ঈশ্বর বিদ্যমান। ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সেই ক্রুশে ঈশ্বর মানব মৃত্যুর উপর বিজয়ী। ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু সেই খ্রিস্টে সমস্ত মাংস

সঞ্জীবিত হয়। ঈশ্বরের পুত্র পাতালে উপস্থিত, কিন্তু মানুষকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনা হয়। খ্রিষ্টে এ সমস্ত বিষয় যত সঙ্কীর্ণিত হবে, খ্রিষ্ট যাঁর থেকে উদ্ধৃত, সেই ঈশ্বরই তত বেশি প্রশংসিত হবেন। তাই পিতা এভাবেই পুত্রকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেন, অপরদিকে পুত্রও জাতিগুলোর অজ্ঞতা ও জগতের নির্বুদ্ধিতার সামনে নিজ প্রভাবশালী কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁকেই গৌরবান্বিত করেন যাঁর থেকে তিনি নিজে উদ্ধৃত। প্রকৃতপক্ষে একে অপরের মধ্যে এই গৌরব-বিনিময় ঈশ্বরত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু সেই ঐশসম্মানকেই লক্ষ করে যা তাদেরই মধ্য থেকে নির্গত হয় যারা আগে ঈশ্বর-অজ্ঞতায় জীবনযাপন করত। আসলে, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু হয়, সেই সমস্ত কিছুতে এমন কী ছিল, পিতা নিজের প্রাচুর্যে যা বিষয়ে অধিকারী নন? অথবা, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা বাস করতে প্রসন্ন হয়েছিল, সেই পুত্র কিসেতে অভাবী ছিলেন? অতএব, পিতা পৃথিবীতে গৌরবান্বিত, কারণ তাঁর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন।

১৬। এসো, এবার দেখি পুত্র পিতার কাছে থেকে কেমন গৌরব প্রত্যাশা করেন; তখন আমাদের আলোচনা পূর্ণতা লাভ করবে। কেননা সুসমাচারের পরবর্তী পংক্তিতে লেখা আছে: পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর। আমি মানুষের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি (ক)। সুতরাং পিতা পুত্রের কর্মে গৌরবান্বিত হন, কেননা তিনি ঈশ্বর বলেও স্বীকৃত ও একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পিতা বলেও প্রকাশিত যিনি আমাদের পরিভ্রাণের জন্য এমনটা চেয়েছিলেন যেন তাঁর পুত্র কুমারী থেকেই মানবরূপে জন্ম নেবেন যাঁর যন্ত্রণাভোগে সেই সমস্ত কিছু সিদ্ধি লাভ করবে যা সেই কুমারীর প্রসবকাল থেকে শুরু হয়েছিল। এভাবে যিনি সবদিক দিয়ে সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও অনাদিকালের আগেও ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় সঞ্জাত, ঈশ্বরের সেই পুত্র এবার তাঁর মাংসধারণ দ্বারা মানুষ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্তই প্রস্তুত ছিলেন: এজন্যই তিনি প্রার্থনা করেন যাতে তিনি নিজে যেভাবে পিতাকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করছিলেন, তিনিও যেন সেইভাবে পিতার কাছে গৌরবান্বিত হন; কেননা সেসময়ে ঈশ্বরের সমস্ত প্রভাব অজ্ঞ জগতের কাছে মাংসেই গৌরবান্বিত হচ্ছিল। কিন্তু, তিনি এখন পিতার কাছে যে গৌরব প্রত্যাশা করছেন, সেই গৌরব কী? জগৎ হবার আগে পিতার কাছে তাঁর যে গৌরব ছিল,

ঠিক সেটাই। তাঁর ছিল ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা, এখনও তাঁর আছে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তিনি মানবপুত্রও হতে শুরু করেছিলেন যেহেতু তিনি মাংস-হওয়া-বাণী ছিলেন। তাঁর যা ছিল, তিনি তা হারাননি, কিন্তু তিনি আগে যা ছিলেন না, তা হতে শুরু করেছিলেন; তিনি নিজের ঐশ্বররূপ কখনও পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু আমাদের যা, তিনি তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন: তাতে নতুন কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। অতএব যে পুত্র স্বয়ং বাণী ও মাংস-হওয়া-বাণী, ও এমন বাণী যিনি স্বয়ং ঈশ্বর ও আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, ও এমন বাণী যিনি জগৎপত্তনের আগেও পুত্র ছিলেন, এখন এই মাংস-হওয়া-পুত্র প্রার্থনা করছেন যাতে পিতার কাছে বাণী যা, মাংসও পিতার কাছে তা হতে শুরু করতে পারে। অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা করছিলেন, যা কালে সঞ্জাত, সেই মাংস যেন তাঁর সেই গৌরব পেতে পারে যা কালবিহীন, যাতে করে মাংসের ক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের প্রভাবে ও আত্মার অক্ষয়শীলতায় রূপান্তরিত ও গৃহীত হতে পারে। সুতরাং এ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, এ পিতার কাছে পুত্রের স্বীকারোক্তি, এ মাংসের মিনতি, তথা, বিচারের দিনে এই মাংসেই তাঁকে বিদ্ধ ব'লে ও ত্রুশচিহ্ন দ্বারা পরিচিত ব'লে সকলে দেখবে; এই মাংসেই তিনি পর্বতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এই মাংসেই স্বর্গে আরোহণ করলেন, এই মাংসেই ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন, এই মাংসেই পল তাঁকে দেখেছিলেন ও স্তোফান তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

১৭। তাই 'পিতা' নামটা মানুষদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে; কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, সেই পিতার প্রকৃত নাম কি? এমনটা কি হতে পারে যে ঈশ্বরের নাম অজ্ঞাত ছিল? মোশি সেই ঝোপের মধ্য থেকে সেই নাম শুনেছিলেন, আদিপুস্তক বিশ্বসৃষ্টির শুরুতে সেই নামের সংবাদ দিল, বিধান তা ব্যক্ত করেছিল, নবীরা সেই নামের গুণকীর্তন করেছিলেন, মানবজাতি জগতের সৃষ্টবস্তুতে তা উপলব্ধি করেছিল, বিজাতীয়রাও মিথ্যার আবরণে সেই নাম আরাধনা করে এল। মানুষ কখনও ঈশ্বরের নাম বিষয়ে অজ্ঞ হইনি। অথচ তারা সত্যিই অজ্ঞতায় ছিল (ক)। কেননা কেউই ঈশ্বরকে জানে না যদি না সে তাঁকে পিতা ও একমাত্র জনিত পুত্রের পিতা বলে স্বীকার করে, ও সেই পুত্রকেও পুত্র বলে স্বীকার না করে, এমন পুত্র যিনি বিচ্ছেদ বা সম্প্রসারণ বা পরম্পরা ছাড়া কিন্তু অনির্বচনীয় ভাবে ও অবোধগম্য ভাবে পিতার পুত্র বলে সেই পিতা থেকে সঞ্জাত, যিনি

সেই ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা রাখেন যা থেকে ও যার মধ্যে সত্যকার, অসীম ও সিদ্ধতাবিশিষ্ট ঈশ্বর বলে জন্ম নিয়েছিলেন; কেননা এটাই ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা। এসমস্ত কিছুর যেকোন একটা যদি বাদ পড়ে থাকে, তবে যে পূর্ণতায় তিনি বসবাস করতে প্রীত ছিলেন, সেই পূর্ণতা আর থাকবে না। একথাই পুত্র দ্বারা প্রচারিত, একথাই অঙ্কদের কাছে প্রকাশিত। এইভাবে পিতা পুত্রের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত যখন তিনি তেমন পুত্রের পিতা বলে স্বীকৃত।

১৮। তেমন বিষয়ে তথা নিজের জন্ম বিষয়ে সত্য সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত করতে ইচ্ছা ক’রে পুত্র নিজের সাধিত কর্মকাণ্ডকে উদাহরণ হিসাবে স্থির করলেন, যেন তাঁর অনির্বচনীয় কর্মকীর্তির কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে আমরা সেই অনির্বচনীয় জন্মের পরাক্রম বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারি: উদাহরণ স্বরূপ, জল আঙুররস হয় ও পাঁচটা যবের রুটি স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েকে বাদে পাঁচ হাজার মানুষকে তৃপ্ত করে ও বারোটা বুড়ি টুকরোগুলোতে ভরে যায়। কর্মটা অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না; কর্মটা ঘটছে বটে, কিন্তু তা আমাদের উপলব্ধির বাইরে থেকে যায়; কর্মের প্রক্রিয়া অনুধাবন করা যায় না, কিন্তু সেটার ফলাফল সুস্পষ্ট। যে ব্যাপার আমরা অনুসন্ধান করি তা যখন এমন হয় যা আমরা তলিয়ে দেখতে পারি না, তখন জিজ্ঞাসা মনোভাবে সেবিষয়ে অভিযোগ তোলা নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। কেননা পিতা অজনিত হওয়ায় যেমন তিনিও অনির্বচনীয়, তেমনি একমাত্র জনিতজন হওয়ায় পুত্রও অনির্বচনীয়, কারণ যিনি জনিতজন, তিনি অজনিতজনের প্রতিমূর্তি। কেননা যখন আমরা ইন্দ্রিয়গুলো ও ভাষার মধ্য দিয়ে কোন একটা প্রতিমূর্তি বিষয়ে একটা ধারণা করি, তখন অবশ্যই এটাই দাঁড়ায় যে, প্রতিমূর্তিতে যা চিত্রিত, আমরা সেই একই পদ্ধতিক্রমেই সেই চিত্র বিষয়ে ধারণা করব। কিন্তু, এই আমরা যাদের ইন্দ্রিয়গুলো কেবল দৃশ্যগত ও দেহগত বিষয় বোঝে, এক্ষেত্রে সেই আমরা যা অদৃশ্য তারই অনুধাবন করতে ও যা দেহগত নয় তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। অথচ আমরা যখন ঈশ্বরের রহস্যাদি ও পরাক্রম সমালোচনা করি, তখন আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জাবোধ করি না, অভক্তি বিষয়েও নিজেদের অভিযুক্ত করি না। কেমন করে তিনি পুত্র? তিনি কোথা থেকে আগত? তাঁর জন্মে পিতা কী হারিয়েছেন? পিতার কোন্ অংশ থেকে তিনি জন্ম নিলেন? এমনটাই আমাদের প্রশ্ন।

অথচ তত সময় ধরে তোমার চোখের সামনে রয়েছে সেই কর্মগুলোর স্পষ্ট প্রমাণ যাতে তুমি বিশ্বাস কর যে, নিজের অকার্যকারিতার কারণে যা কিছু তুমি বুঝতে অক্ষম, ঈশ্বর তা সাধন করতে সক্ষম।

১৯। তুমি তো জিজ্ঞাসা করছ, ঐশআত্মার দেওয়া শিক্ষা অনুসারে পুত্র কিভাবে জন্ম নিলেন; আমি দৈহিক বিষয়েই তোমার কাছে প্রশ্ন রাখব। তিনি যে কীভাবে কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, তা আমি জিজ্ঞাসা করছি না; [কুমারীর] মাংস যে নিজ থেকে নিখুঁত মাংসকে প্রসব ক’রে নিজেতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, তাও আমি জিজ্ঞাসা করছি না। এটা নিশ্চিত যে, কুমারী সাধারণ ভাবে গর্ভধারণ করেননি, তাঁকে বরণ করার জন্য মানব মিলনজনিত লজ্জা বিষয়েও কিছুই অনুভব করেননি; অথচ তিনি অক্ষুণ্ণ হয়েই তাঁকে তাঁর মানবদেহের পূর্ণ অবস্থায় বরণ করলেন। নিঃসন্দেহে ভক্তি এমনটা দাবি করে যে, মানব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরাক্রমের মধ্য দিয়ে যা আমরা সাধ্য বলে দেখি, আমাদের পক্ষে তা ঈশ্বরের বেলায় সাধ্য বলে গণ্য করা উচিত।

২০। কিন্তু, তুমি যেই হও না কেন, সেই তুমি যে যা অনুসন্ধানের নয় তাই অনুসন্ধান কর ও ঈশ্বরের রহস্যাদি ও পরাক্রম কঠোর কিচারে বিচার কর, ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে অদক্ষ ও সরল বিশ্বাসী এই আমি সেই তোমাকেই সেই বিষয়ে আমাকে আলোকিত করার জন্য অনুনয় করি যা উল্লেখ করতে যাচ্ছি। আমি প্রভুর কথা শুনি, ও যেহেতু যা লিপিবদ্ধ তা আমি বিশ্বাস করি, সেজন্য আমি এতে নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের পরে তিনি অসংখ্য অবিশ্বাসীদের কাছে বারে বারে নিজেকে দেখিয়েছিলেন; কমপক্ষে তিনি সেই থোমাসের বেলায় তেমনটা করেছিলেন যিনি এটা দাবি করেছিলেন যে, তাঁর ক্ষত স্পর্শ না করলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। তিনি বলেছিলেন, তাঁর দু’টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশাটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না (ক)। প্রভু আমাদের দুর্বল বোধশক্তির নিম্ন পর্যায়ে পর্যন্তও নিজেকে নমিত করেন, ও অবিশ্বাসী মনা মানুষদের সন্দেহ তুচ্ছ করার জন্য নিজের অদৃশ্য পরাক্রম গুণে অলৌকিক কর্ম সাধন করেন। তুমি যে স্বর্গীয় বিষয়ের সমালোচক, সেই তুমিই তাঁর সাধিত কর্ম ব্যাখ্যা কর।

শিষ্যেরা রুদ্ধ একটা স্থানে ছিলেন; প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময় থেকে তাঁরা গোপনেই সমবেত হয়ে একসাথে বসছিলেন। থোমাসের দাবি গ্রহণ করে প্রভু তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য হাজির হন; তিনি নিজের দেহকে স্পর্শ করার জন্য ও নিজের ক্ষত ছোঁবার জন্য অর্পণ করেন। এমনকি, ক্ষতগ্রস্ত বলে যাঁকে স্বীকৃত হওয়ার কথা, তিনি সেই দেহকে দেখাতে বাধ্য যেখানে সেই ক্ষতগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করছি, সেই রুদ্ধ ঘরের দেওয়ালের কোন্ স্থানে প্রভু দেহগত ভাবে প্রবেশ করেছিলেন। প্রেরিতদূত যত্ন সহকারে সেই পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করেছেন: সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন (খ)। তিনি কি গাঁথা এমন দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বা কাঠের এমন রুদ্ধ অবকাঠামোর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলেন যা এমন পদার্থ যা প্রকৃতিগত ভাবে অপ্রবেশ্য? কেননা তিনি দেহগত ভাবেই সেখানে এসে দাঁড়ালেন, তাতে সন্দেহ বা প্রতারণার মত কিছুই ছিল না। তিনি প্রবেশ করতে করতে তোমার মনশ্চক্ষু তাঁকে অনুসরণ করুক; তিনি সেই বন্ধ আবাসের ভিতরে পার হতে হতে তোমার উপলব্ধির দৃষ্টিশক্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলুক। সবকিছু স্বাভাবিক ও রুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, অথচ দেখ, যাঁর পরাক্রমের সামনে কোন বাধা দাঁড়াতে পারে না, তিনি মাঝখানে উপস্থিত। তুমি তো অদৃশ্য বিষয়ের সমালোচক: আমি তোমাকে এই দৃশ্য ঘটনা ব্যাখ্যা করতে জিজ্ঞাসা করছি। সবকিছু যেইভাবে স্থির ছিল ঠিক সেইভাবে স্থির থাকে; কোন দেহ কাঠের বা পাথুরে বস্তুর ভিতর দিয়ে নিজেকে অনুপ্রবেশ করাতে পারে না। প্রভুর দেহ নিজেকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় না যাতে পরে শূন্য থেকে নিজেকে পুনর্গঠিত করে; তবে যিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি কোথা থেকে এলেন? তোমার ইন্দ্রিয়গুলো ও বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রভাবহীন: এই ঘটনার সত্য মানব যুক্তিষ্কমতার অতীত। তোমার দাবি অনুসারে যদি সেই জন্মের বর্ণনা মিথ্যা, তাহলে প্রমাণ কর যে প্রভুর প্রবেশের বর্ণনাও বানানো কথা মাত্র। আমরা যদি এমনটা বলি যে, ঘটনাটা ঘটেনি যেহেতু আমরা বুঝতে পারি না তা কেমন করে ঘটেছে, তাহলে আমরা আমাদের উপলব্ধির সীমা বাস্তবতার সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করি। কিন্তু ঘটনার নিশ্চয়তা আমাদের মিথ্যাবাদিতাকে পরাজিত করে। হ্যাঁ, প্রভু বন্ধ একটা ঘরে শিষ্যদের মাঝখানে দাঁড়ালেন; পুত্র পিতা থেকে জন্ম নিলেন। যেহেতু তোমার দুর্বল বুদ্ধি এমনটা প্রমাণিত

করতে পারে না যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, সেই ভিত্তিতে এমনটা অস্বীকার করো না যে তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। অজনিত ও সিদ্ধতাবিশিষ্ট পিতা ঈশ্বরের একমাত্র জনিত ও সিদ্ধতাবিশিষ্ট পুত্র ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান কর, কেননা সেই প্রজননের পরাক্রম মানব স্বভাবের ইন্দ্রিয়শক্তি ও ভাষা অতিক্রম করে।

২১। উপরন্তু, ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তু ও পরাক্রম বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা ক্ষেত্রে তেমন অভক্তির বিরুদ্ধে জগতের যত কর্মকাণ্ডও আমাদের পক্ষে দাঁড়াবে। অথচ আমাদের অবিশ্বাস খোদ সত্যকেও ছাড়িয়ে দেয়, এবং ক্রোধোন্মুক্ত হয়ে আমরা তাঁর সিংহাসন থেকে ঈশ্বরকেও সরিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকি। পারলে আমরা দেহ ও হাত হাতিয়ার করে স্বর্গে আরোহণ করতাম, সূর্য ও যত তারানক্ষত্রের স্থিরীকৃত কক্ষপথ বিভ্রান্ত করতাম, সমুদ্র-সাগরের জোয়ার-ভাঁটার লীলা উলট-পালট করতাম, নদনদীর উৎস বুজিয়ে দিতাম বা সেগুলোর জল উল্টদিকে প্রবাহিত করতাম, পৃথিবীর ভিত কাঁপিয়ে তুলতাম, ঈশ্বরের পিতৃসুলভ কর্মকাণ্ড একেবারে ধ্বংস করে দিতাম। এটাই ভাল যে, আমাদের দুর্বল প্রকৃতি সঙ্কুচিত সীমায় আমাদের আবদ্ধ রাখে। এটা নিশ্চিত যে, পারলে আমরা যত অপকর্ম সাধনে দ্বিধা করতাম না। এদিকে আমরা স্বাধীন, তাই অভক্তিময় স্পর্ধ দেখিয়ে সত্যকে বিকৃত করি ও ঈশ্বরের বাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি।

২২। পুত্র বলেছিলেন, পিতা, সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি (ক)। এবিষয়ে ঈশ্বরনিন্দা করার মত কী আছে? রাগ দেখাবার মত কী আছে? তুমি কি ঈশ্বরকে অস্বীকার কর? কেন? পুত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পিতাকে জানতে আমাদের সক্ষম করা। কিন্তু তুমি তখনই তাঁকে অস্বীকার কর যখন তোমার মতে পুত্র পিতা থেকে জন্ম নেননি। তবে তিনি কেন পুত্র বলে অভিহিত হবেন যদি বাকি সবকিছুর মত তিনিও পিতার ইচ্ছামত নির্মিত? আমি বিশ্বের নির্মাতা ঈশ্বর যে খ্রিস্টেরও স্রষ্টা, তাতে আমি তাঁকে আরও শ্রদ্ধাই করতাম; যিনি মহাদূত ও দূত সকলকে, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু, আকাশ ও পৃথিবী ও আমাদের চারদিকের গোটা সৃষ্টিকর্ম নির্মাণ করেছেন, তিনি খ্রিস্টেরও নির্মাতা হলে তবে তেমনটা তাঁর পরাক্রমের যোগ্য অভিব্যক্তি হত। কিন্তু প্রভু যে কর্ম সম্পাদন করতে এসেছিলেন, সেটার উদ্দেশ্য এমনটা ছিল না যাতে তুমি

সর্বস্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করতে পার, কিন্তু উদ্দেশ্য এটাই ছিল, তুমি যেন ঈশ্বরকে সেই পুত্রের পিতা বলে জান যিনি মানুষের কাছে কথা বলেন। স্বর্গে বহু প্রতাপ আছেন যাঁরা শক্তিশালী ও সনাতন, কিন্তু একমাত্র জনিত পুত্র এক, এবং সেই পুত্র ও সেই প্রতাপগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা শক্তি ভিত্তিক পার্থক্য নয়, কিন্তু পার্থক্য এটাই যে, সেই সবকিছু সেই পুত্র দ্বারা হয়েছিল। যেহেতু তিনি সত্যকার ও অনন্য পুত্র, সেজন্য এসো, তিনি যে শূন্য থেকে সঞ্জাত তেমনটা বলায় আমরা যেন তাঁকে জারজ সন্তান না করি। তুমি তো ‘পুত্র’ নামটা শোন: তিনি যে পুত্র তা বিশ্বাস কর। তুমি তো ‘পিতা’ নামটা শোন: তিনি যে পিতা তা মনে রেখ। এই নাম দু’টো সন্দেহ ও শঠতা ও দুঃসাহস দ্বারা ঘিরে রাখার লক্ষ্য কী? ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়গুলো এমন নাম দ্বারা চিহ্নিত যা সেগুলো বিষয়ে সত্যকার নির্দেশনা প্রদান করে; তবে কেন জোর করে সত্যের উপরে ভিন্ন অর্থ চাপিয়ে দিচ্ছ? তুমি তো ‘পিতা’ ও ‘পুত্র’ শব্দ দু’টো শোন: সেই শব্দ দু’টো যা ব্যক্ত করে তা যে সত্য, তা সন্দেহ করো না। পুত্রের প্রকাশকর্মের একমাত্র প্রকৃত লক্ষ্যই যেন তুমি পিতাকে জানতে পার: তবে তুমি কেন নবীদের কষ্ট, বাণীর মাংসধারণ, কুমারীর প্রসব, পরাক্রম-কর্মগুলোর ফল ও খ্রিস্টের ত্রুশ ব্যর্থ কর? এই সমস্ত কিছু তোমাকে অর্জন করার জন্যই ব্যয় করা হয়েছিল, সেই সবকিছু তোমাকে অর্পণ করা হচ্ছে, যাতে সেইসব কিছুর মধ্য দিয়ে পিতা ও পুত্র তোমার কাছে প্রকাশিত হন। আর তুমি এর বদলে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম, সৃষ্টি ও দত্তক ব্যাপারগুলো হাজির করাচ্ছ; তুমি বরং খ্রিস্টের যুদ্ধ-সংগ্রাম ও লড়াইয়ের কথা ভাব। এবিষয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ‘পিতা, সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি’। তিনি তো এমনটা বলেননি, ‘তুমি স্বর্গীয় বিষয়গুলোর স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছ’ বা ‘তুমি পৃথিবীর নির্মাতাকে নির্মাণ করেছ’। না। তিনি বলেন, ‘পিতা, সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি’। তোমার দ্রাণকর্তার দান গ্রহণ করে নাও। এতে নিশ্চিত হও যে, সেই পিতা আছেন যিনি জনিত করলেন, সেই পুত্র আছেন যিনি জন্ম নিলেন; আছেন যিনি, সেই পিতা থেকে প্রকৃত জন্মেই যিনি জন্ম নিলেন। মনে রেখ, পিতা যে ঈশ্বর এজন্য যে তাঁকে তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে তোমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে কারণ তিনি পিতা।

২৩। শোন, আমি এবং পিতা, আমরা এক (ক)। তুমি কেন পুত্রকে পিতা থেকে বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন কর? তাঁরা এক : যা আছে, তার এমন কিছু নেই যা তারও মধ্যে নেই যা থেকে তা আছে। যখন তুমি পুত্রকে একথা বলতে শোন, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’, তখন তোমার দৃষ্টিকোণ সেই ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে মেলাও ; সেই উক্তি মেনে নাও যা জনক ও জনিতজন নিজ নিজ বিষয়ে বলেন। তুমি এমনটা বিশ্বাস কর যে তাঁরা এক, যদিও তাঁরা একাধারে জনক ও জনিতজন। কেন তাঁদের অভিন্ন স্বরূপ অস্বীকার কর? কেন তাঁদের সত্যকার ঈশ্বরত্ব সরাও? তুমি তো এও শোন, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি (খ)। এই কথা যে পিতা ও পুত্রের বেলায় সত্য, তা পুত্রের সাধিত কর্মগুলোতে প্রমাণিত। মানব বিজ্ঞান দেহকে দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাতে পারে না যেইভাবে জল আঙুররসে ঢালা হয় ; কিন্তু আমরা এটা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরত্বের পরাক্রম ও পূর্ণতার সমতা সেই পিতা ও পুত্রে উভয়তেই বিরাজ করে। কেননা পুত্র সবকিছু পিতা থেকে গ্রহণ করেছেন; তিনি ঈশ্বরের ‘রূপ’ (গ), তাঁর ‘সত্তার প্রতিমূর্তি’ (ঘ)। ‘তাঁর সত্তার প্রতিমূর্তি’ বচনটা খ্রিস্টকে তাঁর কাছ থেকে পৃথক করে পুত্র যাঁর থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তেমনটা কেবল এইজন্য করে, যাতে তাঁদের স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করা হয় ; পিতা ও পুত্র যে ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী, তা শেখাবার জন্য নয়। এবং ‘পিতা পুত্রে ও পুত্র পিতাতে’ বচনটার অর্থ এটাই যে, উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরত্বের সিদ্ধ পূর্ণতা বিরাজ করে। পুত্রের অস্তিত্বে পিতা হ্রাসীকৃত হন না, পুত্রও পিতা থেকে ছিন্ন করা একটা অংশ নন। প্রতিমূর্তি প্রকৃত মূর্তির অস্তিত্ব দাবি করে, সাদৃশ্যও একক নয়। এমন কিছু নেই যা ঈশ্বরের সদৃশ হতে পারে যদি না সেই বস্তুর উৎস ঈশ্বরে স্থিত নয় ; নিখুঁত সাদৃশ্য কেবল তা থেকেই প্রতিবিস্তৃত হতে পারে সাদৃশ্যটা যা থেকে উৎসারিত। সূক্ষ্ম সাদৃশ্য উভয় বস্তুর মধ্যকার কোন ভিন্নতা মানে না। তেমন সাদৃশ্য উলট-পালট করো না ; অভিন্ন সত্য থেকেও অনুচিত ভিন্নতা বিযুক্ত করো না, কেননা যিনি বলেছেন, এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও আমাদের সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি (ঙ), তিনি ‘আমাদের সাদৃশ্য’ শব্দটার মধ্য দিয়ে সেই দু’জনকে পরস্পর সদৃশ বলে প্রকাশ করেছেন। সেই নাম দু’টো স্পর্শ করো না, অপব্যবহার করো না, বিকৃত করো না। সত্যের অধিকারী সেই নাম দু’টো আঁকড়িয়ে ধর, নিজের বিষয়ে পুত্রের সেই ঘোষণা

আঁকড়িয়ে ধর। তুমি পুত্রকে তোমার কল্পিত প্রশংসাবাদ দ্বারা তোষামোদ করবে, আমি এমনটা চাই না; লিপিবদ্ধ বাণী নিয়ে তুষ্ট হওয়া, এটাই তোমার পক্ষে ভাল।

২৪। আরও, মানব বুদ্ধির উপরে এমন অতিরিক্ত ভরসা রাখাও উচিত নয় যার ফলে একজন এমনটা ভাববে যে, নিজের ভাবনা বিষয়ে তার পূর্ণ জ্ঞান আছে, অথবা সে এমনটা ভাববে যে, সেবিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ও মজবুত ধারণা ধারণ করলেই সমস্যা মিটে গেছে। সীমিত মন যা অসীম তা ধারণা করতে অক্ষম; যে বস্তু নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল, সেই বস্তুও নিজের নির্মাতার বিষয়ে বা নিজের বিষয়ে নিখুঁত জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম, কেননা নিজের বিষয়ে তার যে চেতনা, তা অবস্থা-পরিস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত, ও সেবিষয়ে এমন সীমা স্থির করা রয়েছে যা তার সেই চেতনা অতিক্রম করতে পারে না। তার কর্মকাণ্ড স্বঘটিত নয়, কিন্তু তার নির্মাতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এবং নির্মাতার উপর নির্ভরশীল একটা বস্তু নিজের গুণাবলির একটার উপরেও সিদ্ধ অধিকার রাখে না, কারণ তার নিজের উৎপত্তি তার নিজের বাইরে রয়েছে। অতএব অনিবার্য নিয়মের জোরে, সেই বস্তুর পক্ষে এমনটা বলা যে, সে সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, তা নির্বুদ্ধিতা স্বরূপ; তার প্রভাব এমন সীমা দ্বারা চিহ্নিত যা সে পরিবর্তন করতে পারে না; ও যখন সে এমন ভ্রান্তির বশে রয়েছে যার জন্য সে মনে করে, তার নিজের তুচ্ছ সীমা অসীমতার সীমার সমব্যাপ্ত, তখনই মাত্র সে অসার দন্তের সঙ্গে বড়াই করতে পারে যে, সে প্রজ্ঞার অধিকারী। কেননা সে প্রজ্ঞা ক্ষেত্রে অক্ষম, কারণ তার জ্ঞান তার উপলব্ধির সীমাতে সীমাবদ্ধ ও পরনির্ভরশীল অস্তিত্বের অক্ষমতার অংশী। সেজন্য সীমিত প্রকৃতি যখন দম্ভ ক’রে এমন বিষয়ে বড়াই করে যে, সে সেই প্রজ্ঞার অধিকারী যা কেবল অসীম জ্ঞান থেকে উৎসারিত, তখন সে প্রেরিতদূতের বিদ্রূপ ও উপহাস অর্জন করে, কেননা প্রেরিতদূত তেমন প্রজ্ঞা মূর্খতা বলে ডাকে। তিনি বলেন, কারণ খ্রিস্ট বাপ্তিস্ম দিতে নয়, সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষায় নয়, যা খ্রিস্টের ক্রুশ ব্যর্থ করতে পারে। কেননা যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ

কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ত্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহুত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিস্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী (ক)। সুতরাং, সমস্ত অবিশ্বাস মূর্খতা, কেননা সেই অবিশ্বাস ততটুকু প্রজ্ঞা নেয় যতটুকু তার নিজের সীমিত উপলব্ধি নিতে পারে, ও সেই তুচ্ছ মাপদণ্ডে অসীমতাকে পরিমাপ ক’রে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সে যা বুঝতে পারে না, তা অবশ্যই অসম্ভব। অবিশ্বাস হলো কোন বিষয়ে তর্ক করার দুর্বলতা। হ্যাঁ, মানুষ তখনই একটা ঘটনা অঘটিত বলে মনে করে, যখন সে আগে থেকে মনে স্থির করেছে যে, সেই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না।

২৫। মানুষ যা জানে না, তা সত্য নয় বলে নির্ধারণ করে, মানব ধারণার তেমন সঙ্কীর্ণ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত বলে প্রেরিতদূত স্পষ্টভাবে বলেন, তিনি প্রজ্ঞার ভাষায় কথা বলেন না, পাছে তাঁর প্রচারকর্ম ব্যর্থ হয়। এবং মূর্খতার প্রচারক বলে পরিগণিত না হবার জন্য তিনি এও যোগ করেন যে, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ত্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর। তিনি তো জানতেন যে অবিশ্বাসীরা এমনটা সমর্থন করত যে, তারা যা জানত, সেটাই একমাত্র জ্ঞান; তিনি এও জানতেন যে, যেহেতু তাদের প্রজ্ঞা তেমন বিষয়েই মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল যা তাদের সীমিত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেজন্য ঈশ্বরের যে প্রজ্ঞা একমাত্রই নিখুঁত প্রজ্ঞা, তারা সেই প্রজ্ঞাকে মূর্খতা মনে করত। তাই তাদের মূর্খতা প্রকৃতপক্ষে তাতেই স্থিত ছিল যা তাদের দুর্বল অভিমতে তারা প্রজ্ঞা মনে করত। সেজন্য যারা বিনাশের দিকে চলছে তাদের কাছে যা যা মূর্খতা বলে গণ্য, তা হলো ঈশ্বরের সেই পরাক্রম যা দ্বারা মানুষ পরিত্রাণ পায়; কেননা এরা নিজেদের দুর্বল ইন্দ্রিয়গুলোকে কখনও মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে না, কিন্তু স্বর্গীয় অসীমতাকে

ঐশ্বরিক কর্মের উপর আরোপ করে। ঈশ্বর প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি এই অর্থেই প্রত্যাখ্যান করেন যে, যেহেতু বিশ্বাসী যারা তারা নিজেদের মূর্খতা স্বীকার করে, সেজন্য পরিত্রাণ তাদেরই মঞ্জুর করা হয় যারা বিশ্বাস করে। অবিশ্বাসী যারা, তারা সেই সবকিছুই মূর্খতা বলে ঘোষণা করে যা তাদের গন্ডির বাইরে রয়েছে, অন্যদিকে বিশ্বাসী যারা, তারা ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রভাবের হাতেই সেই পরিত্রাণের রহস্যাদি মঞ্জুর করার দায়িত্ব রাখে যা দ্বারা পরিত্রাণ প্রদান করা হয়। ঈশ্বরের যা, তাতে মূর্খতা নেই, মূর্খতা সেই মানবীয় প্রজ্ঞায়ই রয়েছে যা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসের শর্ত হিসাবে চিহ্ন ও প্রজ্ঞা দাবি করে। চিহ্ন দাবি করাটা হলো ইহুদীদের মূর্খতা: বিধানের সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিতির মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের নাম বিষয়ে এক প্রকার জ্ঞান রাখে, কিন্তু পতনের কারণ সেই দ্রুশ তাদের দূরে রাখে। গ্রীকদের মূর্খতা এটা হলো যে, তারা প্রজ্ঞা দাবি করে: তারা বিজাতীয়দের অকেজোতা ও মানবীয় বুদ্ধি দ্বারা সেই যুক্তি অনুসন্ধান করে যা অনুসারে ঈশ্বরকে দ্রুশে উত্তোলন করা হয়েছিল। এবং যেহেতু প্রকৃতির দুর্বলতা বশত এসমস্ত কিছু রহস্যের আবরণে আবৃত হয়ে রয়েছে, সেজন্য ইহুদীদের ও গ্রীকদের এই মূর্খতা অবিশ্বাসে পরিণত হয়; কেননা মন প্রকৃতিগত ভাবে যা ধারণা করতে অক্ষম, তারা বিশ্বাস ক্ষেত্রে তা অযৌক্তিক বলে নিন্দা করে। কিন্তু, যেহেতু জগতের প্রজ্ঞা এতই মূর্খ ছিল—কেননা আগে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দ্বারাই জগৎ ঈশ্বরকে জানেনি (তথা জগতের মহিমা ও সেই বিস্ময়কর অলঙ্কার যা অনুসারে তিনি নিজের কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন) ও নিজের স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা শেখায়নি,—সেজন্য ঈশ্বর মূর্খতা প্রচারের মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করতে প্রসন্ন হলেন, অর্থাৎ দ্রুশে বিশ্বাস দ্বারাই তিনি মরমানুষদের অনন্ততা মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হলেন, যাতে মানব প্রজ্ঞার দম্ভকে লজ্জা দেওয়া হয়, ও মানুষ যেখানে মনে করছিল মূর্খতা বিরাজ করে, সেখানে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। কেননা যিনি বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতা ও ইহুদীদের কাছে পতনের কারণ, সেই খ্রিষ্ট হয়ে ওঠেন ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা; কারণ ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে মানব উপলব্ধিতে যা দুর্বল ও মূর্খ মনে হয়, তা প্রকৃত প্রজ্ঞা ও পরাক্রমে পার্থিব ধারণা ও শক্তি অতিক্রম করে।

২৬। অতএব, ঈশ্বরের কর্ম ক্ষেত্রে মানবীয় মনের অভিমতকে স্থান দিতে নেই; ঈশ্বরের কর্মও শ্রষ্টাকে বিচার করবে না। আমাদের পক্ষে মূর্খতা ধারণ করা প্রয়োজন যাতে করে প্রজ্ঞা লাভ করতে পারি; যে মূর্খতা অবিবেচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেই মূর্খতা নয়; কিন্তু সেই মূর্খতা ধারণ করা দরকার যা মানব স্বভাবের দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন; তবেই পার্থিব ধারণার যুক্তি যা ধারণাও করতে পারে না, তা ঐশ্বরিক পরাক্রমের যুক্তিই আমাদের মধ্যে সঞ্চার করবে। কেননা যখন আমরা আমাদের নিজেদের মূর্খতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ও আমাদের যুক্তির অক্ষমতা ও বুদ্ধিহীনতা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখনই ঐশপ্রজ্ঞার বুদ্ধি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় দীক্ষিত হব; হ্যাঁ, তখন আমরা সীমাহীন মহিমা ও পরাক্রমকে সীমাবদ্ধ করব না, প্রকৃতির প্রভুকেও প্রকৃতির নিয়মে আটকিয়ে রাখব না, এতে নিশ্চিত হয়ে যে, আমাদের পক্ষে সেটাই ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রকৃত বিশ্বাস, যেটার তিনিই একাধারে সাক্ষী ও প্রণেতা।

১ (ক) যোহন ১৪:১১।

৩ (ক) কল ২:৯।

৪ (ক) যোহন ১০:৩৮।

৬ (ক) এখানে রুটি-বৃদ্ধির অলৌকিক কর্মও ঐশ্বরিক সৃষ্টিকর্ম বলে পরিগণিত।

৮ (ক) ইশা ২৯:১৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ১ করি ২০-২৫।

৯ (ক) যোহন ৬:৩৮।

(খ) যোহন ১৭:১-৬।

১০ (ক) যোহন ১২:২৩।

(খ) ১ করি ১:২৭।

১১ (ক) মথি ২৭:৫৪।

১২ (ক) যোহন ১৪:২৮।

১৩ (ক) যোহন ১৭:২-৩।

১৪ (ক) যোহন ১৭:৩।

১৬ (ক) যোহন ১৭:৫-৬।

১৭ (ক) ‘অথচ তারা সত্যিই অজ্ঞতায় ছিল’: সাধু হিলারিউস এটা বলেন যে, খ্রিষ্ট, এবং এর ফলে ঐশ্বরিত্বও, পুরাতন নিয়মকালে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত ছিলেন; বাস্তবিকই ত্রিত্ব-রহস্য কেবল খ্রিষ্টধর্মেরই মূল ও বিশিষ্ট তত্ত্ব।

২০ (ক) যোহন ২০:২৫।

(খ) যোহন ২০:২৬।

২২ (ক) যোহন ১৭:৬।

২৩ (ক) যোহন ১০:৩০.

(খ) যোহন ১০:৩৮.

(গ) ফিলি ২:৬ লাতিন পাঠ্য.

(ঘ) হিব্রু ১:৩ লাতিন পাঠ্য.

(ঙ) আদি ১:২৬ লাতিন পাঠ্য.

২৪ (ক) ১ করি ১:১৭-২৫।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৪র্থ পুস্তক

আগের পুস্তকগুলোতে সাধু হিলারিউস বাণীর ঈশ্বরত্বকে প্রমাণ-পদ্ধতি দ্বারা সমর্থন করেছিলেন; এখন, এই ৪র্থ পুস্তকে, প্রমাণ-পদ্ধতি ছাড়া ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে খণ্ডন-পদ্ধতিকেও স্থান দেন। সর্বপ্রথমে তিনি ὁμοούσιος (হমোউসিওস) গ্রীক শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেন; পরে, পুত্রের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করার জন্য আরিউসপন্থীরা বাইবেলের যে যে বচন ব্যবহার করত, তিনি সেই বচনগুলোর সত্যকার অর্থ ব্যক্ত করেন; এবং শেষে, মোশির লেখা দ্বারা, পুরাতন নিয়মের ঐশ্বরপ্রকাশ দ্বারা ও নবীদের লেখা দ্বারা পুত্রের ঈশ্বরত্ব ও সমসত্ত্বার বিরুদ্ধে সমর্থিত আরিউসপন্থীদের তত্ত্ব খণ্ডন করেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	
	৪২																				

[১] বেশ কিছু দিন আগে লেখা আমার আবেগের যে তিনটে পুস্তক, আমার মতে সেগুলোতে রয়েছে এই অখণ্ড প্রমাণ যে, আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় এমন বিশ্বাস ধারণ ও স্বীকার করি যা সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের দ্বারা শেখানো; সেই পুস্তকগুলো এটাও দেখায় যে, ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়, কারণ তারা শর্তহীন ভাবে, অযৌক্তিক ভাবে ও অবিবেচক ভাবে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে। তবু এমন কয়েকটা বিষয় বাকি রয়েছে যা আমি এই পুস্তকে ও পরবর্তী পুস্তকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজন মনে করছি, যাতে তাদের সমস্ত মিথ্যা ও ভক্তিহীন অভিমত প্রকাশ করলে বিশ্বাস সংক্রান্ত

আমাদের জ্ঞান আরও দৃঢ়তর হয়। সেই অনুসারে আমরা প্রথমে অনুসন্ধান করব তাদের শিক্ষা জনিত বিপদ কি কি ও তাদের অভক্তিতে নিহিত ঝুঁকি কি কি; তারপর আমরা দেখাব আমাদের গৃহীত প্রৈরিতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ কি ও তাদের শ্রোতাদের সরলতা ভোলাবার জন্য তারা কেমন ছলনাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে; অবশেষে দিব্য উক্তিগুলোর সত্য ও পরাক্রম বিকৃত করার জন্য তাদের ব্যবহৃত ব্যাখ্যা-পদ্ধতি যে কেমন, তাও দেখাতে চেষ্টা করব।

২। তবু আমরা এটা জানি যে, মানুষের ভাষা ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে কোন তুলনামূলক বক্তব্যও ঐশ্বরিক বিষয়াদি ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা যা অনির্বচনীয়, তা একটা সংজ্ঞার গন্ডিতে সীমাবদ্ধ হতে পারে না; যা আত্মিক, তা সবদিক দিয়ে দৈহিক বিষয় থেকে ভিন্ন। তা সত্ত্বেও যেহেতু আমাদের বিষয়বস্তু স্বর্গীয় বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য আমাদের মন যা গ্রহণ করতে পারে তা ব্যক্ত করার জন্য আমরা সাধারণ পদ্ধতিগত উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য। উপায়টা যে ঈশ্বরের মর্যাদার যোগ্য নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু উপায়টা আমাদের ধীশক্তির দুর্বলতা দ্বারা আমাদের উপরে চাপা, যেহেতু আমাদের ধীশক্তি আমাদের অনুভূতি ও সিদ্ধান্তসমূহ অন্যদের কাছে জ্ঞাত করার জন্য শুধু মানব অবস্থা-পরিস্থিতি ও ভাষাই ব্যবহার করতে পারে। এই কথা আমাদের প্রথম পুস্তকে আলোচিত হয়েছিল, কিন্তু তবুও এখনও পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে আমাদের উপস্থাপিত মানব সংক্রান্ত উদাহরণ ক্ষেত্রে আমরা এমনটা না মনে করি যে, ঈশ্বর দৈহিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে, ও যেন আত্মিক প্রাণীগুলোকে আবেগবিশিষ্ট এই আমাদের সঙ্গে তুলনা না করি; বরং আমরা যেন সেই আত্মিক প্রাণীদের এমন দৃশ্যগত বিষয়ের বাহ্যিক রূপ বলে গণ্য করি যা অদৃশ্য বিষয়ের তাৎপর্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে।

৩। কেননা ভ্রান্তমতপন্থীরা বলে, খ্রিষ্ট ঈশ্বর থেকে নন, অর্থাৎ পুত্র পিতা থেকে সঞ্জাত নন, ও তিনি স্বরূপে নয়, নিয়োগ সূত্রেই ঈশ্বর; অন্য কথায়, তাদের মতে, যে অর্থ অনুসারে অনেকে ঈশ্বরের সন্তান, সেই অর্থ অনুসারেই ঈশ্বরের সন্তান হওয়ায় তিনি নামকরণ বিশিষ্ট দত্তক গ্রহণ করেছেন। আরও, তাদের মতে, খ্রিষ্টের মর্যাদা হলো

ঈশ্বরের পরিব্যাপ্ত মঙ্গলময়তার বহিঃপ্রকাশ, কেননা তিনি সেই অর্থেই ঈশ্বর যে অর্থে বহু ঈশ্বর আছে; তবু তারা এটা মেনে নেয় যে, ঈশ্বর ব'লে সেই দত্তকে ও নামকরণে উপরোল্লিখিত উদাহরণের চেয়ে আরও উদার দয়া প্রকাশিত, কেননা পুত্রের দত্তক কালের দিক দিয়ে আদি-দত্তক, অন্যান্য দত্তকপুত্রদের চেয়ে মহত্তর দত্তক, ও সৃষ্টজীবদের মধ্যে পদমর্যাদায় প্রথম, কারণ সৃষ্ট সেই পুত্র প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ক)। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করতে গিয়ে তাদের কয়েকজন এও বলে যে, তিনি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছিলেন, ও অন্যান্য সৃষ্টজীবদের মত তিনি শূন্য থেকে সনাতন ঋষ্টির প্রতিমূর্তিতে উন্নীত হয়েছিলেন; অর্থাৎ এক বচন দ্বারা তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল তিনি যেন সেই ঈশ্বরের পরাক্রম দ্বারা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত প্রাণীতে উৎসারিত হন, সেই যে ঈশ্বর শূন্য থেকে নিজের সাদৃশ্য গঠন করতে পারেন।

৪। উপরন্তু, [আরিউসের ভ্রান্তমতপন্থী যারা] তারা নাকি এটাও যোগ করে যে, আগেকার বিশপগণ এমন শিক্ষা দিতেন যে, পিতা ও পুত্র একসত্তা মাত্র (ক); তাদের উদ্দেশ্যই যাতে তারা একটা কুটিল ধারণা দ্বারা প্রকৃত সত্যকে এক ভ্রান্তমতে উল্ট-পাল্ট করতে পারে। কেননা তারা নাকি বলে থাকে যে, সেই ‘একসত্তা’ শব্দটা, যা গ্রীক ভাষায় ὁμοούσιος [হমোউসিওস], এমন ভাবে ব্যবহৃত যাতে এমনটা ব্যক্ত হয় যে, পিতা যিনি তিনি একাধারে পুত্র, অর্থাৎ, পিতা অসীমতা থেকে নিজেকে কুমারীতে সম্প্রসারণ করেছিলেন ও সেই কুমারী থেকে একটা দেহ ধারণ করেছিলেন ও যে দেহ ধারণ করেছিলেন তিনি সেই দেহে নিজের জন্য ‘পুত্র’ নাম রেখেছিলেন (খ)। ‘হমোউসিওস’ ক্ষেত্রে এটাই তাদের প্রথম মিথ্যা। তাদের দ্বিতীয় মিথ্যা এটাই যে, এই ‘হমোউসিওস’ শব্দ এমনটা সমর্থন করে যে, পিতা ও পুত্র এমন কিছু অংশী যা উভয়ের পূর্ববর্তী ও উভয় থেকে স্বতন্ত্র; তারা এটাও সমর্থন করে যে, সমস্ত সত্তাগুলোর পূর্ববর্তী কাল্পনিক কোন একটা সত্তা বা ‘উসিয়া’ (গ) পূর্বে ছিল ও সেটাকে ভাগ ভাগ করা হয়েছিল ও সেই উভয়ের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল; তাদের মতে এতে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের এক একজন এমন স্বরূপের অধিকারী যা তাঁর নিজের পূর্বাস্তিত্বশীল, ও সত্তা ক্ষেত্রে এক একজন অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একই। এইভাবে তারা ‘হমোউসিওস’ সংক্রান্ত [মহাসভার] স্বীকারোক্তি নিন্দা করতে স্বীকার করে এই ভিত্তিতে যে,

‘হমোউসিওস’ শব্দটা পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য সমর্থন করে না ও পিতাকে সেই সত্তার পরবর্তী করে যা তিনি পুত্রের সঙ্গে সমানভাবে অধিকারী। এবং তারা ‘হমোউসিওস’ শব্দটা ক্ষেত্রে তৃতীয় এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে, তাদের অভিমত অনুসারে সেই শব্দের অর্থ এমন যে, পুত্র নিজের উৎপত্তি পিতার সত্তার বিভাজন থেকে গ্রহণ করেন, ঠিক কেমন যেন একটা বস্তু যা দু’ ভাগে কাটা হয়। তারা নাকি বলে, ‘একসত্তা’ শব্দের অর্থ এটা হলো যে, আস্ত বস্তু থেকে কাটা যে অংশ, তা যা থেকে কাটা হয়েছে সেটার স্বরূপের অংশী হতে থাকে। কিন্তু আবেগবিহীন হওয়ায় ঈশ্বরের বিভাজ্য নন (য), কেননা তিনি বিভাজন দ্বারা হ্রাসীকৃত হতে বাধ্য হলে তবে তিনি পরিবর্তনশীল হয়ে যেতেন, ও তাঁর সিদ্ধতাবিশিষ্ট সত্তা কাটা অংশে বাস করার জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে তবে তিনি অসিদ্ধ হয়ে যেতেন।

৫। তাছাড়া তারা এমনটাও মনে করে যে, পুত্র যে কালের গণ্ডিতে জন্ম নিয়েছিলেন, তাতে তারা নবীদের ব্যাপারে শুধু নয়, কিন্তু সুসমাচার-রচয়িতাগণ ও প্রেরিতদূতদের ব্যাপারেও সুরঞ্জিপূর্ণ একটা প্রত্যাখ্যানের অধিকারী। আমরা যে এমনটা বলি, পুত্র সর্বদাই বিদ্যমান, তাতে তারা আমাদের যুক্তিহীন বলে; ও যেহেতু তারা এমনটা অস্বীকার করে যে এমন কিছু থাকতে পারে যা সর্বদাই বিদ্যমান, সেজন্য তারা এটাই বলতে বাধ্য যে, তাঁর জন্ম কোন এক কালে সীমাবদ্ধ। কেননা তিনি সর্বদা বিদ্যমান না হলে, তবে অবশ্যই একটা কাল রয়েছে যে কালে তিনি ছিলেন না; ও যখন একটা কাল রয়েছে যখন তিনি ছিলেন না, তখন কাল অবশ্যই তাঁর পূর্ববর্তী ছিল। অর্থাৎ, যিনি সর্বদা বিদ্যমান নন, তিনি অবশ্যই কালের মধ্যে বিদ্যমান হতে লাগলেন, অন্যদিকে যিনি কালের সীমা থেকে মুক্ত, তিনি অবশ্যই সনাতন। পুত্র যে সর্বদা বিদ্যমান, তেমন ধারণা প্রত্যাখ্যান করার যে যুক্তি তারা উপস্থাপন করে, তা এটাই যে, তাঁর সনাতন অস্তিত্ব তাঁর জন্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধী; কেমন যেন একথা স্বীকার ক’রে যে তিনি সর্বদা বিদ্যমান ছিলেন, তাতে আমরা তাঁর জন্ম অসম্ভব করে তুলতাম।

৬। আহা, কেমন নির্বোধ ও অভক্তিময় ধরনের আশঙ্কা। ঈশ্বরের খাতিরে কেমন অভক্তিময় উদ্বেগ। ‘হমোউসিওস’ শব্দে ও ‘সর্বদা বিদ্যমান পুত্র’ উক্তিে তারা যে অর্থ

আবিষ্কার করতে সমর্থন করে, মণ্ডলী তা অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে ও নিন্দা করে। কেননা মণ্ডলী সেই এক ঈশ্বরকে স্বীকার করে যাঁর থেকে সবই আছে; মণ্ডলী আমাদের প্রভু সেই এক যিশু খ্রিস্টকে স্বীকার করে যাঁর দ্বারা সবই আছে: এক যাঁর থেকে, এক যাঁর দ্বারা, এক যিনি সবকিছুর উৎস, এক যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। যাঁর থেকে সবই আছে, সেই ‘একে’ মণ্ডলী তাঁরই অধিকার চিনে নেয় যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়; ও যাঁর দ্বারা সবই আছে, সেই ‘একে’ মণ্ডলী তাঁর পরাক্রম আরাধনা করে যা তাঁর উৎসের পরাক্রম থেকে ভিন্ন নয়, কেননা ‘যাঁর থেকে’ ও ‘যাঁর দ্বারা’ উক্তিতে মণ্ডলী সৃষ্টিকর্মে উভয়ের ভূমিকা স্বীকার করে; ও যা সৃষ্ট হয়েছে, মণ্ডলী সেই সবকিছুর উপরে সেই অধিকার স্বীকার করে যা বিষয়ে উভয় সমানভাবে অংশী। [পবিত্র] আত্মায় মণ্ডলী ঈশ্বরকে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন ও অবিচ্ছেদ্য আত্মা বলে চিনে নেয়, কেননা মণ্ডলী প্রভু থেকে এটা শিখেছে যে, আত্মার হাড়-মাংস নেই (ক); এ এমন সতর্ক বাণী যাতে মণ্ডলী এমন ধারণায় পতিত না হয় যে, আত্মা হওয়ায় ঈশ্বরের উপর দৈহিক কষ্ট ও হানির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়, মণ্ডলী সেই এক ঈশ্বরকে চিনে নেয়, একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পুত্রকেও চিনে নেয়। মণ্ডলী সনাতন ও উৎপত্তি থেকে মুক্ত পিতাকে স্বীকার করে; মণ্ডলী এটাও স্বীকার করে যে, পুত্রের উৎপত্তি অনাদিকাল থেকে। তাঁর যে উৎপত্তি নেই তা নয়, বরং উৎপত্তিবিহীন যিনি সেই উৎপত্তিবিহীন থেকেই তিনি হলেন; তিনি যে স্বয়ং উৎপত্তিশীল তা নয়, বরং যিনি কারও থেকে উৎপন্ন নন ও সর্বদা আছেন, পুত্র তাঁর থেকে উৎপন্ন: তিনি অনাদিকাল থেকে সঞ্জাত, অর্থাৎ তিনি পিতার অনন্ততা থেকে জন্ম প্রাপ্ত। এইভাবে আমাদের বিশ্বাস ভ্রান্তমতপন্থীদের শঠতাপূর্ণ অভিমত থেকে মুক্ত, স্থিরীকৃত ও লিপিবদ্ধ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত, যদিও আজ পর্যন্ত আমাদের স্বীকারোক্তির সুচিন্তিত পক্ষসমর্থনও উপস্থাপিত হয়নি। তবু, [মহাসভার] পিতৃগণ যে অর্থে ‘হমোউসিওস’ শব্দটা ব্যবহার করেছেন, সেবিষয়ে, ও পুত্রের অনন্ততা ক্ষেত্রে আমাদের স্বীকারোক্তি বিষয়েও পাছে কোন না কোন সন্দেহ বর্তমান থাকে, সেজন্য আমি সেই প্রমাণমালা উপস্থাপন করেছি যা দ্বারা আমরা এতে নিশ্চিত হতে পারি যে, পুত্র সর্বদাই সেই সত্তায় বিদ্যমান, যে সত্তায় তিনি পিতা থেকে জনিত হয়েছিলেন, এবং পিতার পুত্রের জন্ম পিতার সেই সত্তার কোন কিছুই হ্রাসীকৃত করেনি যে সত্তায় পিতা

বিদ্যমান ছিলেন। ঈশ্বরের শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই পবিত্র মানুষেরা যখন বলেছিলেন যে পুত্র পিতার সঙ্গে ‘হমোউসিওস’, তখন আমি যে সমস্ত ভুল ও দোষত্রুটি উল্লেখ করেছি, তাঁরা সেই বিষয়গুলো আদৌ ব্যবহার করেননি। তবে, উপরোল্লিখিত সেই ‘উসিয়া’ শব্দ, ও পুত্র যে পিতার সঙ্গে ‘হমোউসিওস’, এক্ষেত্রে সমর্থন যে একমাত্র জনিত পুত্রের জন্মলাভ অস্বীকৃতি স্বরূপ, তেমন ভুল ধারণার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

৭। সেকালের ভ্রান্তমতের প্রলাপের বিরুদ্ধে উত্তম রক্ষা বলে গৃহীত ও ব্যবহৃত এই দু’টো উক্তি (ক) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজেদের নিশ্চিত করার জন্য আমি এমনটা মনে করি যে, বর্তমানকালের ভ্রান্তমতপন্থীদের একগুঁয়ে অবিশ্বাস ক্ষেত্রে জবাব দেওয়া ও সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্য দ্বারা তাদের অসার ও মারাত্মক শিক্ষা খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে উত্তম উপায়। তারা এতে দৃষ্ট করে যে, তারা তাদের সমর্থিত প্রতিটি বাক্যের জন্য প্রমাণ দিতে পারে; আসলে তারা তাদের সেই বাক্যগুলোর সঙ্গে কোন না কোন বচন যুক্ত করে যা পবিত্র শাস্ত্র থেকে নেওয়া; তবু তাদের বচনগুলো এমন অপব্যখ্যায় পূর্ণ যাতে সত্যের মত যা দেখতে কিন্তু যা বিকৃত বুদ্ধিতে প্ররোচিত, তা দিয়ে কেবল অশিক্ষিতদেরই ফাঁদে ফেলে দিতে পারে।

৮। কেননা সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা কেবল পিতার ঈশ্বরত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে পুত্রকে ঈশ্বরত্ব বঞ্চিত করতেই সচেষ্ট, কেননা লেখা আছে, শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক (ক); এবং বিধানে সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা কোন্টা এবিষয়ে বিধানপণ্ডিত যে প্রশ্ন প্রভুর কাছে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি একই উক্তি উচ্চারণ করেছিলেন, শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক (খ); আরও, তারা নাকি বলে যে, পল এমনটা ঘোষণা করেন যে, কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক (গ)। আরও, কেবল ঈশ্বরই প্রজ্ঞাবান তারা এমনটা জোর দিয়ে বলে যাতে পুত্রের জন্য প্রজ্ঞার অবশিষ্ট কিছু না থাকে; এতেও তারা প্রেরিতদূতের একটা বাণী উপস্থাপন করে, ‘যিনি তোমাদের সুস্থির করতে সক্ষম আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে ও যিশু খ্রিষ্টের বাণী-ঘোষণা অনুসারে, সেই রহস্যেরই প্রকাশ অনুসারে, যা

অনাদিকাল থেকে অকথিত ছিল, কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে, ও নবীদের পুস্তকগুলোর মাধ্যমে সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়েছে তারা যেন বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করে, যিশু খ্রিস্ট দ্বারা সেই অনন্য প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে' (৬)। তারা নাকি বলে কেবল তাঁর পক্ষেই জন্মলাভ করা সম্ভব নয় ও একা তিনিই সত্যকার, কেননা ইশাইয়া বলেন, তারা তোমাকে সত্যকার ঈশ্বর বলে ধন্য বলবে (৭) ও সুসমাচারে প্রভু নিজেই এবিষয়ে এই বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে (৮)। আরও, পুত্রের জন্য কোন মঙ্গলময়তা না রাখার জন্য একা তিনিই [অর্থাৎ পিতাই] যে মঙ্গলময়, এমনটা প্রমাণ করার জন্য তারা বলে যে সেবিষয়ে তাঁর দ্বারা বলা হয়েছিল, একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর (৯); এবং একা তিনিই প্রতাপের অধিকারী, কারণ পল বলেছিলেন, নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য পরাক্রম, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু (১০)। আরও, তারা এতে নিশ্চিত যে, পিতা অপরিবর্তনশীল ও রূপান্তরের অতীত, কারণ নবীর মধ্য দিয়ে তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমি অপরিবর্তনশীল (১১), ও প্রেরিতদূত যাকোব বলেন, তাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই (১২); তারা তাঁকে ন্যায়বান বিচারকর্তা বলে সমর্থন করে, কারণ লেখা আছে, ঈশ্বর সেই ন্যায়বান বিচারকর্তা, যিনি শক্তিশালী ও ধৈর্যশীল (১৩); তিনি সকলের প্রতি যত্নশীল, কারণ পাখিদের কথা বলতে গিয়ে প্রভু বলেছিলেন, এবং তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে থাকেন (১৪) ও এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না; তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে (১৫) তারা এও বলে যে, পিতা সবকিছুর বিষয়ে পূর্বজ্ঞানের অধিকারী, যেইভাবে সেই ধন্য সুসান্না বলেন, হে সনাতন ঈশ্বর, তুমি যে যত গোপন বিষয় জান, তুমি যে সবকিছু ঘটবার আগেও সেই সবই জান (১৬)। আরও, তাঁকে ধারণ করা সম্ভব নয়, যেইভাবে লেখা আছে, স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ। আমার জন্য তোমরা কোথায় গৃহ গেঁথে তুলবে? কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান? আমারই হাত এই সবকিছু গড়েছে; এসব কিছু আমারই (১৭); তিনি সবই নিজেতে ধারণ করে থাকেন, যেইভাবে এবিষয়ে পল সাক্ষ্যদান করে বলেন, কারণ

তঁারই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত (ত) ও সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি নেমে যাই, সেখানেও তুমি আছ। যদি উষার আগে আমার পাখা ধরি ও সমুদ্রের অতীতে বসবাস করি, সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করবে ও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখবে (খ); তিনি দেহও বিহীন, কারণ লেখা আছে, ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়; কারণ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ (দ); তিনি যে অমরতার অধিকারী ও অদৃশ্যমান, এবিষয়ে পল বলেন, তিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী ও অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে তাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয় (ধ), ও একই বিষয়ে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র ছাড়া যিনি পিতার বুকে বিরাজমান (ন); আরও, একা তিনিই জন্মলাভ-বিহীন হয়ে থাকেন, কারণ লেখা আছে, ‘আমি সেই আছি যিনি আছি’; আরও, তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: যিনি আছেন তিনিই আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন (প), এবং যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছিল, হে প্রভু, তুমি যে প্রভু (ফ)।

৯। এমন কেইবা লক্ষ করবে না যে এই সমস্ত বচন চালাকি ও মিথ্যায় পূর্ণ? বিষয়গুলো যতই কুটিলতার সঙ্গে এলোমেলো করা হয়েছে ও নানা পাঠ্য যোগ করা হয়েছে, তবু শঠতা ও মূর্খতা হলো সেই সাক্ষ্য যা কুটিলতা ও অদক্ষতার শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টাকে একেবারে চিহ্নিত করে। উদাহরণ যোগে, বিশ্বাস সংক্রান্ত তাদের উপস্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্যে এটাই রয়েছে যে, তারা পিতাকে কেবল অসঞ্জাত বলে স্বীকার করে; কেমন যেন আমাদের পক্ষের কেউ না কেউ এমনটা ভাবতে পারত যে, যাঁর দ্বারা সবই আছে, তাঁকে যিনি জনিত করেছিলেন, তিনি বাইরের কোন উৎস থেকে নিজের অস্তিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে ‘পিতা’ নাম বহন করেন, এটাই তাঁকে তাঁর পুত্রের অস্তিত্বশীলতার কারণ বলে প্রকাশ করে। সেই ‘পিতা’ নামটা এমন কোন ইঙ্গিত দেয় না যে, যিনি সেই নাম বহন করেন তিনি অন্য একজন থেকে আগত, বরং আমাদের স্পষ্ট দেখায়, যিনি জনিত, তিনি কার্ থেকে জনিত। সুতরাং এসো, পিতা ঈশ্বরের যা স্বকীয়,

তা তাঁর স্বকীয় ও গুপ্ত বলে তাঁর কাছে রাখি একথা স্বীকার ক'রে যে, তাঁর মধ্যে সনাতন পরাক্রমের এমন প্রতাপ বিরাজিত যা জন্মের অতীত। আমি এতে নিশ্চিত যে, যখন পিতা ঈশ্বর সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিতে কতগুলো গুণাবলি তাঁর স্বকীয় বলে ও তাঁর নিজ থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে অনুধাবিত, তখন কেউই এবিষয়ে সন্দেহ করতে পারে না যে, সেই স্বীকারোক্তির কারণ এটা হলো, যাতে তিনি ছাড়া অন্য কেউই সেই গুণাবলির অংশী না হয়। কেননা যখন সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা এমনটা বলে যে একা তিনিই সত্যকার, একা তিনিই ধর্মময়, একা তিনিই প্রজ্ঞাবান, একা তিনিই অদৃশ্যমান, একা তিনিই মঙ্গলময়, একা তিনিই শক্তিশালী, একা তিনিই অমরতার অধিকারী, তখন তারা এই 'একা' শব্দটা এমন বাধা হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে যাতে পুত্রকে এই সমস্ত গুণাবলির সহভাগিতা থেকে বিচ্ছেদ করা হয়। তারা নাকি বলে, যিনি একা, তাঁর যা স্বীয় ও স্বকীয়, সেবিষয়ে তাঁর কোন শরিক নেই। কিন্তু যদি আমরা এমনটা ধরে নিই যে সেই গুণাবলি কেবল পিতাতে বিরাজিত কিন্তু পুত্রেও বিরাজিত নয়, তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে পুত্র-ঈশ্বর সত্যবিহীন, প্রজ্ঞাবিহীন, দৃশ্যগত ও জড় পদার্থে গড়া দৈহিক একটা কিছু, অমঙ্গলকর, দুর্বল ও অমরতা-বিহীন; কারণ এভাবে আমরা তাঁকে সেই সমস্ত গুণাবলি থেকে বঞ্চিত করি যেগুলোর একাই অধিকারী হলেন পিতা।

১০। তথাপি, আমরা যারা সেই পরম সিদ্ধতম মর্যাদা ও পূর্ণ ঈশ্বরত্ব বিষয়ে আলোচনা করব যা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পুত্রে আরোপণীয়, সেই আমরা এবিষয়ে এমনটা দ্বিধা করি না যে আমাদের পাঠকগণ এমনটা ভাববে যে, পুত্র সংক্রান্ত আমাদের সুন্দর কথন পিতা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কেমন যেন পুত্রেতে আরোপিত যে প্রশংসা, তা পিতা থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে (ক)। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা উল্ট, কেননা পুত্রের সম্মান বরং হলো পিতার কাছে মর্যাদা আরোপণ; ও প্রণেতা এতেই গৌরবময় হবেন যে, তেমন গৌরবের যোগ্য যিনি, তিনি তাঁর নিজ থেকে আগত। জন্মসূত্রে পুত্রের যা, তা ছাড়া পুত্র অন্য কিছুর অধিকারী নন, এবং জনিতজনের সম্মানের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তা জনকের সম্মানে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীদের অভিযোগ স্তব্ধ করা হলো, কেননা আমরা যেইভাবে শিক্ষা দেব, সেই অনুসারে, পুত্রের সহজাত সমস্ত মহিমা তাঁরই মহত্তর মর্যাদায় ফিরে যাবে যিনি তেমন পুত্রকে জনিত করেছেন।

১১। পিতা সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে পুত্রকে হ্রাসীকৃত করার তাদের [অর্থাৎ আরিউসের ভ্রাতৃত্বমতপন্থীদের] সঙ্কল্প ব্যক্ত করার পর আমাদের পরবর্তী পর্যায় হলো সেই সমস্ত উক্তি শোনা যা দ্বারা তারা পুত্র সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে। কেননা, যেহেতু আমাদের কাজ হলো তাদের প্রত্যেকটা অভিযোগে ধারাবাহিকভাবে উত্তর দেওয়া ও পবিত্র শাস্ত্রের উক্তির প্রমাণে তাদের তত্ত্বসমূহের অভক্তি প্রকাশ করা, সেজন্য, পিতা সম্পর্কে তারা যা বলে, তাতে আমাদের পক্ষে সেই সিদ্ধান্তসমূহ যোগ করা দরকার যা তারা পুত্র সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছে, যাতে পিতা ও পুত্র সংক্রান্ত তাদের স্বীকারোক্তির সঙ্গে পিতা সংক্রান্ত তাদের স্বীকারোক্তি তুলনা করে আমরা তাদের উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের পর পর আমাদের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে পারি। তারা এটাই স্বরণ করায় যে, পুত্র আগেকার কোন পদার্থ থেকে উৎপন্ন নন কারণ তাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্ট হয়েছিল; তিনি ঈশ্বর থেকেও জনিত নন কারণ ঈশ্বর থেকে কিছুই বের করা যায় না; কিন্তু, তারা বলে, যা ছিল না, তা থেকেই তিনি হয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের সিদ্ধতাপ্রাপ্ত একটা সৃষ্টবস্তু, যদিও তাঁর অন্যান্য সৃষ্টবস্তু থেকে ভিন্ন। তারা এমনটা সমর্থন করে যে তিনি সৃষ্টবস্তু, কারণ লেখা আছে, আপন কর্মকাণ্ডে আপন পথসমূহের সূচনায় প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন (ক); আরও, পুত্র ঈশ্বরের সিদ্ধতম কর্ম, যদিও তাঁর অন্যান্য কর্ম থেকে ভিন্ন, কারণ হিব্রুদের কাছে পল লেখেন, তাঁকে স্বর্গদূতদের তুলনায় তত মহান করা হয়েছিল, তাঁদের নামের তুলনায় তিনি যত মহান নামের অধিকারী (খ); আরও, এজন্য, হে পবিত্র ভাইয়েরা, তোমরা যারা স্বর্গীয় এক আহ্বানের অংশীদার, আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের কথা, সেই যিশু খ্রিষ্টেরই কথা বিবেচনা কর, যিনি, তাঁকে যিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত (গ)। এবং পুত্রের পরাক্রম, কর্তৃত্ব ও ঈশ্বরত্বকে অকেজো করার লক্ষ্যে তারা তাঁর এই উক্তিই বিশেষভাবে ব্যবহার করে, ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’ (ঘ)। তবু তারা এটা মেনে নেয় যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবদের একজন নন, কারণ লেখা আছে, সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল (ঙ)। এইভাবে তারা তাদের ঈশ্বরনিন্দাজনক তত্ত্ব তাদের এই কথায় একত্রিত করে:

[পত্রটা আরিউস দ্বারা তখনই আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্দারের প্রতি পাঠানো হয়েছিল যখন আরিউস নিকোমেদিয়াতে বসবাস করত; পত্রটা নিকেয়া-মহাসভার আগে

লেখা হয়েছিল, এবং পত্রের মধ্য দিয়ে আরিউস ভ্রান্তমত-অভিযোগ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অভিপ্রায় করছিল।]

১২। [ভ্রান্তমতপন্থীদের বিশ্বাস-সূত্রের প্রথম অংশ] ‘আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করি যিনি একাই অনির্মিত, একাই সনাতন, একাই উৎপত্তিহীন, একাই সত্যকার, একাই অমরতার অধিকারী, একাই মঙ্গলময়, একাই প্রতাপশালী, সবকিছুর স্রষ্টা, বিধানের, নবীদের ও নূতন নিয়মের অপরিবর্তনশীল, রূপান্তরের অতীত, ধর্মময় ও মঙ্গলময় নিরূপক ও ব্যবস্থাপক। আমরা এমনটা বিশ্বাস করি যে, এই ঈশ্বর সর্বযুগের পূর্বে সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে জনিত করলেন যাঁর দ্বারা তিনি জগৎ ও সমস্ত কিছু নির্মাণ করেছিলেন; এটাও বিশ্বাস করি যে, তিনি তাঁকে জন্ম দিলেন রূপের দিক দিয়ে নয় কিন্তু সত্যিকারে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে, ফলে সেই পুত্র রূপান্তরের অতীত ও অপরিবর্তনশীল, ঈশ্বরের সিদ্ধতম সৃষ্টজীব কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবদের একজনের মত নয়, তাঁর নিজের কর্ম কিন্তু তাঁর অন্যান্য কর্মের একটা নয়; বালেন্তিনুস যেভাবে সমর্থন করত যে পুত্র হলেন পিতার সম্প্রসারণ, সেইভাবে নয়; মানিখেউস (ক) যেভাবে সমর্থন করত যে পুত্র পিতার সমসত্তা বিশিষ্ট একটা অংশ, সেইভাবেও নয়; সেই সাবেল্লিউসের মতও নয় যে একাকীত্বকে পৃথক করে ও প্রথমজনকে পিতা ও দ্বিতীয়জনকে পুত্র বলে অভিহিত করে; সেই হিয়েরাকাসের মতও নয় যে প্রদীপ থেকে প্রদীপ বা দু’টো শিখা বিশিষ্ট বাতি উপস্থাপন করে; সেইভাবেও নয় যা অনুসারে তিনি আগে ছিলেন ও পরবর্তীকালে পুত্রে সঞ্জাত বা নবীনভাবে সৃষ্ট হলেন, এ এমন অভিমত যা তুমি নিজেই, হে ধন্য পোপ (খ), মণ্ডলীতে ও ভ্রাতাদের সমাবেশে প্রকাশ্যে বারে বারে তাদের নিন্দা করেছিলে যারা তেমন অভিমত অনুপ্রবেশ করায়। বরং, আমরা যেইভাবে বলেছিলাম, সেইভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কালের ও যুগগুলোর পূর্বে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সৃষ্ট হয়েছিলেন, ও পিতা থেকে জীবন ও অস্তিত্ব গ্রহণ করে থাকেন ও সমসত্তার অধিকারী সেই পিতা থেকে সমস্ত গৌরবও গ্রহণ করে থাকেন। কেননা যখন পিতা তাঁকে সমস্ত বিষয়ে উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, তখন পিতা, উৎপন্ন নয় যা কিছু তাঁর নিজস্ব অধিকার, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি, কেননা তিনি হলেন সবকিছুর উৎস।’

১৩। [ভ্রান্তমতপন্থীদের বিশ্বাস-সূত্রের বাকি অংশ]। ‘ফলত তিনটে সত্তা রয়েছে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এদিকে, পিতা হলেন সবকিছুর আদিকারণ, উৎপত্তিহীন ও সম্পূর্ণরূপে একাকী; অন্যদিকে, কালের বাইরে পিতা দ্বারা প্রদত্ত, ও যুগগুলোর পূর্বে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত সেইপুত্র জন্ম নেবার আগে ছিলেন না, কিন্তু কালের বাইরে সবকিছুর পূর্বে জন্ম নিয়ে একাই সেই পিতা থেকে একাই অস্তিত্ব পেলেন; কেননা তিনি সনাতনও নন, সহ-সনাতনও নন, পিতার সঙ্গে সহ-অসৃষ্টও নন, পিতার সঙ্গে অস্তিত্বের অধিকারীও নন, যেভাবে কেউ না কেউ বলে থাকে যারা দু’টো সঞ্জাত-নয় এমন আদিকারণ অনুপ্রবেশ করায়। কিন্তু অভিভাজ্য ও সবকিছুর উৎপত্তি হওয়ায় ঈশ্বর সবকিছুর পূর্বেও বিদ্যমান; যার জন্য তিনি পুত্রেরও পূর্বে বিদ্যমান, যেহেতু আমরা তোমার কাছ থেকে তোমার প্রকাশ্য প্রচারকর্মে শিখেছি। তাই, যেহেতু তিনি [অর্থাৎ পুত্র] ঈশ্বর থেকে অস্তিত্ব, গৌরব ও জীবন প্রাপ্ত ও সবকিছু তাঁর কাছে প্রদত্ত, সেজন্য সেই [পিতা] ঈশ্বর নিজেই তাঁর উৎস, যিনি তাঁর ঈশ্বর হওয়ায় তাঁর উপর আধিপত্য রাখেন যেহেতু তাঁর পূর্বে বিদ্যমান। এবং সেই সমস্ত উক্তি সম্পর্কে যেমন “তাঁর থেকে”, “গর্ভ থেকে”, ও “আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি”, যদি এই উক্তিগুলো এমনটা বোঝায় যে পিতা নিজের অনন্য সত্তার একটা অংশকে ও কেমন যেন নিজের সম্প্রসারণকে প্রসারিত করেন, তাহলে পিতা এদের অভিমত অনুসারে হবেন যুক্ত, বিভাজ্য, পরিবর্তনশীল ও দেহবিশিষ্ট। তবে, তাদের সমর্থিত তত্ত্ব অনুসারে, যা দেহগত, দেহ-ছাড়া ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছু বৈশিষ্ট্যসমূহের অধীন হবেন।’

১৪। এমনটাই তাদের ভ্রান্তি, এমনটাই তাদের মারাত্মক শিক্ষা। তেমনটা সমর্থন করার জন্য তারা ঐশউক্তির সাক্ষ্য দখল করে, সেটার অর্থ বিকৃত করে ও মানব অজ্ঞতাকে সুযোগ হিসাবে হাতিয়া] ক’রে সেই সাক্ষ্যগুলো সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে। অথচ এতে কেউই যেন সন্দেহ না করে যে, ঈশ্বরের বিষয়াদি উপলব্ধি করার জন্য ঈশ্বরের শিক্ষাবাগীর উপরে নির্ভর করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কেননা মানব দুর্বলতা নিজের কোন শক্তির বলে স্বর্গীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম; মানব অজ্ঞতাও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে অক্ষম। আমাদের মধ্যে সৃষ্ট ও মাংসময় যা রয়েছে, সেই সমস্ত কিছু, বা আমাদের জীবনের সঙ্কল্প পূরণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের দেওয়া

যুক্তিও স্রষ্টার স্বরূপ ও কর্মকাণ্ড নির্ণয় করতে ও সেবিষয়ে কথা বলতে অক্ষম। আমাদের জ্ঞান স্বর্গীয় জ্ঞানের পর্যায়ে উঠতে অক্ষম, আমাদের উপলব্ধি-শক্তিও বোধগম্য নয় সেই পরাক্রম ধারণা করতে দুর্বল। নিজের বিষয়ে ঈশ্বর যা বলেন, আমাদের তা-ই বিশ্বাস করা দরকার, ও তিনি আমাদের জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে যা নিজে দিতে প্রসন্ন হয়েছেন তা নম্রচিত্তে গ্রহণ করা দরকার। আমাদের বেছে নিতে হবে, হয় বিজাতীয়দের মত তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করব, না হয়, তিনি যেইভাবে আছেন, সেইভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখব; এবং তেমনটা করার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় এটাই যে, তিনি যেভাবে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, আমরা সেইভাবে তাঁকে উপলব্ধি করব। সেজন্য মানুষদের ব্যক্তিগত অভিমত বন্ধ হোক; ও মানবীয় বিচারবুদ্ধি ঐশ্বরিক ভাবে দেওয়া বাধা অতিক্রম করায় ক্ষান্ত হোক। এইভাবে আমরা ঈশ্বর বিষয়ে যত ঈশ্বরনিন্দুক ও অভক্তিময় ধারণা এড়িয়ে ঈশ্বরের দেওয়া আত্মপ্রকাশ আঁকড়িয়ে ধরে থাকব। আমাদের অনুসন্ধানের প্রতিটি বিষয় তাঁরই নির্দেশের আলোতে মেনে নেব যিনি আমাদের বিষয়বস্তু স্বরূপ। যে যে বাক্য নিজ নিজ প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, অদক্ষ শ্রোতাকে প্রবঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করার জন্য তেমন বাক্যগুলো যুক্ত করার প্রচেষ্টা থাকবে না। শব্দগুলো যে পরিস্থিতিতে উচ্চারিত, সেগুলোর অর্থ সেই পরিস্থিতি অনুসারেই নির্ণয় করা হবে। কথাগুলো পরিস্থিতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে, [কথাগুলোর অর্থ পাণ্টাবার জন্য] পরিস্থিতিকে কথাগুলোর উপরে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। যাই হোক, আমরা আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করব; যে পরিস্থিতিতে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিল, আমরা সেই পরিস্থিতি উপস্থাপন করব ও সেইসাথে কথাগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করব, প্রতিটি বিষয়বস্তু ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপস্থাপন করা হবে।

১৫। সেইসব কিছু মध्ये সেই ভ্রাতৃত্বপন্থীদের প্রথম ও প্রধান বচন এটা; তারা নাকি বলে, আমরা অনন্য ঈশ্বরকে স্বীকার করি কারণ মোশি বলেছিলেন, শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক (ক)। কিন্তু এই সত্য কি এমন, যা বিষয়ে কেউ না কেউ কখনও সন্দেহ করতে দুঃসাহস করেছে? নাকি কখনও কোন বিশ্বাসীর কথা জানা হলো যে, সেই বচন যেভাবে ব্যাপারটা স্বীকার করে, তার চেয়ে ভিন্ন ভাবে স্বীকার করল যে, এক ঈশ্বর আছেন যাঁর থেকে সবই হয়েছে, এক পরাক্রম আছেন যাঁর জন্ম হয়নি ও ঈশ্বর

নিজেই সেই উৎপত্তিহীন পরাক্রম? অথচ ঈশ্বরের ঐক্য সংক্রান্ত এই ব্যাপার এমন, যা তাঁর পুত্রের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করার সুযোগ দেয় না। কেননা মোশি, বা আরও সূক্ষ্ম ভাবে কথা বলতে গেলে, মোশির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, যারা মিশরে ও মরুপ্রান্তরেও নানা প্রতিমা ভক্তি করত ও কল্পিত দেব-দেবীকে পূজা করত, সেই জনগণের জন্য প্রথম আঙা হিসাবে এটাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে। তেমন আঙা ছিল সত্য ও যুক্তি বিশিষ্ট, কেননা যাঁর দ্বারা সবই হয়, সেই ঈশ্বর এক। কিন্তু এসো, একটু দেখি, যাঁর দ্বারা সবই হয়, এই মোশি তাঁকেও ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছিলেন কিনা। তাঁর পুত্র ঈশ্বরত্বের অংশী হলে ঈশ্বর তো ঈশ্বর হয়ে থাকেন, তাঁর কাছ থেকে কিছুই কেড়ে নেওয়া হয় না। কেননা তিনি হলেন ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, এক থেকে এক; এজন্যই ঈশ্বর এক, যেহেতু ঈশ্বর তাঁ [অর্থাৎ ঈশ্বর] থেকে। একই প্রকারে, পিতা ঈশ্বর যে এক, এজন্য পুত্র যে কম-ঈশ্বর তা নয়, কেননা তিনি হলেন ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র; তিনি পিতাকে ঐক্য-বঞ্চিত করবেন এজন্যই যে তিনি অনাদিকাল থেকে অসঞ্জাত নন তা নয়, এবং তিনি যে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন ধরনের স্বরূপের অধিকারী তাও নয়, কেননা তিনি ঈশ্বর থেকে জন্ম নিলেন। এক্ষেত্রে যদিও আমাদের এমনটা সন্দেহ করতে নেই যে তিনি ঈশ্বর থেকে সেই জন্মের গুণে নিজেই ঈশ্বর, ফলত আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে শুধু এক ঈশ্বর আছেন, তবু এসো, দেখি, ‘তোমাদের ঈশ্বর সেই প্রভু এক’ ইব্রায়েলকে যিনি একথা প্রচার করেছিলেন, সেই মোশিও পুত্রের ঈশ্বরত্বকে ঘোষণা করেছিলেন কিনা। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে আমাদের স্বীকারোক্তি যথাযথ করার জন্য আমাদের সেই মোশির সাক্ষ্য ব্যবহার করা দরকার যাঁর অধিকারের উপর ভ্রান্তমতপন্থীরা ‘অনন্য ঈশ্বর’ বিষয়ক স্বীকারোক্তির জন্য নির্ভর করে; এই ভিত্তিতে তারা এমনটা মনে করে যে, তারা পুত্রের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করতে পারে।

১৬। সুতরাং, ‘এক পিতা ঈশ্বর, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু আছে; এবং এক যিশু খ্রিষ্ট, আমাদের সেই প্রভু যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু আছে’ (ক), যেহেতু প্রেরিতদূতের এই বাণী ঈশ্বর বিষয়ক সূক্ষ্ম ও পূর্ণ স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করে, সেজন্য এসো, দেখি জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে মোশি কিনা বলেন। তাঁর বাণী এ, ‘ঈশ্বর বললেন, জলরাশি দু’ভাগে পৃথক করার জন্য জলরাশির মাঝখানে একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক। আর সেইমতই হল;

এবং ঈশ্বর তেমন পরদা তৈরি করলেন ও পরদার নিচের জলরাশি থেকে পরদার উপরের জলরাশি পৃথক করে দিলেন' (খ)। তাই তুমি এখানে সেই ঈশ্বরকে পাও 'যাঁর থেকে', ও সেই ঈশ্বরকে পাও 'যাঁর দ্বারা'। তুমি যদি এটা অস্বীকার কর, তাহলে তোমাকে আমাদের বলতে হবে, কার্ দ্বারাই বা সৃষ্টিকর্মে ঈশ্বরের কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল, নইলে তোমার ব্যাখ্যার জন্য, তখনও অসৃষ্ট বস্তুগুলো ক্ষেত্রে এমন বাধ্যতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করতে হবে যা, ঈশ্বর 'একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক' বললেই, সেই পরদাকে নিজেকে স্থাপন করার জন্য বাধ্য করল। তেমন ব্যাখ্যা শাস্ত্রের স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে খাপ খায় না। কেননা নবী যেইভাবে বলেন (গ), সবই শূন্য থেকে হয়েছিল; অর্থাৎ তা অস্তিত্বশীল বস্তুর রূপান্তর ছিল না, কিন্তু যা ছিল না, তা ছিল সিদ্ধতাপ্রাপ্ত কিছুতে সৃষ্টি। কার্ দ্বারা? সুসমাচার-রচয়িতার কথা শোন, 'সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল'; তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর এই ব্যক্তি কে, তবে সেই একই সুসমাচার-রচয়িতা তোমাকে বলবেন, আদিতে ছিলেন বাণী: বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল (ঘ)। এবং তুমি যদি সেই ধারণা অস্বীকার করতে চাও যা অনুসারে পিতাই 'সেই পরদা হোক' বলেছিলেন, তাহলে নবী তোমাকে উত্তরে বলবেন, তিনি কথা বলতেই সবই হল, তিনি আঞ্জা দিতেই সবই সৃষ্ট হল (ঙ)। 'সেই পরদা হোক', লিপিবদ্ধ এই বাণীতে এটাই দেখানো হয় যে, বচনটা পিতা দ্বারা উচ্চারিত; কিন্তু সেই যে বচন অনুসারে ঈশ্বর সেই কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেই বচনের পরবর্তী কথা তথা 'আর সেইমতই হল', তাতে আমাদের সেই ব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে যিনি কর্মটা সম্পাদন করেছিলেন। 'তিনি কথা বলতেই সবই হল', অর্থাৎ তিনি যে তেমনটা শুধু ইচ্ছা করলেন তা নয়, তা নির্মাণও করেছিলেন; 'তিনি আঞ্জা দিতেই সবই সৃষ্ট হল', অর্থাৎ, যাতে করে ঈশ্বর ও যা কিছু সৃষ্ট হওয়ার কথা, সেই উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা যেন বন্ধ হয় এজন্যই যে সেই সবকিছু তাঁকে প্রীত করার জন্য অস্তিত্ব পেয়েছিল তা নয়। যাঁর থেকে সবই হয়, সেই ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য সেই আঞ্জা দেন, ও যাঁর দ্বারা সবই হয়, সেই ঈশ্বর আঞ্জাটা পূরণ করেন। তাই আমরা এক ও একই নাম দ্বারা তাঁকেই স্বীকার করি যিনি আঞ্জা দিয়েছিলেন ও তাঁকেও স্বীকার করি যিনি আঞ্জা পূরণ করেছিলেন। তোমার এমন দুঃসাহস হলে যার জন্য এমনটা অস্বীকার করবে

যে ‘ঈশ্বর ... তৈরি করলেন’ বচনটা পুত্রকে নির্দেশ করে, তাহলে কেমন করে এই বচনটা ব্যাখ্যা করবে, তথা ‘সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’? অথবা তুমি কেমন করে প্রেরিতদূতের এই বাণী, ‘এক যিশু খ্রিষ্ট, আমাদের সেই প্রভু যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু আছে’ বা ‘তিনি কথা বলেই সবই হল’ বচনগুলো ব্যাখ্যা করবে? এই অনুপ্রাণিত বচনগুলো যদিও তোমার দুঃসাহস জয় করতে অকৃতকার্য হয়, তবু ‘শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক’ বচনটা ঈশ্বরের পুত্রের ঈশ্বরত্বকে বাতিল করে না, কেননা যিনি এই বচন উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি জগৎপত্তনের সময়ে তাঁকে ঈশ্বর ও পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এসো, আমরা দেখি, আজ্ঞা দানকারী ঈশ্বর ও আজ্ঞা পূরণকারী ঈশ্বরের মধ্যকার পার্থক্য (৮) থেকে আমরা কেমন জ্ঞান-বৃদ্ধি লাভ করতে পারি। কেননা ‘তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই সৃষ্ট হল’ বচনে যে একটিমাত্র ও একাকী ব্যক্তি নির্দেশিত, তেমনটা ধরে নেওয়া যদিও আমাদের মানবীয় যুক্তিরও কাছে অদ্ভুত লাগে, তবু সমস্ত সন্দেহ নিঃশেষ করার লক্ষ্যে আমাদের সেই ঘটনাসমূহ ব্যক্ত করতে হবে যা জগতের সৃষ্টির পরে ঘটেছিল।

১৭। জগৎ সম্পন্ন হওয়ার পর তার বাসিন্দাকে গড়া দরকার হল; তখনই এবিষয়ে এই বাণী উচ্চারিত হল, ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’ (ক)। আরও, ‘ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে তাকে নির্মাণ করলেন’ (খ)। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি এমনটা মনে কর যে ঈশ্বর সেই বাণীগুলো নিজের কাছে উচ্চারণ করেছিলেন? নাকি তুমি এটাই বোঝ যে, তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে নয় বরং অন্যজনকে উদ্দেশ্য করে সেই বাণী উচ্চারণ করেছিলেন? তুমি যদি উত্তরে বল যে তিনি একেবারে একাই ছিলেন, তাহলে তিনি নিজের মুখ দ্বারা তোমার ধারণা খণ্ডন করেন, কেননা তিনি বলেন, ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’। ঈশ্বর আমাদের কাছে সেই বিধানদাতার [অর্থাৎ মোশির] মধ্য দিয়ে এমনভাবে কথা বললেন যা আমাদের কাছে বোধগম্য, অর্থাৎ, তিনি তাঁর নিজের কর্ম বিষয়ে এমন ভাষার মধ্য দিয়েই আমাদের অবগত করলেন যে ভাষা তিনি নিজেই ইচ্ছা করলেন আমরা ব্যবহার করব। প্রকৃতপক্ষে, যাঁর দ্বারা সবই হয়েছিল, সেই ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ে এই বচন দু’টোতে

একটা ইঙ্গিত রয়েছে, তথা, ‘ঈশ্বর বললেন, একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক’ ও পরবর্তীতে, ‘ঈশ্বর তেমন পরদা তৈরি করলেন’। কিন্তু, আমরা এটাই ধরে নিলে যে তিনি সৃষ্টি সংক্রান্ত আজ্ঞা নিজেকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করেছেন ও পরে নিজেই তা পূরণ করেছেন, পাছে আমরা ঈশ্বরের এই কথাগুলো অকেজো ও অর্থশূন্য মনে করি, (কেননা, যখন সৃষ্টি ক্ষেত্রে আজ্ঞা পূরণের জন্য তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট ছিল, তখন বাণী দ্বারা নিজেকে আজ্ঞা দেওয়ার চেয়ে একাকী সেই ঈশ্বরের বেলায় আর কীবা অদ্ভুত থাকতে পারত?), সেজন্য তিনি এমনটা ইচ্ছা করলেন, যাতে আমরা এবিষয়ে অধিক নিশ্চিত হই যে, সেই বাণীগুলো তাঁকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত ছিল না। যখন তিনি বললেন, ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’, তখন তিনি একটা সাহচর্যের কথা উত্থাপন করলেন। প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ একাকী, তার পক্ষে সাহচর্যের কথা বলা সম্ভব নয়। আরও, ‘এসো, আমরা নির্মাণ করি’ উক্তিও একাকীত্বের সঙ্গে মিল রাখে না, ‘আমাদের’ শব্দও ব্যবহৃত করা সম্ভব নয় যদি না সঙ্গী একজন থাকে। ‘আমরা’ ও ‘আমাদের’ শব্দ দু’টো নিজেকে উদ্দেশ্য ক’রে কথা বলছেন এমন একাকী ঈশ্বরের বেলায় অমিল দেখায়; একই অমিল তখনও বর্তমান যখন কথাটা এমন একজনকে উদ্দেশ্য ক’রে উচ্চারিত, যে কথা বলছে তার সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে যদি তুমি বল যে তিনি একাকী, তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি কি এমনটা ধরে নিচ্ছ যে তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন? তিনি যে নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন তুমি যদি এমনটা না বোঝ, তাহলে কেমন করে ধরে নিতে পার যে তিনি একাকী ছিলেন? যে কেউ অনন্য ও একই ব্যক্তি সে-ই একাবী হবে, যে কেউ অনন্য নয় ও একই ব্যক্তি নয় সে একাকী হবে না। সতরাং যে কেউ একাকী, তার বেলায় ‘আমি’ ও ‘আমার’ শব্দদ্বয় মানায়; কিন্তু যে কেউ একাকী নয়, তার বেলায় ‘আমরা’ ও ‘আমাদের’ শব্দদ্বয় মানায়।

১৮। তাই, যখন আমরা পড়ি, ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’, তখন [‘আমরা’ ও ‘আমাদের’] শব্দদ্বয় এমনটা প্রকাশ করে যে, একাকী এক ঈশ্বরও নেই, ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়ে বর্তমান এক ঈশ্বরও নেই; এজন্য আমাদেরও স্বীকার করতে হবে যে তিনি একাকই নন, ও সেই ব্যক্তি দু’জন ভিন্ন নন।

‘আমার আপন প্রতিমূর্তি’ নয় কিন্তু ‘আমাদের আপন প্রতিমূর্তি’ উক্তিটা এমনটা প্রমাণ করে যে, উভয় ব্যক্তিতে একটামাত্র স্বরূপ অধিকৃত। কিন্তু শব্দ-ভিত্তিক একটা বিষয় অপরিপাক প্রমাণ বলে গণ্য, যদি না উচ্চারিত কথাগুলোর পরে বাস্তব ফলাফলও সাধিত না হয়। কেননা লেখা আছে, ‘ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে তাকে নির্মাণ করলেন’। যদি সেই বাণী ছিল নিজের কাছে উচ্চারিত একাকী ঈশ্বরের বাণী, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, এই শেষ উক্তিতে তুমি কী অর্থ আরোপ করতে? কেননা সেটায় আমি ত্রিবিধ ইঙ্গিত দেখতে পাই তথা, নির্মাতা, নির্মিত ও নমুনার প্রতি ইঙ্গিতত্রয়। যে নির্মিত, সেটা হলো মানুষ, কেননা ঈশ্বর তাকে নির্মাণ করলেন, ও যাকে তিনি নির্মাণ করলেন, তাকে তিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করলেন। যদি আদিপুস্তক একাকী এক ঈশ্বরের কথা বলত, তবে উক্তিটা অবশ্যই হত, ‘নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে তাকে নির্মাণ করলেন’। কিন্তু যেহেতু পুস্তকটা সুসমাচারের রহস্য বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছিল, সেজন্য পুস্তকটা দু’টো ঈশ্বরের নয়, কিন্তু ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ এর কথা বলল, কেননা সেই মানুষের কথা বলে যে ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মিত। তাই আমরা এমনটা দেখতে পাই যে [পুত্র] ঈশ্বর মানুষকে এমন একটা প্রতিমূর্তি অনুসারে গড়লেন যা নিজের ও [পিতা] ঈশ্বরের যৌথ প্রতিমূর্তি ও উভয়ের সাদৃশ্য অনুযায়ী; তাতে একজন প্রণেতা যে উল্লিখিত, তা আমাদের এমনটা নিষেধ করে যেন না মনে করি যে তিনি একাকী ছিলেন; এবং তাঁর যে কাজ উভয়ের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে সাধিত, সেই কাজ প্রমাণ করে যে একজনের ঈশ্বরত্ব ও অন্যজনের ঈশ্বরত্বের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য নেই।

১৯। এসবকিছু বলার পর আরও বেশি বিষয় উপস্থাপন করা সময় নষ্ট করা মনে হতে পারে, কেননা ঈশ্বর সংক্রান্ত সত্যগুলো ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি তত দরকার হয় না, কিন্তু তা ঘোষিত হওয়াই যথেষ্ট (ক)। তবু এবিষয়ে যা কিছু প্রকাশ করা হয়েছে, আমাদের পক্ষে তা জানানো একান্ত প্রয়োজন, কেননা শাস্ত্র যা বলে যদিও আমরা সেবিষয়ে দায়ী নই, তবু সেই উক্তিগুলো সম্পর্কে যে অর্থ উপস্থাপন করি, সেবিষয়ে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। নোয়ার কাছে ঈশ্বরের দেওয়া আজ্ঞাগুলোর মধ্যে একটা এই, ‘যে কেউ মানুষের রক্ত ঝরাবে, তার রক্তের জন্য তার প্রাণ ঝরানো হবে, কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই

আমি মানুষকে নির্মাণ করেছি' (খ)। এখানেও নমুনা, সম্পাদিত কর্ম ও সেই কর্মের প্রণেতার মধ্যকার পার্থক্য বর্তমান। ঈশ্বর এতে সাক্ষ্যদান করেন যে, তিনি মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করলেন। তিনি যখন মানুষকে নির্মাণ করতে উদ্যত হছিলেন, যেহেতু তিনি নিজের কথা বলছিলেন কিন্তু নিজের কাছে কথা বলছিলেন না, সেজন্য ঈশ্বর বলেছিলেন, 'আমাদের আপন প্রতিমূর্তি অনুসারে'; কিন্তু, মানুষ নির্মিত হওয়ার পর [তিনি বললেন], 'ঈশ্বর মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করলেন'। যদি তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'আমার প্রতিমূর্তি অনুসারে তাকে নির্মাণ করলাম', তাহলে ভাষাগত দিক দিয়ে উক্তিটা সূক্ষ্ম হত বৈকি, কেননা 'আমাদের আপন প্রতিমূর্তি অনুসারে' বলায় তিনি দেখিয়েছিলেন যে সেই ব্যক্তিদ্বয় স্বরূপে এক। তাছাড়া আমরা যে তাঁকে একাকী বা একাকী নয় বলে উপলব্ধি করব, সেসম্পর্কে তিনি কোন সন্দেহ রাখলেন না, কেননা যখন ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করেছিলেন, তখন 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে' তাকে নির্মাণ করেছিলেন।

২০। অন্য দিকে, যদি তুমি এমনটা বলতে ইচ্ছা কর যে, একাকী সেই পিতা ঈশ্বর নিজেকে উদ্দেশ্য করে সেই কথা বলেছিলেন (কেমন যেন এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারত যে, একজন যেভাবে একটা সঙ্গীর সঙ্গে সেইভাবে নিজেরই সঙ্গে কথাপোকথন করেছে), ও যদি তুমি এমনটা মনে কর যে, তিনি 'আমি মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করেছি' বলায় আসলে বলতে চাচ্ছিলেন 'আমি মানুষকে আমার নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করেছি' (ক), তাহলে সর্বপ্রথমে তোমার নিজের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা তুমি স্বীকার করেছ, সবই পিতা থেকে কিন্তু সবই পুত্র দ্বারা হয়েছে; এবং 'এসো, আমরা মানুষকে নির্মাণ করি' উক্তিটা দেখায় যে, যাঁর থেকে সবই হয়, সেই উৎস তিনিই হলেন যিনি তেমনটা বলেছিলেন, অন্যদিকে 'ঈশ্বর তাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করলেন' উক্তিটা স্পষ্ট ভাবে তাঁরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যাঁর দ্বারা সবই হয়েছিল।

২১। উপরন্তু, তুমি যেন এবিষয়ে ভুলভ্রান্তিতে না পড়, সেজন্য যাঁকে তুমি নিজে খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করেছ, সেই প্রজ্ঞা এই কথা বলে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবেন, 'যখন

তিনি জলের উৎসধারা আকাশের নিচে বসাছিলেন, যখন পৃথিবীর ভিত্তিমূল প্রবল করছিলেন, তখন আমি সেই সবকিছু বিন্যস্ত করতে করতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমিই ছিলাম সেই যাঁর বিষয়ে তিনি পুলকিত ছিলেন। তাছাড়া আমি দিনে দিনে তাঁর সাক্ষাতে ক্ষণে ক্ষণে পুলক করতাম যখন তিনি যা নির্মাণ করেছিলেন সেই জগৎ নিয়ে ও মানবসন্তানদের নিয়ে অবিরতই পুলকিত ছিলেন’ (ক)। কঠিন সমস্ত কিছু সরিয়ে দেওয়া হল; সমস্ত ভুলভ্রান্তিকে সত্য স্বীকারে বাধ্য করা হোক। যুগগুলোর পূর্বে জনিত প্রজ্ঞা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত; তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত শুধু নয়, কিন্তু সবকিছু বিন্যস্ত করছেন, কেননা তিনি ‘সেই সবকিছু বিন্যস্ত করতে করতে তাঁর সঙ্গে’ ছিলেন। এই বিন্যাস-কর্ম বা ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি কর। নিজের আঞ্জা দ্বারা পিতা হলেন কারণ; আদিষ্ট বিষয় পূরণে পুত্র বিন্যস্ত করেন। ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য এক একজনের জন্য স্থির করা কর্ম দ্বারা চিহ্নিত। কেননা যখন শাস্ত্র বলে, ‘এসো, নির্মাণ করি’, তখন আঞ্জা ও ঘটনা একই পর্যায়ে প্রদর্শিত; কিন্তু যখন লেখা আছে, ‘সেই সবকিছু বিন্যস্ত করতে করতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম’ তখন ঈশ্বর এমনটা প্রকাশ করেন যে, তিনি একাকী হয়ে কর্মটা সম্পাদন করেননি। কেননা তিনি তাঁরই সাক্ষাতে পুলক করছিলেন যিনি—তিনি নিজেই আমাদের বলেন—বিনিময়ে পুলকিত ছিলেন। ‘তাছাড়া আমি দিনে দিনে তাঁর সাক্ষাতে ক্ষণে ক্ষণে পুলক করতাম যখন তিনি যা নির্মাণ করেছিলেন সেই জগৎ নিয়ে ও মানবসন্তানদের নিয়ে অবিরতই পুলকিত ছিলেন’। এতে প্রজ্ঞা তাঁর নিজের আনন্দের কারণ জানাতে ইচ্ছা করেছেন; তিনি সেই পিতার আনন্দের জন্যই পুলক করছিলেন যিনি জগতের ও মানবসন্তানদের সৃষ্টিকর্মের সমাপ্তি নিয়ে পুলকিত। কেননা লেখা আছে, এবং ঈশ্বর দেখলেন, সেই সমস্ত কিছু মঙ্গলময় (খ)। প্রজ্ঞা এতে পুলকিত যে, পিতা নিজের সেই কর্মকাণ্ডে প্রীত যা পিতার আঞ্জাক্রমে প্রজ্ঞা দ্বারা সাধিত হয়েছে। তিনি এমনটা স্বীকার করেন যে, তাঁর আনন্দ হলো সম্পন্ন জগৎ নিয়ে ও মানবসন্তানদের নিয়ে পিতার পুলকের ফলাফল; তিনি বলেন ‘মানবসন্তানদের নিয়ে’, কারণ সেই এক মানুষ আদমে গোটা মানবজাতির সূত্রপাত হয়েছিল। এইভাবে জগৎনির্মাণে এমন একাকী পিতা নেই যিনি নিজের কাছে কথা বলেন; সেই কর্মে তাঁর প্রজ্ঞাই তাঁর সহযোগী, ও তাঁদের যৌথ কর্ম ও সহযোগিতা সম্পন্ন হলে প্রজ্ঞা পিতার সঙ্গে পুলকিত।

২২। এসমস্ত বাণীর পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য যে বহু ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিষয়ে আলোচনা দরকার, সেবিষয়ে আমি সচেতন। আমরা কিন্তু সেগুলো বাতিল করা নয়, বরং আপাতত স্থগিত বলে মনে করছি; সেগুলোর বিচার-বিবেচনা এই অনুসন্ধানের শেষ পর্যায়ের জন্য সংরক্ষণ করছি (ক)। আপাতত আমরা ঈশ্বরনিন্দুকদের বিশ্বাসের, এমনকি, প্রকৃতপক্ষে জঘন্য অবিশ্বাসেরই সেই সূত্রে মন দেব যা অনুসারে এমনটা স্থির করা হয় যে মোশি কেবল একমাত্র ঈশ্বরের কথাই ঘোষণা করেছেন। আমরা এমনটা ভুলে যাই না যে, সেই ঘোষণা যখন স্থির করে যে, যাঁর থেকে সবই হলো সেই ঈশ্বর এক, তখনই ঘোষণাটা সত্যবাদী; কিন্তু এটাও ভুলে যাই না যে, পুত্রের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করার জন্য সেই সত্য একটা অজুহাত হতে পারে না, কেননা মোশি তাঁর সমস্ত লেখা ধরে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরকে স্পষ্ট ভাবে পৃথক করেছেন। তাই আমাদের দেখতে হবে কেমন করে ঐশ্বরিক মনোনয়ন-ইতিহাস ও বিধান প্রদান-ইতিহাস (খ) ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরকে সমকক্ষ স্বীকারোক্তিতে ঘোষণা করে।

২৩। ঈশ্বর আব্রাহামের সঙ্গে নানা কথা বলার পর সারা আগারের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত হলেন; তিনি এতে ঈর্ষায় জ্বলছিলেন যে, গৃহিণী হিসাবে তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, কিন্তু সেই দাসী একটা পুত্র গর্ভধারণ করেছিল। তাই যখন আগার তাঁর দৃষ্টি থেকে চলে গেল, তখন শাস্ত্রে তাঁর বিষয়ে এই কথা বলে, প্রভুর দূত আগারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি এবার তোমার গৃহিণীর কাছে ফিরে যাও, আর তার অধীন থাক। প্রভুর দূত তাকে আরও বললেন, আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি ঘটাব যে, তার বহুসংখ্যার জন্য তা গণনা করা সম্ভব হবে না। আরও, যিনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আগার সেই প্রভুর এই নাম রাখল: তুমি সেই ঈশ্বর যিনি আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছ (ক)। ঈশ্বরের দূত কথা বলেন ঠিকই (প্রকৃতপক্ষে ‘ঈশ্বরের দূত’ শব্দটা দু’টো অর্থ বহন করে তথা, যিনি দূত সেই তিনি, ও তিনি যাঁর দূত সেই তিনি), কিন্তু তিনি এমন কথা বলেন যা তাঁর নাম তথা দূতের ক্ষমতার অতীত কথা। তিনি বলেন, ‘আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি ঘটাব যে, তার বহুসংখ্যার জন্য তা গণনা করা সম্ভব হবে না’। জাতিগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা একটি দূতের ভূমিকার বাইরে রয়েছে। কিন্তু তবু শাস্ত্র তাঁর বিষয়ে কি বলে যিনি ঈশ্বরের দূত বলে অভিহিত কিন্তু এমন কথা উচ্চারণ করেন যা বলা কেবল

ঈশ্বরেরই অধিকার? ‘যিনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আগার সেই প্রভুর এই নাম রাখল : তুমি সেই ঈশ্বর যিনি আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছ’। প্রথমে তিনি ঈশ্বরের দূত ; পরবর্তীতে তিনি প্রভু, কারণ যিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আগার সেই প্রভুর নাম করল’; তৃতীয়ত, তিনি ঈশ্বর, কেননা ‘তুমি যে আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছ, তুমি ঈশ্বর’। যিনি ঈশ্বরের দূত বলে অভিহিত, তিনি দূত ছাড়া প্রভু ও ঈশ্বর। নবীর বাণী অনুসারে, ঈশ্বরের পুত্র ‘মহামন্ত্রণার দূত’ (খ) বলেও অভিহিত। ব্যক্তিদের মধ্যকার পার্থক্য একেবারে স্পষ্ট করার জন্য তিনি ঈশ্বরের দূত বলে অভিহিত ; যিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বরের দূত বলেও অভিহিত ; কিন্তু তিনি যেন তাঁর প্রাপ্য সম্মান গ্রহণ করতে পারেন তিনি প্রভু ও ঈশ্বর বলেও অভিহিত।

২৪। এই বচনে যিনি প্রথমে ঈশ্বরের দূত, পরবর্তীতে তিনি প্রভু ও ঈশ্বর বলে দাঁড়ান ; কিন্তু আব্রাহামের কাছে তিনি কেবল ঈশ্বর বলে অভিহিত। কেননা যখন ব্যক্তিদের মধ্যকার পার্থক্য প্রথমে স্থির করা হয়েছিল, তখন পাছে সেই একাকী ঈশ্বর বিষয়ক ভুল না হয়, সেজন্য তাঁর প্রকৃত ও সত্যকার নাম নিরাপদে প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়। এবং সেই অনুসারে লেখা রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন, দেখ, তোমার স্ত্রী সারা তোমার জন্য একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, এবং তুমি তার নাম ইস্‌হাক রাখবে। আমি তার সঙ্গে ও তার বংশের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থাপন করব, এমন সন্ধি, যা চিরস্থায়ী সন্ধি। ইশ্মায়েলের বিষয়েও দেখ, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি ও তাকে আশীর্বাদ করেছি; এবং তাকে ফলবান করব ও অধিক পরিমাণে তার বংশবৃদ্ধি করব; সে বারোজন গোষ্ঠীপতির পিতা হবে, আর তাকে আমি বড় এক জাতি করে তুলব (ক)। এমনটা কি সন্দেহ করা যায় যে, যিনি আগে ঈশ্বরের দূত বলে অভিহিত ছিলেন, এবার ঈশ্বর বলেও অভিহিত? উভয় ক্ষেত্রে তিনি ইশ্মায়েলের কথা বলছেন; উভয় ক্ষেত্রে তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি তাঁর বংশবৃদ্ধি করবেন। যিনি আগারকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছিলেন, তিনি যে তাঁর চেয়ে আলাদা যিনি এখন কথা বলছিলেন, তেমনটা যেন মনে না করি, সেজন্য ঐশবাণী একই ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে বলে, ‘তাকে আশীর্বাদ করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি করব’। আশীর্বাদ অতীতকালের ব্যাপার, কেননা আগেই আগারকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছিল; বংশবৃদ্ধি ভাবীকালের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, কারণ এটা

হলো ইশ্মায়েল সম্পর্কে আব্রাহামের কাছে উচ্চারিত ঈশ্বরের প্রথম বাণী। এখন ঈশ্বরই আব্রাহামের কাছে কথা বলেন; আগারের বেলায় ঈশ্বরের দূতই কথা বলেছিলেন। তাই ঈশ্বর ও ঈশ্বরের দূত এক, কারণ যিনি ঈশ্বরের দূত, তিনি আবার সেই ঈশ্বরও যিনি ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত। তিনি দূত বলে অভিহিত কারণ তিনি ‘মহামন্ত্রণার দূত’; কিন্তু পরে তিনি ঈশ্বর বলে অভিহিত পাছে আমরা এমনটা না ধরে নিই যে ঈশ্বর যিনি, তিনি দূত মাত্র। এবার বক্তব্য ঘটনাগুলোর অনুক্রম পালন করুক। প্রভুর দূত আগারের কাছে কথা বললেন; তিনি আব্রাহামের কাছেও ঈশ্বর বলে কথা বললেন। বাণী একজন থেকে অন্য একজনের কাছে উচ্চারিত। ইশ্মায়েলকে আশীর্বাদ করা হয়, ও তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যা অনুসারে তিনি বড় এক জাতি হবেন।

২৫। শাস্ত্র আব্রাহামের মধ্য দিয়েও এমনটা প্রকাশ করে যে, যিনি কথা বলছিলেন তিনি ছিলেন ঈশ্বর। আব্রাহামকেও ইসহাক নামক একটি ছেলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর তাঁর কাছে তিনজন লোক আবির্ভূত হন। আব্রাহাম তিনজনকে দেখেও একজনমাত্রকে আরাধনা করেন ও তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করেন। শাস্ত্রে বলে, তিনজন তাঁর সামনে দাঁড়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভালই জানতেন কাকে তাঁকে আরাধনা ও স্বীকার করতে হয়। তাঁদের চিহ্নিত করার মত বাহ্যিক দিক দিয়ে কিছুই ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসের চোখ ও প্রাণের দৃষ্টি দ্বারা তিনি প্রভুকে চিনে নেন। পরে শাস্ত্রে বলে চলে, এবং তিনি তাঁকে বললেন, এক বছর পরে এই সময়ে আমি তোমার কাছে আবার আসবই আসব; তখন তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্রসন্তান হবে **(ক)**। এবং এই কথার পর প্রভু তাঁকে বললেন, ‘আমি যা করতে যাচ্ছি, তা আব্রাহামের কাছে গোপন রাখব না;’ আরও, ‘তাছাড়া প্রভু বললেন, সদোম ও গমোরার বিরুদ্ধে চিৎকার অধিক তীব্র হয়ে উঠেছে, তাদের পাপও অধিক বড় হয়েছে’। পরে, দীর্ঘ একটা বক্তব্যের পরে যা সংক্ষিপ্ততার খাতিরে আমি উল্লেখ করব না, ধার্মিকেরা যে দুর্জনদের সঙ্গে ধ্বংস হবে তাতে বিচলিত হয়ে আব্রাহাম বলেন, পৃথিবীর বিচারকর্তা যে তুমি কোন মতেই এই বিচার পূরণ করবে না। তখন প্রভু বললেন, আমি যদি সদোম শহরের মধ্যে পঞ্চাশজন ধার্মিককে পাই, তবে তাদের খাতিরে সেই সমস্ত জায়গাটাকে রেহাই দেব **(খ)**। তারপরে, যখন আব্রাহামের ভাই লোটের কাছে সতর্ক বাণী শেষ হল, তখন শাস্ত্রে বলে, প্রভু আকাশ

থেকে সদোম ও গমোরার উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন (গ) এবং কিছু দিন পর, ‘প্রভু নিজের কথা অনুসারে সারাকে দেখতে গেলেন; প্রভু যে কথা দিয়েছিলেন, সারার প্রতি তাই করলেন, ও সারা গর্ভবতী হয়ে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই নির্ধারিত সময়ে আব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।’ পরবর্তীকালে, যখন সেই দাসীকে তার ছেলেকে নিয়ে আব্রাহামের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ও ভয় পাচ্ছিল পাছে জলের অভাবে শিশু প্রান্তরে মারা যায়, তখন সেই একই শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনলেন, এবং ঈশ্বরের দূত স্বর্গ থেকে ডেকে আগারকে বললেন, আগার, কী হচ্ছে? ভয় পেয়ো না, কারণ ছেলেটি যেখানে রয়েছে, সেই স্থান থেকে ঈশ্বর তাঁর চিৎকার শুনলেন। ওঠ, ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তাকে হাতে ধর, কেননা আমি তাকে এক মহাজাতি করে তুলব (ঘ)।

২৬। এসবকিছু বিষয়ে অন্ধতায় বাস করা বা তেমনটা জেনেও তা অবহেলা করা, আহা, তা কেমন অন্ধ অবিশ্বস্ততা, কেমন অবিশ্বাসী মনের নিরসতা, কেমন দুঃসাহসী অভক্তি। এসমস্ত কিছু নিঃসন্দেহেই এই কারণে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল ও লেখা হল যাতে ভুল ও অন্ধকার সত্যকে উপলব্ধিতে বাধা দিতে না পারত। যদি, যেইভাবে আমরা প্রমাণ দেব, বাস্তবতা-জ্ঞান অবহেলা করা সম্ভব নয়, তাহলে যে অপরাধ তেমনটা অস্বীকার করে, সেই অপরাধ অবশ্যই অভক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্যাপারটা আগারের কাছে সেই দূতের বাণী নিয়ে শুরু করে যখন তিনি ইশ্মায়েলের বংশবৃদ্ধি ক’রে তাকে বড় এক জাতি করতে ও তাকে অগণন বংশ দান করতে প্রতিশ্রুতি দেন। আগার শোনে, ও নিজের স্বীকারোক্তিতে এমনটা প্রকাশ করে যে, [যিনি কথা বলেছেন] তিনি একাধারে প্রভু ও ঈশ্বর। এই ঘটনার বর্ণনা ঈশ্বরের দূতের আবির্ভাব নিয়ে শুরু হয় ও তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকারে সমাপ্ত হয়। এইভাবে, মহামন্ত্রণার সংবাদ দিতে ভূমিকা রাখেন বিধায় যিনি ঈশ্বরের দূত, তিনি নিজে স্বরূপে ও নামে ঈশ্বর। নামটা স্বরূপের অনুযায়ী, স্বরূপ যে জোর করে নাম অনুযায়ী করা হয় তা নয়। আরও, ঈশ্বর এবিষয়ে আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেন; আব্রাহামকে বলা হয়, ইশ্মায়েল একটা আশীর্বাদ পেয়ে গেছে ও এক জাতিতে তার বংশবৃদ্ধি হবে; ঈশ্বর নিজেই বলেন, আমি তাকে আশীর্বাদ করেছি। তাই উপরে উল্লিখিত ব্যক্তির পরিবর্তন হয় না; বাস্তবিকই তিনি দেখান, তিনি নিজেই আগে

আশীর্বাদ দান করেছিলেন। এটাই অবশ্যই স্বীকার্য যে, শাস্ত্র রহস্য থেকে স্পষ্ট সত্য প্রকাশ পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে, কেননা শাস্ত্র ঈশ্বরের দূত নিয়ে শুরু করে ও ধাপের পর ধাপ এমনটা স্বীকার করে যে ঈশ্বর নিজেই সেই বিষয়ে কথা বলেছিলেন।

২৭। ঐশ্বরিক বর্ণনার অগ্রগতির পাশে পাশে পূর্ণতর তত্ত্বের দ্রুতগত অগ্রগতি হয়। যে বচন বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছিলাম, সেই বচনে ঈশ্বর আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেন ও প্রতিশ্রুত হন যে সারা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন। পরে তিনজন লোক আব্রাহামের আসনের ধারে এসে দাঁড়ান; তিনি কেবল একজনকে আরাধনা করে তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করেন। আব্রাহামের এই আরাধনা ও স্বীকৃতির পরে সেই একজন প্রতিশ্রুত হন, তিনি পরে, একই সময়ে, আবার আসবেন ও সেসময়ে সারার একটি ছেলে হবে। আব্রাহামের কাছে যিনি কথা বলেন তিনি ঈশ্বর। এবং যিনি পরবর্তীতে মানুষের আকারে দেখা দিয়ে একই বিষয়ে আব্রাহামের সঙ্গে কথা বলেন তিনিও সেই একই ঈশ্বর। পরিবর্তনটা কেবল নামেই হয়; উভয় ক্ষেত্রে আব্রাহামের স্বীকৃতি সমান। যদিও তিনি যাকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন একটা মানুষ, তবু আব্রাহাম প্রভুকেই আরাধনা করেছিলেন (ক); এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি ভাবী দেহধারণের রহস্য অনুভব করেছিলেন। তথাপি তেমন দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বনের জন্য একটা প্রমাণ দেওয়া হল, কারণ প্রভু নিজে সুসমাচারে বলেন, তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখে উল্লসিত হয়েছিলেন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন (খ)। তিনি যে মানুষকে দেখেছিলেন, সেই মানুষ এবিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে, তিনি একই সময়ে আবার আসবেন। প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি লক্ষ্য কর, ও সেইসঙ্গে মনে রাখ যে একজন মানুষই প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তবে শাস্ত্রে কেন বলে ‘এবং প্রভু সারাকে দেখতে গেলেন’? (গ)। সুতরাং এই মানুষ অবশ্যই স্বয়ং প্রভু, যিনি যা প্রতিশ্রুত হন তার সিদ্ধি ঘটান। পরে কি লেখা আছে? ‘প্রভু যে কথা দিয়েছিলেন, সারার প্রতি তাই করলেন’। বর্ণনাটা এমনটা বলে যে তাঁর সেই কথা মানুষেরই কথা, এমন বিবৃতি দেয় যে প্রভু সারাকে দেখতে গিয়েছিলেন, এমনটা ঘোষণা করে যে কর্মফলটা ছিল ঈশ্বরেরই সাধিত কর্ম। তুমি তো অবশ্যই এবিষয়ে নিশ্চিত যে যিনি কথা বলেছিলেন তিনি একটি মানুষ, কেননা আব্রাহাম

তাকে শুধু শোনেনি, কিন্তু তাকে দেখেওছিলেন। তবে সেই যে শাস্ত্র তাঁকে মানুষ বলে সম্বোধন করে সেই শাস্ত্র যখন তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে, তখন তিনি যে ঈশ্বর নন তুমি কি করে এমনটা ভাবতে পার? কেননা শাস্ত্রের বাণী এ, ‘তঁার সঙ্গে কথা বলার সময়ে ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন, সেই নির্দিষ্ট সময়ে সারা গর্ভবতী হয়ে আব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে তঁার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন’ (য)। কিন্তু যিনি আবার আসবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি একটি মানুষ ছিলেন। তিনি যে নিতান্ত একটা মানুষ ছিলেন তা বিশ্বাস কর, যদি না এসেছিলেন যিনি তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ঈশ্বর ও প্রভু। যা যা ঘটেছিল তা ভাল করে পরীক্ষা কর। যিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তিনি আসবেন যাতে সারা গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন, সেই তিনি যে একটি মানুষ ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এবার বিশ্বাসের শিক্ষা গ্রহণ কর : যিনি এসেছিলেন যাতে সারা গর্ভবতী হয়ে পুত্রসন্তানকে প্রসব করেন, তিনি ছিলেন প্রভু ও ঈশ্বর। মানুষটি ঈশ্বরের প্রভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের সেই একই প্রভাবে ঈশ্বর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন। এভাবে ঈশ্বর বাণী উচ্চারণে ও কর্ম সম্পাদনে নিজেকে প্রকাশ করেন। আরও, আব্রাহাম যাঁদের দেখেছিলেন, সেই তিনটে মানুষের মধ্যে দু’জন চলে যান; কিন্তু থেকে যান যিনি, তিনি প্রভু ও ঈশ্বর। এবং তিনি যে প্রভু ও ঈশ্বর তা শুধু নয়, তিনি বিচারকর্তাও ছিলেন, কেননা আব্রাহাম প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককে বিনাশ করা, তোমার পক্ষে এমন কাজ করা দূরের কথা, কেননা এর ফলে ধার্মিক দুর্জনের সমান হবে। সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা যে তুমি তেমন বিচার আদৌ করবে না (ঙ)। তাই তঁার এই সমস্ত বর্ণনা দিয়ে আব্রাহাম যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে পরিগণিত হয়েছিলেন সেই বিশ্বাস বিষয়ে আমাদের শিক্ষাদান করেন, সেই তিনজনের মধ্যে আপন প্রভুকে চিনে নেন, কেবল তাঁকেই আরাধনা করেন, ও তাঁকে প্রভু ও বিচারকর্তা বলে স্বীকার করেন।

২৮। পাছে তুমি এমনটা মনে কর যে আব্রাহাম যাঁদের একসঙ্গে দেখেছিলেন তিনি সেই একজনমাত্রকে স্বীকার করায় সেই গোটা তিনটে মানুষেরই প্রতি সম্মান প্রদান অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেজন্য লোটের সেই বাণী লক্ষ কর যা তিনি তখনই উচ্চারণ করেছিলেন যখন সেই দু’জনকে দেখেছিলেন যারা চলে গেছিলেন, ‘তাঁদের দেখামাত্র লোট উঠে তাঁদের

স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে এলেন, ও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন; এবং বললেন, প্রভুগণ আমার, আপনাদের অনুরোধ করি, আপনাদের এই দাসের গৃহে আসুন' (ক)। এই পদে 'প্রভুগণ' বহুবচনটা এমনটা দেখায় যে, দর্শনটা কেবল দূতগণ সংক্রান্ত দর্শনই ছিল; আগের বচনে পিতৃকুলপতির বিশ্বাস এমন সম্মান স্বীকার করে যা কেবল একজনকেই দেয়। এভাবে দিব্য শাস্ত্রের বর্ণনা স্পষ্টই দেখায় যে, সেই তিনজনের মধ্যে দু'জন ছিলেন দূত মাত্র; আগের পদে শাস্ত্র একজনকেই প্রভু ও ঈশ্বর বলে এই বলে ঘোষণা করেছিল, প্রভু আব্রাহামকে বললেন, সারা কেন হাসল? কেন বলল, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি সত্যি মা হব? প্রভুর পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? ভবিষ্যতে আমি ঠিক এই সময়ে আবার তোমার কাছে আসব, আর তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে (খ)। শাস্ত্র সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ; যিনি একেশ্বর ও প্রভু সেবিষয়ে শাস্ত্র বহুবচন প্রয়োগ করায় কোন বিভ্রান্তি আদৌ সমর্থন করে না, সেই স্বর্গদূত দু'জনকে কেবল ঈশ্বরেরই দেয় সম্মানও আরোপ করে না। লোট যে তাঁদের 'প্রভুগণ' বলে সম্বোধন করেন একথা স্বীকার্য, কিন্তু শাস্ত্র তাঁদের 'দূত' বলে ডাকে। প্রথমটা হলো মানব সম্মান প্রদর্শন, দ্বিতীয়টা হলো সত্যকে স্বীকার।

২৯। তারপর সদোম ও গমোরার উপরে ন্যায়বিচারের দণ্ড পড়ে। এথেকে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্যের জন্য কী শিখতে পারি? 'প্রভু গন্ধক ও আগুন প্রভু থেকে বর্ষণ করলেন' (ক)। 'প্রভু প্রভু থেকে' বলায় শাস্ত্র নাম-বৈষম্য দ্বারা তাঁদের স্বরূপের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবেই তাঁদের মধ্যে বৈষম্য রাখে। কেননা আমরা সুসমাচারে পড়ি, পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন (খ)। তাই প্রভু যা দিয়েছেন, প্রভু প্রভু থেকেই তা পেয়েছেন।

৩০। তাই তুমি এখন বিচারকর্তা ঈশ্বরকে 'প্রভু ও প্রভু' বলে জেনেছ; এটাও জেনে নাও যে 'ঈশ্বর ও ঈশ্বর' ক্ষেত্রেও একই সাহচর্য রয়েছে। যখন যাকোব নিজের ভাইয়ের ভয়তে পালিয়ে গেছিলেন, তখন স্বপ্নে একটা সিঁড়ি দেখেছিলেন যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করছিল; ঈশ্বরের দূতদেরও দেখেছিলেন যারা তা বেয়ে ওঠা-নামা করছিলেন, ও সেই সিঁড়ির উপরে দাঁড়ানো সেই প্রভুকেও দেখেছিলেন যিনি

তাঁর উপর সেই সমস্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন যা আব্রাহাম ও ইসহাককে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বর এই বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, ওঠ, বেথেল নামক স্থানে গিয়ে সেইখানে বসতি কর; এবং তোমার ভাই এসৌয়ের কাছ থেকে তুমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলে, তখন যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথ **(ক)**। ঈশ্বর ঈশ্বরের জন্য সম্মান দাবি করেন, ও এটাই স্পষ্ট করেন যে, তিনি নিজের চেয়ে অন্যজনেরই জন্য তেমন সম্মান দাবি করেন; তিনি বলেন, ‘তুমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলে, তখন যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন’ ইত্যাদি; এতে তিনি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একীকরণের উদ্ভব এড়াতে অভিপ্রায় করেন। সুতরাং কথা বলেন যিনি তিনি ঈশ্বর, ও যাঁর সম্পর্কে তিনি কথা বলেন, তিনি ঈশ্বর। তাঁদের উপরে আরোপিত মর্যাদা নাম প্রয়োগে তাঁদের ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী বলে দেখায় না, কিন্তু ব্যবহৃত শব্দগুলো এটা প্রকাশ করে যে, ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা পৃথক পৃথক বলে সমর্থিত।

৩১। তাছাড়া এক্ষেত্রে আমার এমন কয়েকটা বিষয় মনে পড়ে যা বিষয়বস্তুর পূর্ণতর বর্ণনার জন্য অপরিহার্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্ত অভিযোগ ও উত্তরের মধ্যে সমন্বয় রাখা দরকার; তাই বাকি যত বিষয় আমি সময়মত পরবর্তী একটা পুস্তকে বিশ্লেষণ করব। আপাতত, যে ঈশ্বর ঈশ্বরের জন্য সম্মান দাবি করলেন, তাঁর বিষয়ে আমার পক্ষে এটাই মাত্র চিহ্নিত করা যথেষ্ট যে, আগারের সঙ্গে কথা বলার সময়ে যিনি ঈশ্বরের দূত ছিলেন, আব্রাহামের সঙ্গে একই বিষয়ে কথা বলার সময়ে তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও প্রভু। আরও, যে মানুষ আব্রাহামকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বর ও প্রভুও ছিলেন, কিন্তু প্রভুর সঙ্গে যে দু’টো স্বর্গদূতকে দেখা হয়েছিল ও যাঁদের তিনি লোটের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা নবী দ্বারা শুধুমাত্র দূত বলেই বর্ণিত। এবং ঈশ্বর যে কেবল আব্রাহামের কাছেই মানব রূপে দেখা দিয়েছিলেন তাও নয়; তিনি যাকোবের কাছেও মানব বেশে দেখা দিয়েছিলেন। এবং তিনি যে এসেছিলেন তা শুধু নয়, কিন্তু, যেভাবে আমাদের দেখানো হয়, সেই অনুসারে তিনি লড়াই করেছিলেন; এবং তিনি যে লড়াই করেছিলেন তা শুধু নয়, কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। আমার হাতে যে সময় রয়েছে, তা ও বিষয়বস্তুটাও আমাকে এই লড়াইয়ে নিহিত অর্থ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা

করার সুযোগ দেয় না। স্বয়ং ঈশ্বর যে লড়াই করেছিলেন একথা নিশ্চিত, কেননা যাকোব ঈশ্বরের উপর জয়ী হয়েছিলেন ও ইস্রায়েল ঈশ্বরকে দেখেছিলেন (ক)।

৩২। এবার এসো, অনুসন্ধান করে দেখি যদি আগারের বর্ণনায় ছাড়া ঈশ্বরের দূত অন্য স্থানে স্বয়ং ঈশ্বর বলে জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি যে সেইভাবে জ্ঞাত হয়েছিলেন একথা সুস্পষ্ট। তিনি ঈশ্বর বলে শুধু নয়, কিন্তু আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের ঈশ্বর বলেই জ্ঞাত হয়েছিলেন। কেননা প্রভুর দূত মোশির কাছে সেই ঝোপের মধ্য থেকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই ঝোপের মধ্য থেকে প্রভু তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন: তোমার মতে আমরা সেই কণ্ঠ কার্ কণ্ঠ বলে বিবেচনা করব? যিনি দেখা দিয়েছিলেন তাঁরই কণ্ঠ কি? নাকি অন্যজনের কণ্ঠ? এখানে চালাকির জন্য স্থান নেই, শাস্ত্রের বাণী সুস্পষ্ট, ‘প্রভুর দূত একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিশিখায় তাঁকে দেখা দিলেন’ (ক); আরও, ‘ঝোপের মধ্য থেকে প্রভু তাঁকে ডাকলেন, মোশি, মোশি! তিনি উত্তর দিলেন, এ কি? এবং প্রভু বললেন, আর এগিয়ো না, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি। এবং তাঁকে বললেন, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ও ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর’ (খ)। যিনি ঝোপের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন তিনি ঝোপের মধ্য থেকে কথা বলেন; দর্শনের স্থান ও কণ্ঠের স্থান এক; যিনি কথা বলেন তিনি হলেন সেই তিনি যাঁকে দেখা হচ্ছিল, অন্য কেউ নয়। চোখ যখন তাঁকে লক্ষ করে, তখন যিনি ঈশ্বরের দূত, কান যখন তাঁকে শোনে, তখন সেই তিনি প্রভু, এবং সেই প্রভু যাঁর কণ্ঠ শোনা হয় তিনি পরে আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের ঈশ্বর বলে জ্ঞাত হন। যখন তিনি ‘ঈশ্বরের দূত’ বলে চিহ্নিত, তখন এটাই প্রকাশিত যে, তিনি নিজের মধ্যে গন্ডিবদ্ধ ও একাকী নন, কেননা তিনি ঈশ্বরের দূত। যখন তিনি প্রভু ও ঈশ্বর বলে চিহ্নিত, তখন তিনি তাঁর স্বরূপকে দেয় সম্মান ও নাম গ্রহণ করেন। তাই যে দূত ঝোপের মধ্য থেকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই দূতে তুমি তাঁকে পাও যিনি প্রভু ও ঈশ্বর।

৩৩। মোশির সাক্ষ্যগুলো অধ্যয়নে এগিয়ে চল; লক্ষ কর কেমন সূক্ষ্মতার সঙ্গে তিনি প্রভু ও ঈশ্বরের কথা ঘোষণা করার কোন সুযোগ উপেক্ষা করেন কিনা। তুমি তো

অবশ্যই তাঁর এই বচন জান, ‘শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক’ (ক)। তাঁর দিব্য গীতিকার বাণীগুলোও লক্ষ কর, ‘দেখ, দেখ: আমিই প্রভু, ও আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’ (খ)। এবং যেহেতু গীতিকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা উপদেশের প্রধান চরিত্র ঈশ্বরই [অর্থাৎ একমাত্র জনিত সেই পুত্র-ঈশ্বরই] ছিলেন, সেজন্য উপদেশ এই বাণীতে সমাপ্ত হয়, ‘আকাশমণ্ডল, তাঁর সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর। ঈশ্বরের সকল সন্তান তাঁকে আরাধনা করুক। জাতিসকল, তাঁর জনগণের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর। ঈশ্বরের সকল দূত তাঁকে সম্মান আরোপ কর’ (গ)। ঈশ্বরকে ঈশ্বরের দূতদের দ্বারা গৌরবান্বিত হতে হবে, ও তিনি ঘোষণা করেন, ‘কেননা আমিই প্রভু, ও আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’। কেননা তিনি হলেন সেই ‘একমাত্র জনিত’ ঈশ্বর, ও ‘একমাত্র জনিত’ নামটা সেই বিশিষ্টতায় কোন সাহচর্য মানে না, ঠিক সেইভাবে যেভাবে ‘তাঁর জন্ম সম্ভব নয়’ নামটা এমনটা অস্বীকার করে যে, সেই ক্ষেত্রে এমন কেউই নেই যে যাঁর জন্ম সম্ভব নয় সেই পিতার বৈশিষ্ট্যের সহভাগী। পুত্র ‘এক থেকে এক’। যাঁর জন্ম সম্ভব নয় সেই ঈশ্বর ছাড়া এমন কেউই নেই যার জন্ম সম্ভব নয়, তাই একই প্রকারে সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর ছাড়া একমাত্র জনিত বলতে আর কেউই নেই। উভয়ই হলেন একমাত্র ও একা, কেননা একজন ‘যাঁর জন্ম সম্ভব নয়’ নামের অধিকারী ও অন্যজন ‘একমাত্র জনিত’ নামের অধিকারী। এইভাবে উভয়ই একমাত্র ঈশ্বর, কেননা একজন ও অন্যজনের মধ্যে, অর্থাৎ একমাত্রজন যিনি ও সেই একমাত্রজন থেকে উদ্ভূত যিনি, শাস্বত ঈশ্বরত্বে তাঁদের মধ্যে স্বরূপের কোন ভিন্নতা নেই। অতএব উভয়ের পক্ষে ঈশ্বরের সন্তানদের দ্বারা আরাধনার পাত্র হওয়া আবশ্যিক ও ঈশ্বরের দূতদের দ্বারা গৌরব আরোপণের পাত্র হওয়া আবশ্যিক। এই অর্থে ঈশ্বরের সন্তানদের ও তাঁর দূতদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের প্রতি সম্মান ও উপাসনা দেয়। যাঁর তেমন সম্মানের পাত্র হওয়ার কথা তিনি যে কে, ও কাদের দ্বারা তেমন সম্মান দেয়, তা লক্ষ কর: সেই তিনি হলেন ঈশ্বর, ও সেই তারা হলো ঈশ্বরের সন্তানেরা ও তাঁর দূতেরা। এবং আমাদের স্বরূপের সহভাগী যিনি, পাছে তুমি এমনটা ভাব যে সেই [পুত্র] ঈশ্বরের প্রতি সম্মান দেয় নয়, কিন্তু পাছে এমনটা ভাব যে মোশি এই বচনে পিতা ঈশ্বরেরই প্রতি দেয় সম্মানের কথা ভাবছেন (যদিও প্রকৃতপক্ষে পিতার পক্ষে পুত্রতেই সম্মানের পাত্র হওয়া আবশ্যিক)

সেজন্য ঈশ্বর দ্বারা যোসেফের উপরে বর্ষণ করা সেই আশীর্বাদের কথাগুলো লক্ষ কর যা সেই পুস্তকের শেষে উল্লিখিত। কথাগুলো এ, ‘যিনি বাস করছিলেন সেই ঝোপে, তাঁর প্রসন্নতা নেমে আসুক যোসেফের মাথায় ও তাঁর শীরে’ (ঘ)। সুতরাং ঈশ্বরকে ঈশ্বরের সন্তানদের দ্বারা আরাধনার পাত্র হওয়া আবশ্যিক, কিন্তু সেই ঈশ্বর যিনি নিজে ঈশ্বরের পুত্র। এবং ঈশ্বরকে ঈশ্বরের দূতদের দ্বারা সম্মানের পাত্র হওয়া আবশ্যিক, কিন্তু সেই ঈশ্বর যিনি নিজে ঈশ্বরের দূত। কেননা সেই ঝোপের মধ্য থেকে ঈশ্বর ঈশ্বরের দূত বলে দেখা দিয়েছিলেন, এবং যোসেফ আশীর্বাদিত হতে হতে তাঁর জন্য এমন মঙ্গলদান প্রার্থনা করা হয় যা ঈশ্বর মঞ্জুর করতে প্রসন্ন। ঈশ্বরের দূত হওয়ায় তিনি যে ঈশ্বর নন তা নয়; একই প্রকারে, ঈশ্বর হওয়ায় তিনি যে ঈশ্বরের দূত নন তাও নয়। ঐশ ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট তাৎপর্য দেওয়া হল; অজানিতজন ও জানিতজনের মধ্যে অর্থের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হল; স্বর্গীয় রহস্যগুলোর ব্যবস্থা প্রকাশ করা হল; তাই আমাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে, ঈশ্বরের দূত ও তাঁর পুত্র যিনি, ঈশ্বরের দূতেরা ও তাঁর সন্তানেরা তাঁকে আরাধনা করতে করতে আমরা যেন ঈশ্বরকে একাকী বসবাসকারী ঈশ্বর বলে কল্পনা না করি।

৩৪। এসো, এগুলো হোক মোশির পুস্তকগুলো থেকে নেওয়া আমাদের উত্তর, বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে এগুলো হোক স্বয়ং মোশিরই দেওয়া উত্তর। ভ্রান্তমতপন্থীরা এমনটা ভাবে, তারা মোশির অধিকার সূত্রে ও তাঁর দেওয়া ঈশ্বরের ঐক্য সংক্রান্ত স্বীকৃতিকে পুত্র ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করার জন্য ব্যবহার করতে পারে; তাদের সেই কথা এমন অভক্তি যা তাদের নিজেদের সাক্ষীর [তথা মোশির] স্পষ্ট সাবধান বাণীর বিরুদ্ধ, কেননা যখন মোশি এমনটা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর এক, তখন পুত্রের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে শিক্ষা দিতে কখনও অবহেলা করেন না। পরবর্তী পদক্ষেপে আমাদের উচিত স্বয়ং পুত্র সংক্রান্ত নবীদের বিবিধ বচন উপস্থাপন করা।

৩৫। ‘শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক’ (ক) বাণীটার সঙ্গে তুমি তো পরিচিত; আহা তুমি [হে ভ্রান্তমতপন্থী] যদি সেই বাণী সঠিক ভাবেই জানতে! তবু আমি নবীর সেই বাণীর এমন অর্থ খোঁজ করতে চাই যা তোমার ব্যাখ্যা অনুযায়ী।

সামসঙ্গীতমালায় তিনি বলেন, ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন (খ)। পাঠক যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে, সেজন্য তৈলাভিষিক্ত হন যিনি ও তৈলাভিষিক্ত করেন যিনি তাঁদের মধ্যে পার্থক্যটা ভাল মত লক্ষ কর; সেই ‘তোমাকে’ ও সেই ‘তোমারই’ শব্দদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধর, এবং স্পষ্ট করে দেখাও সেই বাণী কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় ও কার দ্বারা উচ্চারিত হয়, কেননা শেষ সিদ্ধান্তটা পূর্ববর্তী পদের স্বীকারোক্তির উপরে নির্ভর করে যা অনুসারে ‘হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী; তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড। তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ ও অধর্ম ঘৃণা করেছ’ (গ); তারপর নবী বলে চলেন, ‘এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন’। তাই ধর্মময়তার প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরে ও অধর্মের প্রতি তাঁর ঘৃণার খাতিরে শাস্ত্রত রাজ্যের ঈশ্বর তাঁর আপন ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হন। এই নামগুলোর মধ্যে কি এমন পার্থক্য রয়েছে যা আমাদের মন বিভ্রান্ত করতে পারে? না। ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য সেই ‘তোমাকে’ ও সেই ‘তোমারই’ শব্দদ্বয় দ্বারা নির্দেশিত, কিন্তু এতে স্বরূপ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত নয়। সেই ‘তোমারই’ [শব্দটা] প্রণেতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; সেই ‘তোমাকে’ [শব্দটা] তাঁরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যিনি প্রণেতা থেকে উদ্ভূত। কেননা তিনি [অর্থাৎ পুত্র] ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’, কারণ উল্লিখিত সেই বচনে নবী স্বীকার করেন, ‘ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন’। এবং তাঁর নিজের বাণী এমন সাক্ষ্য বহন করে যে, যাঁর জন্ম সম্ভব নয় এমন ঈশ্বরের পূর্ববর্তী কোন ঈশ্বর নেই: ‘তোমরা আমার সাক্ষী হও, ও আমি সাক্ষী, একথা বলছেন প্রভু ঈশ্বর, ও আমার সেই দাসও [সাক্ষী] যাকে আমি বেছে নিয়েছি, তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ, এবং বুঝতে পার যে, আমি আছি, ও আমার আগে কোন ঈশ্বর নেই, আমার পরেও [কোন ঈশ্বর] থাকবে না’ (ঘ)। এইভাবে যাঁর আদি নেই তাঁর মর্যাদা প্রদর্শিত, ও যাঁর জন্ম সম্ভব নয় তাঁর গৌরব সংরক্ষিত, কেননা ‘ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন’। সেই ‘তোমারই’ শব্দটা তাঁর জন্মের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, কিন্তু তাঁর স্বরূপকে নিঃশেষ করে না; এবং পিতাই তাঁর ঈশ্বর, কেননা পিতা থেকে সঞ্জাত যিনি, সেই পুত্রই তাঁর ঈশ্বরত্বের সহভাগী। কিন্তু পিতা যে ঈশ্বর তাতে এমন বাধা নেই যে পুত্রও ঈশ্বর, কারণ

‘ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন’। তাই পিতা ও পুত্র উভয়েরই কথা উল্লিখিত ও একই নাম দ্বারা তথা ঈশ্বর নাম দ্বারা চিহ্নিত; তাতে এটা ঘোষিত হয় যে, স্বরূপে ও মর্যাদায় [অর্থাৎ ঐশ্বরিক স্বরূপে বা ঈশ্বরত্বে] তাঁরা এক।

৩৬। কিন্তু, ‘কেননা আমি আছি, ও আমার আগে কোন ঈশ্বর নেই, আমার পরেও [কোন ঈশ্বর] থাকবে না’ (ক) বাণীটা পাছে এমন ভক্তিহীন দুঃসাহসের সুযোগ হয় যা দ্বারা [ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা] প্রমাণিত হয় যে পুত্র ঈশ্বর নন যেহেতু যাঁর পূর্ববর্তী কোন ঈশ্বর নেই, সেই ঈশ্বরের পরে আর কোন ভাবী ঈশ্বর থাকবে না, সেজন্য পুরা বচনটার লক্ষ্য বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার। ঈশ্বর নিজেই নিজের বাণীর বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, কিন্তু তাঁর বেছে নেওয়া দাসও [অর্থাৎ পুত্রও] তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবিষয়ে সাক্ষ্যদাতা যে, তাঁর আগে কোন ঈশ্বর নেই, তাঁর পরেও থাকবে না। নিজের বিষয়ে তাঁর নিজের সাক্ষ্য যথেষ্ট বইকি, তবু তিনি সেই দাসের সাক্ষ্যও যোগ করলেন যাঁকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর আগে যে কোন ঈশ্বর নেই এবিষয়ে আমাদের সেই দু’জনের মিলিত সাক্ষ্য রয়েছে; আমরা তেমন সত্য মেনে নিই, কারণ সবই পিতা থেকে হয়েছিল। আমাদের তাঁদের এই সাক্ষ্যও রয়েছে যে তাঁর পরে কোন ঈশ্বর থাকবে না, কিন্তু এমনটা অস্বীকার করা হয় না যে [পুত্র] ঈশ্বর পিতা থেকে জন্ম নিয়েছেন। পিতার সাক্ষী হিসাবে সেই দাস ইতিমধ্যে এ সমস্ত কথা বলে গেছিলেন যিনি সেই গোষ্ঠীতে জন্ম নিয়েছিলেন যা থেকে তিনি ঈশ্বরের মনোনীতজন হিসাবে উদ্ধৃত হওয়ার কথা। তিনি সুসমাচারেও একই সত্য উপস্থাপন করলেন, এই যে আমার সেই দাস যাঁকে আমি বেছে নিয়েছি, আমার সেই প্রিয়জন যাঁতে আমার প্রাণ প্রসন্ন (খ)। তবে এটাই সেই অর্থ যা অনুসারে ঈশ্বর বলেন, ‘আমার আগে কোন ঈশ্বর নেই, আমার পরেও [কোন ঈশ্বর] থাকবে না’। নিজের আগে বা পরে অন্য কোন ঈশ্বর নেই তেমন ঘোষণা দ্বারা তিনি নিজের শাস্ত ও রূপান্তরের অতীত মর্যাদার অনন্ততা দেখান। তথাপি তিনি তাঁর দাসকে সাক্ষ্য বহনে ও ঈশ্বর-নাম অধিকারেও নিজের সহভাগী করে তোলেন।

৩৭। এই সত্য ঈশ্বরের নিজের উচ্চারিত বাণী থেকে সহজে শেখা যেতে পারে। কেননা নবী হোশেয়াকে তিনি বলেন, আমি ইস্রায়েলকে আর কখনও দয়া করব না, তাদের

একেবারে প্রতিপক্ষই হব। যুদা-সন্তানদের দয়া করব ও তাদের ঈশ্বর প্রভুতে তাদের পরিত্রাণ করব (ক)। এখানে পিতা একেবারে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বর-নামটা সেই পুত্রকে আরোপ করছেন যাঁর মধ্যে তিনি অগণন যুগের আগে আমাদের বেছেও নিয়েছিলেন। তিনি ‘তাদের ঈশ্বর’ বলেন, কেননা তাঁর জন্ম সম্ভব হওয়ায় সেই পিতা যখন সবকিছুর দিক দিয়ে স্বতন্ত্র, তখন তিনি তাঁর আপন পুত্রকে উত্তরাধিকার রূপে আমাদের দান করেছেন। একই প্রকারে আমরা পড়ি, ‘আমার কাছে যাচনা কর, আমি বিজাতীয়দের তোমার উত্তরাধিকার রূপে দেব’ (খ)। যাঁর থেকে সবই হয়েছে, কেউই তাঁর কাছে ঈশ্বর হতে পারে না, কেননা তিনি আদিবিহীন সনাতন; কিন্তু নিজের পিতা হিসাবে পুত্রের স্বয়ং ঈশ্বর আছেন, কেননা তিনি সেই ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জন্য পিতাই ঈশ্বর ও পুত্রও ঈশ্বর; পিতা এমনটা স্বীকার করেন যে পুত্রই আমাদের ঈশ্বর, ও পুত্র এমনটা শিথিয়ে দেন যে আমাদের কাছে পিতাই ঈশ্বর। তথাপি পুত্র পিতা দ্বারা ঈশ্বর-নামে অভিহিত অর্থাৎ সেই নামে অভিহিত যা তাঁর নিজের অনাদি মর্যাদার প্রকৃত নাম। হোশেয়ার কাছে উচ্চারিত বাণী সম্পর্কে এটাই সত্য।

৩৮। আরও, ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর দ্বারা আমাদের প্রভু সংক্রান্ত ঘোষণা কেমন সুস্পষ্ট! তিনি বলেন, সেই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রজন ও আসন্ন সবকিছুর নির্মাতা, তিনি একথা বলছেন: তোমাদের সন্তানদের ও মেয়েদের বিষয়ে যা করা উচিত, তোমরা সে বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর ও আমার নিজের হাতের কাজ সম্বন্ধে আমাকে আঞ্জা দাও। আমিই তো পৃথিবী নির্মাণ করেছি ও তার উপরে মানুষকে সৃষ্টি করেছি; আমিই সমস্ত বাহিনীকে আঞ্জা দিয়েছি! আমিই ধর্মময়তার সঙ্গে এক রাজাকে জাগিয়ে তুলেছি, ও তাঁর সকল পথ সরল। সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে, আমার জনগণের বন্দিদশা শেষ করে দেবে, বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তা করবে; একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। মিশর সঙ্কুচিত হবে, ইথিওপীয়দের ও শেবার অধিবাসীদের পণ্যদ্রব্যও হবে সঙ্কুচিত। লম্বা লম্বা মানুষ তোমার হাতে চলে আসবে, তারা তোমার দাস হবে, শৃঙ্খলিত অবস্থায় তোমার পিছু পিছু হেঁটে চলবে, তোমাকে আরাধনা করবে ও তোমার কাছে মিনতি জানাবে, কেননা ঈশ্বর তোমাতে আছেন ও তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। কারণ তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না, ওগো

ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পরিত্রাতা। তাঁর সকল প্রতিরোধী লজ্জিত বিভ্রান্ত হবে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলে যাবে (ক)। দুঃসাহসে উচ্চারিত কথার জন্য কি এখনও স্থান আছে? নাকি অজ্ঞতার জন্য এখনও অব্যাহতি রয়েছে? অভক্তি যদি এখনও থেকে যায়, তবে এর কারণ এ কি নয় যে এখনও নির্লজ্জ দুঃসাহস বেঁচে রয়েছে? যাঁর থেকে সবই হয়, নিজের আঙা দ্বারা সবই নির্মাণ করেছেন যিনি, নিজেকেই বিশ্বের প্রণেতা বলে ঘোষণা করেন যিনি (কেননা তিনি যদি কথা না বলতেন তবে কিছুই নির্মিত হত না) সেই ঈশ্বর দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি এমন ধর্মময় এক রাজাকে জাগিয়ে তুলেছেন যিনি তাঁর জন্য তথা ঈশ্বরের জন্য একটা নগরী গাঁথে তোলেন ও তাঁর আপন জনগণের বন্দিদশা শেষ করে দেন, বিনা উপহার লাভে, বিনা পুরস্কারেই তা করেন; বাস্তবিকই আমরা সবাই বিনামূল্যেই বিমুক্ত। আরও, তিনি বলেন যে, মিশরের সঙ্কোচের পর অর্থাৎ এই জগতের অমঙ্গলের পর ও ইথিওপীয়দের ও শেবার অধিবাসীদের পণ্যদ্রব্যের পর লম্বা লম্বা মানুষ তাঁর আছে আসবে। আমরা মিশরে তেমন সঙ্কোচ, ইথিওপীয়দের ও শেবা অধিবাসীদের তেমন পণ্যদ্রব্য কেমন ভাবে বুঝব? এসো, আমরা স্মরণ করি কেমন করে প্রাচ্য দেশের সেই পণ্ডিতেরা প্রভুকে আরাধনা করেন ও উপহার দেন; এসো, বেথলেহেম অভিমুখে যুদার সেই দীর্ঘ যাত্রার শ্রান্তির কথা ভাবি। শীর্ষপতিদের শ্রান্তিকর যাত্রায় আমাদের দেখানো হয় মিশরের সঙ্কোচ। কেননা সেই পণ্ডিতেরা ঐশ্বর্যপ্রতাপের দেওয়া দায়িত্ব মায়াময় ও বস্তুগত ভাবে (খ) পালন করতে করতে তাঁদের হয়ে ভক্তিহীন গোটা জগৎ নিজের সাধ্যমত গভীরতম সম্মান নিবেদন করছিল। আরও, এই পণ্ডিতেরাই ইথিওপীয়দের ও শেবার বাজার থেকে উপহার হিসাবে সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস অর্পণ করছিলেন; এ এমন বিষয় যা অন্য একজন নবী দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল; সেই নবী বলেছিলেন, ইথিওপীয়েরা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাত করবে, তাঁর শত্রুরা ধুলা চেটে খাবে। তার্শিশের রাজারা নিয়ে আসবেন অর্ঘ্যদান, আরবীয়দের ও শেবার রাজারা রাজস্ব আনবেন; তাঁকে আরবের সোনা দেওয়া হবে (গ)। সেই পণ্ডিতেরা ও সেই উপহারগুলো মিশরের সঙ্কোচ ও ইথিওপীয়দের ও শেবার অধিবাসীদের পণ্যদ্রব্যের প্রকৃত অর্থ বোঝায়, অর্থাৎ পণ্ডিতদের আরাধনায় বিধর্মী জগৎ প্রদর্শিত, ও তাঁদের অর্ঘ্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের পূজিত প্রভুর জন্য সেরা উপহারগুলো তথা বিধর্মীরাই প্রদর্শিত।

৩৯। সেই যে লম্বা লম্বা মানুষ তাঁর হাতে চলে আসবে ও শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু হেঁটে চলবে তারা যে কারা সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুসমাচারের দিকে ফের; যখন পিতরকে প্রভুর অনুসরণ করতে হয়, তখন তিনি গায় কাপড় জড়ান (ক)। প্রেরিতদূতদের কথা পড়: খ্রিষ্টের দাস পল নিজের বেড়িতে গর্ব করে। এসো, দেখি ‘যিশু খ্রিষ্টের সেই বন্দি’ নিজের শিক্ষাদানে ঈশ্বরের পুত্র সংক্রান্ত ঈশ্বরের উচ্চারিত ভাববাণীগুলো পূরণ করেন কিনা। ঈশ্বর বলেছিলেন, তারা তোমার কাছে মিনতি জানাবে, কেননা ঈশ্বর তোমাতে আছেন (খ)। এবার প্রেরিতদূতের বাণী পরীক্ষা করে দেখ, ও তেমন পরীক্ষা শেষ করে এবাণী বুঝতে চেষ্টা কর, ‘ঈশ্বর খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন’ (গ)। ভাববাণীটা বলে চলে, ‘ও তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই’। প্রেরিতদূত সাথে সাথে এই বচনটা তাঁর নিজের একটা বচনের সঙ্গে খাপ খাওয়ান, তথা ‘কেননা মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’ (ঘ)। এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারে না, কেননা তিনি এক। তৃতীয় এক বচনে নবী বলেন, ‘তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না’। কিন্তু যিনি একসময় ছিলেন মণ্ডলীর অত্যাচারী ব্যক্তি, সেই পল বলেন, পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর (ঙ)। এটাই হবে ‘শৃঙ্খলিত’ এই মানুষদের প্রচার বাণী; তাঁরা সত্যিই লম্বা লম্বা মানুষ, ও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবেন (চ) ও শিক্ষাদানে ও মৃত্যুবরণে প্রভুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায় তাঁদের আপন প্রভুর অনুসরণ করবেন।

৪০। তাই ঈশ্বর ঈশ্বরে আছেন, ও যাঁর মধ্যে ঈশ্বর বসবাস করেন তিনি ঈশ্বর। কিন্তু কেমন করে ‘তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই’ যখন ঈশ্বর তাঁর মধ্যে আছেন? হে ভ্রান্তমতপন্থী, একাকী পিতার বিষয়ে তোমার স্বীকারোক্তির সমর্থনে তুমি ‘আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’ (ক) বচনটা ব্যবহার করছ; ‘তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই’ পিতা ঈশ্বরের এই ঘোষণায় কোন্ অর্থই বা তুমি আরোপ করতে পার যখন ‘আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’ বচনের ব্যাখ্যা করে তুমি পুত্রের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার কর? তেমনটা হলে তবে ঈশ্বর কাকেই বা উদ্দেশ্য করে বলতে পারতেন ‘তুমি ছাড়া অন্য

কোন ঈশ্বর নেই’? সেই একাকী জন যে নিজেকেই উদ্দেশ্য করে তেমনটা বলেছিলেন তা তুমি ধারণা করতে পারই না। যাঁকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেই রাজাকেই প্রভু সেই লম্বা লম্বা মানুষের মুখ দিয়ে বলেছিলেন ‘কেননা ঈশ্বর তোমাতে আছেন’, সেই যে লম্বা লম্বা মানুষ তাঁকে আরাধনা করতেন ও মিনতি জানাতেন। এসমস্ত ঘটনা একাকীত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না। ‘তোমাতে’ কথাটা এমনটা দাবি করে যে, বলতে গেলে, এমন একজন উপস্থিত রয়েছে যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা যেতে পারে। ‘ঈশ্বর তোমাতে আছেন’ পুরা বাক্যটা এমনটা প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর যে উপস্থিত তা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁরই মধ্যে বসবাস করেন যিনি উপস্থিত। বাক্যটা বসবাসকারী ও যাঁর মধ্যে সেই বসবাসকারী বসবাস করেন তাঁরই মধ্যে পার্থক্য রাখে, কিন্তু তেমন পার্থক্য ব্যক্তি সংক্রান্ত মাত্র, স্বরূপের পার্থক্য সংক্রান্ত নয়। ঈশ্বর তাঁর মধ্যে রয়েছেন, এবং যাঁর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বরের বাসস্থান এমন স্বরূপের মধ্যে হতে পারে না যা তাঁর নিজের স্বরূপের চেয়ে ভিন্ন ও পরকীয়। তিনি এমন একজনের মধ্যে অবস্থান করেন যিনি তাঁর আপন অধিকার ও তাঁর নিজ থেকে সজ্ঞাত। ঈশ্বর ঈশ্বরে রয়েছেন, কারণ ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে। ‘কারণ তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না, ওগো ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পরিত্রাতা’ (খ)।

৪১। যেহেতু তুমি এটা অস্বীকার কর যে ঈশ্বর ঈশ্বরে রয়েছেন, সেজন্য আমার পরবর্তী পুস্তক তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে অভিপ্রেত। বাস্তবিকই নবী [ইশাইয়া] বলে চলেছেন, তাঁর সকল প্রতিরোধী লজ্জিত বিভ্রান্ত হবে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলে যাবে (ক)। এটা হলো তোমার অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা। তুমি তো খ্রিস্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, এবং সেজন্যই পিতার কণ্ঠ তোমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করছে, কেননা যাঁর ঈশ্বরত্ব তুমি অস্বীকার করছ, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। এমনকি তুমি ঈশ্বরের প্রতি সম্মানের ছদ্মবেশেই তেমনটা অস্বীকার করছ, কারণ তিনি বলেন, আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই (খ)। লজ্জায় লাল হও; যাঁর জন্ম সম্ভব নয়, তোমার দেওয়া সম্মানের তাঁর কোন দরকার হয় না; তুমি যে একাকীত্ব তাঁর উপর চাপাও, তিনি তেমন একাকীত্বের গৌরব কখনও দাবি করেননি। তিনি তোমার এই প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেন যা ‘আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই’ তাঁর নিজের এই বাণীকে তাঁরই ঈশ্বরত্ব-অস্বীকারোক্তিতে পরিণত করে

যাঁকে নিজে থেকে জনিত করেছেন। পুত্রের ঈশ্বরত্বকে ধ্বংস করতে অভিপ্রেত তোমার এই ব্যাখ্যা যেন তুমি তাঁর উপর আরোপ না কর, তিনি তোমার প্রচেষ্টা বিফল করতে চাইলেন, ও সেইজন্য তিনি ‘তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই’ বচন দ্বারা পুত্রকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করায় তাঁর আপন একমাত্র জনিতজনের গৌরব পূর্ণ করলেন। যা একেবারে সমান, তুমি কেন তাতে পার্থক্য রাখ? যা উত্তমরূপে সমতুল্য, তুমি কেন তা বিচ্ছিন্ন কর? তিনি ছাড়া যে আর কোন ঈশ্বর নেই, তা-ই হলো ঈশ্বরের পুত্রের স্বীয় বৈশিষ্ট্য; নিজ থেকে ছাড়া যে আর কোন ঈশ্বর নেই, তা-ই হলো পিতা ঈশ্বরের স্বীয় বৈশিষ্ট্য: যখন ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বল, তখন ঈশ্বরের উচ্চারিত কথা ব্যবহার কর। তাঁর নিজের নির্ধারিত কথা দ্বারা তাঁকে স্বীকার কর ও রাজা রূপে তাঁকে অনুনয় কর, ‘কেননা ঈশ্বর তোমাতে আছেন ও তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। কারণ তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না, ওগো ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পরিত্রাতা’। তেমন ভক্তিপূর্ণ কথায় ভূষিত স্বীকারোক্তি দুঃসাহস জনিত কলঙ্ক থেকে মুক্ত: তেমন স্বীকারোক্তির ভাষা ঘৃণা জাগায় না। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তেমন স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান লজ্জা ও বিভ্রান্তি ফলায়। ঈশ্বরের উচ্চারিত এ সমস্ত কথা ভাববার জন্য সময় দাও; তাঁর নিজের কথা দ্বারা তাঁকে স্বীকার কর, তাঁর সেই কথাগুলো ব্যবহার কর, তবেই তুমি সেই হুমকি ও সেই লজ্জা এড়াবে। কেননা তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্রের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার কর, তবে, বলতে গেলে, তাঁর গৌরবের মর্যাদায় তাঁকে একাকী করায় ঈশ্বরকে আদৌ আরাধনা করবে না; পুত্রের প্রতি সম্মান অস্বীকার করায় তুমি পিতাকে অবজ্ঞাই করবে। যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় সেই ঈশ্বরের কাছে এমনটা স্বীকার কর যে তুমি তাঁর মর্যাদা বিশ্বাস কর, কারণ তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই; একমাত্র জনিত ঈশ্বরের কাছে এমনটা প্রচার কর যে তুমি তাঁর মর্যাদা বিশ্বাস কর, কারণ ঈশ্বর সেই একমাত্র জনিতজন থেকে পৃথক নন।

৪২। যেহেতু তুমি ইতিমধ্যে মোশি ও ইস্রাইয়ার কথা শুনেছ, সেজন্য এখন সেই যেরেমিয়ার কথাও শোন যিনি তাঁদের একই সত্য বিষয়ে শিক্ষাদান করেন: ‘তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হবে না; তিনিই সদৃশজ্ঞানের সমস্ত পথের সন্ধান পেলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে ও তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান

করলেন। এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন’ (ক)। কেননা আগে তিনি বলেছিলেন, তিনি মানুষ, কে তাঁকে জানবে? (খ)। তাই তুমি এমন ঈশ্বর বিষয়ে সংবাদ পাচ্ছ যিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন। যেহেতু যেরেমিয়া এমনটা ঘোষণা করেন যে ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মধ্যে জীবন কাটালেন, সেজন্য এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কোন্ অর্থ তুমি এই বচনে আরোপ করবে তথা, ‘পিতার বৃকে বিরাজমান একমাত্র জনিত পুত্র ছাড়া ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখেনি’ (গ)। পিতাকে নিঃসন্দেহেই পুত্র দ্বারা ছাড়া আর কারও দ্বারা দেখা যেতে পারে না; তবে সেই তিনি কে যিনি দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন? তিনি আমাদের ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর যিনি মানব আকারে দৃশ্যমান ও যাকে স্পর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু তুমি নবীর এই বাণী উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, ‘তঁার সঙ্গে কারও তুলনা হবে না’। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর তেমনটা কেমন হতে পারে, তাহলে বাক্যের বাকি অংশটাকে শোন, তবেই এমনটা এড়াতে পাচ্ছে পরবর্তী বাক্যটা পিতা সংক্রান্ত বাণী বলে ধরে নিতে প্রভাবিত হও; বাক্যটা এরূপ, ‘শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক’ (ঘ)। পুরা বাক্যটা এ, ‘তঁার সঙ্গে কারও তুলনা হবে না; তিনিই সদ্বিজ্ঞানের সমস্ত পথের সন্ধান পেলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে ও তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন’ (ঙ)। কেননা ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক, তিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ; বিধান প্রদানে ও আমাদের দেহধারণে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি মধ্যস্থ। অতএব তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারে না, কেননা তিনিই সেই একজনমাত্র যিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর রূপে সঞ্জাত, যাঁর দ্বারা স্বর্গে ও পৃথিবীতে সবই সৃষ্ট হয়েছিল, যাঁর দ্বারা কাল ও যুগগুলো হল। যা কিছু আছে তা সবই তাঁর কার্যক্ষমতার ফলে অস্তিত্বমণ্ডিত। একা তিনিই সে-ই যিনি আব্রাহামকে দিক-নির্দেশনা দেন, মোশির সঙ্গে কথা বলেন, ইস্রায়েলের কাছে সাক্ষ্য দেন, নবীদের মধ্যে বসবাস করেন, পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারীর মাধ্যমে জন্ম নিলেন, নিজের যন্ত্রণাভোগের দ্রুশে আমাদের প্রতিকূল ও বিরোধী প্রতাপগুলো বিধিয়ে দেন, মৃত্যুকে পাতালে নিশ্চিহ্ন করেন, নিজের পুনরুত্থান দ্বারা আমাদের আশার নিশ্চয়তা দৃঢ় করেন, নিজের দেহের গৌরব দ্বারা মানব

মাংসের অবক্ষয় ধ্বংস করেন। অতএব তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারবে না। কেননা এগুলো হলো সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বরের বিশিষ্ট প্রতাপ; তেমন নিজস্ব মহৎ বিশেষ ক্ষমতাসমূহের সুখময় অধিকারে একা তিনিই ঈশ্বর থেকে জন্ম নিলেন। তাঁর সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে অন্য এমন ঈশ্বর নেই, কেননা তিনি অন্য কোন পদার্থ থেকে জনিত হননি, কিন্তু তিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে নবীন বা পরকীয় বা সাম্প্রতিক বলতে কিছুই নেই। কেননা যখন ইস্রায়েল এমনটা শোনে যে, তার ঈশ্বর এক ও এমনটাও শোনে যে, ঈশ্বরের পুত্র সেই স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য এমন ঈশ্বরের তুলনা হতে পারে না যিনি ঈশ্বর, তখন সুস্পষ্ট ভাবে এমনটা দাঁড়ায় যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর একেবারে এক, ব্যক্তির একাকীত্বে নয়, কিন্তু সত্তার ঐক্যেই এক (৮)। কেননা যিনি ঈশ্বর, আমরা যে সেই ঈশ্বরের পুত্রকে দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে পরিগণিত করব, নবী আমাদের এমনটা করতে নিষেধ করেন, কারণ ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর।

৩ (ক) আরিউসপস্থীদের বহু ব্যাখ্যার মধ্যে এটাই কাথলিক ধর্মতত্ত্বের চেয়ে সবচেয়ে বিপরীত ব্যাখ্যা। নিকেয়া-মহাসভা আরিউসকে নিন্দিত করার পরে আরিউসপস্থী একটা বিশেষ দল মহাসভার সিদ্ধান্ত মেনে নিল না; দলটা ἐτεροούσιος (এতেরোউসিওস, ভিন্ন সত্তার অধিকারী) নামে ও অন্য নানা নামেও পরিচিত; তারা বলত, পুত্র পিতার সঙ্গে ὁμοούσιος (হমোউসিওস) অর্থাৎ সমসত্তার অধিকারী নন, বরং অন্যান্য সৃষ্টজীবদের উর্ধ্বতম সৃষ্টজীব হলেও তবু একটা সৃষ্টজীব মাত্র।

৪ (ক) পুত্র যে পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী তা সমর্থন করার জন্য নিকেয়া-মহাসভা (৩২৫ খ্রিস্টাব্দে) ὁμοούσιος [হমোউসিওস] গ্রীক শব্দটা আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করেছিল, যদিও শব্দটা আগেও অন্য অর্থে এমনকি ভুল অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছিল। বলা বাহুল্য খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব এখনও ‘হমোউসিওস’ তত্ত্ব সমর্থন করে।

(খ) অর্থাৎ, আরিউসপস্থীরা ὁμοούσιος (হমোউসিওস, সমসত্তার অধিকারী) শব্দটা ‘ταυτοούσιος’ (তাউতোউসিওস) শব্দের অর্থেই ব্যবহার করত যা অনুসারে পিতা ও পুত্র এক সত্তা ও এক ব্যক্তি।

(গ) ‘উসিয়া’: গ্রীক শব্দ ‘οὐσία’ (উসিয়া, সত্তা)।

(ঘ) এই ধারণা ভ্রান্তমতপস্থী মানিখেউস দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল, ১২ অধ্যায় দ্রঃ।

৬ (ক) লুক ২৪:৩৯ দ্রঃ।

৭ (ক) ‘এই দু’টো উক্তি’, অর্থাৎ, ১) পুত্র অনন্তকালীন অস্তিত্বের অধিকারী ও ২) তিনি পিতার সঙ্গে সমসত্ত্বার অধিকারী।

৮ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মার্ক ১২:২৯ লাতিন পাঠ্য।

(গ) ১ তি ২:৫।

(ঘ) রো ১৬:২৫-২৭।

(ঙ) ইশা ৬৫:১৬ লাতিন পাঠ্য।

(চ) যোহন ১৭:৩।

(ছ) মার্ক ১০:১৮।

(জ) ১ তি ৬:১৫ লাতিন পাঠ্য।

(ঝ) মালা ৩:৬ লাতিন পাঠ্য।

(ঞ) যাকোব ১:১৭।

(ট) সাম ৭:১২ লাতিন পাঠ্য।

(ঠ) মথি ৬:২৬।

(ড) মথি ১০:২৯-১০।

(ঢ) দা ১২:৪২।

(ণ) ইশা ৬৬:১-২ লাতিন পাঠ্য।

(ত) প্রেরিত ১৭:২৮।

(থ) সাম ১৩৯:৭-১০ লাতিন পাঠ্য।

(দ) যোহন ৪:২৪।

(ধ) ১ তি ৬:১৬ লাতিন পাঠ্য।

(ন) যোহন ১:১৮ লাতিন পাঠ্য।

(প) যাত্রা ৩:১৪ লাতিন পাঠ্য।

(ফ) ঘেরে ১:৬ লাতিন পাঠ্য।

১০ (ক) এটা ছিল আরিউসপন্থীদের সমর্থিত তত্ত্ব।

১১ (ক) ‘প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন’ : আরিউসপহীরা প্রবচন পুস্তকের এ বচন (৮:২২) গ্রীক সত্তরী পাঠ্য অনুসারে উপস্থাপন করত ; কিন্তু সাধু হিলারিউস লাতিন পাঠ্য উপস্থাপন করেন যা অনুসারে ‘প্রভু আমাকে অধিকার করেছেন’ ।

(খ) হিব্রু ১:৪ ।

(গ) হিব্রু ৩:১-২ লাতিন পাঠ্য ।

(ঘ) যোহন ১৪:২৮ ।

(ঙ) যোহন ১:৩ ।

১২ (ক) ‘মানিথেউস’ নামক ভ্রান্তমতন্তী ‘মানি’ বলেও পরিচিত ।

(খ) ‘হে ধন্য পোপ’ : সেই কালে ‘পোপ’ নামটা সাধারণত বিশপদের বেলায় আরোপিত ছিল ; কেবল পরবর্তীকালেই নামটা শুধুমাত্র রোমের বিশপের জন্যই সংরক্ষিত নাম বলে ব্যবহৃত হতে লাগল ।

১৫ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য ।

১৬ (ক) ১ করি ৮:৬ লাতিন পাঠ্য ।

(খ) আদি ১:৬-৭ লাতিন পাঠ্য ।

(গ) ২ মাকা ৭:২৮ দ্রঃ ।

(ঘ) যোহন ১:১-৩ ।

(ঙ) সাম ১৪৮:৫ লাতিন পাঠ্য ।

(চ) ‘আজ্ঞা দানকারী ঈশ্বর ও আজ্ঞা পূরণকারী ঈশ্বরের মধ্যকার পার্থক্য’ : এই ধরনের ব্যাখ্যা সেকালে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল (সাধু ইরেনেউস, তের্তুল্লিয়ানুস, অরিগেনেস, হিগ্নলিতুস, সাধু আথানাসিউস, সাধু বাসিল, সাধু আগস্তিন ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব দ্রঃ) ।

১৭ (ক) আদি ১:২৬ লাতিন পাঠ্য ।

(খ) আদি ১:২৭ লাতিন পাঠ্য ।

১৯ (ক) সত্যগুলো ক্ষেত্রে ‘পুনরাবৃত্তি তত দরকার হয় না, কিন্তু তা ঘোষিত হওয়াই যথেষ্ট’ : অর্থাৎ, বাইবেলের সত্যগুলো বিশ্বাস করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, বাইবেলে সেই সত্য কমপক্ষে একবারই উপস্থাপিত ।

(খ) আদি ৯:৬ লাতিন পাঠ্য ।

২০ (ক) ‘আমি মানুষকে আমার নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করেছি’ : এতে এটা দাঁড়ায় যে, ঈশ্বরের ঐক্য ক্ষেত্রে আরিউসপন্থীরা ইহুদীদের ধারণা পালন করত।

২১ (ক) প্রবচন ৮:২৮-৩১ লাতিন পাঠ্য।

(খ) আদি ১:৩১ লাতিন পাঠ্য।

২২ (ক) ‘সেগুলোর বিচার-বিবেচনা এই অনুসন্ধানের শেষ পর্যায়ের জন্য সংরক্ষণ করছি’ : অর্থাৎ সাধু হিলারিউস বিষয়টা ১২শ পুস্তকে ৩৫ অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করেন।

(খ) ‘ঐশ্বরিক মনোনয়ন’ নাম দিয়ে নূতন নিয়ম নির্দেশিত, এবং ‘বিধান প্রদান’ নামটা পুরাতন নিয়মকে লক্ষ করে।

২৩ (ক) আদি ১৬:৯, ১০, ১৩ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ইশা ৯:৫ লাতিন পাঠ্য।

২৪ (ক) আদি ১৭:১৯-২০ লাতিন পাঠ্য।

২৫ (ক) আদি ১৮:১০ লাতিন পাঠ্য।

(খ) আদি ১৮:১৭, ২০, ২৬ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) আদি ১৯:২৪।

(ঘ) আদি ২১:১৭-১৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

২৭ (ক) আব্রাহাম ‘যাঁকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন একটা মানুষ, তবু আব্রাহাম প্রভুকেই আরাধনা করেছিলেন’ : আব্রাহাম একটা মানুষ দেখা সত্ত্বেও বুঝতে পেরেছিলেন, সেই মানুষে ঈশ্বরের পুত্র ও মাংসধারণ-রহস্য পূর্বলক্ষিত ছিল।

(খ) যোহন ৮:৫৬০ লাতিন পাঠ্য।

(গ) আদি ২১:১।

(ঘ) আদি ২৭:২ লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) আদি ১৮:২৫ লাতিন পাঠ্য।

২৮ (ক) আদি ১৯:১-২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) আদি ১৮:১৩-১৪ লাতিন পাঠ্য।

২৯ (ক) আদি ১৯:২৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ৫:২২।

৩০ (ক) আদি ৩৫:১।

৩১ (ক) আদি ৩২:২৪ ইত্যাদি দ্রঃ।

৩২ (ক) যাত্রা ৩:২।

(খ) যাত্রা ৩:৪-৫।

৩৩ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯ লাতিন পাঠ্য; সাধু হিলারিউস একথাগুলো পিতার নয়, পুত্রেরই উচ্চারিত কথা বলে সমর্থন করেন।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৩ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ৩৩:১৬।

৩৫ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাম ৪৫:৮ লাতিন পাঠ্য; সাধু হিলারিউসের মত অন্যান্য পিতৃগণও সামসঙ্গীতের এই বচনে দু'টো বিশিষ্ট ব্যক্তি চিনে নেন, যেমন সাধু ইরেনেউস, তের্তুল্লিয়ানুস, সাধু আম্ব্রোজ ইত্যাদি পিতৃগণ।

(গ) সাম ৪৫:৭-৮।

(ঘ) ইশা ৪৩:১০ লাতিন পাঠ্য।

৩৬ (ক) ইশা ৪৩:১০ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ১২:১৮।

৩৭ (ক) হো ১:৬-৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাম ২:৮।

৩৮ (ক) ইশা ৪৫:১১-১৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সেকালের অন্যান্য ব্যাখ্যাতাদের মত সাধু হিলারিউসও মনে করছিলেন, পণ্ডিতেরা ছিলেন গণক।

(গ) সাম ৭২:৯-১১ লাতিন পাঠ্য।

৩৯ (ক) যোহন ২১:৭ দ্রঃ।

(খ) ইশা ৪৫:১৪।

(গ) ২ করি ৫:১৯।

(ঘ) ১ করি ৮:৬।

(ঙ) রো ৯:৫ লাতিন পাঠ্য।

(চ) মথি ১৯:২৮ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৪০ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ইশা ৪৫:১৫ লাতিন পাঠ্য।

৪১ (ক) ইশা ৪৫:১৬ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ইশা ৪৫:১৮ লাতিন পাঠ্য।

৪২ (ক) বারুক ৩:৩৬-৩৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) বারুক ৩:২০ লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোহন ১:১৮ দ্রঃ।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য।

(ঙ) বারুক ৩:৩৬-৩৮ লাতিন পাঠ্য।

(চ) ‘ব্যক্তির একাকীত্বে নয়’ অর্থাৎ, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা একক ব্যক্তি নন, ব্যক্তিত্রয়ের ঐক্যেও এক নন, বরং তিন ব্যক্তি; অন্যদিকে, ‘সত্তার ঐক্যেই এক’: অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সত্তার অর্থাৎ স্বরূপের ঐক্যে এক (তথা ঈশ্বরত্বে এক)। সুতরাং, ‘ব্যক্তির একাকীত্বে এক’ সংজ্ঞাটা ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত, ও ‘সত্তার ঐক্যেই এক’ সংজ্ঞাটা মণ্ডলী দ্বারা সমর্থিত।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৫ম পুস্তক

পুত্র যে ঈশ্বরত্বের অধিকারী ও পিতার সঙ্গে সমসত্তারও অধিকারী, ৫ম পুস্তক বিশেষভাবে এ বিষয় দু'টোর উপরেই জোর দেয়। বিষয় দু'টো নানা বিষয় দ্বারা প্রমাণিত, যেমন :

- পুত্র হলেন সৃষ্টিকর্মের প্রণেতা ;
- পুরাতন নিয়মের নানা ঐশপ্রকাশ পুত্র-ঈশ্বরের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে ;
- আরিউসপন্থীরা পুত্রের ঈশ্বরত্ব ও সমসত্তার বিপক্ষে বাইবেলের যে নানা পাঠ্য বিকৃত করে, সেই পাঠ্যসমূহের প্রকৃত অর্থ উপস্থাপন ;
- পিতা ও পুত্রের স্বরূপের ঐক্য সংক্রান্ত ও তাঁদের প্রকৃত পার্থক্যও সংক্রান্ত মণ্ডলীর বিশ্বাস।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯			

১। আগের পুস্তকগুলোতে ভ্রান্তমতপন্থীদের অভক্তিময় ও উন্মাদ তত্ত্বগুলোতে উত্তর দিতে গিয়ে আমরা এতে সচেতন ছিলাম যে, আমাদের কাজ বেশ কঠিন ছিল ও আমাদের শ্রোতাদের পক্ষে আমাদের সেই উত্তর আমাদের নীরবতার চেয়ে আরও বেশি বিপজ্জনক হতে পারত। কেননা যেহেতু যখন স্পর্ধাজনক অভক্তি-প্রণোদিত অবিশ্বাস আমাদের উপরে ঈশ্বরের সেই ঐক্যের কথা ঠেলে দিচ্ছিল যা ভক্তিময় ও যুক্তিসম্মত বিশ্বাস অস্বীকার করতে পারে না, সেই একই সময় সুবিবেচক প্রাণ এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছিল যে, আমাদের ধারণা গ্রহণ করলে বা প্রত্যাখ্যান করলেও ঈশ্বরনিন্দার বিপদ তখনও উপস্থিত ছিল। একই তত্ত্ব গ্রহণ করা যে অভক্তিময় ব্যাপার ও তা প্রত্যাখ্যান করাও যে

অভক্তিময় ব্যাপার, এমনটা বলা মানব যুক্তির কাছে হাস্যকর ও অযুক্তিকর মনে হতে পারে, কেননা যা সমর্থন করা ভাল, তাতে বিরোধিতা করা মন্দই হওয়া উচিত; যা খণ্ডন করা মঙ্গলকর, তা সমর্থন করাও যে মঙ্গলকর তেমন কথা যুক্তির বাইরে। অথচ মানবীয় যুক্তি ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার সামনে ভ্রান্তি স্বরূপ ও স্বর্গীয় সন্নিবেচনার কাছে মূর্খতা স্বরূপ; সেই মানবীয় যুক্তি নিজের সীমাবদ্ধতা অনুসারে বিচার করে ও নিজের প্রকৃতির দুর্বল শক্তি অনুসারে জানে। ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞাবান হওয়ার আগে যুক্তিকে তার নিজের চোখের সামনে মূর্খ হতে হয়; অর্থাৎ, যুক্তির পক্ষে তার নিজের ধারণাধারার দীনতা মেনে নেওয়া ও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা অন্বেষণ করা দরকার। জগতের সুস্পষ্ট মূর্খতা থেকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় পার হবার জন্য যুক্তিকে প্রজ্ঞাবান হতে হবে, কিন্তু মানবীয় প্রজ্ঞা অনুসারে নয়, বরং সেই প্রজ্ঞা অনুসারে যা ঈশ্বরের কাছে চালনা করে। ভ্রান্তমতপন্থীদের চতুরতা নির্বোধ এই প্রজ্ঞার যুক্তি পতনের অঙ্ক হিসাবে হাতিয়ার করে ঈশ্বরের ঐক্য স্বীকার করেছে ও বিধান ও সুসমাচারের অধিকার আহ্বান করেছে; হ্যাঁ, তারা এই বাণী শোনায়ে, শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক (ক)। তাদের এই কথা যে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে পারবে বা নীরবতায় উপেক্ষা করা হবে, এতে যে কেমন অন্তর্নিহিত বিপদ রয়েছে তারা এবিষয়ে সচেতন আছে, ও উভয় ক্ষেত্রে তারা অভক্তির একটা সুযোগ প্রত্যাশা করে। এভাবে যদি বিশ্বাস-বিরোধী মনোভাবে উপস্থাপিত সেই পবিত্র বচন নীরবতার সম্মুখীন হয়, সেই নীরবতা সম্মতি বলে গৃহীত, কেননা যেহেতু ঈশ্বর এক, সেজন্য ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর নন যেহেতু একথা সত্য যে, ঈশ্বর এক। অপরদিকে, যদি তাদের দুঃসাহসী ভ্রান্তমতে নিহিত তত্ত্ব প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়, তাহলে তেমন বিরোধিতা প্রকৃত সুসমাচারের বিশ্বাস ক্ষেত্রে অস্বীকার বলে পরিগণিত, কেননা সুসমাচার সূক্ষ্ম ভাষায় ঈশ্বরের ঐক্য ঘোষণা করে; এবং এইভাবে যে স্বীকারোক্তি অনুসারে পিতা ও পুত্র এক ঈশ্বর, তাদের মতে সেই স্বীকারোক্তি অন্য একটা ভ্রান্তমতের অভক্তিতে পতিত হয় (খ)। এইভাবে সেই যে ‘জগতের প্রজ্ঞা’ যা ‘ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা’, তা কুটিল ও মারাত্মক সরলতার বেশে তাদের বিশ্বাসের প্রথম সূত্রেই আমাদের প্রতারণা করে; তাদের সেই প্রথম সূত্র এমন যা আমরা স্বীকারও করতে পারি না, ঈশ্বরনিন্দায় পতিত না হয়ে অস্বীকারও করতে পারি না। উভয় ক্ষেত্রে নিহিত যে বিপদ, তা হাতিয়ার করে তাদের ভ্রান্তমত এমনটা পেতে

চায় যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর নন যেহেতু ঈশ্বর এক : অথবা সেই ভ্রান্তমত এমন সিদ্ধান্তে আসতে দাবি করে যে আমরা অবশ্যই ভ্রান্তমতপন্থী যদি সেই মতলব এটা ধরে নেয় যে আমরা পিতাকে ঈশ্বর বলে ও পুত্রকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করায় ঈশ্বরের ঐক্য সাবেল্লিউসের অভক্তিময় অভিমত অনুসারে ব্যাখ্যা করি। এইভাবে, ‘এক ঈশ্বর’ এর উপরে চাপ দেওয়ায় তাদের যে ফন্দি, তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঈশ্বরত্ব থেকে বহিস্কার করবে অথবা সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে গ্রহণ করায় [ঈশ্বরের] ঐক্য ধ্বংস করবে, না হয় সেই ঐক্যকে শুধু নামেই ঐক্য বলে মানবে : সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা এমনটা সমর্থন করে যে, সেই ঐক্য দ্বিতীয় একজনকে মানে না ; দ্বিতীয় একজনের উপস্থিতি ঐক্যকে নিশ্চিহ্ন করে, ও দুই এক হতে পারে না।

২। কিন্তু এই আমরা যারা ঈশ্বরের সেই প্রজ্ঞা পেয়েছি যা জগতের কাছে মূর্খতা, ও প্রভুতে বিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী ও অকপট স্বীকৃতি দ্বারা তাদের শিক্ষার সাপ-জাতীয় চালাকি অনাবৃত করতে উদ্যত, সেই আমরা আমাদের প্রতিবাদের জন্য এমন পরিকল্পনা স্থির করেছি যা সত্য প্রদর্শনের জন্য পথ উন্মুক্ত করবে কিন্তু সেইসঙ্গে ভ্রান্তমতজনক সমর্থনের বিপদের মধ্যে আমাদের আটকাবে না। আমরা যত্ন সহকারে উভয় চরমপ্রান্ত এড়িয়েছি : ঈশ্বর যে এক তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যিনি (ক) ঈশ্বরের ঐক্য ঘোষণা করলেন আমরা তাঁর অধিকার ভিত্তি করে সুস্পষ্ট ভাবে এ প্রচার করি যে ঈশ্বর ও ঈশ্বর আছেন। আমরা এশিক্ষা দিই যে, দু’টো ব্যক্তির সংযোগের ফলে যে এক ঈশ্বর আছেন তা নয়, তাছাড়া বহু ঈশ্বরকে প্রচার করায় আমরা তাঁকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করি না, নামেই মাত্র পার্থক্যও স্বীকার করি না, বরং আমরা তাঁকে ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ বলে উপস্থাপন করি ; এবং ঈশ্বরের ঐক্য সংক্রান্ত সমস্যা পুরো আলোচনার জন্য ভবিষ্যতে স্থগিত করা হবে। কেননা সুসমাচারগুলো আমাদের এমনটা বলে যে, যখন মোশি ঘোষণা করেন যে ঈশ্বর এক, তখন তিনি সত্য বলেন ; ও এক ঈশ্বর সংক্রান্ত তেমন ঘোষণার মধ্য দিয়ে মোশি সেই সুসমাচারগুলোর শিক্ষা সপ্রমাণ করেন সেই যে সুসমাচারগুলো ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ এর কথা বলে। এইভাবে আমরা আমাদের অধিকারসম্পন্ন সাক্ষ্যদানসমূহ বিরোধিতা করি না, বরং সেগুলোর উপরেই আমাদের শিক্ষা দাঁড় করাই যাতে করে এমনটা না হয় যে, ইস্রায়েলের কাছে দেওয়া ঈশ্বরের ঐক্য

সংক্রান্ত প্রকাশ এটা বলতে সম্মতি দেয় যে, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর নন; কেননা ‘ঈশ্বর এক’ আমাদের এই ঘোষণা করার জন্য যিনি আমাদের অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, তিনি তাঁর পুত্রের ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করার জন্যও আমাদের অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

৩। তাই পুস্তকের বিন্যাস উত্থাপিত প্রতিবাদগুলোর অনুক্রম ঘনিষ্ঠভাবেই পালন করে। যেহেতু তাদের কুটিল ও অভক্তিময় স্বীকারোক্তির পরবর্তী সূত্র হলো ‘আমরা একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে স্বীকার করি’ (ক), সেজন্য ঈশ্বরের পুত্র সত্যকার ঈশ্বর কিনা তেমন বিষয়েই গোটা এই ২য় পুস্তক (খ) কেন্দ্রীভূত। কেননা এটা স্পষ্ট যে, ভ্রান্তমতপন্থীরা আগে ‘এক ঈশ্বর’ বলায় ও পরে ‘একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে’ স্বীকার করায় বুদ্ধিকৌশলময় ভাবে পুস্তকের এই বিন্যাস স্থির করেছে যাতে করে পুত্রকে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে; কেননা যখন ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ একাই পিতার স্বরূপ দ্বারা সীমিত, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে একাই তিনি প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী। ফলত, যেহেতু এটা সন্দেহের বাইরেই যে মোশি যখন ঈশ্বরের ঐক্য ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের পুত্রের ঈশ্বরত্বকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন, সেজন্য এসো, এই শিক্ষা যেখানে উপস্থাপিত, খোদ সেই সাক্ষ্যবাণীতেই ফিরে যাই ও এটা অনুসন্ধান করি, যাঁকে তিনি ঈশ্বর বলে ইঙ্গিত করেছেন, তাঁকে তিনি সত্যকার ঈশ্বর বলে দেখাতে চাইলেন কিনা। কোন একটা বস্তু যে প্রকৃত ও খাঁটি, তা সেটার স্বরূপ ও গুণাবলির উপরে নির্ভর করে, এবিষয়ে সবাই একমত। উদাহরণ স্বরূপ, সেটাই খাঁটি গম যেটা এমন মঁজরী বিশিষ্ট শিষ যা তুষ থেকে শুদ্ধ হয়ে ও ময়দায় মাড়াই করা, রুটির আকারে প্রস্তুত করা ও খাদ্য হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার পর নিজে থেকেই রুটির প্রকৃতি ও ব্যবহার ব্যক্ত করে। অতএব, যেহেতু প্রকৃতিগত গুণাবলিই হলো সত্যের প্রমাণ, সেজন্য এসো, পরীক্ষা করে দেখি, মোশি যাঁকে ঈশ্বর বলেন তিনি সত্যকার ঈশ্বর কিনা। সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি একাধারে সত্যকার ঈশ্বর, এবিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আমরা যা প্রতিশ্রুত হয়েছি যদি তা অবহেলা করে এমনটা সপ্রমাণ না করি যে পিতা ও পুত্র ব্যক্তিত্বয়তে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বিরাজিত, তবে ভয় করি, আগ্রহী ও উদ্বিগ্ন কত প্রাণ বিপজ্জনক সন্দেহে নিপীড়িত হবে।

৪। সেই যে জগৎসৃষ্টির পরে মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করল, সেই জগৎসৃষ্টি এমনটা দেখায় যে ঈশ্বরের পুত্র নিজেই ঈশ্বর; তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, কেমন করে সেই জগৎসৃষ্টি পুত্র যে সত্যকার ঈশ্বর' মিথ্যা বলে প্রমাণ করবে? সবই যে পুত্রের দ্বারা হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কেননা প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, 'সমস্ত কিছু তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই মধ্যে হয় (ক)। যখন সমস্ত কিছু তাঁরই দ্বারা হয় ও সবই শূন্য থেকে গড়া হয়েছে ও তাঁরই দ্বারা ছাড়া অন্য কোন কিছু নেই, তখন জিজ্ঞাসা করি, যিনি ঈশ্বরের স্বরূপও বিহীন নন ও পরাক্রমও বিহীন নন, তিনি কেমন করে সত্যকার ঈশ্বরত্ব বিহীন হতে পারেন? কেননা যা কিছু অস্তিত্ববিহীন ছিল তা অস্তিত্বে আনার জন্য ও নিজের ইচ্ছাক্রমে তা সৃষ্টি করার জন্য তিনি নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রমকেই ব্যবহার করলেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর দেখলেন, সেই সবই মঙ্গলময়।

৫। যখন বিধান বলে (ক) 'এবং ঈশ্বর বললেন, একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক', এবং পরে বলে চলে, 'এবং ঈশ্বর পরদাটা তৈরি করলেন' (খ), তখন বিধান ব্যক্তি-পার্থক্য ছাড়া অন্য পার্থক্য উপস্থাপন করে না। সেই বচনে বিধান পরাক্রম বা স্বরূপ সংক্রান্ত কোন পার্থক্য ইঙ্গিত করে না, কোন নামও পরিবর্তন করে না, কিন্তু বক্তার পরিচয় দান করে শুধু এই লক্ষ্যে, তথা যেন নির্মাতার কর্মের দিকে অঙুলি নির্দেশ করতে পারে। যে বর্ণনা দেয়, তার ভাষা সেই নির্মাতাকে ঐশ্বরিক স্বরূপ ও পরাক্রম বর্ণিত করার জন্য কিছুই বলে না, বরং অধিকতর সূক্ষ্মভাবে তাঁর ঈশ্বরত্বকে চিহ্নিত করে। [সৃষ্টি সংক্রান্ত] বাণীকে কার্যকর করার পরাক্রম কেবল সেই স্বরূপেরই অধিকার যাঁর পক্ষে কথা বলা ও কর্ম সাফল্যমণ্ডিত করা এক। তবে যিনি কথা বলেন তিনি যখন ঈশ্বর, তখন যিনি নির্মাণ করেন তিনি কেমন করে সত্যকার ঈশ্বর নন? কেননা সেই বাণী যেমন প্রকৃতই ঐশ্বরিক বাণী ছিল, তেমনি সম্পাদিত কর্মটাও প্রকৃতই ঐশ্বরিক ছিল। যিনি কথা বললেন তিনি ঈশ্বর, যিনি নির্মাণ করলেন তিনি ঈশ্বর। যিনি কথা বললেন তিনি যদি প্রকৃত ঈশ্বরত্বের অধিকারী, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন নির্মাতার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হয়? যদি না এমনটা হয় যে, ঈশ্বরত্ব তখনই একজনের মধ্যে উপস্থিত যখন সেই একজন কথা বলেন ও তখনই অপরজনের মধ্যে অনুপস্থিত যখন সেই অপরজন নির্মাণ করেন। তাই ঈশ্বরের পুত্রতে আমরা প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ লক্ষ্য করি: তিনি ঈশ্বর, তিনি

স্রষ্টা, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি সবই পারেন। তিনি যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন তা শুধু নয়, কেননা ইচ্ছা সবসময়ই পরাক্রমের পাশে পাশে থাকে; এমনকি তাঁকে যা কিছু বলা হয় তিনি তা করতে পারেন। এটাই নিখুঁত প্রতাপ: নির্মাতার স্বরূপ সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করতে পারে যা বস্তুর কথায় ব্যক্ত। তাই যা কিছু বলা হয় তা যখন কার্যমণ্ডিত করা যেতে পারে, তখন গৃহীত কথাগুলোতে নিখুঁতভাবে অনুরূপ যে কার্যকারী প্রতাপ, সেই প্রতাপ ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী। তাই ঈশ্বরের পুত্র মিথ্যা ঈশ্বর নন, দত্তক গুণেও ঈশ্বর নন, নাম-সহভাগিতা গুণেও ঈশ্বর নন, কিন্তু সত্যকার ঈশ্বর। তাঁর ঈশ্বরত্বের বিরোধী অন্য কোন প্রতিবাদ উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না; তিনি যে ঈশ্বরের নাম ও স্বরূপের অধিকারী, আমার কাছে এটাই যথেষ্ট প্রমাণ। যাঁর দ্বারা সব কিছু হয়েছে, তিনি ঈশ্বর। তাঁর বিষয়ে এই সত্যকে জগৎসৃষ্টিই আমাকে বলেছে। তিনি নামে ঈশ্বরের সমকক্ষ ঈশ্বর, প্রতাপে সত্যকার ঈশ্বরের সমকক্ষ সত্যকার ঈশ্বর। ঐশ্বরিক প্রতাপ সৃজনী বাণীতে প্রকাশিত, তেমনি ঈশ্বরের প্রতাপ সৃজনী কর্মে ব্যক্ত। তাই আমি এখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, পিতা ও পুত্রকে আমার স্বীকারোক্তি ক্ষেত্রে কোন্ অধিকারেই বা একজন তাঁরই প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ অস্বীকার করতে পারে যাঁর নাম তাঁর প্রতাপকে প্রকাশ করে ও যাঁর প্রতাপ ঈশ্বর-নাম ক্ষেত্রে তাঁর অধিকার প্রমাণ করে।

৬। আমার পাঠককে মনে রাখতে হবে যে সাধারণত উত্থাপিত প্রতিবাদসমূহের ব্যাপারে আমি বিস্মৃতির কারণে বা নিশ্চয়তার অভাবের কারণেই যে নীরব থাকি, তা নয়। কেননা ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’ (ক) প্রায়ই উপস্থাপিত বচনটা ও সেটার সমরূপ বচনগুলো সম্পর্কে আমি বিস্মৃত নই বা সেগুলোর অর্থও এমনভাবে ভুল বুঝি না যার ফলে আমি সেগুলো মূল্যায়ন না করেই এটা সমর্থন করি যে পুত্রে সত্যকার ঈশ্বরের স্বরূপ উপস্থিত। কিন্তু এটাই উপযোগী ছিল যে, আমার উত্তরগুলো বিপক্ষদের উত্থাপিত প্রতিবাদের সঠিক অনুক্রম অনুযায়ীই দেওয়া হবে, যেন ভ্রান্তমত নিন্দাজনক ও ভক্তিহীন পথ ধরা মাত্রই আমার ভক্তিময় প্রচেষ্টা দেরি না করে তাদের অভক্তিময় শিক্ষাদানের পদাঙ্ক ধাপে ধাপে অনুসরণ ক’রে তার সেই ভ্রান্তিজনক পদচিহ্ন সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন করতে পারে। এই লক্ষ্যেই আমরা সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্য আমাদের এই কর্মের শেষেই স্থগিত করে আপাতত বিধান ও নবীদের ক্ষেত্রেই

ঈশ্বরনিন্দুকদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে অপব্যাখ্যা ও চালাকি ভিত্তিক তাদের সমস্ত কুটিল প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেব সেই একই বচনগুলো ব্যবহার ক’রে যা দ্বারা তারা আমাদের বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট। সত্য উপলব্ধি করা যায় না, যদি না সত্য-বিরোধী সমস্ত প্রতিবাদের মিথ্যা উদ্ঘাটিত হয়; ও মিথ্যাবাদীর অপমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন খোদ মিথ্যা-মিথ্যি সত্যের উপকারে আসে। বাস্তবিকই মানবজাতির অভিজ্ঞতা এটা শিখেছে যে, মিথ্যা ও সত্য কখনও সহচর হয় না ও যা কিছু সেই ধরনের, তা পুনর্মিলিত ও একমত করা সম্ভব নয়। কেননা খোদ প্রকৃতিই এমনটা মানে না যে পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলো ঠিক তাদের বিরোধিতার ভিত্তিতেই পরস্পর মিলিত হবে, বিপরীত বিষয়গুলো সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ও পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে মিল স্থাপিত হবে।

৭। ব্যাপারটা এরূপ দাঁড়ালে তবে আমি জিজ্ঞাসা করি কেমন করে ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’ (ক) বচনে সত্যকার ও মিথ্যা ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। কথাগুলো একটা অর্থ ব্যক্ত করে, অর্থটা হলো একটা ধারণার প্রকাশ, ধারণার গতি সত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সুতরাং এসো, কথাগুলো থেকে শুরু করে অর্থ অনুসরণ করি, অর্থ থেকে ধারণা শিখি, ও ধারণা থেকে সত্য নিষ্পন্ন করি। ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’, বচনটা যাকে লক্ষ করে, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, যিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, তাঁর দ্বারা তিনি কোন্ দিক দিয়ে সত্যকার ঈশ্বর বলে পরিগণিত নন? কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে কথাগুলো বক্তার মনোভাব ও ধারণা ব্যক্ত করে। ‘এসো, আমরা নির্মাণ করি’ বলায় তিনি অবশ্যই এমন একজনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যিনি কর্ম ক্ষেত্রে তাঁর নিজের সঙ্গে বিমত নন, তাঁর নিজের কাছে পরকীয় নন, প্রতাপে তাঁর নিজের নিম্ন নন, তিনি বরং এমন একজনকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন যিনি, যা বিষয়ে তিনি কথা বলেন, তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখেন। তাই আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে, যিনি তেমন কথা বলেন, যেহেতু তিনি তেমন কথা উচ্চারণ করেছেন সেজন্য নিঃসন্দেহেই তিনি ঠিক এই ধারণা ব্যক্ত করতে চাচ্ছিলেন।

৮। পুত্রের স্বরূপে ও কর্মে সহজাত সত্য যেন পূর্ণতর ভাবে প্রমাণিত হয়, সেজন্য যিনি আমার উল্লিখিত কথা দ্বারা নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করছিলেন, তিনি যা বিষয়ে ভাবছিলেন তা তাঁরই প্রকৃত ঐশ্বর্যরূপ দ্বারা প্রভাবিত ছিল যাকে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে’। সত্যকার ঈশ্বর যাকে বলেন ‘আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে’, তিনি কেমন করে মিথ্যা ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে পারেন? ‘আমাদের’ শব্দটা একাকীত্ব ক্ষেত্রে সঙ্গত শব্দ নয়, পৃথক স্বরূপকেও বা ভিন্ন ইচ্ছাকেও বোঝায় না। কেননা কথাগুলো একেবারে সূক্ষ্ম অর্থ অনুসারে ধরলে তবে এমনটা দাঁড়ায় যে মানুষ তাঁদের মিলিত প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মিত। মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে কোন মিল থাকতে পারে না। কথা বলেন যিনি, সেই ঈশ্বর ঈশ্বরেরই কাছে কথা বলছেন: মানুষটি পিতা ও পুত্রের প্রতিমূর্তি অনুসারেই সৃষ্ট। তাঁদের নাম ভিন্ন নয়, তাঁদের স্বরূপ আলাদা নয়। যে প্রতিমূর্তি অনুসারে মানুষ সৃষ্ট হলো, প্রকারে সেই প্রতিমূর্তি একক। ব্যাপারটা তেমনটা হলে, তবে যখন মানবসৃষ্টি ও খোদ প্রতিমূর্তির সত্য উভয়েরই মিলিত কর্ম, তখন [পুত্রের] প্রকৃত ঈশ্বরত্ব কেমন করে হারিয়ে যেতে পারে? বিষয়টা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এখনও হয়নি; পরবর্তীকালেই আমরা বোঝাব, যা অনুসারে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে, পিতা ঈশ্বরের ও পুত্র ঈশ্বরের সেই প্রতিমূর্তি কেমন। আপাতত আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে লেগে থাকব তথা, সত্যকার ঈশ্বর যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ‘এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি’, তিনি সত্যকার ঈশ্বর কিনা। [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] যদি পার, তবে উভয় সংক্রান্ত এই মিলিত প্রতিমূর্তিতে প্রকৃত ও মিথ্যা বিষয়গুলো পৃথক পৃথক কর, এবং যা অবিভাজ্য তোমার ঈশ্বরনিন্দুক ক্ষিপ্ততায় তা বিভক্ত কর। কেননা তাঁরা এক, ও মানুষ তাঁদের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যের একক কপি হিসাবে নির্মিত হয়েছে।

৯। কিন্তু এসো, অনুক্রম অনুসারে শাস্ত্রকে পাঠ করে চলি যাতে করে সত্য নিজের অপরিবর্তনীয় সঙ্গতি অনুসারে এসমস্ত মিথ্যা প্রতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত না হয়। ‘ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে তাকে নির্মাণ করলেন’ (ক)। প্রতিমূর্তিটা উভয় সংক্রান্ত: ঈশ্বর মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে নির্মাণ করলেন। ঈশ্বরের পুত্র যে সত্যকার ঈশ্বর, একথা যে অস্বীকার করে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব,

তার মতে কোন্ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন? তথাপি সে সবসময় মনে রাখুক যে সবই পুত্রের দ্বারা হয়; কেননা এমনটা এড়াতে হয় পাছে দৈবাৎক্রমে ভ্রান্তমত নিজের লক্ষ্যের জন্য মিথ্যাভাবে সৃষ্টিকর্মটা পিতা ঈশ্বরের উপর আরোপ করে। তাই যদি মানুষ পুত্র ঈশ্বর দ্বারা পিতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে সৃষ্ট, তাহলে সে পুত্রের প্রতিমূর্তি অনুসারেও সৃষ্ট; কেননা এমন কেউ নেই যে এমনটা সমর্থন করে যে ‘আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে’ কথাটা পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। তাই ঐশবাণী নিজের উচ্চারিত কথায় সেই প্রকৃত ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করল যা সৃষ্টি নিজেও পরবর্তীতে সৃষ্টিকর্মে সম্পূর্ণরূপে সত্যায়িত করেছিল। এর ফলে, যিনি মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়েন, যিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেন, তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃত ঈশ্বরত্ব থেকে বঞ্চিত না করে নিজেই সত্যকার ঈশ্বর। কেননা প্রকৃত ঈশ্বরত্ব বিষয়ে মিলিত অধিকার তাঁরই প্রকৃত ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত করে যিনি সৃষ্টিকর্মে পুত্র ঈশ্বর বলে নির্দেশিত হয়েছিলেন।

১০। আহা, হারানো মনের কেমন ক্ষিপ্ততা! আহা, কেমন নির্বোধ স্পর্ধা যা অন্ধ অভক্তির ফল! তুমি তো ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ এর কথা শোন; তুমি তো ‘আমাদের আপন প্রতিমূর্তি’ কথাটাও শোন; কেন তুমি তাতে অনুমান কর যে একজন হলেন সত্যকার ঈশ্বর ও অন্যজন সত্যকার ঈশ্বর নন? কেন সত্যকার ঈশ্বর ও মিথ্যা ঈশ্বর এর মধ্যকার পার্থক্য অনুপ্রবেশ করাও? বিশ্বাস রক্ষা করার অজুহাতে কেন তুমি বিশ্বাসকে আমূলে ধ্বংস কর? একমাত্র ঈশ্বর আছেন ও একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর আছেন তেমন ঘোষণা অপব্যবহার করে কেন তুমি এমনটা সমর্থন করতে চেষ্টা কর যে ঈশ্বর সত্যকারও নন, একও নন? আপাতত আমি তোমার অবোধ স্পর্ধা সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের সেই স্পষ্ট বাণী দ্বারা খর্ব করতে চাই না যা অনুসারে পিতা ও পুত্র ব্যক্তি হিসাবে নয় কিন্তু স্বরূপ ক্ষেত্রে উভয়ই একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর। আপাতত তোমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিধানই যথেষ্ট। বিধান কি কখনও একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর ও প্রকৃত নয় এমন ঈশ্বর এর কথা বলে? বিধান কি উভয় ক্ষেত্রে [ঈশ্বর] নাম ছাড়া অন্য নাম ব্যবহার করে? সেই ঈশ্বর নাম তো তাঁদের স্বরূপ চিহ্নিত করে। এবং যে বিধান একমাত্র ঈশ্বরের কথা বলেছিল, ঠিক সেই বিধানই ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ বিষয়ে কথা বলে।

কিন্তু আমি কেন শুধু এটাই বলি যে, বিধান সেবিষয়ে কথা বলেছিল? সেই বিধান [তাদের যৌথ] প্রতিমূর্তির বাস্তব প্রমাণে তাঁদের সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার ঈশ্বর বলে প্রকাশ করল। তাঁদের চিহ্নিত করতে গিয়ে বিধান শুরুতে তাঁদের সাধারণ নাম ব্যবহার করেছে; পরে, সত্তা ক্ষেত্রে তাঁদের উপর প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ আরোপ করে। কেননা যাকে সৃষ্টি করা হয়, সে যখন উভয়ের প্রতিমূর্তি অনুসারেই সৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, তাঁরা এক একজন সত্যকার ঈশ্বর।

১১। কিন্তু এসো, আমাদের শিক্ষাদান নিয়ে সেই পথে এগিয়ে চলি যা নিজের পবিত্রতায় বিধান ঈশ্বর বিষয়ে আমাদের দেখিয়েছে। ঈশ্বরের দূত আগারকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, ও সেই একই দূত হলেন ঈশ্বর। কিন্তু যেহেতু তিনি ঈশ্বরের দূত, সেজন্য এমনটাও হতে পারে যে তিনি সত্যকার ঈশ্বর নন। এই নাম এমন যা মনে হচ্ছে নামটা নিম্ন স্বরূপ নির্দেশ করে, ও যখন আমরা অন্য ধরনের নামের সামনে সম্মুখীন হই, তখন আমরা এমনটাও মনে করতে পারি যে, আমরা অন্য ধরনের কিছুর সামনে দাঁড়াছি। আগের পুস্তক ইতিমধ্যে দেখিয়েছে যে এই ধরনের প্রতিবাদ ভিত্তিহীন (ক)। ‘দূত’ নামটা স্বরূপ নয় ভূমিকাই নির্দেশ করে। এবং এক্ষেত্রে নবী নিজেই আমার এই ব্যাখ্যা এইভাবে সমর্থন করেন, ‘তিনি বাতাসকে নিজের দূত, জ্বলন্ত আগুনকে নিজের সেবক করেন’ (খ)। সুতরাং, তাঁর সেই সেবকেরা হলেন জ্বলন্ত আগুনের শিখা ও তাঁর সেই দূতেরা হলেন সেই বাতাস যা আসে। এ চিত্রগুলো যাদের নাম দূত সেই সংবাদদাতাদের স্বরূপ ও অধিকার দেখায়, সেই সেবকদেরও স্বরূপ ও অধিকার দেখায়। তাই এই বাতাস দূত হয়, এবং এই জ্বলন্ত আগুন ঈশ্বরের সেবক হয়; ও তাঁদের এই স্বরূপ তাঁদের জন্য সংবাদদাতা বা সেবক-ভূমিকা অর্জন করে। বিধান অর্থাৎ বিধানের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র-ঈশ্বরকে এমন ব্যক্তি বলে নির্দেশ করতে চাইলেন যিনি পিতার একই নাম বহন করেন তথা দূত অর্থাৎ ঈশ্বরের সংবাদদাতা। ‘সংবাদদাতা’ শব্দটা এটা প্রমাণিত করে যে তিনি এমন ভূমিকার অধিকারী যা তাঁর নিজস্ব; কিন্তু যখন ঈশ্বর তাঁকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করলেন, তখন সেই নামে তিনি এটা প্রমাণিত করলেন যে তাঁর স্বরূপ সত্যিই ঐশ্বরিক। কিন্তু এখানে আমরা স্বরূপের নয়, ব্যক্তিরই পার্থক্যের সম্মুখীন। আমরা ঘোষণা করি, তাঁরা সত্যিকারে পিতা ও পুত্র, ও তাঁদের নাম এতই সমতুল্য একটা ঐশ্বরিক

স্বরূপ নির্দেশ করে যে একমাত্র জনিত পুত্র, নিজের জন্ম গুণে, যাঁর জন্ম সম্ভব নয় সেই পিতা ঈশ্বর থেকে প্রকৃত ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত বচনে প্রেরিত ও প্রেরণকর্তা বিষয়ক নির্দেশনা এমন যা পিতা ও পুত্রকে নির্দেশ করা ছাড়া অন্য কিছু নির্দেশ করে না, কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপও বাতিল করে না, পুত্রের সেই ঈশ্বরত্বকেও নিশ্চিত করে না যা তাঁর জন্মগত অধিকার। এটা স্পষ্ট যে, পুত্রের জন্ম এমনটা দাবি রাখে যে, তিনি একাধারে নিজের প্রণেতার স্বরূপেরও অধিকারী হবেন; এভাবে অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আবির্ভূত হয়, কারণ এক এক থেকে ভিন্ন নন; উভয়ই এক, কারণ এক এক থেকে হন।

১২। হে বিশ্বাসের অদম্য উত্তাপ; হে প্রত্যাশিত বাণীর অসহনীয় নীরবতা! আগের পুস্তকেও আমরা আমাদের শিক্ষা-প্রদর্শনের জন্য অতীষ্ট নিয়ম থেকে দূরে সরে গেছিলাম, কেননা একথা সমর্থন ক’রে যে ভ্রান্তমতপন্থীরা ঈশ্বরের ঐক্য বিষয়ে অভক্তিময় ভাষা ব্যবহার করে ও সেই বচনগুলো ব্যাখ্যা ক’রে যেগুলোতে মোশি ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ এর কথা বলেন, আমরা হয় তো অত্যাধিক ত্বরার সঙ্গে, যদিও ভক্তিময়ই ত্বরার সঙ্গে, ঈশ্বরের ঐক্য বিষয়ক খাঁটি ও যথার্থ সংজ্ঞা নির্দেশ করতে এগিয়ে চলেছি। এবং অন্য বিষয়ে অতিব্যস্ত হয়ে আমরা এবারও স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুসরণ করিনি, ও ঈশ্বরের পুত্রের প্রকৃত ঈশ্বরত্বের কথা বলতে ব্যস্ত হতে হতে উদ্দীপ্ত ও ভক্তিপূর্ণ প্রাণে পিতা ও পুত্রের প্রকৃত ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করতে পদার্পণ করেছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের সত্য-প্রদর্শন উপস্থাপনার জন্য আমাদের উপযুক্ত স্থান বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। সেবিষয়ে এই প্রাথমিক কথা পাঠকের মনের নিরাপত্তার জন্যই বলা হয়েছে, কিন্তু কথাটা এমনভাবে বিকশিত করা ও আরও ব্যাপক ভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার যাতে বিরোধীদের মতলব ব্যর্থ হয়।

১৩। যে নাম ভূমিকা নির্দেশ করে, সেই নাম স্বরূপের পরিবর্তন দাবি করে না: যিনি ঈশ্বরের দূত, তিনি ঈশ্বর। তিনি যদি এমন কিছু না বলতেন ও না করতেন যা কেবল ঈশ্বর বলতে ও করতে পারেন, তাহলে তিনি কোন মতে সত্যকার ঈশ্বর হতেন না। কেননা তিনি ইশ্মায়েলকে বড় এক জাতিতে বংশবৃদ্ধি করেন ও এমনটা প্রতিশ্রুত হন যে, বহু জাতি তাঁর নাম বহন করবে (ক), কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এটা কি দূতেরই

কাজ বলে গণ্য হতে পারে? বরং, সেই কাজ যদি ঈশ্বরেরই অধিকারের চিহ্ন হয়, তবে [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তুমি যাঁর উপর প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকার আরোপ কর, তাঁর বেলায় কেন প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ অস্বীকার কর? তাঁর স্বরূপের পরাক্রমই তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ যোগায়। যিনি সেই সত্যকার ঈশ্বর যিনি জগতের পরিব্রাজকের জন্য নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর নন, তা কখনও হতে পারে না।

১৪। সর্বপ্রথমে আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘সত্যকার প্রকৃত ঈশ্বর’ ও ‘সত্যকার প্রকৃত ঈশ্বর নন’ কথা দু’টোর অর্থ কী? কেউ যদি আমাকে বলত, এটা আগুন, কিন্তু প্রকৃত আগুন নয়; অথবা, এটা জল, কিন্তু প্রকৃত জল নয়, তবে তেমন কথার অর্থ আমি বুঝতে পারতাম না; এবং আমি জিজ্ঞাসা করি, যখন দু’টো জিনিস একই ধরনের, তখন প্রথমটার প্রকৃত স্বরূপ ও দ্বিতীয়টার প্রকৃত স্বরূপের মধ্যে কেমন পার্থক্য থাকতে পারে? যখন একটা জিনিস আগুন, এমনটা হতে পারে না যে তা প্রকৃত আগুন নয়; যত সময় সেটার স্বরূপ একই হয়ে থাকে, তত সময় ধরে প্রকৃত হবার তার যে নিজের বৈশিষ্ট্য, সেই জিনিস তা হারাতে পারে না। জলকে জলের স্বীয় বৈশিষ্ট্য-বঞ্চিত কর, তবেই তুমি প্রকৃত জল বলে সেই জলকে ধ্বংস করবে। কিন্তু তা যদি জল হয়ে থাকে, তাহলে এটা অপরিহার্য যে, সেই জল প্রকৃত জল হয়ে থাকবে। একটা জিনিসের স্বরূপ তখনই মাত্র ধ্বংস হতে পারে যখন সেই জিনিস নিজের অস্তিত্ব হারায়, কিন্তু জিনিসটা যদি অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে, তাহলে এটা অপরিহার্য যে, স্বরূপটা প্রকৃত। ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর হলে, তবে তিনি সত্যকার প্রকৃত ঈশ্বর; অথবা, তিনি সত্যকার ঈশ্বর না হলে, তবে এমনটা সম্ভব নয় যে তিনি ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী হবেন, কারণ তাঁর যদি স্বরূপ না থাকে তাহলে সেই নামের তাঁর কোন অধিকার নেই; কিন্তু তাঁর যদি স্বরূপের সহজাত নাম থাকে, তাহলে তিনি যে প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ বিহীন, তা আদৌ হতে পারে না।

১৫। কিন্তু এমনটাও বলা যেতে পারত যে, যখন ঈশ্বরের দূত ঈশ্বর বলে চিহ্নিত, তখন তাঁকে সেই নাম সৌজন্যেই, উপমাচ্ছলেই, দেওয়া হয়, ফলে তিনি এমন ঈশ্বরত্বেরই অধিকারী যা নামেই মাত্র ঈশ্বরত্ব, অর্থাৎ সেই ঈশ্বরত্ব প্রকৃত নয়। তাঁকে যখন ঈশ্বরের

দূত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তখন তিনি যদি অপরিপাক্ত ভাবে নিজের ঐশ্বর্যরূপ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে এমনটা দেখতে চেষ্টা কর যদি তিনি নিজের প্রকৃত স্বরূপকে দূতের স্বরূপের চেয়ে নিম্নতর ধরনেরই স্বরূপের নামে প্রকাশ করে থাকেন। কেননা আব্রাহামের কাছে যিনি কথা বলেছিলেন তিনি একটা মানুষ ছিলেন, কিন্তু আব্রাহাম তাঁকে ঈশ্বর বলেই আরাধনা করেছিলেন। হে দুষ্কৃত ভ্রাতৃমতপন্থী, যাকে তুমি ঈশ্বর বলে অস্বীকার কর, আব্রাহাম কিন্তু তাঁকে ঈশ্বর বলেই স্বীকার করেছিলেন। তোমার অভক্তিতে তুমি আব্রাহামকে প্রতিশ্রুত সেই সমস্ত আশীর্বাদ থেকে কী প্রত্যাশা করতে পার? তিনি যেমন বিজাতীয়দের পিতা, তিনি সেইমত তোমার কাছে পিতা নন। তাঁর বিশ্বাসকে দেওয়া আশীর্বাদগুলোর গুণে তুমি নবজন্ম লাভ ক’রে তাঁর বংশের পরিবারে প্রবেশ করতে পার না। তুমি আব্রাহামের জন্য পাথর থেকে উদ্ধৃত সন্তান নও (ক), কিন্তু সাপের বংশ যে তুমি, তুমি তো তাঁর বিশ্বাসের শত্রুই বলে দাঁড়াও (খ)। তুমি ঈশ্বরের ইস্রায়েল নও, তুমি আব্রাহামের উত্তরাধিকারী নও, তুমি ধর্মময় বলে সাব্যস্ত নও (গ): তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করনি। কেননা আব্রাহাম যাকে বিশ্বাস করেছিলেন, যে বিশ্বাস গুণে সেই ঈশ্বরকে আরাধনা করেছিলেন, সেই বিশ্বাসের ফলেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন ও বিজাতীয়দের পিতা হতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সুখী ও বিশ্বস্ত পিতৃকুলপতি যাকে আরাধনা করেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর; এবং লক্ষ কর কেমন করে তিনি সত্যিই সেই ঈশ্বর ছিলেন যার পক্ষে—ঈশ্বরের নিজের কথা অনুসারে—প্রতিটি কথা কাজে পরিণত করতে সাধ্য (ঘ)। একা ঈশ্বর বাদে এমন কেউ কি আছে যার পক্ষে সবই সাধ্য? একজন যদি সবই পারে, তবে, আমি জিজ্ঞাসা করি, তার পক্ষে সত্যকার ঈশ্বর হবার জন্য বাকি কি রয়েছে?

১৬। আমি আরও জিজ্ঞাসা করি: এই যে ঈশ্বর সদোম ও গমোরা উল্ট-পাল্ট করে দিলেন, তিনি কে? (ক)। কেননা প্রভু প্রভু থেকে [গন্ধক ও আগুন] বর্ষণ করেছিলেন (খ): সত্যকার প্রভু থেকে যিনি গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করেন সেই প্রভু কি সত্যকার নন? প্রভু থেকে সেই প্রভু ছাড়া তিনি অন্য কিছুই কিবা হতে পারেন? তুমি যদি এমনটা না মেনে নাও যে, ‘প্রভু ও প্রভু’ কথায় সেই ব্যক্তি দু’টো পৃথক, তাহলে অন্য কোন্ ব্যাখ্যা উপস্থাপন কর? এটাও মনে রাখ যে, তাঁকে তুমি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার

করেছ, এমনকি একমাত্র ন্যায়বান বিচারকর্তা বলেও তাঁকে স্বীকার করেছ। এটা লক্ষ কর যে, যে প্রভু প্রভু থেকে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করেন, দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককে বিনাশ না করায় ও সারা পৃথিবীকে বিচার করায় তিনি একাধারে প্রভু ও ন্যায়বান বিচারকর্তা এবং প্রভু থেকে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি যাকে একমাত্র ন্যায়বান বিচারকর্তা বলে বর্ণনা কর তিনি কে। প্রভু প্রভু থেকে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন; যিনি প্রভু থেকে [গন্ধক ও আগুন] বর্ষণ করেন তিনি যে সেই ন্যায়বান বিচারকর্তা তা তুমি অস্বীকার করবে না; কেননা বিজাতীয়দের পিতা, কিন্তু অবশ্যই অবিশ্বাসী বিজাতীয়দের পিতা নন, সেই আব্রাহাম বললেন, দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককে বিনাশ করা, তোমার পক্ষে এমন কাজ করা দূরের কথা, কেননা এর ফলে ধার্মিক দুর্জনের সমান হবে। সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা যে তুমি তেমন বিচার আদৌ করবে না (গ)। সুতরাং ন্যায়বান বিচারকর্তা এই ঈশ্বর অবশ্যই সত্যকার ঈশ্বরও হবেন। হে ঈশ্বরনিদ্দুক, তোমার নিজের মিথ্যাই তোমাকে খণ্ডন করে। আমি এখনও বিচারকর্তা ঈশ্বর সংক্রান্ত সুসমাচারের সেই সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি না, খোদ বিধানই আমাকে বলেছে যে ঈশ্বর বিচারকর্তা। তুমি যদি পুত্রকে তাঁর প্রকৃত ঈশ্বরত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চাও, তবে তিনি যে বিচারকর্তা তা অস্বীকার কর। কেননা তুমি নিজেই গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করেছ যে যিনি একমাত্র ন্যায়বান ঈশ্বর একাই তিনিই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর। যাকে তুমি ন্যায়বান বিচারকর্তা বলে সমর্থন কর, তোমার অভিমত অনুসারে তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর, তা তুমি অস্বীকার করতে পার না। এই বিচারকর্তা হলেন সেই স্বয়ং প্রভু যার পক্ষে সবই সাধ্য, যিনি অসংখ্য সনাতন আশীর্বাদ প্রতিশ্রুত হলেন, যিনি ভক্তপ্রাণদের ও দুর্জনদের বিচারকর্তা; তিনি আব্রাহামের সেই ঈশ্বর যাকে তাঁর দ্বারা আরাধনা করা হয়েছিল। তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর নন, যদি তেমনটা প্রমাণ করতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার ভাষার ভক্তিহীন ও নির্বোধ স্পর্ধা হাতিয়ার করে নতুন কোন একটা মিথ্যা বানাও।

১৭। স্বর্গীয় দয়ার রহস্যাদি প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে অসঙ্গত নয়; তাঁর বিশ্বস্ত পবিত্রজনেরাও সেই বেশে প্রবেশ করতে ব্যর্থ নন যা তিনি ধারণ করেন যাতে বিশ্বাস তাঁকে দেখতে পারে। বিধানের প্রতীকগুলো সুসমাচারের রহস্যাদি পূর্বপ্রকাশ করেছিল;

ফলে পিতৃকুলপতি [আব্রাহাম] তা-ই অনুভব করেন ও বিশ্বাস করেন যা প্রেরিতদূত স্বচক্ষে দেখেন ও প্রচার করেন। কেননা যেহেতু বিধান হলো আসন্ন বিষয়ের ছায়ামাত্র (ক), সেজন্য সেই ছায়াটা হলো দেহধারণ-বাস্তবতার পূর্ববর্তী প্রকাশ। ঈশ্বরকে সেই মানুষ রূপে দেখা হয়, বিশ্বাস করা হয় ও আরাধনা করা হয়, কালের পূর্ণতায় মানুষ রূপে যাঁর জন্মাবার কথা ছিল। কেননা [পিতৃকুলপতিদের] চোখে তিনি এমন রূপ ধারণ করেন যা ভাবী বিষয়ের পূর্বঘোষণা করে। কিন্তু সেই কালে [অর্থাৎ বিধান কালে] ঈশ্বরকে কেবল এমন মানুষ রূপেই দেখা হয়েছিল যে মানুষ তখনও জন্মায়নি; পরবর্তীকালে তাঁকেই দেখা হয়েছিল যিনি জন্মও নিয়েছিলেন। মানুষ যেন তাঁকে দেখতে পায় সেই লক্ষ্যে তিনি যে মানব রূপ ধারণ করলেন, সেই রূপের সঙ্গে পরিচয়টার উদ্দেশ্য এটা ছিল, যাতে তিনি মানুষকে সেই কালের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন যখন তিনি জন্ম নেবেন। আমাদের স্বরূপের দুর্বলতার খাতিরে সেকালে তিনি ঈশ্বরের প্রভাবে মানুষ রূপে দৃশ্যমান হন; এখন [অর্থাৎ সুসমাচার কালে] সেই ছায়াটা সত্যময় হয়, রূপটা বাস্তবতা ধারণ করে, দর্শনটা জীবনপ্রাপ্ত হয়। তথাপি, যখন ঈশ্বর মানব রূপের বেশে বা প্রকৃত ভাবেই জন্ম নেন, তখন তিনি অপরিবর্তিত হয়ে থাকেন। যিনি জন্ম নিয়েছেন ও যিনি দর্শনে দেখা দিয়েছেন, সেই দুইয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে, সেই সাদৃশ্য নিখুঁতই ছিল। তাই তিনি যেভাবে জন্ম নিলেন, দর্শনকালেও সেইভাবে ছিলেন, ও যে আকারে দর্শন দিতেন, সেইভাবে জন্ম নিলেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের পক্ষে নবীর বর্ণনার সঙ্গে সুসমাচারের বর্ণনাকে তুলনা করার সময় এখনও হয়নি, সেজন্য এসো, আপাতত বিধান নিয়ে ব্যস্ত থেকে স্থির করা গতিধারা অনুসারে চলতে থাকি। পরবর্তীকালে সুসমাচার ভিত্তি করে আমরা এমনটা প্রমাণ করব যে যিনি মানুষ রূপে জন্ম নিলেন তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র; আপাতত আমরা বিধানের মাধ্যমে এটাই দেখাতে ইচ্ছা করি যে, যে ঈশ্বরের পুত্র নবীদের কাছে মানব রূপে দেখা দিতেন, তিনি ছিলেন সত্যকার ঈশ্বর। কেননা যখন তিনি আব্রাহামের কাছে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁকে ঈশ্বর বলে আরাধনা করা হয়েছিল ও বিচারকর্তা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, ও যখন প্রভু প্রভু থেকে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করেছিলেন, তখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিধানের যে বর্ণনা অনুসারে প্রভু প্রভু থেকে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ

করেন, সেই বর্ণনা পিতা ও পুত্রকেই প্রকাশ করতে অভিপ্রায় করে। অন্যদিকে, আমরা এটা মেনে নিতেও পারি না যে, সেই পিতৃকুলপতি যাঁকে পূর্ণ চেতনার সঙ্গে ঈশ্বর বলে আরাধনা করছিলেন, তিনি এমনটা জানতেন না যে তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর বলে আরাধনা করছিলেন।

১৮। নিজেদের জঘন্য অবিশ্বাসে সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের পক্ষে প্রকৃত বিশ্বাস উপলব্ধি করা যথেষ্ট কঠিন লাগে। তাদের বুদ্ধি অভক্তির দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়েছে বিধায় সত্যকার ধর্মের শিক্ষা তাদের সেই বুদ্ধির সামনে কার্যকর নয়। এর ফলে, মানুষের পরিভ্রাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ঈশ্বর যে মানুষ রূপে জন্ম নিলেন, ভ্রান্তমতপন্থীদের মন তাঁর সেই মহাকর্মের অর্থ বুঝে উঠতে পারে না। সেই অবিশ্বাসী মন এটা বুঝতে পারে না যে তার পরিভ্রাণকর্ম হলো ঈশ্বরের পরাক্রমের ফল। ভ্রান্তমতপন্থীরা [পুত্রের] জন্মসূচিত কষ্ট, শিশুকালের দুর্বলতা, বালককালের বৃদ্ধি, যৌবনকাল, দৈহিক কষ্ট, যন্ত্রণাভোগ ও ত্রুশে মৃত্যু এসমস্ত কথাই ভাবে ও তাঁর প্রকৃত ঈশ্বরত্ব মেনে নেয় না। কিন্তু সেই পুত্র মানবস্বরূপের পাশাপাশি এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিজেতে জনিত করলেন যা বিষয়ে, আগে, তাঁর প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপে, তাঁর ছিল না; ও মাংসধারণে যখন ঈশ্বর যিনি তিনি এক ক্ষণে মানুষ হতে লাগলেন, তখন তিনি নিজের প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপকে হারালেন না ও ঈশ্বরও হতে বন্ধ করলেন না। ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা বোঝে না যে, পূর্বে যা ছিল না তা-ই হওয়া এমন কিছু যা প্রকৃত ঈশ্বরত্ব থেকে জনিত পরাক্রমের ফলাফল, কিন্তু তবুও তিনি যা ছিলেন তা হয়ে থাকতে শেষ করেন না: আমাদের দুর্বল স্বরূপ ধারণ তাঁর শক্তিশালী স্বরূপের পরাক্রমের ফলাফল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, সেই যে স্বরূপ আগেকার গুণাবলি রক্ষা করতে করতে তথাপি এমনটা হতে পারে যা পূর্বে ছিল না। আহা, হে ভ্রান্তমতপন্থীদের নির্বুদ্ধিতা, হে জগতের মূর্খ প্রজ্ঞা যা এমনটা দেখতে পার না যে খ্রিস্টের অপমান হলো ঈশ্বরের পরাক্রম, যা এমনটা উপলব্ধি করতে পার না যে বিশ্বাসের মূর্খতা হলো ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। তাই খ্রিস্ট তোমার কাছে ঈশ্বর নন, কারণ যিনি ছিলেন তিনি জন্ম নেন, যিনি অপরিবর্তনশীল তিনি বছরে বছরে বেড়ে ওঠেন, যিনি যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন তিনি কষ্টভোগ করেন, যিনি জীবনময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন, যিনি মৃত তিনি জীবিত; কারণ তাঁর মধ্যে যা, তা সবই প্রকৃতির সমস্ত নিয়মের বিরোধী।

জিজ্ঞাসা করি, ঐশ্বরিক হওয়ায় তিনি যে সর্বশক্তিমান, এ ছাড়া এসব কিছু আর কীবা বোঝায়? হে পবিত্র ও পূজনীয় সুসমাচারসমূহ, এসমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও যিশু খ্রিষ্ট যে স্বয়ং ঈশ্বর, তোমাদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে তা প্রমাণ করার জন্য আমি এখনও তোমাদের স্পর্শ করি না; কেননা তোমরা বিধান থেকেই আগত (ক), এবং এটাই অবধারিত যে, বিধানই আমাদের এমনটা শিখিয়ে দিক যে, ঈশ্বর যিনি, তিনি আমাদের দুর্বলতা ধারণ করে নিজের ঈশ্বরত্বকে হারান না। নিজের রহস্যগুলো গুণেই বিধান এবিষয়ে দৃঢ় সাক্ষ্য বহন করে যে, তোমাদের বিশ্বাস সত্য।

১৯। হে পবিত্র ও সুখী পিতৃকুলপতি যাকোব, আমার পাশে এসে দাঁড়াও, তোমার বিশ্বাসের প্রেরণা দ্বারা ভ্রান্তমত-সাপের বিষাক্ত হিসের বিরুদ্ধে এখনই আমার পাশে এসে দাঁড়াও; এবং সেই মানুষের সঙ্গে তোমার লড়াইতে আবার জয়ী হও ও তাঁর চেয়ে তুমিই শক্তিশালী হওয়ায় পুনরায় তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর (ক)। যিনি দুর্বল তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা এ কেমন কথা? যাঁর বল নেই তাঁর কাছে থেকে কী প্রত্যাশা কর? যাঁর আশীর্বাদ তুমি যাচনা কর, তাঁর উপরে তুমি তো তোমার আলিঙ্গনে জয়ী হও কারণ তুমিই তাঁর চেয়ে বলবান। তোমার দেহের শক্তিতে যা তুমি কর তা তোমার মনের কর্মের চেয়ে একেবারে বিপরীত: তুমি একটা জিনিস ভাব ও অন্য একটা কর। তোমার সফল লড়াইতে তুমি যাঁর সম্মুখীন, তিনি দুর্বল একটা মানুষ, কিন্তু এই মানুষ তোমার কাছে সত্যকার ঈশ্বর, নামে শুধু নয়, স্বরূপেও ঈশ্বর। হে পিতৃকুলপতি, তুমি তো দত্তক এক ঈশ্বরের আশীর্বাদে নয়, সত্যকারই এক ঈশ্বরের আশীর্বাদে আশীর্বাদিত হতে দাবি কর। তুমি তো একটা মানুষের সঙ্গে লড়াই কর, কিন্তু যাঁকে তুমি মুখোমুখি দেখ তিনি স্বয়ং ঈশ্বর (খ)। তোমার দৈহিক চোখে যাঁকে তুমি দেখ, তোমার বিশ্বাসের উপলব্ধিতে যাঁকে তুমি লক্ষ কর, তাঁর চেয়ে তিনি অনেক ভিন্ন। তোমার বিবেচনায় সেই মানুষ দুর্বল, কিন্তু তোমার প্রাণ এজন্যই ত্রাণ পেল কারণ তাঁর মধ্যে সে ঈশ্বরকেই দেখেছে। লড়াইতে তুমি যাকোব, যাচাই করা সেই আশীর্বাদে প্রাপ্ত বিশ্বাসে তুমি এখন ইস্রায়েল। সেই মানুষ মাংস অনুসারে তোমার চেয়ে দুর্বল (গ), তাতে মাংসের যন্ত্রণাভোগই পূর্বলক্ষিত। মাংসের দুর্বলতায় তুমি ঈশ্বরকে চিনে নিতে পার, ও তেমনটা ঘটে যাতে [পবিত্র] আত্মায় সাধিত আশীর্বাদ প্রকাশিত হয়। চোখ যে দেখেছে, তাতে বিশ্বাসের জন্য কোন বাধা নেই, ও

তঁার দুর্বলতা তঁার আশীর্বাদকে যাচনা করা থেকে তোমাকে ভ্রষ্ট করে না। যিনি মানুষ, তঁার মানবীয় অবস্থা এমন কোন বাধা দেয় না যে তিনি ঈশ্বর, ও যিনি ঈশ্বর, তাতে যে তিনি সত্যকার ঈশ্বর নন এমনটা নয়; কারণ আশীর্বাদ দানে, নাম পাণ্টানোতে ও নতুন নাম আরোপ করানোতে যিনি ঈশ্বর, তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর নন তা সম্ভব নয় (ঘ)।

২০। নিজের অগ্রগতিতে বিধান সেই সুসমাচার-রহস্যের গতিধারা অনুসরণ করে [বিধান] নিজেই যার ছায়া; এবং সত্য সমর্থনের প্রতিযোগিতায় সেই বিধান নিজ নিজ প্রতীক দিয়ে প্রেরিতদূতদের শেখানো সত্য আগে থেকে প্রদর্শন করে। নিজের স্বপ্নের সেই দর্শনে সুখী যাকোব ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন: এই স্বপ্নে আমাদের দৈহিক একটা অভিব্যক্তি নয়, কিন্তু একটা রহস্য-উদ্ঘাটনই দেখা দরকার। কেননা তাঁকে সেই দূতদের দেখানো হয় যঁারা সেই সিঁড়ি বেয়ে নামছেন ও স্বর্গে উঠছেন, ও সেই সিঁড়ির উপরে দাঁড়ানো স্বয়ং ঈশ্বর দেখা দেন, এবং সেই দর্শনের ব্যাখ্যা আগে থেকে সেই সত্য পূর্বঘোষণা করে যা সেই স্বপ্ন ভবিষ্যতে প্রকাশ করার কথা। ‘এ তো ঈশ্বরের গৃহ ও স্বর্গের দ্বার’ (ক) পিতৃকুলপতির এই কথা আমাদের সেই দর্শনের স্থান দেখায়। তঁার কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ বর্ণনার পর শাস্ত্র বলে চলে, ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, ওঠ, বেথেলে গিয়ে সেইখানে বসতি কর; এবং তোমার ভাই এসৌয়ের কাছ থেকে তুমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলে, তখন যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথ (খ)। যদি সুসমাচারের বিশ্বাস পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে ও ঈশ্বর ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ছাড়া জ্ঞাত হতে পারেন না, তাহলে তুমি আমাকে দেখাও, স্বর্গীয় সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো সেই ঈশ্বরের জন্য সম্মান দাবি করেন যিনি, তিনি কোন্ কোন্ কারণেই বা সত্যকার ঈশ্বর নন। যখন উভয় এক ও একই এমন নাম বহন করেন যা একই স্বরূপ নির্দেশ করে, তখন স্বরূপ দিক দিয়ে কোন্ পার্থক্য উভয়কে ভিন্ন করে? তিনিও ঈশ্বর যিনি [যাকোবের কাছে] দৃশ্যমান হয়েছিলেন, তিনিও ঈশ্বর যিনি সেই ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলেন যিনি দৃশ্যমান হয়েছিলেন। ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ছাড়া ঈশ্বরকে জানা সম্ভব নয়, যেইভাবে ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ছাড়া ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে সম্মান গ্রহণ করেন না। কেননা আমরা এমনটা বুঝতে পারতাম না যে একজনকে সম্মান করা দরকার, যদি না অন্যজন সেই একজনের প্রতি দেয় সম্মান না

দেখাতেন ; একজনের ঈশ্বরত্বকে জানতে পারতাম না, যদি আগে অন্যজনের ঈশ্বরত্বকে না জানতাম। রহস্যগুলোর প্রকাশ-ব্যবস্থা বিশিষ্ট ও স্বীয় অনুক্রম পালন করে। ঈশ্বরের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে সম্মান করতে আমাদের শেখানো হয়। প্রতিটি স্বরূপের স্বীয় স্বীয় নাম আছে, ও সেই নামগুলো ‘ঈশ্বর’ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এবং যখন একমাত্র নাম রয়েছে যা পিতা ও পুত্রের একমাত্র মিলিত স্বরূপ চিহ্নিত করে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, পুত্র ঈশ্বর কেমন করে নিজেকে এতই নিকৃষ্ট করতে পারেন যার ফলে তিনি সত্যকার ঈশ্বর নন?

২১। মানবীয় মানদণ্ড দ্বারা ঈশ্বরকে বিচার করতে নেই। কেননা আমাদের স্বরূপ এমন নয় যা স্বর্গীয় বিষয় জ্ঞানলাভে নিজের শক্তিতে নিজেকে উন্নীত করতে পারে। ঈশ্বর সম্পর্কে যা ভাবা উচিত, ঈশ্বর থেকেই তা আমাদের শিখতে হয়, কেননা তিনি নিজে নিজেকে আমাদের জ্ঞানের প্রণেতা না করলে আমরা তাঁকে জানতে পারি না। তবে আসুক জাগতিক দর্শনশাস্ত্রে সূক্ষ্ম জ্ঞানপ্রাপ্তি, আসুক সততায় যাপিত জীবন : এসমস্ত কিছু মনের তৃপ্তি এনে দেবে বৈকি, কিন্তু ঈশ্বর-জ্ঞান যোগাড় করবে না। রানীর পুত্র বলে গৃহীত হয়ে ও মিশরীয়দের যত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে মোশি প্রাকৃতিক আবেগের তাড়নায় মিশরীয় একজনকে হত্যা করায় হিব্রু একজনের অপমান ক্ষেত্রে প্রতিশোধ করা সত্ত্বেও সেই ঈশ্বরকে জানতেন না যিনি তাঁর নিজের পিতৃগণকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বাস্তবিকই, সেই হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করা হবে এমন ভয়তে যখন তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেছিলেন ও মিদিয়ান দেশে মেষপালক হিসাবে জীবনযাপন করছিলেন, তখন একটা ঝোপে আগুন দেখলেন কিন্তু ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছিল না ; তখনই তিনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনলেন, তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন ও তাঁর স্বরূপ জানলেন। ঈশ্বর সংক্রান্ত এসমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ছাড়া জ্ঞাত হতে পারত না। তাই তিনি নিজের বিষয়ে আমাদের উপলব্ধির জন্য যা যা উচ্চারণ করেছেন, তা বাদে আমরা যেন ঈশ্বর বিষয়ে অন্য কিছু না বলি।

২২। যিনি ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা আগুনে দেখা দিয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরের দূত : এবং যিনি ঝোপের মধ্য থেকে আগুনের মধ্যে কথা বলেন তিনি ঈশ্বর। তিনি

তোমার কাছে দূত নামে উপস্থাপিত, কারণ দূত শব্দে তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর ভূমিকাই নির্দেশিত; যে নাম তাঁর স্বরূপ উপস্থাপন করে তা হলো ‘ঈশ্বর’, কারণ ঈশ্বরের দূত হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু এমনটাও হতে পারত যে তিনি সত্যকার ঈশ্বর নন। তবে, যিনি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর, তিনি কি সত্যকার ঈশ্বর নন? ঝোপের মধ্য থেকে যে দূত কথা বলেন, তিনি তাঁদের চিরকালীন ঈশ্বর। তিনি যে দত্তক গুণেই মাত্র সেই নামের অধিকারী পাচ্ছে তুমি এমনটা সমর্থন করার জন্য সুযোগ পাও, সেজন্য ‘যিনি আছেন’ সেই ঈশ্বরই মোশির কাছে কথা বলেন। তাই আমরা শাস্ত্রে পড়ি, এবং প্রভু মোশিকে বললেন, আমি সেই আছি যিনি আছি। পরে তিনি আরও বললেন, তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: যিনি আছেন তিনি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন (ক)। ঈশ্বরের একথা এজন্য দূতের বাণী দিয়ে শুরু করে যাতে পুত্রে সাধিত মানব পরিভ্রাণের রহস্য বোঝানো হয়: পরে তিনি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর বলে নিজেকে দেখান যেন আমরা সেই নাম জানতে পারি যা স্বরূপে তাঁর নাম। অবশেষে সেই ঈশ্বর আছেন ‘যিনি আছেন’: তিনিই মোশিকে ইস্রায়েলের কাছে প্রেরণ করেন যেন আমরা এতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি ঈশ্বর।

২৩। হে ভ্রাতৃমতে সূচিত অভক্তির অসার মূর্খতা, তোমার উন্মাদ স্পর্ধায় তুমি আর কেমন মিথ্যা তৈরি করতে পার? এবং তেমন অধিকারসম্পন্ন পিতৃকুলপতিদের প্রজ্ঞা তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে করতে তুমি কেন অন্ধকারময় বীজবুনিয়্যে রূপে বপনের সেরা বীজের মধ্যে সেই শ্যামাঘাস বোন যা আগুনের জন্য নিরুপিত? কিন্তু তুমি যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে, তবে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরেও বিশ্বাস করতে; অবশ্যই, যদি না এমনটা হয় যে, হয় তো তুমি এটা অস্বীকার কর যে মোশি তাঁরই বিষয়ে কথা বলছিলেন। তুমি যদি তেমনটা অস্বীকার করতে চাও, তবে তোমাকে ঈশ্বরের বাণী শুনতে হবে, ‘কারণ আপনারা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতেন, তবে আমাকেও বিশ্বাস করতেন, যেহেতু তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছিলেন’ (ক)। তিনি অবশ্যই তোমার যুক্তি খণ্ডন করবেন, তিনি দূতদের দ্বারা বিন্যস্ত সেই বিধানের গোটা পুস্তক দ্বারাই তোমার যুক্তি খণ্ডন করবেন যে পুস্তক তিনি সেই মধ্যস্থের হাত থেকে গ্রহণ করেছিলেন (খ)। যিনি বিধান দান

করেছিলেন, অনুসন্ধান কর তিনি সত্যকার ঈশ্বর কিনা, কেননা এটা সন্দেহের অতীত যে যিনি বিধান দান করেছিলেন তিনি সেই মধ্যস্থ। এবং মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই যে পর্বতের দিকে জনগণকে বের করে এনেছিলেন, এটা কি সত্য নয়? নাকি, হয় তো যিনি পর্বতে নেমে এসেছিলেন, তিনি কি ঈশ্বর ছিলেন না? অথবা হয় তো সেই নাম কি তাঁর নিজের স্বরূপের অধিকৃত নাম নয়, কিন্তু ছিল মিথ্যা নাম বা অনুচিত একটা নাম? সেই তুরিধ্বনির শব্দ, সেই মশালগুলোর আগুন, সেই ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জ লক্ষ কর যা হাপরের ধোঁয়ার মত পর্বতমালা থেকে উর্ধ্বে আরোহণ করছে; সেই আতঙ্ক লক্ষ কর যা ঈশ্বরের অবশ্যম্ভাবী আগমন বিষয়ে সচেতন; সেই স্বীকারোক্তি লক্ষ কর যা দ্বারা জনগণ মোশিকে নিজেদের মুখপাত্র হবার জন্য অনুনয় করার পর এটা বলে যে, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই তারা মরবে। ঈশ্বরকে কথা বলতে শুনে ইম্রায়েল ভয় পেল তারা মরবে, ও মানব দুর্বলতা তাঁর কণ্ঠস্বর সহ্য করেনি, একথা যদি সত্য, তবে, হে ভ্রান্তমতপন্থী, তোমার কাছে ঈশ্বর কি সত্যকার ঈশ্বর নন? তুমি যেন শুনতে ও দেখতে পেতে, সেই লক্ষ্যে তিনি যে দুর্বল মানবীয় ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে তোমার কাছে কথা বললেন, এজন্যই কি তিনি তোমার কাছে ঈশ্বর নন? মোশি পর্বতে আরোহণ করলেন; চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাতের সময়কালে তিনি স্বর্গের সমস্ত ঐশ্বরিক রহস্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেন ও পর্বতে যা তাঁকে দেখানো হয়েছিল, সেই সত্যের দর্শন অনুসারে সবকিছু বিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন যিনি, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গতা গুণে তিনি সেই গৌরবের দীপ্তি পেয়েছিলেন যা কেউই কখনও লক্ষ করতে পারেনি, ও কেউই যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, নিকটবর্তী ঐশ্বর্যাদার সেই আলো তাঁর মুখমণ্ডলের ক্ষয়শীল রূপ রূপান্তরিত করেছিল: তিনি ঈশ্বর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন, বিজাতীয়দের আনন্দের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে আরাধনা করার জন্য ঈশ্বরের দূতদের আহ্বান করেন, এবং প্রার্থনা করেন যেন যে আশীর্বাদে তিনি প্রীত সেই আশীর্বাদ যেন যোসেফের মাথায় নেমে আসে। এসমস্ত প্রমাণের পর এমন কেউ কি থাকবে যে, ঈশ্বরকে যা যা দেয় তা থেকে তাঁকে কেবল [‘ঈশ্বর’] নামটা মঞ্জুর করে দুঃসাহস দেখিয়ে তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর বলে অস্বীকার করবে?

২৪। আমরা মনে করি, এই দীর্ঘ আলোচনা এটা দেখিয়েছে যে, যে যে বচনে বিধান ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’, ‘প্রভু ও প্রভু’ সম্পর্কে কথা বলেছিল, সেই ক্ষেত্রে এমন কোন নির্ভরযোগ্য বিষয় উত্থাপিত হয়নি যা যুক্তি সহকারে একটা সত্যকার ঈশ্বর ও একটা মিথ্যা ঈশ্বরের কথা সমর্থন করতে পারে। মনে করি, আমরা এমনটাও প্রমাণ করেছি যে, নাম ও স্বরূপ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই, যার ফলে আমরা নামটাকে স্বরূপের একটা প্রমাণ ব’লে ও স্বরূপটাকে নাম বুঝবার জন্য সহায়িকা ব’লে গণ্য করতে পারি। কেননা, বিধান দ্বারা যিনি ঈশ্বর বলে অভিহিত ছিলেন, তাঁর মধ্যে স্থান পায় ঈশ্বরের পরাক্রম, ঈশ্বরের অধিকার, ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ঈশ্বরের নাম। আমরা এটাও দেখিয়েছি যে, সুসমাচারে যা শীর্ষস্থান অর্জন করে, সেই রহস্যের ব্যবস্থা অনুসারে বিধান [পুত্রের] ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করার জন্য তাঁকে এমন ঈশ্বর বলে দেখায় যিনি জগৎ সৃষ্টিকর্মে ঈশ্বরের উক্তির প্রতি বাধ্য; তাঁকে এমন ঈশ্বর বলে দেখায় যিনি, মানব সৃষ্টিকর্মে, নিজের ও [পিতা] ঈশ্বরের মিলিত প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন; তাঁকে এমন প্রভু বলে দেখায় যিনি সদোমীয়দের দণ্ডাজ্ঞায় প্রভুর পক্ষ থেকে বিচার করেন; তাঁকে এমন ঈশ্বরের দূত বলে দেখায় যিনি আশীর্বাদ প্রদানে ও বিধানের রহস্যাদি বিন্যাস কর্মে নিজেই ঈশ্বর। এইভাবে, পিতা যে ঈশ্বর ও পুত্র যে ঈশ্বর তেমনটা যথার্থ ভাবে স্বীকার করার জন্য অবিরতই ও জোর দিয়ে উল্লিখিত ‘ঈশ্বর’ শব্দটা আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপকে তার প্রকৃত নাম দ্বারাই প্রকাশ করে; কেননা বিধান প্রকৃত ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট কিছুই ফেলে রাখে না, কারণ সেই বিধান পিতা ও পুত্র উভয়কেই ঈশ্বর বলে নির্দেশ করে।

২৫। সেই সময় এসেছে, যে সময়ে বিধান ভক্তিময় ও ধর্মসন্মত যা কিছু শিখিয়েছে আমরা তা ভ্রান্তমতপন্থীদের মূর্খ দুষ্কৃতা দ্বারা বিকৃত হতে দেব না। ঈশ্বরের পুত্রকে অস্বীকার করার জন্য ওরা এই বচন থেকে শুরু করে, ‘শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক’। এবং বিধান ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ এর কথা বলায় যেহেতু ওদের এই অভক্তি তাঁদের একই নাম দ্বারা বিপদগ্রস্ত, সেজন্য ওরা একটা নবীয় বচনের অধিকার দ্বারা [পুত্রতে] নামের ঐশ্বরিক স্বরূপ অস্বীকার করার জন্য এটাও যোগ করে বলে, তারা তোমাকে, সেই সত্যকার ঈশ্বরকে, ধন্য বলবে (ক)। ওরা নাকি বলে, এই কথা দিয়ে বিধান এমনটা নির্দেশ করল যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন, ও ঈশ্বরের পুত্র যিনি সেই

ঈশ্বরে নাম রয়েছে কিন্তু [ঈশ্বরের] সত্যকার স্বরূপ নেই, কেননা সত্যকার ঈশ্বরকে একক ব্যক্তিতেই দেখা দরকার। হে নির্বোধ, তুমি হয় তো মনে কর যে, ‘একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর আছেন’ এমনটা অস্বীকার করার জন্য আমরা তোমার উল্লিখিত বচনগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াব। তুমি যেমন, তেমনি আমরাও অবশ্যই [ঈশ্বরের ঐক্য] মেনে নিই ও তা স্বীকারও করি। কেননা এটাই আমাদের বিশ্বাস, এটাই আমাদের বিবেক, এটাই আমাদের ঘোষণা। কিন্তু আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে, এমনকি সত্যকার ঈশ্বরকে চিনে নিই। [ঈশ্বর] নামে আমাদের স্বীকারোক্তি বিপদগ্রস্ত হয় না, কেননা আমাদের স্বীকারোক্তি এটা সমর্থন করে যে, পুত্রের স্বরূপে রয়েছেন একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর। [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তুমি যে কথা উল্লেখ কর, সেই কথার প্রকৃত অর্থ শিখে নাও ও এমনটা চিনে নাও যে একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর আছেন, যাতে করে তুমি ধর্মসম্মত ভাবে একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বরকে ঘোষণা করতে পার। আমরা যে বাণী দ্বারা আমাদের বিশ্বাস স্বীকার করি, তুমি তো সেই বাণী বিকৃতই কর ও সেই বাণীকে তোমার অভক্তির অঙ্গ বলে ব্যবহার কর; তুমি বাণীর কণ্ঠ রক্ষা কর, কিন্তু তার অর্থ বিকৃত কর। এইভাবে তুমি তোমার মূর্খ প্রজ্ঞাকে আবৃত রেখে সত্যের ছদ্মবেশে সত্যকে ধ্বংস কর। তুমি তো একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে স্বীকার কর যাতে সেই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পার। তোমার দাবিই, তোমার স্বীকারোক্তি যত অভক্তিময় তত ভক্তিময় বলে গণ্য হোক, তা যত মিথ্যা তত সত্যময় বলে গণ্য হোক। ‘একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর আছেন’ তোমার এই স্বীকারোক্তি ঈশ্বরকে অস্বীকারেই চালনা করে; কেননা তুমি এমনটা বল যে ঈশ্বরের পুত্র সত্যকার ঈশ্বর নন, যদিও তিনি যে ঈশ্বর, তা তুমি অস্বীকার কর না, কেননা তুমি তাঁকে স্বরূপে নয়, নামেই মাত্র ঈশ্বর বলে স্বীকার কর। যদি তাঁর জন্ম শুধু নামে কিন্তু কর্মে জন্ম নয়, তবেই নামের সত্যতা অস্বীকার করা তোমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তিনি যদি সত্যিকারে ঈশ্বর বলে জন্ম নিয়ে থাকেন, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে জন্ম নিয়েছেন একথা যখন সত্য, তখন তিনি কেমন করে সত্যকার ঈশ্বর না হয়ে পারেন। যাতে তিনি [সত্যকার ঈশ্বর] না হন, হয় তুমি অস্বীকার করবে যে তিনি [ঈশ্বর রূপে] আছেন, না হয়, তিনি যদি [ঈশ্বর রূপে] থাকেন, তবে যা আছে তা কেমন করে না হয়ে থাকবে, যেহেতু যা আছে তা যে একাধারে নেই, তা সম্ভব নয়? কিন্তু তাঁর

জন্ম সম্পর্কে সম্প্রতিই কথা বলব। ইতিমধ্যে, আমি প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্পর্কে তোমার ভক্তিহীন নকল নবীদের সাক্ষ্যদান দ্বারা খণ্ডন করব : কিন্তু এমনটা করব যাতে একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর সম্পর্কে আমার শিক্ষাদান সাবেল্লিউসের সেই ভ্রান্তমতকেও সুযোগ না দেয় যা অনুসারে পিতা ও পুত্র একই ব্যক্তি, ঈশ্বরের পুত্রের সেই প্রকৃত ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধেও যেন সুযোগ না দেয় যা তুমি তখনই ভ্রান্তিময় ভাবে সমর্থন কর যখন এমনটা বল যে একজনমাত্রই [অর্থাৎ পিতাই মাত্র] সত্যকার ঈশ্বর।

২৬। প্রজ্ঞার সঙ্গে অভক্তির আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, ও যা প্রজ্ঞার সূচনা সেই ঈশ্বরভীতি যখন অনুপস্থিত তখন সন্ধিবেচনাও মিলিয়ে যায়। পুত্রের সত্যকার ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস ব্যর্থ করার জন্য ভ্রান্তমতপন্থীরা নবীর এই বচন উপস্থাপন করে, তারা তোমাকে, সেই সত্যকার ঈশ্বরকে, ধন্য বলবে (ক)। সর্বপ্রথমে এটাই হলো ভ্রান্তমতপন্থীদের অভক্তির মূর্খতা : হয় তারা সেই বচনের আগের বচনগুলো বুঝতে পারেনি, না হয়, সেই বচনগুলো বুঝলেও সেগুলো বিষয়ে নীরব থাকল। দ্বিতীয়ত, সেই চালাকি কাটাবার জন্য তারা এমন একটা ছোট্ট শব্দ যোগ করল যা সেই পুস্তকে নেই (খ)। তেমনটা করে তারা মিথ্যা ও মূঢ়ই একটা পদ্ধতি পালন করল, কেমন যেন তাদের প্রস্তাবিত পাঠ্যকে এমন পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্য পাঠ্য বলে ধরে নেওয়া হত যে, কেউই নবীর বচনগুলোর সত্যতা সঠিক ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে ভাবত না। কেননা সেই বচন এমনটা বলে না, ‘তারা তোমাকে, সেই সত্যকার ঈশ্বরকে, ধন্য বলবে’, কিন্তু এটাই বলে, ‘তারা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে’। ‘তোমাকে, সেই সত্যকার ঈশ্বরকে’ ও ‘সত্যকার ঈশ্বরকে’ পাঠ্য দু’টোর মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে অস্পষ্টতা নূন নয়। সেই ‘তোমাকে’ সর্বনামটা দ্বিতীয় একটা ব্যক্তির আভাস দেয়, কিন্তু অপর যে বাক্যে সর্বনামটা নেই, সেখানে [সত্যকার ঈশ্বর] বাক্যটা বক্তাকেই লক্ষ্য করে।

২৭। যাতে সত্য-নিরূপণ ক্ষেত্রে আমার পদ্ধতি একেবারে যথার্থ হয়, সেজন্য আমি নবীর বাণী সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করব, অতএব প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন, দেখ, আমার আপন দাসেরা খাবে, কিন্তু তোমরা ক্ষুধায় ভুগবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা পান করবে, কিন্তু তোমরা পিপাসায় ভুগবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে

চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে, কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে ও আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে। কেননা তোমরা আনন্দের সঙ্গে আমার মনোনীতজনদের কাছে তোমাদের নাম রেখে যাবে, কিন্তু প্রভু তোমাদের বধ করবেন। কিন্তু আমার আপন দাসেরা এমন নতুন এক নামে অভিহিত হবে যা পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য হবে, এবং তারা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে: ও যারা পৃথিবীর উপরে শপথ করে, তারা সত্যকার ঈশ্বরের দিব্য দিয়েই শপথ করবে (ক)। ব্যাখ্যার প্রচলিত নানা পদ্ধতি থেকে দূরে যাবার জন্য সবসময়ই একটা কারণ আছে, ও কেউ না কেউ যে ভুল বুঝবে সেবিষয়ে তা ব্যাখ্যার নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ দিতে পারে। অতীতকালে ঈশ্বর বিষয়ে বহু ভাববাণী উচ্চারিত হয়েছিল, ও ঈশ্বরের মর্যাদা ও স্বরূপ প্রমাণিত করার জন্য ঈশ্বরের সাধারণ ও অনন্য নাম উল্লেখ করা হয়েছিল; তাই এই সমস্যা দাঁড়ায় তথা কেনই বা এখন [পবিত্র] আত্মা ইশাইয়ার মুখ দিয়ে এমনটা পূর্বঘোষণা করেন যে ‘সত্যকার ঈশ্বরকে’ ধন্য বলা হবে ও পৃথিবীর উপরে ‘সত্যকার ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে’ শপথ করা হবে। প্রথমত, আমাদের এটা স্মরণ রাখা উচিত যে এই কথাগুলো এমন কিছু পূর্বঘোষণা করে যা ভাবীকাল সংক্রান্ত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি: এমনটা কি হতে পারে যে, মানুষেরা ইহুদীদের অভিমত অনুসারে যে ঈশ্বরকে ধন্য বলবে ও যাঁর দিব্য দিয়ে শপথ করবে, তিনি হয় তো সত্যকার ঈশ্বর নন? কেননা ইহুদীরা ঈশ্বর সংক্রান্ত রহস্যে নিহিত সত্য বিষয়ে না জেনে ও সেজন্য ঈশ্বরের পুত্রের কথা না জেনে [ঈশ্বরকে] পিতা বলেও নয়, কেবল ঈশ্বর বলেই আরাধনা করত। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা যদি তাঁকে পিতা বলে আরাধনা করত তাহলে তাঁকে পুত্র বলেও আরাধনা করত। যাঁকে তারা ধন্য বলত ও যাঁর দিব্য দিয়ে শপথ করত, তিনি অবশ্যই ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু নবী এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে যাঁকে ধন্য বলা হবে তিনি ‘সত্যকার ঈশ্বর’, ও তাঁকে ‘সত্যকার ঈশ্বর’ বলে অভিহিত করেন কারণ [পুত্রের] দেহধারণ রহস্য অনেকের কাছে তাঁর মধ্যে নিহিত সত্যকার ঈশ্বরত্বকে আবৃত করতে পারত। এবং যেখানে একদিন মিথ্যার ছড়িয়ে পড়ার কথা, সেখানে এটা প্রয়োজন ছিল, সত্যকে স্পষ্টভাবে সত্যায়িত করা হবে (খ)। কিন্তু এসো, উপরে উল্লিখিত বচনের উক্তিগুলো একটার পর একটা পর্যালোচনা করি।

২৮। লক্ষ কর একই পদে কেমন করে আলাদা দু'টো কাল নির্দেশ করা হয় যাতে তুমি প্রতিটি কাল সংক্রান্ত সত্য জানতে পার। লেখা আছে, 'আমার আপন দাসেরা খাবে'। এর অর্থ এ হলো যে, ঈশ্বর বর্তমান জীবনের ভক্তিকে ভাবী পুরস্কার দানে প্রতিদান দেন ও ফলত ভবিষ্যতে বর্তমান কালের মানুষদের অভক্তিকে পিপাসা ও ক্ষুধায় দণ্ডিত করবেন। তারপর তিনি বলে চলেন, 'দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে, কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে ও আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে'। উপরে যেমন, তেমনি এখানেও আমরা ভাবীকালের ও বর্তমানকালের কথা পাই; তাই যারা [ঈশ্বরের] সেবা করে তারা আনন্দ করবে, কিন্তু যারা [তঁার] সেবা করে না তারা মনের দুঃখে চিৎকার করবে ও আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে। তারপর তিনি একথা যোগ করেন, 'তোমরা আনন্দের সঙ্গে আমার মনোনীতজনদের কাছে তোমাদের নাম রেখে যাবে, কিন্তু প্রভু তোমাদের বধ করবেন।' ভাবীকাল সংক্রান্ত বাণীগুলো সেই ইস্রায়েলকে লক্ষ করে যে মাংস অনুসারে জীবনযাপন করে, ও শাস্তি হিসাবে তাদের বলা হয়, তারা নিজেদের নাম ঈশ্বরের মনোনীতদের কাছে রেখে যাবে। জিজ্ঞাসা করি, নামটা কী? অবশ্যই, নামটা হলো 'ইস্রায়েল', কেননা ভাববাণী ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হয়েছিল। এবার জিজ্ঞাসা করি, আজ সেই ইস্রায়েল কারা? প্রেরিতদূত উত্তর দেন, অক্ষর অনুসারে নয়, অন্তর অনুসারেই যারা চলে, খ্রিস্টের নিয়ম অনুসারেই যারা চলে, তারাই ঈশ্বরের ইস্রায়েল (ক)।

২৯। আরও, যেহেতু উপরে উল্লিখিত বচনে আমরা এটা পাই যে, 'অতএব প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন', সেজন্য এটা বোঝানো দরকার কেনই বা পরে এই বাণী উচ্চারিত হয়, 'কিন্তু প্রভু তোমাদের বধ করবেন', ও এটার পরে পরবর্তী বাণীরও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করা দরকার তথা, 'কিন্তু আমার আপন দাসেরা এমন নতুন এক নামে অভিহিত হবে যা পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য হবে'। এতে কি সন্দেহ থাকতে পারে যে 'অতএব প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন' বাণীতে ও পরবর্তী বাণী তথা 'কিন্তু প্রভু তোমাদের বধ করবেন' এর মধ্যে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, কথা বলছিলেন যিনি ও যাঁর বধ করার কথা, তিনি সেই প্রভু ছাড়া অন্য কেউ নন, যিনি, যারা একদিন তাঁর আপন সেবক হবে তাদের নতুন এক নাম দানে পুরস্কৃত করবেন, যিনি বিস্মৃত হবেন না বরং নবীদের মুখ দিয়ে কথা

বলেছিলেন, যিনি একদিন ভাল ও মন্দ সকলেরই বিচারকর্তা হবেন? তাই বাকি যে বাণী, তা সুসমাচারে প্রকাশিত ঈশ্বরের পরিকল্পনা সংক্রান্ত রহস্য ব্যাখ্যা করতে অভিপ্রায় করে, যেন যিনি কথা বলেন সেই প্রভু সম্পর্কে ও যিনি বধ করেন সেই প্রভু সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে: ‘কিন্তু আমার আপন দাসেরা এমন নতুন এক নামে অভিহিত হবে যা পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য হবে’। এই শেষ উক্তি প্রতীতি বাণী ভাবী জীবনকে লক্ষ করে। এবং ধর্মের এই নতুন নাম যা এমন নতুন নাম যা পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য হবে, সেই নাম কী? অতীত শতাব্দীগুলো অবধি যদি কখনও ‘খ্রিস্টিয়ান’ নামের উপরে কোন আশীর্বাদ হয়ে থাকে, তবে সেই নাম আজকালে এক নতুন নাম নয়। কিন্তু যদি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তির পবিত্র নাম এক নতুন নাম হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের ধর্মে আরোপিত ‘খ্রিস্টিয়ান’ এই নতুন নামটাই হলো পৃথিবীর উপরে স্বর্গীয় আশীর্বাদের পুরস্কার।

৩০। আরও, পরবর্তী বাণী আমাদের গোটা বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ নিশ্চয়তা সত্যায়িত করে, ‘এবং তারা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে; ও যারা পৃথিবীর উপরে শপথ করে, তারা সত্যকার ঈশ্বরের দিব্য দিয়েই শপথ করবে’। হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈশ্বরের সেবায় সেই নতুন নাম অর্জন করেছে তারাই সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে; তাছাড়া, যাঁর দিব্য দিয়ে তারা শপথ করবে তিনি সত্যকার ঈশ্বর। যাঁর দিব্য দিয়ে মানুষ শপথ করবে, কাকে তারা ধন্য বলবে, যারা তাঁর সেবা করে কার্ দ্বারা তাদের এক নতুন ও সুখময় নাম দেওয়া হবে, তিনি যে সেই সত্যকার ঈশ্বর, এবিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? মণ্ডলীর প্রচারিত একেবারে যথার্থ বিশ্বাস, সেই যে নতুন নাম তুমিই, হে খ্রিস্ট, দিয়েছ, সেই নামের সাক্ষ্য, ও সেই যে [খ্রিস্টিয়ান] নাম তুমি সেবাদানে বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য করেছ, এসমস্ত কিছু, হে ভ্রান্তমতপন্থী, তোমার ভক্তিহীন শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে আমারই ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল রাখে। বিশ্বাস দিব্য দিয়ে শপথ করে যে তুমি সত্যকার ঈশ্বর। কেননা সকল বিশ্বাসীর মুখ ঘোষণা করে যে তুমিই, হে খ্রিস্ট, তুমিই ঈশ্বর। সকল বিশ্বাসীর বিশ্বাস দিব্য দিয়ে শপথ করে যে তুমি ঈশ্বর; তুমি যে সত্যকার ঈশ্বর এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সেই বিশ্বাস তোমাকে সত্যকার ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে।

৩১। ভাববাণীর পুরা প্রসঙ্গের আলোতে অনুধাবিত এই বচন এক্ষেত্রে একটা বাধাও ফেলে রাখেনি যাতে তাঁকেও ঈশ্বর বলে গণ্য করা হয় যাঁর কাছে সেই নতুন নামের গুণে সেবা অর্পণ করা হবে, যাঁর খাতিরে সেই নতুন নাম পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য হবে, যাঁকে সত্যকার ঈশ্বর বলে ধন্য বলা হবে, ও সত্যকার ঈশ্বর বলে যাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করা হবে। এবং এটাই হলো সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি যা কালের পূর্ণতায় মণ্ডলী আপন প্রভু সেই খ্রিস্টের প্রতি ধর্মসম্মত ভক্তির সঙ্গে নিবেদন করে। এবং আমরা এটা দেখতে পাই, ভাববাণীর উক্তিগুলো সত্যের সঙ্গে কেমন মিল রাখে ও দ্বিতীয় ব্যক্তির সর্বনাম যোগ করায় বচনের অর্থ পরিবর্তন করার ব্যাপারে বিরত থাকে। ‘তোমাকে, সেই সত্যকার ঈশ্বরকে’ একথা যদি থাকত, তবে কথাটা অন্য একজনকে উদ্দেশ্য করা কথা বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারত, কিন্তু ‘সত্যকার ঈশ্বরকে’ উক্তিটা অন্য কাউকে নয়, শুধু সেই একজনকেই উদ্দেশ্য করা যেতে পারে যিনি কথাটা উচ্চারণ করেন। এবং খোদ বচনটা যে কাকে উদ্দেশ্য করতে ইচ্ছা করে, তা একেবারে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু বচনটার পূর্ববর্তী উক্তিগুলো বচনটার সংযোগে ধরে নিলে স্পষ্ট দেখায় বচনটা কাকে উদ্দেশ্য করা দরকার। সেই পূর্ববর্তী কথাগুলো এ, ‘যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের কাছে আমি প্রকাশ্যেই দেখা দিয়েছি; যারা আমার খোঁজ করত না, তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাকে বলেছি, এই যে আমি আছি। সারাদিন ধরে আমি অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি’ (ক)। ভ্রান্তমতপন্থীদের শিক্ষাদানের ভক্তিহীন ভ্রান্তি এখানে কি একেবারে স্পষ্ট নয়? এবং যিনি এই কথা বলেন, তিনি কি সত্যকার ঈশ্বর বলে অস্বীকৃত হবেন? জিজ্ঞাসা করি, যারা তাঁর কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের কাছে যিনি প্রকাশ্যেই দেখা দিয়েছেন ও যারা তাঁর খোঁজ করত না, তাদের যিনি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছেন, তিনি কে? এবং যে জাতি অতীতকালে তাঁর নাম করত না, সেই জাতি কারা? এবং যিনি অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলেন, তিনি কে? এই বাণীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবরণের সেই পবিত্র ও ঐশ্বরিক গীতিকা তুলনা কর যে গীতিকায় ঈশ্বর অসার প্রতিমার বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত নয় তাদের সেই তাদেরই বিরুদ্ধে জ্বালায় উত্তপ্ত করেন যারা এক জাতি নয় ও নির্বোধ এক জাতি;

এবং বুঝে নাও সেই তিনি কে যিনি যারা তাঁকে জানে না, তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, সেই তিনি কে যিনি যাদের কাছে একসময় পরকীয় ছিলেন, তাদের সম্পদ হন, এবং সেই তিনি কে যিনি আমাদের প্রতিকূল সেই আগেকার লিখিত ঋণপত্র দ্রুশে বিধিয়ে দিয়ে (খ) সারাদিন ধরে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়ে থাকেন। কেননা এই পর্যায়ে নবীর আত্মা এই বক্তব্যের সঙ্গতিপূর্ণ ও ক্রমগত বিকাশে এগিয়ে চলে বললেন, ‘কিন্তু আমার আপন দাসেরা এমন নতুন এক নামে অভিহিত হবে যা পৃথিবীর উপরে আশিসধন্য হবে, এবং তারা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে : ও যারা পৃথিবীর উপরে শপথ করে, তারা সত্যকার ঈশ্বরের দিব্য দিয়েই শপথ করবে’।

৩২। যদি ভ্রান্তমত নিজের মূর্খতা ও অভক্তিতে অজ্ঞ ও সরলমনা মানুষকে সত্য থেকে প্রলুব্ধ করার জন্য এমনটা বলবে যে এই বাণীগুলো পিতা ঈশ্বর দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল যাতে করে এমনটা এড়ানো হয় যে এই বচনের শিক্ষা পুত্র ঈশ্বরকে আরোপ করা হয়, তাহলে সেই ভ্রান্তমত প্রেরিতদূত ও বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু থেকে নিজের মিথ্যার দণ্ডাজ্ঞা শুনুক। যে ইস্রায়েল মাংসে প্রভুর আগমন চিনতে চায় না, যখন প্রেরিতদূত সেই ইস্রায়েলের অবিশ্বাস তিরস্কার করেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, এসমস্ত ভাববাণী প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্য সংক্রান্ত ও সুসমাচারের বিশ্বাসের কাল সংক্রান্ত। তাঁর বাণী এ, ‘কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে। তবে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা তারা কখনও শোনেনি, কেমন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে? আরও, প্রচারক না থাকলে, তারা কেমন করে শুনবে? আর প্রেরিত না হলে তারা কেমন করে প্রচার করবে? ‘যেমনটি লেখা আছে, আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে!’ (ক)। কিন্তু সবাই যে সুসমাচারের প্রতি বিশ্বাস রাখে তা নয়। ইশাইয়াই তাই বলেন, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে? (খ)। সুতরাং, বিশ্বাস সেই প্রচার-শোনা থেকে, ও প্রচার-শোনাটা বচন দ্বারা হয়। কিন্তু আমি বলি, তবে তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয় পেয়েছে! সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন। তবু আমি আবার বলি : ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? এবিষয়ে মোশি প্রথমে বলেন, যে জাতি জাতি নয়, আমি তেমন জাতির প্রতিই তোমাদের ঈর্ষাতুর করব; মূর্খ এক জাতির

প্রতি তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব। আর ইশাইয়া অধিক সাহসের সঙ্গে বলেন, যারা আমার খোঁজ করত না, তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি; যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি। কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি সারাদিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জনগণের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম (গ)। [হে ভ্রাতৃমতপন্থী,] তুমি যে পরস্পর স্বর্গের মধ্য দিয়ে আরোহণ করেছ, শরীরে কিনা, নাকি অশরীরে কিনা, তা কেউ জানে না; এবং নবীর বাণী পলের চেয়েও অধিক বিশ্বস্তভাবে ব্যাখ্যা করেছ, সেই তুমি কে? তুমি যে স্বর্গীয় রহস্যাদির আবৃত অনির্বচনীয় বিষয়ের কথা নীরবে শুনেছ ও তাঁর চেয়ে অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে ঈশ্বর দ্বারা ঐশপ্রকাশের লক্ষ্যে মঞ্জুর করা সেই সমস্ত সত্য ঘোষণা করেছ, সেই তুমি কে? তুমি যে ত্রুশে প্রভুর যন্ত্রণাভোগে পূর্ণ অংশ নিতে পূর্বনির্দিষ্ট, তোমাকে যে প্রথম হয়ে পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ও সেই তুমি যে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্র সম্পর্কে সেই মনোনীত পাত্রের চেয়েও শ্রেয়তর ব্যাখ্যা প্রদান করেছ কিন্তু এটাই ভুলে গেছ যে এসমস্ত বিষয় হলো সত্যকার ঈশ্বরের সেই উচ্চারিত ও সাধিত বাণী যা তাঁর প্রকৃত ও মনোনীত প্রেরিতদূত দ্বারা প্রচারিত হলো যাতে আমরা সত্যকার ঈশ্বরকে চিনতে পারি, সেই তুমি কে? (ঘ)।

৩৩। এমনটাও হতে পারে যে সেই প্রেরিতদূত এই নবীয় বাণী ব্যবহার করার সময়ে নবীয় বাণীর আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন না ও অন্য এক মানুষেরই বাণী কোন রকমে ব্যাখ্যা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতদূত সমস্ত সত্য প্রচার করেন কারণ স্বয়ং খ্রিষ্টই তাঁকে সেই সত্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি ইশাইয়ার বাণীর অর্থ স্বয়ং ইশাইয়ার পাঠ্য থেকেই গ্রহণ করেন। যে বচনে এমনটা বলা হয় যে ঈশ্বরের আপন সেবকেরা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে ও তাঁর দিব্য দিয়ে শপথ করা হবে, সেই বচনের শুরুতে আমরা নবীর এই কথা পড়ি, পুরাকাল থেকে আমরা কখনও শুনিনি, আমাদের চোখও তোমাকে ছাড়া কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি, ও তোমার আপন শরণাগতদের পক্ষে যে মহাকর্ম তুমি সাধন করবে, তাও আমাদের চোখ দেখেনি (ক)। ইশাইয়া এমনটা বলেন যে, তিনি এই ঈশ্বরকে ছাড়া অন্য ঈশ্বরকে দেখেননি। বাস্তবিকই তিনি ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেয়েছিলেন ও কুমারী থেকে তাঁর দেহধারণ রহস্য পূর্বঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তুমি

যদি ভ্রান্তমত অনুসারে এটা জান না যে সেই গৌরবে তিনি একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে দেখেছিলেন, তাহলে সুসমাচার-রচয়িতা যোহনের কথা শোন, ইশাইয়া তখনই এই কথা বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর গৌরব দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁর কথা বলেছিলেন (খ)। হে ভক্তিহীন ভ্রান্তমতপন্থী, এবিষয়ে নিজ নিজ বাণী দ্বারা সেই প্রেরিতদূত, সেই সুসমাচার-রচয়িতা ও সেই নবী সবাই মিলে তোমার সমস্ত প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দিচ্ছেন। কেননা ইশাইয়া ঈশ্বরকে দেখেছিলেন ও যদিও এমনটা লেখা আছে যে, ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন (গ), তথাপি নবী ঈশ্বরকে দেখেছিলেন ও তাঁর গৌরব লক্ষ করেছিলেন, এবং তাঁর এ নবীয় অধিকারের জন্য তাঁকে ঘৃণাও করা হয়েছিল; কেননা এটাই সেই কারণ যার জন্য তিনি ইহুদীদের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন (ঘ)।

৩৪। পিতার বুকে বিরাজমান যিনি, সেই একমাত্র জনিত পুত্র সেই ঈশ্বরেরই বর্ণনা দিলেন যাকে কেউই দেখেনি। সেজন্য, [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] হয় তোমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, সেই একমাত্র জনিতজন যা বর্ণনা করেন তা ভিত্তিহীন, না হয় তোমাকে তাঁকেই বিশ্বাস করতে হবে যাকে দেখা হয়েছিল ও যিনি তাদেরই কাছে দেখা দিয়েছিলেন যারা তাঁকে জানত না ও সেই বিজাতীয়দের [ঈশ্বর] হয়েছিলেন যারা তাঁকে ডাকত না, ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলেন (ক)। তাঁর বিষয়ে এটাও বিশ্বাস কর যে, যারা তাঁর সেবা করে তারা এক নতুন নামে অভিহিত, ও পৃথিবীতে মানুষ তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর বলে ধন্য বলে ও তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে। নবীয় বাণী বর্ণনা দেয়, সুসমাচার সত্যায়িত করে, প্রেরিতদূত ব্যাখ্যা করেন, মণ্ডলী স্বীকার করে যে, যাকে দেখা হয়েছিল তিনি সত্যকার ঈশ্বর; কিন্তু পিতাকেই যে দেখা হয়েছে, কেউই যেন সেই কথা বলতে সাহস না করে। অথচ ভ্রান্তমতের ক্ষিপ্ততা এমন উন্মাদনায় প্রসারিত হলো যে, তারা এই সত্য চিনে নেয় ব'লে স্বীকার করতে করতে প্রকৃতপক্ষে তা অস্বীকারই করে। সত্যকে এড়াবার নবীন ও ভক্তিহীন চালাকি দ্বারা তারা সত্যকে অস্বীকার করে, ও সেইসঙ্গে সেই সত্যকে আঁকড়িয়ে ধরার ভান করে। কেননা তারা যখন একাই সত্যকার ও একাই ধর্মময়, একাই প্রজ্ঞাবান, একাই অপরিবর্তনশীল, একাই অমর, একাই প্রতাপশালী সেই একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে, তখন তারা সেই ঈশ্বরকে

সত্যায় ভিন্ন এমন এক পুত্রকে যোগ করে যিনি ঈশ্বর হবার জন্য ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত নন কিন্তু পুত্র হবার জন্য সৃষ্টি দ্বারা গৃহীত, যিনি এমন নামের অধিকারী যা স্বরূপে পাওয়া নয়, কিন্তু সেই নাম এমন যা দত্তক দ্বারা গৃহীত নাম; এবং এইভাবে তারা পুত্রকে সেই সমস্ত গুণ থেকে বঞ্চিত করে যা তারা পিতার উপরে, তাঁর সেই একাকী মর্যাদায়, চাপিয়ে দেয়।

৩৫। ভ্রান্তমতের বিকৃত মন একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে জানতে ও স্বীকার করতে অক্ষম; তেমন স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাস ও যুক্তি অবিশ্বাসের সঙ্গে আদৌ মিল রাখে না। ঈশ্বরকে একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করার আগে আমাদের পক্ষে পিতা ও পুত্রকে স্বীকার করা প্রয়োজন। পিতা ও পুত্রতে জীবনের উদ্দেশে নবজন্মদানকারী পরাক্রম দ্বারা আমাদের অন্তরে সাধিত মানবপরিভ্রাণ-রহস্য জানবার পরেই আমরা বিধান ও নবীদের রহস্যাদিতে প্রবেশে আশা রাখতে পারি। সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষাদান বিষয়ে ভক্তিহীন অজ্ঞতা একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর জ্ঞানে পৌঁছতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের সঙ্গে সিদ্ধ মিল রেখে আমরা সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা থেকে শুরু করে ঈশ্বর বিষয়ক সত্যকার ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করব, যাতে করে পিতা থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত সেই একমাত্র জনিতজন ব্যক্তিত্বে নয় কিন্তু স্বরূপেই অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য বলে জ্ঞাত হন, ও ঈশ্বর যেন এক বলে জ্ঞাত হন কারণ ঈশ্বরের স্বরূপের গুণেই তিনি ঈশ্বর। কিন্তু এই সিদ্ধ ঐক্যে বিশ্বাসের মূল ভিত্তি নবীয় লেখাগুলোতেই থাকা চাই, ও সেই ভিত্তির উপরেই সুসমাচারের কাঠামোর ভিত স্থাপন করতে হবে, যাতে করে সেই একমাত্র ঈশ্বরত্বের একই স্বরূপ গুণে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন যেহেতু একমাত্র জনিত ঈশ্বর দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে আলাদা ভাবে নির্দেশিত নন। এই গোটা পুস্তক ধরে আমাদের চালানো বিন্যাসে আমরা আগের পুস্তকের পদ্ধতি পালন করেছি ও যে পদ্ধতি দিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি যে পুত্র নিজেই ঈশ্বর, সেই একই পদ্ধতি ক্রমে এখন আমরা প্রমাণ করেছি যে তিনি সত্যকার ঈশ্বর। আশা রাখি, প্রতিটি বচন সংক্রান্ত সেই ব্যাখ্যা এমনভাবে কার্যকর হয়েছে যাতে সবাই যাকে ঈশ্বর বলে মানত, তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর বলেও জ্ঞাত হন। পুস্তকের বাকি অংশে আমরা এমনটা চেষ্টা করব যাতে যিনি সত্যকার

ঈশ্বর বলে জ্ঞাত, তিনি যেন দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে গণ্য না হন। দ্বিতীয় এক ঈশ্বরের কথা মেনে নিতে আমাদের অস্বীকৃতি ঐক্যকে আরও দৃঢ় করবে; কিন্তু এই ঐক্য যেন ব্যক্তি হিসাবে পুত্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন না করে বরং [পিতা] ঈশ্বরে ও [পুত্র] ঈশ্বরে একমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ রক্ষা করে।

৩৬। প্রকৃত পদ্ধতি এমনটা দাবি রাখে যেন এই অনুসন্ধান তাঁরই থেকে শুরু হয় যাঁর দ্বারা ঈশ্বর জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধানটা মোশি থেকেই শুরু হবে, কেননা তাঁরই মুখ দিয়ে একমাত্র জনিত ঈশ্বর নিজের বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন, দেখ, দেখ: আমিই ঈশ্বর; আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই (ক)। নিজের অভক্তির জোরে যাতে ভ্রান্তমত, যাঁর জন্ম সম্ভব নয় সেই পিতা ঈশ্বরে এই কথা আরোপ না করে, সেজন্য সেই কথাগুলোর অর্থ ও প্রেরিতদূতের সাক্ষ্যও আমাদের সহায়তায় আসে, কেননা প্রেরিতদূত আমাদের শিখিয়েছেন যে এই বচন একমাত্র জনিত ঈশ্বর দ্বারা উচ্চারিত বলেই বিবেচনাযোগ্য, যেইভাবে আমরা উপরে দেখিয়েছি (খ)। প্রেরিতদূত এটাও দেখান যে, ‘জাতিসকল, তাঁর জনগণের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর’ (গ) বাণীটা পুত্রেরই বাণী বলে বিবেচনাযোগ্য, ও তেমনটার সমর্থনে তিনি এটাও যোগ করেন, ‘যেসের শিকড় উৎপন্ন হবেন ও তিনিও থাকবেন যিনি জাতি-বিজাতির উপর কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন; তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা প্রত্যাশা রাখবে’ (ঘ)। একই প্রকারে, ‘জাতিসকল, তাঁর জনগণের সঙ্গে আনন্দে চিৎকার কর’ একথা দ্বারা মোশি তাঁরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যিনি বলেছিলেন, ‘আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’; এবং প্রেরিতদূত সেই কথাগুলো একমাত্র জনিত ঈশ্বর সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টে আরোপ করেন যাঁর মধ্যে বিজাতীয়দের প্রত্যাশা তখনই বিরাজ করে যখন তিনি মাংস অনুসারে যেসের শিকড় থেকে রাজা রূপে উৎপন্ন হন। সেজন্য এখন আমাদের এই কথাগুলো বলার কারণ বিচার-বিবেচনা করতে হবে, যাতে, একথা জেনে যে সেই কথাগুলো তাঁরই দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল, সেই ভিত্তিতে এটাও বুঝতে পারি কোন্ অর্থে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছিল।

৩৭। আমাদের বিশ্বাসের বুনয়াদ স্বরূপ সেই সত্যকার, পূর্ণ ও সিদ্ধ তত্ত্ব হলো ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরে ঈশ্বরকে স্বীকার করা; ও তেমনটা করা উচিত বাহ্যিক প্রক্রিয়া গুণে নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক পরাক্রম গুণে, একটা স্বরূপকে অন্য স্বরূপের মধ্যে প্রবাহিত করার মাধ্যমে নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক স্বরূপের রহস্যময় পরাক্রম দ্বারা। বিভাজন বা সম্প্রসারণ বা নিঃসরণ দ্বারাই যে ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে হন তা নয়, কিন্তু এমন স্বরূপ দ্বারাই তিনি তাই হন যা জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে এমন স্বরূপকে বিদ্যমান করে যা নিজের মধ্যে এক। এসমস্ত বিষয়কে পরবর্তী পুস্তকই তন্ন তন্ন করে আলোচনা করবে, সেই যে পুস্তক সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা ব্যক্ত করতে নিযুক্ত, কিন্তু আপাতত আমাদের উপস্থাপিত ধারণা ও আমাদের বিশ্বাসকে বিধান ও নবীদের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রমাণসিদ্ধ করতে হয়। ঈশ্বরের পুত্র যা থেকে জন্ম নিয়েছেন সেই স্বরূপকে তিনি না রেখে পারেন না; তিনি ঈশ্বর থেকে ভিন্ন অন্য কিছু বলে অস্তিত্বশীল হতে পারেন না, কারণ তাঁর উদ্ভব ঈশ্বর থেকে ছাড়া অন্য কারও থেকে অস্তিত্বশীল নয়। তিনি একই স্বরূপের অধিকারী, এই অর্থে নয় যে যিনি তাঁকে জনিত করেছেন তিনি জন্ম নিয়েছেন, কেননা যদি তিনি জনিত হতেন তবে কেমন করে সেই তিনি হতে পারতেন যিনি আছেন? (ক)। বরং যিনি জনিত হয়েছেন তিনি এমন সত্তার অধিকারী যা সেই সমস্ত গুণপ্রাপ্ত যা বিষয়ে তিনিই সম্পূর্ণরূপে অধিকারী যিনি তাঁকে জনিত করেছেন ও তাঁর একমাত্র জনক। এজন্যই তাঁকে অন্য স্বরূপ আরোপ করা হয় না, কারণ তিনি এক থেকে এক: তাঁর মধ্যে নতুন কিছু নেই, কারণ তিনি জীবনময় থেকে জীবনময়; তাঁর মধ্যে অনুপস্থিতও কিছুই নেই, কারণ জীবনময় যিনি তিনি তাঁকে নিজের জীবনের অংশী বলে জনিত করেছেন। এইভাবে পুত্রকে প্রজননে অশরীরী ও অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর অশরীরী ও অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরকে জনিত করায় নিজের স্বরূপকেও মঞ্জুর করেন; এবং অশরীরী ও অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর থেকে অশরীরী ও অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরের নিখুঁত জন্মের ফলে জনকের সত্তা যে হ্রাসীকৃত হয় তা নয়, ঠিক সেইভাবে যেইভাবে আমরা ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর রহস্যের আলোতে দেখতে পাই। একমাত্র জনিত ঈশ্বর পবিত্র মোশি দ্বারা এই কথায় এসত্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন, ‘দেখ, দেখ: আমিই ঈশ্বর; আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’ (খ)। কেননা দ্বিতীয় কোন ঐশ্বরিক স্বরূপ নেই, ফলে তাঁর

পাশে আর কোন ঈশ্বর থাকতে পারেন না যেহেতু তিনি ঈশ্বর। কেননা পুত্র ঈশ্বর হয়েও তথাপি নিজের স্বরূপের পরাক্রম গুণে ঈশ্বর তাঁর মধ্যেও বর্তমান। এবং যেহেতু তিনি ঈশ্বর ও তাঁর মধ্যে ঈশ্বর বর্তমান, সেজন্য তাঁর পাশে অন্য কোন ঈশ্বর নেই: যেহেতু তাঁর ঈশ্বরত্ব ঈশ্বর থেকে বাদে অন্য কারও থেকে উদ্ভূত নয় ও ঈশ্বর তাঁর মধ্যে বর্তমান, সেজন্য তাঁর মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব শুধু নয়, কিন্তু সেই অস্তিত্বের প্রণেতাও বর্তমান।

৩৮। নবীয় বাণীর সেই যে আত্মা বহু বহু ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অভিন্ন হয়ে থাকেন, ও পরবর্তী ও ভিন্ন ভিন্ন কালের মধ্য দিয়ে অপরিবর্তনশীল হয়ে বিশ্বাসের সত্য বিষয়ে প্রচার করে থাকেন, সেই [পবিত্র] আত্মা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতিকে সত্যাপ্রয়ী ও পরিত্রাণদায়ী বলে সত্যায়িত করেন। মোশির সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে আমরা যেইভাবে দেখিয়েছি, সেই অনুসারে, একমাত্র জনিত ঈশ্বরের উচ্চারিত কথাগুলো যাতে আমাদের অধিক পূর্ণতর শিক্ষালাভে সত্যায়িত হয়, সেজন্য পিতা ঈশ্বরের ব্যাখ্যাতা সেই নবীয় বাণীর আত্মা লম্বা লম্বা মানুষদের হয়ে পুনরায় ইশাইয়াতে বলেন, কেননা ঈশ্বর তোমাতে আছেন ও তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। কারণ তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না, ওগো ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পরিত্রাতা (ক)। ভ্রান্তমতের অভক্তির আশাহীন ক্ষিপ্ততা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত স্বরূপ ও নামের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে নিজেকে ব্যক্ত করুক ও তেমনটা পারলে তবে নিজের ক্ষিপ্ততায় ক্রোধান্বিত মুখ দিয়ে নামে ও বাস্তবতায় এই সিদ্ধ ঐক্য দীর্ণ-বিদীর্ণ করুক। ঈশ্বরে ঈশ্বর আছেন ও তিনি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই। যিনি তাঁর মধ্যে আছেন, অভক্তির ক্ষিপ্ততা তাঁরই থেকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করুক যাঁর মধ্যে তিনি আছেন, ও তেমন রহস্যময় ধারণাকে স্থায়ী স্থায় ধরণ অনুসারে বিচ্ছিন্ন করুক। কেননা যখন [ইশাইয়া] বললেন, ‘ঈশ্বর তোমাতে আছেন’, তখন এমনটা শিখিয়েছিলেন যে, পিতা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ পুত্র ঈশ্বরে রয়েছে, ও এটাও দেখাতে ইচ্ছা করতেন যে, ঈশ্বর যিনি, ঈশ্বর বলে তিনি তাঁর মধ্যে ছিলেন। ও যখন তিনি এও বললেন, ‘তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই’, তখন এটা দেখালেন যে তিনি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই, কারণ যিনি ঈশ্বর তাঁর মধ্যে ঈশ্বর উপস্থিত। ‘তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না’ এই তৃতীয় উক্তি প্রকাশ করে, ভক্তিময় ও ন্যায় বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি আমাদের শিক্ষাদানে উপযোগী হবার জন্য কেমন হতে হবে। ঐশ্বরিক জন্ম-

রহস্য প্রকাশের পর ও যোসেফের কাছে দূত দ্বারা [ইস্মানুয়েল] নাম সংক্রান্ত সংবাদ দানের পর সেই স্বীকারোক্তি চিৎকার করুক, ‘তুমিই ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না, ওগো ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পরিত্রাতা’। যে ঐশ্বররূপ পুত্রে উপস্থিত তা মানুষ জানে, কারণ ঈশ্বর ঈশ্বরে আছেন ও সেই তিনি ছাড়া যিনি ঈশ্বর, তাঁকে বাদে অন্য কোন ঈশ্বর নেই; কেননা ঈশ্বর-নামটা ও তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি এমনটা হতে দেয় না যে আমরা ভুলবশত অন্য কোন ঈশ্বরের কথা ভাবি। এই অর্থেই ইশাইয়া সেই নবীয় বাণী উচ্চারণ করেছিলেন: তিনি পিতা ও পুত্রের অপরিবর্তনশীল ও অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করছিলেন।

৩৯। ভিন্ন নয় এমন নবীয় প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে যেরেমিয়া একই প্রকারে দেখালেন যে, স্বরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র জনিত ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নন; তাঁর বাণী এ, তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হবে না; তিনিই সদ্ভক্তদের সমস্ত পথের সন্ধান পেলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে ও তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন (ক)। তুমি কেন ভ্রান্তমতপন্থীর বিশিষ্ট মনোভাবে ঈশ্বর যিনি সেই ঈশ্বরের পুত্রকে দ্বিতীয় এক ঈশ্বরে রূপান্তরিত করতে চাও? একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে জানতে ও স্বীকার করতে শেখ। ঈশ্বর হবার জন্য খ্রিস্টের সঙ্গে অন্য কোন ঈশ্বরের তুলনা হয় না। তিনি স্বরূপে ও জন্মসূত্রে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর। তাঁর ঈশ্বরত্ব ঈশ্বর থেকে, ও তাছাড়া তিনি দ্বিতীয় এক ঈশ্বর নন। কেননা তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না, কারণ তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ বাদে প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন স্বরূপ নেই। ঈশ্বরের ঐক্যের প্রতি ভান করা সম্মানের খাতিরে তুমি কেন যা মিথ্যা তা সত্যের সঙ্গে, যা দূষিত তা খাঁটির সঙ্গে, যা ভিন্ন তা ভিন্নের সঙ্গে যুক্ত কর? পিতাও স্বয়ং ঈশ্বর, পুত্রও স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বর ঈশ্বরে বর্তমান; তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর হবার জন্য তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা করা যায় না। এই দুইয়ে যদি তুমি একা ঈশ্বরকে কিন্তু একাকী ঈশ্বরকে নয় চিনবে, তবে তুমি সেই মণ্ডলীর বিশ্বাস স্বীকার করবে যে মণ্ডলী পুত্রে ঈশ্বরকে স্বীকার করে। এর বিপরীতে তুমি যদি স্বর্গীয় রহস্য বিষয়ে অজ্ঞতায় তাঁর একাকীত্ব

সমর্থন করার লক্ষ্যে ঈশ্বরের ঐক্যকে অজুহাত বলে উপস্থাপন কর, তাহলে তুমি ঈশ্বর-জ্ঞানের সহভাগী নও, কারণ তুমি এটা স্বীকার কর না যে ঈশ্বর ঈশ্বরে আছেন।

১ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাধু হিলারিউস বলতে চান, যারা ঈশ্বরের ঐক্য বিষয়ে আরিউসপন্থীদের ভুল ধারণার বিরুদ্ধে স্থান পায় না, তাদের বেলায় এমনটা বলা যেতে পারে যে, তারা নিজেরাও পুত্রের ঈশ্বরত্বের বিরোধী; এবং যারা এবিষয়ে আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাদের বেলায় এমনটা বলা যেতে পারে যে, তারা নিজেরাও ঈশ্বরের ঐক্যের বিরোধী, অথবা সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমত অনুসারে তারাও পিতা ও পুত্রকে একক ব্যক্তি বলে সমর্থন করে।

২ (ক) ‘যিনি ঈশ্বরের ঐক্য ঘোষণা করলেন’, তিনি হলেন মোশি।

৩ (ক) আরিউসের বিশ্বাস-সূত্রের আরম্ভ; ৪র্থ পুস্তক ১২ অধ্যায়ও দ্রঃ।

(খ) ‘২য় পুস্তক’: প্রকৃতপক্ষে পুস্তকটা হলো ৫ম পুস্তক; তবে কেনই বা সাধু হিলারিউস পুস্তকটা ২য় পুস্তক বলে উপস্থাপন করেন? সম্ভবত, প্রথম তিন পুস্তক লেখার পর সাধু হিলারিউস গোটা লেখার পদ্ধতি ও পুস্তক-বিন্যাস পরিবর্তন করে বাকি পুস্তকগুলো (অর্থাৎ ৪র্থ-১২শ পুস্তক) যোগ করার সময়ে কিছুটা ভুল করেছিলেন; এজন্য ৫ম পুস্তক ভুলবশত ২য় পুস্তক হয়ে যায়। এধরনের ভুল অন্যান্য পুস্তকগুলোতেও পাওয়া যায়।

৪ (ক) কল ১:১৬ লাতিন পাঠ্য।

৫ (ক) ‘যখন বিধান বলে’: সাধু হিলারিউস ‘বিধান’ নাম দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আদিপুস্তককে চিহ্নিত করেন, কারণ ‘বিধান’ নাম দ্বারা হিব্রু গোটা পঞ্চপুস্তককে ‘বিধান’ বলে অভিহিত করত (লুক ২৪:৪৪ দ্রঃ)।

(খ) আদি ১:৬-৭ লাতিন পাঠ্য।

৬ (ক) যোহন ১৪:২৮।

৭ (ক) আদি ১:২৬ লাতিন পাঠ্য।

৯ (ক) আদি ১:২৭ লাতিন পাঠ্য।

১১ (ক) ৪র্থ পুস্তক ২৩ দ্রঃ।

(খ) সাম ১০৪:৪ লাতিন পাঠ্য।

১৩ (ক) আদি ১৬: ৯ ইত্যাদি দ্রঃ।

১৫ (ক) মথি ৩:৯ দ্রঃ।

(খ) মথি ৩:৭ দ্রঃ।

(গ) রো ৩:২৬ দ্রঃ।

(ঘ) আদি ১৮:১৪ দ্রঃ।

১৬ (ক) আদি ১৮:২০ ... ; ১৯:১ ... দ্রঃ।

(খ) আদি ১৯:২৪ দ্রঃ।

(গ) আদি ১৮:২৫।

১৭ (ক) হিব্রু ১০:১ দ্রঃ।

১৮ (ক) ‘[হে সুসমাচারসমূহ,] তোমরা বিধান থেকেই আগত’: সুসমাচারসমূহ এজন্যই বিধান থেকে আগত, কারণ বিধানে যে সমস্ত সত্য পূর্বনির্দেশিত ও ছায়ার মত উপস্থিত, সেই সমস্ত সত্য সুসমাচারে পূর্ণ ও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

১৯ (ক) আদি ৩২:২৬-২৭ দ্রঃ।

(খ) আদি ৩২:৩১ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) ‘সেই মানুষ মাংস অনুসারে তোমার চেয়ে দুর্বল’: অর্থাৎ, সেই মানুষ মানব-প্রকৃতি অনুসারে তোমার চেয়ে দুর্বল।

(ঘ) ‘নাম পাল্টানোতে ও নতুন নাম আরোপ’: অর্থাৎ ঈশ্বর যাকোবের পুরাতন নাম পাল্টিয়ে তাঁকে ‘ইস্রায়েল’ নতুন নাম আরোপ করেন।

২০ (ক) আদি ২৮:১৭ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) আদি ৩৫:১ লাতিন পাঠ্য।

২২ (ক) যাত্রা ১৩:১৪।

২৩ (ক) যোহন ৫:৪৬।

(খ) প্রেরিত ৭:৫৩ দ্রঃ।

২৫ (ক) ইশা ৬৫: ১৬ লাতিন পাঠ্য।

২৬ (ক) ইশা ৬৫: ১৬ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ‘একটা ছোট শব্দ যোগ করল’: নবী ইশাইয়ার প্রকৃত বচন এটা: ‘তারা সত্যকার ঈশ্বরকে ধন্য বলবে’; কিন্তু আরিউসপস্থীরা বচনটা পরিবর্তন করে ‘তোমাকে’ শব্দটা যোগ করেছিল: ‘তারা তোমাকে, সেই সত্যকার ঈশ্বরকে, ধন্য বলবে’।

২৭ (ক) ইশা ৬৫:১৩-১৬ লাতিন পাঠ্য।

(খ) আরিউসপহীরা ‘সত্যকার ঈশ্বর’ সংজ্ঞাটা পিতা ঈশ্বরে আরোপ করত; কিন্তু সাধু হিলারিউস সংজ্ঞাটা পুত্র ঈশ্বরেই আরোপ করেন।

২৮ (ক) রো ২:২৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৩১ (ক) ইশা ৬৫:১-২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) কল ২:১৪ দ্রঃ।

৩২ (ক) রো ১০:১৩-১৫।

(খ) ইশা ৫৩:১।

(গ) রো ১৩-২১ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) আরিউসপহীদের অপব্যখ্যা খণ্ডন করার জন্য সাধু হিলারিউস ব্যঙ্গ করে সেই আরিউসপহীদের সাধু পলের সমকক্ষ বলে চিত্রিত করেন।

৩৩ (ক) ইশা ৬৪:৩ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ১২:৪১ লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোহন ১:১৮।

(ঘ) ‘এটাই সেই কারণ যার জন্য তিনি ইহুদীদের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন’: এক্ষেত্রে সাধু হিলারিউসের ধারণা এ: যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে ইশাইয়া ঈশ্বরকে দেখেছিলেন, কিন্তু যখন সেই যোহন এটাও বলেন যে, পিতা ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখেনি, তখন এটা দাঁড়ায় যে, ইশাইয়া পুত্র ঈশ্বরকেই দেখেছিলেন।

৩৪ (ক) পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যার জন্য মানব-পরিভ্রাণের রহস্যগুলো জানাটা হলো অপরিহার্য শর্ত স্বরূপ, কারণ পুরাতন নিয়ম জুড়ে যে সমস্ত দুর্ভেদ্য বা অস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে, সেগুলো ত্রিত্ব-রহস্য সংক্রান্ত সেই প্রত্যক্ষ ঐশপ্রকাশ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যা ঈশ্বর নূতন নিয়মে উপস্থাপন করলেন।

৩৬ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ৪র্থ পুস্তক ৩৩ অধ্যায় দ্রঃ।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৩; রো ১৫:১০।

(ঘ) রো ১৫:১৩ লাতিন পাঠ্য।

৩৭ (ক) ‘সেই তিনি হতে পারতেন যিনি আছেন’ : যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি আছেন।

(খ) ‘আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই’ : অর্থাৎ পিতা ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই।

৩৮ (ক) ইশা ৪৫:১৪-১৫ লাতিন পাঠ্য।

৩৯ (ক) বারুক ৩:৩৬-৩৮ লাতিন পাঠ্য।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৬ষ্ঠ পুস্তক

আরিউসের ভ্রান্তমত অবোধে ছড়িয়ে পড়ছিল। এর ফলে যে গভীর উদ্বেগ সাধু হিলারিউসের মন আক্রান্ত করছিল, সেই উদ্বেগ ৬ষ্ঠ পুস্তকের প্রথম চার অধ্যায় চিহ্নিত করে। সময়কাল হলো ৩৫৬-৩৫৯ খ্রিষ্টাব্দ, অর্থাৎ সেই সময় যখন সাধু হিলারিউস তুরস্কের ফ্রিগিয়া অঞ্চলে নির্বাসিত অবস্থায় ‘ত্রিত্ব প্রসঙ্গ’ পুস্তক রচনা করেন। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সম্রাট কনস্টান্টিউস আরিউসপন্থীদের পক্ষে দাঁড়ালে আরিউসপন্থীরা বহু গির্জা দখল করেছিল ও ৩৫৯ সালে, ইতালি-স্থিত রিমিনি-মহাসভার পরে, নিকেয়া-মহাসভার প্রতি বিশ্বস্ত পশ্চিমা খ্রিস্টমণ্ডলীর উপরে প্রাধান্য পেয়েছিল।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	
	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২										

১। আমি ভালই জানি যে, অসুবিধা ও কঠোরতায় পূর্ণ সময়ে আমি সেই উন্মাদ ও অভক্তিময় ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে লিখতে বসেছি যা এমনটা সমর্থন করে যে ঈশ্বরের পুত্র সৃষ্টজীব মাত্র। রোম সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিটি প্রদশে বহু মণ্ডলী ইতিমধ্যে এ মারাত্মক মতবাদের রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে ও সেই মতবাদের সঙ্গে দীর্ঘ পরিচিতির কারণে ও সেই মতবাদই যে সত্যকার ধর্ম, তেমন মিথ্যা দাবির ফলে সেই মণ্ডলীগুলো, বলতে গেলে, এমন ভুল ধারণায় আত্মভূত হয়েছে যা অনুসারে তাদের সমর্থিত [ভ্রান্ত] বিশ্বাসই হলো সত্যকার বিশ্বাস। আমি তো এবিষয়ে সচেতন যে, ইচ্ছাশক্তি মনপরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে অসুবিধা বোধ করছে কারণ নিজের ভ্রান্তির প্রতি আকর্ষণের ফলে সেই ইচ্ছাশক্তি সেই অভিমতের বোঝা দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে, সেই যে অভিমত ইতিমধ্যে

বহুসংখ্যক মানুষের ভিড়ের সাধারণ সম্মতিতে পরিণত হয়েছে। বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এ ভুলভ্রান্তি সত্যিই গুরুতর ও বিপজ্জনক। ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে মেনে নিলেও সেই ভ্রান্তিতে পতিত বহুসংখ্যক মানুষ [সত্যে] ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করে। নিজেরা যে সংখ্যায় বহু, তা ভেবে তারা স্পর্ধা ভরে [তেমন ভুল পথে চলার] অধিকার দাবি করে ও এমনটাও চায়, নিজেদের ভুল সন্ধিবেচনা বলে গণ্য হোক ও যেহেতু তারা বহুজনের সঙ্গে ভুল করে, সেজন্য [তাদের মতে] এতে প্রমাণিত হয় সেই ভুল প্রকৃতপক্ষে সত্য; কেননা সাধারণত বহুজনের ভুল কম ভুল বলে পরিগণিত।

২। আমার পক্ষ থেকে, আমার আহ্বান আমার উপর যে দাবি রাখে অর্থাৎ বিশপ হিসাবে যত্ন সহকারে সুসমাচার প্রচার করার যে দায়িত্ব আমাকে মণ্ডলীর প্রতি বাধ্য করে, তা বাদে এসমস্ত লেখবার আগ্রহ তত বৃদ্ধি পেত যত বৃদ্ধি পেত সেই লোকদের সংখ্যা যারা ভ্রান্তমতের বিপজ্জনক শিক্ষায় মগ্ন হচ্ছিল। আনন্দের পূর্ণতর একটা প্রত্যাশা এতেই আমাকে আশান্বিত করত যখন ভাবতাম কেমন বহুসংখ্যক লোকের ভিড় পরিভ্রাণ পেতে পারত যদি তারা ঈশ্বরে সিদ্ধ বিশ্বাসের রহস্যগুলো জেনে মানব মূর্খতার ভক্তিহীন তত্ত্বসমূহ পরিত্যাগ করত, ভ্রান্তমতপন্থীদের প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের হাতে নিজেদের ফিরিয়ে দিত, পাখিকে যেভাবে আকর্ষিত করা হয় সেইভাবে তারা মৃত্যুদায়ী টোপ থেকে দূরে সরে গিয়ে মুক্ত নিরাপত্তায় উড়তে উড়তে পরিচালক খ্রিস্টকে ও সংবাদদাতা হিসাবে প্রেরিতদূতদের অনুসরণ করত, পিতা ও পুত্র সংক্রান্ত স্বীকৃতিতে সিদ্ধ বিশ্বাস ও নিশ্চিত পরিভ্রাণ পেত, ‘পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেই সম্মান করে না’ (ক) প্রভুর মুখে উচ্চারিত এই উক্তি স্মরণ ক’রে তারা যদি পুত্রকে সম্মান করায় পিতাকে সম্মান করতে মনস্থ করত।

৩। কেননা সম্প্রতিকালে মানবজাতির জন্য মারাত্মক ও প্রাণনাশক এমন রোগ বেরিয়েছে যা নিজের অধিক সংক্রামক প্রভাবে, সঙ্গে করে শোচনীয় ও সাজ্জাতিক ধ্বংস আনল। কেননা মানবজাতির ধ্বংসনে এই ভ্রান্তমতের অগ্রগতি যত ঘটিয়েছে, নিজ নিজ বাসিন্দাদের সঙ্গে শূন্যতায় নিমজ্জিত শহরগুলোর আকস্মিক ধ্বংস, যুদ্ধ-সংগ্রামের বহুসংখ্যক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড, অনিবার্য মহামারী-জনিত ব্যাপক অধঃপতন কখনও তত

সর্বনাশা অনিষ্ট ঘটায়নি। কেননা যা কিছু মৃত ঘাঁর কাছে সেই সবই জীবিত, সেই ঈশ্বরের কাছে তারই মাত্র ধ্বংস হয় যা নিজের ইচ্ছাক্রমে ধ্বংস হতে চায়। সকলের বিচারকর্তা হবেন যিনি, অজ্ঞতার দরুন যে কেউ ভুল করে থাকে যিনি নিজের মর্যাদার গুণ সেই দয়ার খাতিরে তার যোগ্য দণ্ড কমিয়ে দেবেন, যারা তাঁকে অস্বীকার করে তাদের তিনি বিচার না করে সরাসরিই অস্বীকার করবেন (ক)।

৪। ক্ষিপ্ততায় উন্মত্ত এই ভ্রান্তমত অস্বীকার করে; হ্যাঁ, ভ্রান্তমত সত্যকার বিশ্বাস-রহস্য অস্বীকার করে ও নিজের অভক্তিময় তত্ত্বগুলো ছড়াবার জন্য আমাদের নিজেদের ধর্মের উক্তিসমূহকেই অবলম্বন করে। তার অবিশ্বাসের যে স্বীকারোক্তি আমি পূর্ববর্তী পুস্তকগুলোতে (ক) উল্লেখ করেছি, সেই স্বীকারোক্তি এভাবে শুরু হয়, ‘আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করি যিনি একাই অনির্মিত, একাই সনাতন, একাই উৎপত্তিহীন, একাই সত্যকার, একাই অমরতার অধিকারী, একাই মঙ্গলময়, একাই প্রতাপশালী’। ভ্রান্তমতপন্থীরা আমাদের নিজেদের ভক্তিময় স্বীকারোক্তির সেই প্রথম বাণীগুলো দখল করে যা অনুসারে ‘একমাত্র ঈশ্বর, একাই অনির্মিত ও একাই উৎপত্তিহীন’, যাতে করে সত্যের এই আভাস দেখিয়ে তারা নিজেদের অভক্তিময় সংযোজন অনুপ্রবেশ করাতে পারে। কেননা যোগ করা এমন অন্যান্য কতগুলো কথার পরে যেগুলোতে পুত্রের প্রতি একই ধরনের ভান করা ভক্তি ব্যক্ত হয়, তাদের স্বীকারোক্তি বলে চলে, [ঈশ্বরের পুত্র] ‘ঈশ্বরের সিদ্ধতম সৃষ্টজীব কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবদের একজনের মত নন, তাঁর নিজের কর্ম কিন্তু তাঁর অন্যান্য কর্মের একটা নন’। আরও, অন্যান্য এমন বহু কথার পর যেগুলো সত্যময় নানা উক্তি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভ্রান্তমতের অভক্তির লক্ষ্য আবৃত রাখে, ভ্রান্তমতপন্থীরা কুতর্ক বিশিষ্ট কুটিলতা দ্বারা এমনটা সমর্থন করার জন্য যে পুত্র শূন্য থেকে অস্তিত্বশীল হলেন, সেই লক্ষ্যে তারা এটা যোগ করে যে, ‘যুগগুলোর পূর্বে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত সেই পুত্র জন্ম নেবার আগে ছিলেন না’। অবশেষে, কেমন যেন অভক্তি রক্ষার লক্ষ্যে সমস্ত বিষয় একেবারে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে, সেই পুত্র যেন পুত্রও নন ও ঈশ্বরও নন বলে গণ্য হন, সেজন্য তারা এটা যোগ করে, ‘সেই সমস্ত উক্তি সম্পর্কে যেমন “তাঁর থেকে”, “গর্ভ থেকে”, ও “আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি”, যদি এই উক্তিগুলো এমনটা বোঝায় যে পিতা নিজের অনন্য সত্তার একটা অংশকে ও কেমন যেন নিজের

সম্প্রসারণকে প্রসারিত করেন, তাহলে পিতা এদের অভিমত অনুসারে হবেন যুক্ত, বিভাজ্য, পরিবর্তনশীল ও দেহবিশিষ্ট। তবে, তাদের সমর্থিত তত্ত্ব অনুসারে, যা দেহগত, দেহ-ছাড়া ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছুই বৈশিষ্ট্যসমূহের অধীন হবেন।’ কিন্তু, আমরা অতুলনীয় ভাবে অভক্তিময় এ মতবাদের উক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের বিতর্ক পুনরায় ধারণ করতে গিয়ে, যেহেতু এখন সুসমাচারের উক্তিগুলোই ব্যবহার করব, সেজন্য, যদিও এ ভ্রান্তমত সংক্রান্ত গোটা দলিল ইতিমধ্যে প্রথম পুস্তকে (খ) উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, তবু এই ষষ্ঠ পুস্তকেও তা পুনরায় উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত মনে হল, যাতে করে আমাদের প্রতিপক্ষরা তা পুনরায় পড়তে পারে ও সঙ্কলনের প্রতিটি বিষয় আমাদের প্রতিবাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, ফলে অনিচ্ছুক ও তর্কপ্রিয় হয়েও তারা যেন সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের স্পষ্ট শিক্ষা দ্বারা সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে তারা বলে :

[আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্দারের প্রতি আরিউসের যে পত্র ৪র্থ পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সাধু হিলারিউস সেই একই পত্র এই পুস্তকে পুনরায় উপস্থাপন ক’রে তা খণ্ডন করার পর পুত্রের ঈশ্বরত্ব ও পিতার সঙ্গে তাঁর সমসত্তা সংক্রান্ত প্রমাণ করে চলেন।]

৫। [ভ্রান্তমতপন্থীদের বিশ্বাস-সূত্রের প্রথম অংশ] ‘আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করি যিনি একাই অনির্মিত, একাই সনাতন, একাই উৎপত্তিহীন (ক), একাই অমরতার অধিকারী, একাই মঙ্গলময়, একাই প্রতাপশালী, সবকিছুর স্রষ্টা, বিধানের, নবীদের ও নূতন নিয়মের অপরিবর্তনশীল, রূপান্তরের অতীত, ধর্মময় ও মঙ্গলময় নিরূপক ও ব্যবস্থাপক। আমরা এমনটা বিশ্বাস করি যে, এই ঈশ্বর সর্বযুগের পূর্বে সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে জনিত করলেন যাঁর দ্বারা তিনি জগৎ ও সমস্ত কিছু নির্মাণ করেছিলেন; এটাও বিশ্বাস করি যে, তিনি তাঁকে জন্ম দিলেন রূপের দিক দিয়ে নয় কিন্তু সত্যিকারে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে, ফলে সেই পুত্র রূপান্তরের অতীত ও অপরিবর্তনশীল, ঈশ্বরের সিদ্ধতম সৃষ্টজীব কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবদের একজনের মত নন, তাঁর নিজের কর্ম কিন্তু তাঁর অন্যান্য কর্মের একটা নন; বালেন্তিনুস যেভাবে সমর্থন করত যে পুত্র হলেন পিতার সম্প্রসারণ, সেইভাবে নয়; মানিখেউস যেভাবে সমর্থন করত যে পুত্র পিতার সমসত্তা বিশিষ্ট একটা অংশ, সেইভাবেও নয়; সেই সাবেল্লিউসের মতও নয় যে একক

ব্যক্তিকে বিভক্ত করে ও প্রথমজনকে পিতা ও দ্বিতীয়জনকে পুত্র বলে অভিহিত করে; সেই হিয়েরাকাসের মতও নয় যে প্রদীপ থেকে প্রদীপ বা দু'টো শিখা বিশিষ্ট বাতি উপস্থাপন করে; সেইভাবেও নয় যা অনুসারে তিনি আগে ছিলেন ও পরবর্তীকালে পুত্রে সঞ্জাত বা নবীনভাবে সৃষ্ট হলেন, এ এমন অভিমত যা তুমি নিজেই, হে ধন্য পোপ, মণ্ডলীতে ও ভ্রাতাদের সমাবেশে প্রকাশ্যে বারে বারে তাদের নিন্দা করেছিলে যারা তেমন অভিমত অনুপ্রবেশ করায়। বরং, আমরা যেইভাবে বলেছিলাম, সেইভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কালের ও যুগগুলোর পূর্বে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সৃষ্ট হয়েছিলেন, ও পিতা থেকে জীবন ও অস্তিত্ব গ্রহণ করে থাকেন ও সমস্তার অধিকারী সেই পিতা থেকে সমস্ত গৌরবও গ্রহণ করে থাকেন। কেননা যখন পিতা তাঁকে সমস্ত বিষয়ে উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, তখন পিতা, উৎপন্ন নয় যা কিছু তাঁর নিজস্ব অধিকার, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি, কেননা তিনি হলেন সবকিছুর উৎস।’

৬। [ভ্রাতৃমতপন্থীদের বিশ্বাস-সূত্রের বাকি অংশ]। ‘ফলত তিনটে সত্তা রয়েছে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এদিকে, পিতা হলেন সবকিছুর আদিকারণ, উৎপত্তিহীন ও সম্পূর্ণরূপে একাকী; অন্যদিকে, কালের বাইরে পিতা দ্বারা প্রদত্ত, ও যুগগুলোর পূর্বে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত সেই পুত্র জন্ম নেবার আগে ছিলেন না, কিন্তু কালের বাইরে সবকিছুর পূর্বে জন্ম নিয়ে একাই সেই পিতা থেকে একাই অস্তিত্ব পেলেন; কেননা তিনি সনাতনও নন, সহ-সনাতনও নন, পিতার সঙ্গে সহ-অসৃষ্টও নন, পিতার সঙ্গে অস্তিত্বের অধিকারীও নন, যেভাবে কেউ না কেউ বলে থাকে যারা দু'টো সঞ্জাত-নয় এমন আদিকারণ অনুপ্রবেশ করায়। কিন্তু অভিবাজ্য ও সবকিছুর উৎপত্তি হওয়ায় ঈশ্বর সবকিছুর পূর্বেও বিদ্যমান; যার জন্য তিনি পুত্রেরও পূর্বে বিদ্যমান, যেইভাবে আমরা তোমার কাছ থেকে তোমার প্রকাশ্য প্রচারকর্মে শিখেছি। তাই, যেহেতু তিনি [অর্থাৎ পুত্র] ঈশ্বর থেকে অস্তিত্ব, গৌরব ও জীবন প্রাপ্ত ও সবকিছু তাঁর কাছে প্রদত্ত, সেজন্য সেই [পিতা] ঈশ্বর নিজেই তাঁর উৎস, যিনি তাঁর ঈশ্বর হওয়ায় তাঁর উপর আধিপত্য রাখেন যেহেতু তাঁর পূর্বে বিদ্যমান। এবং সেই সমস্ত উক্তি সম্পর্কে যেমন “তাঁর থেকে”, “গর্ভ থেকে”, ও “আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি”, যদি এই উক্তিগুলো এমনটা বোঝায় যে পিতা নিজের অনন্য সত্তার একটা অংশকে ও কেমন যেন নিজের

সম্প্রসারণকে প্রসারিত করেন, তাহলে পিতা এদের অভিমত অনুসারে হবেন যুক্ত, বিভাজ্য, পরিবর্তনশীল ও দেহবিশিষ্ট। তবে, তাদের সমর্থিত তত্ত্ব অনুসারে, যা দেহগত, দেহ-ছাড়া ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছুই বৈশিষ্ট্যসমূহের অধীন হবেন।’

৭। এখানে কেইবা না চিনতে পারে সাপের ঘুরপথের চটচটে কুটিলতা, বা কেইবা কুণ্ডলিত পৈঁচের কারণে দেখতে না পারে চন্দ্রবোড়া জাতীয় সেই গিঁট যা গুটানো দেহের ঘন ঘুর বিষাক্ত দাঁতের মারাত্মক প্রভাব লুকিয়ে রাখে? কিন্তু সমস্ত গিঁট বিস্তৃত করলে ও খুললে সেই সাপের লুকোনো মাথায় সমস্ত বিষ প্রকাশ পাবে। ভ্রান্তমতের বিষ অনুপ্রবেশ করাবার জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের চোখের সামনে সত্যের নানা বাহ্যিক শব্দ দাঁড় করানো হয়। ঠোঁটে মঙ্গল রয়েছে যাতে অন্তর থেকে অমঙ্গল বের হয়। অথচ তাদের সমস্ত উক্তির মধ্যে আমি কোথাও এমনটা শুনি না যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর বলে চিহ্নিত; কোথাও এমনটা পাই না যে সেই পুত্র তাঁর পুত্রত্বের ভিত্তিতে পুত্র বলে ঘোষিত। পুত্র-নামটা আগে আগে উচ্চারিত, কিন্তু তেমনটা হয় যাতে তাঁর স্বরূপের বিষয়ে কিছুই না বলা হয়। [পুত্রের] স্বরূপ অস্বীকৃত যাতে তিনি যে সেই নামের অধিকারপ্রাপ্ত তা বলা যেন এড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য যত ভ্রান্তমতের মুখোশ খুলে ফেলা হয়, কিন্তু এই লক্ষ্যে, যাতে নিজের ভ্রান্তমত লুকিয়ে রাখা হয়। একমাত্র ঈশ্বরের ও একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের কথা বলা হয়, কিন্তু যাতে ঈশ্বরের পুত্রকে তাঁর সত্যকার ও ব্যক্তিগত ঈশ্বরত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৮। পূর্ববর্তী পুস্তকগুলোতে (ক) বিধান ও নবীদের শিক্ষা ভিত্তি করে আমরা এটা প্রমাণ করেছি যে, ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’, ‘সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার ঈশ্বর’ ও ‘সত্যকার ঈশ্বর পিতা ও সত্যকার ঈশ্বর পুত্র’ নামগুলো স্বরূপের ঐক্যে ও ব্যক্তি-একাকীত্বে-নয় এমন স্বীকৃতিতে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বলেই স্বীকৃত হওয়া চাই। কিন্তু বিশ্বাস বিষয়ে নিখুঁত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা উল্লেখ করতে হবে যাতে এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, সত্যকার ঈশ্বর হিসাবে ঈশ্বরের পুত্র পিতার স্বরূপের চেয়ে পরকীয় নয় ও ভিন্ন নয় এমন স্বরূপের অধিকারী, কিন্তু একই ঈশ্বরত্বের অধিকারী, কারণ সত্যকার জন্মসূত্রের ফলেই তিনি অস্তিত্বের অধিকারী। অবশ্যই, আমি

কাউকেই তত বুদ্ধিহীন জ্ঞান করি না যে সে ঈশ্বর দ্বারা তাঁর নিজের বিষয়ে প্রকাশিত সত্য জানবার পর তা মেনে নেবে না; অথবা তা বুঝবার পর সে তা জানাতে অস্বীকার করবে; অথবা সে এমনটা ভাববে, মানব যুক্তি সেই সত্যগুলো পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু এ পরিত্রাণদায়ী রহস্যাদিতে নিহিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করার আগে আমাকে প্রথমে সেই গর্ব খর্ব করতে হয় যা দ্বারা এই ভ্রান্তমতপন্থীরা অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থীদের নাম নিন্দা করে। এইভাবে সেই লুকোনো বিষ উদ্ঘাটিত হবে ও সেই একই উপায় প্রয়োগে প্রকাশিত হবে যা দ্বারা সে ছদ্মবেশ ধারণ করে ও নিজেকে লুকোয়, ফলত সকলের মিলিত চেতনা তার বিষাক্ত চাটুকারিতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

৯। ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা সমর্থন করে যে, ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর থেকে নন ও ঈশ্বর থেকে, ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে ও স্বরূপেও ঈশ্বর বলে সঞ্জাত নন। এই লক্ষ্যেই ‘একমাত্র ঈশ্বরকে, একাই সত্যকার’ তেমন বাক্য স্বীকার করার পর তারা ‘ও পিতাকে’ শব্দদ্বয় যোগ করতে বিরত থাকে। পরে, সত্যকার জন্মের কথা অস্বীকার দ্বারা পিতা ও পুত্রের একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরত্বকে স্বীকৃতি এড়াবার জন্য তারা বলে চলেছিল, ‘বালেস্তিনুস যেভাবে সমর্থন করত যে পুত্র হলেন পিতার সম্প্রসারণ, সেইভাবে নয়’। এইভাবে, বালেস্তিনুসের ভ্রান্তমতের অজুহাতে ‘সম্প্রসারণ’ (ক) শব্দটা প্রত্যাখ্যান করায় তারা ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরের জন্ম প্রত্যাখ্যান করে। বাস্তবিকই সেই বালেস্তিনুস হাস্যকর ও অল্লীল কল্পনার প্রণেতা হয়েছিল; মুখ্য ঈশ্বরের পাশাপাশি সে দেবদেবীর গোটা একটা গোষ্ঠীকে ও ‘অনন্তকালগুলোর’ অসংখ্য আধিপত্যকে (খ) উদ্ভাবন করেছিল ও এমনটা শেখাত যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ছিলেন রহস্যময় একটা ইচ্ছার সম্প্রসারণের ফল। কিন্তু সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত মণ্ডলীর বিশ্বাস দুঃসাহসী ও মূর্খ এক স্বপ্নদর্শীর ক্ষিপ্ততা থেকে উদ্গত তেমন কাল্পনিক সম্প্রসারণ সম্পর্কে কিছুই জানে না। মণ্ডলী বালেস্তিনুসের সেই ‘অতল গহ্বর’ ও ‘নীরবতা’ ও সেই তিনগুণ দশ ‘এওন’ (গ) এর বিষয়ে কিছুই জানে না; যাঁর থেকে সবই হয় একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতাকে ছাড়া ও যাঁর দ্বারা সবই হয়, যিনি ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ঈশ্বর সেই একমাত্র যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া মণ্ডলী কিছুই জানে না। কিন্তু যেহেতু তিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে সঞ্জাত

হওয়ায় নিজের জন্ম দ্বারা ঈশ্বর থেকে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রত্যাহার করেননি ও জন্মলগ্নেও তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছুই ছিলেন না ; আরও, যেহেতু তিনি ঈশ্বর কিন্তু একারণে নয় যে তাঁর ঈশ্বরত্বের সূচনা হয়েছিল কিন্তু এজন্যই যে তিনি ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ; আরও, যেহেতু মানব যুক্তি যতদূর বোঝে সেই অনুসারে যা কিছু জন্ম হয় তা সম্প্রসারণ বলে প্রতীয়মান যার ফলে জন্মও সম্প্রসারণ বলে বিবেচিত ; এসমস্ত বিচার-বিবেচনার জন্যই ভ্রান্তমতপন্থীরা বালেন্তিনুসের ভ্রান্তমত উল্লেখ করল ও [পুত্রের] সত্যকার জন্ম সংক্রান্ত ধারণা বাদ দেওয়ার জন্য ‘সম্প্রসারণ’ শব্দটা উঠিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কেননা পার্থিব মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুসারে ‘সম্প্রসারণ’ এর অর্থ পার্থিব জন্মের অর্থ থেকে তত ভিন্ন নয়। সেই যে মানুষের মন ঐশ্বরিক বিষয়াদি ধারণ করতে ধীর ও স্থূল, সেই মন এমনটা দাবি রাখে যে, আমরা অন্য সময়ে যে যে ধারণা উপস্থাপন করেছিলাম (৬) সেবিষয়ে বার বারই স্মরণ করানো হয়, অর্থাৎ, মানব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া উপমা ঐশ্বরিক প্রতাপের রহস্যাদি বোঝাবার জন্য সিদ্ধ উপায় নয়। পার্থিব ধরনের উদাহরণ শুধু এই লক্ষ্যে ব্যবহৃত যাতে মানুষ স্বর্গীয় বিষয়ের ব্যাপারে আধ্যাত্মিক ভাবে প্রশিক্ষিত হয়, যার ফলে আমাদের প্রকৃতির এই ধরনের অগ্রগতির গুণে আমরা ঐশ্বরিক মর্যাদাকে উপলব্ধিতে উন্নীত হই। কিন্তু, মানব জন্ম যেভাবে হয়, তেমন সম্প্রসারণ-বিশিষ্ট জন্মের সঙ্গে ঈশ্বরের জন্ম বিচার্য নয়। যখন আমরা ‘এক থেকে এক’ ও ‘ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ঈশ্বর’ এর কথা বলি, তখন সেই ধারণার অর্থ উপলব্ধি করার জন্য পার্থিব জন্ম সামান্য একটা উপায় মাত্র। কিন্তু যে পার্থিব জন্ম মিলন, গর্ভধারণ, গর্ভকালীন প্রক্রিয়া ও প্রসব দ্বারা চিহ্নিত, সেই পার্থিব জন্ম যার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে তাতে সিদ্ধ কোন মিল পায় না, কেননা যখন আমরা এমনটা বলি যে ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, তখন ‘সঞ্জাত’ শব্দ বাদে অন্য কিছুই ধারণা করতে নেই। তথাপি আমরা সময় মত (৭) সত্যকার ঐশ্বরিক জন্মের কথা সেইভাবে বিশ্বাস অনুসারে তুলে ধরব যেভাবে সেই বিশ্বাস সুসমাচার দ্বারা ও প্রেরিতদূতদের দ্বারা উপস্থাপিত। তথাপি আপাতত ভ্রান্তমতপন্থীদের চতুরতার নানা উদ্ভাবন দেখানো আমাদের দরকার হয়েছে, কেননা [পুত্রের] সত্যকার জন্ম ধ্বংস করার জন্যই সেই ভ্রান্তমত ‘সম্প্রসারণ’ শব্দটা নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করেছে।

১০। [আরিউসের পত্র] নিজের সেই জঘন্য ও কুটিল চতুরতা রক্ষা করে যা অন্যান্য পদেও তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বিশেষভাবে তখনই যখন পত্রটা বলে চলে, ‘মানিখেউস যেভাবে সমর্থন করত যে পুত্র পিতার সমসত্তা বিশিষ্ট একটা অংশ, সেইভাবেও নয়’। আগে ভ্রান্তমতপন্থীরা সেই ‘সম্প্রসারণ’ পরিত্যাগ করেছিল যাতে করে [পুত্রের অনন্তকালীন] জন্ম অস্বীকৃত হয়; এখন, মানিখেউস নামটার দিকে অঙুলি নির্দেশ ক’রে তারা সেই তত্ত্বও উপস্থাপন করে যা অনুসারে পুত্র হলেন একমাত্র ঐশ্বরিক সত্তার একটা অংশ, ও সেই তত্ত্বকে তারা অস্বীকার করে যাতে করে এমনটা বিশ্বাস না করা যেতে পারে যে ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে। কেননা বিধান ও নবীদের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী, দিয়াবলের পক্ষের তীব্র সমর্থক ও সূর্যের অন্ধ পূজারী সেই মানিখেউস এমনটা ঘোষণা করেছে যে, যা কিছু কুমারীতে ছিল তা ছিল ঐশ্বরিক সত্তার একটা অংশ, ও এটাও সমর্থন করেছে যে, পুত্র বলতে তা-ই বুঝতে হত যা ঈশ্বরের সত্তার একটা অংশ থেকে নেওয়া হয়ে মাংসে আবির্ভূত হল। একমাত্র জনিত পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্মকে ও ‘সমসত্তা’ (ক) শব্দটাও সরিয়ে দেবার জন্য [আরিউসপন্থীরা] এ অজুহাত উপস্থাপন করে যে পুত্রের জন্মে রয়েছে একমাত্র সত্তার বিভাজন। একমাত্র সত্তার বিভাজন জনিত জন্মের কথা বলা একেবারে ও স্পষ্টভাবে ঈশ্বরনিন্দুক কাজ, ও সেজন্য প্রথমে যত ধরনের জন্মকে সেই নিন্দা-ঘোষণায় মিলিত হয় যা তারা সেই বিভাজন-সূত্রে জন্ম-ধারণার প্রতি ঘোষণা করে যা স্বয়ং মানিখেউসেরই ধারণা। পরে সেই ভ্রান্তমতপন্থী সত্তার ঐক্য ক্ষেত্রে নামটা ও বিশ্বাসও অস্বীকার করে, কারণ তাদের মতে জন্মের সঙ্গে ‘বিভাজন’ ধারণাটাই যুক্ত। পুত্র যে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, তারা এটাও অস্বীকার করে, কারণ তিনি যে ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী তা তারা বিশ্বাস করে না। কোন্ কারণেই বা তেমন উন্মত্ত ভ্রান্তমত নিজের উন্মাদ ক্ষিপ্ততাকে ভক্তির মিথ্যা বেশে নকল করে? মণ্ডলীর ভক্তিসম্মত বিশ্বাস মানিখেউসকে সেইভাবে নিন্দা করে যেভাবে সে [আরিউসের] উন্মাদ ভ্রান্তমতও নিন্দা করে। কেননা সেই বিশ্বাস সেই পুত্রতে [ঈশ্বরত্বের] একটা অংশ নয়, কিন্তু তাঁকে পূর্ণ ঈশ্বর থেকে পূর্ণ ঈশ্বর বলে চিনে নেয়; তাঁকে এক থেকে এক, বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু সঞ্জাত বলে চিনে নেয়; [সেই বিশ্বাস] এমনটা চিনে নেয় যে ঈশ্বরের জন্মে জনকের হ্রাসীকরণও জড়িত নয়, সঞ্জাতজনের দুর্বলতাও জড়িত নয়। এটা [মণ্ডলীর] কল্পিত

উদ্ভাবন হলে তবে [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তাকে সুচিন্তিত নয় এমন স্বীকৃতি করার জন্য ভৎসনা কর; অন্যদিকে যদি মণ্ডলী নিজের প্রভু থেকেই এসমস্ত শিক্ষা পেয়ে থাকে, তবে এটা স্বীকার কর যে যিনি জন্ম নেন তিনি জানেন তাঁর জন্ম কেমন করে হয়েছে। পিতা ও পুত্র যে এক, ও পুত্র যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতার অধিকারী (খ), এসমস্ত সত্য স্বয়ং একমাত্র জনিত ঈশ্বরই মণ্ডলীকে জানিয়েছেন। এজন্য মণ্ডলী পুত্র ক্ষেত্রে একমাত্র সত্তার বিভাজন ধারণাটা প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁর রাজকীয় জন্ম ক্ষেত্রে পুত্রতে সেই সত্যকার ঈশ্বরত্ব আরাধনা করে যা সেই পুত্রের অধিকার। কিন্তু এসমস্ত বিষয় সংক্রান্ত গভীরতর ব্যাখ্যা আপাতত পাশে রেখে, এসো, অন্য বিষয় পরীক্ষা করতে শীঘ্রই অগ্রসর হই।

১১। [ভ্রান্তমতপন্থীদের বিশ্বাস-সূত্রের] পরবর্তী উক্তি এ, ‘সেই সাবেল্লিউসের মতও নয় যে একক ব্যক্তিকে পৃথক করে ও প্রথমজনকে পিতা ও দ্বিতীয়জনকে পুত্র বলে অভিহিত করে’। এইভাবে চিন্তা করায় সাবেল্লিউস সুসমাচার ভিত্তিক ও প্রৈরিতিক রহস্যময় সত্য বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন নয় যে, একজন ভ্রান্তমতপন্থী ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা সরল মনে নিন্দিত হচ্ছে। যেহেতু এরা এমনটা সমর্থন করে যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্বরূপের ঐক্য বলতে আদৌ কিছুই নেই, সেজন্য একক ব্যক্তিকে বিভাজন করায় সাবেল্লিউস যে ভুল করেছে এরা সেই ভুলই নিন্দা করে; বিভাজনটা এমন যার ফল [দ্বিতীয় একটা ব্যক্তির] জন্ম নয়, কিন্তু এমন যা সেই একক ব্যক্তিকে দু’টো অংশে বিচ্ছিন্ন করে ও সেই দু’টো অংশের একটাকে কুমারীতে স্থান দেয়। কিন্তু আমরা যা স্বীকার করি, তা হলো সেই জন্ম; ও একক ব্যক্তিতে দু’টো ব্যক্তির উপস্থিতি প্রত্যাখ্যান করতে করতে ঈশ্বরের ঐক্য সমর্থন করি; অর্থাৎ, আমরা এমনটা সমর্থন করি যে, ‘এক থেকে এক’ বলতে স্বরূপের ঐক্য বোঝায়, কারণ যে জীব ছিলেন ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বর থেকে সত্যকার জন্মের গুণে ঈশ্বর থেকে ছাড়া অন্য কোন বিষয় থেকে নিজের সত্তা গ্রহণ করতে পারেননি। উপরন্তু, যিনি অন্য কোন বিষয় থেকে নয় কিন্তু কেবল ঈশ্বর থেকেই জীবনপ্রাপ্ত, তিনি অবশ্যই সেই সত্যকার স্বরূপে জীবনযাপন করেন যে স্বরূপে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান; এবং এজন্য [পিতা ও পুত্র] এক, কারণ ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর যিনি, তাঁর অন্য কোন স্বরূপও নেই, ঐশ্বরিক উৎপত্তি ছাড়া তাঁর অন্য কোন উৎপত্তিও নেই। কিন্তু [আরিউসপন্থীদের দ্বারা] একক ব্যক্তিতে দু’টো ব্যক্তির উপস্থিতি

সংক্রান্ত সাবেল্লিউসের সেই ভুল প্রদর্শিত, কারণ তারা মণ্ডলীকে ঐক্য সংক্রান্ত বিশ্বাস বিষয়ে বঞ্চিত করতে চায়। তারপর আমি ভ্রান্তমতপন্থীদের চাতুরির অন্যান্য উদ্ভাবন তদন্ত করব যাতে আমাকে পরের সরলতার নিন্দুক মনা বিচারকর্তা বলে গণ্য করা না হয় ও এমন অভিযোগ যেন আমার উপর আরোপ করা না হয় যে, সত্যের চেয়ে আমি আমার নিজস্ব ধারণারই বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করি। তাদের গোটা বিশ্বাস-সূত্রের শেষ সূত্রগুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে আমি এমনটা দেখাব, তারা যা কুটিলভাবে বানিয়েছিল, সেই সমস্ত ধারণা থেকে কেমন ফলাফল অনিবার্য।

১২। [ভ্রান্তমতপন্থীদের বিশ্বাস-সূত্রের] পরবর্তী উক্তি এ, ‘সেই হিয়েরাকাসের মতও নয় যে প্রদীপ থেকে প্রদীপ বা দু’টো শিখা বিশিষ্ট বাতি উপস্থাপন করে; সেইভাবেও নয় যা অনুসারে তিনি আগে ছিলেন ও পরবর্তীকালে পুত্রে সঞ্জাত বা নবীনভাবে সৃষ্ট হলেন’। হিয়েরাকাস একমাত্র জনিতজনের জন্মের কথা বাদ দেয়, ও সুসমাচার ভিত্তিক প্রকাশের পরাক্রম মূল্যায়ন না করে একমাত্র প্রদীপের দু’টো শিখার কথা উপস্থাপন করল। একমাত্র বাটির তেলের সরবরাহ করা তেমন প্রতীকশীল শিখা দু’টোই হলো পিতা ও পুত্রের সত্তা বিষয়ে তার ধারণার উদাহরণ। এ এমন, যেন প্রদীপের সেই তেলের মত এমন একটা বহিঃস্থ সত্তা রয়েছে যা সেই দু’টো শিখার স্বরূপ ধারণ করে; অথবা যেন একই পদার্থের একটা মশাল রয়েছে যা দুই প্রান্তে জ্বলন্ত ও তার মধ্যবর্তী উপাদান নিজের ত্রিক্রিয়াকর্মে সেই শিখা দু’টোর জন্য পুষ্টি যোগায়। এসমস্ত কিছু হলো সেই মানব মূর্খতার বিভ্রম যা জ্ঞান অর্জনের জন্য ঈশ্বরের উপরে নয়, নিজের উপরেই আস্থা রাখে। কিন্তু সত্যকার বিশ্বাস এটা স্বীকার করে যে, ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে আলো থেকে আলোই যেন জন্ম নিলেন, ও তেমন আলো নিজের কোন হ্রাসীকরণ ছাড়াই নিজ থেকে নিজের স্বরূপ ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে সেই আলো যা বিষয়ে অধিকারী তা-ই দান করে কিন্তু যা দিতে থাকে সেটার অধিকারী হয়ে থাকে; [সত্যকার বিশ্বাস] এটাও স্বীকার করে যে, [পিতাতে] যা অজনিত, পুত্রে তা-ই জন্ম নেয়, কারণ পিতাতে যা অজনিত, তা ছাড়া পুত্রে অন্য কিছুই জন্ম নেয়নি (ক)। পিতাতে যা অজনিত ছিল পুত্র তা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু যা গ্রহণ করেছেন তা [পিতা থেকে] অপসারণ করেননি। উভয় এক, কারণ যিনি জন্ম নেন তিনি সে-ই থেকে জন্ম নেন যিনি আছেন, ও সে-ই [অর্থাৎ সেই পিতা] থেকে

ছাড়া তিনি অন্য কোথা থেকে উৎপন্ন নন, তিনি ভিন্ন স্বরূপেরও অধিকারী নন, কেননা তিনি হলেন আলো থেকে আলো। তেমন সত্যকার বিশ্বাস থেকে মানুষের বিশ্বাস সরিয়ে দেবার জন্য, হিয়েরাকাস যা বিষয়ে কথা বলে, সেই মশাল বা সেই প্রদীপকে তাদেরই ভুল বলে প্রতিনিন্দা করা হয় যারা ঈশ্বরকে আলো থেকে আলো বলে স্বীকার করে। যেহেতু সেই উদাহরণ ভ্রান্তিজনক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ও বর্তমানকালে ও অতীতকালেও ভুল বলে নিন্দিত হয়েছে, সেজন্য তারা এমনটা চায় না সেই উদাহরণ সত্যাপ্রয়ী বলে গণ্য হোক। দূর হও, দূর হও হে ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তিহীন আতঙ্ক; যা তুমি সমর্থন করতে যত্নবান, সেই মিথ্যা ধারণাধারা দ্বারা নিজেকে মণ্ডলীর বিশ্বাসের পৃষ্ঠপোষক করো না। আমরা দৈহিক কোন কিছুকে, প্রাণহীন কোন কিছুকেই ঈশ্বরের গুণাবলির মধ্যে স্থান পেতে দিই না: যিনি ঈশ্বর, তিনি পূর্ণরূপে ঈশ্বর। তাঁর মধ্যে পরাক্রম ছাড়া, জীবন ছাড়া, আলো ছাড়া, সুখ ছাড়া, আত্মা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। সেই স্বরূপে চেতনাহীন বস্তুগত উপাদান বলতে কিছুই নেই, সেই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত নয়, সেই স্বরূপ অপরিবর্তনশীল: ঈশ্বর হওয়ায় ঈশ্বর যা, তিনি তা অপরিবর্তনশীল ভাবে হয়ে থাকেন, ও নিজের অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরত্বে তিনি [পুত্র] ঈশ্বরকে জনিত করলেন। প্রদীপের সেই শিখা দু'টো বা মশালের সেই সলিতা দু'টো যেমন, পিতা ও পুত্র সেইমত বহিঃস্থ কোন পদার্থ দ্বারা যুক্ত নন। ঈশ্বর থেকে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্মটা স্থানে বিস্তৃত ধারাবাহিকতা নয়, সেই জন্ম প্রকৃতপক্ষে প্রজননই; তা সম্প্রসারণও নয়, কিন্তু আলো থেকে আলো। কেননা আলোর ঐক্য হলো স্বরূপেরই ঐক্য, তা সংযুক্ত নানা পদার্থের সম্প্রসারণ নয়।

১৩। লক্ষ কর, ভ্রান্তমতপন্থীদের স্বীকারোক্তি কেমন চতুরতা ও চালাকিতে পূর্ণ; [পুত্রকে সৃষ্টি বিষয়ে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে] ‘সেইভাবেও নয় যা অনুসারে তিনি আগে ছিলেন ও পরবর্তীকালে পুত্রে সঞ্জাত বা নবীনভাবে সৃষ্ট হলেন’। যিনি ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত হলেন সেই ঈশ্বর অবশ্যই শূন্য থেকে সঞ্জাত হননি; অস্তিত্বশীল নয় এমন কিছু থেকেও সঞ্জাত হননি, কিন্তু তাঁর জন্ম এমন ছিল যা জীবনময় স্বরূপ অনুযায়ী। যিনি জন্ম নিলেন সেই একই ঈশ্বর নন যিনি ছিলেন, কিন্তু তিনি যিনি ছিলেন, সেই ঈশ্বর থেকেই তিনি ঈশ্বর রূপে জন্ম নিলেন; ও তাঁর জন্মলগ্নে তাঁর সেই জন্ম তাঁরই স্বরূপের সহভাগী

হল যিনি তাঁকে উৎপন্ন করলেন। যদি আমরা নিজেদের কথার অধিকারের জোরেই কথা বলতাম তবে দুঃসাহসী হতাম; অপরদিকে আমরা যদি এমনটা দেখাতে পারব যে ঈশ্বর নিজেই আমাদের শিখিয়েছেন কেমন করে আমাদের কথা বলতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের জন্ম অবশ্যই সেই অর্থে স্বীকৃত হতে হয় যে অর্থ ঈশ্বর নিজে আমাদের জানিয়েছেন। ভ্রান্তমতপন্থীদের উন্মাদ ক্ষিপ্ততা পিতাতে ও পুত্রতে স্বরূপের এই ঐক্যকে ও জীবনময় জন্মের অনির্বচনীয় রহস্যকে বাতিল করতে সচেষ্ট হয়ে বলে, ‘তাঁকে সেইভাবেও নয় যা অনুসারে তিনি আগে ছিলেন ও পরবর্তীকালে পুত্র হবার জন্য সজ্জাত বা নবীনভাবে সৃষ্ট হলেন’। কেইবা এতই বোধশূন্য হবে যে এমনটা ভাববে, পিতা নিজেকে হতে বন্ধ করবেন? অথবা কেইবা এমনটা ভাববে, যিনি আগে ছিলেন তিনি পরবর্তীতে জন্ম নিলেন বা নবীনভাবে পুত্র বলে সৃষ্ট হলেন? এবং কেইবা এমনটাও ভাববে, ঈশ্বরের অন্তর্ধান হল যাতে তাঁর সেই অন্তর্ধানের স্থানে একটা জন্ম স্থান পেতে পারে যেহেতু জন্ম এমনটা সমর্থন করে যে, জন্মের একজন প্রণেতা থাকা চাই? অথবা কেইবা এতই উন্মাদ হবে যে এমনটা মেনে নেবে যে জন্মের মধ্য দিয়ে ছাড়া একটা পুত্র হবে? যুক্তিহীন আর কেইবা থাকতে পারে যে এমনটা সমর্থন করতে দুঃসাহস করবে যে, যেহেতু তিনি ঈশ্বররূপে জন্ম নেন সেজন্য তিনি ঈশ্বররূপে বিদ্যমান ছিলেন না? যিনি ঈশ্বররূপে জন্ম নিলেন তিনি যে ঈশ্বররূপে বিদ্যমান ছিলেন তা নয়, কিন্তু যিনি ঈশ্বররূপে তাঁরই থেকে জন্ম নিলেন যিনি আগে ঈশ্বররূপে বিদ্যমান ছিলেন ও [জন্মলগ্নে] তিনি নিজেতে জনকের স্বরূপ বজায় রাখলেন যেহেতু [জনকের] একই স্বরূপে জন্ম নিলেন। যে ঐশ্বরিক জন্ম ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরের অভ্যন্তরে হয়, সেই জন্ম এমন কিছু সঙ্গে করে বহন করে না যা আগে ছিল না, কিন্তু সত্যকার জন্ম গুণে সেই গুণাবলি বজায় রাখে যা ঈশ্বরেরই অধিকার ছিল ও তাঁরই অধিকার হয়ে থাকে। সুতরাং যিনি ছিলেন তিনি যে জন্ম নিলেন তা নয়, কিন্তু যে ঈশ্বর জন্ম নিলেন তিনি অস্তিত্বপ্রাপ্ত হলেন সেই গুণাবলি-সহ ও সেই গুণাবলিতে যা ছিল ঈশ্বরের অধিকার। ভ্রান্তমতের চতুরতার সেই যে দীর্ঘ পূর্বালোচনা বিষয়ে আমরা উপরে কথা বলেছি, সেই পূর্বালোচনাই এই ভুক্তিহীন মতবাদের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে। একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে অস্বীকার করার লক্ষ্যে সেই পূর্বালোচনা, বলতে গেলে, সত্যময় একটা ধারণা উপস্থাপন করতে শুরু করে যাতে

পরে এটা সমর্থন করতে পারে যে, পুত্রের জন্ম অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টির এমন ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায় তিনি ঈশ্বর থেকে নয় কিন্তু শূন্য থেকে জন্ম নিলেন।

১৪। আরও, তত সংখ্যক কথার পর কেমন যেন লক্ষ্যের জন্য সূক্ষ্ম ভাবে প্রস্তুত করা ফাঁক থেকে বের হয়ে ভ্রান্তমত একথা ছোঁড়ে, ‘পুত্র কালের বাইরে [পিতা দ্বারা] প্রদত্ত, ও যুগগুলোর পূর্বে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত সেই পুত্র জন্ম নেবার আগে ছিলেন না’। ভ্রান্তমত মনে করে যে, সে নিজের কথা এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে নিজের অভক্তিও সপ্রমাণ করতে পারত ও নিজের ঈশ্বরনিন্দাও ন্যায়সঙ্গত বলে সাব্যস্ত করতে পারত যদি ‘পুত্র জন্ম নেবার আগে ছিলেন না’ উক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হত। [পুত্র] যে জন্ম নেবার আগে ছিলেন না, তেমনটা বলায় ভ্রান্তমত তাঁর সনাতন উৎপত্তির স্বরূপ অস্বীকার করতে ও তেমনটাও বলতে অভিপ্রায় করত যে, জন্মের আগে যাঁর কাছে অস্তিত্ব প্রদত্ত হয়নি তিনি অবশ্যই শূন্য থেকেই অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। তাছাড়া, যদি একথা ভক্তিহীন বলে গণ্য হত, তাহলে ভ্রান্তমত এবিষয়ে প্রস্তুত করা একটা উত্তর হাতে রাখতে অভিপ্রায় করত, তথা, যিনি ছিলেন তিনি জন্ম নিতে পারতেন না, ও যিনি আগে থেকে বিদ্যমান ছিলেন, বিদ্যমান হবার জন্য তাঁর পক্ষে জন্ম নেবার কোন কারণ থাকত না, কারণ জন্ম-ধারণাটা এমনটা দাবি করে যে, যে জন্ম নেয় সে অস্তিত্বে প্রবেশ করবে। হে নির্বোধ ও ভক্তিহীন, যখন এমন একজনের কথা বলা হচ্ছে যিনি জন্ম ছাড়া সনাতন হয়ে বিদ্যমান, তখন সেক্ষেত্রে কেইবা জন্মের কথা প্রত্যাশা করবে? অথবা, আমরা কেমন করে এমনটা বিশ্বাস করতে পারি যে, যিনি আছেন তিনি জন্ম নেবেন যখন জন্মলাভ জন্ম নেওয়ার প্রক্রিয়া দাবি করে? অথচ তুমি আপন পিতা ঈশ্বর থেকে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম ধূর্তভাবে অস্বীকার করতে সচেষ্ট হতে হতে ‘তিনি জন্ম নেবার আগে ছিলেন না’ বলায় এই সত্য এড়াতে চাইলে যা অনুসারে যাঁর থেকে ঈশ্বরের পুত্র জন্ম নিলেন সেই ঈশ্বর ইতিমধ্যে ছিলেন, ও জন্মসূত্রে পুত্র যে স্বরূপ থেকে ঈশ্বররূপে বিদ্যমান, ঈশ্বরের সেই স্বরূপ সনাতন। তবে যখন [পুত্র] ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, তখন এটা মেনে নেওয়া দরকার যে তাঁর জন্ম সনাতন স্বরূপে হয়েছে, এই অর্থে নয় যে, যিনি ছিলেন তিনি জন্ম নিলেন, কিন্তু এই অর্থে যে, যিনি ছিলেন, সেই ঈশ্বর থেকেই [পুত্র] ঈশ্বর জন্ম নিলেন।

১৫। কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীদের ফুটন্ত আগ্রহ নিজের ভক্তিহীন উগ্রতা সংযত রাখতে পারে না। ‘জন্ম নেবার আগে তিনি ছিলেন বা ছিলেন না’ এবচনকে নির্দেশ ক’রে তারা এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করতে করতে যে [পুত্র] শূন্য থেকে জন্ম নিলেন অর্থাৎ তিনি সত্যকার ও সিদ্ধ জন্ম দ্বারা পিতা ঈশ্বর থেকে পুত্র ঈশ্বর রূপে জন্ম নেননি, তারা ঠিক গোটা দলিলের শেষাংশেই নিজেদের ঈশ্বরনিন্দাজনক ক্ষিপ্ততার অধিক ভক্তিহীন শিখা বিস্তারিত হতে দেয়। তারা বলে, ‘সেই সমস্ত উক্তি সম্পর্কে যেমন “তঁার থেকে”, “গর্ভ থেকে”, ও “আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি”, যদি এই উক্তিগুলো এমনটা বোঝায় যে পিতা নিজের অনন্য সত্তার একটা অংশকে ও কেমন যেন নিজের সম্প্রসারণকে প্রসারিত করেন, তাহলে পিতা এদের অভিমত অনুসারে হবেন যুক্ত, বিভাজ্য, পরিবর্তনশীল ও দেহবিশিষ্ট। তবে, তাদের সমর্থিত তত্ত্ব অনুসারে, যা দেহগত, দেহ-ছাড়া ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছুই বৈশিষ্ট্যসমূহের অধীন হবেন’। অভক্তি যত স্পর্ধা করত যদি যুক্তি তত বিবেচক হত, তবে ভ্রান্তমতের মিথ্যা-মিথ্যির বিরুদ্ধে সত্যকার বিশ্বাস রক্ষা করা ভারী ও অধিক কঠিন কাজ হত; কিন্তু এটাই সৌভাগ্য যে, তাদের যুক্তির অভাব-ই তো ভ্রান্তমতের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে, যদিও মূর্খতার যুক্তি খণ্ডন করা সহজ, তবু মূর্খদের সংশোধন করা কঠিন। কেননা এরা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খোঁজ করে না ও, দ্বিতীয়ত, যখন তেমন ব্যাখ্যা এমন একজন দ্বারা উপস্থাপিত যে তা খুঁজে পেয়েছে, তখন এরা তা মানে না। কিন্তু এমন কেউ না কেউ থাকলে যারা নিজস্ব পূর্বধারণা প্রণোদিত অভক্তিময় ইচ্ছা দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরভীতি দ্বারা ও সত্য অজ্ঞতা দ্বারা ভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়েছে, আমি এতে আশ্রয়ান যে, তারা নিজেদের সংশোধন করতে ইচ্ছুক হবে, কারণ সত্য-প্রদর্শন অখণ্ডনীয় ভাবে প্রমাণ করবে যে, ভ্রান্তমত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৬। তোমাদের প্রজ্ঞা যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, হে মূর্খ, তেমনটা না জেনে তোমরা বলেছ ও এখনও বলতে থাক ‘সেই সমস্ত উক্তি সম্পর্কে যেমন “তঁার থেকে”, “গর্ভ থেকে”, ও “আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি” [ইত্যাদি]’ (ক)। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এসমস্ত কথা কি ঈশ্বর দ্বারা উচ্চারিত কথা, নাকি তঁার দ্বারা উচ্চারিত কথা নয়? অবশ্যই সেই কথাগুলো ঈশ্বর দ্বারা উচ্চারিত; এবং যেহেতু সেই কথাগুলো ঈশ্বর দ্বারা

নিজেরই বিষয়ে উচ্চারিত কথা, সেজন্য এটা আবশ্যিক যে, কথাগুলো যে অর্থে উচ্চারিত হয়েছিল, তা ভিন্ন নয় এমন অর্থেই ব্যাখ্যা করা চাই। আমরা যথাস্থানে, অর্থাৎ প্রতিটি কথা সংক্রান্ত সঠিক অর্থ স্পষ্ট করার পরেই সেই কথাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব (খ)। আপাতত আমি প্রতিটি পাঠকের বুদ্ধির কাছে এ প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছা করি, সে ‘তাঁর থেকে’ কথার অর্থ সম্পর্কে কী বোঝে? এটাই কি বুঝতে হবে যে তিনি বলতে চান ‘অন্য কারও কাছ থেকে’ বা ‘শূন্য থেকে’? নাকি এটাই বুঝতে হবে যে তিনি ‘একই ব্যক্তি’ বলতে চাচ্ছিলেন? ‘অন্য কারও কাছ থেকে’ অর্থটা ধরে নিতে নেই, কারণ ‘তাঁর থেকে’ কথাটা [পুত্রের] সেই ঈশ্বরত্বকে বোঝায় যা ঈশ্বর থেকে ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে আসে না। ‘শূন্য থেকে’-ও বুঝতে নেই, কারণ ‘তাঁর থেকে’ কথার মধ্য দিয়ে তাঁরই স্বরূপ নির্দেশিত যা থেকে তাঁর জন্ম হয়। ‘একই ব্যক্তি’-ও বুঝতে নেই, কারণ ‘তাঁর থেকে’ কথার মধ্য দিয়ে পুত্রের জন্ম পিতার কাছে ফিরিয়ে আনা হয়। যখন ‘গর্ভ থেকে’ কথাটা পাই, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি: যখন তাঁর জন্মের সত্য এমন কথা দ্বারা চিহ্নিত যা দেহ-বিশিষ্ট একজনের কর্ম নির্দেশ করে, তখন এমনটা কি বিশ্বাস করা যেতে পারে যে তিনি শূন্য থেকে জন্ম নিলেন? পুত্রের প্রজননের কথা ইঙ্গিত ক’রে যিনি বলেন আমি তোমাকে প্রভাতী তারার আগে গর্ভ থেকে জনিত করলাম (গ), সেই ঈশ্বর তো দৈহিক অঙ্গ দিয়ে গঠিত নন; বরং, যেহেতু তিনি এবিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করতে চান যে, সেই একমাত্র জনিত পুত্র তাঁর নিজের [তথা পিতার] সত্যকার ঈশ্বরত্বের সহভাগী হয়ে তাঁর নিজ থেকে [তথা পিতা থেকে] অনির্বচনীয় ভাবে জন্ম নিয়েছেন, সেজন্য তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করেন যা আমাদের বুদ্ধিকে সাহায্য দিতে পারে। তেমনটা এজন্যই ঘটে যে, তিনি মানব স্বরূপের গুণাবলির কথা ভেবে নিজের ঐশ্বরিক বিষয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস উপলব্ধি করার জন্য মানুষের কার্যক্ষমতাকে প্রশিক্ষিত করতে ইচ্ছা করেন; আবার, তেমনটা এজন্যও ঘটে যে, ‘গর্ভ থেকে’ বলায় তিনি এটা বোঝাতে ইচ্ছা করেন যে, শূন্য থেকে কোন সৃষ্টি হয়নি, বরং তাঁর নিজ থেকে একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম সত্যকারই জন্ম। অবশেষে, ‘আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি’ (ঘ) বাক্যটা এমন সন্দেহ জাগায় কি যে, [পুত্রের] ঈশ্বরত্ব পিতা থেকে নয় কিন্তু অন্য কোন উৎস থেকে হয়? যেহেতু তিনি পিতা থেকে বেরিয়েছেন, সেজন্য তিনি পিতার স্বরূপের সমান

স্বরূপের অধিকারী হলেন ও তেমন স্বরূপ বাদে অন্য কোন স্বরূপের অধিকারী হননি ; কিন্তু তিনি এ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, যাঁর থেকে তিনি বেরিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন, সেই তিনিই ছিলেন তাঁর নিজের প্রণেতা। এবিষয়ে সংক্রান্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেওয়া হবে।

১৭। কিন্তু ইতিমধ্যে এসো, এমনটা দেখি, ঈশ্বর বিষয়ে কেমন করে মানব স্পর্ধা সেই সাক্ষ্যসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে যেগুলো অস্বীকার করা যায় না যেহেতু ঈশ্বর নিজেই নিজের বিষয়ে সেই সাক্ষ্যগুলো দান করলেন। হে মানব মূর্খতা ও দন্তের সর্বোচ্চ অপমান যা ঈশ্বরের নিজের দেওয়া আত্মপ্রকাশ বিশ্বাস না করার দায়ে ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করে শুধু নয়, কিন্তু তা সংস্কার করায়ও তাঁকে দণ্ডিত করে ও তাঁর অভ্যন্তরে নিহিত তাঁর স্বরূপ ও পরাক্রমের অনির্বচনীয় রহস্য দূষিত করে ও নিতান্ত মানবীয় কল্পনা দ্বারা সেই রহস্যকে বিচারমঞ্চে আনে এবং এধরনের কথা উচ্চারণ করতে দুঃসাহস করে তথা, ‘যদি পুত্র ঈশ্বর থেকে হন, তাহলে ঈশ্বর পরিবর্তনীয় ও দেহবিশিষ্ট, কারণ তিনি নিজের সত্তা পুত্রতে প্রসারিত ও বিকশিত করেছেন’। তুমি কেন ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীলতা নিয়ে তত ব্যস্ত? আমরা সেই জন্ম স্বীকার করি, আমরা সেই একমাত্র জনিতজনকে ঘোষণা করি কারণ ঈশ্বর তা-ই আমাদের শিখিয়েছেন। তুমি সেই জন্ম বাদ দেওয়ার জন্য ও সেই একমাত্র জনিতজনকে মণ্ডলীর বিশ্বাস থেকে বহিস্কৃত করার জন্য প্রতিবাদ কর এটাই সমর্থন ক’রে যে, ঈশ্বরের স্বরূপ অপরিবর্তনশীল ও তা নিজেকে প্রসারিত করতে পারে না, বিকশিতও করতে পারে না। হে দুর্ভাগা ভুলভ্রান্তি, জন্ম যে সম্প্রসারণ তোমার তেমন যুক্তি প্রত্যাখ্যান করার জন্য ও জনকের হ্রাসীকরণ ছাড়াই যে একটা জীব অস্তিত্বে আসতে পারে না তোমার তেমন অনুমান খণ্ডন করার জন্য আমি এজগতের নানা প্রাণীরও জন্ম বিষয়ক কতগুলো উদাহরণ তোমাকে দেখাতে পারতাম, এমনকি দৈহিক সংসর্গ ছাড়া একটা প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে স্থানান্তরিত জীবন বিষয়ক বহু উদাহরণও রয়েছে যা আমি দেখাতে পারতাম যদি না যখন ঈশ্বর নিজের বিষয়ে কথা বলেন তখন তাঁকে বিশ্বাস না করা অভক্তিময় আচরণ হত ও জীবন অর্জনের জন্য তুমি যে বিশ্বাসের প্রতি সম্মান স্বীকার কর, সেই বিশ্বাসকে অধিকার বিহীন করা মূর্খতা বলে বিবেচিত হত। কেননা, যখন কেবল ঈশ্বর দ্বারাই জীবন হয়, তখন তাঁর কাছ থেকে

যে জীবনদায়ী বিশ্বাস হয় না, তা কেমন সম্ভব হতে পারে? জীবনদায়ী বিশ্বাস কেমন করে এমন একজনের মধ্যে থাকতে পারে যিনি নিজের বিষয়ে অবিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী বলে গণ্য?

১৮। কেননা, হে অধিক ভক্তিহীন ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি তো পুত্রের জন্মকে সৃষ্টিশক্তিমণ্ডিত একটা ইচ্ছার উপরে আরোপ কর, অর্থাৎ তুমি এমনটা বলতে চাও যে তিনি ঈশ্বর থেকে জন্ম নেননি কিন্তু তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার ইচ্ছার ফলেই অস্তিত্ব পেয়েছেন। আরও, যেহেতু একমাত্র ঈশ্বর আছেন, সেজন্য তোমার মতে পুত্র জন্ম নিয়ে তাঁর নিজের উৎপত্তির স্বরূপ বজায় রাখতে পারেন না। তুমি তো বল, একমাত্র জনিতজন হিসাবে তিনি অন্যান্য সৃষ্টজীব ও নির্মিত বস্তুর চেয়ে উর্ধ্বতর হয়েও তবু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি ঐশ্বরিক সত্তার চেয়ে ভিন্ন এমন সত্তা গ্রহণ করেছেন। তুমি এমনটা বল যে, তিনি সৃষ্ট হয়েছেন, জগৎ সৃষ্টি করার যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তিনি নিজের দিক দিয়ে তা পালন করতে পারেন, কিন্তু তাঁর জন্ম তাঁকে ঐশ্বরিক স্বরূপকে প্রদান করেনি। তোমার মতে, তিনি এই অর্থেই জন্ম নিলেন যে, তিনি শূন্য থেকে [অস্তিত্বশীল!] হয়েছেন; তুমি তাঁকে পুত্র বলে ডাক, তিনি যে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত হয়েছেন এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। কেননা তুমি সেই ভক্তপ্রাণ লোকদের কথা স্মরণ করাও যারা ঈশ্বর দ্বারা এই [পুত্র] নামে অভিহিত হতে যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল। উপরন্তু তুমি তো তাঁকে ঈশ্বর নামটা এমন অর্থে আরোপ কর যা ‘আমি বলেছি: তোমরা ঈশ্বর ও তোমরা সবাই পরাৎপরের পুত্র’ (ক) বচনের অর্থ থেকে ভিন্ন নয়; এইভাবে তিনি স্বরূপগত অধিকারসূত্রে নয়, কিন্তু নামদাতার প্রসন্নতার খাতিরেই সেই নাম বহন করেন; এবং তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে তিনি দত্তক ভিত্তিতেই পুত্র, তিনি নাম প্রদানের ভিত্তিতেই ঈশ্বর, অনুগ্রহের গুণেই একমাত্র জনিতজন, কালের দিক দিয়েই প্রথমজাত, সবদিক দিয়ে সৃষ্টজীব, ঈশ্বর মোটেই না। কেননা এইভাবে তাঁর প্রজনন সত্যকার অর্থে ঈশ্বর থেকে জন্ম হয়নি, কিন্তু তা হলো কোন একটা সৃষ্ট সত্তার জীবনের আরম্ভ।

১৯। এবং এখন, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমি সর্বপ্রথমে আমার অতিরিক্ত ক্ষোভের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, ও যাচনা করি তুমি যেন আমাকে তোমার সম্মুখে কথা

বলতে দাও ; মাটি ও ছাই যে আমি, তোমার ভালবাসার ধর্মে আবদ্ধ সেই আমাকে এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করার স্বাধীনতা দান কর। এমন সময় ছিল যখন আমি আমার হীনাবস্থায় কিছুই ছিলাম না, এবং জীবন-বোধহীন ও নিজের সম্পর্কে চেতনাহীন হয়ে আমার ব্যক্তিত্ববোধের হানি ভুগছিলাম। তোমার করুণাই হলো জীবনের উদ্দেশে আমার জন্মের কারণ, এবং এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে তোমার মঙ্গলময়তায় তুমিই আমার জন্মকে আমার মঙ্গলার্থে নিরূপণ করেছ। যাঁর পক্ষে আমার কোন প্রয়োজন নেই, সেই তুমি এটা আদৌ হতে দিতে না যে আমার জীবনের আরম্ভ হবে অমঙ্গলেরই আরম্ভ ; এমনকি, আমার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করার পর ও আমাকে যুক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানও মঞ্জুর করার পর তুমি তোমার দাসদের তথা মোশি ও নবীদের লেখা পবিত্র পুস্তকাদির মধ্য দিয়ে তোমার নিজের বিষয়ে জ্ঞানে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছ। তাঁদেরই দ্বারা তুমি এমনটা প্রকাশ করেছ যে, আমাদের তোমাকে উপাসনা করতে হবে, কিন্তু একাকী ঈশ্বর বলে নয়। সেই পুস্তকেই আমি এটা জানতে পেরেছি যে, স্বরূপে ভিন্ন নন কিন্তু তোমার সত্তার রহস্যক্রমে এক এমন ঈশ্বর তোমার সঙ্গে ছিলেন। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি ঈশ্বরে ঈশ্বর, মিশ্রণের ফলে একীভূত নন কিন্তু তোমার স্বরূপের সর্বশক্তিমত্তা গুণে, কারণ যিনি তোমা থেকে উদ্ভূত, তাঁর মধ্যে তোমার ঈশ্বরত্ব রয়েছে : তুমি তাঁর মধ্যে বর্তমান, কিন্তু একই ব্যক্তি নন, বরং সিদ্ধ জন্ম বিষয়ক সত্য আমাতে এশিক্ষা দিত যে, যিনি তোমা থেকে ছিলেন, তুমি তাঁর মধ্যে ছিলে। সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের কণ্ঠ এখনও এসমস্ত কথা আমাকে বলতে থাকে ; ও তোমার একমাত্র জনিতজনের পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত ও পবিত্র পুস্তকগুলোতে সংরক্ষিত বাণীসকল এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে যে, যাঁর জন্ম সম্ভব নয় সেই ঈশ্বর থেকে তথা তোমা থেকেই উদ্ভূত একমাত্র জনিত ঈশ্বর যিনি, তোমার সেই পুত্র আমার পরিত্রাণ-রহস্যের লক্ষ্যে কুমারী থেকে মানুষ রূপে জন্ম নিলেন। তিনি নিজেতে তোমাকে ধারণ করেন, কারণ তুমি তাঁকে প্রকৃতিরূপেই তোমা থেকে জনিত করেছ, ও তোমাতে যিনি বসবাস করেন তুমি তাঁকে ধারণ কর কারণ তিনি তোমা থেকে তোমার স্বরূপে সঞ্জাত।

২০। অনুনয় করি, আশাহীন এই যে অতল গহ্বরে তুমি আমাকে নিমজ্জিত করেছ, সেটা কী? কেননা আমি এসবকিছু শিখেছি, বিশ্বাস করেছি ও রক্ষা করেছি হৃদয়ে এমন দৃঢ়

বিশ্বাসের সঙ্গে যা আমি অন্যথা বিশ্বাস করতে পারতাম না বা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করতাম না। কেন তুমি তোমার বিষয়ে আমার দুর্বলতা ভুলিয়েছ? কেন তুমি আমার হতভাগা মাংস ও প্রাণ এমন শিক্ষা দ্বারা বিনাশ করেছ যা তোমার বিষয়ে আমাকে মিথ্যা জ্ঞান দান করে? লোহিত সাগরের জলরাশি দু’ভাগ হওয়ার পর যিনি সেই পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন ও তোমার সাক্ষাতে স্বর্গীয় যত রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব লক্ষ্য করেছিলেন, সেই মোশির মুখমণ্ডলের গৌরব আমার কাছে প্রতারণার কারণ হয়েছে। যখন তিনি তোমার বিষয়ে তোমার দ্বারা নির্দেশ করা বাণী জানিয়েছিলেন তখন আমি তাঁকে বিশ্বাস করেছি। তোমার মনের মত মানুষ বলে যাঁর সন্ধান পাওয়া হয়েছিল সেই দাউদ আমাকে বিনাশ করেছেন; যাঁকে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা দানের যোগ্য বলে পাওয়া গেছিল, সেই শলোমনও আমাকে বিনাশ করেছেন; সেই ইশাইয়াও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি ‘সাবাওথ’ প্রভুর দর্শনলাভের পরে ভাববাণী দিতেন; সেই যেরেমিয়াও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি মাতৃগর্ভে গঠিত হবার আগে সেই জাতিসকলের নবী রূপে পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন যাদের উৎপাটন ও রোপণ করার কথা ছিল; সেই এজেকিয়েলও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি পুনরুত্থান রহস্যের সাক্ষী; সেই দানিয়েলও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি সর্বকালের বাসনা বিষয়ে সচেতন মানুষ ছিলেন; নবীদের সেই পবিত্রীকৃত দলও আমাকে বিনাশ করেছেন; সুসমাচারগুলোর ঐশপ্রকাশের পবিত্র শিক্ষাও আমাকে বিনাশ করেছে; সেই মথিও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি কর-আদায়কারী অবস্থা থেকে প্রেরিতদূত হতে মনোনীত হয়েছিলেন; সেই যোহনও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি প্রভুর সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গতা গুণে স্বর্গীয় রহস্যাদি প্রকাশের যোগ্য হয়েছিলেন; সেই সুখী শিমোনও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি রহস্য স্বীকারের পর মণ্ডলীর গাঁথনির ভিত্তি হয়ে উঠেছিলেন ও স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি গ্রহণ করেছিলেন; সেই অন্যান্য সকলেও আমাকে বিনাশ করেছেন যাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলেছিলেন; সেই পলও আমাকে বিনাশ করেছেন যিনি নির্যাতনকারী থেকে প্রেরিতদূত হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন তোমার মনোনীত পাত্র, যিনি জীবিত মানুষ হিসাবে গভীর সমুদ্রতলে সময় কাটিয়েছিলেন, যাঁকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল,

যিনি সাক্ষ্যমরণের আগে পরমদেশে ছিলেন ও নিজের সাক্ষ্যমরণে সেই অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন যা নিখুঁত বিশ্বাসের প্রমাণ।

২১। এঁাদেরই কাছ থেকে আমি সেই সমস্ত কিছু শিখেছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে আছি, এঁাদেরই কাছ থেকে আমি এমনভাবে সংপৃক্ত হয়েছি যে আমার জন্য আর প্রতিকার নেই। যখন আমি তাঁদের মধ্যে কিছুই পরিবর্তন করতে পারি না, এমনকি তাঁদের সঙ্গে আমি মরতেও পারি, তখন, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর। এই বর্তমান কাল অধিক দেরি করেই আমার সামনে ভ্রান্তমতপন্থী এই আধুনিক চিকিৎসকদের এনে দিয়েছে যাদের আমি যতাসাধ্য ভক্তিহীন বলে গণ্য করি। যা তুমি শিক্ষাপ্রাপ্ত করেছ, আমার এই বিশ্বাস অধিক দেরি করেই এই শিক্ষকদের পেয়েছে। এদের নাম শুনবার আগে আমি এইভাবে তোমাতে বিশ্বাস রেখেছি, তোমার গুণে আমি এইভাবে নবজন্ম লাভ করেছি; ও সেসময় থেকে আমি এইভাবে তোমারই। আমি জানি, তুমি সর্বশক্তিমান, এবং একাই তুমি ও তোমার একমাত্র পুত্র যা জান, তুমি যে তোমার সেই অনির্বচনীয় জন্ম-রহস্য আমাকে বুঝিয়ে দেবে আমি তার জন্য অপেক্ষা করি না। তোমার পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই, ও তোমার সর্বশক্তিমত্তা থেকে আগত পরাক্রম গুণে তোমার পুত্র যে তোমা দ্বারা জনিত হয়েছেন সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। যদি সন্দেহ করতাম, তবে আমি তোমার সেই সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করতাম। আমার নিজের জন্মও তোমার মঙ্গলময়তাকে আমার কাছে প্রকাশ করে, সেজন্য আমি ভরসা ভরে এমনটা ভাবি যে, তোমার একমাত্র জনিতজনের জন্ম ক্ষেত্রে তোমার মঙ্গলদান বিতরণে তুমি কার্পণ্য করনি। কেননা আমি বিশ্বাস করি, যা কিছু তোমার তা তাঁরও, ও যা কিছু তাঁর তা তোমারও। তোমার প্রজ্ঞার কথা বলতে গেলে, জগৎসৃষ্টি নিজেই আমাকে এপ্রমাণ দেয় যে তুমি প্রজ্ঞাবান। আমি এতে সচেতন যে, তোমার সেই প্রজ্ঞাকে তুমি নিজ থেকে তোমার চেয়ে অসদৃশ নয় বলে জনিত করেছ। সত্যি, আমার কাছে তুমি একমাত্র ঈশ্বর, কিন্তু যিনি তোমা থেকে ঈশ্বর, তাঁর মধ্যে যে এমন কিছু রয়েছে যা তোমার নয় (ক), আমি তা কখনও বিশ্বাস করব না। এবং তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে আমি যদি বিধান, নবীদের ও প্রেরিতদূতদের উপর অধিক বিশ্বাস রাখায় অপরাধী হয়ে থাকি, তবে তুমি সেই পুত্রে আমাকে দণ্ডিত কর।

২২। দুঃসাহসী এই কথন শেষ হোক, ও ভ্রান্তমতপন্থীদের মূর্খতা প্রকট করার প্রয়োজনে যে অধিক উদ্দীপিত কথা ব্যবহার করা হয়েছে তা ছেড়ে, এসো, প্রমাণ দেওয়ার বাস্তব কর্মে স্থানান্তর করি। তবে, যদি এমন কেউ থাকে যাদের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া এখনও সম্ভব হয়, তাহলে তারা অবশ্যই সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষার উপরে স্থাপিত বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে চলবে ও তাঁকে চিনে নেবে যিনি দত্তক গুণে নয় কিন্তু স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বরের পুত্র। এটা সমীচীন যে, আমাদের প্রতিবাদে আমরা এই অনুক্রম অনুসরণ করি, অর্থাৎ এটাই সমীচীন যে, আমরা সর্বপ্রথমে এমনটা দেখাই যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাতে করে যে স্বরূপ তাঁকে পুত্র করে তোলে তিনি যে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী তা যেন স্পষ্ট হয়। কেননা আমরা যা বিচার-বিবেচনা করতে যাচ্ছি, সেই ভ্রান্তমত যে প্রধান লক্ষ্য অনুধাবন করতে সচেষ্ট, তা হলো, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে সত্যিকারে সত্যকার ঈশ্বরের পুত্র ও সত্যকার ঈশ্বর, তা অস্বীকার করা। বহু প্রমাণ এবিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর বলে প্রকাশিত ও তিনি সত্যিই তাই। পিতা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, প্রেরিতদূতেরা একথা ঘোষণা করেন, বিশ্বস্তরা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, অপদূতেরা তাঁকে স্বীকার করে, ইহুদীরা তাঁকে অস্বীকার করে, যজ্ঞগাতোগের সময়ে বিধর্মীরা তাঁকে চিনে নেয়। ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নামটা তাঁকে দেওয়া হয় যেহেতু সেই নাম এমন নয় যা অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর মিলিত অধিকার, কিন্তু নামটা হলো তাঁর নিজস্ব সম্পূর্ণ অধিকার। যেহেতু খ্রিষ্ট প্রভুর সমস্ত কর্ম ও শিক্ষা তাদেরই ক্ষমতা অতিক্রম করে যারা পুত্র-নাম বহন করে, ও যেহেতু যে যে নাম খ্রিষ্টের বিশেষ অধিকার সেই সমস্ত নামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম হলো ঈশ্বরের পুত্র, সেজন্য তাঁর ‘পুত্র’ নাম এমন নাম নয় যা তিনি ভাইদের অসংখ্য দলের সঙ্গে সহভাগিতা করেন।

২৩। আমি আমার নিজের কথা যোগ করায় এই সত্যের প্রমাণ দুর্বল করতে চাই না। পিতা নিজেই নিজের একমাত্র জনিতজনের বিষয়ে সেইভাবে কথা বলুন, যেভাবে তিনি প্রায়ই করেন যাতে এমনটা না হয় যে, বাপ্তিস্ম-রহস্য সম্পন্ন হওয়ার পর যিশু খ্রিষ্টকে দেহের কারণে চিনে নেওয়া না হয়: ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন’ (ক)।

আমি জিজ্ঞাসা করি, সত্য এখানে কিসেতে অস্পষ্ট ও ঘোষণার বিশ্বাসযোগ্যতা কিসেতে দুর্বল? পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারীর সেই প্রসব যা বিষয়ে দূত সংবাদ দেন; সেই তারা যা পণ্ডিতদের চালনা করে; দোলনায় [শায়িত যিশুর প্রতি] তাঁদের ভক্তিপ্রকাশ; বাপ্তিস্মদাতার স্বীকৃত (খ) তাঁরই পরাক্রম যিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে সম্মত: অথচ [ভ্রান্তমতের কাছে] এসমস্ত কিছু তাঁর মর্যাদা দেখাবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বলে পরিগণিত নয়। পিতা স্বর্গ থেকে কথা বলেন ও এবাণী ঘোষণা করেন, ‘ইনিই আমার পুত্র’। উপাধি নয়, সর্বনামই প্রয়োগে কী প্রমাণিত হয়? উপাধি যে নামের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, সেই নামকে একটা অর্থ যোগ করে, কিন্তু সর্বনাম যে ব্যক্তির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, সেই ব্যক্তির বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দেয়। যখন আমরা ‘ইনি’ ও ‘আমার’ কথা শুনি, তখন যা নির্দেশিত সেটার সত্তা বিষয়ক নির্দেশনা পাই। কথাগুলোর সত্যকার অর্থ বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি পড়েছ, ‘আমি পুত্রদের লালন-পালন করেছি ও উন্নীত করেছি’ (গ), কিন্তু ‘আমার পুত্রদের’ এমনটা পাওনি, কেননা বিজাতীয়দের মধ্য থেকে তাদের পৃথক পৃথক করায় ও আপন উত্তরাধিকারের জনগণ বলে তাদের গ্রহণ করায় (ঘ) তিনি নিজের জন্যই তাদের লালন-পালন করেছিলেন। সুতরাং, পাছে ‘পুত্র’ নামটা একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে এমন বাড়তি উপাধি বলে দেওয়া হয় যা দ্বারা তাঁর উপর অন্যান্যদের মিলিত দত্তকপুত্রত্ব আরোপ করা হয়, সেজন্য তাঁর সত্যকার স্বরূপ সেই শব্দ [তথা ‘আমার’] দ্বারা ব্যক্ত হলো যা নিজস্ব অধিকার নির্দেশ করে। খ্রিষ্টের বিষয়ে তাঁকে অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত ‘পুত্র’ নামটা তখনই আরোপ করা হোক যখন এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারবে যেখানে অন্য কারও বিষয়ে বলা হয় ‘ইনিই আমার পুত্র’। কিন্তু, যখন ‘ইনিই আমার পুত্র’ বাক্যটা অধিকারসূত্রে সম্পূর্ণ তাঁরই, তখন পিতা যখন ঘোষণা করেন যে তিনি হলেন তাঁর পুত্র, তখন আমরা কেন পিতাকে অভিযুক্ত করি? তুমি এমনটা মনে কর না যে ‘ইনিই’ শব্দটা ব্যবহার করায় তিনি বলতে চান, আমি অন্যান্যদেরও পুত্র নামটা দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ইনিই আমার আপন পুত্র; আমি বহুসংখ্যক মানুষকে দত্তক পুত্র নামটা দিয়েছি, কিন্তু ইনিই আমার আপন পুত্র; অন্য কাউকে খোঁজ করো না, বিশ্বাস কর, ‘ইনিই আমার পুত্র’। ঐকেই আমি আঙুল ও কণ্ঠ দিয়ে নির্দেশ করছি ও তোমাকে বলছি, ‘আমার’, ‘ইনিই’, ‘পুত্র’। তবে এসবকিছুর পরে,

তাকে যেন তেমনটাই বলে বিশ্বাস করা না হয়, এখন যুক্তিসঙ্গত আর কোন্ অজুহাত থাকতে পারে? এটাই ছিল পিতার কণ্ঠের লক্ষ্য, সমস্ত ধর্মময়তা সম্পন্ন করার জন্য যাঁর বাপ্তিস্ম পাবার কথা ছিল তাঁর স্বরূপ যেন অজ্ঞাত না থাকে, কিন্তু আমাদের পরিভ্রাণ-রহস্য সার্থক করার জন্য যিনি মানুষ রূপে হাজির হচ্ছিলেন, তাঁকে যেন ঈশ্বরের কণ্ঠে ঈশ্বরের পুত্র বলে চিনে নেওয়া হত।

২৪। আরও, যেহেতু বিশ্বাসের এই সত্য স্বীকারে বিশ্বাসীদের জীবন বিরাজিত—কেননা একমাত্র জনিত ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে জানা ছাড়া অনন্ত জীবনের উদ্দেশে অন্য পথ নেই—সেজন্য প্রেরিতদূতেরা পুনরায় স্বর্গ থেকে একটা কণ্ঠ শোনেন যা আগেকার সংবাদ পুনরাবৃত্তি করে, যাতে সেই জীবনদায়ী বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করা হয় যা অবিশ্বাস করলে মৃত্যু হয়। কেননা যখন মহিমায় পরিবৃত্ত প্রভু মোশি ও এলিয়কে তাঁর পাশে ক’রে ও যাঁরা দর্শনের সত্য ও তাঁর নিজের বাণীর সাক্ষী বলে মনোনীত হয়েছিলেন মন্ডলীর সেই তিন স্তম্ভকে সঙ্গে ক’রে তিনি সেই পর্বতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন স্বর্গ থেকে পিতার এই কণ্ঠ নেমে এসেছিল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন **(ক)**। তাঁরা যে বিভা দেখেছিলেন তা তাঁর গৌরব প্রমাণিত করতে যথেষ্ট হয়নি বিধায় সেই কণ্ঠ এটা নির্দেশ করে, ‘ইনি আমার পুত্র’। প্রেরিতদূতেরা প্রভুর গৌরব সহ্য করতে পারেন না, তাঁদের মরণশীল চোখ তাঁর সাক্ষাতে ক্ষীণ হয়, পিতর, যাকোব ও যোহনের আস্থা আতঙ্কে নিঃশেষ হয়। কিন্তু হঠাৎ করে পিতার অধিকারসম্পন্ন স্বীকারোক্তি তাঁদের সহায়তায় আসে ও এখানে বক্তার সূক্ষ্ম ভাষা দ্বারা পুত্র প্রকাশিত। এবং পুত্র হিসাবে তাঁর প্রকৃত অবস্থা যে শুধু ‘ইনি’ ও ‘আমার’ শব্দদ্বয় দ্বারা প্রদর্শিত তা নয়, কিন্তু ‘তাঁর কথা শোন’ আহ্বানও যুক্ত হয়। তবে এখানে রয়েছে স্বর্গ থেকে ধ্বনিত পিতার সাক্ষ্য, কিন্তু পৃথিবীতে সত্যায়িত হয় পুত্রের সাক্ষ্য, কারণ আমাদের তাঁর কথা শুনতে আহ্বান করা হয়। এবং যদিও পিতার স্বীকারোক্তির ফলে অস্পষ্ট কিছুই আর থাকে না, তথাপি এবিষয়েও আমাদের আহ্বান করা হয় যেন আমরা পুত্রের আত্মপ্রকাশ বিশ্বাস করি। বাণীগুলো অধিক স্পষ্টভাবে শেখায় যে পুত্র হলেন সত্যকার পুত্র, এটাও শেখায় যে, প্রমাণ স্বরূপ পিতার কণ্ঠ এমনটা দাবি করে যেন আমরা পুত্রের কথা শোনার মাধ্যমে আমাদের বাধ্যতা দেখাই। উপসংহারে, যেহেতু পিতার ইচ্ছার এই কণ্ঠ এমনটা

বলে যেন পুত্রকে শোনা হয়, সেজন্য যখন পুত্র নিজেই সাক্ষ্য দেন, তখন এসো, তিনি নিজের বিষয়ে যা বলেছেন আমরা তাঁর সেই কথা শুনি।

২৫। আমি এমনটা মনে করি না যে সাধারণ বুদ্ধি বিহীন এমন কেউ রয়েছে যে, সকল সুসমাচার-পুস্তকে বিস্তৃত পুত্রের বাণীতে সেই অবমাননা উপলব্ধি করবে না যা তিনি দেহ ধারণ করায় মেনে নিলেন। যেমন, তিনি বলেন, ‘পিতা, আমাকে গৌরবান্বিত কর’ (ক); ও প্রায়ই তাঁর উচ্চারিত এবাণী ‘তোমরা মানবপুত্রকে দেখবে’ (খ), ও ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’ (গ), ও ‘এখন আমার প্রাণ কস্পিত’ (ঘ), ও ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন’ (ঙ)। এধরনের আরও আরও বাণী রয়েছে যা বিষয়ে আমি সময়মত কথা বলব (চ)। কিন্তু আমি মনে করি যে, তাঁর বিনম্রতা বিষয়ে দেওয়া তত প্রমাণের সামনে এমন কেউই থাকবে না যে তাঁকে অহঙ্কার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারবে এই ভিত্তিতে যে তিনি তখনই পিতাকে নিজের পিতা বলেন যখন বলেন, ‘আমার স্বর্গস্থ পিতা যে যে চারাগাছ পৌঁতেননি, সেগুলো সবই উপড়ে ফেলা হবে’ (ছ), অথবা, ‘আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না’ (জ)। কেউই এমনটা ভাবতে পারে না যে, যতবার [পুত্র] পিতাকে নিজের পিতা বলে নির্দেশ করেন ততবার তিনি অন্যায় অহঙ্কার দেখান, কেননা প্রকৃতপক্ষে তা হলো অকপট এমন মনের পরিচয় যা নিজের জন্মের বিষয়ে সচেতন হয়ে ‘পিতা’ শব্দে সত্যকার নাম চিনে নেয়। সুতরাং, বিনম্রতা বিষয়ে ঘন ঘন স্বীকারোক্তি স্পর্ধা-রিপুটাকে মানায় না, অর্থাৎ সেই রিপুই মানায় না যা দ্বারা, যা বিষয়ে কোন দাবি নেই সেবিষয়ে দাবি রাখা হয়, যা বিষয়ে কোন অধিকার নেই সেবিষয়ে অধিকার দাবি করা, নিজের অধিকারকে ঈশ্বরের অধিকারের সমান বলে দাবি করা। এবং যখন তিনি এ বচনে নিজেকে পুত্র বলেন, ‘ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিদ্রাণ পেতে পারে’ (ঝ) ও এ বচনে বলেন, ‘ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?’ (ঞ), তখন আমরা তাঁকে এমন স্পর্ধার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারি না যা সেই স্পর্ধার মত যা অনুসারে ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু আমরা যখন যিশু খ্রিস্টকে কেবল দত্তক পুত্র নামটা আরোপ করি তখন এ থেকে আলাদা কী করি? কেননা তেমন নাম আরোপ করায়, ও যখন তিনি ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলেন তখনও আমরা তাঁকে

দুঃসাহসী স্পর্ধার দায়ে অভিযুক্ত করি। পিতার কণ্ঠ স্বর্গ থেকে বলে, ‘তাঁর কথা শোন’। আমি শুনি, ও তিনি বলেন, ‘পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি’ (ঢ), আরও, ‘তোমরা নাকি বল, আমি ঈশ্বরনিন্দা করেছি কারণ আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র’ (ঠ)। আমি যদি নামগুলোতে বিশ্বাস না রাখি ও শব্দগুলো দ্বারা বস্তুগুলোর সত্তাকে নির্দেশ না করি, তাহলে জিজ্ঞাসা করি আমাকে কেমন ভাবে ভাবতে ও চিন্তা করতে হবে; হ্যাঁ, আমার জন্য বিকল্প কোন পথ আর থাকে না। স্বর্গ থেকে পিতা অধিকার-সহ বলেন, ‘ইনি আমার পুত্র’। পুত্র নিজের বিষয়ে বলেন, ‘আমার পিতার গৃহ’ ও ‘আমার পিতা’। যখন ‘ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?’ এ প্রশ্ন দ্বারা বিশ্বাস করতে আহ্বান করা হয়, তখন এর অর্থ হলো যে, তেমন নাম-স্বীকার পরিব্রাণ এনে দেয়। ‘আমার’ সর্বনামটা এটা নির্দেশ করে যে, পরবর্তী নাম বক্তারই অধিকার। হে ভ্রাতৃমতপন্থী, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিকল্প বলে তুমি কী উপস্থাপন কর? তুমি তো পিতার বিশ্বাসযোগ্য বাণী ও পুত্রের স্বীকারোক্তির বিরোধিতা কর, ও নামগুলো অর্থশূন্য কর যাতে সেই নামগুলো যা ব্যক্ত করে তা নির্দেশ না করে। কেবল তোমার এই স্পর্ধাপূর্ণ অভক্তি থেকে যায়, তথা, ঈশ্বর নিজের বিষয়ে মিথ্যা বলেছেন।

২৬। তাই অকপট বিশ্বাস ছাড়া এমন কিছুই আর থাকে না যা এটা বোঝাবে যে, এগুলো সত্যিই অর্থপূর্ণ নাম, যার ফলে যখন আমরা বলি ‘ইনি আমার পুত্র’ ও ‘আমার পিতা’, তখন শব্দগুলো সত্যিকারে সেই ব্যক্তিদের নির্দেশ করে যাঁদের বিষয়ে ও যাঁদের উদ্দেশ্য করে শব্দগুলো উচ্চারিত। তথাপি, ‘পুত্র’ ও ‘পিতা’ শব্দ দু’টো পাছে পুত্র ক্ষেত্রে কেবল দত্তক নির্দেশকারী নাম ব’লে, ও পিতা ক্ষেত্রে কেবল মর্যাদা নির্দেশকারী নাম ব’লে গণ্য হয়, সেজন্য এসো, দেখি স্বয়ং পুত্র দ্বারা নিজের নাম বিষয়ে কোন্ গুণ আরোপিত। তিনি বলেন, সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তলে দেওয়া হয়েছে, ও পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও সে-ই ছাড়া যার কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন (ক)। ‘ইনি আমার পুত্র’ ও ‘আমার পিতা’ বাক্য দু’টো কি ‘পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া’ বাক্য দু’টোর সঙ্গে মিল রাখে নাকি রাখে না? কেননা কেবল পারস্পরিক সাক্ষ্যদান দ্বারাই পুত্র পিতা দ্বারা জ্ঞাত হতে পারলেন ও পিতা পুত্র

দ্বারা জ্ঞাত হতে পারলেন। স্বর্গ থেকে শোনা সেই কণ্ঠ রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে পুত্রের বাণীগুলো। পিতা যেমন, পুত্রও তেমনি অনির্বচনীয়। সবই তাঁকে দেওয়া হয়েছে, ও ‘সবই’ শব্দ দ্বারা এমনটা বোঝা যায় যে কিছুই বাদ পড়ে না। যখন অধিকার সমান, যখন পারস্পরিক জানা-ও সমান ও যখন [পিতা ও পুত্র] নাম দু’টো নিজ নিজ সাধারণ অর্থ অনুসারে কথিত, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যারা প্রতাপ ক্ষেত্রে সমান শক্তির অধিকারী ও রহস্য ক্ষেত্রে সমান অভেদ্যতার অধিকারী, নামগুলো যেভাবে তাঁদের নির্দেশ করে তাঁরা কেমন করে সেইভাবে নন। যখন ঈশ্বর কথা বলেন তখন তিনি প্রতারণা করেন না, ও পিতা নিজের উপর নিজের পিতৃত্ব ও পুত্র নিজের উপর নিজের পুত্রত্ব আরোপ করেন না। তবে এখন এটা শিখে নাও কেমন করে ঘটনাসমূহও সেই সত্য বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে যা এ নামগুলো ব্যক্ত করে।

২৭। তিনি [অর্থাৎ পুত্র] বলেন, যে কাজ সম্পাদনের ভার পিতা আমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমার দ্বারা সাধিত এই সমস্ত কাজই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তাছাড়া পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন (ক)। নিজের নামকে শুধু নয়, নিজের পরাক্রমও সাক্ষী রূপে দাঁড় করিয়ে একমাত্র জনিত ঈশ্বর নিজেকে ‘পুত্র’ বলে প্রমাণ করেন; যে কাজ তিনি সম্পাদন করেন, সেই সমস্ত কাজই প্রমাণ করে তিনি পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করি, এসমস্ত কাজ এমন কোন্ ব্যাপার প্রমাণ করে? কাজগুলো এটা প্রমাণ করে যে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তিনি যে প্রেরিত হয়েছেন, তা তাঁর বাধ্যতাকেও প্রমাণ করে ও তাঁর পিতার অধিকারকেও প্রমাণ করে, কারণ যে যে কাজ [খ্রিষ্ট] সম্পাদন করেন, সেগুলো অন্য কারও দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না, পিতা দ্বারা যিনি প্রেরিত হয়েছেন কেবল তিনিই তা করতে পারেন। কিন্তু অবিশ্বাসীদের কাছে এমনটা সাক্ষ্য দেবার জন্য যে পিতা তাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সেই কাজগুলো যথেষ্ট নয়; বাস্তবিকই তিনি বলে চলেন, পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন; তাঁর কণ্ঠস্বর তোমরা কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি (খ)। জিজ্ঞাসা করি, তাঁর বিষয়ে পিতার সাক্ষ্য কোন্টা? সুসমাচারের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে লক্ষ কর ও তাতে যা লেখা রয়েছে তা বিবেচনা কর: ‘ইনি আমার প্রিয় পুত্র,

ঐতে আমি প্রসন্ন’ ও ‘তুমি আমার পুত্র’ ইতিমধ্যে উপস্থাপিত এ সাক্ষ্য দু’টো ছাড়া পিতার দেওয়া বাকি সাক্ষ্যও পড়। যিনি আগে থেকে সত্য জানতেন, সেই যোহনই এবাণী শুনেছিলেন, কিন্তু এ বাণী আমাদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পিতার কণ্ঠের সাক্ষ্য হিসাবেই ব্যক্ত। কিন্তু এবাণী যে সব তা নয়। মরণপ্রান্তরে জীবনকালে যোহন এই ঐশ্বর্যপ্রকাশ শুনবার যোগ্যতা পেলেন, কিন্তু প্রেরিতদূতেরা যে এই সাক্ষ্য বিষয়ক নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবেন তা হবার ছিল না। সেই একই কণ্ঠ স্বর্গ থেকে তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু যোহনকে যা বলা হয়েছিল, সেটার চেয়ে তাঁরা দীর্ঘতর বাণী শোনেন। কেননা মাতৃগর্ভ থেকে যিনি নবী ছিলেন, সেই যোহনের পক্ষে ‘তাঁর কথা শোন’ আঙুর প্রয়োজন ছিল না: হ্যাঁ, আমি তাঁর কথা শুনব, ও সত্য বিষয়ে শিক্ষাদান করার লক্ষ্যে যিনি তাঁর কথা শুনেছিলেন, আমি তাঁর কথা ও সেই প্রেরিতদূতেরই কথা ছাড়া অন্য কারও কথা শুনব না। ইনি [খ্রিষ্ট] যে তাঁর পুত্র, একথা বাদে যখন পুস্তকগুলো পুত্র সম্পর্কে পিতার অন্য কোন সাক্ষ্য বহন করে না, তখন এ সাক্ষ্যদানের সত্য এ দ্বারা প্রমাণিত যে, পুত্র পিতার ইচ্ছাক্রমে যা সম্পাদন করেন, সেই কাজগুলোই এ সাক্ষ্য সত্য বলে প্রমাণিত করে। আজকালের যে অপবাদ অনুসারে ‘পুত্র’ নামটা দত্তক হিসাবে দেওয়া হয়েছে, সেই অপবাদ যখন এটা বলে যে তিনি সত্যকার ঈশ্বর নন ও এটাও বলে যে, যে নামগুলো তাঁর উপর আরোপ করা হয় সেগুলো অকেজো, তখন সেই অপবাদের বিরুদ্ধে কেমন প্রমাণ উত্থাপন করা হয়? পিতা পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন; পিতার কাজগুলো যে তাঁর নিজের কাজগুলোর সমান, এ সাক্ষ্যদান দ্বারা পুত্র পিতার সাক্ষ্যদান যে নিজের সাক্ষ্যদানের সমান সেবিষয়ে প্রমাণ দেন। তবে যে পুত্রত্ব ঘোষিত ও প্রমাণিত, তাঁর মধ্যে তাঁর সেই সত্যকার পুত্রত্ব কেন স্বীকৃত হবে না? পিতা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রসন্নতার খাতিরে দেওয়া দত্তক গুণেই যে খ্রিষ্ট ‘পুত্র’ নাম অর্জন করেন তা নয়; বিশ্বাস স্বীকারে কষ্ট বহন করার ফলে যেমন অনেকে ঈশ্বরের পুত্র, তেমনিভাবেই যে তিনিও নিজের পবিত্রতা গুণে ‘পুত্র’ নাম অর্জন করেছেন, তাও নয়; কেননা উল্লিখিত সেই লোকদের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিষয়ে কোন ইঙ্গিত নেই; বাস্তবিকই যদিও তেমন নাম আরোপ করা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য, তবু সেক্ষেত্রে তা কেবল একটা নাম বোঝায় যা ঈশ্বর প্রসন্নতার খাতিরেই মঞ্জুর করেছেন। ‘ইনি’, ‘আমার’, ‘তাঁর কথা

শোন’ যা নির্দেশ করে তা একেবারে আলাদা ব্যাপার; এ শব্দগুলো সত্যকার, বাস্তব, প্রকৃত পুত্রত্বকে নির্দেশ করে।

২৮। এবং প্রকৃতপক্ষে, পিতা যা বিষয়ে নির্দেশ করেন, পুত্র নিজের বিষয়ে সেই সত্যকার পুত্রত্ব সম্পর্কে কম স্পষ্ট প্রমাণ দান করেন না। ‘ইনি আমার পুত্র’ পিতার এবাণী যেমন আমাদের জন্য একটা আহ্বান যেন আমরা সেই রহস্য ও বিশ্বাসের প্রতি কান দিই যা তিনি স্বর্গ থেকে বহন করতে এসেছেন—কেননা বিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী শিক্ষা শিখবার জন্য আমাদের তাঁর কথা শুনতে আহ্বান করা হয়—তেমনি পুত্র নিজের [অনন্তকালীন] জন্ম ও নিজের আগমনের সত্যকে এবাণী দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আমাকে জান না, আর আমি যে কোথা থেকে আসছি, তা তোমরা জান না; কেননা আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং যিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্যবাদী ও তোমরা তাঁকে জান না; কিন্তু আমি তাঁকে জানি, যেহেতু আমি তাঁর থেকে উদ্ভূত ও তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন (ক)। পিতাকে কেউই জানে না, ও পুত্র সেবিষয়ে প্রায়ই আমাদের নিশ্চিত করেন। পরে তিনি এও বলেন যে, একাই তিনি তাঁকে জানেন, কারণ তিনি সেই পিতা থেকে উদ্ভূত। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে পিতা থেকে উদ্ভূত, তা কি [পিতার] কোন একটা সৃষ্টিকর্মের ফল, নাকি তা হলো একই স্বরূপে প্রজননের ফল? তা কোন একটা সৃষ্টিকর্মের ফল হলে তাহলে সৃষ্ট সমস্ত জিনিসও ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। তবে এ কেমনটা হয় যে, সৃষ্টবস্তুর একটাও পিতাকে জানে না কিন্তু পিতা এটা বলেন যে, তিনি তাঁকে জানেন যেহেতু তিনি তাঁর থেকে উদ্ভূত? তিনি যে ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত তা যদি জন্ম বলে নয় কিন্তু সৃষ্টিকর্মই বলে বিবেচিত হবে তবে এটা কেমনটা হতে পারে যে, যদি একথা সত্য যে সবই ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত, তবে ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত সকল সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে তিনিও পিতাকে জানেন না? কিন্তু যদি পিতাকে জানা হলো পুত্রেরই নিজস্ব অধিকার যেহেতু তিনি পিতা থেকে উদ্ভূত, তবে তিনি যে পিতা থেকে উদ্ভূত, তাও কেমন করে পুত্রের নিজস্ব অধিকার হবে না? অর্থাৎ, সত্যকার পুত্র রূপে তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে উদ্ভূত, ও তিনি যে একাই ঈশ্বরকে জেনেছেন তার কারণ এ হলো যে, একাই তিনিই ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত। তবে তুমি এটা দেখতে পাও যে, [পিতা বিষয়ে] একটা জ্ঞান আছে যা কেবল তাঁরই অধিকার ও যা এমন জন্মেরই ফল যা কেবল

তাঁরই অধিকার; এবং পুত্র যে পিতা থেকে উদ্ভূত, তা পিতার সৃজনী পরাক্রমের কাজ নয়—কেননা সৃষ্টিকর্মের গুণে সবই পিতা থেকে উদ্ভূত হয়ে অস্তিত্বশীল—, কিন্তু [পুত্রের বেলায়] সেই ‘উদ্ভূত’ শব্দের অর্থ হলো সত্যকার জন্ম। তেমন জন্মের ফলেই একাই তিনি পিতাকে জানেন, কিন্তু পিতা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সৃষ্টবস্তু তাঁকে জানে না।

২৯। তথাপি, পুত্র যে পিতা থেকে উদ্ভূত, পাছে এবিষয়ে ভ্রান্তমত এমনটা বলে যে তাঁর সেই ‘উদ্ভূত’ অবস্থা তাঁর আগমনের সময়ে শুরু হয়েছিল, সেজন্য তিনি সাথে সাথে একথা যোগ করেন, ‘যেহেতু আমি তাঁর থেকে উদ্ভূত ও তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন’। যখন তিনি এমনটা ঘোষণা করলেন যে, তিনি সঞ্জাত হয়েছেন ও পরে প্রেরিত হয়েছেন, তখন সুসমাচার রহস্যের যে অনুক্রম প্রকাশ করে তিনি তা রক্ষা করলেন: আগেকার ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জানাতে চাইলেন তিনি নিজে কে ও কার কাছ থেকে তিনি উদ্ভূত। কেননা ‘তাঁর থেকে উদ্ভূত’ ও ‘তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন’ বাক্য দু’টো একই ধারণা ব্যক্ত করে না, যেইভাবে ‘তোমরা আমাকে জান না, আর আমি যে কোথা থেকে আসছি, তাও তোমরা জান না’ বাক্য দু’টো একই কথা বলে না। একথা কি সত্য নয় যে, সকলের ধারণা অনুসারে, মাংসে সঞ্জাত হয়েও প্রতিটি মানুষ ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত? তবে খ্রিষ্ট কেমন করে একথা বলতে পারেন যে, তিনি নিজে ও তাঁর অস্তিত্বের উৎসও অজানা? তিনি তখনই মাত্র তেমনটা বলতে পারেন যদি ‘আমি কোথা থেকে আসছি’ বাক্যটা তাঁর নিজের স্বরূপের প্রণেতার দিকে নির্দেশ করে (ক)। হে ভুলভ্রান্তির দুর্ভাগা মূর্খ, ‘তোমরা আমাকে জান না, আর আমি যে কোথা থেকে আসছি, তাও তোমরা জান না’ বাক্যটার অর্থ ভাল মত ভাব। তুমি তো বল, সবই শূন্য থেকে উদ্ভূত, ও সেই সবই এমনভাবে শূন্য থেকে উদ্ভূত যে তুমি ভ্রান্তিময় ভাবে এটা সমর্থন কর যে একমাত্র জনিত ঈশ্বরও শূন্য থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত। তবে ভক্তহীনেরা কোন্ কারণেই বা খ্রিষ্টকে জানে না ও তাঁর উৎপত্তিও জানে না? তারা যে [শাস্ত্রের কথা অনুসারে] তাঁর উৎপত্তি জানে না, সেটাই সেই স্বরূপের বিষয়ে একটা নির্দেশনা যা থেকে তিনি উৎপন্ন। বাস্তবিকই, যা কিছু শূন্য থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত, সেটার বিষয়ে এমনটা বলা যেতে পারে না যে সেটার উৎপত্তি অজানা, কারণ যখন আমরা জানি, একটা কিছু শূন্য থেকে উৎপন্ন, তখন সেটার উৎপত্তি বিষয়ে অজানা কিছু নেই। তবে, যিনি [পৃথিবীতে] এসেছেন তিনি

নিজেতে অস্তিত্বের অধিকারী নন, কিন্তু তাঁকে পাঠিয়েছেন যিনি, সেই সত্যকার [ঈশ্বরই] অধিকারী যাকে ভক্তিহীনেরা জানে না। তাই, যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন তিনিই প্রেরণকর্তা বলে অজ্ঞাত; তাই প্রেরিতজন প্রেরণকর্তা থেকে উৎপন্ন; তাঁরই থেকে উৎপন্ন যাকে তারা [অর্থাৎ সেই ইহুদীরা] প্রেরণকর্তা বলে জানে না। খ্রিষ্ট যে কে, তারা যে তা জানে না, এর কারণ এটাই যে, তিনি কোথা থেকে উদ্ভূত তা তারা জানে না। খ্রিষ্ট যে কোথা থেকে উদ্ভূত যে কেউ তা জানে না, সে-ই খ্রিষ্টকে জানে না; ও যে তাঁর জন্ম জানে না, সে-ই খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে; এবং যে কেউ এমনটা ভাবে যে তিনি শূন্য থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত, তাঁর জন্ম সম্পর্কে সে আদৌ কিছু ভাবতে পারে না। তাছাড়া, তিনি শূন্য থেকে অস্তিত্ব পাওয়া থেকে এতই দূরেই রয়েছেন যে, তিনি যে কোথা থেকে উদ্ভূত, ভ্রান্তমতপন্থীরা তা বলতে পারে না।

৩০। তারা অজ্ঞ, একেবারেই অজ্ঞ যারা [ঈশ্বরের] নাম থেকে [ঈশ্বরের] স্বরূপ পৃথক করে; ও অজ্ঞ থাকতে থাকতে অজ্ঞ হতে পছন্দ করে। কিন্তু তারা সেই ভর্ৎসনা শুনুক যা পুত্র তেমন জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য সেসময় ভক্তিহীনদের উপর চাপিয়ে দিলেন যখন ইহুদীরা এটা ঘোষণা করত যে, ঈশ্বর তাদের আপন পিতা। তিনি বলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্যই ভালবাসতে, যেহেতু আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি; আমি তো নিজে থেকে আসিনি, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন (ক)। যারা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার ক'রে এমনটা বলত যে ঈশ্বর ছিলেন তাদের পিতা, তারা যে নিজেদের জন্য [পিতার] পবিত্র নাম মেনে নিত সেবিষয়ে ঈশ্বরের পুত্র তাদের ভর্ৎসনা করেননি, কিন্তু যারা ঈশ্বরকে নিজেদের পিতা বলে মানত ও সেইসঙ্গে তাঁকে ভালবাসত না, সেই ইহুদীদেরই নির্বোধ অপবাদকে তিনি নিন্দা করেন: ‘ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্যই ভালবাসতে, যেহেতু আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’। বিশ্বাস গুণে যাদের কাছে ঈশ্বর হলেন পিতা, তাদের সকলের কাছে সেই বিশ্বাসেরই গুণে তিনি পিতা, যে বিশ্বাসে আমরা যিশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করি। কিন্তু এমনটা স্বীকার করা যে তিনি সেই অর্থেই পুত্র যে অর্থ পবিত্রজনদের গোটা দলকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ এমনটাই বলা যে তিনি ঈশ্বরের পুত্রদের একজন, তা কেমন বিশ্বাস? দুর্বল সৃষ্টজীব হয়েও অন্যান্য

সেই সকলেও কি সেই অর্থে কোন না কোন রকমে পুত্র নয়? তাঁর যদি পুত্রের স্বরূপ না থাকে কিন্তু অন্যান্য সকল পুত্রদের মত তাঁর শুধু ‘পুত্র’ নাম থাকে, তাহলে যে বিশ্বাস যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, সেই বিশ্বাস কিসেতে শ্রেষ্ঠ? এই জঘন্য বিশ্বাস খ্রিস্টকে ভালবাসে না ও যারা তেমন অভক্তিময় কথা স্বীকার করে তারা সত্যকার বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরকে আপন পিতা বলে মান্য করে না; যদি ঈশ্বর তাদের পিতা হতেন, তাহলে তারা খ্রিস্টকে ভালবাসত যেহেতু তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন। এখন তিনি ‘ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন’ বাক্যের অর্থ বিষয়ে অনুসন্ধান করব। ঈশ্বর থেকে বের হওয়া ও ঈশ্বর থেকে আসা যে একই জিনিস তা নিঃসন্দেহে সমর্থন করা যায় না। ‘যেহেতু আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি ও এসেছি’ বাক্যটা দু’টো বিষয় নির্দেশ করে। যেহেতু [পুত্র] ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’ ও ‘এসেছি’ এর অর্থ স্পষ্ট করতে ইচ্ছা করেন, সেজন্য তিনি সাথে সাথে বলে চলেন, ‘আমি তো নিজে থেকে আসিনি, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন’। যখন তিনি বললেন ‘আমি তো নিজে থেকে আসিনি’, তখন তিনি এমনটা দেখালেন যে তিনি নিজের উৎস ছিলেন না, এবং পরে তিনি বলেন তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন ও তাঁর দ্বারা প্রেরিত হলেন। কিন্তু যখন তিনি বলেন যে যারা ঈশ্বরকে নিজেদের পিতা বলে ডাকত তাদের পক্ষে তাঁকে [অর্থাৎ খ্রিস্টকে] ভালবাসা আবশ্যিক ছিল যেহেতু তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর জন্মকেই করলেন তাদের ভালবাসার কারণ। নিজের অশরীরী জন্মকে নির্দেশ করার জন্যই তিনি ‘আমি বেরিয়েছি’ উক্তি ব্যবহার করলেন, কারণ ঈশ্বর থেকে জনিত হলেন যিনি, সেই খ্রিস্টের প্রতি ভালবাসা দ্বারাই ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে ডাকবার ন্যায্য দাবি আমাদের অর্জন করতে হয়। কেননা যখন তিনি বলেন, আমাকে যে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে (খ), তখন ‘আমার’ বলায় তিনি দেখাতে চান যে পিতার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, অন্য কেউই সেই সম্পর্কের সহভাগী নয়। অন্যদিকে, যে ঈশ্বরকে আপন পিতা বলে স্বীকার করে কিন্তু পুত্রকে ভালবাসে না, তিনি তাকে নিন্দা করেন কেননা সেই লোক ‘পিতা’ নামটা অপব্যবহার করে, কারণ যে তাঁকে ঘৃণা করে সে অবশ্যই পিতাকেও ঘৃণা করবে, এবং পুত্রকে যে ভালবাসে না, সে পিতা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে না। পুত্রকে ভালবাসার একমাত্র কারণ এটা যে, তিনি পিতা থেকে উদ্ভূত। তাই পুত্র তাঁর

আগমন গুণে নয় কিন্তু তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম গুণেই ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত; এবং পিতার প্রতি ভালবাসা কেবল তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা বিশ্বাস করে, পুত্র সেই পিতা থেকে উদ্ভূত।

৩১। এবিষয়ে প্রভু এই বলে সাক্ষ্য দেন, ‘আমি যে তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, একথা আমি বলছি না; কেননা পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, যেহেতু তোমরা আমাকে ভালবেসেছ, ও বিশ্বাস করেছ যে, আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি ও পিতা থেকে এই জগতে এসেছি’ (ক)। পিতা সম্পর্কে সিদ্ধ বিশ্বাস, এমন বিশ্বাস যা এই সত্য বিশ্বাস করে ও ভালবাসে যে, তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন; এমন বিশ্বাস যা মধ্যস্থ ছাড়া পিতার কাছে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত, এমন বিশ্বাস যা, পুত্র যে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ও প্রেরিত এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করায় সাথে সাথে পিতার মনোযোগ ও ভালবাসার যোগ্যতা অর্জন করে। তাই সেই জন্ম ও আগমন সংক্রান্ত বর্ণনা সূক্ষ্ম ও আক্ষরিক অর্থেই অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’, কারণ তিনি এমনটা চান না, [ঈশ্বর] থেকে তাঁর জন্ম তাঁকে যে স্বরূপ দিয়েছে, তাঁর উপরে সেটার চেয়ে আলাদা স্বরূপ আরোপ করা হোক। ঈশ্বর থেকে কি বের হতে পারত? অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্মের পরে ঈশ্বর ছাড়া এমন কি অস্তিত্বপ্রাপ্ত থাকতে পারত? তিনি বলেন, ‘পিতা থেকে এই জগতে এসেছি’: সেই ‘ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’ বাক্যটা যে পিতা থেকে তাঁর জন্ম প্রকাশ করতে অভিপ্রায় করত তা স্পষ্ট করার জন্য তিনি এটা ঘোষণা করলেন যে, তিনি পিতা থেকে প্রেরিত হয়ে এই জগতে এসেছিলেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় ঘোষণা পরিব্রাণ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত, প্রথমটা ছিল [পুত্রের] স্বরূপ সংক্রান্ত। ‘বের হওয়া’ শব্দটা ‘আগত’ অর্থে অনুসারে ধরে নেওয়া উচিত নয়, কারণ [খ্রিস্ট] আগে ঈশ্বর থেকে নিজের বের হওয়াটা, ও পরেই, তিনি প্রেরিত হওয়ার পরেই, পৃথিবীতে নিজের আগমনের কথা উল্লেখ করেন। কেননা পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়ে তাঁর সেই আগমন করা ও ঈশ্বর থেকে তাঁর সেই বের হওয়াটা একই অর্থ বহন করে না: সেই বাক্য দু’টোর মধ্যে সেই একই পার্থক্য রয়েছে যা জন্ম নেওয়া ও উপস্থিত হওয়া ধারণা দু’টোর মধ্যে রয়েছে। ঈশ্বর থেকে জন্ম যা প্রদান করে, সেই সত্তায় অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য ঈশ্বর থেকে বের হওয়া একটা

জিনিস, ও আমাদের পরিভ্রাণের রহস্যগুলোকে সিদ্ধতায় আনবার জন্য পিতা থেকে এই জগতে আগমন করা আলাদা জিনিস।

৩২। আমাদের প্রতিবাদের অনুক্রম অনুসরণ করে আমরা মনে করি, প্রেরিতদূতেরা যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টকে নামে শুধু নয় কিন্তু স্বরূপেই, দত্তক গুণে নয় কিন্তু জন্মসূত্রেই ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করলেন, তৃতীয় ধরনের প্রমাণ দিয়ে তেমনটা দেখাবার জন্য অধিক উপযুক্ত সময় এসেছে (ক)। নিজের ক্ষেত্রে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের উল্লিখিত বহু ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও বাকি রয়েছে যা দ্বারা তিনি, মিথ্যা-প্রণোদিত ক্ষদ্রতমও আপত্তির সম্ভাবনা বিলীন ক’রে নিজের ঐশ্বরিক জন্মের সত্যকে সপ্রমাণ করেন। কিন্তু অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করায় পাঠকের মন ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়, তাছাড়া, যেহেতু তাঁর জন্মের স্বরূপ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়ে গেছে সেজন্য বাকি যত প্রমাণকে নানা বিতর্কিত বিষয় স্পষ্ট করার জন্য আপাতত অব্যক্ত রাখা হবে। আমাদের আলোচনায় আমরা এজন্যই এই অনুক্রম স্থির করেছি যাতে করে পিতার দেওয়া প্রমাণের পর ও পুত্রের দেওয়া আত্মপ্রকাশের পর আমরা এখন সত্যকার ও সত্যিকারে সঞ্জাত ঈশ্বরের পুত্রকে স্বীকার করা ক্ষেত্রে প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস বিষয়ে শিক্ষা পেতে পারি। তাই আমাদের দেখতে হবে, ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’ প্রভুর উচ্চারিত বাক্যে প্রেরিতদূতেরা তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপের জন্মকে অবলম্বন করে অন্য কিছুই লক্ষ করেছেন কিনা।

৩৩। অস্পষ্ট এমন বহু উক্তির পরে যা তাঁরই দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল যাকে প্রেরিতদূতেরা ইতিমধ্যে মোশি ও নবীদের পূর্বঘোষিত খ্রিস্ট বলে জানতেন, যাকে নাথানায়েলও ঈশ্বরের পুত্র ও ইস্রায়েলের রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন, পিতা বিষয়ক প্রশ্নের জন্য যিনি ফিলিপকে ভর্তসনা করেছিলেন (প্রভু তাঁকে এজন্য ভর্তসনা করেছিলেন কারণ সেই ফিলিপ খ্রিস্টের সাধিত পরাক্রম-কর্মের ভিত্তিতে এটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে পিতা তাঁরই মধ্যে ও তিনি পিতাতে ছিলেন; এবং তেমনটা তখনও ঘটত যদিও তিনি প্রায়ই বুঝিয়েছিলেন যে তিনি পিতার থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন), সেই প্রেরিতদূতেরা যখন খ্রিস্টকে একথা বলতে শোনেন যে তিনি পিতা থেকে বেরিয়েছেন,

তখন তাঁরা এভাবে উত্তর দেন (সুসমাচারে উল্লিখিত উক্তি এ), তাঁর শিষ্যেরা বললেন, এই যে এখন আপনি স্পষ্টভাবেই কথা বলছেন, কোন রূপক ব্যবহার করছেন না। এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন ও কারও প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকা আপনার দরকার হয় না। এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন (ক)। জিজ্ঞাসা করি : তিনি যে ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন, তাঁর এবাণীতে বিশ্বয়কর কী আছে? হে পবিত্র ও ধন্য মানুষ, তোমাদের বিশ্বাসের জন্য পুরস্কার স্বরূপ তোমরা স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি পেয়েছ ও স্বর্গে ও পৃথিবীতে বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার অধিকার পেয়েছ, তোমরা তো দেখেছিলে যে সেই মহৎ ও সত্যিকারে ঐশ্বরিক কাজ ঈশ্বরের পুত্র আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। অথচ শুধু এখন, যখন তিনি প্রথমবারের মত বলেন যে তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন, এখনই মাত্র কি তোমরা নির্দিধায় ঘোষণা কর যে সত্য-জ্ঞান পেয়েছ? তোমরা অবশ্যই সেই বিয়ে ভোজের জল দেখেছিলে যা এক স্বরূপ থেকে অন্য স্বরূপে স্থানান্তর দ্বারা বা পরিবর্তনের ফলে বা রূপান্তরের ফলে বা সৃষ্টির ফলে বিয়ে ভোজের উপযুক্ত আঙুররস হয়েছিল। তাছাড়া তোমরা সেই মহৎ লোকারণের খাদ্যরূপে পাঁচখানা রুটি ছিঁড়েছিলে; এবং সবাই তৃপ্ত হওয়ার পর সেই রুটিগুলোর অবশিষ্টাংশ ধরার জন্য বারোখানা বুড়ি লেগেছিল, এবং ক্ষুধা লঘু করতে করতে সেই খাদ্যের ক্ষুদ্র পরিমাণ একই স্বরূপের খাদ্যের বহু পরিমাণে বেড়ে গেছিল। তোমরা সেই নুলো হাত তেজময় হতে, সেই বোবাদের জিহ্বা কখনে মুক্ত হতে, খোঁড়াদের পা দৌড়ে দ্রুত হতে, অন্ধদের চোখ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে ও মৃতদের জীবনে ফিরে আসতে দেখেছিলে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলেন সেই লাজার [খ্রিস্টের] বাণীতে পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন ও কবরের বাইরে আহূত হয়ে সেই বাণী ও জীবনে তাঁর ফিরে আসার মধ্যকার বিলম্ব ছাড়া অবিলম্বেই বেরিয়ে এসেছিলেন ও হাওয়া তখনও নাসারন্ধ্রে মরণের গন্ধ বইতে বইতে, এই যে, সেই লাজার জীবিত অবস্থায় উপস্থিত। প্রভুর মহৎ ও ঐশ্বরিক পরাক্রমের বাকি অলৌকিক কাজের কথা উল্লেখ করব না। তাই এখন, প্রথমবারের মত, ‘আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি’ তাঁর একথা শোনার পর তোমরা নাকি বুঝে ফেলেছ, তিনি স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়েছেন? এসত্য প্রথমবারের মতই রূপক ছাড়া তোমাদের বলা হয়েছে, ও প্রথমবারের মতই তোমরা নাকি তাঁর স্বরূপের পরাক্রমের ভিত্তিতে বুঝে ফেল যে তিনি

সত্যিকারে ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন? এবং তেমনটা কি তখনই ঘটে যখন তিনি নীরবে তোমাদের মনের চিন্তা-ভাবনা বোঝেন, অজ্ঞ মানুষের মত কোন প্রশ্ন রাখেন না ও এমনটা দেখান যে তিনি সবই জানেন। এই যে সমস্ত কিছু তিনি নিজের পরাক্রম ও ঐশ্বরিক স্বরূপ গুণে সাধন করেন, তা এবিশ্বাস সমর্থন করে যে, তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন।

৩৪। ব্যাপারটা এমনটা হলে, তবে এটা দাঁড়ায় যে, পবিত্র প্রেরিতদূতেরা সেসময় ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’ বচনের অর্থ অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বর থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, তা বোঝেননি। কেননা তাঁর আগের সমস্ত উপদেশে তাঁরা বহুবার তাঁকে একথা স্বীকার করতে শুনিয়েছিলেন যে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যখন এটা শোনেন যে তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন, যখন তাঁর কর্মের ভিত্তিতে তাঁরা দেখতে পান যে তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক স্বরূপ সত্যিই উপস্থিত, তখন তিনি যে ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন এতে তাঁরা তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ চিনে নেন ও সেইজন্য বলেন, ‘এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন ও কারও প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকা আপনার দরকার হয় না। এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন’। তাঁরা এজন্যই বিশ্বাস করেন যে তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের কাজ করতে পারেন এমনকি তা করেন। তিনি যে পিতা থেকে এসেছেন তা নয়, তিনি যে পিতা থেকে বেরিয়েছেন তা-ই তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপকে নির্দিষ্ট করে। ফলে তাঁরা যে সত্য এখন প্রথমবারের মত ঘোষিত বলে শুনতে পাচ্ছেন, সেই সত্যে নিজেদের বিশ্বাস দেখাবার জন্য তাঁরা সেই সত্যকে সপ্রমাণ করেন। প্রভু দু’টো ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন, ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি ও পিতা থেকে এই জগতে এসেছি’। এবং ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি ও পিতা থেকে এই জগতে এসেছি’ এই যে উক্তি তাঁরা বহুবার শুনিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা বিস্মিত নন। কিন্তু তাঁদের উত্তর এটা প্রকাশ করে যে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সেই আরেকটা উক্তি তথা ‘আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি’ বিশ্বাস করেন ও বোঝেন। কেননা তাঁরা শুধু এই উক্তিরই দিকে নির্দেশ করছেন যখন বলেন, ‘এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন’ ও এমনটা যোগ করেন না যে, ‘আপনি পিতা থেকে এই জগতে এসেছেন’ (ক)। তাই একটা উক্তির পরে একটা ঘোষণা আসে, কিন্তু অন্য উক্তির পরে নীরবতা আছে; আগে

কখনও শোনা কথার ফলেই সেই ঘোষণা উপস্থাপিত হয়, কিন্তু সত্যকে উপলব্ধিই তাঁদের নিশ্চয়তা বিষয়ে সাক্ষ্যদান দেবার প্রয়োজনীয়তা জাগায়। তাঁরা আগে থেকে জানতেন যে, ঈশ্বর বলে তিনি সবই করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর [অনন্তকালীন] জন্মের কথা তাঁদের কাছে তখনও প্রকাশিত হয়নি, এবং তিনি যে ঈশ্বর থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন একথা জানা সত্ত্বেও তাঁরা এটা জানতেন না যে তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছিলেন। এখন, যেহেতু তাঁরা সেই বাণীর অর্থ থেকে পুত্রের অনির্বচনীয় ও সিদ্ধতাবিশিষ্ট জন্মের কথা বোঝেন, সেজন্য এ স্বীকার করেন যে, তিনি রূপক ছাড়া কথা বলছেন।

৩৫। কেননা মানবীয় প্রসব ক্ষেত্রে যেভাবে হয়, ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে সেইভাবে সঞ্জাত হন না; এবং যে বীজ আমাদের উৎপত্তি ঘটায় তেমন বীজের প্রভাবে যেভাবে একটা মানুষ অন্য মানুষ থেকে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে তিনি উৎপন্ন হন না। [ঈশ্বরের] জন্ম নিখুঁত, সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও নিষ্কলঙ্ক; সেটার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এটা যে, প্রসবের চেয়ে সেই জন্ম বরং হলো বের হওয়া। তিনি এক থেকে এক। এটা একটা অংশ, একটা বিচ্ছেদ, হাসীকরণ, প্রবহন, সম্প্রসারণ, পরিবর্তনের ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই জন্ম হলো জীবিত স্বরূপ থেকে জীবিত স্বরূপের জন্ম। সেটা হলো ঈশ্বর যিনি ঈশ্বর থেকে বের হন, কিন্তু একটা সৃষ্টজীব নয় যে ‘ঈশ্বর’ নাম বহন করার জন্য মনোনীত; তাঁর অস্তিত্ব শূন্য থেকে উৎপন্ন হয়নি, কিন্তু সনাতন যিনি, সেই অস্তিত্ব সেই সনাতনজন থেকে বের হয়; এবং ‘বের হওয়া’ শব্দটা শুরু করা নয় বরং জন্ম নেওয়া ধারণাই বহন করে। ‘ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন’ ও ‘নতুন সত্তা অস্তিত্ব পেয়েছে’ বাক্য দু’টো সমার্থক শব্দ নয়। ভাষা এই ঐশ্বরিক জন্মকে চিহ্নিত করতে পারে না কারণ সেই জন্ম অনির্বচনীয়, তথাপি সেই পুত্রের শিক্ষার উপরে স্থাপিত বিশ্বাসের এই নিশ্চয়তা রয়েছে যিনি প্রকাশ করেন, তিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন।

৩৬। ঈশ্বরের পুত্র যে কেবল নামেই ঈশ্বর কিন্তু স্বরূপে নন, তেমন বিশ্বাস সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস নয়। এই নাম যদি এমন যা দত্তক পুত্রকে নির্দেশ করে, ও যদি এমনটা নয় যে তিনি ঈশ্বর থেকে বের হওয়াই পুত্র, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা

করি, যোনার ছেলে সেই সুখী শিমোন কেনই বা ঘোষণা করেন, আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র? (ক)। কেনই বা তিনি গোটা মানবজাতির সঙ্গে মিলিত হয়ে নবজন্মদানকারী সাক্রামেন্টের গুণে ঈশ্বরের পুত্রদের একজন বলে জন্ম নিতে পারেন? যদি খ্রিষ্ট শুধু এই ভিত্তিতেই ঈশ্বরের পুত্র, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই যে ঐশ্বর্যপ্রকাশ যা রক্তমাংস নয়, স্বর্গস্থ পিতাই পিতরকে দিয়েছিলেন, সেই ঐশ্বর্যপ্রকাশ কী? সবার কাছে প্রযোজ্য একটা ঘোষণার মূল্য কি? সবার কাছে জ্ঞাত একটা বিষয় প্রকাশ করাতে গর্ব করার কী আছে? খ্রিষ্ট দত্তকসূত্রে পুত্র হলে তবে, যা পবিত্রজনদের মিলিত বৈশিষ্ট্য, পিতর যখন পুত্রকে সেই ‘পুত্র’ বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন, তখন তাঁর স্বীকৃত সুখের কী লাভ? বরং প্রেরিতদূতের বিশ্বাস মানবীয় জ্ঞানের অতীতেই নিজেকে প্রসারিত করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি বহুবার এবাণী শুনেছিলেন, তোমাদের যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন (খ)। সুতরাং প্রেরিতদূত ভালই জানতেন যে খ্রিষ্ট প্রেরিত হয়েছিলেন; এবং তিনি যে প্রেরিত হয়েছিলেন তা শুধু জানতেন না, কিন্তু তাঁকে একথা বলতেও শুনেছিলেন, ‘সবই আমার পিতা দ্বারা আমাকে দেওয়া হয়েছে, ও পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া’। তবে এখন পিতা পিতরকে যা প্রকাশ করেন ও যা সেই সুখময় স্বীকারোক্তির প্রশংসা লাভ করে, সেই সত্য কী? তিনি হয় তো কি ‘পিতা’ ও ‘পুত্র’ নাম দু’টো জানতেন না? তিনি তো সেই নাম দু’টো প্রায়ই শুনেছিলেন। অথচ তিনি এমন বাণী উচ্চারণ করেন যা মানুষের জিহ্বা কখনও উচ্চারণ করেনি, ‘আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র’। দেহে থাকাকালে খ্রিষ্ট নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু এখন, প্রথমবারের মত, প্রেরিতদূতের বিশ্বাসই তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক স্বরূপের উপস্থিতি চিনে নেয়। পিতর কেবল সম্মান প্রদানের জন্য নয়, কিন্তু রহস্যময় সত্যকে চিনে নেওয়ার জন্যই প্রশংসিত, কেননা তিনি খ্রিষ্টকে শুধু স্বীকার করেননি, কিন্তু সেই খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলেই স্বীকার করেছিলেন। অবশ্যই, সম্মান প্রদানের জন্য ‘আপনি সেই খ্রিষ্ট’ বলা যথেষ্টই হত, কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে খ্রিষ্টকে স্বীকার করা কিন্তু তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার না করা অকেজোই একটা স্বীকারোক্তি হত। ‘আপনি’ বলায় তিনি তাঁর সত্যকার

স্বরূপের স্বীয় পরাক্রম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। তাছাড়া পিতা ‘ইনি আমার পুত্র’ ঘোষণা করায় পিতরকে এটা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁকে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলেই স্বীকার করতে হবে, কেননা সেই ‘ইনি’ কথাটা সেই ঈশ্বরকে নির্দেশ করে যিনি প্রকাশ করছেন, ও ‘আপনি’ উত্তরটা সেই বিশ্বাসীকে ব্যক্ত করে যিনি সত্যকে চিনে নেন। সুতরাং, মণ্ডলীকে গঁথে তোলাটা [খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত] এই স্বীকারোক্তি-পাথরের উপরেই বিরাজ করে। কিন্তু রক্তমাংসের উপলব্ধি-শক্তি [খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত] এ স্বীকারোক্তির অর্থ উদ্ঘাটন করতে অক্ষম। ঈশ্বরই এ রহস্যকে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ তিনি এটা প্রকাশ করেন যে খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করা শুধু নয় কিন্তু বিশ্বাস করাও দরকার। নাকি পিতরকে স্বরূপের কথা নয়, শুধু ‘পুত্র’ নামটাই প্রকাশ করা হয়েছে? ব্যাপারটা যদি শুধু নাম সংক্রান্ত হত, তাহলে তিনি স্বয়ং প্রভু থেকেই নামটা বারবার শুনেছিলেন যখন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করতেন। তবে সেই ঐশ্বর্যপ্রকাশের মূল্য কিসেতে রয়েছে? তা নাম প্রকাশে নয়, স্বরূপ প্রকাশেই রয়েছে, কেননা নামটা বহুবার ঘোষণা করা হয়েছিল।

৩৭। এবিশ্বাস হলো মণ্ডলীর ভিত : এবিশ্বাসের গুণে পাতালের দ্বার মণ্ডলীর বিরুদ্ধে শক্তিহীন। এটাই সেই বিশ্বাস যা স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠির অধিকারী। এবিশ্বাস পৃথিবীতে যা যা মুক্ত করেছে বা বেঁধে রেখেছে তা স্বর্গে মুক্ত হয় ও বেঁধে রাখা হয়। এবিশ্বাস হলো সেই দান যা পিতা আমাদের দেন যখন তিনি আমাদের এসত্য প্রকাশ করেন যে, আমাদের পক্ষে খ্রিস্টকে ভ্রান্তিময় ভাবে শূন্য থেকে আগত একটা সৃষ্টজীব বলে ভাবতে নেই বরং তাঁকে ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী ঈশ্বরের পুত্র বলেই স্বীকার করতে হবে। হে দুর্ভাগা মূর্খতার অভক্তিময় ক্ষিপ্ততা যা বয়সে ও বিশ্বাসে সুখী সেই সাক্ষ্যদাতাকে চিনে নিতে চাও না, সেই সাক্ষ্যদাতা পিতরকে চিনে নিতে চাও না যাঁর খাতিরে পিতাকে মিনতি করা হয়েছিল যেন তাঁর বিশ্বাস প্রলোভনে লোপ না পায়। তিনিই তাঁর কাছে যা চাওয়া হয়েছিল, ঈশ্বরের প্রতি নিজের ভালবাসার সেই স্বীকারোক্তি দু’ বার ঘোষণা করার পর, তৃতীয়বারের মত সেই স্বীকারোক্তি তাঁর কাছে চাওয়া হলে দুঃখ পেয়েছিলেন, তা এমন কেমন যেন তাঁর বিশ্বাস সন্দিগ্ধ ও টলমান। কিন্তু সেই তৃতীয় পরীক্ষা তাঁর দুর্বলতা শোধন করার পর তিনি তিনবার একথা শুনবার যোগ্য হলেন, ‘আমার মেসগুলির যত্ন

নাও’। সকল প্রেরিতদূত নীরব থাকতে তিনিই পিতার প্রকাশকর্মের গুণে ঈশ্বরের পুত্রকে চিনে নিয়ে মানব দুর্বলতার স্বীয় সীমা অতিক্রম করলেন ও এমন গৌরব অর্জন করলেন যা তাঁর পবিত্র বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির গুণে উচ্চতমই এক গৌরব। তাঁর কথাগুলো ব্যাখ্যার পরে আমরা কোন্ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য? তিনি খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তুমি, হে নবীন প্রচারকর্মের নকল বিশপ, তুমি তো আমাকে এমনটা মেনে নিতে বাধ্য করতে অভিপ্রায় কর যে, খ্রিস্ট এমন সৃষ্টজীব যিনি শূন্য থেকে এসেছেন। তুমি কেন সেই গৌরবময় উক্তি বিকৃত কর? খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেছেন বলেই পিতার সুখী। এটাই পিতার প্রকাশ, এটাই মণ্ডলীর ভীত, এটাই তার অনন্ততার নিশ্চয়তা। এজন্যই সেই মণ্ডলী স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠির অধিকারী, এজন্যই মণ্ডলীর পার্থিব বিচার হলো স্বর্গীয় বিচার। সেই প্রকাশের ফলে পিতার জগতের আদি থেকে আবৃত একটা রহস্য জানতে পারলেন, নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন, ঐশ্বরিক স্বরূপ প্রচার করলেন, ঈশ্বরের পুত্রকে স্বীকার করলেন। এসমস্ত সত্য যে অস্বীকার করে ও খ্রিস্টকে সৃষ্টজীব বলে স্বীকার করতে সম্মত, তাকে আগে পিতরের প্রচারকর্ম, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সুখময় অবস্থা, তাঁর বিশপ-অধিকার, তাঁর স্বীকারোক্তি অস্বীকার করতে হবে। এসমস্ত কিছু করার পর সে স্বীকার করুক সে খ্রিস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন, কেননা খ্রিস্টকে পুত্র বলে স্বীকার করায়ই পিতার সেই গৌরবময় নামগুলো অর্জন করলেন।

৩৮। হে আজকালের দুর্ভাগা ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি কি এমনটা মনে কর যে পিতার আরও বেশি সুখী হয়ে যেতেন যদি বলতেন, তুমি সেই খ্রিস্ট, ঈশ্বরের সিদ্ধতম সৃষ্টজীব; তুমি ঈশ্বরের সাধিত অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের সর্বোচ্চ সৃষ্টকর্ম; তুমি শূন্য থেকে অস্তিত্ব পেয়েছ, ও যিনি একাই মঙ্গলময়, সেই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার খাতিরেই তুমি ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত না হয়েও দত্তক গুণেই পুত্র নাম লাভ করেছ। পিতার যদি এধরনের কথা বলতেন, তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কেমন উত্তর পেতেন, কেননা যেহেতু যন্ত্রণাভোগ সংবাদের সময়ে তিনি ‘দূরের কথা, প্রভু! এমনটি আপনার কখনও ঘটবে না’ (ক) বলার কারণে তাঁকে একথা শুনতে হয়েছিল, আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা (খ)। তথাপি পিতরের মানবীয় অজ্ঞতা তাঁকে অপরাধ পর্যন্ত নিয়ে যায়নি,

কেননা পিতা তখনও যজ্ঞগাভোগের পূর্ণ রহস্যকে তাঁকে প্রকাশ করেননি, তবু তাঁর অল্প বিশ্বাস তাঁকে দণ্ডবিচার এনে দিল। তবে [হে ভ্রাতৃমতপন্থীরা,] কেনই বা পিতা পিতরকে তোমাদের এ বিশ্বাস স্বীকারোক্তি তথা পুত্র যে সৃষ্টজীব ও দত্তক তা প্রকাশ করেননি? আমি মনে করি, সেসময় ঈশ্বর ঈর্ষায়ই পিতরকে এসমস্ত সত্য থেকে বঞ্চিত রাখলেন; হ্যাঁ, তিনি তা পরবর্তীকালের জন্য স্থগিত করলেন যেন এখনই আজকালের প্রচারক এই তোমাদের জন্যই তা গচ্ছিত রাখতে পারেন। যখন স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি পাঁটে গেছে তখন তুমি বিশ্বাস পাঁটাও; যার বিরুদ্ধে পাতালের দ্বার জয়ী হবে না, সেই মণ্ডলী যখন পাঁটে যাবে তখন তুমি বিশ্বাস পাঁটাও। যদি এমন কোন নতুন প্রেরিত থাকবে যে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যা বেঁধে রাখবে ও মুক্ত করবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখবে ও মুক্ত করবে, তাহলে বিশ্বাস পাঁটাও; সত্যকার খ্রিস্ট বাদে যদি ভাবিকালে অন্য এক খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রচারিত হয়, তাহলে বিশ্বাস পাঁটাও। কিন্তু অপরদিকে, একাই এই যে বিশ্বাস খ্রিস্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেছে, সেই বিশ্বাস যখন পিতরের ব্যক্তিত্বে সমস্ত আশীর্বাদের গৌরব পাবার যোগ্য হল, তখন যে বিশ্বাস খ্রিস্টকে শূন্য থেকে সৃষ্টজীব বলে স্বীকার করতে ইচ্ছা করে, সেই বিশ্বাস অবশ্যই মণ্ডলীর চাবিকাঠির অধিকারী নয় ও সেই প্রৈরিতিক বিশ্বাস ও পরাক্রমের বাইরে স্থাপিত হওয়ায় তা মণ্ডলীর বিশ্বাস নয়, খ্রিস্টের বিশ্বাসও নয়

৩৯। সুতরাং এসো, প্রেরিতদূতদের রচিত সকল বিশ্বাস স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করি। যখন তাঁরা ঈশ্বরের পুত্রকে স্বীকার করেন, তখন সেই সকল স্বীকারোক্তি তাঁর বিষয়ে নামসূত্রে একটা পুত্রকে ও দত্তক ভিত্তিতে একটা পুত্রকে স্বীকার করে না, কিন্তু সত্যকার ঐশ্বরিক একটা স্বরূপ স্বীকার করে; তাঁকে নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব-পদ আরোপ করে না, কিন্তু ঈশ্বর থেকে সত্যকার জন্ম জনিত গৌরবই আরোপ করে। প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে করতে এমনকি এখনও সেই আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন যিনি, সেই যোহনই কথা বলুন; সেই যোহন, যাকে পিছনে রাখা হয়েছিল ও ঈশ্বরের ইচ্ছার রহস্যাবৃত নিয়তির হাতে ফেলে রাখা হয়েছিল, কেননা এমনটা বলা হয়নি তাঁর মৃত্যু হবে না, কিন্তু এটাই মাত্র বলা হয়েছিল, তিনি থেকে যাবেন (ক)। তাই তিনি নিজের প্রচলিত বলার ভঙ্গিতে কথা বলুন, ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি, সেই একমাত্র জনিত পুত্র ছাড়া যিনি

পিতার বুকে বিরাজমান ^(খ)। তাঁর মতে, [খ্রিস্টের ঐশ্বরিক] স্বরূপের সত্যতা ‘পুত্র’ নাম দ্বারা যথেষ্ট স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হচ্ছিল না, যদি না তাঁর বিশেষ অবস্থা চিহ্নিত করায় তিনি বাড়তি হিসাবে তাঁর স্বীয় স্বরূপ বিষয়ে বহিঃস্থ প্রমাণ উপস্থাপন না করতেন। কেননা তাঁকে ‘পুত্র’ নামে শুধু নয়, ‘একমাত্র জনিত’ নামেও অভিহিত করায় তিনি, খ্রিস্ট যে দত্তক পুত্র, সেই সম্ভাব্য সন্দেহও একেবারে বিলীন করলেন, কেননা একমাত্র জনিতজন বলে তাঁর অবস্থা এমনটা প্রমাণ করে যে, ‘পুত্র’ নামের জন্য তিনি পূর্ণ অধিকার রাখেন।

৪০। ‘যিনি পিতার বুকে বিরাজমান’ এবাণীর অর্থ বিষয়ে আলোচনাটা আপাতত স্থগিত করছি; এক্ষেত্রে সময়মত স্থান দেব। আপাতত আমার অনুসন্ধানের বিষয় হলো সেই ‘একমাত্র জনিত’ শব্দের অর্থ কী হতে পারে ও সেই অর্থ আমাদের কাছে কী দাবি রাখতে পারে। এবং এসো, দেখি যদি সেই শব্দ তা-ই নির্দেশ করে যা তুমি স্বীকার কর, অর্থাৎ যদি তোমার অভিমত অনুসারে তার অর্থ হলো ঈশ্বরের সিদ্ধতাবিশিষ্ট সৃষ্টজীব; যার ফলে ‘সিদ্ধতাবিশিষ্ট’ হলো ‘একমাত্র জনিত’ এর সমতুল্য শব্দ, ও ‘সৃষ্টজীব’ হলো ‘পুত্র’ এর সমার্থক শব্দ। কিন্তু যোহন সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে সিদ্ধতাবিশিষ্ট সৃষ্টজীব বলে নয়, ঈশ্বর বলেই চিহ্নিত করলেন। কিন্তু তিনি তোমার এ নিন্দাজনক কথা বিষয়ে অঙ্গুষ্ট ছিলেন না, কারণ তিনি বললেন, তিনি [অর্থাৎ পুত্র] ‘পিতার বুকে বিরাজমান’, এবং আপন প্রভু থেকে এ শুনলেন, কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায় ^(ক)। জগৎকে ভালবাসায় ঈশ্বর তার প্রতি নিজের ভালবাসার সাক্ষ্য স্বরূপ নিজের একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করলেন। যখন তাঁর ভালবাসার প্রমাণ এটাই যে, তিনি সৃষ্টজীবদের কাছে একটা সৃষ্টজীবকে মঞ্জুর করলেন ও জগতের জন্য এমন জীবকে দিলেন যা জগতেরই সম্পদ; এবং শূন্য থেকে আসা সেই জীবদের মুক্তিসাধন করার জন্য শূন্য থেকে আগত একটা জীবকে নিবেদন করলেন, তখন এটা স্পষ্ট যে, তেমন অল্পমূল্য ও তুচ্ছ উপহার মহা মঙ্গল লাভের অভিব্যক্তি নয়। অপরদিকে, সেই উপহারগুলোই মূল্যবান যেগুলো ভালবাসার সাক্ষ্য, ও আমরা সেগুলোর মহত্ত্ব ভালবাসার মহত্ত্ব থেকেই মূল্যায়ন করি।

জগৎকে ভালবাসলেন যিনি, তিনি দত্তক একটা পুত্রকে নয়, বরং তাঁর আপন একমাত্র জনিত পুত্রকেই জগৎকে দান করলেন। এখানে যত্ন, জন্ম ও সত্যই রয়েছে, দত্তকও নেই, সৃষ্টিও নেই, মিথ্যাও নেই। তাঁর ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার প্রমাণ এটা : জগতের পরিত্রাণের জন্য তিনি তাঁর আপন ও একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করলেন।

৪১। আমি পুত্রকে আরোপিত সমস্ত নাম উল্লেখ না করে এগিয়ে চলব। যেখানে বাছাই করার মত বহু বিষয় রয়েছে, সেখানে কিছুটা বর্জন করায় কোন ক্ষতি নেই। যেকোন কার্যের সবসময় একটা কারণ আছে ও যেকোন কর্মেরও আছে সেটা সম্পাদন করার প্রকাশ্য লক্ষ্য। তাই যখন সুসমাচার-রচয়িতা সুসমাচার লিখলেন, তখন নিজের লেখার লক্ষ্য প্রকাশ করলেন। এসো, দেখি, যে লক্ষ্য তিনি ব্যক্ত করেন সেই লক্ষ্য কি; তিনি বলেন, তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র (ক)। সুসমাচার লিখবার জন্য যে একমাত্র কারণ তিনি ব্যক্ত করেন, তা হলো যেন সবাই বিশ্বাস করে যে যিশু হলেন খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র। পরিত্রাণের জন্য যদি খ্রিষ্টে বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট, তাহলে তিনি কেন ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটা যোগ করলেন? কিন্তু যদি সত্যকার বিশ্বাস হলো এমনটা বিশ্বাস করা যে খ্রিষ্ট কেবল খ্রিষ্ট নন, কিন্তু তিনি খ্রিষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র, তাহলে ‘পুত্র’ নামটা সেই ‘খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র’ এর সঙ্গে দত্তকের কারণে স্বাভাবিক একটা বাড়তি হিসাবে যুক্ত নয়, কেননা পরিত্রাণের জন্য সেই নাম আবশ্যিক। সুতরাং, যদি পরিত্রাণ সেই ‘পুত্র’ নাম স্বীকারে কেন্দ্র করে, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি কেনই বা নামটা সত্যকে ব্যক্ত করে না। অন্যদিকে, যদি নামটা সত্যকে ব্যক্ত করে, তাহলে তাঁকে কোন্ অধিকারেই বা সৃষ্টজীব বলে ঘোষণা করা যাবে যখন একটা সৃষ্টজীবকে নয়, কিন্তু সেই পুত্রকেই স্বীকার করাটা আমাদের পরিত্রাণ এনে দেবে?

৪২। তবে যিশু খ্রিষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, তেমনটা বিশ্বাস করায়ই রয়েছে সত্যকার পরিত্রাণ, রয়েছে সিদ্ধ বিশ্বাসের উপকার। পুত্রের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে ছাড়া আমাদের অন্তরে পিতা ঈশ্বরের প্রতি কোন ভালবাসা নেই। এসো, তাঁর পত্রের কথা দ্বারা তাঁকে কথা বলতে শুনি, যে কেউ পিতাকে ভালবাসে, তাঁর থেকে যিনি জন্ম নিয়েছেন, সে

তাকেও ভালবাসে (ক)। জিজ্ঞাসা করি, তাঁর কাছ থেকে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি? অর্থটা হয় তো এটা কি, তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হওয়া? অন্য কথায়, কেনই বা সুসমাচার-রচয়িতা এমন মিথ্যা বলেন যখন ভ্রান্তমতপন্থী যাকে তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট বলে শেখায় তিনি তাঁকে তাঁর কাছ থেকে সঞ্জাত বলে প্রচার করেন? এসো, সবাই শুনি এই শিক্ষক কেমন ধরনের মানুষ। কেননা লেখা রয়েছে, সে-ই খ্রিস্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে (খ)। তুমি যে একটা সৃষ্টজীবের কথা বল ও শূন্য থেকে এক নবীন খ্রিস্টকে তৈরি কর, সেই তুমি আসলে কী করতে চাও? যদি তুমি তোমার স্বীকারোক্তিতে লেগে থাক, তাহলে যে তেমনটা স্বীকার করে তার নাম মনে রাখ। অথবা তুমি নাকি এমনটা ভাব যে, পিতা ও পুত্রকে স্রষ্টা ও সৃষ্টজীব বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তুমি দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করায় তোমাকে খ্রিস্টবৈরী বলে চেনা হবে না? তুমি যদি এমনটা বিশ্বাস কর যে, পিতা সত্যিকারে পিতা ও পুত্র সত্যিকারে পুত্র, তাহলে আমি নিন্দুক যেহেতু তোমার উপর এমন অপবাদের নাম আরোপ করি যা তোমার প্রাপ্য নয়। অপরদিকে, তুমি খ্রিস্টের উপরে যে উপাধি আরোপ কর সেগুলো যদি মিথ্যা এমনকি নামেমাত্র উপাধি ও তাঁর নিজস্ব উপাধি নয়, তাহলে প্রেরিতদূতের কাছ থেকে তোমার বিশ্বাসের নাম জেনে নাও, ও যে বিশ্বাস পুত্রে বিশ্বাস রাখে, তা যে কী তা শোন, পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি; পুত্রকে যে স্বীকার করে, পুত্র ও পিতাকেও সে পেয়েছে (গ)। যে কেউ পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতা-বঞ্চিত হয়, যে কেউ পুত্রকে স্বীকার করে ও তাঁকে পেয়ে থাকে, সে পিতাকেও পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, দত্তক নির্দেশক নামগুলো এখানে কেমন স্থান পায়? প্রতিটি শব্দ, সবগুলো মিলে, কি ঐশ্বরিক স্বরূপকে নির্দেশ করে না? কিন্তু জেনে নাও এ স্বরূপ কেমন।

৪৩। যোহন বলেন, কেননা আমরা জানি: ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, ও আমাদের জন্য মাংসধারণ করেছেন, যজ্ঞগাভোগ করেছেন, ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে আমাদের ধারণ করেছেন, ও এমন শ্রেষ্ঠ ধীশক্তি দিয়েছেন যেন সেই সত্যময়কে জানি ও তাঁর পুত্র সেই যিগু খ্রিস্টে বিরাজ করি: ইনিই সত্যকার পুত্র, ইনিই অনন্ত জীবন, আমাদের পুনরুত্থান (ক)। হে দুর্ভাগা, ঈশ্বরের আত্মা বিহীন, খ্রিস্টবৈরীর আত্মা ও নাম বহন করার জন্য নিরুপিত জ্ঞান যা সেই সত্য বিষয়ে অজ্ঞ যা অনুসারে ঈশ্বরের পুত্র

আমাদের পরিত্রাণের রহস্য পূরণ করতে এসেছেন, ও সেই অন্ধকারে সেই সর্বোত্তম জ্ঞানের আলো উপলব্ধি করতে অযোগ্য। যখন তুমি এমনটা সমর্থন কর যে যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র নন কিন্তু দত্তক কালে গৃহীত একটা নাম ধারণ করেন, তখন কেমন অন্ধকারময় রহস্যের মধ্য দিয়ে এ গোপন জ্ঞান শিখেছ? অথবা, আজকের দিনের এই যে মহৎ আবিষ্কার তুমি মেনে নিচ্ছ, সেটার প্রণেতা কে? নাকি, তুমি প্রেমপূর্ণ অন্তরঙ্গতায় তাঁর বুকে নিজের মাথা সাঁপে দিতে দিতে স্বয়ং প্রভুই কি এ গোপন তত্ত্ব তোমার কাছে ব্যক্ত করেছেন? অথবা, যেহেতু একাই তুমি ত্রুশের ধারে তাঁকে অনুসরণ করছিলে, সেজন্য তিনি তোমার নিজের মাতা হিসাবে মারীয়াকে তুলে নেওয়ার আদেশের মত অন্য অন্য আদেশ দিতে দিতে তুমি কি তোমার প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসার চিহ্ন রূপে এ রহস্যও শিখেছ? নাকি তুমি তখনই এ জ্ঞান অর্জন করেছ যখন পিতরের আগে আগে সমাধিগুহার দিকে দৌড়োচ্ছিলে? অথবা, দূত দলের মধ্যে, মুক্ত করা যাচ্ছিল না সীল দিয়ে মোহরযুক্ত এমন পুস্তকগুলোর মধ্যে, স্বর্গীয় চিহ্নগুলোর বিবিধ প্রভাবের মধ্যে ও চিরকালীন গায়কদলের নবীন ও অনির্বচনীয় সঙ্গীতের মধ্যেই কি তোমার পথদিশারী সেই মেঘশাবক দ্বারা তোমাকে এমন ভক্তিময় ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে যা অনুসারে পিতা পিতা নন, পুত্র পুত্র নন, স্বরূপ স্বরূপ নয়, সত্যও সত্য নয়? কেননা তোমার কাছে এসমস্ত কিছু মিথ্যায়ই পরিণত হয়। তাঁকে যে সর্বোচ্চ ধীশক্তি মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেটা গুণে প্রেরিতদূত ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ে তাঁকে সত্যকারই বলেন; তুমি তো সমর্থন কর তিনি সৃষ্ট, ঘোষণা কর তিনি দত্তক, তাঁর জন্ম অস্বীকার কর। এবং যখন তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র, অনন্ত জীবন ও পুনরুত্থান, তখন যার কাছে তিনি ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র নন, তার জন্য তিনি জীবনও নন, অনন্ত জীবনও নন, পুনরুত্থানও নন। এটা হলো প্রভুর প্রিয় শিষ্য সেই যোহনের শিক্ষা।

৪৪। কিন্তু এটার চেয়ে ভিন্ন নয় এমন বিশ্বাস তিনিই প্রচার করলেন যিনি নির্যাতনকারী থেকে পরে প্রেরিতদূত ও মনোনীত পাত্র হলেন। কেননা তাঁর কোন্ উপদেশ পুত্র-স্বীকারে কেন্দ্র করে না? কোন্ পত্র এসত্য সংক্রান্ত রহস্য ঘোষণা দ্বারা শুরু হয় না? কোন্ শব্দ যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত নয়? যখন পড়ি, আমরা তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম (ক) ও কয়েক পদ পরে, ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে

বলিরূপে তাঁর আপন পুত্রকে পাঠালেন (খ), ও যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত (গ), তখন এ বচনগুলোতে ভ্রাতৃত্বপন্থীদের ফাঁকির জন্য কোন্ স্থান রাখা রয়েছে? আমরা তো ‘তাঁর আপন পুত্র’ ও ‘তাঁর পুত্র’ পড়ি, তিনি যে দত্তক বা তাঁর সৃষ্টজীব এধরনের কথা নেই। নামটা স্বরূপকে ব্যক্ত করে, সর্বনামগুলো এমনটা জানায় তিনি সত্যকার পুত্র, প্রেরিতদূতের স্বীকারোক্তি তাঁর নিজের বিশ্বাস বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; তবে পুত্রের স্বরূপকে প্রমাণিত করার জন্য যে আর কি যোগ করা দরকার তা আমি জানি না। সেই খ্রিষ্ট যে তাঁরই পুত্র যিনি আমাদের বিশ্বাস অনুসারে হলেন স্বয়ং পিতা, তা স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাষায় তিনিই ব্যক্ত করেছেন যিনি মনোনীত পাত্র। বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু ও খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত নিজের শিক্ষা উপস্থাপনে অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট কিছুই রাখেননি। তিনি তো ভালই জানেন কারা দত্তক পুত্র, ও তাদেরও জানেন যারা নিজ নিজ বিশ্বাসের জন্য তা-ই হতে ও সেই নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কেননা তিনি বলেন, যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা ‘আব্বা, পিতা’ বলে ডেকে উঠি (ঘ)। আমরা যারা নবজন্মদানকারী সাক্রামেন্ট দ্বারা বিশ্বাস করি, সেই আমাদের উপরে মঞ্জুর করা নাম সেটাই, এবং আমাদের স্বীকারোক্তিই আমাদের সেই দত্তকপুত্রত্ব অর্জন করে। কেননা ঈশ্বরের আত্মা অনুযায়ী সম্পাদিত কর্ম আমাদের ঈশ্বরের পুত্র বলে চিহ্নিত করে। এবং যে চিৎকার আমরা জাগাই, সেটা আমাদের সত্তাময় স্বরূপের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং সেই চিৎকার হলো ‘আব্বা, পিতা’। কেননা কণ্ঠ আমাদের সেই সত্তাময় স্বরূপকে আদৌ স্পর্শ করে না, এবং [পিতা বলে] অভিহিত হওয়া ও [পিতা] হওয়া এক জিনিস নয়।

৪৫। কিন্তু এসো, এখন ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে প্রেরিতদূতের বিশ্বাস কেমন, তা বুঝতে চেষ্টা করি। মণ্ডলীর কাছে যে সমস্ত শিক্ষা তিনি দিলেন, তাতে তিনি পুত্রকে স্বীকার না করে পিতা বিষয়ে কখনও কিছুই বলেননি। তথাপি মানব ভাষা যত সর্বাধিক সূক্ষ্মতায় ধারণা ব্যক্ত করতে সক্ষম, সেই অনুসারে এটা দেখাবার জন্য যে এই নাম প্রকৃতই একটা নাম, তিনি বললেন, তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন

আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন [ইত্যাদি] (ক)। যিনি স্পষ্টভাবে ‘নিজের পুত্র’ বলে অভিহিত, তাঁকে কি এখনও কোন ভাবে ‘দত্তকপুত্র’ শব্দটা আরোপ করা যেতে পারবে? প্রেরিতদূত আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা দেখাতে অভিপ্রায় করছিলেন, ও ঈশ্বর যে আমাদের কেমন বিমুক্ত করেছিলেন তা দ্বারা সেই প্রেরিতদূত ঈশ্বরের ভালবাসা যে কেমন মহৎ তা দেখাবার জন্য আমাদের প্রকাশ করলেন যে ঈশ্বর নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি। এ সন্দেহের অতীত যে, যাদের একদিন দত্তক বলে গৃহীত হওয়ার কথা, সেই পুত্র যে তাদের খাতিরে নিজেই দত্তক বলে গৃহীত ছিলেন তা নয়, তিনি যে সৃষ্টজীবদের খাতিরে একটা সৃষ্টজীব ছিলেন তাও নয়, কিন্তু অন্যদের পুত্রদের খাতিরে তাঁর নিজের পুত্রই ছিলেন, তাদেরই খাতিরে তাঁর নিজের পুত্র ছিলেন যাদের একদিন পুত্র নামের সহভাগী হওয়ার কথা। তাঁর ভালবাসা যে কেমন মহৎ, তা বুঝবার জন্য বচনের অর্থ পরীক্ষা কর। সেই প্রকৃত অর্থ যেন না হারাও, সেজন্য তন্ন তন্ন করে দেখ ‘আপন’ শব্দটা কী নির্দেশ করে। কেননা প্রেরিতদূত পুত্রকে ‘নিজের’ বলে নির্দেশ করেন, কিন্তু আগেকার অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়ই ‘তাঁর’ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। এবং অনুবাদকের গাফিলতির কারণে যদিও বহু পাণ্ডুলিপি এই বচনে ‘নিজের পুত্র’ এর স্থানে ‘তাঁর পুত্র’ উপস্থাপন করে, তবু গ্রীক মূলপাঠ্য (প্রেরিতদূত এই গ্রীক ভাষায়ই তো কথা বলছিলেন) ‘তাঁর’ শব্দের চেয়ে এক্ষেত্রে ‘নিজের’ শব্দটা বেছে নেন। এবং যদিও সাধারণত ‘নিজের’ ও ‘তাঁর’ শব্দ দু’টোর মধ্যে বড় পার্থক্য পরিগণিত নয়, তবু প্রেরিতদূত যদিও অন্যান্য সমস্ত বচনে গ্রীক ভাষায় τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν [তোন এয়াউতু হুইয়োন] তথা ‘তাঁর পুত্র’ বাক্যটা ব্যবহার করে এসেছিলেন, এই বচনে ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο [হোস গে তু ইদিউ হুইউ উক এফেইসাতো] তথা ‘নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি’ বাক্যটা ব্যবহার করায় তিনি জোরদার করে পুত্রের সত্যকার স্বরূপ নির্দেশ করলেন। এইভাবে যিনি আগে এমনটা দেখিয়েছিলেন যে দত্তকপুত্রের আত্মা গুণে পুত্রেরা অনেকে ছিল, এখন ‘নিজের’ শব্দটা দ্বারা প্রকাশ করেন, একমাত্র জনিত সেই ঈশ্বর হলেন তাঁর নিজের পুত্র।

৪৬। তেমন ভুলভ্রান্তি মানব দুর্বলতা জনিত ভুলভ্রান্তি নয়, ও যারা ঈশ্বরের পুত্রকে অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে তারা নিজেদের অজ্ঞতার উপর দোষারোপ করতে পারে না, কেননা তারা যা অস্বীকার করে, সেই সত্য বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া তাদের উচিত নয়। এরা এটা সমর্থন করে যে, ঈশ্বরের পুত্র শূন্য থেকে আসা একটা সৃষ্টজীব। এবিষয়ে পিতা কিছুই না বলে থাকলেও, এবিষয়ে পুত্র সাক্ষ্য না দিয়ে থাকলেও, এবিষয়ে প্রেরিতদূত কিছুই ঘোষণা না করে থাকলেও তাদের নিজেদের সেই অভিমত সমর্থন করা, তা খ্রিষ্টের বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় শুধু নয়, বরং তাঁকে ঘৃণা করা বোঝায়। আপন পুত্র সম্পর্কে পিতা বলেন ‘ইনি’ (ক), নিজের সম্পর্কে পুত্র বলেন ‘যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেন, তিনিই’ (খ), পিতার স্বীকার করেন ‘তুমি’ (গ), যোহন সাক্ষ্য দেন ‘তিনি সত্যকার [পুত্র]’ (ঘ), পল ‘নিজের’ (ঙ) বলায় ক্লান্তি মানেন না, সেজন্য আমি এটা ভাবতে পারি না যে, যখন এসত্য অস্বীকৃত, তখন ঘৃণা ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই: গুরুতর অপরাধ ক্ষেত্রে অজুহাত হিসাবে অদক্ষতা জনিত ভুলের উপর দোষারোপ করা উচিত নয়। নবীদের ও তাঁর আগমনের সংবাদদাতাদের দ্বারা যে এসমস্ত ব্যাখ্যা অনুপ্রবেশ করায় ও স্পষ্ট ভাষায়ই সেগুলোকে অনুপ্রবেশ করায়, সে হলো ঠিক সেই ব্যক্তি যে ভবিষ্যতে খ্রিষ্টবৈরীর বেশে কথা বলতে আসবে। এই নবীন ধরনের প্রলোভন দিয়ে সে পরিত্রাণদায়ী বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিকে অস্থির করে তোলে। প্রথমত, যেহেতু পুত্রের ঐশ্বরিক স্বরূপ সংক্রান্ত নিশ্চয়তা হলো আমাদের বিশ্বাস, সেজন্য সে আমাদের অন্তর থেকে তা উপড়ে ফেলতে চায়; দ্বিতীয়ত, সে এমনটা দেখাতে চেষ্টা করে যে, ‘দত্তক পুত্র’ নামটা অন্য নামটা একেবারে বর্জন করে। কেননা যারা খ্রিষ্টকে একটা সৃষ্টজীব বলে মনে করে, তারা অবশ্যই খ্রিষ্টে সেই খ্রিষ্টবৈরীকে দেখতে বাধ্য, কেননা পুত্রের যা নিজস্ব গুণ, কোন সৃষ্টজীব সেটার অধিকারী হতে পারে না, ও যখন সে বলে, সে নিজেই ঈশ্বরের পুত্র, তখন মিথ্যা বলে। সুতরাং, যারা খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার করে, তারা অবশ্যই এটাই বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, সেই খ্রিষ্টবৈরীই হলো তাদের খ্রিষ্ট।

৪৭। জিজ্ঞাসা করি, তোমার অবোধ ক্ষিপ্ততায় তুমি কেমন ধরনের আশা পেতে সচেষ্ট? তোমার পরিত্রাণের কেমন নিশ্চয়তায় তুমি তোমার ঈশ্বরনিন্দাজনক মুখ দিয়ে এমনটা সমর্থন কর যে খ্রিষ্ট পুত্র নন বরং একটা সৃষ্টজীব? তোমার উচিত ছিল সুসমাচারগুলো

জানা ও এই বিশ্বাসের রহস্য দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা। কেননা তাঁর কাছে সবই সাধ্য হলেও তবু প্রভু এটা চাইলেন, যারা তাঁর কার্যকর সহায়তা প্রার্থনা করে তারা যেন নিজেদের বিশ্বাস স্বীকার করার মজুরি পায়। এর অর্থ এ নয় যে, ঈশ্বরের পরাক্রম যিনি, প্রার্থীর বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি তাঁর পরাক্রমকে বৃদ্ধি করবে, বরং অর্থ এ, তাঁর সেই সহায়তা পাওয়াটাই হবে বিশ্বাসের পুরস্কার। কেননা, যে মার্থা লাজারের খাতিরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করছিলেন যখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন মার্থা এটা বিশ্বাস করছিলেন নাকি করছিলেন না যে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল তারা অনন্তকাল ধরে মরবে না, তখন মার্থা নিজের অন্তরের বিশ্বাস এই বলে ব্যক্ত করেছিলেন, হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরের পুত্র, সেই ব্যক্তি জগতে যিনি এসেছেন (ক)। এই স্বীকারোক্তি অনন্তকালের অধিকারী, এই বিশ্বাস কখনও মরবে না। যখন মার্থা ভাইয়ের জীবনের জন্য প্রার্থনা করছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল কিনা; এবং তিনি সেইভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, যে কেউ এই সত্য অস্বীকার করে, সে কেমন জীবন আশা করতে পারে ও কার কাছে থেকে তা আশা করতে পারে যখন কেবল এই বিশ্বাসই হলো জীবন? এই বিশ্বাসের রহস্য মহান, ও সিদ্ধিই সেই সুখ যা এই স্বীকারোক্তির ফল।

৪৮। প্রভু করুণা দেখিয়ে একটা জন্মান্বকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন: প্রকৃতির প্রভু প্রকৃতির একটা খুঁত অপসারণ করেছিলেন। এই অন্ধ মানুষ ঈশ্বরের গৌরবার্থেই জন্ম নিয়েছিলেন যাতে খ্রিষ্টের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম দেখাতে পারেন, ও ঈশ্বর অপেক্ষা করলেন না সেই মানুষ নিজের বিশ্বাস স্বীকার করবে; কিন্তু সেই যে মানুষ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার ক্ষণে নিজের জন্য যিনি তত মহাদান মঞ্জুর করেছিলেন তাঁর পরিচয় জানতেন না, সে পরে বিশ্বাস শিখবার যোগ্য হল। অন্ধত্ব অপসারণ যে তাকে অনন্ত জীবন এনে দেবে তা নয়। সেজন্য সে সুস্থ হওয়ার পর যখন তাকে সমাজগৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন প্রভু এই বলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে? (ক)। এটা হচ্ছিল যেন সেই মানুষ এমনটা ভাবতে পারে যে, তার পক্ষে সমাজগৃহ থেকে বিতারণটা ক্ষতি নয়, কিন্তু বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিই তাকে প্রতিদানে অমরতা দিতে পারবে। এবং যেহেতু সেই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উত্তরে বলেছিল, প্রভু, তিনি কে, আমি

যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি? (খ), সেজন্য প্রভু চেয়েছিলেন, সেই মানুষের অজ্ঞতা থেকে যাবে না কেননা সেই মানুষ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাবার পর তেমন মহৎ বিশ্বাস-জ্ঞান অর্জনে উপকৃত হতে যাচ্ছিল; তাই তিনি একথা বলেছিলেন, তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই সে (গ)। যে অন্যান্যরা আরোগ্য প্রার্থনা করছিল, তাদের কাছে যেমন, তেমনি এর কাছেও কি প্রভু সুস্থতা লাভের প্রতিদানে বিশ্বাস-স্বীকৃতি দাবি করেন? না, আদৌ না। কেননা যখন সেই অন্ধ ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছিল, তখনই তিনি তাকে সেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু শুধু এই লক্ষ্যেই তেমনটা করেছিলেন যেন এই উত্তর পেতে পারেন, ‘প্রভু, আমি বিশ্বাস করি’ (ঘ), কারণ সেই উত্তরে ব্যক্ত বিশ্বাস দৃষ্টিশক্তিকে নয়, জীবনকেই নিরাময় করতে নিরূপিত ছিল। এখন এসো, যত্ন সহকারে একথাগুলোর মূল্য পরীক্ষা করতে চেষ্টা করি। প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, ‘ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?’ অবশ্যই, যদি সিদ্ধ বিশ্বাস খ্রিষ্ট বিষয়ে সাধারণ একটা স্বীকারোক্তিতে পূর্ণতা লাভ করত, তবে প্রশ্নটা এটাই হত, ‘খ্রিষ্টে তোমার কি বিশ্বাস আছে?’ কিন্তু, যেহেতু ভাবীকালে প্রায় সকল ভ্রান্তমতপন্থীর মুখে এ নামটা থাকত ও তাঁকে খ্রিষ্ট বলে স্বীকার করত কিন্তু তাঁকে [ঈশ্বরের] পুত্র বলে অস্বীকার করত, সেজন্য খ্রিষ্ট তাঁর যা নিজস্ব তা-ই বিশ্বাসের প্রমাণ হিসাবে দাবি করেন, তথা মানুষ যেন ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে। কিন্তু তিনি একটা সৃষ্টজীব হলে তবে ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসের কী লাভ যখন তিনি এমন খ্রিষ্টে বিশ্বাস দাবি করেন যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টজীব নন, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র?

৪৯। নাকি অপদূতেরা এই নামের প্রকৃত অর্থ বোঝেনি? এটাই উপযুক্ত যে, ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রেরিতদূতদের শিক্ষাদান দ্বারা নয়, কিন্তু অপদূতদের মুখ দ্বারা সত্যকে মেনে নেয়। সেই অপদূতেরা জোর গলায় বলে, এমনকি বহুবার জোর গলায় বলে, হে যিশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে আপনার আবার কী? (ক)। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্যই এই স্বীকারোক্তি জোর করে বের করল, এবং বাধ্যতা মেনে নিতে তাদের দুঃখে ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকার স্বাক্ষরিত। তারা তখনই তাঁর পরাক্রম দ্বারা পরাজিত যখন তাদের অধিকৃত সমস্ত দেহগুলো ছেড়ে দেয়: তখনই তাঁকে সম্মান দেয় যখন তাঁর [ঐশ্বরিক] স্বরূপ স্বীকার করে। এসমস্ত কিছুতে খ্রিষ্ট কর্মে ও নামে নিজেকে ঈশ্বরের

পুত্র বলে প্রকাশ করেন। হে ভ্রাতৃমতপন্থী, কোন্ বিষয়ের ভিত্তিতে তুমি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পার যে, তাঁকে স্বীকার করছে এমন অপদূতদের এসমস্ত চিৎকারের মধ্যে তিনি সৃষ্টজীব বলে নির্দেশিত ও [ঈশ্বরের] প্রসন্নতার খাতিরেই তিনি দত্তক পুত্র মাত্র?

৫০। খ্রিষ্ট যে কে, তা তুমি অন্তত তাদেরই কাছে শিখে নাও যারা তাঁকে জানে না (ক), যাতে যারা তাঁকে চিনে নেয় না, তারা যে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করতে বাধ্য, সেই স্বীকারোক্তি তোমার অভক্তিকে স্পর্শ করে তোলে। ইহুদীরা দেহ-বিশিষ্ট খ্রিষ্টকে চিনে নিত না, কিন্তু এ জানত যে সত্যকার খ্রিষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষীদের ব্যবহার করতে করতে ও তাদের যত সাক্ষ্যদানে একটামাত্র সত্যকথা না থাকলেও, সেসময় তাদের যাজক এই বলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তুমি কি সেই খ্রিষ্ট? ধন্য যিনি, তুমি কি তাঁর পুত্র? (খ)। [মাংসধারণ] রহস্য না জানলেও তারা [মসীহের] ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞ নয়। এবং খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র কিনা তা নয়, কিন্তু তিনি খ্রিষ্ট কিনা ও ঈশ্বরের পুত্র কিনা তা-ই জিজ্ঞাসা করে। খ্রিষ্টের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তারা ভুল করে, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র সেসম্পর্কে ভুল করে না। কেননা খ্রিষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র কিনা, সন্দেহটা এতে কেন্দ্র করে না, তাই তিনি খ্রিষ্ট কিনা তারা এটা জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে, তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র তা অস্বীকার করে না। জিজ্ঞাসা করি, যারা এবিষয়ে কিছুই জানে না, তারাও যখন এই সত্য অস্বীকার করে না, তখন যে বিশ্বাস তোমাকে এই সত্য অস্বীকার করতে চালনা করে, তোমার সেই বিশ্বাস কেমন ধরনের? যদিও সেটাই সিদ্ধ জ্ঞান যেটা এমনটা চিনে নেয় যে সর্বযুগের পূর্বে বিদ্যমান ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, তথাপি যারা মারীয়া থেকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তারাও এসম্পর্কে অজ্ঞ নয় যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। এবং লক্ষ কর, তুমি ঈশ্বরের পুত্রকে অস্বীকার করায় সেই ইহুদীরা কেমন ভক্তিহীন সংসর্গে তোমাকে আবদ্ধ করেছে। কেননা তাঁকে দণ্ডিত করার জন্য তারা যে কারণ উত্থাপন করে, তাতে তারা স্বীকার করে যে, আমাদের এক বিধান আছে, আর সেই বিধান অনুসারে এর মৃত্যু হওয়া উচিত, কেননা সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র করে তুলেছে (গ)। এটা কি সেই একই অভিযোগ নয় যা, তাঁকে সৃষ্টজীব বলে সমর্থন করতে করতে তুমিও তাঁর বিরুদ্ধে আন, অর্থাৎ সেই অভিযোগ যা অনুসারে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেন?

যখন তিনি নিজের বিষয়ে স্বীকার করেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তখন ইহুদীরা তাঁকে মৃত্যুর যোগ্য বলে বিচার করে; যখন তুমি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার কর, তখন, আমাকে বল, কেমন রায় তুমি উচ্চারণ কর? তাঁকে স্বীকার করতে ইহুদীরা যেমন অখুশি, তেমনি তুমিও অখুশি। জিজ্ঞাসা করি, যখন তোমার লক্ষ্য তাদের লক্ষ্য থেকে ভিন্ন নয়, তখন তোমার অভিমত তাদের অভিমতের চেয়ে কি ভিন্ন? যে অভক্তিতে তুমি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার কর, সেই অভক্তি তাদের অভক্তির সমান। যদিও এটা অনস্বীকার্য নয় যে, সত্য বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ায় তাদের অপরাধ লঘুতর। কেননা তিনি যে মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন তা তারা জানে না, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র এবিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ নেই। তুমি তো এমনটা বলতে পার না যে, তুমি মারীয়া থেকে তাঁর জন্ম বিষয়ে অজ্ঞ, তাসত্ত্বেও সেই তুমি এটা মেনে নাও না যে খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। নিজেদের অজ্ঞতায় তারা যদি বিশ্বাস করে, তবে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাদের এখনও নিশ্চিত সুযোগ আছে; কিন্তু পরিত্রাণ পাবার ব্যাপারে তোমার জন্য সমস্ত দরজা বন্ধ, কারণ তুমি এমন সত্যকে অস্বীকার কর যা উপেক্ষা করতে আর পার না। তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র এবিষয়ে তুমি তো অজ্ঞ নও, বাস্তবিকই তুমি তাঁকে দত্তক পুত্র বলে চিহ্নিত কর যাতে তাঁকে এমন সৃষ্টজীব বলে দেখাতে পার যিনি অন্যান্য সৃষ্টজীবদের সঙ্গে পুত্র নামের অধিকারী। তুমি তো যথাসাধ্য তাঁকে ঐশ্বরিক স্বরূপ বর্ণিত কর, ও পারলে তাঁকে নামও বর্ণিত করতে। কিন্তু তেমনটা সম্ভব না হলে তুমি নাম থেকে স্বরূপ ছিন্ন কর যাতে যিনি পুত্র বলে অভিহিত তিনি যেন ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র না হন।

৫১। বাতাস জোরে বইতে বইতে ও সাগর সংক্ষুব্ধ হতে হতে যে প্রেরিতদূতদের মঙ্গলার্থে একটা আজ্ঞা-বাণী দ্বারা নিস্তব্ধতা ফিরে এসেছিল, সেই প্রেরিতদূতদের স্বীকারোক্তি তোমার জন্য একটা সুযোগ হতে পারত, কেননা তাঁরা যেমন করেছিলেন তেমনি তুমিও [খ্রিষ্টকে] ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র বলে স্বীকার করতে পারতে ও তাঁদের উচ্চারিত কথাও আপন করে নিতে পারতে তথা, ‘সত্যি, তিনি ঈশ্বরের পুত্র’ (ক)। কিন্তু উন্মাদনার আত্মা তোমার জীবনকে নৌকাডুবিতে চালনা করছে ও ঝড়ঝঞ্ঝা তোমার অস্তির মনের উপরে বিক্ষুব্ধ সাগরের উপরেই যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে প্রভুত্ব করছে।

৫২। সেই নাবিকদের সাক্ষ্য তোমার কাছে এজন্য অনিশ্চিত মনে হতে পারে যেহেতু তুমি মনে করবে সেই সাক্ষ্য প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে আসে, তথাপি যদিও সেই সাক্ষ্য আমাকে কম বিস্মিত করে তবু আমার কাছে তা আও বেশি অধিকারসম্পন্ন। যাই হোক, সেবিষয়ে বিজাতীয়দেরও দেওয়া সমর্থন গ্রহণ করে নাও। সেই একটা লোকের কথায় কান দাও যিনি ত্রুশে পাহারা দেবার জন্য সেই কড়া প্রহরীদলের একজন ছিলেন, অর্থাৎ রোম সেনাদলের সেই সৈন্য যিনি বিশ্বাসে নমিত হলেন। খ্রিষ্টের এমন পরাক্রমী কার্যকলাপ লক্ষ করে সেই শতপতি বলেন, ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন (ক)। এ সত্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে সেই মন্দিরের পরদা যা খ্রিষ্ট প্রাণত্যাগ করার পর ছিঁড়ে যায়, সেই পৃথিবী যা কাঁপতে লাগে, সেই শৈলরাজি যা ফেটে যায়, সেই কবরগুলো যা খুলে যায়, সেই মৃতেরা যারা পুনরুত্থিত হয় (খ); এবং বিশ্বাসহীন সেই বিজাতীয় [সত্য] স্বীকার করেন। সেই কর্মকাণ্ডে তিনি প্রকৃতির পরাক্রম চিনে নেন, [ঈশ্বরের পুত্র] নামে সত্যকার ঐশ্বরিক স্বরূপ ঘোষণা করেন। সত্যের প্রমাণ এমন ও তাঁর বিশ্বাসের শক্তি এমন যে সত্যের অনস্বীকার্য বল ইচ্ছাশক্তিকে পরাজিত করে, ও যিনি তাঁকে ত্রুশে দিয়েছিলেন তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, সনাতন গৌরবের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সত্যিই ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।

২ (ক) যোহন ৫:২৩।

৩ (ক) মথি ১০:৩৩ দ্রঃ।

৪ (ক) ৪র্থ পুস্তক ১২ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) ‘গোটা দলিল ইতিমধ্যে প্রথম পুস্তকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে’। প্রকৃতপক্ষে পুস্তকটা হলো ৪র্থ পুস্তক; তবে কেনই বা সাধু হিলারিউস পুস্তকটা ৪র্থ পুস্তক বলে উপস্থাপন করেন? সম্ভবত, প্রথম তিন পুস্তক লেখার পর সাধু হিলারিউস গোটা লেখার পদ্ধতি ও পুস্তক-বিন্যাস পরিবর্তন করে বাকি পুস্তকগুলো (অর্থাৎ ৪র্থ-১২শ পুস্তক) যোগ করার সময়ে কিছুটা ভুল করেছিলেন; এজন্য ৪র্থ পুস্তক ভুলবশত ১ম পুস্তক হয়ে যায়। এধরনের ভুল অন্যান্য পুস্তকগুলোতেও পাওয়া যায়।

৫ (ক) ৪র্থ পুস্তক ১২ অধ্যায়ে উপস্থিত ‘একাই সত্যকার’ কথা এই পুস্তকে নেই।

৮ (ক) ‘পূর্ববর্তী পুস্তকগুলোতে’, অর্থাৎ, ৪র্থ ও ৫ম পুস্তক।

৯ (ক) ‘সম্প্রসারণ’: আরিউসপস্থীরা মনে করছিল, মণ্ডলীর সমর্থিত ‘প্রজনন’ ধারণা ও বালেন্তিনুসের সমর্থিত ‘সম্প্রসারণ’ ধারণা একই ধারণা; এর ফলে, যেহেতু মণ্ডলী বালেন্তিনুসের সমর্থিত ‘সম্প্রসারণ’ ধারণা ভ্রান্ত ধারণা বলে নিন্দিত করেছিল, সেজন্য তাদের মতে ‘প্রজনন’ ধারণাও ভ্রান্ত ধারণা বলে নিন্দিত হওয়ার যোগ্য হওয়া উচিত ছিল।

(খ) ‘অনন্তকালগুলোর অসংখ্য আধিপত্য’: সাধু হিলারিউস সেই এওনের (αἰών, অনন্তকাল) দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যা নানা ভ্রান্তমত সমর্থন করত।

(গ) ‘অতল গহ্বর’ (βυθός, বুথোস বা বিথোস) ও ‘নীরবতা’ (লাতিন ভাষায় ‘সিলেত্তিউম’) হলো গোটা ‘পূর্ণতার’ (πλήρωμα, প্লেরোমা) আদিকারণ, যে পূর্ণতা সেই ৩০টা এওন নিয়ে গঠিত যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সেগুলো থেকে উদ্গত। গ্রীক জ্ঞানমার্গ-পন্থীদের মতে সেই এওনগুলো ঈশ্বর থেকে সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্গত আত্মিক জীব, যেগুলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করে। সেগুলোর সংখ্যা নানা উপদল অনুসারে কম-বেশি হতে পারে। অকালীন, অশরীরী, অজনিত ও অক্ষয়শীল যে সর্বোচ্চ জীব, বালেন্তিনুসের মতে সেটার নাম হলো সিদ্ধ এওন, যা সেই অতল গহ্বর ও নীরবতার সমন্বয়ে গঠিত। এ প্রথম জোড়া থেকে, সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার ফলে অন্য কতগুলো জোড়া উদ্গত যেগুলো দ্বারা সেই ‘পূর্ণতা’ গঠিত যা সিদ্ধ ঐশজীবনের রাজ্য স্বরূপ। ‘সফিয়া’ (Σοφία, প্রজ্ঞা) নামক শেষ এওন প্রথম এওনকে তথা অতল গহ্বরকে আবিষ্কার করার চেষ্টায় জগৎকে উৎপন্ন করল; তেমন উৎপত্তির ফলে জগতের মধ্যে রয়েছে সেই সমস্ত দুর্বলতা যা যেকোন ব্যর্থ প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) ১ম পুস্তক ১৯ অধ্যায় ও ৪র্থ পুস্তক ২ অধ্যায় দ্রঃ।

(ঙ) ২৩ অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়গুলো দ্রঃ।

১০ (ক) ‘সমসত্তা’: এখানে সেই ὁμοούσιος [হমোউসিওস] শব্দকে নির্দেশ করা হচ্ছে যা নিকেয়া-মহাসভা (৩২৫ সালে) পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করে, অর্থাৎ ‘পুত্র পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী’; শব্দটার ‘কন্সুব্স্ত্যান্সিয়ালিস’ লাতিন নামটা প্রথমবারের মত সির্মিও-মহাসভায় (৩৫৭ সালে) ব্যবহৃত হয়।

(খ) যোহন ১০:৩০; ১৭:২২; কল ২:৯ দ্রঃ।

১২ (ক) ‘[পিতাতে] যা অজনিত, পুত্রতে তা-ই জন্ম নেয়, কারণ পিতাতে যা অজনিত, তা ছাড়া পুত্রতে অন্য কিছুই জন্ম নেয়নি’: অর্থাৎ, ব্যক্তি হিসাবে পিতা ও পুত্র ভিন্ন অর্থাৎ পিতা-ব্যক্তি ও পুত্র-ব্যক্তি; কিন্তু স্বরূপে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে তাঁরা এক।

১৬ (ক) পুরো বচনের জন্য ৬ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) ৩১ অধ্যায় দ্রঃ; ১২শ পুস্তক ৮... দ্রঃ।

(গ) সাম ১১০:৩ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) যোহন ১৬:২৭।

১৮ (ক) সাম ৮২:৬ লাতিন পাঠ্য।

২১ (ক) অর্থাৎ, পিতা ও পুত্র একই ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী।

২৩ (ক) মথি ৩:১৭।

(খ) মথি ৩:১১; মার্ক ১:৭; লুক ৩:১৬; যোহন ১:২৭।

(গ) ইশা ১:২ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৮-৯ দ্রঃ।

২৪ (ক) মথি ১৭:৫।

২৫ (ক) যোহন ১৭:৫।

(খ) মথি ২৬:৬৪।

(গ) যোহন ১৪:২৮।

(ঘ) যোহন ১২:২৭।

(ঙ) মথি ২৭:৪৬।

(চ) ১০ম পুস্তক ৮ ইত্যাদি দ্রঃ।

(ছ) মথি ১৫:১৩।

(জ) যোহন ১:১৬।

(ঝ) যোহন ৩:১৭।

(ঞ) যোহন ৯:৩৫ দ্রঃ।

(ট) যোহন ১১:৪১।

(ঠ) যোহন ১০:৩৬ দ্রঃ।

২৬ (ক) মথি ১১:২৭ দ্রঃ।

২৭ (ক) যোহন ৫:৩৬-৩৬।

(খ) যোহন ৫:৩৭।

২৮ (ক) যোহন ৭:২৮-২৯ দ্রঃ।

২৯ (ক) তিনি মানুষ হিসাবে যে কোথা থেকে আসছিলেন, যেহেতু এবিষয়ে ইহুদীরা অজ্ঞ ছিলেন না, সেজন্য ‘আমি কোথা থেকে আসছি’ বাক্যটা অবশ্যই পুত্রের অনন্তকালীন জন্মের প্রণেতাকেই লক্ষ্য করবে।

৩০ (ক) যোহন ৮:৪২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ১৫:২৩।

৩১ (ক) যোহন ১৬:২৬-২৮।

৩২ (ক) প্রথম ধরনের প্রমাণ হলো পিতার নানা সাক্ষ্যদান (২৩-২৭ অধ্যায়); দ্বিতীয় ধরনের প্রমাণ হলো পুত্রের নানা সাক্ষ্যদান (২৮-৩১ অধ্যায়); তৃতীয় ধরনের প্রমাণ হলো প্রেরিতদূতদের নানা সাক্ষ্যদান (৩২-৪৫ অধ্যায়)।

৩৩ (ক) যোহন ১৬:২৯-৩০।

৩৪ (ক) যোহন ১৬:২৮ লাতিন পাঠ্য।

৩৬ (ক) মথি ১৬:১৬।

(খ) মথি ১০:৪০।

৩৮ (ক) মথি ১৬:২২।

(খ) মথি ১৬:২৩।

৩৯ (ক) যোহন ২১:২২,২৩ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১:১৮ দ্রঃ।

৪০ (ক) যোহন ৩:১৬।

৪১ (ক) যোহন ২০:৩১।

৪২ (ক) ১ যোহন ৫:১ দ্রঃ।

(খ) ১ যোহন ২:২২।

(গ) ১ যোহন ২:২৩ দ্রঃ।

৪৩ (ক) ১ যোহন ২০ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৪৪ (ক) রো ৫:১০।

(খ) রো ৮:৩ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১:৯।

(ঘ) রো ৮:১৪-১৫।

৪৫ (ক) রো ৮:৩১-৩২।

৪৬ (ক) মথি ৩:১৭।

(খ) যোহন ৯:৩৭।

(গ) মথি ১৬:১৬।

(ঘ) ১ যোহন ৫:২০ দ্রঃ।

(ঙ) রো ৮:৩২।

৪৭ (ক) যোহন ১১:২৭ লাতিন পাঠ্য।

৪৮ (ক) যোহন ন৯:৩৫ দ্রঃ।

(খ) যোহন ৯:৩৬।

(গ) যোহন ৯:৩৭।

(ঘ) যোহন ৯:৩৮।

৪৯ (ক) লুক ৮:২৮।

৫০ (ক) ‘খ্রিষ্ট যে কে, তা তুমি অন্তত তাদেরই কাছে শিখে নাও যারা তাঁকে জানে না’:
অর্থাৎ, যারা খ্রিষ্টকে জানে, যখন তুমি তাদের কাছে শিখে নিতে চাও না, তখন যারা তাঁকে
জানে না তাদেরই কাছে শিখে নাও।

(খ) মার্ক ১৪:৬১।

(গ) যোহন ১৯:৭।

৫১ (ক) মথি ১৪:৩৩ দ্রঃ।

৫২ (ক) মথি ২৭:৫৪।

(খ) মথি ২৭:৫১-৫২ দ্রঃ।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৭ম পুস্তক

৭ম পুস্তক আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে এটা প্রমাণ করে যে, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’, যোহনের সুসমাচারে (১০:৩০) যে ঐক্য বিষয়ে খ্রিষ্ট কথা বলেন, তা আরিউসপন্থীদের সমর্থিত মনের ঐক্য নয়, কিন্তু স্বরূপেরই ঐক্য। এজন্য সাধু হিলারিউস এপুস্তকের শুরুতে বলেন, এ পুস্তকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	

১। আজকালের অবুঝ দুঃসাহসের বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ আমরা লিখতে বসেছি, এটা হলো সেটার সপ্তম পুস্তক। অনুক্রমের দিক দিয়ে পুস্তকটা অবশ্যই আগেকার অন্যান্য পুস্তকগুলোর পরে স্থান পায়, কিন্তু সিদ্ধ বিশ্বাস-জ্ঞান অর্জনের দিক দিয়ে পুস্তকটা হলো প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। লেখাটা শুরু করতে গিয়ে আমরা এতে অধিক সচেতন যে, আমরা যার সম্মুখীন, সুসমাচার-শিক্ষাদানের সেই পথ কঠিন ও দুর্লভ। আমাদের দুর্বলতা বিষয়ে চেতনা জনিত ভয় সেই পথে চলতে আমাদের পিছনে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, তথাপি বিশ্বাসের উদ্যম দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ও ভ্রান্তমতপন্থীদের ক্ষিপ্ততার সামনে কম্পিত হয়ে ও অজ্ঞদের বিপদ দ্বারা অস্থির আমরা যা বলতে সাহস করি না, সেই বিষয়ে নীরব থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিবিধ একটা বিপদ আমাদের বশীভূত করে, অর্থাৎ পাছে নীরব থাকা ও কথা বলা দু’টোই সত্য-পরিত্যাগ বিষয়ে আমাদের অপরাধী করে। কেননা সেই কুটিল ভ্রান্তমত বিকৃত যত মনের সহজাত অদ্ভুত চালাকিকে হাতিয়ার ক’রে চারপাশেই নিজেকে ঘিরে ফেলেছে; প্রথম, ভক্তিময় চেহারা; দ্বিতীয়, সরলমনা সকল শ্রোতাদের মনকে অসার কথন দ্বারা প্রতারণা করা;

তৃতীয়, এযুগের চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাওয়া ; অবশেষে, সত্য ব্যাখ্যা করার বেশে সেই সত্য-জ্ঞান দূরে রাখা। কেননা এই ভ্রান্তমত যখন জোর দিয়ে এটা প্রমাণ করল যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তখন ভণ্ড ভক্তিকে প্রকাশ করল ; যখন ঘোষণা করল, খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তখন অস্পষ্ট শব্দগুলো প্রয়োগে শ্রোতাদের ফাঁদে ফেলে দিল ; যখন এটাও বলল যে তিনি জন্ম নেবার আগে ছিলেন না, তখন জগতের প্রজ্ঞায় সায় দিল ; যখন এটা স্বীকার করল যে ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল ও অশরীরী, তখন মিথ্যা যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরের জন্ম অস্বীকার করল। ভ্রান্তমত আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করল ও মণ্ডলীর বিশ্বাস দ্বারা মণ্ডলীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করল ; হ্যাঁ, আমরা প্রতিবাদ করি বা নীরব থাকি উভয় ক্ষেত্রে ভ্রান্তমত আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর বিপদ ঘটাল, কারণ যা অনস্বীকার্য, তার মধ্য দিয়ে ভ্রান্তমত ঠিক তা-ই প্রচার করে যা অস্বীকার্য।

২। এসো, এমনটা স্মরণ করি যে আগের পুস্তকগুলোতেও আমরা পাঠকদের সতর্ক করেছিলাম যেন ভ্রান্তমতপন্থীদের ঈশ্বরনিন্দুক প্রচার তন্ন তন্ন পরীক্ষা ক’রে তারা এতে সচেতন হয় যে সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের একমাত্র লক্ষ্য এটা ছিল, যাতে তারা আমাদের এমনটা বিশ্বাস করাতে পারে যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্রও নন ও ঈশ্বরও নন। কেননা, এটাও ধরে নিয়ে যে তিনি কেবল এক প্রকার দত্তকের ফলেই সেই নামগুলোর [তথা ‘ঈশ্বরের পুত্র’ ও ‘ঈশ্বর’ নাম দু’টোর] অধিকারী, তবু ঈশ্বর ও পুত্র হিসাবে তাঁর স্বরূপকে আপনা আপনিই অস্বীকৃত হয়। অন্যদিকে, ঈশ্বর যে অপরিবর্তনশীল ও অশরীরী, এই সত্যকার স্বীকার তাদের দ্বারা এলক্ষ্যেই উপস্থাপিত যেন এটা অস্বীকার করা হয় যে সেই পুত্র ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত নন। উপরন্তু, তাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে ঈশ্বর এক, কিন্তু শুধু এই লক্ষ্যে যেন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস বাতিল করা হয়। তাদের মতে, অশরীরী স্বরূপ কোন জন্ম মানে না, ও আমরা যা স্বীকার করি, সেই একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকারটা এটা বিশ্বাস করার সুযোগ নিশ্চিহ্ন করে যে, পুত্র ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’। কিন্তু আগের পুস্তকগুলোতে বিধান ও নবীদের শিক্ষা হাতিয়ার করে আমরা এটা দেখিয়েছিলাম যে, তাদের তেমন প্রচার মিথ্যা ও নিষ্প্রয়োজন। ফলত, তাদের প্রতিবাদ করে আমরা এ বিশেষ গতিপথ পালন করেছি,

তথা : আমরা ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’ ধারণা উপস্থাপন করেছি, ও একইসঙ্গে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে স্বীকার করেছি; যাতে করে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরে একক ব্যক্তিত্ব আরোপ করার ফলে যেন আমাদের বিশ্বাস হ্রাসীকৃতও না হয়, দ্বিতীয় এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রচার করার ফলে যেন বিশ্বাসকে বাড়তি কিছুও যোগ করা না হয়। কেননা আমরা একাকী এক ঈশ্বরকেও স্বীকার করি না, দু’টো ঈশ্বরকেও নয়। এভাবে, তিনি যে একমাত্র তা অস্বীকার না ক’রে ও তিনি যে একাকী তা স্বীকার না ক’রে আমরা বিশ্বাসের ন্যায় পথ পালন করেছি, কেননা প্রতিটি ব্যক্তি ঐক্যে বর্তমান, কিন্তু সেই ব্যক্তিদের একটাও একমাত্র ঈশ্বর নন। যেহেতু আমাদের সঙ্কল্প এটা ছিল যেন সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা দ্বারা আমাদের সিদ্ধ বিশ্বাসের এই অবিনশ্বর রহস্যকে প্রমাণিত করি, সেজন্য আমাদের প্রথম কর্তব্য এটা হলো, যেন পাঠকেরা এবিষয়ে অবগত হয় যে, ঈশ্বরের পুত্র এমন স্বরূপের অধিকারী যা সত্যিকারে অস্তিত্ব ও জন্ম দ্বারা চিহ্নিত, এবং যেন এটা স্পষ্ট করা হয় যে, পুত্র অন্য কিছু থেকে বা শূন্য থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। আগের পুস্তকে দেওয়া প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, দত্তকপুত্র নামটা বাতিল হলে তবে তিনি সত্যকার জন্মের গুণেই সত্যকার পুত্র। অতএব এখন, সুসমাচারগুলোর সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতে আমরা এমন প্রমাণও উপস্থাপন করতে ইচ্ছা করি যা এটা দেখাবে যে, তিনি সত্যকার পুত্র হওয়ায় সত্যকার ঈশ্বরও; কেননা তিনি সত্যকার ঈশ্বরও না হলে তবে সত্যকার পুত্র হতে পারবেন না; সত্যকার পুত্র না হলে তবে সত্যকার ঈশ্বরও হতে পারবেন না।

৩। আসন্ন বিপদ, মানব স্বভাবের জন্য এর চেয়ে উৎপীড়ক আর কিছুই নেই, কেননা অজানা বা আকস্মিক যত অমঙ্গল মায়াময় নিরাপত্তার ভাব এনে দেয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের আতঙ্ক আনে না, কারণ যখন এক ব্যক্তি সেই অমঙ্গলের সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন, তখন উদ্বেগ নিজেই কষ্টদায়ক দুঃখ। আমি যে এখন জাহাজে করে বন্দর ছেড়ে যাচ্ছি, সেই আমি এমন নাবিক নই যে সমুদ্রের বিপদ বিষয়ে অজ্ঞ, এমন পথিকও নই যে জানে না বন ডাকাতে ভরা, এমন অনুসন্ধানকারী নই যে লিবিয়ার মরুভূমি বিষয়ে অচেতন যে সেখানে সব জায়গায় বিছে, চন্দ্রবোড়া ও বিষাক্ত সাপ উপস্থিত। আমার অশান্তি স্বস্তি পায় না ও আমার মন শান্তি মানে না। আমি সেই সকল ভ্রান্তমতপন্থীদের

মনোযোগী নজরে কথা বলি যারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতিটি কথায় একটা অজুহাত বের করতে প্রস্তুত; আমার এ প্রবন্ধের গতিপথও সরু রাস্তা দ্বারা বাধাগ্রস্ত বা গর্তের জন্য বিপন্ন বা চারদিকে ফাঁদে পরিপূর্ণ। আমার যাত্রাপথ যে কঠিন ও দুরূহ সেবিষয়ে আমি আদৌ দুঃখ প্রকাশ করি না, কেননা আমার নিজের পদাঙ্কে নয়, প্রেরিতদূতদেরই পদাঙ্কে আমি এগিয়ে চলি। কিন্তু আমি সবসময় বিপদের সম্মুখীন, কোন না কোন কাঠিন্যের জন্য পথ হারাতে বা কোন না কোন গর্তে হোঁচট খেতে বা কোন না কোন ফাঁদে পা জড়াতে সবসময় আতঙ্কিত। যেই মাত্র আমি বিধানের, নবীদের ও প্রেরিতদূতদের আত্মায় ঈশ্বরের ঐক্যের কথা ঘোষণা করতে উদ্যত, ঠিক একথা বলার মুহূর্তেই, এই যে, আমার সামনে সেই সাবেল্লিউস দাঁড়ায় যে তার নিষ্ঠুর দাঁত দিয়ে আমাকে এক গ্রাস গিলতে তৈরী কেমন যেন আমি কাম্য খাবার। আর যদি আমি সাবেল্লিউসের প্রস্তাবিত অর্থে ঈশ্বরের ঐক্য প্রত্যাখ্যান করি ও এটা স্বীকার করি যে ঈশ্বরের পুত্র সত্যকার ঈশ্বর, তবে এই যে, নবীন একটা ভ্রান্তমত (ক) দু'টো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করার জন্য ওত পেতে রয়েছে। আর শুধু তা নয়, ঈশ্বরের পুত্র যে মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন আমি যখনই একথা বলব বলে মনস্থ করি, তখনই ফতিনুস, বা অন্য যুক্তি দিয়ে হেবিওন (খ) নিজের মিথ্যা বিষয়ে সপ্রমাণ হিসাবে সত্যময় এ ঘোষণা পাকাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। অন্যান্য ভ্রান্তমতবাদীদের কথা বিষয়ে আমি নীরব থাকি, কেননা সবাই জানে, তারা মণ্ডলীর বাইরে রয়েছে। অপরদিকে এ অমঙ্গল (গ) যতই প্রায়ই নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হোক না কেন তা এখনও মণ্ডলীর অভ্যন্তরে উপস্থিত। গালাতিয়া অঞ্চল ঈশ্বরের ঐক্যের ভক্তিহীন সমর্থকের দলকে পুষ্ট করেছে (ঘ)। সত্যের বিরুদ্ধে আলেক্সান্দ্রিয়া (ঙ) প্রায় সারা জগৎ জুড়ে দু'টো ঈশ্বরের কথা অস্বীকার করেও সেই কথা ছড়িয়ে দিয়েছে। পাল্লনিয়া অঞ্চল মারীয়া থেকে খ্রিষ্টের জন্মের কথা ভক্তিহীন ব্যাখ্যা অনুসারে সমর্থন করে (চ)। এবং তেমন পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যাগুলোর মাঝে মণ্ডলী সত্য তত্ত্ব থেকে অসত্য সিদ্ধান্তে চালিত হবে বলে বিপদগ্রস্ত, কারণ ভক্তিহীন লক্ষ্যে এমন সিদ্ধান্তগুলো তার সামনে উপস্থাপিত যেগুলো বিশ্বাসকে ধ্বংস করে। আমরা ধর্মসম্মত ভাবে ঈশ্বরকে এক বলে ঘোষণা করতে পারি না যদি সেই ঈশ্বর একাকীই ঈশ্বর, কেননা একাকী ঈশ্বরে বিশ্বাস

পুত্রের ঈশ্বরত্বকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু, অন্যদিকে, আমরা যদি প্রচার করি যে, এবং এটা তো সত্য, ঈশ্বরের পুত্র নিজেই ঈশ্বর, তবে আমরা একেশ্বর-বিশ্বাস উপেক্ষা করা বিপদের সম্মুখীন। এবং তাঁর ঐক্যও অস্বীকার করা ও তাঁর একাকীত্ব স্বীকার করা এটাও একইভাবে বিপজ্জনক। এবং জগতের মূর্খতা এসমস্ত কিছু অনুভব করে না (৪), কারণ এটা ধরে নেয় যে, যখন বলা হয় ঈশ্বর একাকী নন, তখন [পিতা ও পুত্রের] ঐক্যকে পরিত্যাগ করা হয়; ও যখন বলা হয় তিনি [অর্থাৎ পিতা ও পুত্র] এক, তখন তিনি একাকী নন বলে সমর্থিত।

৪। কিন্তু আমি এই আশা রাখি, মণ্ডলী নিজের শিক্ষার আলো দ্বারা জগতের মূর্খ প্রজ্ঞাকেও আলোকিত করবে, যেন জগৎও বিশ্বাস-রহস্যকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়েও এটা মেনে নেয় যে, ভ্রান্তমতপন্থীদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে আমরাই সেই রহস্যের সত্যকে প্রচার করি। সত্যের শক্তি মহৎ, ও যদিও সেই সত্যকে নিজে থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে, তবু তার বিরুদ্ধে চালিত আক্রমণের মধ্য দিয়েও সেই সত্য নিজের আলো দেখায়। তাই, নিজের স্বরূপে অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকতে থাকতে সেই সত্য দৈনিক পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রকৃতিগত দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। এটাই মণ্ডলীর বিশিষ্ট গুণ: সে যখন আঘাতগ্রস্ত তখন বিজয়ী, সে যখন আক্রান্ত তখন স্বীকৃত, সে যখন ক্ষতিগ্রস্ত তখন লাভবান। সে অবশ্যই বাসনা করে, সকল মানুষ তার পাশেপাশে ও তার বুকে থাকবে, নিজের শান্তির বন্দর থেকে কাউকে ত্যাগ করবে না বা মানুষ তেমন মহান মাতার নিরাপদ আশ্রয়ের অযোগ্য হয়ে গেলেও সে তাকে হারাবে না; কিন্তু যখন ভ্রান্তমতপন্থীরা তাকে ত্যাগ করে ও সে তাদের বহিষ্কার করে, তখন তাদের দ্রাণ করতে না পারায় সে যে ক্ষতি বোধ করে, সেটার প্রতিদানে তার এ নিশ্চয়তা রয়েছে যে, একাই সে সুখ দান করতে পারে। এ এমন সত্য যা ভ্রান্তমতপন্থীদের উত্তপ্ত আগ্রহ অধিক স্পষ্ট করে তোলে। সবার মধ্যে একাই মণ্ডলী প্রভু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও তাঁর প্রেরিতদূতদের দ্বারা তাকে দৃঢ় করে তোলা হয়েছে, কিন্তু পরস্পর বিরোধী নানা দলের উন্মাদনাপূর্ণ ক্ষিপ্ততা এ মণ্ডলী থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে; এবং একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বাস সংক্রান্ত মতভেদের শিকড় ভ্রান্তিময় এমন ব্যাখ্যায় রয়েছে যা অনুসারে, নিজ নিজ অভিমত শাস্ত্রের উপরে না দাঁড় করিয়ে শাস্ত্রকে

বরং নিজ নিজ অভিমত অনুযায়ী সংস্কার করা হয়। তথাপি এক এক দল নিজ নিজ বিরোধিতা করতে করতে মণ্ডলী সত্যকার মণ্ডলী বলে স্বীকৃতি পায়, নিজের শিক্ষাদানের গুণে শুধু নয়, কিন্তু যারা তার বিরোধিতা করে তাদের শিক্ষার ফলেও স্বীকৃতি পায়। একাই মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সবাই দাঁড়ায়, কিন্তু সে যে একা ও একমাত্র, সেটাই সকলের একেবারে ভক্তিহীন ভ্রান্তির যথেষ্ট প্রতিবাদ। সুতরাং ভ্রান্তমতপন্থীরা সবাই মিলে মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এগিয়ে চলে, কিন্তু তারা এক একজন অন্যদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হতে কেউই নিজের জন্য বিজয়ী হয় না। তাদের বিজয় হলো তাদের সকলের উপরে মণ্ডলীর জয়যাত্রা, কারণ এক একটা ভ্রান্তমত অন্যান্য ভ্রান্তমতে সেই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যা মণ্ডলীর বিশ্বাস সেই ভ্রান্তমতগুলোতে নিন্দা করে; কেননা ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে একমত হওয়ার মত এমন কিছুই নেই; তাই এইভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তারা আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোলে।

৫। সাবেল্লিউস পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্ম সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের ঐক্য প্রচার করে, যদিও স্বরূপের যে পরাক্রম সেই [খ্রিস্ট] মানুষে কার্যকর ছিল তা যে ঐশ্বরিক ছিল, এবিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। সে পুত্র সংক্রান্ত রহস্যের কথা আদৌ ভাবে না: তার কাছে তাঁর সাধিত সমস্ত কর্ম এতই বিস্ময়কর মনে হয় যে সে এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে, যিনি সেগুলো সাধন করেছেন তিনি সত্যিকারে জনিত হয়েছিলেন। যখন সে এবাণী শোনে, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’ (ক), তখন ত্বরা করে সে ভক্তিহীন ভাবে এ সিদ্ধান্তে আসে যে, একক ব্যক্তি রয়েছে যা পিতা ও পুত্রে বর্তমান, অবিচ্ছেদ্য ও অবিভেদ্য স্বরূপ দিয়ে গঠিত। সে এটা বুঝে উঠতে পারে না যে, জন্মের নির্দেশনা দ্বারা স্বরূপের ঐক্য প্রকাশিত, কারণ পুত্রে পিতাকে দেখাটা পুত্রের ঈশ্বরত্বকে প্রমাণিত করে কিন্তু তাঁর জন্ম বিলুপ্ত করে না। তাই একজনকে জানাটা অন্যকেও জানাটা দাবি করে, কারণ স্বরূপের দিক দিয়ে সেই একজন অন্যজন থেকে ভিন্ন নন; এবং যখন কোন পার্থক্য থাকে না তখন স্বরূপটা নিশ্চিত্তে একজনের ও অন্যজনের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঈশ্বরের অবস্থায় অবস্থান করতেন যিনি (খ), তিনি আত্মপ্রকাশ করতে করতে যে ঈশ্বরের অবস্থার প্রকৃত রূপ দেখাতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জঘন্য মতবাদের মূর্খ ক্ষিপ্ততা প্রভুর এই উক্তিও অতিরিক্ত

একটা সুযোগ পায়, তথা, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ (গ)। একই স্বরূপে নিহিত যে ঐক্য-ধারণা, তা থেকে তারা অভক্তিময় ভাবে ব্যক্তির ঐক্য সংক্রান্ত ভ্রান্তিতে পদার্পণ করল; কিন্তু একক পরাক্রমই যে নির্দেশিত, বচনের যুক্তি তা মানায় না। ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ উক্তি একাকী ঈশ্বরের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে না। সেই ‘এবং’ সংযোগটা যা ‘পিতা’ শব্দটাকে যুক্ত করে, সেই সংযোগ এমনটা হতে দেয় না যে একক ব্যক্তির কথা নির্দেশিত হবে, এবং সেই বহুবচন ‘আমরা’-ও একবচনবিশিষ্ট কর্তাকে মানায় না; তাছাড়া, ‘আমরা এক’ কথা দু’টোও জন্মের কথা অস্বীকার করে না, কিন্তু এটা দেখায় যে, ধরনের দিক দিয়ে স্বরূপের কোন পার্থক্য নেই। ‘এক’ শব্দটাও পার্থক্য-ধারণাটা সমর্থন করে না, ‘আমরা’ শব্দটাও একব্যক্তি-ধারণা সমর্থন করে না।

৬। সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমতের সামনাসামনি আজকালের ভ্রান্তমতপন্থীদের মতবাদ দাঁড় করাও যাতে এরা সাবেল্লিউসের বিরুদ্ধে নিজেদের যুক্তি পেশ করতে পারে। এরা এটা বলে যে, তারা পড়েছিল ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’ (ক), এবং জন্ম-রহস্যও উপেক্ষা ক’রে ও যিনি নিজেকে শূন্য করে নিজে মাংস হন সেই ঈশ্বর-রহস্যও উপেক্ষা ক’রে তারা একথা ধ’রে যে পুত্রের চেয়ে মহান একজন আছেন সেই ভিত্তিতে [পুত্রের] স্বরূপের নিম্নতা সমর্থন করবে। সাবেল্লিউসের বিরুদ্ধে এরা এটা বলবে যে, পুত্র সেইভাবেই গঠিত তথা, তিনি পিতার ছোট, তিনি চান তাঁর অতীত গৌরব তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, তিনি মরতে ভয় পান ও মৃত্যুবরণ করেন (খ)। প্রতিবাদে সাবেল্লিউস [প্রভুর] কর্মকাণ্ডের দিকে অঙুলি নির্দেশ ক’রে [পুত্রের] ঐশ্বরিক স্বরূপ সমর্থন করে। একদিকে, আজকালের এ নবীন ভ্রান্তমত পুত্রের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস বাতিল করার জন্য একমাত্র ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করবে না; অপরদিকে সাবেল্লিউস এমনটাও বাতিল করার জন্য যে পুত্র বিদ্যমান, নিজের বিশ্বাস-স্বীকারে একমাত্র ঈশ্বর ধারণাটা রক্ষা করবে। একজন [তথা আরিউস] কর্মরত পুত্রের উপর চাপ দেয়; অপরজন [তথা সাবেল্লিউস] প্রতিবাদ ক’রে এটা বলে যে, তাঁর কর্মকাণ্ডেই তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত। একজন বলবে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন; অপরজন একমাত্র ঈশ্বরকে অস্বীকার করবে। সাবেল্লিউস নিজের অভিমত রক্ষা করবে এটা বলে যে, সেই সাধিত কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের স্বরূপ দ্বারা ছাড়া অন্য কোন স্বরূপ দ্বারা সাধিত হতে পারেনি, বস্তুত পাপের ক্ষমা, রোগ-ব্যাধির আরোগ্য,

খোঁড়াদের হাঁটাফেরা, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি, মৃতদের জীবন—এসব কেবল ঈশ্বর থেকেই আসে। যে স্বরূপ নিজের বিষয়ে পূর্ণ সচেতন, সেটা বাদে অন্য কোন স্বরূপ নেই যা বলতে পরত ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। কেনই বা তুমি আমাকে দ্বিতীয় একটা সত্তা মেনে নিতে বাধ্য করছ? কেনই বা তুমি দ্বিতীয় একটা ঈশ্বরকে মেনে নিতে তাড়না করছ? ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসূচক এ কর্মকাণ্ড একমাত্র ঈশ্বরই তো সাধন করেছেন। কিন্তু একথার বিরুদ্ধে তারাই চেষ্টামেচি জাগাবে যারা কম সাপতুল্য মুখে নয় এমন কথা দ্বারা এটা সমর্থন করে যে, পুত্র পিতা ঈশ্বরের অসদৃশ (গ), এবং বলে, তুমি তোমার পরিত্রাণ-রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ; যাঁর দ্বারা জগৎ নির্মিত হল ও মানুষ গঠিত হল, দূতদের দ্বারা যিনি বিধান দিলেন, মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, পিতা থেকে প্রেরিত হলেন, দ্রুশে বিদ্ধ হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও সমাহিত হলেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান ক’রে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন, জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা, সেই পুত্রে বিশ্বাস করা দরকার। সেই পুত্রেই আমাদের নবজন্ম লাভ করতে হয়, তাঁকেই আমাদের স্বীকার করতে হয়, তাঁর রাজ্যে আমাদের স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। মণ্ডলীর উভয় শত্রু মণ্ডলীর স্বার্থের পক্ষেই কাজে রত। সাবেল্লিউস পুত্রের কর্মকাণ্ডে ব্যক্ত [ঐশ্বরিক] স্বরূপের সাক্ষ্যদান ভিত্তি ক’রে ঈশ্বরকে প্রচার করে; তার বিপক্ষরা সত্যকার বিশ্বাস-রহস্যকে ভিত্তি ক’রে [খ্রিস্টকে] ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে।

৭। উপরন্তু, সেই যে লোকটা একই সময়ে জয়ী হয় ও পরাজিত হয়, সেই হেবিওনের ওরফে ফতিনুসের বিজয় আহা আমাদের বিশ্বাসের কেমন বিজয়। সে সাবেল্লিউসকে ভ্রান্তি বিষয়ে সাব্যস্ত করতে পারে, কেননা ঈশ্বরের পুত্র যে মানুষ, সেই সাবেল্লিউস তা অস্বীকার করে; সেই ফতিনুস আবার আরিউসপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত কারণ সে সেই মানুষে ঈশ্বরের পুত্রকে চিনে নেয় না। সাবেল্লিউসের বিরুদ্ধে সে মারীয়ার পুত্র সংক্রান্ত নানা সাক্ষ্যদান-সহ সুসমাচারগুলোকে নিজের সাহায্যে ডাকে; কিন্তু আরিউস তার সঙ্গে এবিষয়ে একমত নয় যে সুসমাচারগুলো সেই খ্রিস্টে কেবল মারীয়ার পুত্রকে উপস্থাপন করে। পুত্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যে সাবেল্লিউস, তার বিরুদ্ধে ফতিনুস একটা মানুষকে পুত্র-পদে উন্নীত করতে দাবি করে। পুত্র যে সর্বযুগের পূর্বে সঞ্জাত তেমনটা মেনে নেয় না যে ফতিনুস, তার বিরুদ্ধে আরিউস এটাই অস্বীকার করে যে ঈশ্বরের

পুত্রের জন্ম মানবীয় জন্ম মাত্র। তাদের ইচ্ছামত তারা জয়ী হোক, কারণ তারা পারস্পরিক ভাবে এক একজন অপর একজনের উপর জয়ী হতে হতে পরাজিত হয়। যারা আজকালের প্রতিপক্ষরা, তারা ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তাদের আলোচনার যুক্তিতে খণ্ডিত : সাবেল্লিউস পুত্রের জন্ম-রহস্য ক্ষেত্রে অস্বীকৃত ; ফতিনুস এতে অভিযুক্ত, কারণ সে এটা উপেক্ষা ও অস্বীকার করে যে ঈশ্বরের পুত্র সর্বযুগের পূর্বে জন্ম নিলেন। কিন্তু এসমস্ত কিছু মध्ये, সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষার ভিত্তির উপরে স্থাপিত মণ্ডলীর বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গে পুত্রের অস্তিত্ব ক্ষেত্রে সাবেল্লিউসের বিরুদ্ধে নিজের অভিমত রক্ষা করে ; আরিউসের বিরুদ্ধে মণ্ডলীর একই বিশ্বাস পুত্রের ঐশ্বরিক স্বরূপ সমর্থন করে ; ফতিনুসের বিরুদ্ধে সে এটা ঘোষণা করে যে পুত্রই জগতের স্রষ্টা ; এবং এই বিশ্বাস এতেই বিশেষভাবে সত্যাপ্রয়ী যেহেতু এসমস্ত সত্য পালাক্রমে উপরোল্লিখিত সকল প্রতিপক্ষদের দ্বারা সমর্থিত। কেননা সাবেল্লিউস এটা সমর্থন করে যে খ্রিষ্টের কর্মকাণ্ড হলো তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপের ফল কিন্তু পুত্রকে সেই কর্মকাণ্ডের প্রণেতা বলে চিনে নেয় না। তাছাড়া এরা [তথা আরিউসপন্থীরা] খ্রিষ্টকে ‘পুত্র’ নামটা আরোপ করে কিন্তু তিনি যে সত্যকার ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী তা তারা মেনে নেয় না। ফতিনুস পুত্রকে মনুষ্যত্ব আরোপ করে কিন্তু সেই মনুষ্যত্ব আরোপ করার পর এটা মেনে নেয় না যে তিনি সর্বযুগের পূর্বে ঈশ্বররূপে জন্ম নিলেন। এইভাবে এক একটা দল উল্লিখিত তত্ত্বকে রক্ষা বা নিন্দা করায় আমাদের বিশ্বাসের সত্য দেখায়, সেই যে বিশ্বাস সেই তত্ত্বগুলোর সত্যাপ্রয়ীতা অনুসারেই সেগুলোকে [যেখানে দরকার সেখানে] রক্ষা করে ও [যেখানে দরকার সেখানে] নিন্দা করে।

৮। এ ক্ষুদ্র নির্দেশনা দেওয়া আমার কাছে সঙ্গত মনে হল ; তেমনটা বহু বহু তথ্য দেবার জন্য করিনি, কিন্তু সতর্কবাণী বলেই সেইসব উপস্থাপন করেছি। আমার প্রথম লক্ষ্য এটা ছিল যেন এমনটা জ্ঞাত করতে পারি যে ভ্রান্তমতপন্থীদের সেই সমস্ত ঘোষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ও ভ্রান্তিজনক ; বাস্তবিকই তাদের পরস্পর-বিপরীত কথা আমাদের উপকারে আসে। দ্বিতীয় লক্ষ্য এটা ছিল পাছে এমন কেউই আমার উপর এই ভুল আরোপ করে যে আমি দু’টো ঈশ্বরে বা স্বতন্ত্র ও একাকী ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি ; কেননা আমি প্রকৃতপক্ষে আজকালের ভ্রান্তমতপন্থীদের ঈশ্বরনিন্দুক স্বীকারোক্তির

বিরোধিতা করি; পিতাকেও ঈশ্বর ও পুত্রকেও ঈশ্বর বলে প্রচার করি; তাছাড়া এটা স্বীকার করি যে পিতা ও পুত্র নামেও এক, স্বরূপেও এক যেহেতু উভয় অসদৃশ নয় এমন ধরনের ঈশ্বরত্বের অধিকারী। পিতা যে ঈশ্বর ও পুত্র যে ঈশ্বর, আমার এই ঘোষণায় একক ব্যক্তিকে চিনে নেওয়া সম্ভব নয়, ও তাঁদের একমাত্র স্বরূপ সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে এক ও অন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য মানে না। আগের পুস্তকে আমি সুসমাচারগুলোর সাক্ষ্যদানে ভিত্তি ক’রে তাদেরই উত্তর দিয়েছিলাম যারা এটা অস্বীকার করে যে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর থেকে সত্যিকার জন্মের গুণে অস্তিত্বের অধিকারী। এখন আমাকে এই প্রমাণ দিতে হবে যে, যিনি স্বরূপ থেকে সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র, তিনি তাঁর নিজের স্বরূপের গুণেও সত্যিকারে ঈশ্বর। কিন্তু এর ফলাফল যেন এমনটা না হয় যে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে একাকী ঈশ্বর বা দ্বিতীয় একটা ঈশ্বর ঘোষণায় পতিত করি, কেননা আমাদের সেই বিশ্বাস এমন একমাত্র ঈশ্বরকে প্রচার করবে যিনি কিন্তু একাকী নন; আবার তাঁকে একাকী নন বলে এমনভাবে স্বীকার করবে না কেমন যেন তিনি একমাত্র নন।

৯। আমরা নানা ভাবেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বর বলে জানি, তথা, তাঁর নাম, তাঁর জন্ম, তাঁর স্বরূপ, তাঁর প্রতাপ ও তাঁর নিজের স্বীকারের মাধ্যমে। নাম বিষয়ে আমি মনে করি কোন সন্দেহ নেই; কেননা আমরা পড়ি ‘আদিতে ছিলেন বাণী, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর’ (ক)। তাঁর নাম যা নির্দেশ করে, তিনি যে সেটা নন এবিষয়ে কোন্ যুক্তি থাকতে পারে? হয় তো কি সেই নাম স্বরূপটাকে নির্দেশ করে না? আরও, যেহেতু প্রতিটি বিবাদের জন্য একটা যুক্তি চাই, সেজন্য এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে ঈশ্বর, এক্ষেত্রে তা অস্বীকার করার কী কারণ রয়েছে? কেননা যে নাম তাঁকে দেওয়া হয়, তা সাধারণ, ও নামটার এমন পরকীয় সংযোজন নেই যা সন্দেহ জাগাতে পারে। যে বাণী ‘মাংস হলেন’ তিনি ঈশ্বর বাদে অন্য কিছুই নন। নামটা এমনটা হতে দেয় না কেউ না কেউ ভাববে, নামটা এমন যা তাঁকে বিশেষ অধিকার সূত্রে দেওয়া নাম বা তাঁর নিজের উদ্যোগে আপন করে নেওয়া নাম যার ফলে তাঁর পক্ষে ঈশ্বর হওয়াটা এমন নাম নয় যা [ঐশ্বরিক] স্বরূপ বর্জন করে।

১০। সেই অন্যান্য ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর যেখানে এই নাম, হয় বিশেষ অধিকার সূত্রে দেওয়া হয়েছে, না হয় আপন করে নেওয়া হয়েছে। মোশিকে বলা হয়েছিল, আমি ফারাওর কাছে তোমাকে ঈশ্বর বলে প্রতিষ্ঠিত করেছি (ক)। কিন্তু যখন তিনি বলেন ‘ফারাওর কাছে’, তখন এই সংযোজনটা কি [ঈশ্বর] নাম আরোপণের কারণ হয় না? নাকি ঈশ্বর মোশিকে ঐশ্বরিক স্বরূপের সহভাগী করলেন? অথবা এটাই কি নয় যে, মোশি যাঁকে ভয় পেতেন ঈশ্বর সেই লোকটাকে আতঙ্কিত করতে ইচ্ছা করছিলেন, উদাহরণ স্বরূপ যেইভাবে তখনই ঘটল যখন মোশির সাপ মন্ত্রজালিকদের সাপগুলোকে গ্রাস করে সাথে সাথে লাঠি হয়, যখন তিনি যে ডাঁশগুলো ঢুকিয়েছিলেন সেগুলোকে তাড়িয়ে দেন, যখন তিনি যে প্রভাবে শিলাবৃষ্টি এনেছিলেন সেই একই প্রভাবে তা বন্ধ করেন, যখন তিনি যে পরাক্রমে পঙ্গপাল এনেছিলেন সেই একই পরাক্রমে সেগুলোকে দূর করে দেন, যখন মোশির কর্মে মন্ত্রজালিকেরা স্বীকার করে, সেখানে ঈশ্বরের আঙুল আছে। এই অর্থেই মোশিকে ফারাওর কাছে ঈশ্বর বলে নিযুক্ত, যেহেতু তাঁকে ভয় করা হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়, তিনি তিরস্কার করেন, তিনি আরোগ্য দান করেন। কিন্তু ঈশ্বর বলে নিযুক্ত হওয়া একটা জিনিস, ঈশ্বর হওয়া আলাদা জিনিস। ফারাওর বেলায় তাঁকে ঈশ্বর বলে হাজির করা হয়েছিল, কিন্তু যে স্বরূপ ও নামে ঈশ্বরত্ব বিরাজিত, তিনি সেই নাম ও স্বরূপের অধিকারী নন। দ্বিতীয় এমন আর একটা উদাহরণ আমার মনে পড়ে যেখানে ‘ঈশ্বর’ নাম আরোপিত; সেই বচনে লেখা আছে, ‘আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর’ (খ), কিন্তু এবচন থেকে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে নামটা প্রসন্নতার খাতিরেই দেওয়া। ‘আমি বলেছি’ বাক্যটা এটা বোঝায় যে কথাটা প্রকৃত নামের চেয়ে বরং বক্তার অভিব্যক্তি মাত্র, কারণ প্রকৃত একটা নাম নাম-বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান দান করে, কিন্তু একটা বর্ণনা বক্তার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। এবং নামটা যে আরোপ করে সে যখন নিজেকে দেখায়, তখন নামটা বস্তু থেকে নয়, কিন্তু বক্তার কথা থেকেই উৎসারিত। আরোপিত নামটা কোন কিছুর প্রকৃতিগত স্বরূপ ব্যক্ত করে না।

১১। কিন্তু এক্ষেত্রে বাণী সত্যিকারে ঈশ্বর। সেই বাণীতে ঐশ্বরিক সত্তা অস্তিত্বশীল ও সেই সত্তা ‘বাণী’ শব্দে ব্যক্ত। ঈশ্বরের পুত্র তাঁর জন্ম-রহস্যের ফলেই ‘বাণী’ বলে অভিহিত; একই কারণে তিনি প্রজ্ঞা ও পরাক্রম বলে অভিহিত। তাঁর সত্যকার জন্ম

দ্বারা সেই যে সত্তা তাঁর নিজের অধিকার, সেই সত্তার সঙ্গে এ নামগুলো ঈশ্বরের পুত্র হবার জন্য অস্তিত্ব পেয়েছিল; তথাপি সেই নামগুলো বিষয়ে [পিতা] ঈশ্বর অভাবী নন; হ্যাঁ, সেই নামগুলো [পিতা] ঈশ্বরের নিজস্ব অধিকার হওয়ায় তাঁর অন্তর্বর্তী যদিও নামগুলো [পুত্র] ঈশ্বর হবার জন্য তাঁর নিজ থেকে সঞ্জাত হয়েছিল। আমরা যেভাবে বহুবার বলে এসেছি, যে রহস্য আমরা প্রচার করি সেটা এমন পুত্রের রহস্য যিনি বিভাজন গুণে নয় কিন্তু জন্ম গুণেই অস্তিত্বশীল। তিনি যে পৃথক ও ফলত অপূর্ণাঙ্গ একটা অংশ তা নয়, বরং তিনি সঞ্জাত, ফলত সিদ্ধতাবিশিষ্ট এক পুত্র, কেননা জন্ম জনকের হ্রাসীকরণ ঘটায় না ও যিনি জন্ম নিতে যাচ্ছেন সেই জন্ম তাঁর সিদ্ধির সম্ভাবনা বজায় রাখে। এজন্য একমাত্র জনিতজন ঈশ্বরকে সেই অপরিহার্য নামগুলো আরোপিত যেগুলো ঐশ্বরিক প্রজননের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করে ও পিতার অপরিবর্তনশীল স্বরূপ গুণে সেই পিতাতে বর্তমান। বাণী হচ্ছেন একমাত্র জনিত ঈশ্বর, কিন্তু যাঁর জন্ম সম্ভব নয় সেই পিতা বাণীকে ছাড়া থাকেন না, কখনও না, কোনও প্রকারেও নয়। পুত্র যে একটা উচ্চারিত কণ্ঠ তা নয়, কিন্তু যেহেতু তিনি সেই ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর যিনি সত্যকার জন্ম দ্বারা পূর্বাস্তিত্বের অধিকারী, সেজন্য তাঁকে ‘বাণী’ শব্দ দিয়ে নির্দেশ করা হলো যেন এটা শেখানো যেতে পারে যে তিনি পিতা থেকে উদ্ভূত ও নিজের স্বরূপের ভিত্তিতে পিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। একই প্রকারে, খ্রিষ্ট ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরাক্রম, কিন্তু এই অর্থে নয় যে, যেভাবে ব্যাপারটা সাধারণত উপলব্ধি করা হয় সেইভাবে তিনি হলেন [পিতার] প্রতাপ ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু তাঁর স্বরূপ জন্মসূত্রে সত্যকার ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় তিনি এমন নামগুলো দিয়ে নির্দেশিত যা সেই স্বরূপের অন্তর্নিহিত সত্তাকে ব্যক্ত করে। যা কিছু জন্মসূত্রে নিজস্ব অস্তিত্বের অধিকারী, তা এমন কিছুর সঙ্গে এক হতে পারে না যা অন্য কিছুর নিজস্ব অস্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু, যিনি তাঁর আপন পিতা সেই সনাতন ঈশ্বর থেকে নিজস্ব অস্তিত্বের অধিকারী ঈশ্বর রূপে অর্থাৎ ব্যক্তি রূপেই জন্ম নিলেন, পাছে সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে পিতার ঐশ্বরিক স্বরূপের পরকীয় বলে গণ্য করা হয়, সেজন্য তাঁর সত্যকার ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমাদের কাছে এমন নামগুলোর মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যেগুলো সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করে যা বিষয়ে বা বিষয়ে, তিনি যাঁর থেকে অস্তিত্ব পেয়েছিলেন, সেই পিতা হ্রাসীকরণ ভোগ করেননি। তাই যিনি

ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নন। কেননা যখন আমি ‘ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর’ বাক্য শুনি, তখন এমনটা শুধু শুনি না যে বাণী ঈশ্বর বলে অভিহিত ছিলেন, কিন্তু এটা শিখি যে তিনি ঈশ্বর। সেই পুরাকালে যখন মোশি ঈশ্বর বলে অভিহিত হয়েছিলেন ও অন্যান্যরা দেব-দেবী বলে অভিহিত হয়েছিল, তখন সম্মানসূচক একটা নাম আরোপ করার জন্যই একটা নাম যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু এখানে যখন বলা হয় ‘তিনি ছিলেন ঈশ্বর’, তখন এমন কিছু নির্দেশ করা হয় যা সত্তা সংক্রান্ত। সেই ‘ছিলেন’ শব্দটা ঐচ্ছিক একটা নাম নয় বরং ছিল অস্তিত্বমণ্ডিত একটা সত্য, সনাতন একটা আদিকারণ, তাঁর আপন স্বরূপের অপরিহার্য একটা বৈশিষ্ট্য।

১২। এসো, এবার দেখি, যখন প্রেরিতদূত থোমাস প্রভু আমার ও ঈশ্বর আমার (ক) বলে ওঠেন, তখন তাঁর স্বীকারোক্তি সুসমাচার-রচয়িতার উপরোল্লিখিত শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষা কিনা। সুতরাং, যাকে থোমাস ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন তিনি হলেন তাঁর আপন ঈশ্বর। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি প্রভুর এবাণী বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, তথা শোন, ইস্রায়েল! তোমার ঈশ্বর সেই প্রভু এক (খ)। যখন জীবন ঈশ্বরের ঐক্য স্বীকারেই যাপিত হওয়ার কথা, তখন কেমন করে একজন প্রেরিতদূতের বিশ্বাস সেই প্রধান আজ্ঞা বিষয়ে বিস্মৃত হতে ও খ্রিস্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করতে পারল? কিন্তু পুনরুত্থানের আলোর গুণেই তিনি গোটা বিশ্বাস-রহস্য উপলব্ধি করলেন, ও যেহেতু তিনি ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ (গ), ‘যা কিছু পিতার, তা সবই আমার’ (ঘ), ও ‘আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’ (ঙ) বচনগুলো প্রায়ই শুনেছিলেন, সেজন্য বিশ্বাসকে বিপদগ্রস্ত না করেই তিনি সেই নাম স্বীকার করলেন যা [খ্রিস্টের] স্বরূপ ব্যক্ত করে। কেননা ঈশ্বরের পুত্রকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করায় তাঁর ভক্তিময় বিশ্বাস একমাত্র ঈশ্বরে তথা পিতাতে বিশ্বাসকে বাতিল করছিল না, কারণ তিনি এ বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের পুত্র পিতার সত্যকার স্বরূপের চেয়ে ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী নন। এবং একমাত্র [ঐশ্বরিক] স্বরূপে যে বিশ্বাস, তা দ্বিতীয় একটা ঈশ্বরে ঈশ্বরনিন্দাজনক স্বীকারে পরিণত হবার কোন ঝুঁকির সম্মুখীন ছিল না, কারণ ঈশ্বরের সিদ্ধতাবিশিষ্ট জন্ম সঙ্গে ক’রে দ্বিতীয় একটা ঐশ্বরিক স্বরূপকে আনেনি। অতএব, সুসমাচার-রহস্যে নিহিত সত্য বিষয়ে পূর্ণ উপলব্ধিতেই থোমাস আপন প্রভু ও আপন ঈশ্বরকে স্বীকার করলেন। এখানে সম্মানসূচক নামের

ব্যাপার নয়, কিন্তু স্বরূপ বিষয়ক স্বীকারেরই ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করলেন, খ্রিষ্ট সত্তা ক্ষেত্রে ও পরাক্রম ক্ষেত্রেই ঈশ্বর। এবং প্রভু এটা সত্যায়িত করলেন যে, সেই ভক্তিময় ঘোষণা সম্মানসূচক একটা অভিব্যক্তি শুধু নয়, ছিল বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি, কেননা তিনি বললেন, দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করেছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী (চ)। বাস্তবিকই, দেখেছিলেন বলেই থোমাস বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করছ, তিনি কীবা বিশ্বাস করেছিলেন? তিনি যা ঘোষণা করেছিলেন তথা ‘প্রভু আমার ও ঈশ্বর আমার’, তাছাড়া তিনি আর কীবা বিশ্বাস করতে পারতেন? ঐশ্বরিক স্বরূপ বাদে অন্য কোন স্বরূপ স্বশক্তিতে মৃত্যু থেকে জীবনে পুনরুত্থান করতে পারত না, ও শক্ত বিশ্বাসজনিত নিশ্চয়তাই থোমাসকে এসত্যকে তথা খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর তা স্বীকার করতে সক্ষম করে তোলে। তাই যখন সেই ‘ঈশ্বর’ নাম কতিপয় প্রমাণে স্থাপিত ঐশ্বরিক স্বরূপে বিশ্বাসের ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছে, তখন আমরা কি এমনটা ভাবতে পারি যে, ‘ঈশ্বর’ নামটা বাস্তব স্বরূপ নির্দেশ করে না? কেননা যিনি নিজের ইচ্ছা পালন করতেন না কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা পালন করতেন যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন (ছ) ও নিজের গৌরব নয় কিন্তু তাঁরই গৌরব অব্বেষণ করতেন (জ) যাঁর থেকে তিনি এসেছিলেন, আপন পিতার ভক্তপ্রাণ সেই পুত্র, যে ঐশ্বরিক ঐক্য ঘোষণা করেছিলেন তা ধ্বংস না করার লক্ষ্যে অবশ্যই নিজের জন্য সেই সম্মান অস্বীকার করতেন যা সেই ধরনের নামের সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু প্রেরিতদূতের বিশ্বাসে ব্যক্ত রহস্যকে সত্যায়িত করায় ও পিতার স্বরূপকে নির্দেশ করে যে নাম, তা নিজের নাম বলে গ্রহণ করায় তিনি এটা শেখালেন যে, তারাই সুখী যারা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে না দেখা সত্ত্বেও তথাপি পুনরুত্থানের অর্থ বুঝতে পেরে বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি ঈশ্বর।

১৩। সুতরাং, এই যে নাম [ঈশ্বরের] স্বরূপকে ব্যক্ত করে, সেই নাম প্রমাণ করে, আমাদের বিশ্বাস-ঘোষণা সত্য। যে নাম একটা সত্তাকে নির্দেশ করে, সেই নাম একই ধরনের অন্যান্য সত্তাকেও জ্ঞাত করে; এবং এক্ষেত্রে সত্তা দু’টো নয়, কিন্তু একই ধরনের একটামাত্র সত্তা রয়েছে। ঈশ্বরের পুত্র যিনি তিনি ঈশ্বর: এটাই তাঁর নামে ব্যক্ত সত্য। একটামাত্র নাম দু’টো ঈশ্বরকে একীভূত করে না, কেননা ‘ঈশ্বর’ এই একমাত্র নামটা হলো একটামাত্র অদৃশ্যমান স্বরূপের নাম। যেহেতু পিতাও ঈশ্বর ও পুত্রও ঈশ্বর,

ও ঐশ্বরিক স্বরূপের বিশিষ্ট নাম উভয়কে ঘেরে, সেজন্য উভয় এক। ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে নিজের জন্মের ফলে পুত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী, কিন্তু তবুও সেই নামে তিনি ঐক্য বজায় রাখেন; পুত্রের জন্ম বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে দু'টো ঈশ্বরকে স্বীকার করতে বাধ্য করে না, কারণ সেই বিশ্বাস স্বীকার করে যে, পিতা ও পুত্র যেমন স্বরূপে তেমনি নামেও এক। অতএব, ঈশ্বরের পুত্র তাঁর জন্মের গুণে তেমন নামের অধিকারী। এবং এটাই হলো আমাদের সত্যপ্রকাশের দ্বিতীয় ধাপ, অর্থাৎ তিনি নিজের জন্মের গুণে ঈশ্বর। 'ঈশ্বর' নামটা যে নামের সত্যকার ও প্রকৃত অর্থ অনুসারে ব্যবহৃত, তা প্রমাণ করার জন্য প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্যও এখনও বাকি রয়েছে, কিন্তু আপাতত আমি সুসমাচারের বর্ণনা সম্পর্কে কথা বলা উপযোগী মনে করি।

১৪। সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করি: পুত্র যেন ঈশ্বর না হন, তাঁর জন্ম তাঁর স্বরূপে কোন্ নবীনত্ব অনুপ্রবেশ করাতে পারল? একটা জীব যে জন্মের ফলে স্বরূপ ক্ষেত্রে তার জনকের চেয়ে আলাদা হবে, মানব যুক্তি এধারণা প্রত্যাখ্যান করে। যদি না এমনটা হয় যে, ভিন্ন স্বরূপের পিতামাতা দ্বারা এমন নবীন ধরনের একটা জীব জনিত হয় যে উভয়ের স্বরূপের সহভাগী কিন্তু উভয় থেকে ভিন্ন; ব্যাপারটা প্রায়ই পশু ও বন্যজন্তুর বেলায় দেখা দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃত একটা নবীন জীবজন্তু হয় না, যদি না তা হয় এমন জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ফল যা জনকদের ভিন্ন স্বরূপে অন্তর্নিহিত। প্রজননই যে জনিতদের মধ্যে পার্থক্য স্থানান্তর করে তা নয়, বরং জনকদের থেকে আসা মিলিত ভিন্নতা নিজেতে বহন করায়ই প্রজনন জনকদের ভিন্নতা গ্রহণ করে নেয়। তবে, দৈহিক ক্ষেত্রে ভিন্নতা উৎপাদন ও গ্রহণ করার সম্ভাবনা বিষয়ে ব্যাপারটা এমনটা হলে তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ কেমন উন্মাদ ক্ষিপ্ততা যা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্মকে ঈশ্বর থেকে আগত নিকৃষ্ট স্বরূপের উপরে চাপায়? জন্ম হতে পারে না যদি না সেই জন্ম হলো জনকের বিশিষ্ট স্বরূপের ফল; সুতরাং আর কোন জন্ম হবে না যদি জনকের বিশিষ্ট স্বরূপ প্রজননের সময়ে বর্তমান ও কার্যকর না থাকে। সেই সমস্ত উগ্রতা ও ক্ষিপ্ততা শুধু এটা দেখাতে চায় যে, ঈশ্বরের পুত্র ক্ষেত্রে, জন্ম হয় না, সৃষ্টিই হয়; এটাও দেখাতে চায় যে, বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেও খ্রিষ্ট নিজের স্বরূপের উৎপত্তিকে আর রাখে না, কিন্তু শূন্য থেকে এমন স্বরূপ ধারণ করেন যা ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে ভিন্ন। কেননা [সুসমাচার-রচয়িতার]

কথা অনুসারে মাংস থেকে যা জন্মায় তা মাংসই, আর আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই (ক)। ঈশ্বর তো আত্মা, তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যিনি জন্ম নেন, তিনি যাঁর থেকে জন্ম নেন তাঁর চেয়ে তাঁর এমন কিছুই নেই যা আলাদা ও পরকীয়। সুতরাং, ঐশ্বরিক জন্ম তাঁকে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা প্রদান করে ও আমাদের এবিষয়ে জ্ঞাত করে যে, ঈশ্বরের শুরু হয়নি, তিনি বরং সঞ্জাত হলেন। অর্থ ক্ষেত্রে, শুরু হওয়া ও জন্ম নেওয়া একই নাও হতে পারে। সমস্ত কিছু শুরু হয়, বা শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসে, বা আগে যা ছিল তা হতে শেষ ক'রে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে স্থানান্তর করে। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, মাটি থেকে সোনা গঠিত হয়, শক্ত পদার্থ তরল পদার্থে, শীতল পদার্থ উষ্ণ পদার্থে, সাদা পদার্থ লাল পদার্থে স্থানান্তর করে, জল জলচর প্রাণীকে জন্মায়, প্রাণহীন বস্তু প্রাণী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বর হওয়ায় ঈশ্বরের পুত্র শূন্য থেকে আদৌ শুরু হননি বরং সঞ্জাত হলেন; ঐশ্বরিক অস্তিত্বের আগেও তাঁর অন্য কোন অস্তিত্ব হয়নি। তাই যিনি জন্মসূত্রে ঈশ্বর, ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে তাঁর শুরুও হয়নি, সেটার বৃদ্ধিও হয়নি। সেই জন্ম ঈশ্বরের পুত্রে তাঁর আদি স্বরূপ বজায় রাখে ও তিনি নিজের স্বতন্ত্র স্বরূপে এমন স্বরূপের অধিকারী নন যা ঈশ্বরের স্বরূপের চেয়ে আলাদা।

১৫। অন্যদিকে, যে কেউ এক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে, সে ইহুদীদের কাছ থেকেই পুত্রের স্বরূপ শিখে নিক, এমনকি সেই সুসমাচার থেকেই তাঁর জন্মের সত্যকথা জানুক যেখানে আমরা পড়ি, এজন্যই ইহুদীরা আরও প্রবল ভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কারণ তিনি যে শাব্বাৎ দিন লঙ্ঘন করছিলেন, তা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলছিলেন ও এইভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন (ক)। অন্যান্য বচনাদির বৈষম্যে এই বচনে ইহুদীদের প্রকৃত কথা উল্লিখিত হয় না; প্রকৃতপক্ষে এখানে সুসমাচার-রচয়িতার বর্ণনাই পাই যিনি এটাই বোঝাতে ইচ্ছা করেন কেনই বা ইহুদীরা প্রভুকে হত্যা করতে চাচ্ছিল। এটা যে এমন ত্রুটিযুক্ত শিক্ষার ব্যাপার যা ঈশ্বরনিন্দুক লোকদের অভক্তি-জনিত, একথা অজুহাত মাত্র। প্রেরিতদূতের সাক্ষ্য [পুত্রের] সত্যকার স্বরূপ প্রকাশ করে ও আমাদের দেখায়, তাঁর প্রকৃত জন্ম হয়েছিল। ‘তিনি ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলছিলেন ও এইভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন’। ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলায় যেখানে স্বরূপের সমতা নির্দেশিত, সেখানে

কি স্বরূপ থেকে স্বরূপের জন্মের কথা হয় না? এতে কোন সন্দেহ নেই, সমতা যেকোন পার্থক্যকে একেবারে বাতিল করে। তবে এখন আর কেইবা এটা ভাবতে পারবে যে, জন্ম সম্পূর্ণরূপে সমান স্বরূপকে দাবি করে না? এথেকেই মাত্র সত্যকার সমতা আসতে পারে, কারণ কেবল জন্মই স্বরূপের সমতাকে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে ব্যক্তির ঐক্য রয়েছে, সেখানে আমরা এটা ভাবতে পারতাম না যে, সমতা আছে; যেখানে স্বরূপের বৈষম্য রয়েছে, সেখানেও সমতা পেতে পারতাম না। উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিমূর্তির স্থায়ী সমতা একাকীত্ব ও বৈষম্য বাতিল করে, কারণ যেকোন সমতা আলাদা বা একক হতে পারে না।

১৬। আমাদের ব্যাখ্যা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেগুলো সাধারণ মানব যুক্তির সঙ্গে মিল রাখে, এই অর্থে যে, জন্ম স্বরূপের সমতা দাবি করে, ও যেখানে সমান দু'টো জীব উপস্থিত, সেখানে যেকোন প্রকার বৈষম্য ও একাকীত্ব সম্ভব নয়। তবু আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বয়ং প্রভুর বাণীতেই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের এমনটা করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষরা স্পর্ধা ভরে কথাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আরোপ করার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে না পারে, এমনকি, তারা যেন ঈশ্বরের তাঁর নিজের বিষয়ে দেওয়া সাক্ষ্যগুলোর বিরোধিতা করতে দুঃসাহস না করে। প্রভু [ইহুদীদের] এ উত্তর দিলেন, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা-ই করেন। কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু করেন, তা সমস্তই তাঁকে দেখান, এবং এর চেয়ে মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন, যেন আপনারা আশ্চর্য হন। পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন। কারণ পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না (ক)। বক্তব্যের প্রস্তাবিত অনুক্রম এটা দাবি করত যে, প্রতিটি বিষয়বস্তু এক একটা বিষয় তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হবে। আমরা এটা শিখেছিলাম যে, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিস্ট নামে, জন্মে,

স্বরূপে, প্রতাপে ও আত্মপ্রকাশে ঈশ্বর, সুতরাং আমাদের প্রমাণ উপরে প্রস্তাবিত অনুক্রমের এক একটা বিষয় লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জন্ম এধরনের ব্যাখ্যা মানে না যেহেতু সেই জন্মে নাম, স্বরূপ, প্রতাপ ও আত্মপ্রকাশ অন্তর্ভুক্ত। এসমস্ত কিছু না থাকলে কোন জন্ম হবে না, কারণ জন্মটা জন্মলাভেই সেই সবগুলো নিজেতে বহন করে। তবে, যেহেতু আমরা এ জন্ম বিষয়টা পরীক্ষা করতে অভিপ্রেত, সেজন্য উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বক্তব্যের যে যে স্থানে থাকার কথা, সেই স্থানেই সেগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

১৭। ইহুদীদের কাছে উত্তর দিতে গিয়ে—কেননা তিনি ঈশ্বরকে নিজের পিতা ব'লে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করেছিলেন বিধায় এরা তাঁকে হত্যা করবে বলে আরও বেশি করে ইচ্ছা করছিল—প্রভু তাদের অভক্তিময় মনের গতি নিন্দা করেন ও আমাদের গোটা বিশ্বাস-রহস্য ব্যক্ত করেন। আগের বচনে, যখন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে আরোগ্যদানের ফলে ইহুদীরা তাঁকে শাব্বাৎ দিন লঙ্ঘনের দায়ে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছিল এমনকি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি (ক)। এজন্য তাদের ঈর্ষা একেবারেই জ্বলছিল, কেননা, তাদের মতে, তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলায় নিজেকে ঈশ্বরের একই পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। এখন, যেহেতু তিনি নিজের ঐশ্বরিক জন্মকে সত্যায়িত করতে ও নিজের স্বরূপের পরাক্রম প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, সেজন্য খ্রিষ্ট বলেন, আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন (খ)। তাঁর উত্তরের এ প্রথম কথাগুলো ইহুদীদের ভক্তিহীন ঈর্ষাকেই লক্ষ্য করে, এমন ঈর্ষা যা তাঁকে মৃত্যু দেওয়া পর্যন্তই তাদের অস্থির করছিল। বাস্তবিকই, যখন শাব্বাৎ দিন লঙ্ঘনের বিষয়ে তাঁকে দোষী করা হয়েছিল, তখন খ্রিষ্ট বলেছিলেন, ‘আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি’। এতে তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজের [পিতার] আদর্শের অধিকার অনুসারেই আচরণ করছিলেন; কিন্তু এটাও বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি যা যা করছিলেন, তা পিতার কাজ বলেই গণ্য হওয়ার কথা, কেননা যিনি তাঁর অন্তরে কাজে রত ছিলেন সেই পিতারই গুণে তিনি কাজে রত ছিলেন। উপরন্তু, যখন তিনি ঈশ্বরকে পিতা

বলেছিলেন, তখন তারা যে তাঁকে এতে অভিযুক্ত করেছিল যে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন, সেই জঘন্য অভিযোগ ফিরিয়ে দেবার জন্য তিনি এও যোগ করেছিলেন, ‘আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না ; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন’। খ্রিষ্ট নিজেকে নামে ও স্বরূপে ঈশ্বরের সমান করেছিলেন, এ ঘোষণাটা পাছে মানুষকে তাঁর জন্মে বিশ্বাস রাখা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সেজন্য তিনি বলেন যে, নিজে থেকে পুত্র এমন কিছু করতে পারেন না যা তিনি পিতাকে করতে দেখেননি। তাছাড়া, যে পরিভ্রাণদায়ী মিল পিতা ও পুত্রে আমাদের বিশ্বাসকে চিহ্নিত করে, সেই মিলের প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিজের জন্মের স্বরূপ প্রকাশ করেন। তা এমন স্বরূপ যা নিজের কর্মশক্তিকে এমন ধারাবাহিক শক্তিপ্রয়োগ থেকে পায় না যা প্রতিটি কর্মের লক্ষ্যে বারে বারে মঞ্জুর করা হয়, কিন্তু সেই স্বরূপ জ্ঞান থেকেই সেই কর্মশক্তি অর্জন করে। এবং স্বরূপ সেই জ্ঞান এতে পায় না যে, পিতা কোন না কোন দৈহিক কর্ম সম্পাদন করেন বা, বলতে গেলে, এমন একটা নমুনা তৈরি করেন যাতে, পিতা আগে যা করেছেন পুত্র তা অনুকরণ করতে পারেন। ব্যাপারটা এটার বিপরীত, কেননা ঈশ্বরের স্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপেই অস্তিত্বশীল, অর্থাৎ তিনি পিতা থেকে পুত্ররূপে জন্ম নিলেন ; তিনি এতে সচেতন যে, পিতার পরাক্রম ও স্বরূপ তাঁর মধ্যে বিরাজিত ; তিনি সাক্ষ্য দেন, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করতে পারতেন না, শুধু তা-ই করতে পারতেন যা তিনি পিতাকে তা করতে দেখেছিলেন। একমাত্র জনিত ঈশ্বর পিতার পরাক্রম থেকে আগত কাজ সাধন করেন ও এজন্য তিনি নিজের উদ্যোগে সেই সমস্ত কিছু করেন যা বিষয়ে তিনি জানেন, পিতা ঈশ্বরের স্বরূপ তা করতে পারে, সেই যে স্বরূপ যা সেই স্বরূপ থেকে অবিচ্ছেদ্য যা তিনি প্রকৃত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। কেননা ঈশ্বর দৈহিক ভাবে দেখেন না, বা আরও সূক্ষ্ম ভাবে, তাঁর সমস্ত দেখাটা তাঁর স্বরূপের পরাক্রমে বিরাজ করে।

১৮। পরে তিনি আরও বললেন, কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা-ই করেন (ক)। তিনি সেই ‘একইভাবে’ যোগ করলেন নিজের জন্ম দেখাবার জন্য ; অন্যদিকে তিনি ‘যা কিছু’ ও ‘ঠিক তা-ই’ শব্দগুলো ব্যবহার করলেন নিজের সত্যকার স্বরূপ দেখাবার জন্য। ‘যা কিছু’ ও ‘ঠিক তা-ই’ শব্দগুলো বৈষম্য ও অসমতা বাতিল

করে। তাই যে কেউ এমন স্বরূপের অধিকারী যার জন্য সে সেই সমস্ত কিছু করতে পারে যা অন্য একজন করতে পারে, সে একই স্বরূপেরই অধিকারী। এবং যখন সেই সব, একেবারে সবকিছুই পুত্র দ্বারা ‘একইভাবে’ সম্পাদিত হয়, তখন কর্মে সেই সাদৃশ্য এটা বাতিল করে যে, সেই কর্ম যে সম্পাদন করে সে একাকী; ফলত পিতা যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে সেই সব, একেবারে সবকিছুই করেন। এখানেই রয়েছে পুত্রের জন্মের সত্যকার প্রমাণ ও আমাদের বিশ্বাস-রহস্যের অধিক স্পষ্ট প্রকাশ যা ঐশ্বরিক স্বরূপের ঐক্য থেকে শুরু ক’রে পিতা ও পুত্রতে একমাত্র ও অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বের সত্যকে স্বীকার করে। একই কাজ করায় পুত্র তা ‘একইভাবে’ করেন ও তা ‘একইভাবে’ করায় তিনি একই কাজ করেন। এই বাক্যে দু’টো সত্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তথা, পুত্রের কাজ যে ‘একইভাবে’ সম্পাদিত, তাতে তাঁর [অনন্তকালীন] জন্মকে প্রমাণিত; সম্পাদিত কাজ যে ‘ঠিক তা-ই’, তাতে তাঁর স্বরূপ প্রমাণিত।

১৯। নিজের উত্তরে প্রভু যে অনুক্রম পালন করেন, তা সেই অনুক্রমের সঙ্গে অখণ্ডভাবে মিল রাখে যা মণ্ডলী নিজের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে পালন করে। উভয় ক্ষেত্রে স্বরূপের বৈষম্য সমর্থিত নয়, ও জন্মের সত্য ঘোষিত। কেননা তিনি বলে চলেন, কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু করেন, তা সমস্তই তাঁকে দেখান, এবং এর চেয়ে মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন, যেন আপনারা আশ্চর্য হন। পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন (ক)। এখানে কাজের যে প্রকাশ উপস্থাপিত, সেটার উদ্দেশ্য কি এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য হতে পারে তথা যেন আমাদের অন্তরে সেই জন্ম বিষয়ে বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা হয়, ও অস্তিত্বশীল পুত্র যে অস্তিত্বশীল পিতা ঈশ্বর থেকে জনিত, তা বিশ্বাস করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করা? যদি না এমনটা বিশ্বাস করতে হয় যে, নিজের অজ্ঞতায় একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পক্ষে উপরে নির্দেশিত শিক্ষার দরকার ছিল। কিন্তু তেমন ভক্তিহীন ধারণার দুঃসাহস গ্রহণযোগ্য নয়। যা শেখাবার কথা সে সম্পর্কে যিনি সবই জানেন, তাঁর পক্ষে সেবিষয় শিক্ষা পাওয়া দরকার হয় না। কেননা পরে তিনি বলেন, ‘পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও নিজে যা কিছু করেন, তা সমস্তই তাঁকে দেখান’। তিনি এটা দেখাতে ইচ্ছা করেন যে, পিতা দ্বারা এসমস্ত প্রকাশের লক্ষ্যই হলো বিশ্বাসে

আমাদের শিক্ষাদান করা, অর্থাৎ তিনি এমনটা ইচ্ছা করেন যেন আমরা পিতা ও পুত্রকে স্বীকার করি এবং একথার ভিত্তিতে আমরা যেন এমনটা না ভাবি যে, পিতা নিজের সম্পাদিত কাজ যাকে প্রকাশ করেন, সেই পুত্রের উপলব্ধি-শক্তি কোন না কোন ভাবে অপূর্ণাঙ্গ। তিনি পর পরে বলে চলেন, ‘এবং তিনি এর চেয়ে মহত্তর কাজও তাঁকে দেখাবেন, যেন আপনারা আশ্চর্য হন। পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন’। সুতরাং, পুত্র এটা বিষয়ে অঙ্গ নন যে এমন কাজ ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে; তিনি জানেন যে সেই কাজ তাঁকে দেখানো হবে, পিতার আদর্শ অনুসারে তাঁকে মৃতদের জীবন দান করতে হবে। প্রভু এটা বলেন যে, পিতা পুত্রকে এমন কিছু দেখাবেন যা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত করবে, এবং সেই ‘কিছু’ যে কি, তা তিনি সাথে সাথে জানিয়ে বলেন, ‘পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন’। উভয়ের পরাক্রম একই যেহেতু উভয়ের স্বরূপ একই ও সমান। এবং সেই কর্ম-প্রকাশের উদ্দেশ্য যে [পুত্রের] অঙ্গতাকে শিক্ষা দেওয়া, তা নয়, কিন্তু আমাদেরই বিশ্বাসকে শিক্ষা দেওয়া। এই কর্ম-প্রকাশ পুত্রের কাছে অঙ্গাত বিষয়ের জ্ঞান আনে না, কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর জন্ম বিষয়ে স্বীকারোক্তিই এনে দেয়, এবং তিনি যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন সেই সমস্ত কর্মের কথা যে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনটা বলায় তিনি তাঁর জন্ম বিষয়ে সেই স্বীকারোক্তি সত্য বলে প্রমাণিত করেন। স্বর্গীয় ভাষা অসতর্ক হতে চায় না, পাছে বলার ভঙ্গির কোন না কোন দ্ব্যর্থতার অজুহাতে আলাদা স্বরূপের ধারণাটা অনুপ্রবেশ করে। [পুত্র] এটা বলেন যে, তাঁর কাছে পিতার কাজসকল প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এটা বলেন না যে, সেই কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁকে পরাক্রমী স্বরূপ যুক্ত করা হয়েছে। তিনি বোঝাতে চান, কর্ম-প্রকাশটাই তাঁর জন্ম-প্রক্রিয়ার একটা অপরিহার্য অংশ, কেননা পিতার ভালবাসার গুণে এই জন্মের পাশাপাশি পুত্রে সেই কর্ম-জ্ঞানের জন্ম হয়েছিল সেই যে কর্মগুলো পিতা ইচ্ছা করছিলেন পুত্রই সম্পাদন করবেন। আরও, পিতার সম্পাদিত কর্ম-প্রকাশের ভিত্তিতে পাছে আমরা এমনটা বিশ্বাস করি যে, পুত্র সিদ্ধ জ্ঞান বিহীন এমন ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী, সেজন্য প্রভু দেখান, তাঁকে যা যা প্রকাশ করা হবে সেবিষয়ে তিনি অঙ্গ নন।

তাই, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দান করেন, এব্যাপারে কার্যকর হবার জন্য তাঁর কোন আদর্শের অধিকারের আদৌ দরকার হয় না। কেননা ইচ্ছা করা হলো স্বাধীন স্বরূপের নামান্তর, এমন স্বাধীন স্বরূপ যা সুখময় ও সিদ্ধ পরাক্রম প্রয়োগের লক্ষ্যে বেছে নেবার ইচ্ছাশক্তি-সহ নিজেই স্বয়ং বিদ্যমান।

২০। এবং পরে পাছে সেই ‘তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন’ বাক্যটার অর্থ এমনটা দাঁড়ায় যে, যার জন্ম হয়েছে তিনি নিজেতেই তেমন স্বরূপের অধিকারী নন, বরং অজানিতই একটা প্রতাপের অধিকারী (ক), সেজন্য প্রভু সাথে সাথে বলেন, পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন (খ)। এবং এই যে কথা অনুসারে তাঁর হাতে সমস্ত বিচারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, সেই কথায়ই রয়েছে তাঁর স্বরূপ ও জন্মের প্রকাশ। ভিন্ন নয় এমন স্বরূপই মাত্র সেই ‘সমস্ত’ এর অধিকার রাখতে পারে, এবং যার জন্ম হয়েছে, সে কোন কিছুই অধিকারী হতে পারে না যদি না সেই কিছু তাঁকে দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া, পুত্রের হাতেই সমস্ত বিচারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, কেননা তিনি যাকে ইচ্ছেই জীবন দান করেন। কিন্তু এমনটাও ভাবা যায় না যে বিচারের ভার পিতা থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কেননা তিনি বিচার করেন না যেহেতু পুত্রের বিচার পিতার বিচার থেকে উদ্ভূত, কারণ পিতা থেকেই বিচারের ভার তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তথাপি বিচারের ভার যে ন্যস্ত করা হয়েছে, তার কারণ অব্যক্ত থেকে যায় না; বাস্তবিকই বর্ণনা এভাবে চলে, ‘তিনি সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না’। জিজ্ঞাসা করি, সন্দেহ করার মত আর কী বাকি রয়েছে? অথবা, অভক্তিময় ভ্রান্তমতের জন্য আর কোন্ অজুহাত বাকি রয়েছে। ‘পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন’, এটাই সেই কারণ যার জন্য বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ যেন পুত্র পিতার সম্মানের সমান সম্মানের পাত্র হন, ও পুত্রকে যে সম্মান করে না, সে যেন পিতাকেও সম্মান না করার দায়ে দোষী হয়। এসমস্ত কথার পর এমনটা কেমন ভাবা যেতে পারে যে জন্ম থেকে পুত্রকে দেওয়া স্বরূপটা ভিন্ন যখন সেই স্বরূপ [পিতার]

স্বরূপের সমান কেবল কাজে, পরাক্রমে ও সম্মানে নয় কিন্তু তখনই অপমানেও সমান যখন তাঁর প্রতি সম্মান অস্বীকৃত? অতএব, এই যে বর্ণনায় ঈশ্বর ইহুদীদের উত্তর দেন, সেই গোটা বর্ণনা তাঁর জন্ম-রহস্যের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। পিতা থেকে পুত্রকে পৃথক করা সম্ভব নয়, ন্যায্যও নয়, তা করা তখনই মাত্র বিধেয় যখন এটা শেখাতে হয় যে, তিনি স্বরূপে ভিন্ন না হয়েও তবু জন্ম নিয়েছেন।

২১। সুতরাং, পিতা এখনও কাজে রত আছেন, পুত্রও কাজে রত আছেন। ‘পিতা কাজে রত আছেন’ ও ‘পুত্রও কাজে রত আছেন’ বাক্য দু’টোতে তুমি তো সেই নামগুলো পাও যা তাঁদের স্বরূপ ব্যক্ত করে। তাছাড়া, যে ঐশ্বরিক স্বরূপ গুণে ঈশ্বর কাজে রত আছেন, ঈশ্বরের সেই কার্যকর স্বরূপ কেমন, তা ভাব। আরও, পাছে তুমি এমনটা ভাব যে এখানে আলাদা দু’টো স্বরূপের ভিন্ন দু’টো কাজের কথা বলা হচ্ছে, সেজন্য সেই কথা স্মরণ কর যা সেই অন্ধের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, এমনটি ঘটেছে যেন ঈশ্বরের কর্মকীর্তি তার মধ্যে প্রকাশ পায়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমাকে তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে (ক)। সুতরাং, পুত্র যে কাজ সম্পাদন করেন, সেই কাজে পিতার কাজ রয়েছে, ও পুত্রের কাজ হলো ঈশ্বরের কাজ। উপদেশের পরবর্তী অংশও সেই কাজ বিষয়ে কেন্দ্র করে। কিন্তু আপাতত আমার ব্যাখ্যার শুধু এই লক্ষ্য আছে, তথা উভয়কে সেই কাজ আরোপ করা ও তাছাড়া এটাও দেখানো যে, উভয়ের কাজের পদ্ধতি আলাদা নয়, কেননা পিতা এতক্ষণে যে যে কাজ সম্পাদন করে আসছেন, সেই কাজগুলো পুত্রও সম্পাদন করে আসছেন। এ সন্দেহ দূর করে দিতে ইচ্ছা হয় যে, যিনি শাব্বাতের প্রভু—কেননা মানবপুত্র হলেন শাব্বাতের প্রভু—তিনি যখন শাব্বাত দিনে কাজ করেছিলেন, তখন তিনি অবৈধই একটা কাজ করেছিলেন; হ্যাঁ, সেই প্রভু, যার কর্মসকল আমাদের এবিষয়ে নিশ্চিত করে যে পিতা তাঁর মধ্যে কাজে রত আছেন সেই স্বরূপের গুণে যা তাঁর জন্মের মধ্য দিয়ে তাঁকে মঞ্জুর করা হয়েছিল। তিনি যে পুত্র তা বাতিল করা হয় না, কেননা তাঁর ঈশ্বরত্ব পিতার সঙ্গে একীভূতও নয়, অস্বীকৃতও নয়; তিনি যে ঈশ্বর, তাও বাতিল করা হয় না, কেননা তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ অস্পৃষ্ট হয়ে থাকে। তাঁদের স্বরূপের ঐক্যও বাতিল করা হয় না, কেননা তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার মত কোন পার্থক্য প্রকাশিত নয়, এবং তাঁদের ঐক্য এমন ভাবে উপস্থাপিত নয় যা তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে

বিরোধিতা করবে। তুমি সর্বপ্রথমে এতেই তাঁকে পুত্র বলে জেনে নাও যখন তিনি বলেন, ‘নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন’। এখানে পুত্রের জন্ম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, কারণ সেই জন্ম নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না যতক্ষণ তিনি না দেখেন, সেই জন্ম হয়েছে। নিজে থেকে তিনি কিছুই করতে পারেন না, এটা বলায় খ্রিষ্ট এই ভুল ধারণা বাতিল করেন যা অনুসারে তিনি অজনিত—কেননা যে জনিত, সে তো কোন ক্ষমতা রাখে না (খ)—কিন্তু তিনি যে [পিতার কাজ] দেখেন এতে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান নির্দেশিত হয়, সেই যে স্বরূপ বিষয়ে খ্রিষ্ট নিজেকে অধিকারী বলে জানেন। এখন ঈশ্বরের সত্যকার স্বরূপের কথা স্মরণ কর যা এবচনে ব্যক্ত, ‘তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও তেমনি তা-ই করেন’। আরও, তাঁর স্বরূপের পরাক্রম জানবার পর, এখন এবচনের মধ্য দিয়ে এটা ভাব উভয়তে এই স্বরূপ কেমন এক ও সমান: ‘যেন সকলে পুত্রকে সেইভাবে সম্মান করে যেভাবে সেই পিতাকে সম্মান করে যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন’। এবং পাছে সেই স্বরূপের ঐক্য তোমাকে একাকীত্বের একত্রে আটকিয়ে রাখে, সেজন্য এবচনেই বিশ্বাস-রহস্যকে শেখ, ‘পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না’। এভাবে ভ্রান্তমতপন্থীদের ক্ষিপ্ততার সমস্ত চালাকির জন্য সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি পুত্র, কেননা নিজে থেকে কিছুই করতে পারেন না; তিনি ঈশ্বর, কেননা পিতা যা কিছু করেন, তিনিও তা করেন। উভয় এক, কেননা সম্মান ক্ষেত্রে [পুত্র পিতার] একই পর্যায়ে উন্নীত, ও কেননা পুত্র আলাদা কিছু নয়, একই কাজ করেন। পুত্র পিতা নন, কেননা প্রেরিত হয়েছেন। সেজন্য জন্ম-বিষয়টা এ মহৎ রহস্যের অধিকারী: সেই জন্ম নিজেতে নাম, স্বরূপ, প্রতাপ, ঐশপ্রকাশ ধারণ করে, কেননা যেকোন জন্ম যা থেকে জন্ম নেয়, তার মধ্যে সেই স্বরূপ না থেকে পারে না। জন্ম পরকীয় ধরনের কোন সত্তা বহন করে না, কেননা যা এক, তা থেকে পরকীয় কিছুই অস্তিত্ব পায় না। যা কিছু নিজ থেকে পরকীয় অন্য কিছু ধারণ করে না, নিজের স্বরূপের দিক দিয়ে তা এক, ও যা কিছু জন্মসূত্রে এক, তা কোন একাকীত্ব মানে না, কারণ একাকীত্ব একবচন বিশিষ্ট, কিন্তু জন্ম-জনিত ঐক্য উভয়কে লক্ষ করে।

২২। উপরন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে সেই বিচারগুলোও সাক্ষ্যদান করে যা তিনি নিজের বিষয়ে উচ্চারণ করেন। কেননা তিনি বলেন, যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না। পিতা আমাকে যা দিয়েছেন, তা সবকিছুর চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। আমি এবং পিতা, আমরা এক (ক)। জিজ্ঞাসা করি, অকেজো মনের কেমন স্বীয় মূর্খতা এমনভাবে আমাদের উপলব্ধি-শক্তিকে ভোঁতা করতে পারে যে তত স্পষ্ট কথা আমাদের কাছে বোধগম্য হয় না? গর্বিত মনের কেমন স্বীয় অসার স্পর্ধা মানব দুর্বলতাকে এমনভাবে ভোলাতে পারে যে যারা একথা থেকে ঈশ্বরকে জানতে শিখেছে তারা একথা দ্বারা সেই ঈশ্বরকে চিনে নেবে না যিনি ঠিক সেই কথার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন? হয় ভ্রান্তমতপন্থীরা নিজেদের শিক্ষার সমর্থনে অন্য সুসমাচারগুলো উপস্থাপন করবে, না হয়, এগুলোই মাত্র যদি ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, তাহলে এগুলো যেমন শিক্ষা দেয়, আমরা কেন সেই শিক্ষা অনুসারে বিশ্বাস করি না? অন্যদিকে, এ সুসমাচারগুলোই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলে, তবে, যে উৎস থেকে জ্ঞান আগত, আমরা কেন সেই উৎস থেকে বিশ্বাসকে তুলে আনি না? কিন্তু, আমরা যখন অনুভব করি, বিশ্বাস জ্ঞানের বিরোধী হয়, তখন সেই বিশ্বাস জ্ঞান থেকে আগত বিশ্বাস আর নয়, অপরাধ থেকেই আগত বিশ্বাস হয়, কেননা সেই বিশ্বাস স্বীকৃত জ্ঞানের ভক্তিকে নয়, দুঃসাহসী অভক্তিকেই গ্রহণ করে নেয়। তবে, নিজের অধিকারকৃত স্বরূপ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে একমাত্র জনিত ঈশ্বর অধিক স্পষ্টতর ভাষায় নিজের সেই অনির্বচনীয় জন্ম-রহস্য প্রকাশ করেন যেন আমরা যা বিশ্বাস করি, কমপক্ষে তা-ই স্বীকার করতে পারি। তিনি ইচ্ছা করেন, আমরা এটা বিশ্বাস করব যে তিনি ঐশ্বররূপের অধিকারী ও পিতার সঙ্গে তিনি এক। কিন্তু যখন তিনি ঘোষণা করেন, পিতার সঙ্গে তিনি এক, তখন তিনি তা এই অর্থে বলেন না কেমন যেন তিনি একেবারে একা ও তিনি নিজেই হলেন স্বয়ং পিতা যার ফলে তাঁর পুত্রত্ব বিলীন হয়। প্রথমত, তিনি তখনই আপন স্বরূপের পরাক্রম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যখন তাঁর মেষদের বিষয়ে বলেন, ‘আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে

নেবে না’। এখানে সচেতন একটা প্রতাপ ঘোষিত, অসীম ও অপরিবর্তনশীল এমন পরাক্রম স্বীকৃত যে কেউই তাঁর মেঘগুলো তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তিনি তো ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী বটে, তথাপি আমরা যেন এটা মেনে নিতে বাধ্য হই যে তাঁর সেই প্রতাপ ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত, সেজন্য তিনি বলে চলেন, ‘পিতা আমাকে যা দিয়েছেন, তা সবকিছুর চেয়ে মহান’। তিনি পিতা থেকে নিজের জন্মের কথা গুপ্ত রাখতে আদৌ চেষ্টা করেন না; পিতা থেকে যা পেয়েছেন, তা—তাঁর নিজের কথায়—‘সবকিছুর চেয়ে মহান’। এবং যিনি পেয়েছেন, তিনি সেটারই অধিকারী যা জন্মের পরে নয়, কিন্তু জন্মের সময়েই পেয়েছেন, তথাপি তিনি যা পেয়েছেন, যেহেতু তা পেয়েছেন, সেজন্য তা অন্য একজন থেকে আসে। কিন্তু অন্যজন থেকে যিনি এই দান পেয়েছেন, তিনি এমনটা ইচ্ছা করেন না, যাঁর কাছ থেকে তিনি সেই দান পেয়েছেন তিনি তাঁর তুলনায় সত্যি ভিন্ন ও স্বরূপ ক্ষেত্রে তাঁর স্বরূপ-বিহীন বলে গণ্য হবেন, সেজন্য তিনি বলেন, ‘কেউ আমার পিতার হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারে না’। কেউই তা পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, কারণ যা সবকিছুর চেয়ে মহান, তা তিনি পিতা থেকে পেয়েছেন। তবে, কেউই তা তাঁর পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, এই অসাধারণ ঘোষণার অর্থ কী? যে হাত পিতা থেকে পেয়েছে, সেটা হলো পুত্রের হাত, যে হাত পুত্রকে সেই দান দিয়েছে, সেটা হলো পিতার হাত। তবে কোন্ অর্থে বলা হয় যে, পুত্রের হাত থেকে যা ছিনিয়ে নিতে পারা যায় না, তা পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারা যায় না? বচনটার অর্থ যদি জানতে চাও, তবে একথা বোঝ, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। পুত্রের হাত হলো পিতার হাত। স্বরূপটা জন্মের ফলে এমনভাবে দূষিত হয় না যে তা অন্য রকম হয়, তথাপি সেই স্বরূপ যে একই হয়ে থাকে, তা জন্মে বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করে না, কেননা জন্ম নিজেতে [জনকের স্বরূপের চেয়ে] পরকীয় কিছুই মেনে নেয় না। কিন্তু, তুমি যেন দৈহিক ধরনের নির্দেশনার মাধ্যমে উভয়ে বিদ্যমান ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রম জানতে পারতে, সেজন্য এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো যে পুত্রের হাত হলো পিতার হাত, কেননা পিতার স্বরূপ ও পরাক্রম পুত্রে বিরাজ করে। অবশেষে, তুমি যেন জন্ম-রহস্য প্রকাশের মাধ্যমে ঐশ্বরিক স্বরূপের সত্য ও ঐক্য চিনে নিতে পারতে, সেজন্য বলা হলো, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। একথা

এজন্য বলা হলো, যেন এমনটা বিশ্বাস করা না হত যে ঐক্যে রয়েছে বৈষম্য ও একাকীত্ব; কেননা সেই জন্ম ও প্রজনন দ্বারা উভয়তে দ্বিতীয় কোন স্বরূপ অস্তিত্ব পায়নি।

২৩। যতদূর বোঝা যেতে পারে, নির্বোধ মানুষদের মনে ইচ্ছা তখনও থেকে যায় যখন সেই ইচ্ছা পূরণের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়, ও কুকর্ম করার অজুহাত যখন আর নেই তখনও অনিষ্টকর আত্মা তাদের জঘন্য প্রাণ ত্যাগ করে না। নিজেদের ক্ষিপ্ততায় আজকালের ভ্রান্তমতপন্থীরা, ইহুদীদের দৃষ্টান্তে, প্রভুকে ক্রুশে দিতে পারে না যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গে আসীন, তাসত্ত্বেও, একই অভক্তির সঙ্গে, তারা, তিনি যা, তা অস্বীকার করে। তারা [প্রভুর] উচ্চারিত সত্যসমূহ অস্বীকার করতে পারে না, তথাপি তাঁর আজ্ঞাগুলোতে কান দেয় না, নিজেদের ঈশ্বরনিন্দুক ঘৃণা দেখায়, নিজেদের অপবাদ-পাথর ছুড়ে মারে ও সম্ভব হলে তাঁকে ক্রুশ-সিংহাসনে এখনও টেনে নিত। প্রভুর উচ্চারিত বাণীর নবীনতা ক্ষেত্রে ইহুদীদের ক্রোধ সম্পর্কে লেখা আছে, ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর হাতে তুলে নিলেন। যিশু তাঁদের বললেন, পিতার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি; কোন্ কাজের জন্য আপনারা আমাকে পাথর মারতে যাচ্ছেন? ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘ভাল কাজের জন্য আমরা আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন (ক)। কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি, হে ভ্রান্তমতপন্থী, তোমার নিজের আচরণ ও কথা চিনে নাও, ও এটাও বুঝে নাও যে, যাদের জঘন্য অবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত নিজেতে প্রতিফলিত করছ, তুমি তাদের সঙ্গী। ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ ঠিক একথা উচ্চারিত হওয়ার সময়েই ইহুদীরা পাথর তুলে নিল, এবং যে জ্বালা পরিভ্রাণ-রহস্যের প্রকাশকে গ্রহণ করতে তাদের অধৈর্য করছিল, সেই অভক্তিময় জ্বালা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টায় হঠাৎ করে বিস্তারিত হল। পাথর মারার মত তোমার হাতে কেউ নেই, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করায় তুমি সেটার চেয়ে কমগুরুতর অপরাধ কী কর না? ইচ্ছা তো ভিন্ন নয়। এমনকি তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনই তোমার সেই ইচ্ছা অকার্যকর করে। সেই ইহুদীর চেয়ে তুমিই কত না বেশি ভক্তিহীন। সে দেহের বিরুদ্ধে পাথর তোলে, তুমি [পবিত্র] আত্মারই বিরুদ্ধে পাথর তোলে; সে যাকে মানুষ মনে করছিল তাঁরই বিরুদ্ধে, তুমি ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে পাথর তোলে; সে পৃথিবীস্থ একজনের বিরুদ্ধে, তুমি পরাক্রমের

সিংহাসনে আসীন একজনেরই বিরুদ্ধে পাথর তোল; সে অচেনা একজনের বিরুদ্ধে, তুমি যাকে স্বীকার কর তাঁরই বিরুদ্ধে পাথর তোল; সে মৃত্যুর সম্মুখীন একজনের বিরুদ্ধে, তুমি জগতের বিচারকর্তার বিরুদ্ধে পাথর তোল। তিনি বলেন, ‘তুমি যে মানুষ হয়ে’, তুমি বল, ‘তুমি যে সৃষ্টজীব হয়ে’, কিন্তু উভয়ে তোমরা বল, ‘নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছ’; এটাই তোমাদের ভক্তিহীন মুখের সেই অপবাদ যা তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের মিলিত অপবাদ। তুমি অস্বীকার কর তিনি ঐশ্বর্যজনন সূত্রে ঈশ্বর, তুমি অস্বীকার কর তিনি সত্যকার জন্ম সূত্রে পুত্র, তুমি অস্বীকার কর যে ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ তাঁর এই বাণী হলো সেই উভয়তে একমাত্র ও সমরূপ স্বরূপের স্বীকারোক্তি। কিন্তু তাঁর পদে এমন ঈশ্বরকে উপস্থাপন কর যিনি নবীন, পরকীয় ও আলাদা সত্তা-বিশিষ্ট, যাতে তিনি অন্য ধরনের ঈশ্বর হন, অথবা যেন তিনি একেবারে ঈশ্বর না হন যেহেতু তিনি জন্মসূত্রে ঈশ্বর থেকে অস্তিত্বশীল নন।

২৪। ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ : এই উক্তির রহস্য তোমাকে [হে ভ্রাতামতপন্থী] এতই ক্ষুব্ধ করে তোলে যে, ইহুদী ‘আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন’ বলতে বলতে তুমি একই অভক্তিতে বল, ‘আপনি সৃষ্টজীব হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন’ (কেননা তুমি তো বল, জন্মসূত্রে আপনি পুত্র নন, সত্যকার ঈশ্বর নন; আপনি অন্যান্য সকল সৃষ্টজীবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একটা সৃষ্টজীব, কিন্তু ঈশ্বররূপে সঞ্জাত নন, কারণ অশরীরী ঈশ্বর থেকে যে আপনার স্বরূপের জন্ম হয় তা আমি মানি না। আপনি ও পিতা যে এক নন, তা শুধু নয়, কিন্তু আপনি পুত্র নন, ঈশ্বরের সদৃশ নন, ঈশ্বর নন)। প্রভু ইহুদীদের উত্তর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই উত্তর তাদের অভক্তির চেয়ে তোমারই অভক্তির বেশি উপযোগী, আপনাদের বিধানে কি একথা লেখা নেই, আমি বললাম: তোমরা ঈশ্বর? ঈশ্বরের বাণী যাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পিতা যদি তাদের ঈশ্বর বলেন—আর শাস্ত্র তো খণ্ড করা যায় না!—তবে তিনি যাকে পবিত্রীকৃত করলেন ও জগতে প্রেরণ করলেন, তাঁকে আপনারা কেমন করে বলতে পারেন, আপনি ঈশ্বরনিন্দা করছেন, কারণ আমি বললাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র? আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন; তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন

যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি (ক)। তেমন উত্তরের কারণ এটাই ছিল যে, তাঁকে ঈশ্বরনিন্দা দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁকে আরোপ করা অপরাধ এটা ছিল যে, তিনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছিলেন। তিনি যে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছিলেন, এটার প্রমাণ এটা ছিল যে, তিনি বলেছিলেন, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। যাতে দেখানো হয় যে ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ বাক্যটা ছিল জন্মসূত্রে অধিকৃত ঐশ্বর্যরূপের ফল, সেজন্য প্রভু সর্বপ্রথমে সেই হাস্যকর অভিযোগের অসঙ্গতি খণ্ডন করেন যা বিষয়ে তাঁকে মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করছিলেন বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল। পবিত্রজনেরা যে তেমন নামে অভিহিত হন, বিধান তা মেনে নেয়, ও ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীল বাণী তেমন নামকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা বিষয়ে সম্মতি দেয়। তবে, যদি একথা সত্য যে, বিধান যাঁদের উপরে ঈশ্বর নাম আরোপ করল, তাঁদের বিষয়ে ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীল বাণী সম্মতি দিল, তাহলে পিতা যাঁকে পবিত্রীকৃত করেছিলেন ও এজগতে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করতে করতে কেমন করে ঈশ্বরনিন্দুক হতে পারেন? সুতরাং, যেহেতু বিধান তাদেরই ‘ঈশ্বর’ নাম দিল যারা মানুষ ছিল, সেজন্য এটা স্পষ্ট যে, তিনি মানুষ হয়ে যে নিজেকে ঈশ্বর করে তোলেন তা অপরাধ নয়। এবং যখন অন্যান্য মানুষদের পক্ষে এই নাম ব্যবহার অভ্যস্তিকর নয়, তখন ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নাম ব্যবহার করা যে স্পর্ধার চিহ্ন, তা ভাবা যায় না, যেহেতু তা তাঁরই দ্বারা ঘটে যিনি পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত হলেন (কেমনা এই বচনে পুরো উত্তর তাঁকে মানুষ হিসাবে কেন্দ্র করে, কারণ ঈশ্বরের পুত্র একাধারে মানবপুত্র)। যারা অভ্যস্তির দায়ে অভিযুক্ত না হয়ে নিজেদের ঈশ্বর বলে অভিহিত করতে পারে, এই সবার উপরে তিনি শ্রেষ্ঠ যেহেতু পুত্র বলে পবিত্রীকৃত হলেন। ধন্য পল এই পবিত্রীকরণ বিষয়ে আমাদের জ্ঞাত করেন যখন বলেন, ‘... [যে সুসমাচার] দেবেন বলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এই সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সজ্জাত, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত’ (খ)। অতএব, যে অপরাধ অনুসারে তিনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তোলেন, ঈশ্বরনিন্দা সংক্রান্ত এই অপরাধ শেষ হয় : ঈশ্বরের বাণী এই নাম বহু মানুষকে আরোপ করেছে, এবং পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত

ও প্রেরিত বলে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কিছুই করেননি।

২৫। ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ বাক্যটা যে জন্ম থেকে মঞ্জুর করা স্বরূপ সংক্রান্ত বাক্য, আমার মতে, তা সন্দেহ করার আর কোন সম্ভাবনা রইল না। ইহুদীরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল কারণ উপরের সেই উক্তি দ্বারা তিনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলেছিলেন, এবং সেজন্য তিনি প্রতিবাদে এবাণী দিয়ে এটা সপ্রমাণ করেন যে, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ উক্তির মাধ্যমে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে নিজেকে দেখাতে ইচ্ছা করেছিলেন, প্রথমত নামে, পরে স্বরূপে, অবশেষে জন্মসূত্রে। ‘আমি’ ও ‘পিতা’ শব্দ দু’টো প্রকৃত নাম; কিন্তু ‘এক’ শব্দটা হলো স্বরূপ বিষয়ক স্বীকৃতি, কেননা মূলত সেই স্বরূপ উভয়তে ভিন্ন নয়; এবং ‘আমরা’ শব্দটা একাকীত্বকে (ক) মানে না। যখন ‘আমরা এক’ সংজ্ঞাটা একাকীত্ব বোঝায় না, তখন সেই জন্মই উভয়কে এক করে। কেননা এসমস্ত সত্য সেই ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নাম থেকে উদ্ভূত যা পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত সেই তিনি নিজের বিষয়ে ঘোষণা করেন, এবং এই ঘোষণা ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ বাক্যকে সপ্রমাণ করে, কেননা পুত্র যাঁর থেকে অস্তিত্ব পান সেই পিতার স্বরূপ বাদে জন্মটা পুত্রকে অন্য কোন স্বরূপ আরোপ করতে পারে না।

২৬। কিন্তু একমাত্র জনিত ঈশ্বরের উপদেশ আমাদের গোটা বিশ্বাস-রহস্যের সিদ্ধি ঘটায়। তিনি যে মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলেছিলেন, এই অভিযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং যেহেতু তিনি ইচ্ছা করছিলেন, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ উক্তিটা স্পষ্ট ও সিদ্ধ শেষ উত্তর হবে, সেজন্য তিনি সাথে সাথে একথা যোগ করলেন, ‘আপনারা বলেন, আমি ঈশ্বরনিন্দা করেছি, কারণ বললাম, আমি ঈশ্বরের পুত্র। আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন; তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি’। একথার পর যে কেউ সচেতন হয়ে পরিত্রাণের আশা ত্যাগ করে, সে অশেষ উন্মাদনার পরিচয় দেয়, ও তার যত অবিশ্বাস-ঘোষণা নির্লজ্জ দুঃসাহস স্বরূপ। যে কেউ বিশ্বাস হারিয়েছে,

সে তার নিজের ভ্রান্তির ব্যাপারে লজ্জায় আর লাল হয় না, কেননা এসমস্ত ঘোষণার বিরোধিতা করা অজ্ঞতার চেয়ে বরং উন্মাদনারই চিহ্ন। প্রভু বলেছিলেন, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’: এখানে রয়েছে তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম-রহস্য, এই অর্থে যে, পিতা ও পুত্র স্বরূপের ঐক্যে সহভাগী। এবং যেহেতু ঐশ্বর্যরূপকে অবৈধ দাবির দায়ে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি যুক্তি দেখিয়ে সেই দাবির কারণ দেখান। তিনি বলেন, ‘আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না’। তিনি যদি পিতার কাজ না করেন, তাহলে যখন তিনি ঘোষণা করেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তখন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব না। তাই জন্মটা তাঁকে নতুন ও বাইরে থেকে আগত একটা স্বরূপ আরোপ করেনি; কেননা এটাই বিশ্বাস করা দরকার যে, পিতার কাজ করেন বিধায়ই তিনি পুত্র। তবে, যাতে তিনি নিজের স্বরূপের ফলে ঈশ্বরের পুত্র না হন, সেই লক্ষ্যে সেই দত্তক বা প্রসন্নতার খাতিরে মঞ্জুর করা সেই নাম এখানে কী স্থান পেতে পারে যখন এটা বিশ্বাস করতে হয় যে পিতার স্বরূপ অনুযায়ী কাজের ফলেই তিনি ঈশ্বরের পুত্র? কোন সৃষ্টজীব ঈশ্বরের সমান বা সদৃশ নয়, এবং প্রতাপ ক্ষেত্রে তাঁর স্বরূপের পরকীয় কোন স্বরূপ তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাঁর সাদৃশ্য ক্ষেত্রে, অভ্যস্তিতে না পড়ে, একাই পুত্রই নিজের সেই জন্ম গুণে তাঁর সমান ব’লে বিবেচিত হতে পারেন। কেননা যা কিছু তাঁর বাইরে রয়েছে তা, তাঁর পরাক্রমের প্রতি অপমান ঘটিয়ে, তাঁর সমান বলে বিবেচিত হবে। তাঁর নিজ থেকে হয়নি এমন কিছু যদি থাকে যা তাঁর সমান ও পরাক্রমে তাঁর সদৃশ, যদি এমনটা ধরে নিই যে সঙ্গী হিসাবে ঈশ্বর তাঁর সমান, তাহলে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠতা হারাবেন; তাছাড়া, যদি তাঁর নিজ থেকে ভিন্ন নন এমন দ্বিতীয় ঈশ্বর থাকেন, তাহলে একমাত্র ঈশ্বর থাকবেন না। অন্যদিকে, যে পুত্র ঈশ্বরের, ঈশ্বর যদি সেই পুত্রকে নিজের সমান করে থাকেন তাতে অপমানজনক বলতে কিছু নেই, কেননা যা কিছু তাঁর সদৃশ তা তাঁরই; যা কিছু তাঁর সঙ্গে তুলনা করা হয় তা তাঁর নিজ থেকে উদ্ভূত; যা কিছু তাঁর কাজ করতে পারে তা তাঁর বাইরে স্থিত নয়; এবং তেমন প্রতাপকে জনিত করা ও সেইসঙ্গে নিজের স্বরূপকে বিকৃত না করা, সত্যি সম্মানের ব্যাপার। পুত্র পিতার কাজ সম্পন্ন করেন ও এজন্যই তিনি দাবি রাখেন যেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করা হয়। এ দাবি অহঙ্কারে পূর্ণ নয়, কেননা তাঁর সম্পন্ন

কাজ পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি গৃহীত হবার দাবি রাখেন না। তাছাড়া তিনি ঘোষণা করেন, তিনি নিজের কাজ নয় কিন্তু পিতারই কাজ করেন, পাছে, তাঁর কর্মের মহত্ত্বের কারণে তাঁর জন্মে অধিকৃত [ঐশ্বরিক] স্বরূপকে হরণ করা হয়। এবং যেহেতু দেহধারণ ও মারীয়া থেকে মানবজন্মের রহস্যের সামনে [ইহুদীদের দ্বারা] তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিগণিত হননি, সেজন্য তিনি নিজের কর্মকাণ্ডের দ্বারাই এই নামের বিশ্বাসযোগ্যতা জানিয়ে দেন; এক্ষেত্রে তিনি বলেন, ‘কিন্তু যদি [পিতার কাজ] করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন’। সর্বপ্রথমে তিনি এটা ইচ্ছা করেন না তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করা হয়, যদি না পিতার সেই কাজকর্মের ভিত্তিতে যা তিনি সম্পন্ন করেন। কারণ তিনি যদি সেই কাজকর্ম করেন ও তাঁর দেহের নিম্নাবস্থার কারণে তিনি বিশ্বাস-ঘোষণার পাত্র হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাহলেই তিনি তাঁর কর্মে বিশ্বাস করতে দাবি রাখেন। কেনই বা মানুষ হিসাবে তাঁর জন্ম-রহস্য ঈশ্বর হিসাবে তাঁর জন্ম-স্বীকৃতিতে বাধা দেবে যখন ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত যিনি তিনি ধারণ করা মনুষ্যত্ব দ্বারা ঈশ্বরের সমস্ত কর্ম সম্পন্ন করেন? তাই যখন সেই কর্মের মধ্য দিয়ে সেই মানুষে বিশ্বাস হয় না যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তখন তাঁর সেই কাজকর্মেই বিশ্বাস হোক যা ঈশ্বরের পুত্রেরই কাজকর্ম যেহেতু সেই কাজকর্ম যে ঈশ্বরের নয়, তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বরের পুত্র নিজেতে যা কিছু ধারণ করে আছেন তা সবই ঈশ্বরের; এবং পুত্রের কাজ হলো পিতার কাজ, কেননা তিনি যাঁর থেকে উদ্ভূত, তাঁর জন্ম সেই স্বরূপ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেনি, এমনকি অস্তিত্বপ্রাপ্ত বলে তিনি যা থেকে উদ্ভূত, তিনি সেই স্বরূপ নিজেতে ধারণ করে আছেন।

২৭। তাই পুত্র পিতার কাজ করেন, ও দাবি করেন যেন, তাঁকে বিশ্বাস না করলে অন্তত যেন তাঁর সমস্ত কাজে বিশ্বাস রাখা হয়; এইভাবে তাঁকে দেখাতে হবে কোন্ কারণে তাঁর সমস্ত কাজে বিশ্বাস রাখা দরকার। কারণটা পরবর্তী বচনে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, ‘কিন্তু যদি [পিতার কাজ] করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন; তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি’। একথা একথারও সমান তথা, ‘আমি ঈশ্বরের পুত্র’, একথারও সমান, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। এটাই জন্ম থেকে মঞ্জুর করা সেই স্বরূপ, এটাই পরিব্রাণদায়ী

বিশ্বাস-রহস্য, তথা, যা এক তা বিচ্ছিন্ন না করা, তাঁর জন্ম থেকে স্বরূপ হরণ না করা, ও এ সত্য স্বীকার করা যে, জীবনময় ঈশ্বর জীবনময় ঈশ্বর থেকে [সঞ্জাত]। স্বয়ং জীবন যিনি, সেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল এমন কিছু নন যা যুক্ত করা নানা প্রাণহীণ অংশ দিয়ে তৈরী; স্বয়ং পরাক্রম যিনি, তিনি দুর্বল উপাদান দিয়ে গঠিত নন; স্বয়ং আলো যিনি, তিনি অন্ধকারময় নানা উপাদানের মিশ্রণের ফল নন; স্বয়ং আত্মা যিনি, তিনি এলোমেলো বস্তু নিয়ে দিয়ে গঠিত নন। তাঁর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা এক; ফলত যা আত্মা, তা আলো, পরাক্রম ও জীবন; ও যা জীবন, তা আলো, পরাক্রম ও আত্মা। কেননা যিনি বলেন, আমি আছি, আমি অপরিবর্তনশীল (ক), তিনি কোন অংশেও পরিবর্তনশীল নন ও ধরনেও রূপান্তরশীল নন। উল্লিখিত এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন অংশগুলো নয় যা তাঁর মধ্যে বর্তমান, কিন্তু তা তাঁর মধ্যে এমন কিছু যা একমাত্র ও সিদ্ধতাবিশিষ্ট; জীবনময় ঈশ্বর সবই-স্বরূপ। তাই তিনি জীবনময় ঈশ্বর, জীবনময় স্বরূপের সনাতন প্রতাপ, ও তাঁর প্রকাশিত রহস্যময় সত্য অনুযায়ী যা কিছু তাঁর নিজ থেকে সঞ্জাত, তা জীবনময় বলে ছাড়া সঞ্জাত হতে পারত না। কেননা যখন তিনি বললেন, যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত [ইত্যাদি] (খ), তখন তিনি এ শিক্ষা দিলেন যে, জীবনময় পিতার দ্বারাই তাঁর মধ্যে জীবন রয়েছে। আরও, যখন তিনি বলেন, কেননা পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন (গ), তখন তিনি এবিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, জীবনময় যা কিছু তাঁর আছে, তা সেই জীবনময় থেকে আগত। আরও, জীবনময় বলে সঞ্জাত হলেন যিনি, তিনি যখন জীবনময় থেকে সঞ্জাত হলেন, তখন একটা জন্ম হয়, একটা নতুন স্বরূপ হয় না। জীবন্ত কিছু থেকে যা জীবন্ত বলে জনিত হয়, তা নতুন কিছু নয়; তার জীবন শূন্য থেকে জীবন পাবার জন্য আহূত হয়নি, এবং যে জীবন জীবন থেকে জন্ম নেয়, সেই জীবনের পক্ষে স্বরূপের ঐক্যের দ্বারা ও সিদ্ধ ও অনির্বচনীয় জন্ম-রহস্যের দ্বারাই সেই জীবনময়তে জীবনযাপন করা ও সেই জীবনময়ের জীবনকে নিজেতে রাখা আবশ্যিক।

২৮। আমাদের ভালই মনে আছে যে, আমাদের প্রবন্ধের শুরুতে (ক) আমরা এবিষয়ে এ সতর্কবাণী দিয়েছিলাম যে, মানব তুলনা ঐশ্বরিক উদাহরণের সঙ্গে উপযোগী মিল রাখে

না। তথাপি ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে নেওয়া উদাহরণ থেকে আমাদের মন, যদিও আংশিক ভাবে, তবু আলোকিত হয়। যারা মানব জন্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ, তাদের আমি জিজ্ঞাসা করি, শিশুদের উৎপত্তি পিতামাতাদের মধ্যে থেকে যায় কিনা। কেননা সেই যে প্রাণহীণ ও অশোভন উপাদান জন্ম-প্রক্রিয়ার আরম্ভের কারণ, যদিও সেই সমস্ত উপাদান পারস্পরিক ভাবে জনক ও জননীর মধ্যে চলাচল করে তবু তারা এক একজন নিজ নিজ প্রভাব বজায় রাখে। তারা নিজেদের জীবনের সঙ্গে সমান একটা জীবন উৎপন্ন করেছে, ও সেইজন্য, যে সঞ্জাত হয়েছে তার মধ্যে জনক-জননী বর্তমান থাকে, ও যে জনিত হয়েছে যেহেতু সে জনক-জননীর হস্তান্তরিত কিন্তু হারানো নয় এমন প্রভাবের মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করে, সেজন্য সে নিজের জনক-জননীর মধ্যে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু এসমস্ত কথা কেবল মানব জন্ম সংক্রান্ত প্রক্রিয়া আলোকিত করার জন্যই প্রযোজ্য হোক, ও একমাত্র জনিত ঈশ্বরের ক্ষেত্রে জন্ম বিষয়ক নিখুঁত উদাহরণ বলে গণ্য না হোক। কেননা দুর্বল মানব স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সংযোগে গঠিত ও নানা প্রাণহীণ পদার্থের দ্বারা বেঁচে থাকে। তাছাড়া, জনিত যে জীব, সে যে সাথে সাথে সেই জীবনে জীবনযাপন করে তা নয়, জীবন থেকে যে সে সবকিছু গ্রহণ ক’রে জীবনযাপন করে তাও নয়, কেননা জীবনে কতগুলো অঙ্গ রয়েছে যেগুলো বিকশিত হওয়ার পর অচেতন ভাবে সরে পড়ে। অপরদিকে, ঈশ্বরে যা কিছু আছে, তা জীবিত। কেননা ঈশ্বর তো জীবন, ও জীবন থেকে এমন কিছু উদ্ধৃত হতে পারে না যা জীবিত নয়। তাঁর জন্ম নির্গমন দ্বারা নয়, পরাক্রম দ্বারাই হয়। তাই, তিনি যা আছেন যেহেতু সেই সবই জীবিত, ও যা কিছু জন্ম নেয় যেহেতু সেই সবই পরাক্রম, সেজন্য ঈশ্বর জন্মদানের অধিকারী কিন্তু রূপান্তর বিহীন, বৃদ্ধি ক্ষেত্রে সক্ষম কিন্তু হ্রাসীকরণ সাপেক্ষ নন, কেননা তিনি সেই পুত্রের জীবনে সদা-বর্তমান ও সহভাগী হয়ে থাকেন যাঁকে তিনি জন্মদানের মাধ্যমে এমন স্বরূপ দিলেন যা নিজের স্বরূপের সদৃশ ও অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ। এবং জীবনময় থেকে জীবনময় [বলে সঞ্জাত] যিনি, সেই পুত্র নিজের জন্মলাভে সেই স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

২৯। বিশ্বাস সম্পর্কে একপ্রকার অর্থ দেবার জন্য আগুনের উদাহরণ উপকারিতা রাখে, কেননা আগুন একদিকে নিজেতে আগুন রাখে ও অন্যদিকে আগুনে থাকে। সেই আগুনে রয়েছে আলোর দীপ্তি, নিজের স্বরূপের বিশিষ্ট তাপ, জ্বলবার ক্ষমতা, শিখার অস্থিরতা।

তথাপি আগুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও এসমস্ত কিছু হলো একমাত্র স্বরূপ। আগুনের দুর্বলতা এটাই যে, সে ইন্ধন দ্বারাই অস্তিত্বশীল ও জীবিত, এবং যা দ্বারা সে জীবিত ছিল সেই ইন্ধন শেষ হয়ে গেলেই সে নিঃশেষ হয়। এই উদাহরণ দ্বারা আমরা আংশিক ভাবে জানতে পারি ঈশ্বর কেমন অতুলনীয়, ও এমনটাও জানতে পারি যে, পার্থিব পদার্থে যা কোন না কোন মাত্রায় পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো যে ঈশ্বরে বর্তমান তা অবিশ্বাস্য নয়। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, যখন আগুন থেকে আগুণ হয়, তখন সেটায় বিভাজন ও বিচ্ছেদ আছে কিনা। যখন আলো থেকে আলো জ্বালানো হয়, তখন প্রথম আলো জ্বালানো আলো থেকে কি এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন যার ফলে এই আলো সেই আলোতে থেকে যেতে পারে না? নাকি প্রথম আলো কেমন যেন একটা ধারাবাহিকতায়ই দ্বিতীয় আলোতে থেকে যায় যা জন্মের ধারাবাহিকতার সদৃশ? যদিও প্রথম আলোর স্বরূপের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে, তথাপি আলো থেকে কি আলো হয় না? যে দ্বিতীয় আলো নিজের অস্তিত্বের জন্য—অবশ্যই, বিচ্ছেদের ফলে নয়—প্রথম আলোর উপর নির্ভর করে, প্রথম আলো কি সেই দ্বিতীয় আলোতে জীবিত নয়? হয় তো দ্বিতীয় আলো যে আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি বরং যা থেকে নিজের স্বরূপগত সত্তার ঐক্য বজায় রেখে বেরিয়েছে, সেই দ্বিতীয় আলো কি প্রথম আলোতে বসবাস করে না? জিজ্ঞাসা করি, যেহেতু বিভাজন দ্বারা আলো থেকে আলো বিচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, স্বরূপের জাতের ভিত্তিতেও সেই দু'টোর মধ্যে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, সেজন্য সেই দু'টো কি এক নয়?

৩০। যেমনটা বলেছি, এসমস্ত উদাহরণ ঈশ্বরের মর্যাদা ব্যক্ত করার জন্য নয়, বিশ্বাস উপলব্ধি করার জন্যই উপকারী মাধ্যম বলে গণ্য হোক। আমরা যেন দৃশ্যগত বস্তু থেকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারি, এজন্যই আমাদের এসমস্ত উদাহরণের উপর নির্ভর করতে হয়। উপমা থেকে আনা কোন না কোন উদাহরণ ঈশ্বরের স্বরূপকে নিখুঁত ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে, এই কারণেই যে আমরা এগুলোর উপর নির্ভর করি তা নয়, বরং কারণটা এ, নিজের বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষ্যদানে বিশ্বাস করা ভক্তিময় ও ন্যায্য কর্ম। কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীদের ক্ষিপ্ততা সরলমনা বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে এব্যাপারে অস্থির করল যে, ঈশ্বর সংক্রান্ত এমন তত্ত্ব মেনে নিতে নেই যা বোধগম্য হবার জন্য দৈহিক জগৎ থেকে আনা উপমা ব্যবহার করা দরকার। তাই, ‘মাংস থেকে যা জন্মায় তা মাংসই, আর

আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই’ আগে উল্লিখিত প্রভুর এই বচন অনুসারে যেহেতু ঈশ্বর আত্মা, সেজন্য এসমস্ত উদাহরণকে কিছুটা স্থান দেওয়া উপযোগী মনে করলাম। এইভাবে আমরা ঈশ্বর থেকে সেই অভিযোগ সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করতাম যা অনুসারে তিনি নিজের নানা ঘোষণায় এ উদাহরণগুলো ব্যবহার করায় আমাদের ভুলিয়েছেন, অথচ তাঁর সৃষ্টবস্তুর স্বরূপ থেকে আনা তেমন উপমাগুলো কোন রকমে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের অর্থ উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে।

৩১। সুতরাং, যিনি জীবনময় থেকে জীবনময়, যিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, যিনি নিজের অবিচ্ছেদ্য ও অসদৃশ নয় এমন স্বরূপের ঐক্য ও নিজের জন্ম-রহস্য প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরের পুত্র বলেন, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। যেহেতু তেমন উক্তি জঘন্যভাবে তাঁর অহঙ্কারের পরিচয় বলে গণ্য হত, সেজন্য সেই উক্তিতে নিহিত ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ে নিজের চেতনা আরও স্পষ্ট করার লক্ষ্যে তিনি এটাও বললেন, ‘আপনারা বলেন, আমি ঈশ্বরনিন্দা করেছি কারণ বললাম, আমি ঈশ্বরের পুত্র’; এবং এটা দেখালেন যে, স্বরূপের ঐক্য তাঁর জন্ম থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু পরে, যাতে শর্তহীন উক্তি তাঁর জন্ম বিষয়ক বিশ্বাসকে দৃঢ় করে ও সেইসাথে পাছে সেই উক্তি স্বরূপের বৈষম্যের ধারণা অনুপ্রবেশ করায়, সেজন্য নিজের উত্তর এভাবে শেষ করেছিলেন, ‘আপনারা সেই সমস্ত কাজে বিশ্বাস রাখুন, কারণ আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’। তাঁর জন্ম-রহস্য যেভাবে এখানে প্রকাশিত, তা স্বরূপ ও দাবি ক্ষেত্রে উচিত নয় কি এমন কিছু দেখায়? উভয় পারস্পরিক ভাবে উভয়ের মধ্যে বর্তমান, কেননা পুত্রের জন্ম পিতা থেকে ছাড়া অন্য কোথাও থেকে নয়, কেননা তিনি পরকীয় ও ভিন্ন স্বরূপের দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে অস্তিত্বশীল নন, কেননা ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে অনন্তকালীন হওয়ায় তিনি যা [অর্থাৎ ঈশ্বর], তা ঈশ্বর থেকে ছাড়া অন্য কোথাও থেকে পাননি। [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তোমার পক্ষে সম্ভব হলে তবে মণ্ডলীর বিশ্বাসে দু’টো ঈশ্বর অনুপ্রবেশ করাও; অথবা, মায়াময় যুক্তি দ্বারা একটা একাকী ঈশ্বরকে কল্পনা কর; পারলে, তবে সত্যকার জন্ম-স্বীকার বাদ দিয়ে পুত্রকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কর। পুত্র পিতাতে আছেন ও পিতা পুত্রে আছেন, ও তেমনটা পারস্পরিক প্রবাহীকরণ ও প্রতি-প্রবাহীকরণ দ্বারা নয় বরং জীবনময় স্বরূপের সিদ্ধ জন্ম দ্বারাই হয়। ফলত তুমি পিতা ঈশ্বরে ও পুত্র ঈশ্বরে দু’টো ঈশ্বরকেও গুনতে

পারবে না, কারণ উভয় এক ; একাকী ঈশ্বরের কথাও বলবে না, কারণ উভয় একমাত্র ব্যক্তি নন। সুতরাং, প্রৈরিতিক বিশ্বাস দু'টো ঈশ্বরকে মানে না, কারণ সেই বিশ্বাস দু'টো পিতাকেও মানে না, দু'টো পুত্রকেও মানে না। পিতাকে স্বীকার করে সেই বিশ্বাস পুত্রকে স্বীকার করেছে; পুত্রে বিশ্বাস রেখে সে পিতাতেও বিশ্বাস রাখে, কেননা 'পুত্র' নামটা 'পিতা' নামটাও নিজেতে ধারণ করে আছে। পুত্র না থাকলে পিতৃত্ব হয় না, এবং পুত্রের উপস্থিতি পিতার উপস্থিতির প্রমাণ, কেননা পিতা থেকে ছাড়া পুত্র হয় না। তাই একমাত্র ঈশ্বর-স্বীকারোক্তিতে একাকী কোন ঈশ্বর নেই, কারণ পুত্র পিতাকে পরিপূর্ণ করেন ও পুত্রের জন্ম পিতা থেকে হয়। উপরন্তু, সেই জন্মের ফলে স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু সেই স্বরূপ একই হয়ে থাকে কারণ নিজের জাতের প্রতি সদৃশ হয়ে থাকে। সেই স্বরূপ এতই একই হয়ে থাকে যে, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পিতা ও পুত্র জন্ম ও প্রজনন গুণে এক, কিন্তু তাঁরা একমাত্র ব্যক্তি নন।

৩২। সুতরাং, সে-ই দু'টো ঈশ্বরের কথা বলুক যে ঐক্য না থাকলেও তবু ঐক্যের কথা বলতে পারে; অথবা সে-ই একাকী ঈশ্বর বিষয়ে শিক্ষা দিক যে এটা বলতে পারে যে, যে একাকী, সে এমন একাকীর মধ্যে বাস করে না যে স্বরূপের প্রভাবে ও প্রজনন ও জন্ম-রহস্যের গুণে একাকী। যে কেউ এবিষয়ে অজ্ঞ যে পিতা ও পুত্র [মণ্ডলীর বিশ্বাস দ্বারা] এক বলে প্রচারিত, সে-ই পিতা ও পুত্রকে ভিন্ন স্বরূপও আরোপ করুক। সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা যদি দু'টো ঈশ্বরের বা একাকী ঈশ্বরের কথা বলতে ইচ্ছা করে, তাহলে পুত্রের সেই ঘোষণা মুছিয়ে দিক যা তিনি নিজের বিষয়ে সুসমাচারে ব্যক্ত করেন, 'আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন'। যখন এমনটা বলা হয় যে, উভয় একমাত্র স্বরূপের অধিকারী, তখন একাধিক স্বরূপের বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই, এবং 'ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর' সত্যটা সেই উভয়কে দু'টো ঈশ্বর করে না, এবং ঈশ্বরের জন্মলাভ, ঈশ্বর যে একাকী, তেমনটা মানে না, এবং যঁারা একে অন্যের মধ্যে, তাঁরা ঐক্যবিহীন নন। তবু তাঁরা একে অন্যের মধ্যে যেহেতু তাঁরা এক থেকে এক; কেননা একজন প্রজননের মাধ্যমে একজনকে এমন কিছু দেননি যা তাঁর নিজের নয়, এবং যিনি একজন, তিনিও জন্মের মাধ্যমে সেই একজনের কাছ থেকে এমন কিছু পান না যা সেই একজনের নয়। তাই প্রৈরিতিক বিশ্বাস যখন পিতাকে প্রচার করবে, তখন তাঁকে একমাত্র ঈশ্বর বলেই

প্রচার করবে; যখন পুত্রকে স্বীকার করবে, তখন তাঁকে একমাত্র ঈশ্বর বলে স্বীকার করবে, কারণ উভয়তে ঐশ্বরিক স্বরূপ এক ও অসদৃশ নয়। যেহেতু পিতা হলেন ঈশ্বর ও পুত্র হলেন ঈশ্বর, সেজন্য যে নাম উভয়ের স্বরূপকে ব্যক্ত করে সেই নামও এক, যার ফলে ‘একমাত্র ঈশ্বর’ বাক্যটা উভয়কে নির্দেশ করে। কেননা ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’ বা ‘ঈশ্বরে ঈশ্বর’ বাক্য দু’টো ঈশ্বরকে তৈরি করে না, কেননা যিনি ‘এক থেকে এক’ তিনি তাঁরই স্বরূপ ও নামের সহভাগী হয়ে অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকেন, তিনি একাকী ঈশ্বরেও হ্রাসীকৃত হন না, কেননা ‘এক ও এক’ বাক্যটার অর্থে কোন একাকীত্ব স্থান পায় না।

৩৩। প্রভু তেমন মহারহস্যে নিহিত শিক্ষা অনিশ্চিত ও সন্দেহযুক্ত অবস্থায় রাখেননি, দ্ব্যর্থতা জনিত অন্ধকারেও আমাদের একা ফেলে রাখেননি। তবে এসো, তাঁকে সেই ক্ষণে শুনি যে ক্ষণে তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে এই বিশ্বাসের পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ করেন; তিনি বলেন, আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন। পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে। ফিলিপ তাঁকে বললেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব। যিশু তাঁকে বললেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তোমরা আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর (ক)। যিনি পথ, তিনি ভ্রান্তিময় ও অগম্য পথে আমাদের চালনা করেন না; যিনি সত্য, তিনিও মিথ্যা দ্বারা আমাদের ভোলান না; যিনি জীবন, তিনিও মৃত্যুর ভ্রান্তিতে আমাদের একা ফেলে রাখেন না। এবং যেহেতু তিনি নিজেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর নিজেরই দ্বারা নিরূপিত পথগুলো দেখাবার জন্য এ মঙ্গলময় নাম তিনটে স্থির করেছেন যাতে পথ বলে সত্যে আমাদের চালনা করেন ও সত্য বলে

আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেজন্য আমরা যেন এই জীবন পাই সেই লক্ষ্যে তিনি যে কেমন রহস্য দেখান, তা আমাদের জানা দরকার। ‘পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়’ : পিতা অভিমুখে পথ পুত্রের মধ্য দিয়েই যায়। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার যদি লক্ষ্যটা তাঁর শিক্ষার প্রতি বাধ্যতা দ্বারা নাকি তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপে বিশ্বাস দ্বারা অর্জনীয়; কেননা আমরা এমনটা মনে করতে পারি যে পিতার ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে বর্তমান বলে স্বীকার করার চেয়ে বরং পুত্রের শিক্ষা দ্বারাই আমরা পিতার কাছে পৌঁছতে পারব। সেজন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এ বচনের প্রকৃত অর্থ জানতে প্রয়াসী হব। কেননা বিশ্বাস আমাদের স্বেচ্ছাকৃত বিচারের উপরে নয়, উক্তিগুলোর অর্থের উপরেই স্থাপিত হওয়া চাই।

৩৪। কেননা সেই উক্তির পরে এবাণী উচ্চারিত হয়, ‘তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে’। কেননা প্রেরিতদূতেরা মানুষ যিশু খ্রিস্টকেই লক্ষ্য করছেন। তবে তাঁরা যদি তাঁকে জেনে থাকেন তাহলে কেমন করে পিতাকে জানবেন যদি একথা সত্য যে প্রেরিতদূতেরা তাঁর মধ্যে তাঁর স্বরূপের চেহারা অর্থাৎ মানুষকেই চেনেন অথচ ঐশ্বরকে আমাদের এই শারীরিক মাংসের দুর্বলতায় নয়, কিন্তু শারীরিক মাংস থেকে মুক্ত বলে জানা দরকার? কিন্তু, দেহধারণ রহস্যের ক্ষণে তাঁর মধ্যে পিতার ঐশ্বরিক স্বরূপ যে বর্তমান ছিল, তা সপ্রমাণ করে প্রভু ঘটনাগুলোর অনুক্রম এভাবে স্থির করলেন, ‘তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে’। তিনি দেখার কাল জানার কাল থেকে পৃথক করেন। কেননা তিনি বলেন, তাঁরা যাকে একদিন জানবেন, তাঁকে ইতিমধ্যে দেখেছেন, যার ফলে, এই প্রকাশ-ক্ষণ থেকে শুরু করে তাঁরা সেই স্বরূপের জ্ঞান অর্জন করে যা আগেও তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন।

৩৫। কিন্তু একথার নবীনতা প্রেরিতদূত ফিলিপকে অস্থির করে, তিনি একটা মানুষকে দেখেন, এই মানুষ নিজেকে ঐশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেন, ও ঘোষণা করেন যে, তাঁরা যদি তাঁকে জানেন তবে অবশ্যই পিতাকেও জানেন। তিনি বলেন, তাঁরা পিতাকে দেখেছেন ও তাঁকে দেখেছেন বলে এখন থেকে তাঁকে জানবেন। মানব মনের দুর্বলতা

এসত্যকে ধরতে পারে না, তেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলো বিশ্বাসকে জয় করতে পারে না, যেমন তাঁরা ইতিমধ্যে পিতাকে দেখেছেন ও একদিন তাঁকে জানবেন যেহেতু তাঁকে ইতিমধ্যে দেখা মানে তাঁকে জানা; আরও, যদি তাঁরা পুত্রকে জেনে থাকেন তবে পিতাকেও জেনেছেন। এসমস্ত কথা বলা হয় যদিও পুত্র মানবীয় দৃষ্টি ও স্পর্শন শক্তি-দু'টোর মধ্য দিয়েই নিজের বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে থাকে, ও সেই মানুষের যে একেবারে আলাদা স্বরূপকে তাঁরা দেখেছে, তা পিতার বিষয়ে জ্ঞান দিতে পারে না, ও পুত্র প্রায়ই এটা ঘোষণা করেছেন যে, পিতাকে কেউই দেখেনি। সেজন্য, প্রৈরিতিক ঘনিষ্ঠতায় ও আস্থায় ফিলিপ প্রভুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে ওঠেন, ‘প্রভু, আমাদের পিতাকে দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।’ এখন বিশ্বাস যে পরীক্ষার সম্মুখীন তা নয়, এখানে বরং অজ্ঞতা জনিত ভুল উপস্থিতি। কেননা প্রভু বলেছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে পিতাকে দেখেছিলেন ও এখন থেকে তাঁকে জানবেন, কিন্তু সেই প্রৈরিতদূত এটা বুঝে ওঠেননি যে, তাঁরা তাঁকে ইতিমধ্যে দেখেছিলেন। ফলত পিতাকে যে ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে তা তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু এমনটা মিনতি করেন যেন তাঁকে দেখানো হয়। তিনি তাঁকে যে, বলতে গেলে, নিজের দেহের চোখ দিয়ে দেখতে বাসনা করেন তা নয়, কিন্তু তাঁরা যাকে দেখেছিলেন তাঁর বিষয়ে তিনি বোধগম্য প্রমাণ দাবি করেন। তিনি পুত্রকে মানব অবস্থায় দেখেছিলেন, কিন্তু এই ভিত্তিতে যে তিনি পিতাকে দেখেছেন তা বুঝে উঠতে পারেন না। কেননা এমনটা দেখাবার জন্য যে তিনি যা বাসনা করছিলেন সেই দর্শন মানবীয় ধরনের নয় বরং ছিল মনেরই দর্শন, সেজন্য ‘প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন’ অনুরোধের পাশেপাশে তিনি ‘তাতে আমরা তুষ্ট হব’ বাক্যটা যোগ করেন। তিনি প্রভুর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে অস্বীকার করেন না, কিন্তু জানার ব্যাপারে এমন প্রমাণ দাবি করেন যা প্রভুর উক্তিকে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে, কেননা প্রভুর ঘোষণার মাধ্যমে এমন অধিকার উপস্থিতি হয়েছিল যা বিশ্বাসকে দাবিই করছিল। অন্যদিকে পিতাকে দেখবার অনুরোধ এজন্য হয়েছিল, কারণ পুত্র এটা বলেছিলেন যে তাঁরা পিতাকে ইতিমধ্যে দেখেছিলেন ও তাঁকে দেখেছিলেন বলে তাঁকে অবশ্যই জানবেন। তাঁরা যাকে ইতিমধ্যে দেখেছিলেন তাঁকে জানবার জন্য অনুরোধ রাখা তো স্পর্ধার অভিব্যক্তি আদৌ নয়।

৩৬। অতএব, ফিলিপের কথায় প্রভু এ উত্তর দিয়েছিলেন, ‘ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তোমরা আমাকে জান না?’ প্রেরিতদূত তাঁকে চিনে নিতে পারেননি বলেই প্রভু তাঁকে ভর্ৎসনা করেন, কেননা আগে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁরা যদি তাঁকে জানতেন তবে পিতাকেও জানতেন। তিনি তাঁকে জানবার ব্যাপারে প্রেরিতদূতের অজ্ঞতা ভর্ৎসনা করেন, কেননা তিনি আগে বলেছিলেন যে, তাঁকে জানলে তবে তাঁরা পিতাকেও জানতেন। কিন্তু কোন্ কারণেই বা তিনি এই অসন্তোষ প্রকাশ করেন যে তাঁরা এতদিন পরে তাঁকে জানেন না? অবশ্যই কারণটা এটা যে, যদি তাঁরা তাঁকে জানতেন তাহলে তাঁদের পক্ষে তাঁর নিজের মধ্যে পিতার স্বরূপকে উপলব্ধি করা দরকার ছিল। তাঁর সাধিত কর্মকাণ্ড ছিল ঈশ্বরেরই স্থায়ী কর্মকাণ্ড : ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটা, বাতাসকে আত্মা দেওয়া, মানব বোধের অতীত সেই আঙুররস-পরিবর্তনকে ও রুটি-বৃদ্ধিকে অঙ্গভঙ্গির বিশ্বাসের গুণে সাধন করা, অপদূতদের তাড়ানো, রোগ-ব্যাদি দূর করে দেওয়া, আঘাতগ্রস্ত দেহকে নিরাময় করা, জন্ম থেকে উপস্থিত খুঁত সংস্কার করা, পাপ ক্ষমা করা, মৃতদের জীবনকে ফিরিয়ে দেওয়া। এবং তিনি মাংস ধারণ করতে করতেই তেমনটা করেছিলেন ও এটা ঘোষণা করছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। সেই ভর্ৎসনার প্রধান কারণ এটা, তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, মানবজন্ম-রহস্যের গুণে তিনি যা ধারণ করেছিলেন, সেই মানব অবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপটাই সেই সমস্ত কর্মকাণ্ড সাধন করেছিল।

৩৭। সেজন্য তিনি তাঁদের ভর্ৎসনা করেন, কারণ তিনি এতদিন ধরে উপরোল্লিখিত অলৌকিক কাজ সাধন করা সত্ত্বেও তিনি অচেনা হয়ে থেকেছিলেন। যাঁরা তাঁকে পিতাকে দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করেন, তাঁদের তিনি বলেন, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’। এতে তিনি দৈহিক দর্শনের কথা ও মাংসময় চোখে দৃষ্টির কথা ইঙ্গিত করেন না, কিন্তু সেই চোখেরই কথা বলছিলেন যা বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি : চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে (ক)। কাল এমনটা হতে দেয় না ও সোনালী ফসলের মাঠের ইঙ্গিতও এমনটা হতে দেয় না যে তাঁরা সেই কথায় পার্থিব ও দৈহিক

কিছু উপলব্ধি করবে, কিন্তু তিনি অন্তিম ফসলের সুখময় দর্শনের দিকেই মনশ্চক্ষু তুলতে আঙা করলেন। তেমনিভাবে এখন ঘটছে যখন তিনি বলেন, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’। কুমারীর প্রসব থেকে সঞ্জাত মাংসময় এই দেহটাই যে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের রূপ ও প্রতিমূর্তি প্রকাশ করতে পারে তা নয়; তিনি যে মানবীয় রূপ ধারণ করেছেন, তা ঈশ্বরের অশরীরী স্বরূপের দর্শন পাবার জন্য উপযোগী দৃষ্টান্ত নয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞাত হন, যদি একথা সত্য, এমনকি একথা অবশ্যই সত্য যে, এমন কারও না কারও কাছে তিনি জ্ঞাত হলেন যারা তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রম দ্বারা তাঁকে চিনল, এবং পুত্রের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে উপলব্ধি পিতারও ঈশ্বরত্ব বিষয়ে উপলব্ধি দাবি করে, কেননা পুত্র হলেন পিতার প্রতিমূর্তি এই অর্থে যে, তিনি ধরনের দিকে ভিন্ন নন কিন্তু তাঁকে নিজের প্রণেতা বলে নির্দেশ করেন। ভিন্ন ভিন্ন অন্যান্য যত ধাতু বা রং বা পদার্থ বা শিল্পকর্ম দিয়ে তৈরী প্রতিমূর্তি যা উপস্থাপন করে, তা হলো সেই বস্তুর চেহারা মাত্র; কিন্তু প্রাণহীন কপি মাত্র হওয়ায় সেগুলো কি সেই জীবন্ত মূলবস্তুর সমান বলে গণ্য হতে পারে? অথবা, চিত্র বা অংকন বা খোদাই করা বা মডেল করা মূর্তি কি মূল নমুনার সমান বলে গণ্য হতে পারে যার জন্য সেগুলো প্রকৃত প্রতিমূর্তি হতে পারে? তবে, পিতার সম্পর্কে পুত্র এধরনের প্রতিমূর্তি নন, কেননা তিনি সেই জীবনময়ের জীবনময় প্রতিমূর্তি, ও তিনি তাঁর নিজ থেকে সঞ্জাত হওয়ায় তাঁর স্বরূপ ভিন্ন নয়; এবং যেহেতু তিনি কোন কিছুতেই ভিন্ন নন, সেজন্য তিনি সেই স্বরূপের পরাক্রমের অধিকারী যা তাঁর নিজের স্বরূপের সমান। সুতরাং, যখন তিনি প্রতিমূর্তি, তখন এটা দাঁড়ায় যে, একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম পিতা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করে, এটাও জ্ঞাত করে যে, পুত্র নিজেও অদৃশ্য ঈশ্বরের রূপ ও প্রতিমূর্তি; এবং যে সাদৃশ্য ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে জড়িত, তা পুত্র হারান না, কারণ ঐশ্বরিক স্বরূপের যে পরাক্রম, সেক্ষেত্রে তিনি অভাবী নন।

৩৮। তবে বাণীর ব্যাখ্যা এ : ‘এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তোমরা আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন?’ ঈশ্বরের বিষয়াদি সম্পর্কে বলার মত স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী বাদে মানুষের আর বাকি কথা রইল না; বাকি সমস্ত কথা কঠিন, অস্পষ্ট, জটিল ও

অন্ধকারময়। ঈশ্বর যে কথা উচ্চারণ করেছেন, যদি এমন কেউ থাকে যে তাঁর সেই কথার চেয়ে আলাদা কথা দ্বারা এই বচন ব্যাখ্যা করতে চায়, তাহলে সে, হয় বচনটা আদৌ বোঝে না, না হয় পাঠকদের কাছে সেই বচনকে দুর্বোধ্য রাখবে। যখন প্রেরিতদূতেরা তাঁকে পিতাকে দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি বললেন, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’। এই বচন পরিবর্তন করা খ্রিস্টবৈরীরই কাজ, তা অস্বীকার করা ইহুদীদের কাজ, তা বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকা বিজাতীয়দের কাজ। কিন্তু যদি দৈবাৎ এক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হই, তাহলে, এসো, আমাদের উপলব্ধিকেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করি। যদি ঈশ্বরের বাণীতে দুর্বোধ্য কিছু পাই, তাহলে, এসো, আমাদের বিশ্বাসের অভাবকেই দোষী করি। কেননা বচনটা স্পষ্টই দেখায় যে ঈশ্বর একাকী ঈশ্বর নন, কিন্তু তবুও কথাগুলো এমনটা দেখায় যে [পিতা ও পুত্রের] স্বরূপ ভিন্ন নয়। পুত্রতে পিতাকেও দেখা হয়, ও তেমনটা হতে পারে না যদি জীবটা একাকী বা ভিন্ন এক জীব হয়, কারণ পিতাকে পুত্রের মধ্য দিয়েই দেখা হয়, এবং রহস্য-স্বীকারোক্তিতে উভয় একাকী ঈশ্বরও নন, একক ব্যক্তিও নন। জিজ্ঞাসা করি, ‘আমাকে যে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’ উক্তি দ্বারা প্রভু এমন কি নির্দেশ করছিলেন যা মানুষ বিশ্বাস করবে? পিতা যে পুত্রের সঙ্গে উল্লিখিত, তা নির্দেশ করার জন্য যেখানে ‘এবং’ সংযোগটাও রয়েছে, সেখানে একটামাত্র ব্যক্তিকে নির্দেশ করা চলে না। কেননা যখন ‘এবং পিতা’ বলা হয়, তখন তা যে একাই ও একক ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তাও সমর্থন করা চলে না। তবে, স্বরূপের ঐক্যের সঙ্গে জড়িত সাদৃশ্য গুণেই যে পিতা পুত্রের মধ্য দিয়ে দৃশ্যগত হন, এই সিদ্ধান্ত বাদে অন্য আর কোন্ সিদ্ধান্ত বাকি রয়েছে? কিন্তু পাছে বিশ্বাস ক্ষেত্রে আমাদের কোন না কোন অনিশ্চয়তার হাতে একা ফেলে রাখা হয়, সেজন্য তিনি এই কথাও যোগ করলেন, ‘কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন?’ কেননা কেমন করে মানুষ পিতার বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে পারত? বা, যাঁরা তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, যখন তাঁরা পিতাকে পুত্রতে দেখেছিলেন, তখন তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া কী দরকার ছিল?

৩৯। আরও, জনক ও জনিতজনের যে ঐক্য সমান স্বরূপে ও সমান ধরনে ব্যক্ত, তা এটা প্রমাণ করে যে পিতাকে তাঁর সত্যকার স্বরূপে দেখা হয়েছিল। এবং এটা প্রভুর

পরবর্তী কথায় প্রকাশিত, তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? (ক)। তাঁদের স্বরূপ সমান হওয়ায় পিতা ও পুত্র যে অবিচ্ছেদ্য, তা আমরা পুত্রের নিজের কথা দ্বারা বাদে অন্য কথায় শেখাতে পারি না। এক্ষেত্রে এমনটা ভাবতেই নেই যে, পথ ও সত্য ও জীবন সেই খ্রিস্ট নামগুলো ও চেহারা-রূপান্তর বিষয়ক নাটিকায় চর্চা করেন ও সেজন্য তাঁর ধারণ করা মনুষ্যত্বের জন্য তিনি পুত্র বলে অভিহিত; আরও, স্বরূপের জন্য তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে অভিহিত করেন; এবং এসমস্ত কিছু এমন যাতে এই বিভ্রম দেওয়া হয় যে একটামাত্র ও একাই একটা ব্যক্তি রয়েছে যে মুখোশ পরে যেন মনে হতে পারে যে দু'জন ব্যক্তি উপস্থিত। না। তিনি একাকী এমন জীব নন যে একসময়ে নিজের কাছে পুত্র বলে হাজির হন ও অন্যসময়ে নিজের কাছে নিজেকে পিতা বলে ঘোষণা করেন ও এমন নামগুলো দেখান যা কোন স্বরূপ না থাকলেও একটা স্বরূপ নির্দেশ করে। বরং এক্ষেত্রে ভাষাটা একেবারে স্পষ্ট, কেননা পিতা হলেন পিতা ও পুত্র হলেন পুত্র। কিন্তু নাম দু'টোতে ও বাস্তবতা দু'টোতে নতুন বলতে, ভিন্ন বলতে, ও পরকীয় বলতে কিছুই নেই। কেননা সত্যকার স্বরূপ স্বরূপ হয়ে থাকে, ও যিনি ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত তিনি ঈশ্বর হয়ে থাকেন, ও জন্মটা কোন হ্রাসীকরণ বা বৈষম্য ঘটায় না, কেননা পুত্র এমন স্বরূপে অস্তিত্বশীল যা সনাতন ও পিতার স্বরূপের চেয়ে অসদৃশ নয়; এবং একমাত্র জনিতজনকে জনিত ক'রে পিতা তাঁকে এমন কিছু আরোপ করেননি যা নিজ থেকে পরকীয়, কিন্তু দাতা হিসাবে কোন লোকসান ভোগ না করে তাঁকে নিজস্ব সমস্ত কিছু মঞ্জুর করলেন। তাতে পুত্র ঐশ্বরিক স্বরূপ বিহীন নন, কেননা তিনি ঈশ্বর থেকে ছাড়া অন্যজন থেকে [উদ্ভূত] ঈশ্বর নন; তিনি ঈশ্বরের চেয়েও ভিন্ন নন, কেননা ঈশ্বর ছাড়া তিনি অন্য কিছু নন। পুত্র হলেন ঐশ্বরিক জন্মদানের ফল, ও তেমন ঐশ্বরিক জন্মদানের ফলে ঈশ্বরের স্বরূপ নিজের ঈশ্বরত্বকে হারায়নি। সুতরাং পিতা পুত্রতে আছেন, পুত্র পিতাতে আছেন, ঈশ্বর ঈশ্বরে আছেন। এবং এমনটা ভিন্ন ধরনের, আবার কিন্তু সঙ্গতিময় ধরনেরও দু'টো জীবের সংযোগের মধ্য দিয়ে ঘটে না, এমন একীকরণের মধ্য দিয়েও নয় যা দ্বারা উচ্চ ধরনের একটা সত্তা নিম্ন ধরনের এটা সত্তায় একীভূত হয়, কেননা সত্তা ক্ষেত্রে এমনটা সম্ভব নয় যে একটা বস্তু নিজেতে অন্য বস্তু ধারণ করবে ও সেইসঙ্গে বস্তুটাও সেটা দ্বারা ধারণকৃত

হবে, কিন্তু এই সমস্ত, জীবনময় স্বরূপ থেকে জীবনময় স্বরূপের জন্মের মধ্য দিয়েই ঘটে, কারণ সত্তা ভিন্ন নয়, কারণ সেই জন্ম ঈশ্বরের স্বরূপে কোন পরিবর্তন আনে না, কারণ ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে জন্ম নেন যেন তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু না হন, কারণ এসমস্ত কিছুতে নতুন বলতে, পরকীয় বলতে, বিভাজ্য বলতে কিছুই নেই, কারণ পিতা ও পুত্রকে দু'টো ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করা অভক্তিকর ব্যাপার, কারণ পিতা ও পুত্র যে একাকী ঈশ্বর এমনটা বলা অভক্তিকর ব্যাপার (খ), কারণ 'ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর' এর সত্তার সাদৃশ্যে স্থিত সেই ঐক্যকে অস্বীকার করা ঈশ্বরনিন্দা স্বরূপ (গ)।

৪০। সুসমাচারে বিশ্বাসী যারা, পাছে তারা এই রহস্যকে সন্দেহময় ও অনিশ্চিত বলে গণ্য করে, সেজন্য প্রভু রহস্যটা উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এই অনুক্রম পালন করলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন (ক)। জিজ্ঞাসা করি, যখন এসমস্ত কথায় পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্মের উপরে চাপ দেওয়া হয়েছে, তখন এসমস্ত কথা বাদে তিনি অন্য কোন্ কথা দিয়ে এমনটা প্রমাণ করতে পারতেন ও এখনও প্রমাণ করতে পারেন যে, পিতা ও পুত্র [ঐশ্বরিক] স্বরূপের অধিকারী? যখন তিনি বলেন, 'আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না', তখন তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকেও বিলীন করেন না, নিজে যে পুত্র তাও অস্বীকার করেন না, নিজেতে যে পিতার ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রম বর্তমান তাও গুপ্ত করেন না। কেননা যখন তিনি নিজেই কথা বলেন, তখন সেই ঐশ্বরিক সত্তায় অবস্থান করেই কথা বলেন; কিন্তু যখন তিনি নিজে থেকে কথা বলেন না, তখন নিজেতে পিতা ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরের জন্ম বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তিনি পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হতে পারেন না, কেননা তাঁদের স্বরূপ এক; ও তিনি যে কথা বলেন যদিও নিজে থেকে সেই কথা বলেন না, তবু তিনিই সেই কথা বলেন। যে কেউ যে কথা বলে সেই কথা নিজে থেকে বলে না তবুও সেই কথা বলে, সে যে অস্তিত্বপ্রাপ্ত নয় তা হতে পারে না যেহেতু সে সেই কথা বলে; এবং সে যে কথা বলে তা নিজে থেকে বলে না, সেজন্য এটা প্রকাশ করে যে, সে যে কথা বলে সেই কথা তার নিজের নয়। কেননা তিনি একথা যোগ করলেন, 'যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই

নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন’। পিতা যে পুত্রতে অবস্থান করেন, এর অর্থ এই নয় যে পিতা স্বতন্ত্র ও একক; পিতা যে পুত্রের মধ্য দিয়ে কাজ সাধন করেন, এর অর্থ এই নয় যে, পিতা ভিন্ন ও পরকীয়। একই প্রকারে, পুত্র যে কথা বলেন, তিনি যে নিজে থেকে সেই কথা বলেন না, এতে এটা দাঁড়ায় যে, একটামাত্র ব্যক্তি নেই; একইপ্রকারে, একজন যে অন্যের মধ্য দিয়ে কথা বলেন, এতেও এটা দাঁড়ায় যে, তাঁরা পরকীয় ও বিচ্ছেদ্য নন, বরং এ রহস্য প্রকাশিত হয় যে, তাঁরা এক। উপরন্তু, তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভিন্ন নন, কেননা তাঁদের নিজস্ব স্বরূপের মাধ্যমে তাঁরা নিজেতে নিজেরা রয়েছেন; তাঁদের ঐক্য এ, যিনি কথা বলেন তিনি নিজে থেকে কথা বলেন না, ও যিনি নিজে থেকে কথা বলেন না তিনি তবু কথা বলেন। এবং যেহেতু তিনি এ শিখিয়েছিলেন যে, পিতা কথাও বলতেন ও তাঁর মধ্যে কাজও করতেন, সেজন্য তিনি তেমন সিদ্ধ ঐক্যের বিশ্বাস স্থির করে বললেন, ‘যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর’। পিতা পুত্রতে কাজ করেন, কিন্তু পুত্রও পিতার কাজ সাধন করেন।

৪১। অতএব, পাছে এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে, পিতা পুত্রতে কাজ করেন ও কথা বলেন নিজের পরাক্রমী কার্যকারিতার মাধ্যমে ও তাঁর সেই নিজস্ব স্বরূপের মাধ্যমে নয় যা জন্মের ফলে হলো পুত্রের অধিকার, সেজন্য প্রভু বলেন, ‘তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’। জিজ্ঞাসা করি, ‘আমাকে বিশ্বাস কর’ বাক্যটার অর্থ কি? অবশ্যই, বাক্যটা সেই দাবির সঙ্গে সম্পর্কিত যা আগে করা হয়েছিল তথা, ‘পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন’। বিশ্বাস করার এই আঞ্জা দ্বারা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলা হয়, সেই যে বিশ্বাস এমনটা অনুরোধ করেছিল যেন পিতাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’ এই যে কথা তিনি বলেছিলেন, তা যথেষ্ট ছিল না যদি তিনি আমাদের জ্ঞান এমনভাবে প্রসারিত না করতেন যেন আমরা, যদিও আগে একথা জানতাম যে পিতা পুত্রতে রয়েছেন, তথাপি যেন এটাও মনে রাখতাম যে পুত্র পিতাতে রয়েছেন, এর ফলে প্রজনন ও জন্মের মাধ্যমে উভয়ের অধিকৃত স্বরূপের ঐক্যের চেয়ে পাছে একে অন্যের মধ্যকার প্রবাহেরই উপর

বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতএব, প্রভু ইচ্ছা করেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা হোক পাছে এমনটা হয় যে মানবধারণের ব্যবস্থার ফলে বিশ্বাসের চেতনা বিপন্ন হয়। যদি তাঁর মাংস, তাঁর দেহ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগ নিঃসন্দেহেই কোন না কোন অনিশ্চয়তা আনে, তবু অন্তত কর্মকাণ্ডের জোরে এটা বিশ্বাস করা হোক যে ‘ঈশ্বর ঈশ্বরে’, ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’, ও তাঁরা এক; কেননা তাঁদের স্বরূপের পরাক্রমে উভয় একে অন্যের মধ্যে, ও উভয়ের কোনও একজনও অন্যকে ছাড়া নন: তাঁর নিজস্ব যা কিছু আছে পিতা তা থেকে পুত্রতে কিছুই হারান না, ও পুত্র যা, পুত্র পিতা থেকে তা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করেন। এই অবস্থা দৈহিক সমস্ত স্বরূপের এমন অবস্থা নয় যে সেগুলো পারস্পরিক ভাবে একে অন্যের মধ্যে অবস্থান করবে, এমন অবস্থা নয় যে অস্তিত্বশীল [পুত্র] যিনি, তাঁরা উভয় তাঁর স্বরূপের সিদ্ধ ঐক্যকে অধিকার করবেন, এমন অবস্থা নয় যে একমাত্র জনিত পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্ম তাঁর নিজের পিতার সত্যকার ঈশ্বরত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য হবে। এটা এমন যা কেবল একমাত্র জনিত ঈশ্বরেরই বৈশিষ্ট্য, এটা সেই বিশ্বাস যা সত্যকার জন্ম-রহস্যে নিহিত, এটা আত্মিক পরাক্রমের কাজ, অর্থাৎ, [ঈশ্বর] হওয়া ও ঈশ্বরে অবস্থান করা, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু ঈশ্বরে এমন অবস্থান করা যা সেইভাবে নয় যেভাবে একটা বস্তু অন্য বস্তুতে অবস্থান করে, ঠিক সেইভাবে যেভাবে একটা দেহ অন্য দেহে অবস্থান করে; কিন্তু এমনভাবেই [ঈশ্বর হিসাবে] হওয়া ও এমনভাবেই [পুত্র হিসাবে] অস্তিত্বশীল হওয়া যেন তিনি সেই অস্তিত্বশীলজনের মধ্যে অবস্থান করেন; তাঁর মধ্যে সত্যিকারে এমনভাবেই অবস্থান করা যেন তিনি নিজেও অস্তিত্বশীল হয়ে দাঁড়ান। কেননা উভয় এমনভাবে অস্তিত্বশীল হন যে অন্যকে ছাড়া কোনও একজন হন না, যেহেতু প্রজনন ও জন্মের ফলে সেই অস্তিত্বশীলজনের স্বরূপ অন্য রকম নয়। এজন্য লেখা রয়েছে, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’, আরও, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’, আরও, ‘আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’, কারণ সেই জন্ম পৃথক ও নিম্নতর নয় যেহেতু জন্মসূত্রে [পুত্রের] অধিকৃত ঐশ্বর্যরূপ পিতাতে ও পুত্রতে বর্তমান একমাত্র ঈশ্বরত্বের রহস্যকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করে যেহেতু ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নন। ফলত, একমাত্র জনিতজনের প্রজনন দু’টো ঈশ্বরকে মেনে

নেয় না, কারণ ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বররূপে জন্ম নিয়ে, তাঁকে যিনি জনিত করেন সেই ঈশ্বরের স্বরূপকে নিজেতে প্রকাশ করেন।

৩ (ক) ৪র্থ পুস্তক ১২-১৩ অধ্যায়, ও ৬ষ্ঠ পুস্তক ৫-৬ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) এখানে আরিউসের ভ্রান্তমত নির্দেশিত। এরা নাকি বলত, পিতা ও পুত্রকে দু'টো ব্যক্তি বলে মেনে নেওয়ায় কাথলিকেরা তাঁদের দু'টো স্বরূপও মেনে নেয়।

(গ) সাধু হিলারিউস প্রাচীনকালের হেবিওনকে বর্তমানকালের ফতিনুস নামে অভিহিত করেন কারণ ফতিনুস হেবিওনের প্রাক্তন ভ্রান্তমত পুনরুজ্জীবিত করেছিল; তাছাড়া সাধু হিলারিউস নিজেই ১ম পুস্তক ৩৬ অধ্যায়ে বলেছিলেন, তিনি হেবিওনের ভ্রান্তমত সম্পর্কে পর্যালোচনা উপস্থাপন করবেন।

(ঘ) এটা হলো ফতিনুসের ভ্রান্তমত।

(ঙ) এখানে আঞ্চিরার বিশপ মার্কেল্লুসকে নির্দেশ করা হলো যিনি নিকেয়া-মহাসভার সমর্থিত বিশ্বাস রক্ষা করার লক্ষ্যে আস্তোরিউসের বিরুদ্ধে একটা পুস্তক লিখেছিলেন ও এই কারণে আরিউসপন্থীরা বলত, তিনি সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমতের অনুসারী।

(চ) এখানে আরিউসের কথা নির্দেশ করা হলো।

(ছ) সির্মিওর ভ্রান্তমতপন্থী বিশপ ফতিনুস এটা সমর্থন করত যে, ধন্যা মারীয়া থেকে খ্রিস্টের জন্ম পার্থিব ও সাধারণ একটা জন্ম মাত্র।

৫ (ক) যোহন ১৪:৯।

(খ) ফিলি ২:৬ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১০:৩০।

৬ (ক) যোহন ১৪:২৮।

(খ) যোহন ১৭:৫; মথি ২৬:৩৮ ইত্যাদি দ্রঃ।

(গ) এখানে সেই আনোমোইওদের (ʼΑνομολοί) কথা বলা হলো যারা 'হমোউসিওস' তত্ত্বের বিপক্ষে এটা সমর্থন করত যে, পুত্র পিতার অসদৃশ সত্তার অধিকারী।

৯ (ক) যোহন ১:১।

১০ (ক) যাত্রা ৭:১ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাম ৮২:৬ লাতিন পাঠ্য।

১২ (ক) যোহন ২০:২৮।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোহন ১০:৩০।

(ঘ) যোহন ১৬:১৫।

(ঙ) যোহন ১৪:১১।

(চ) যোহন ২০:২৯ লাতিন পাঠ্য।

(ছ) যোহন ৬:৩৮ দ্রঃ।

(জ) যোহন ৮:৫০ দ্রঃ।

১৪ (ক) যোহন ৩:৬।

১৫ (ক) যোহন ৫:১৮।

১৬ (ক) যোহন ৫:১৯-২৩।

১৭ (ক) যোহন ৫:১৭।

(খ) যোহন ৫:১৯।

১৮ (ক) যোহন ৫:১৯ লাতিন পাঠ্য।

১৯ (ক) যোহন ৫:২০-২১।

২০ (ক) ‘অজনিতই একটা প্রতাপের অধিকারী’: এখানে অজনিত পিতার প্রতাপের কথা নির্দেশ করা হলো; অন্য কথায়, প্রভু ইচ্ছা করেন না, তাঁর বিষয়ে এটা ধারণা করা হবে যে, পুত্র জনিত বলে অজনিত পিতার প্রতাপের অধিকারী নন।

(খ) যোহন ৫:২২।

২১ (ক) যোহন ৯:৩-৪ দ্রঃ।

(খ) ‘যে জনিত, সে তো কোন ক্ষমতা রাখে না’: যে জনিত, সে নিজে থেকে কোন কিছুই অধিকারী নয় কিন্তু সে যে ক্ষমতা রাখে তা জনকের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমতা।

২২ (ক) যোহন ১০:২৭-২০ লাতিন পাঠ্য।

২৩ (ক) যোহন ১০:৩১-৩৪।

২৪ (ক) যোহন ১০:৩৪-৩৮।

(খ) রো ১:৪ দ্রঃ।

২৫ (ক) 'একাকীত্ব' ভ্রান্ত ধারণাটা তিন ব্যক্তিকে একক ব্যক্তিতে একীভূত করে।

২৭ (ক) মালা ৩:৬ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ৬:৫৭।

(গ) যোহন ৫:২৬।

২৮ (ক) ১ম পুস্তক ১৯ অধ্যায়; ৪র্থ পুস্তক ৯ অধ্যায় দ্রঃ।

৩৩ (ক) যোহন ১৪:৬-১১ লাতিন পাঠ্য।

৩৭ (ক) যোহন ৪:৩৫।

৩৯ (ক) যোহন ১৪:১০ দ্রঃ।

(খ) এখানে সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমত নির্দেশ করা হলো।

(গ) এখানে আরিউসের ভ্রান্তমত নির্দেশ করা হলো।

৪০ (ক) যোহন ১৪:১০ দ্রঃ।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৮ম পুস্তক

এতক্ষণে সাধু হিলারিউস পবিত্র আত্মার কথা প্রায় উল্লেখ করেননি। এখন, এই ৮ম অধ্যায়ে, তিনি ভ্রান্তমতপন্থীদের সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করার লক্ষ্যে পবিত্র আত্মার উৎপত্তির কথা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে মুখ্য বচনটা হলো যোহন ১৬:১২-১৫, যা ব্যাখ্যা করে সাধু হিলারিউস বলেন, ‘সুতরাং, যিনি পুত্র থেকে প্রেরিত ও সেইসঙ্গে পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তিনি পুত্র থেকে তুলে নেন’ (২০ অধ্যায়)। এবং একথা বলার পর ভ্রান্তমতপন্থীদের অভিমত খণ্ডন করার জন্য অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক কথা উপস্থাপন করে ঘোষণা করেন, পবিত্র আত্মার সঙ্গে খ্রিষ্ট এক, ‘যেহেতু যা ঈশ্বরের তা খ্রিষ্টেরও, ও যেহেতু যা খ্রিষ্টের তা ঈশ্বরেরও, সেজন্য খ্রিষ্ট এমন কিছু হতে পারেন না যা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। সুতরাং, খ্রিষ্টই ঈশ্বর, ঈশ্বরের সঙ্গে একমাত্র আত্মা’ (২৭ অধ্যায়)। এবং এ সুচিন্তিত মন্তব্যের পর সাধু হিলারিউস, পবিত্র আত্মা যে ঈশ্বরত্বের অধিকারী তা দেখাবার জন্য শাস্ত্রের নানা সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন (প্রেরিত ১:৪-৫, ৮; ১ করি ৮:৪-৬; ১২:৩, ৮, ১১; এফে ৪:৫-৬; যোহন ৬:৪০, ইত্যাদি)।

৪৫-৪৭ অধ্যায়ে সাধু হিলারিউস পুনরায় খ্রিষ্টের কথায় ফিরে এসে কল ১:১৫-২০ উপস্থাপন করে এটা বলেন যে, খ্রিষ্টের জন্মে গোটা ঈশ্বরত্বের ঐক্য ও পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকল; পরে, ফিলি ২:৬-৭ (লাতিন পাঠ্য) ব্যাখ্যা করে সাধু হিলারিউস এটা বলেন যে, যখন সাধু পল বলেন মাংসধারণের আগে খ্রিষ্ট ‘রূপ দিক দিয়ে ঈশ্বর’ ছিলেন, তখন এমনটা সমর্থন করেন না যে খ্রিষ্ট অন্য ঈশ্বরের রূপে ছিলেন; বরং প্রেরিতদূত এটাই মেনে নেন যে, খ্রিষ্ট যে ঈশ্বরের রূপে ছিলেন, সেই ঈশ্বর হলেন বাইবেলের একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর: ‘যেহেতু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের গৌরবে রয়েছেন, সেজন্য তিনি যাঁর গৌরবে রয়েছেন তাঁরই কাছ থেকে আপনা আপনিই সেই ঈশ্বরত্ব-গুণের অধিকারপ্রাপ্ত’ (৪৭ অধ্যায়)।

৪৮-৪৯ অধ্যায়: সাধু হিলারিউস এ দু’টো প্রশ্নের উত্তর দিতে অভিপ্রায় করেন, তথা, খ্রিষ্ট কি অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্য প্রতিমূর্তি? অসীম ঈশ্বরকে কি সীমাবদ্ধ রূপের

প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে দৃশ্যগত করা যেতে পারে? সাধু হিলারিউস এক্ষেত্রে বলেন, খ্রিষ্ট নিজেই তখনই যোহন ১৪:৯-এ উত্তর দিলেন যখন আপন শিষ্যদের বলেছিলেন, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’, ও যখন যোহন ১৫:১৭-এ বলেছিলেন, ‘আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাতে বিশ্বাস করবে না’; অর্থাৎ, যেহেতু কেবল ঈশ্বরত্বই ঈশ্বরত্বের কাজ সম্পাদন করতে পারে, সেজন্য খ্রিষ্ট খ্রিষ্ট পিতার একই স্বরূপের অধিকারী। এবং কল ১:১৫-২০ উল্লেখ করে সাধু হিলারিউস এ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন যে, খ্রিষ্ট সত্যিই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে তিনি ঈশ্বরত্বের স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

৫০ অধ্যায় : এসব কিছু ভিত্তিতে সাধু হিলারিউস এটা বলেন যে, অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে খ্রিষ্ট হলেন নিজের দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; এবং যেহেতু তিনি ‘আদি’ বলে অভিহিত সেজন্য তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত; ফলত ‘তিনি সবকিছুতে শীর্ষপদের অধিকারী, কারণ যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি আমাদের সবার দেহ, কারণ যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, তিনি একইসময়ে চিরকাল ধরেই প্রথমজাত’। এ বাক্য দ্বারা সাধু হিলারিউস বলতে চান : যেহেতু নিজেতে সমস্ত সৃষ্টির আদির অধিকারী হওয়ায় খ্রিষ্ট হলেন নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, ও যেহেতু নিজের দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা হওয়ায় তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সেজন্যই তিনি শীর্ষপদের অধিকারী কারণ সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করে, এবং তাঁরই দ্বারা সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেন। অতএব, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে খ্রিষ্ট হলেন সৃষ্টিরও আদি, নবসৃষ্টিরও আদি।

৫১-৫৬ অধ্যায় : এসব কিছু বলার পর সাধু হিলারিউস জিজ্ঞাসা করেন, ‘ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়াটা যে কি, তুমি এখন তা উপলব্ধি কর? তার অর্থ হলো এ, সমস্ত কিছু তাঁর মধ্যে তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।’ এবং তা বলার পর ও সেই ভিত্তিতে দীর্ঘ আলোচনা করার পর, সাধু হিলারিউস পুস্তকটা সমাপ্ত করে বলেন, ‘সেই ঈশ্বরত্ব’ ব্যক্তি-খ্রিষ্টে ‘এমনভাবে দেহগতরূপে অবস্থান করে যার ফলে উভয়ই [পিতা ও পুত্র] এক; হ্যাঁ, উভয় এমন ঐক্য যে, ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নন [অর্থাৎ, একক ঈশ্বরত্বে পিতা ও পুত্র ভিন্ন নন], ঈশ্বরত্বে একে অন্যের সঙ্গে এমন সমান যে সিদ্ধতাবিশিষ্ট জন্ম সিদ্ধতাবিশিষ্ট ঈশ্বরকে উদ্ভূত করল।’

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	
	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬						

১। ধন্য প্রেরিতদূত পল আদর্শ বিশপের রূপ নির্ধারণ করতে ও তাঁর শিক্ষাদান দ্বারা মণ্ডলীর একটা নতুন মানুষকে গঠন করতে ইচ্ছা করে শিথিয়ে দিলেন তাঁর মধ্যে, বলতে গেলে, পরাক্রমগুলোর শ্রেষ্ঠতা কি। তিনি বললেন, তাঁকে বিশ্বাসের ধর্মশিক্ষার অনুরূপ বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হতে পারেন; কেননা অনেকেই আছে যারা অদম্য, বাচাল ও প্রলুব্ধকারী (ক)। এইভাবে তিনি এটা দেখান যে, শৃঙ্খলা ও নীতি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য তখনই মাত্র বিশপত্ব অনুশীলনে উপকারী যখন অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সেগুলোর অভাব না থাকে যেগুলো বিশ্বাস বিষয়ে শিক্ষাদান ও সেই বিশ্বাস রক্ষার্থে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন; কারণ যাঁর পক্ষে অনিন্দনীয় জীবনাচরণ বা প্রচারকর্মে দক্ষতা যথেষ্ট, সেই বিশপ আদৌ উত্তম ও উপযোগী নন, কেননা যিনি নিরপরাধী তিনি দক্ষ না হলে তবে কেবল নিজের জন্যই উপকারী, এবং যিনি দক্ষ তিনি নিরপরাধী না হলে তবে নিজের দক্ষতার অধিকার হারাবেন। সততা ও ধর্মিষ্ঠতার আঙ্গাবলি দ্বারা মানুষকে এজগতে জীবনের জন্য গঠন করা, প্রেরিতদূতের বাণীর একমাত্র লক্ষ্য শুধু নয়, অন্যদিকে সেই বাণী শিক্ষাদানের দক্ষতা দ্বারা সমাজগৃহের শাস্ত্রীকে বিধান-ব্যাখ্যার জন্য চালনা করতেও অভিপ্রেত নয়; কিন্তু সেই বাণী সর্বোত্তম গুণাবলিকে সিদ্ধ অর্জন ক্ষেত্রে মণ্ডলীর এমন প্রধান ব্যক্তিত্বকে প্রশিক্ষিত করতে অভিপ্রেত যাতে তাঁর জীবনাচরণ শিক্ষাদান দ্বারা ও তাঁর শিক্ষাদান জীবনাচরণ দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। অবশেষে তাঁর বাণী যাঁকে লক্ষ্য করছিল, প্রেরিতদূত সেই তীতকেও উপযুক্ত ধর্মাচরণ বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করলেন, সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে (খ)। বিজাতীয়দের এই যে শিক্ষাগুরু, যিনি তাঁর অন্তরে খ্রিষ্ট যে

কথা বলছিলেন ও বসবাস করছিলেন এবিষয়ে চেতনার জন্য মণ্ডলীর আচার্য মর্যাদায় উন্নীত হলেন, তিনি তো এতে অঙ্গ ছিলেন না যে মারাত্মক ধর্মতত্ত্বের সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়বে ও ক্ষতিকর ধর্মশিক্ষা-জনিত বিকৃতি বিশ্বাসযোগ্য বাণীর শুদ্ধতার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ততা দেখাবে; এতেও অঙ্গ ছিলেন না যে, এই বিকৃতি নিজের ভক্তিহীন ব্যাখ্যার বিষ প্রাণের অন্তঃস্থলেও নিমজ্জিত করে গভীরতম অনিষ্ট অনুপ্রবেশ করাবে। এসব কিছু ফলেই তিনি বলেন, তাদের কথা দুষ্কৃতের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে (গ) ও সবসময় গুপ্ত ও অনুপ্রবেশ করতে তৈরী নিজের বিষ দিয়ে আক্রান্ত প্রাণের শুদ্ধতাকে দূষিত করে। একারণে তিনি ইচ্ছা করেছেন যেন বিশপের শিক্ষায় ভ্রান্তিমুক্ত বাণী, সচেতন বিশ্বাস, মন জয় করার ক্ষমতা, ভক্তিহীন, মিথ্যাবাদী ও নির্বোধ প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্থিরতা বিরাজ করবে। কেননা অনেকেই আছে যারা বিশ্বাস করতে ভান ক’রে বিশ্বাসের অধীন হয় না ও বিশ্বাস যেভাবে আছে তা গ্রহণ করে না নিয়ে বরং অসার মানব মতবাদ দ্বারা গর্বে স্ফীত হয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য উপযোগী বিশ্বাস তৈরি করে। এরা নিজেদের যা পছন্দ তা ভাবে ও যা সত্য তা ভাবতে চায় না; কিন্তু সত্যকার প্রজ্ঞা হলো, যা জানবার ইচ্ছা হয় না, মাঝেমাঝে ঠিক তা-ই জানা। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত প্রজ্ঞার ফলাফল হলো মূর্খতার ভাষণ, কেননা এটা আবশ্যিক যে, যখন মূর্খতার সঙ্গে জ্ঞানলাভ হয় তখন অবশ্যই মূর্খতার সঙ্গে প্রচার হয়। তাছাড়া, মূর্খ প্রচার তখনই শ্রোতাদের কেমন অনিষ্ট ঘটায় যখন সেই শ্রোতার প্রজ্ঞার অজুহাতে মূর্খ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়! এজন্য প্রেরিতদূত এ বলে এদের উপস্থাপন করে বলেন, ‘কেননা অনেকেই আছে যারা অদম্য, বাচাল ও প্রলুব্ধকারী’। সুতরাং, সেই দান্তিক অভক্তির বিরুদ্ধে, বাচাল দম্ভের বিরুদ্ধে ও প্রলুব্ধকারী বাচালতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার; আরও, ধর্মশিক্ষার যথার্থতা দ্বারা, বিশ্বাসের সত্যের দ্বারা, ও কথার সত্যতার দ্বারা প্রতিবাদ করা দরকার যাতে সেই সত্যের সত্যতা ও সেই যথার্থতার সত্য ভেসে ওঠে।

২। যে কারণে আমি একটু আগে প্রেরিতদূতের বাণী মনে করিয়ে দিয়েছি, সেই কারণ এ: মনে জঘন্য, সত্য ঘোষণায় মিথ্যাবাদী, প্রত্যাশায় অকেজো, কখনে বিষাক্ত এমন মানুষ রয়েছে যাদের প্রতিবাদ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তারা ভক্তির বেশে মারাত্মক তত্ত্ব, অশুভ শিক্ষা, জঘন্য মনোভাব শ্রোতাদের সরল অন্তরে অনুপ্রবেশ করায়।

প্রৈরিতিক প্রচারের শুদ্ধতা মূল্যায়ন না করে তারা সেই শ্রোতাদের এমনটা মেনে নিতে চালনা করে যে, পিতা পিতা নন, পুত্র পুত্র নন, বিশ্বাস বিশ্বাস নয়। তাদের উন্মাদ মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমরা বিধানকে ভিত্তি করে আমাদের প্রতিবাদকে এটা প্রমাণিত করতে চালিয়েছি যে, ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’ (ক) ও ‘সত্যকার ঈশ্বরে সত্যকার ঈশ্বর’ (খ) আছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা সুসমাচারের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা ভিত্তি করে এটা দেখিয়েছি যে, একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ ও সত্যকার জন্ম (গ)। অবশেষে, একই বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে আমরা এটা প্রমাণ করেছি যে, ঈশ্বরের পুত্র হলেন সত্যকার ঈশ্বর ও তাঁর স্বরূপ পিতার স্বরূপের চেয়ে পৃথক নয়, ও সেইজন্য মন্ডলীর বিশ্বাস একাকী ঈশ্বরকেও মানে না, দু’টো ঈশ্বরকেও মানে না (ঘ)। কেননা জন্ম-ধারণাটা একাকী ঈশ্বর-ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না, ও সিদ্ধ জন্মটা পৃথক দু’টো স্বরূপের নাম [তথা পিতা ও পুত্র নাম] দু’টো ঈশ্বরে আরোপ করতে মানে না। উপরন্তু, ভ্রান্তমতপন্থীদের অসার কথা প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা দু’টো বিষয়ে চিন্তিত: প্রথমত, পবিত্র, নিখুঁত ও যথার্থ শিক্ষা উপস্থাপন করা, যাতে করে আমাদের আলোচনা ভ্রান্ত ও বাঁকা পথে চলাচল না করে, ও সত্য-প্রমাণের চেয়ে বরং সত্য-অনুসন্ধান এদিক-ওদিক লক্ষ্যহীন ভাবে চলছে এমন সৌড়ঙ্গ থেকে বের হয়; দ্বিতীয়ত, অসার ও মিথ্যা যুক্তি হাতিয়ার করে ভ্রান্তমতপন্থীরা আকর্ষণীয় সত্যের বেশ উপস্থাপন করার জন্য যে ধারণাগুলো ব্যবহার করে, সেই সমস্ত ধারণা যে কেমন হাস্যকর ও যুক্তিহীন তা সকলের চোখের সামনে ব্যক্ত করা। কেননা ভক্তিময় শিক্ষা দান করা যথেষ্ট নয় যদি না ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিরোধ করার মাধ্যমেই বোঝানো না যায় যে সেই ভক্তিময় শিক্ষা সত্যিকারে ভক্তিময়।

৩। কোন না কোন শুভ প্রত্যাশার লক্ষ্য পূরণের জন্য, বা অন্তত সেই লক্ষ্য পূরণের সুযোগ পাবার জন্য, যেমন সহজাত গুণাবলি ও সদিচ্ছা ভাল ও সুবিবেচক মানুষকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিতে চালনা করে পাছে প্রত্যাশা পূরণে তারা কোন না কোন দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তেমনি যারা ভ্রান্তমতের ক্ষিপ্ততায় আক্রান্ত, তাদের সর্বোচ্চ চিন্তা হলো, ভক্তিময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাদের গোটা অভক্তিময় বুদ্ধি লাগানো। এরা নিজেদের অভক্তিময় আগ্রহ ভক্তপ্রাণদের বিরুদ্ধে লাগাতে, আমাদের জীবনের পুষ্টিকর প্রত্যাশার

উপরে তাদের জীবনের দুরাশাপূর্ণ প্রত্যাশাকে জয়ী করতে, সত্যের লক্ষ্যে আমরা যে শিক্ষা লাগাই, সেটার চেয়ে মিথ্যার লক্ষ্যে আরও বেশি ধারণা লাগাতে সচেষ্ট। আমাদের বিশ্বাসের ভক্তিময় ঘোষণার বিরুদ্ধে তারা নিজেদের ঈশ্বরনিন্দুক জঘন্যতায় কুটিলতার সঙ্গে এসমস্ত আপত্তি সাজিয়েছে। প্রথমে, তারা দাবি করে, আমরা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করব; পরে, খ্রিষ্টও ঈশ্বর কিনা, তারা এই প্রশ্ন উপস্থাপন করে; শেষে, পিতা পুত্রের চেয়ে মহান, এই প্রশ্নও উপস্থাপন করে। তাদের লক্ষ্য হলো, ‘একমাত্র ঈশ্বর আছেন’ আমাদের যে ঘোষণা, ‘খ্রিষ্ট ঈশ্বর নন’ দেখাবার জন্য আমাদের সেই ঘোষণাকে ব্যবহার করা। পুত্র ক্ষেত্রে তারা এমনটা জিজ্ঞাসা করে না, তিনি ঈশ্বর কিনা; তারা বরং খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাটা ফেলে রেখে কেবল এই লক্ষ্যই পূরণ করতে অভিপ্রায় করে অর্থাৎ তারা প্রমাণ করতে চায় যে, তিনি পুত্র নন। এবং এইভাবে, সরল বিশ্বাসের মানুষকে প্রতারণা করে তারা ঈশ্বর বলে খ্রিষ্টকে স্বীকার করা থেকে সেই মানুষকে দূর করে দিতে চেষ্টা করে, এই ভিত্তিতে যে, যদি খ্রিষ্টকেও ঈশ্বর বলে স্বীকার্য তাহলে ঈশ্বর আর এক নন। তাছাড়া, এক্ষেত্রে তারা, আহা, কেমন জাগতিক প্রজ্ঞার সূক্ষ্মতায় তর্ক করে যখন বলে, যদি একমাত্র ঈশ্বর থাকেন, তাহলে অন্য কোন ঈশ্বরকে দেখানো হলে তিনি আর ঈশ্বর হতে পারবেন না; যখন দ্বিতীয় একটা ঈশ্বর আছেন, তখন একমাত্র ঈশ্বর আর থাকবেন না, কারণ যেখানে অন্যজন আছে সেখানে যে একজন মাত্র থাকবে, অথবা, যেখানে একজন মাত্র আছে সেখানে যে অন্য একজন থাকবে, প্রকৃতির নিয়ম তেমনটা মানায় না। পরে, যখন এই কুটিল ধারণার চালাকির মাধ্যমে তারা সেই সকলকে পথভ্রষ্ট করেছে যারা সহজে বিশ্বাস করে ও শোনে, তখন তারা এই ধারণা প্রয়োগ করে (তারা তো এধারণা, বলতে গেলে, আরও সহজেই প্রয়োগ করতে পারে) তথা, খ্রিষ্ট স্বরূপের চেয়ে নামেই বরং ঈশ্বর, কেননা তাঁর উপরে আরোপিত এ সাধারণ নাম একমাত্র সত্যকার বিশ্বাসকে তথা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসকে আদৌ বিনাশ করে না। এবং, তাদের মতে, পিতা এজন্যই পুত্রের চেয়ে মহান, কারণ, যেহেতু কেবল এক ঈশ্বর আছেন, সেজন্য তাঁদের স্বরূপ ভিন্ন হওয়ায় পিতা আপন অধিকৃত স্বরূপের জন্যই [পুত্রের চেয়ে] মহান; এবং খ্রিষ্ট এজন্যই ‘পুত্র’ বলে ও পিতার ইচ্ছার ফলে ‘অস্তিত্বপ্রাপ্ত সৃষ্টজীব’ বলে অভিহিত, কারণ তিনি পিতার চেয়ে নিম্নতর। তিনি ঈশ্বর নন, কারণ

ঈশ্বরের ঐক্য-ধারণাটা দ্বিতীয় যে একটা ঈশ্বর থাকতে পারেন এধারণার বিরুদ্ধ ধারণা ; এবং যিনি নিম্নতর, তিনি অবশ্যই এমন স্বরূপের অধিকারী হবেন যা তাঁর চেয়ে মহান যিনি তাঁর স্বরূপের চেয়ে ভিন্ন [স্বরূপের অধিকারী]। আরও, তারা যখন এমনটা বলে যে, যেহেতু সবকিছুর জন্ম দু'টোর সংযোজন থেকে হয় সেজন্য একজনমাত্র থেকে কোন জন্ম আদৌ হতে পারে না; আরও, তারা যখন এমনটা বলে যে, যেহেতু যা অপরিবর্তনীয় তা যোগ সাপেক্ষ নয় ও যেহেতু একাকী ও একমাত্র জীবের স্বরূপ নিজেতে প্রজননের ক্ষমতা রাখে না, সেজন্য অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর সঞ্জাত একজনকে নিজের মধ্য থেকে জন্ম দিতে পারেন না, তখন এসমস্ত কিছু বলায় ঈশ্বরকে নিয়মাবদ্ধ করতে চেষ্টা ক'রে তারা কেমন হাস্যকর (ক)।

৪। কিন্তু আমরা আত্মিক শিক্ষাদান গুণে সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসে গিয়ে পৌঁছে ও পিতা ও পুত্রকে স্বীকার করতে করতে অবিরামভাবে সুখময় স্বীকারোক্তির অনন্ততার প্রত্যাশা অনুসরণ ক'রে বিধানের ভিত্তিতে 'ঈশ্বর ও ঈশ্বর' রহস্যকে ব্যাখ্যা করার পর একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস ত্যাগ না করে ও খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর তাও ঘোষণা করাটা বন্ধ না করে, এখন, সুসমাচারগুলো ভিত্তি করে আমাদের ব্যাখ্যায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করি অর্থাৎ আমরা পিতা ঈশ্বর থেকে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের সত্যকার জন্ম দেখাব। কেননা এই জন্মের গুণেই তিনি সত্যকার ঈশ্বর ও একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের স্বরূপের পরকীয় নন। এভাবে তিনি ঈশ্বর বলে অস্বীকৃত হতে ও দ্বিতীয় ঈশ্বর বলেও ঘোষিত হতে পারেন না, কারণ যখন জন্ম তাঁকে ঈশ্বর করে তোলে, 'ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর' বলে তাঁর এই স্বরূপ তাঁকে দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে পৃথক করে না। সাধারণ মানব যুক্তি আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, একই স্বরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ নির্দেশকারী নামগুলো মেনে নেওয়া চলে না, এবং যে জীবগুলোর সত্তা জাতে ভিন্ন নয়, সেই জীবগুলো অবশ্যই এক। তথাপি আমাদের প্রভুর স্বীয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে এসমস্ত সত্য দেখানো আমাদের পক্ষ ভাল মনে হল, সেই যে প্রভু এটা প্রায়ই জানিয়ে দিয়ে যে আমাদের বিশ্বাসের ও আমাদের প্রত্যাশার ঈশ্বর এক, ঈশ্বরের ঐক্য রহস্য সপ্রমাণ করার জন্য নিজের ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা ও প্রমাণের সঙ্গে বলেছেন, আমি এবং পিতা, আমরা এক (ক), আরও, তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও

জানতে (খ), আরও, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (গ), আরও, যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন (ঘ), আরও, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর (ঙ)। ‘পিতা’ নাম দ্বারা তিনি নিজের জন্মকে ব্যক্ত করলেন; বাস্তবিকই তিনি এটা ঘোষণা করেন যে, তাঁকে জানলে তবে পিতাকেও জানা হয়। তাই যখন তিনি বলেন, যে তাঁকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে, তখন স্বরূপের ঐক্যকে প্রমাণিত করেন; যখন তিনি বলেন, তিনি তাঁর নিজের মধ্যে বসবাসকারী পিতাতে বসবাস করেন, তখন এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি পিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। যখন তিনি নিজের পরাক্রমের সাধিত কাজকর্মের খাতিরে এমনটা দাবি করেন যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা হয়, তখন তিনি নিজের চেতনা বিষয়ে আস্থার অধিকারী। এবং এইভাবে, সিদ্ধ জন্মে স্থাপিত এই সম্পূর্ণরূপে পবিত্র বিশ্বাসে সমস্ত ভ্রান্তি—দু’টো ঈশ্বর ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হোক ও একাকী ঈশ্বর ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হোক—সমস্ত ভ্রান্তিই বাতিল হয়। যাঁরা একমাত্র স্বরূপ, তাঁরা একক ব্যক্তি নন; ও ‘যিনি আছেন’ তাঁর সঙ্গে যিনি একক ব্যক্তি নন, তিনি তবুও তাঁর থেকে এমন কোন দিকেও ভিন্ন নন যার ফলে উভয় নিজেদের সত্যায় এক নন।

৫। এখন, যেহেতু ভ্রান্তমতপন্থীরা তত স্পষ্টতার সঙ্গে ব্যক্ত করা ও উপলব্ধি করা বাণীগুলো অস্বীকার করতে পারে না, সেজন্য তারা এ বাণীগুলো অস্বীকার করার জন্য অদ্ভুত মিথ্যা ও মূর্খ অভক্তি দ্বারা সেগুলো বিকৃত করে। তারা ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’ বাক্যটা ইচ্ছার সম্মতির অর্থ অনুসারেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে; তাই, তাদের মতে, উপরে উল্লিখিত বাণীতে স্বরূপের ঐক্য নয়, ইচ্ছারই ঐক্য রয়েছে, অর্থাৎ উভয় [অর্থাৎ পিতা ও পুত্র] সত্যায় যা, সেটার ফলে নয়, কিন্তু উভয় যা একমতে ইচ্ছা করেন, সেটারই ফলে তাঁরা এক। এবং তাদের একতার সমর্থনে তারা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে যা উল্লিখিত, তথা যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ (ক), ঠিক এই বচন স্মরণ করায় যাতে এমনটা দেখাতে পারে যে, একাধিক মন ও একাধিক প্রাণের ভিন্নতা ইচ্ছার মিল দ্বারাই একমন ও একপ্রাণের ঐক্য হতে পারে। আরও, যেহেতু আমাদের পরিত্রাণের জন্য ও একই রহস্য-প্রকাশের জন্য

তাদের [তথা পিতা ও পুত্রের] কাজ ভিন্ন নয়, সেজন্য উভয়তে যে ইচ্ছার ঐক্য রয়েছে তা দেখাবার জন্য ভ্রান্তমতপন্থীরা করিন্থীয়দের কাছে লেখা এই বাণী শোনায, যে পৌঁতে ও যে জল দেয়, তারা দু'জনে এক (খ)। আরও, প্রভু যখন পিতার কাছে তাঁর আপন ভাবী বিশ্বাসী জাতিদের পরিভ্রাণ যাচনা করেন, তখন প্রভু যে কথা বলেন তারা তাও যোগ দেয়, তথা, আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে (গ)। তারা এটা দেখাতে চায় যে, যেহেতু মানুষেরা ঈশ্বরে আত্মভূত হতে বা নিজেরা নিজেদের মধ্যে একমাত্র ও অনির্দিষ্ট পিণ্ডে একীভূত হতে পারে না, সেজন্য তারা যে এক তা ইচ্ছার ঐক্য থেকে আসে, কারণ সবাই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কাজ করে ও আত্মার সঙ্গতিপূর্ণ গতিতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত, ফলত, তাদের মতে, তাদের স্বরূপ নয় কিন্তু তাদের ইচ্ছাই সেই সকলের ঐক্যকে ঘটায়।

৬। ঈশ্বরকে যে জানে না, সে যেকোন জ্ঞান ক্ষেত্রেই অজ্ঞ। এবং যেহেতু খ্রিস্টই প্রজ্ঞা, সেজন্য যে খ্রিস্টকে জানে না বা তাঁকে ঘৃণা করে, সে অবশ্যই প্রজ্ঞার বাইরে রয়েছে; তেমনি তাদেরও বেলায় ঘটে যারা এমনটা দাবি করে, গৌরবের প্রভু, জগতের রাজা ও একমাত্র জনিত ঈশ্বর যিনি, তিনি ঈশ্বরের পুত্রের চেয়ে বরং হন ঈশ্বরের একটা সৃষ্টজীব। এবং তারা যখন মূর্খ মিথ্যাকথা বলে, সেটার চেয়ে তখনই আরও বেশি মূর্খ যুক্তি প্রয়োগ করে যখন নিজেদের মিথ্যা রক্ষা করে। যাই হোক, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের যা বৈশিষ্ট্য, সেই ঐক্য-বিষয়টা আর কিছু সময়ে স্থগিত ক'রে আমাদের আপাতত ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করতে হবে সেই একই বচন দ্বারা যা তারা ব্যবহার করে।

৭। কেননা আমি জিজ্ঞাসা করি, যারা ছিল একমন একপ্রাণ তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস গুণেই এক ছিল কিনা। হ্যাঁ, অবশ্যই তারা বিশ্বাস গুণে এক ছিল; সেই বিশ্বাস দ্বারাই সবাই ছিল একমন একপ্রাণ। আরও জিজ্ঞাসা করি, একমাত্র বিশ্বাস আছে, নাকি দু'টো বিশ্বাস আছে? নিঃসন্দেহেই একটামাত্র বিশ্বাস আছে, যেইভাবে প্রেরিতদূতও (ক) আমাদের

নিশ্চিত করেন যখন এটা প্রচার করেন যে, বিশ্বাস এক, যেমন প্রভু এক, বাপ্তিস্ম এক, প্রত্যাশা এক ও ঈশ্বর এক। সুতরাং, যখন বিশ্বাসের মাধ্যমেই অর্থাৎ একমাত্র বিশ্বাসের প্রকৃতির মাধ্যমেই সেই সকলে এক ছিল, তখন তুমি এমনটা কেমন করে ভাবতে পার যে, যারা একমাত্র বিশ্বাসের প্রকৃতির মাধ্যমে এক, তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য নেই? সকলের নবজন্ম হয়েছিল নিরপরাধিতার উদ্দেশে, অমরতার উদ্দেশে, ঈশ্বর-জ্ঞানের উদ্দেশে, একমাত্র প্রত্যাশার বিশ্বাসের উদ্দেশে। এবং যেহেতু যেমন একমাত্র প্রভু আছেন ও নবজন্মদানকারী একমাত্র বাপ্তিস্ম আছে তেমনি একমাত্র প্রত্যাশা ও একমাত্র ঈশ্বর আছেন, সেজন্য এসমস্ত কিছু যদি তাদের জন্য অসদৃশ হতে না পারে, যদি এসমস্ত কিছু স্বরূপের নয় কিন্তু সম্মতিরই ঐক্য গড়ে তোলে, তাহলে, [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] যারা এসমস্ত কিছুতে নবজন্ম লাভ করেছে, তাদের উপরেও ইচ্ছার ঐক্য আরোপ কর। অপরদিকে, তারা যদি একমাত্র জীবনের ও একমাত্র অনন্ততার প্রকৃতিতে সেই নবজন্ম লাভ করে থাকে যা গুণে তাদের প্রাণ ও মন এক, তাহলে তাদের জন্য সেই সম্মতিতে স্থাপিত ঐক্য বিলীন হয়, কারণ তারা একই প্রকৃতির সেই নবজন্ম গুণেই এক।

৮। আমরা নিজস্ব ধারণা উপস্থাপন করছি না, ও আমাদের শ্রোতাদের কান প্রতারণা করার লক্ষ্যে কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করে ভ্রান্তিময় ব্যাখ্যা কল্পনা করছি না। বরং যথার্থ শিক্ষার অনুরূপ হয়ে আমরা যা সত্যাপ্রিয়ী তা-ই ভাবি ও তা-ই প্রচার করি। প্রেরিতদূত আমাদের শেখান যে, বিশ্বস্তদের এই ঐক্য সাক্রামেন্টগুলোর প্রকৃতি থেকে আগত, যেমনটা গালাতীয়দের কাছে তিনি লেখেন, কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক (ক)। জাতি, অবস্থা ও লিঙ্গের তেমন মহৎ পার্থক্যের মধ্যে তাঁদের যে ঐক্য, সেটা কি ইচ্ছার মিলের উপরে নাকি সাক্রামেন্টের ঐক্যের উপর নির্ভর করে যেহেতু তাদের জন্য রয়েছে একমাত্র বাপ্তিস্ম ও সবাই একমাত্র খ্রিষ্টকে পরিধান করেছে? তাই, তারা যে একমাত্র বাপ্তিস্মের প্রকৃতির মাধ্যমে একমাত্র খ্রিষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় সবাই এক, একথা যখন সত্য, তখন সেই প্রাণদের মিল এব্যাপারে আর কীবা করে?

৯। তাছাড়া, যেহেতু ‘যে পোঁতে ও যে জল দেয়, তারা দু’জনে এক’, সেজন্য এর কারণ এ কি নয় যে, একমাত্র বাপ্তিস্মে নবজন্ম লাভ ক’রে তারা নবজীবন দানকারী একমাত্র বাপ্তিস্মের সেবাকর্মী? তারা কি একই জিনিসের অধিকারী নয়? তাদের এক হওয়াটা কি এক জিনিসে স্থাপিত নয়? সুতরাং, যারা একই জিনিসের গুণে এক, তারা ইচ্ছা গুণে শুধু নয়, কিন্তু স্বরূপ গুণেই এক, কারণ একই জিনিস হয়ে উঠেছে ও একই জিনিস ও একই জিনিসের ও একই কার্যকারিতার সেবাকর্মী হল।

১০। তবে, মূর্খরা যে বিরোধিতা করে, তা সবসময় তাদের মূর্খতাকে দেখাবার জন্য উপযোগী। সত্যের দৃঢ়তা ও অপরিবর্তনশীলতার বিরুদ্ধে মূর্খ ও বিকৃত মনের চালাকি যা কিছু করতে সচেষ্ট, সেইসব স্বীকৃত করা দরকার ঠিক একারণে যে, মিথ্যা ও মূর্খ হওয়ায় সেগুলো সত্যের বিপরীত। ভ্রান্তমতপন্থীরা অতিব্যস্ত : মানুষকে পতিত করার জন্য তারা এবচন উল্লেখ করে, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। এবচনে যে স্বরূপের ঐক্য ও একই ঐশ্বরিক সত্তা স্বীকৃত হোক তা তারা চায় না, কিন্তু এটা চায়, পিতা ও পুত্র পারস্পরিক ভালবাসার ফলে ও ইচ্ছার মিলের ফলেই এক হোন। যেইভাবে উপরে প্রমাণ করেছি, সেই অনুসারে তারা তো এই ঐক্যের একটা প্রমাণ দিয়েছে প্রভুর বাণীর ভিত্তিতেও, তথা, ‘সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে’। অপরদিকে, অভক্তি ক্ষিপ্ততা এটা, যা উপলব্ধি করা হয়েছে তা বিশ্বাস না করা, ও যা বিশ্বাসের বস্তু তার অর্থ বিকৃত করা।

১১। কিন্তু, যদিও অভক্তি মানুষের উপলব্ধি-শক্তি বিকৃত করতে পারে, তবু বচনগুলোর প্রকৃত অর্থ অবশ্যই থেকে যাবে। প্রভু পিতার কাছে প্রার্থনা করেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে তারা যেন এক হয়, এবং তিনি যেমন পিতাতে আছেন ও পিতা তাঁর মধ্যে আছেন, তেমনি সকলে যেন পিতাতে ও পুত্রে এক হয়। [যে ভ্রান্তমতপন্থী,] এক্ষেত্রে তুমি কেন সম্ভাব উত্থাপন করছ? কেন তুমি ইচ্ছার মিলের মাধ্যমে মন ও প্রাণের ঐক্যের কথা বল? যদি ইচ্ছাই সেই সকলকে এক করে তুলত, তবে উপযোগী যথেষ্ট কথা ছিল যাতে প্রভু নিজের প্রার্থনা এভাবে সাজাতেন : পিতা, আমরা যেমন একই

জিনিস ইচ্ছা করি, তেমনি তারাও একই জিনিস ইচ্ছা করুক যেন মনের মিল গুণে আমরা সবাই এক হই। অথবা, দৈবাৎ, স্বয়ং বাণী যিনি, তিনি কি সেই কথার অর্থ জানতেন না? ও স্বয়ং সত্য যিনি, তিনি কি সত্য কথা বলতে পারতেন না? ও স্বয়ং প্রজ্ঞা যিনি, তিনি কি মূর্খ কথনে পথভ্রষ্ট হলেন? ও স্বয়ং পরাক্রম যিনি, তিনি কি এতই দুর্বল হলেন যে, যা বোঝাতে ইচ্ছা করছিলেন তা ব্যক্ত করতে সক্ষম হননি? তিনি সুসমাচারের বিশ্বাসের সত্যকার ও বিশ্বাসযোগ্য রহস্যগুলো স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। এবং আমরা যেন বুঝতে পারি সেজন্য তিনি কথা বললেন শুধু নয়, কিন্তু আমরা যেন বিশ্বাস করি সেজন্য তিনি তখন শিক্ষাও দিলেন যখন বললেন, ‘সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে’। প্রথমত তাদেরই জন্য একটা প্রার্থনা আছে যাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়, ‘সকলেই যেন এক হয়’; পরে, ঐক্য সংক্রান্ত একটা উদাহরণ দ্বারা ঐক্য-গঠনটা নির্দেশিত, এক্ষেত্রে তিনি বলেন, ‘পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে’। তিনি ইচ্ছা করেন, যেমন পিতা পুত্রতে ও পুত্র পিতাতে আছেন, তেমনি যেন ঠিক এই ঐক্যের রূপ অনুসারে সবাই পিতাতে ও পুত্রতে এক হন।

১২। কিন্তু, যেহেতু একাই পিতা ও পুত্র হলেন স্বরূপের ঐক্যের অধিকারী যেহেতু ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে ও একমাত্র জনিতজন যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় এমন একজন থেকে হতে পারেন না যদি না সেই একই স্বরূপ তাঁর নিজের উৎসে বর্তমান, সেজন্য যিনি জনিত হয়েছেন তিনি যে সত্য সঞ্জাত হয়েছেন সেই সত্য অস্তিত্বশীল, এবং পুত্র যে ঈশ্বরত্ব থেকে আগত সেটার চেয়ে অন্য বা ভিন্ন ঈশ্বরত্বের অধিকারী নন। তাই প্রভু, আমাদের বিশ্বাসের জন্য দ্ব্যর্থতার কোন চিহ্ন না রেখে পরবর্তী গোটা উপদেশ দানে এই সম্পূর্ণ ঐক্যের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। পরবর্তী কথা এ, ‘... যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে’ (ক)। তাই জগৎ বিশ্বাস করবে যে পুত্র পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন কারণ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হবে তারা সবাই পিতাতে ও পুত্রতে এক হবে। এবং তারা কেমন করে তেমনটা হবে সেসম্পর্কে আমাদের অবিলম্বেই বলা হয়, তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি (খ)। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি

সেই গৌরব ইচ্ছার সমান কিনা, যেহেতু ইচ্ছা হলো আমাদের মনের গতি, অন্যদিকে গৌরব হলো স্বরূপেরই একটা অলঙ্কার বা ভূষণ। তাই, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে, পুত্র তাদের সকলকে সেই গৌরব দেবেন যা তিনি পিতা থেকে পেয়েছেন, নিজের ইচ্ছাকে অবশ্যই দেবেন না। ইচ্ছাকেই যদি দেওয়া হত, তবে বিশ্বাস সঙ্গে করে কোন গৌরব বহন করত না, কেননা তেমনটা হলে তবে যা আমাদের অন্তরে বিশ্বাসকে রাখত তা হত চাপানোই একটা ইচ্ছার প্রয়োজনীয়তা। [পিতা থেকে সেই] গৃহীত গৌরবকে দান করার উদ্দেশ্য যে কি, তা তিনি একথায় ব্যক্ত করেন, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক (গ)। সুতরাং, যে গৌরব পুত্র পিতা থেকে পান, তা দেওয়া হয় যেন সবাই এক হয়। ফলত, গৌরব ক্ষেত্রে এখন সবাই এক, কারণ যে গৌরব গৃহীত হয়েছিল সেটা ছাড়া অন্য গৌরব দেওয়া হয়নি; এবং তা কেবল এই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছিল, যেন সবাই এক হয়। এবং যে গৌরব পুত্রকে দেওয়া হয়েছে ও পুত্র বিশ্বাসীদের কাছে মঞ্জুর করেছেন, যেহেতু সেই গৌরব দ্বারাই সবাই এক, সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা করি: যখন পুত্রের গৌরব সকল বিশ্বাসীকে পিতার গৌরবের ঐক্যে উন্নীত করে, তখন কেমন করে পুত্র পিতার গৌরবের চেয়ে ভিন্ন এমন গৌরবের অধিকারী হতে পারেন? অবশ্যই, এই ধরনের মানবীয় প্রত্যাশা বিষয়ে কথা বলা অত্যাধিক মনে হতে পারে, কিন্তু তা যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তা নয়, কেননা যদিও তেমনটা প্রত্যাশা করা দুঃসাহসের ব্যাপার হতে পারে তবু তাতে বিশ্বাস না রাখা অভক্তি স্বরূপ, কারণ আমাদের প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের যিনি প্রণেতা, তিনি এক ও একমাত্র। অবশ্যই, এ বিষয়ে আমরা আরও স্পষ্ট ভাবে ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব যেহেতু তেমনটা করা সঙ্গত। ইতিমধ্যে, যা আপাতত বলা হয়েছে, তা আমাদের এটা বোঝাতে পারে যে, আমাদের এ প্রত্যাশা অসারও নয়, দুঃসাহসীও [দুঃসাহসের ব্যাপারও] নয়। সুতরাং পুত্র যে গৌরব পেয়েছেন ও দিয়েছেন, সেই গৌরব গুণে সবাই এক। আমি বিশ্বাসের অধিকারী, ও এই ঐক্যের কারণ মেনে নিই, কিন্তু সেই দেওয়া গৌরব যে কেমন করে সকলের ঐক্যকে সাধন করে, তা এখনও বুঝতে পারি না।

১৩। কিন্তু প্রভু তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের চেতনায় অনিশ্চিত কিছু ফেলে না রেখে বরং আমাদের স্বরূপের কার্যকারিতার ফল শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘সকলেই যেন এক হয়;

পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে’। তবে, যারা পিতা ও পুত্রের মধ্যে ইচ্ছার ঐক্যকে অনুপ্রবেশ করায় আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি : আজ খ্রিষ্ট কি তাঁর স্বরূপের সত্য দ্বারা, না ইচ্ছার মিল দ্বারা আমাদের মধ্যে রয়েছেন? কেননা যদি সত্যিকারে বাণী হলেন মাংস (ক), ও সত্যিকারে আমরা প্রভুর দেওয়া খাদ্যে সেই মাংস-হওয়া-বাণীকে গ্রহণ করি, তাহলে যিনি মানুষ হিসাবে সঞ্জাত হয়ে নিজ থেকে ইতিমধ্যে অবিচ্ছেদ্য আমাদের এই মাংসের স্বরূপকে ধারণ করলেন, এবং যে সাক্রামেন্ট আমাদের তাঁর মাংসের সহভাগী করে যিনি সেই সাক্রামেন্টে তাঁর আপন মাংসের স্বরূপকে সনাতন [অর্থাৎ ঐশ্বরিক] স্বরূপের সঙ্গে মিলিত করেছেন, কি করেই বা এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, তিনি স্বরূপগত ভাবেই আমাদের মধ্যে বসবাস করেন? এভাবে আমরা সকলে এক, কেননা পিতা খ্রিষ্টের মধ্যে ও খ্রিষ্ট পিতার মধ্যে রয়েছেন। সুতরাং, পিতা যে স্বরূপগত ভাবে পুত্রতে রয়েছেন, যে কেউ একথা অস্বীকার করবে, প্রথমে সে-ই অস্বীকার করুক, সে নিজে স্বরূপগত ভাবে খ্রিষ্টে নেই ও খ্রিষ্ট তার মধ্যে নেই; কেননা পিতা যে খ্রিষ্টে ও খ্রিষ্ট যে পিতাতে, এটার ফলেই আমরা তাঁদের সঙ্গে এক। অতএব, যদি খ্রিষ্ট সত্যিকারে আমাদের দেহের মাংস ধারণ করে থাকেন ও মারীয়া থেকে সঞ্জাত সেই মানুষই সত্যিকারে খ্রিষ্ট, ও [এউখারিস্তিয়া] সাক্রামেন্ট দ্বারা আমরা সত্যিকারে তাঁর দেহের মাংস গ্রহণ করি ও তাঁর সঙ্গে এক হব যেহেতু পিতা পুত্রতে রয়েছেন ও পুত্র আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাহলে, যখন স্বরূপের ঐক্যই (খ) এই সাক্রামেন্টকে সিদ্ধ ঐক্যের সাক্রামেন্ট করে তোলে, তখন কেমন করে ইচ্ছার ঐক্যের কথা সমর্থন করা যেতে পারে?

১৪। ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে মানবীয় ও জাগতিক মন দিয়ে কথা বলতে নেই, উগ্র ও অবিবেচক ভাবেও প্রচার করতে নেই। স্বর্গীয় বাণীগুলোকেও পরকীয় ও ভক্তিহীন ব্যাখ্যার প্রণোদিত ভুল উপস্থাপনা থেকে মুক্ত করতে হয়। এসো, যা লেখা রয়েছে তা-ই পড়ি, ও যা পড়েছি তা-ই বুঝতে চেষ্টা করি, তবেই আমরা সিদ্ধ বিশ্বস্ত অনুগামীদের কর্তব্য পালন করব। কেননা আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের স্বরূপের প্রকৃত উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা যা বলি, তা মূর্খ ও ভক্তিহীন ভাবেই বলি যদি তিনি নিজেই তা আমাদের না শিখিয়ে থাকেন। কেননা তিনি বলেন, আমার মাংস সত্যকার খাদ্য ও আমার রক্ত

সত্যকার পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তাঁর অন্তরে বসবাস করি (ক)। তাঁর সত্যকার মাংস ও রক্ত সম্পর্কে সন্দেহের জন্য কোন স্থান রইল না। তবে, স্বয়ং প্রভুর ঘোষণা থেকে ও আমাদের বিশ্বাস (খ) থেকেই এটা দাঁড়ায় যে, তা সত্যিকারে মাংস ও সত্যিকারে রক্ত। এবং যখন তা খাওয়া হয় ও পান করা হয়, তা এমনটা করে যে আমরা খ্রিষ্টে রয়েছি ও খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে রয়েছেন। একথা কি সত্য নয়? এই সত্য অস্বীকার করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তাদেরই হোক যারা এটা অস্বীকার করে যে যিশু খ্রিষ্ট সত্যকার ঈশ্বর। তাই তিনি মাংসের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন ও আমরা তাঁর মধ্যে আছি; ও সেইসঙ্গে আমরা যা, তা তাঁর সঙ্গে মিলে ঈশ্বরে আছে।

১৫। যে সাক্রামেন্ট দ্বারা তিনি আমাদের তাঁর মাংস ও রক্তের সহভাগী করেন, সেই সাক্রামেন্টের মাধ্যমে আমরা কেমন করে তাঁর মধ্যে আছি, সেবিষয়ে তিনি নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, এবং জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত আছ, কারণ আমি আমার পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি (ক)। তিনি যদি সাধারণ একটা ইচ্ছার মিল নির্দেশ করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে কোন্ কারণেই বা তিনি সেই ক্রমগত প্রক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যা অনুসারে ঐক্য সাধিত? কোন্ কারণেই বা তিনি তা ব্যক্ত করলেন যদি না একারণেই যে, ঐশ্বরিক স্বরূপের ফলে তিনি পিতাতে থাকায় কিন্তু অপরদিকে তাঁর দৈহিক জন্ম গুণে আমরা তাঁর মধ্যে থাকায় তিনি ইচ্ছা করছিলেন, আমরা বিশ্বাস করব যে তিনিও সাক্রামেন্টগুলোর রহস্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন? এইভাবে শেখানো হয় সেই মধ্যস্থের মাধ্যমে সাধিত সিদ্ধ ঐক্য, কেননা আমরা তাঁর মধ্যে বসবাস করতে করতে তিনি পিতাতে বসবাস করেন, ও তিনি পিতাতে বসবাস করতে করতে আমাদের মধ্যে বসবাস করেন; এবং এইভাবে আমরা পিতার সঙ্গে ঐক্যে উপনীত হতে পারি। কেননা যিনি [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে পিতাতে স্বরূপগত ভাবে রয়েছেন, আমরাও তাঁর মধ্যে স্বরূপগত ভাবে রয়েছি যেহেতু তিনিও আমাদের মধ্যে স্বরূপগত ভাবে রয়েছেন (খ)।

১৬। এ স্বরূপগত ঐক্য যে আমাদের মধ্যে বর্তমান, এবিষয়ে তিনি নিজে সাক্ষ্য দেন :
যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর
আমি তার অন্তরে বসবাস করি (ক)। কেননা কেউই তাঁর মধ্যে থাকতে পারবে না, সে-ই
ছাড়া যার মধ্যে তিনি নিজে থাকবেন : তিনি নিজেতে কেবল তারই মাংস ধারণ করেন
যে নিজেতে তাঁর মাংস গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, তিনি আগেও এই সিদ্ধ ঐক্যের রহস্য
প্রকাশ করেছিলেন যখন বলেছিলেন, যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন
আর আমি যেমন পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমারই জন্য
জীবিত থাকবে (খ)। তাই তিনি পিতারই জন্য জীবিত আছেন, ও যেভাবে তিনি পিতার
জন্য জীবিত, সেইভাবে আমরা তাঁর মাংসের জন্য জীবিত আছি। কেননা সমস্ত উদাহরণ
একটা ধারণা স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত, যাতে করে, সেই প্রস্তাবিত উদাহরণ অনুসারে
আমরা ধারণার অর্থ ধারণ করতে পারি। সুতরাং, আমাদের জীবনের কারণ এ, মাংসময়
এই আমাদের মধ্যে আমরা সেই খ্রিস্টকে প্রাপ্ত আছি যিনি নিজের মাংসের মধ্য দিয়ে
আমাদের মধ্যে বসবাস করেন, কারণ এটা নির্ধারিত যে, আমরা সেইভাবে তাঁর জন্য
জীবিত থাকব যেভাবে তিনি পিতার জন্য জীবিত আছেন। তাই যখন আমরা মাংস
অনুসারে তাঁর মধ্য দিয়ে স্বরূপগত ভাবে জীবিত আছি, অর্থাৎ তাঁর মাংসের স্বরূপ গ্রহণ
করেছি, তখন তিনি কেমন করে স্বরূপের ঐক্যের গুণে [পবিত্র] আত্মার অনুসারে
নিজেতে পিতাকে প্রাপ্ত নন যেহেতু তিনি নিজে পিতার মধ্য দিয়ে জীবিত আছেন? তিনি
তো পিতার মধ্য দিয়েই জীবিত আছেন, কারণ সেই জন্ম তাঁর কাছে পরকীয় ও ভিন্ন
স্বরূপকে নিয়ে আসেনি, কারণ তাঁর ঐশ্বরিক সত্তা পিতা থেকে উদ্ভূত, ও পিতা থেকে
উদ্ভূত হয়েও সেই স্বরূপ স্বরূপের কোন না কোন পার্থক্যের ফলে তাঁর থেকে বৈসদৃশ
নয়, কারণ [পিতার] স্বরূপের পরাক্রমে নিজের ঐশ্বরিক জন্মের মধ্য দিয়ে তিনি
নিজেতে পিতাকে প্রাপ্ত আছেন।

১৭। তবে, আমরা এসমস্ত সত্য মনে করিয়েছি কারণ ভ্রান্তমতপন্থীরা মিথ্যায় এটা
সমর্থন ক'রে যে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্য হলো ইচ্ছার মিল মাত্র, [সেই ভিত্তিতে]
ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঐক্য সংক্রান্ত উদাহরণ ব্যবহার করত কেমন যেন আমরা
পুত্রের সঙ্গে ও পুত্রের মাধ্যমে পিতার সঙ্গে বাধ্যতা ও ভক্তিময় ঐক্যে মাত্রই ঐক্যবদ্ধ,

এবং আমাদের পক্ষে মাংস ও রক্তের সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে স্বরূপগত সহভাগী হওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু পুত্রের দেওয়া সেই গৌরব, মাংসময় ভাবে আমাদের মধ্যে অবস্থানকারী পুত্র, ও যিনি আমাদের দেহকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে ধারণ করেন সেই পুত্রে আমাদের ঐক্য, এসমস্ত কিছুই সত্যকার ও স্বরূপগত ঐক্য-রহস্যকে ঘোষণা করতে আমাদের বাধ্য করে (ক)।

১৮। তাই আমরা বিপক্ষদের ক্ষিপ্ততার কাছে প্রতিবাদ করেছি যেন তাদের মিথ্যার অকেজোতা প্রমাণিত করা হয় ও পাছে তাদের অসার ও হাস্যকর দাবিতে নিহিত ভ্রান্তি দ্বারা সরলমনাদের পথভ্রষ্ট করা হয়। কিন্তু সুসমাচারে স্থিত বিশ্বাসের জন্য আমাদের প্রতিবাদ আদৌ দরকার ছিল না। প্রভু আমাদের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের বিষয়ে যাচনা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজের ঐক্যকে বজায় রাখেন ও সেই এক্যে অবস্থান করে থাকেন। উভয় যে এক, তা যে ঈশ্বরের রহস্যময় সঙ্কল্প ক্রমে হয়, তা নয়, কিন্তু তা স্বরূপগত জন্ম ক্রমেই হয়, কারণ এক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজে থেকে পুত্রকে জনিত করায় নিজের স্বরূপের কোন বৈশিষ্ট্য হারান না। তাঁরা এক, কারণ পুত্রের হাত থেকে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় না, তা পিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না; কারণ যখন তিনি জ্ঞাত তখন পিতা জ্ঞাত; কারণ যখন তিনি দৃষ্ট তখন পিতা দৃষ্ট; কারণ তিনি যা বলেন তা তাঁর মধ্যে অবস্থানকারী পিতা বলেন; কারণ তাঁর কাজকর্মে পিতা কাজ করেন; কারণ তিনি পিতাতে আছেন ও পিতা তাঁর মধ্যে আছেন। এসমস্ত কিছু সৃষ্টিকর্মের নয়, [ঐশ্বরিক সেই] জন্মেরই ফলাফল; তা ইচ্ছা দ্বারা নয়, পরাক্রম দ্বারাই সাধিত; তা ইচ্ছার মিল ব্যক্ত করে না, স্বরূপই তা ব্যক্ত করে। সৃষ্ট হওয়া ও সঞ্জাত হওয়া এক নয়, ইচ্ছা করা ও সক্ষম হওয়াও এক নয়, একমত হওয়া ও অবস্থান করাও এক জিনিস নয়।

১৯। তাই, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে ইচ্ছার মিল রয়েছে তা আমরা অস্বীকার করি না; কেননা ভ্রান্তমতপন্থীরা ঠিক এধরনের মিথ্যা বলে যাতে, যখন আমরা সেই মিল ঐক্যের ভিত্তি বলে মানি না, তখন তারা যেন এটা সমর্থন করতে পারে যে আমরা পিতা ও পুত্রের মধ্যকার অনৈক্যকে ঘোষণা করি। কিন্তু তারা শুনুক কেমন সেই ইচ্ছার মিল আমাদের দ্বারা আদৌ অস্বীকৃত নয়। পিতা ও পুত্র স্বরূপে, গৌরবে ও পরাক্রমে এক;

এবং একই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন কিছু ইচ্ছা করতে পারে না। তারা সেই পুত্রকেও শুনুক যিনি নিজের ও পিতার মধ্যকার স্বরূপের ঐক্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, সেই সহায়ক, যাকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব—সেই সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন —তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন (ক)। সেই সহায়ক আসবেন, ও পুত্র তাঁকে পিতার কাছ থেকে পাঠাবেন, এবং তিনি হলেন সেই সত্যের আত্মা যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন। সমস্ত দলের ভ্রান্তমতপন্থীরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা লাগিয়ে দিক ও এখন অন্তত খুঁজে বের করুক সরলমনাদের কাছে কেমন মিথ্যা বলতে পারে ও এটাও জানিয়ে দিক, পুত্র পিতা থেকে যা পাঠাবেন তা কি। যিনি পাঠান তিনি যা পাঠান তাতেই নিজের পরাক্রম দেখান। কিন্তু তিনি পিতা থেকে যা পাঠান, আমরা তা কেমন বুঝব? আত্মা কি গৃহীত নাকি প্রেরিত নাকি জনিত? কেননা পুত্র যে পিতা থেকে পাঠাবেন এমনটা বলা অবশ্যই সেই তিনটে জিনিসের একটাকে বোঝাবে। এবং তিনি পিতা থেকে সেই সত্যের আত্মাকে পাঠাবেন যিনি পিতা থেকে বের হয়ে চলেন; সুতরাং পিতা গ্রহীতা হতে পারেন না যেহেতু তিনি প্রেরণকর্তা বলে নির্দেশিত। তবে এক্ষেত্রে কেবল আমাদের অভিমত স্থির করাই বাকি রয়েছে, অর্থাৎ, যদি আমরা একই স্বরূপের একটা ব্যক্তির বহির্গমন (খ), নাকি জনিত একজনের বের হয়ে এগিয়ে চলাটার কথা ভাবব?

২০। আপাতত এক্ষেত্রে আমি ব্যাখ্যাতাদের মনের স্বাধীন ইচ্ছা অভিযুক্ত করি না যদি তারা এমনটা মনে করে, সহায়ক আত্মা পিতা থেকে আসেন বা এমনটা ভাবে, আত্মা পুত্র থেকে উদ্ভূত (ক)। প্রভু আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে একা ফেলে রাখেননি। উপরোল্লিখিত কথার পর তিনি এই কথা বলেন, তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনে, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের

বলে দেবেন (খ)। সুতরং, যিনি পুত্র থেকে প্রেরিত ও সেইসঙ্গে পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তিনি পুত্র থেকে তুলে নেন। তবে আমি জিজ্ঞাসা করি যদি পুত্র থেকে তুলে নেওয়া ও পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলা একই জিনিস কিনা। কেননা যদি এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে পুত্র থেকে তুলে নেওয়া ও পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে পুত্র থেকে তুলে নেওয়া ও পিতা থেকে তুলে নেওয়া এক ও একই জিনিস বলে গণ্য হবে। কেননা প্রভু নিজেই বলেন, ‘কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন’। সেই আত্মা যা তুলে নেবেন—তা পরাক্রমই হোক, তা শ্রেষ্ঠতাই হোক, তা শিক্ষাই হোক—সেই সম্পর্কে পুত্র এটা বলেন যে, তা তাঁরই কাছ থেকে তুলে নেওয়া হতে হবে, এবং তিনি এটাও জানিয়ে দেন যে, তা পিতা থেকে তুলে নেওয়া হতে হবে। যখন পুত্র এটা বলেন যে, যা কিছু পিতার তা সবই তাঁরই, ও সেজন্যই তিনি বলেছেন যে, যা তাঁর, পবিত্র আত্মার পক্ষে তা থেকেই তুলে নেওয়া দরকার, তখন তিনি এটাও শেখান যে, যা পিতা থেকে তুলে নেওয়া দরকার, তা পুত্র থেকে তুলে নেওয়া হয়, কেননা যা কিছু পিতার, তা সবই পুত্রের। এধরনের ঐক্য কোন পার্থক্য মানে না, ও যিনি তুলে নেন তাঁর ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই যদি যা দেওয়া হয় তা পুত্র দ্বারা দেওয়া বলে উপস্থাপতি। তবে কি এবারও ইচ্ছার ঐক্যের কথা উত্থাপন করা হবে? যা কিছু পিতার, তা পুত্রের; ও যা কিছু পুত্রের, তা পিতার। তিনি নিজে বলেন, যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার (গ)। তিনি যে কারণে বলেছেন, ‘কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি...’ সেই কারণ দেখাবার ক্ষণ এখনও আসেনি; যখন পুত্র এটা প্রকাশ করেন যে, যা তাঁর, [পবিত্র আত্মা] তা থেকে তুলে নেবেন, তখন তিনি কোন এক ভাবী কালের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন। যাই হোক, এখন পুত্র এটা বলেন যে, যা তাঁর, পবিত্র আত্মা তা তুলে নেবেন, কারণ যা কিছু পিতার, তা সবই তাঁরই। [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তুমি পারলে তবে এই স্বরূপের ঐক্যকে বিযুক্ত করে এমন কোন না কোন আবশ্যকীয় বৈসাদৃশ্য অনুপ্রবেশ করাও যার ফলে পুত্র স্বরূপের ঐক্যে স্থান পাবেন না। কেননা সত্যের আত্মা পিতা থেকেই বের হয়ে

এগিয়ে চলেন, কিন্তু পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চললেও পিতাই তাঁকে প্রেরণ করেন। যা কিছু পিতার, তা সবই পুত্রের, ফলত যাকে পাঠানো হবে তিনি যা কিছু তুলে নেবেন, তা পুত্রের কাছ থেকেই তুলে নেবেন যেহেতু যা কিছু পিতার, তা সবই পুত্রের। সুতরাং, স্বরূপটা সব দিক দিয়ে নিজের নিয়ম স্থির রাখে, ও যেহেতু উভয় এক, সেজন্য প্রজনন ও জন্মের মধ্য দিয়ে উভয়তে একই ঈশ্বরত্ব বর্তমান বলে নির্দেশিত, যেহেতু পবিত্র আত্মা পিতা থেকে যা তুলে নেবেন, সেই বিষয়ে পুত্র বলেন যে, তাঁরই দ্বারা তা দেওয়া হতে হবে। অতএব, ভ্রান্তমতপন্থীদের জঘন্য অভিমতকে ভক্তিহীন ব্যাখ্যার এমন স্বাধীনতা দিতে নেই যা দ্বারা, প্রভু এই যে বচনে বলেন, যা কিছু পিতার তা সবই তাঁরই ও সেজন্য সত্যের আত্মা তা তাঁর [অর্থাৎ পুত্রের] কাছ থেকে তুলে নেবেন, এসমস্ত কিছু যে স্বরূপের ঐক্য সংক্রান্ত বচন নয়, ভ্রান্তমতপন্থীরা যেন তা মেনে নিতে অস্বীকার না করতে পারে।

২১। মনোনীত পাত্র ও বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু যিনি, যিনি আগেও রোমের জনগণের বিশ্বাস সত্য-জ্ঞানের জন্য প্রশংসা করেছিলেন, এখন তিনিই কথা বলুন। পিতা ও পুত্র ক্ষেত্রে যখন তিনি তাঁদের স্বরূপের ঐক্য বিষয়ে শিক্ষাদান করতে ইচ্ছা করেন, তখন একথা বলেন, তোমরা কিন্তু মাংসে নয়, আত্মায়ই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে রয়েছেন। কিন্তু খ্রিস্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিস্টের নয়। আর যদি খ্রিস্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃত্যুই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিস্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন (ক)। যদি ঈশ্বরের আত্মা আমাদের অন্তরে থাকেন, তাহলে আমরা সবাই আত্মায় রয়েছি। কিন্তু ঈশ্বরের এই আত্মা আবার হলেন খ্রিস্টের আত্মা (খ)। তথাপি, যখন খ্রিস্টের আত্মা আমাদের অন্তরে রয়েছেন, তখন যিনি খ্রিস্টকে মৃতদের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন তাঁর আত্মাও আমাদের অন্তরে রয়েছেন; ও যিনি খ্রিস্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি আমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা আমাদের মরদেহকেও জীবন দান

করবেন। সুতরাং, আমাদের অন্তরে খ্রিস্টের নিবাসী আত্মা গুণে আমরা তাঁরই দ্বারা জীবন পাই যিনি মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে পুনরুত্থিত করেছেন। এবং যখন আমাদের অন্তরে তাঁরই আত্মা রয়েছেন যিনি মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে পুনরুত্থিত করেছেন, তখন আমাদের অন্তরে খ্রিস্টের আত্মাও রয়েছেন, তথাপি আমাদের অন্তরে যে আত্মা রয়েছেন সেই আত্মা যে ঈশ্বরের আত্মা নন তা হতে পারে না। তাই, যখন আমাদের অন্তরে খ্রিস্টের নিবাসী আত্মাই ঈশ্বরের আত্মা, ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত সেই খ্রিস্টের আত্মাই সেই ঈশ্বরেরই আত্মা যিনি খ্রিস্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেন, তখন, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, খ্রিস্টের আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মা থেকে বিযুক্ত কর, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত সেই খ্রিস্টের আত্মাকেও সেই ঈশ্বরেরই আত্মা থেকে বিযুক্ত কর যিনি খ্রিস্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।

২২। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ‘ঈশ্বরের আত্মা’ বাক্য দ্বারা [ঈশ্বরের] স্বরূপকেই নির্দেশ কর? নাকি তাঁর স্বরূপের কোন কিছুকে নির্দেশ কর? (ক) কেননা যে জিনিস একটা জিনিসের অধিকার, কোন স্বরূপ সেই জিনিসের একই নয়, যেইভাবে একটা মানুষের যা অধিকার, একটা মানুষও সেটার একই নয়; আঙনের যা অধিকার, আঙণও সেটার একই নয়। একই প্রকারে, ঈশ্বরের যা অধিকার, ঈশ্বরও সেই জিনিসের এক নন।

২৩। কেননা আমি এটা স্মরণ করি যে, ঈশ্বরের পুত্র ‘ঈশ্বরের আত্মা’ বাক্য দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করেছেন যেন আমরা তাঁর মধ্যে পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতি চিনে নিতে পারি, ও ‘ঈশ্বরের আত্মা’ বাক্যটা যেন উভয়েরই একজনকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এই সত্য তখনই শুধু নবীদের অধিকার দ্বারা নয়, কিন্তু সুসমাচার-রচয়িতাদেরও অধিকার দ্বারা প্রদর্শিত যখন শাস্ত্রে বলে, প্রভুর আত্মা আমার উপরে অধিষ্ঠিত, সেইজন্য তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন (ক); আরও, এই যে আমার সেই দাস যাকে আমি বেছে নিয়েছি, আমার সেই প্রিয়জন যাঁতে আমার প্রাণ প্রসন্ন। আমি তাঁর উপর আমার আত্মার অধিষ্ঠান ঘটাব (খ); তখনও বাক্যটা উপস্থাপিত যখন প্রভু নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে অপদূত

তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য আপনাদের মাঝে এসেই পড়েছে (গ)। মনে হচ্ছে, এসমস্ত বচন কোন দ্ব্যর্থতা না রেখে পিতা ও পুত্রকে নির্দেশ করছে, যদিও উভয়ের স্বরূপের পরাক্রমও প্রকাশ করে।

২৪। আমি মনে করি, ‘ঈশ্বরের আত্মা’ বাক্যটা এজন্যই উভয়কে লক্ষ করেই ব্যবহৃত পাছে আমরা এমনটা বিশ্বাস করতাম যে শুধু দেহগত ভাবেই পুত্র পিতাতে উপস্থিত বা পিতা পুত্রে উপস্থিত; অর্থাৎ কিনা, পাছে এমনটা মনে হয় যে, ঈশ্বর একস্থানে অবস্থান করেন ও নিজেতে ছাড়া অন্য কোথাও অস্তিত্বশীল নন। একটা মানুষ বা তার মত অন্য একটা জীব যখন একস্থানে আছে তখন একইসময়ে অন্য কোথাও থাকতে পারে না, কারণ যা কিছু একস্থানে রয়েছে, তা যেখানে রয়েছে সেইখানে ধারণকৃত। যদি একজন একস্থানে রয়েছে, তার স্বরূপ এমনটা হতে দেয় না যে সে সর্বস্থানে থাকবে। তবে, অসীম পরাক্রমের অধিকারী জীবনময় শক্তি যিনি, সেই ঈশ্বর সর্বস্থানে উপস্থিত ও কোন স্থান থেকে অনুপস্থিত নন, নিজের যা, তা দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন ও এটা প্রকাশ করেন যে, যা তাঁর নিজস্ব, তা তিনি ছাড়া অন্য কিছু নয়; এইভাবে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, যা তাঁর নিজস্ব, তা যেখানে রয়েছে, তিনিই সেখানে আছেন। কিন্তু যেন এমনটা না ভাবা হয় যে, দৈহিক ভাবে যেমন, তেমনি ঈশ্বরও যখন একস্থানে রয়েছেন তখন সর্বস্থানে নন, কেননা যা তাঁর নিজস্ব, তা দ্বারা সর্বস্থানে উপস্থিত থাকায় তিনি কখনও ক্ষান্ত নন, এবং যা তাঁর নিজস্ব, তা তিনি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এসব কিছু এজন্য বলা হয়েছে যেন ‘স্বরূপ’ শব্দটার অর্থ স্পষ্ট হয়।

২৫। এখন আমি মনে করি, ‘ঈশ্বরের আত্মা’ সংজ্ঞায় পিতা ঈশ্বরকেই নির্দেশিত বলে দেখা উচিত, কেননা প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে অধিষ্ঠিত ও এজন্য তাঁকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন ও শুভসংবাদ প্রচার করতে প্রেরণ করেছেন। তখনই পুত্রে পিতার স্বরূপের পরাক্রম প্রকাশিত হয়, যখন পিতা দেখান যে, পুত্র মাংসে সঞ্জাত হয়েও তবু এই আত্মিক তৈলাভিষেক-রহস্য গুণে পুত্র তাঁর নিজের সঙ্গে স্বরূপের সহভাগী। কেননা বাপ্তিস্মে জারীকৃত তাঁর জন্মের পরে স্বর্গ থেকে একটা কণ্ঠের সাক্ষ্য দ্বারা খ্রিষ্টের সহজাত পুত্রত্ব বিষয়ক ইঙ্গিত শোনা হয়েছিল, তুমি

আমার পুত্র ; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম (ক) । পিতা যে নিজের উপরে অধিষ্ঠিত, বা পিতা যে স্বর্গ থেকে নিজের উপরে নেমে আসেন, বা পিতা যে নিজেকে পুত্র অভিহিত করেন, সুসমাচারের বাক্যটা এই অর্থে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । এসমস্ত ইঙ্গিত আমাদের বিশ্বাসের জন্যই দেওয়া হয়েছিল, যেন সিদ্ধ ও সত্যকার জন্ম-রহস্যে আমরা পুত্রে বিরাজমান স্বরূপের ঐক্যকে চিনে নিতে পারতাম, সেই যে পুত্র মানুষ হতেও শুরু করেছিলেন । তাই এটা জানা হয়েছে যে ‘ঈশ্বরের আত্মা’ সংজ্ঞায় অবশ্যই পিতা নির্দেশিত । কিন্তু আমরা মনে করি, এইভাবে সেই পুত্র নির্দেশিত যখন তিনি বলেন, ‘কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য আপনাদের মাঝে এসেই পড়েছে’ । অর্থাৎ, তিনি স্পষ্ট দেখান, তিনি নিজের স্বরূপের প্রভাবে সেই অপদূতদের তাড়ান যেগুলোকে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ছাড়া তড়ানো সম্ভব নয় । উপরন্তু, ‘ঈশ্বরের আত্মা’ সংজ্ঞায় সহায়ক আত্মাও নির্দেশিত । এমনটা নবীদের সাক্ষ্যদানে শুধু নয়, কিন্তু প্রেরিতদূতদের সাক্ষ্যদানেও স্বীকৃত যখন ঘোষণা করা হয়, তা-ই ঘটছে, যা বিষয়ে নবী [যোয়েল] বলেছিলেন : সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব, এবং তাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে (খ) । এবং আমরা এবিষয়ে অবগত যে, এই গোটা নবীয় বাণী প্রেরিতদূতদের নিয়ে তখনই পূর্ণতা লাভ করেছিল যখন পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের ফলে তাঁরা সবাই জাতিগুলোর ভাষায় কথা বললেন ।

২৬। এসমস্ত কিছু স্পষ্ট করা এজন্য প্রয়োজন ছিল যেন মিথ্যা ভ্রান্তমত যে দিকে ফেরে সেইখানে সেই বাধা ও সীমানা দ্বারা বিঘ্নিত হয় যা সুসমাচারের সত্য দ্বারা আগে থেকে স্থির করা হয়েছিল । কেননা খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে বসবাস করেন : এবং খ্রিষ্ট বসবাস করলে ঈশ্বরই বসবাস করেন । এবং যখন খ্রিষ্টের আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস করেন, তখন খ্রিষ্টের আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস করলেও ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া অন্য আত্মা বসবাস করেন না । অন্যদিকে, যদি আমরা এটা মেনে নিই যে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে রয়েছেন, তাহলে এই আত্মা যেমন ঈশ্বরের আত্মা বলে স্বীকার্য তেমনি খ্রিষ্টের আত্মা বলেও স্বীকার্য । এবং যেহেতু উভয়ের একই স্বরূপের অধিকারী একজন দ্বারা [অর্থাৎ পবিত্র আত্মা] আমাদের অন্তরে সেই একই স্বরূপ বসবাস

করে, সেজন্য পুত্রের স্বরূপ পিতার স্বরূপের অসদৃশ নয় বলে বিশ্বাস করা উচিত, কেননা এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, খ্রিষ্টের আত্মা ও একইসঙ্গে ঈশ্বরের আত্মা যিনি, সেই পবিত্র আত্মা এমন ব্যক্তি যিনি উভয়ের একই স্বরূপের অধিকারী। তাই এখন আমি জিজ্ঞাসা করি: তাঁরা কেমন করে স্বরূপে এক না হয়ে পারেন? সত্যের আত্মা পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, পুত্র দ্বারা প্রেরিত হন ও পিতা থেকে তুলে নেন। কিন্তু যা কিছু পিতার, তা সবই পুত্রের, ফলত যিনি পুত্র থেকে তুলে নেন তিনি ঈশ্বরের আত্মা, কিন্তু একই সময়ে তিনি খ্রিষ্টের আত্মা। সেই আত্মা এমন যিনি পুত্রের একই স্বরূপের অধিকারী কিন্তু পিতারও একই স্বরূপের অধিকারী। তিনি তাঁরই আত্মা যিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, কিন্তু একইসময়ে সেই খ্রিষ্টেরই আত্মা যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে। যে আত্মা ঈশ্বরেরই, সেই আত্মা যে একইসময়ে খ্রিষ্টেরও আত্মা নন তা যখন [ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা] প্রমাণ করা সম্ভব হবে, তখনই মাত্র বলা যেতে পারবে যে, একই স্বরূপ না হবার জন্য অবশ্যই খ্রিষ্টের ও পিতার স্বরূপ কোন কিছুতে ভিন্ন।

২৭। কিন্তু, হে ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি যে ক্ষিপ্ততায় ভরা ও তোমার মারাত্মক শিক্ষার আত্মায় চারদিকে চালিত, প্রেরিতদূত সেই তোমাকে ধরে রাখেন ও সীমাবদ্ধ করেন। তিনি আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি বলে খ্রিষ্টকেই দাঁড় করান ও প্রভুর এই উক্তি বিষয়ে অঙ্গ নন, যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান (ক)। এই বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি এটা প্রমাণ করেছেন যে যখন খ্রিষ্টের আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস করেন, তখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস করেন, ও যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তাঁর আত্মা তাঁরই আত্মা থেকে ভিন্ন নন যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। কেননা সেই উভয় আমাদের অন্তরে আসেন ও আমাদের অন্তরে বসবাস করেন। তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই উভয় কি স্বরূপের ভিন্নতায় আসবেন নাকি স্বরূপের ঐক্যেই আমাদের কাছে নিজেদের বাসস্থান করবেন? কিন্তু বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু এটা সমর্থন করেন না যে, বিশ্বস্ত শিষ্যদের অন্তরে দু'টো আত্মা রয়েছেন তথা ঈশ্বরের আত্মা ও খ্রিষ্টের সেই আত্মা

যিনি ঈশ্বরেরও আত্মা। এটা সহ-বসবাস নয়, বসবাসই; কিন্তু এমন বসবাস যা রহস্যময় আকারে সহ-বসবাস, কারণ দু'জন যে বসবাস করবেন এমন নয়, একজন বসবাসকারী যে অন্য বসবাসকারী থেকে ভিন্ন এমনটাও নয়। কেননা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা রয়েছেন, কিন্তু আমাদের অন্তরে খ্রিস্টের আত্মাও রয়েছেন; ও যখন খ্রিস্টের আত্মা রয়েছেন তখন ঈশ্বরের আত্মা রয়েছেন। এইভাবে, যেহেতু যা ঈশ্বরের তা খ্রিস্টেরও, ও যেহেতু যা খ্রিস্টের তা ঈশ্বরেরও, সেজন্য খ্রিস্ট এমন কিছু হতে পারেন না যা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। সুতরাং, খ্রিস্টই ঈশ্বর, ঈশ্বরের সঙ্গে একমাত্র আত্মা।

২৮। প্রেরিতদূত আমাদের শেখান যে সুসমাচারের এবচনটাও আমি এবং পিতা, আমরা এক (ক) স্বরূপের ঐক্যকে নির্দেশ করে, একাকী এক জীবের নিজস্ব একাকীত্বকে নয়, কারণ করিস্থীয়দের কাছে তিনি লেখেন, এজন্য আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কেউ বলে না যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু (খ)। তাই, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, এখন তুমি কি বোঝা কোন্ আত্মার প্রেরণায় তুমি বল খ্রিস্ট একটা সৃষ্টজীব? যেহেতু যারা স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টজীবেরই সেবা করেছে তারা বিনাশ-মানতের বস্তু, সেজন্য যখন তুমি ঘোষণা কর খ্রিস্ট সৃষ্টজীব তখন উপলব্ধি কর তুমি কী, যেহেতু তুমি তো এবিষয়ে অজ্ঞ নও যে, সৃষ্টজীব-উপাসনা বিনাশ-মানতের বস্তু। যা পরে লেখা রয়েছে, তাও লক্ষ কর, ‘পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না ‘যিশু প্রভু’। খ্রিস্টের যা, যখন তুমি খ্রিস্টের বেলায় তা দিতে অস্বীকার কর, তখন তুমি কি অনুভব কর তুমি কিসেতে অভাবী? যদি তুমি এটা ভাব যে খ্রিস্ট নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপ গুণে তোমার প্রভু, তাহলে তোমার পবিত্র আত্মা আছে; কিন্তু যদি তাঁকে দত্তকের নাম গুণে প্রভু বলে ভাব, তাহলে, যেহেতু তুমি পবিত্র আত্মা বিহীন সেজন্য তুমি ভ্রান্তির প্রেরণায় জীবিত, কেননা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না যিশু প্রভু। কিন্তু যখন তুমি এমনটা বল যে তিনি ঈশ্বর নয় [নন] বরং সৃষ্টজীব মাত্র, তখন তাঁকে প্রভু বলে ডাকলেও তবু তুমি তো তাঁকে ‘প্রভু’ বলে ঘোষণা কর না যেহেতু তোমার কাছে তিনি স্বরূপে প্রভুর চেয়ে সাধারণ ধরনের প্রভু ও সাধারণ নাম অনুসারে প্রভু। কিন্তু পল থেকে প্রভুর স্বরূপ শিখে নাও (গ)।

২৯। কারণ তিনি বলে চলেন, বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক। কিন্তু প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া (ক)। এই বর্তমান বচনে আমরা চতুর্বিধ অর্থ দেখতে পাই, কেননা অনুগ্রহদান ক্ষেত্রে আত্মা এক, সেবাকর্ম ক্ষেত্রে প্রভু এক, ধর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে ঈশ্বর এক ও সার্বিক উপকারিতার জন্য আত্মার একটা বিশেষ অভিব্যক্তি রয়েছে। তাছাড়া, আমরা যেন জানতে পারতাম যে সার্বিক উপকারিতার জন্য এক একজনকে আত্মার বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি দেওয়া থাকে, সেজন্য প্রেরিতদূত সাথে সাথে বলে চলেন, সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা (খ)।

৩০। এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা যা চতুর্থ অর্থ বলে চিহ্নিত করেছি, অর্থাৎ সার্বিক উপকারিতায় দেওয়া আত্মার সেই অভিব্যক্তি, সেই চতুর্থ অর্থের তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট। প্রেরিতদূত সেই উপকারী অনুগ্রহদানগুলো মনে করিয়ে দিলেন যেগুলো দ্বারা আত্মার এই অভিব্যক্তি ঘটে। কেননা পরাক্রমের এ নানা অভিব্যক্তির মধ্যে সেই দান নির্দিধায়ই নির্দেশিত যা বিষয়ে প্রভু তখনই প্রেরিতদূতদের কাছে কথা বলেছিলেন যখন তাঁদের ‘যেরুশালেম থেকে চলে না যাওয়ার’ আদেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যেন তাঁরা পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, যে প্রতিশ্রুতির কথা তোমরা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তথা: যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে (ক)। আরও, কিন্তু তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুশালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী

হবে (খ)। তিনি তাঁদের আদেশ করেন তাঁরা যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রাখেন যা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেছিলেন। নিঃসন্দেহে এখানেও পিতার সেই একই প্রতিশ্রুতির কথা বলা হচ্ছে। সুতরাং, এসমস্ত পরাক্রমের কার্যকারিতায়ই আত্মার অভিব্যক্তি ঘটে। কেননা যখন প্রজ্ঞার বাণী রয়েছে ও জীবনদায়ী বাণী শোনা হয়, তখন আত্মার দান রহস্য গুপ্ত থাকে না; অথবা, যখন ঐশ্বরিক বিষয়াদি জ্ঞান উপস্থিত তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে জন্তুর মত ঈশ্বরকে না চিনে নিয়ে আমাদের জীবনের প্রণেতার বিষয়ে অজ্ঞ না থাকি; অথবা, যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস না করার ফলে ঈশ্বরের সুসমাচারের বাইরে অবস্থান না করি; অথবা, যখন আরোগ্যদানের ক্ষমতা রয়েছে, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে রোগ-ব্যাধির আরোগ্যদানের মাধ্যমে তাঁরই অনুগ্রহ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি যিনি তেমন দান আমাদের মঞ্জুর করেছেন; অথবা, যখন পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা রয়েছে, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে স্বীকার করি যে যা কিছু আমরা করি, তা হলো ঈশ্বরের পরাক্রমের ফলাফল; অথবা, যখন নবীর ভাষা হয়, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে আমাদের তত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে চিনে নেওয়া যেতে পারে যে আমরা ঈশ্বর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি (গ); অথবা, যখন আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা রয়েছে, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে মানুষ যে পবিত্র নাকি বিকৃত প্রেরণায় কথা বলে সেবিষয়ে অজ্ঞ না হই; অথবা, যখন নানা ভাষায় কথা বলা উপস্থিত, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে নানা ভাষায় কথা বলাটা পবিত্র আত্মারই দানের ইঙ্গিত বলে দেওয়া হয়ে থাকে; অথবা, যখন সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তখনও সেই রহস্য গুপ্ত থাকে না, যাতে শ্রোতাদের বিশ্বাস অজ্ঞতার দরুন বিপন্ন না হয় যেহেতু ভাষার অর্থের ব্যাখ্যাতা সেই ভাষায় অজ্ঞদের কাছেই সেই ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেয়। সুতরাং, যা কিছু এক একজনের ব্যক্তিগত উপকারিতায় ভাগ ভাগ করা হয়, সেই সবকিছুতে রয়েছে আত্মার অভিব্যক্তি যেহেতু এক একজনকে মঞ্জুর করা এই চমৎকার উপকারিতার গুণে আত্মার দান আদৌ গুপ্ত নয়।

৩১। তবে, মানব উপলব্ধির কাছে অধিক কঠিন এমন স্বর্গীয় রহস্যগুলো ক্ষেত্রে ধন্য প্রেরিতদূত পল স্পষ্ট অভিব্যক্তি ও যত্নপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যাতে প্রমাণ করতে পারেন যে এই নানা দান আত্মা দ্বারা ও আত্মায়ই দেওয়া হয়, কেননা আত্মা দ্বারা ও আত্মায় দেওয়াটা একই জিনিস নয়, কারণ আত্মায় প্রাপ্ত একটা দানের বণ্টন আত্মা দ্বারাই মঞ্জুর করা হয়। এবং এসমস্ত দান-বিতরণ ক্ষেত্রে তিনি নিজের বক্তব্য এভাবে শেষ করেন, কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক’রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন (ক)। সেজন্য এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন্ আত্মাই বা এসমস্ত কিছু ভাগ ভাগ করে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করতে গিয়ে এসমস্ত কিছু সাধন করেন, অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করি, যে আত্মা এসমস্ত দান-বিতরণ সাধন করেন তিনি সেই আত্মা ‘যাঁর দ্বারা’, বা সেই আত্মা ‘যে আত্মায়’ এসমস্ত কিছু হয় (খ)। অন্যদিকে, এমন কেউ থাকলে যে এমনটা বলতে দুঃসাহস করবে যে, তিনি সেই একই ব্যক্তি যাকে নির্দেশ করা হয়, তবে প্রেরিতদূত পাঠকের তেমন ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ বলে অস্বীকার করবেন, কেননা তিনি উপরে বলেছিলেন, বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক (গ)। সুতরাং, একজন আছেন যিনি বিতরণ করেন ও অন্য একজন আছেন যাঁর মধ্যে বিতরণটা মঞ্জুর করা হয়। তবু এটা লক্ষ কর যে, যিনি এসমস্ত কিছু সাধন করেন তিনি সবসময় ঈশ্বর, কিন্তু এমনভাবে যাতে খ্রিষ্ট কাজ করেন ও পুত্র হিসাবে কাজ করতে করতে পিতার কাজ সম্পন্ন করেন। এবং তুমি যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, তাহলে প্রেরিতদূতের পত্রের সেই তিনটে নির্দেশনার অর্থ মেনে নাও। কেননা বহুবিধ দানের মধ্যে আত্মা এক, বহুবিধ সেবাকর্মের মধ্যে প্রভু এক, বহুবিধ কর্মক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বর এক, এবং সর্বোপরি এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র আত্মাই সাধন করেন যিনি ভাগ ভাগ ক’রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। এবং পারলে তবে এটা উপলব্ধি কর যে, সেবাকর্ম বিতরণে যে প্রভু ও কর্মক্রিয়া বিতরণে যে ঈশ্বর, তাঁরা হলেন এই এক ও একই আত্মা যিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ সাধন করেন ও ভাগ ভাগ করে দেন। কারণ দানগুলো বিতরণে একমাত্র আত্মা আছেন ও সেই একই আত্মা কাজ সাধন করেন ও ভাগ ভাগ করে দেন।

৩২। কিন্তু, এই যে আত্মা [পুত্রের অন্তকালীন] জন্ম-রহস্য গুণে ঈশ্বরে ও প্রভুতে এক, তুমি একই ঈশ্বরত্বের এই আত্মাকে মেনে নিতে সম্মত না হলে, তবে আমাকে দেখাও কোন্ আত্মা আমাদের কাছে এসমস্ত দান সাধন করেন ও বিতরণ করেন ও কোন্ আত্মায় তিনি তেমনটা করেন। কিন্তু যা আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তা ছাড়া তুমি অন্য কিছু দেখাতে পারবে না, কারণ প্রেরিতদূতই এমনটা নির্দেশ করেন আমাদের কাকে বুঝতে হবে যখন তিনি বলেন, কেননা দেহ যেমন এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক’টি মিলে একদেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ (ক)। তাই তিনি আমাদের জানিয়ে দেন যে অনুগ্রহদানের বহুবিধতা সেই একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে আগত যিনি সকলের দেহ। কেননা, সেবাকর্ম ক্ষেত্রে প্রভুকে দেখাবার পর ও কর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে দেখাবার পর তিনি কিন্তু এটা দেখান যে, একমাত্র আত্মাই এই বহুবিধ আত্মিক দানগুলোকে একমাত্র দেহের সিদ্ধতায় বিতরণ ক’রে এসমস্ত কিছু সাধন করেন ও বিতরণ করেন।

৩৩। [উপরে উপস্থাপিত যুক্তি তবেই অসঙ্গত] যদি না আমরা হয় তো এমনটা ভাবি যে প্রেরিতদূত ঐক্যের মূলকারণকে মানেননি যখন বলেছিলেন, ‘বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু ঈশ্বর এক’; তবে এর ফলে, যেহেতু তিনি সেবাকর্মগুলো প্রভুর সঙ্গে ও কর্মক্রিয়াগুলো ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত বলে ইঙ্গিত করেন, সেজন্য, আমাদেরও বিবেচনায়, সেবাকর্ম ও কর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে একমাত্র ও একই জনকে মেনে নেওয়া উচিত নয়। লক্ষ কর কেমন করে বহুবিধ এসমস্ত সেবাকর্ম বহুবিধ সমস্ত কর্মক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যখন তিনি বলেন, তোমরা খ্রিষ্টের দেহ ও তাঁর অঙ্গগুলো। এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন সেই প্রেরিতদূতেরা (ক) যাঁদের মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞার অনুগ্রহদান; ‘দ্বিতীয়ত সেই নবীরা আছেন’ যাঁদের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের অনুগ্রহদান; ‘তৃতীয়ত সেই শিক্ষাগুরুরা আছেন’ যাঁদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসের অনুগ্রহদান; ‘তারপর আসে সেই পরাক্রম-কর্মগুলো’ যেগুলোর মধ্যে রয়েছে আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান (খ)। এটা স্পষ্ট যে এগুলো হলো মণ্ডলীর সেই সমস্ত সেবাকর্ম ও কর্মক্রিয়া যেগুলো দ্বারা খ্রিষ্টের দেহ গঠিত ও যেগুলো স্বয়ং ঈশ্বর স্থির

করেছেন। [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] হয় তো তুমি এমনটা সমর্থন করতে ইচ্ছা কর যে এ অনুগ্রহদানগুলো খ্রিষ্টের দ্বারা স্থির করা হয়নি যেহেতু ঈশ্বরই সেগুলো স্থির করেছিলেন, কিন্তু তুমি স্বয়ং প্রেরিতদূতকেই একথা বলতে শুনবে, খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে (গ); আরও, যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের উর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গাঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন (ঘ)। তবে এমনটা কি হতে পারে যে সেবাকর্ম সংক্রান্ত অনুগ্রহদানগুলো ঈশ্বরেরও দান হলেও তবু খ্রিষ্টের নয়?

৩৪। কিন্তু, যদি [ভ্রান্তমতের] অভক্তি নিজের উপরে এ সিদ্ধান্ত নেবার দুঃসাহস করে থাকে যে, যেহেতু প্রেরিতদূত বলেন ‘প্রভু এক’ ও ‘ঈশ্বর এক’ সেজন্য তাঁরা স্বরূপের ঐক্যে বিদ্যমান নন, তাহলে আমি তোমার এই ব্যাখ্যায় এমন বিষয় যোগ করব যা তুমি আরও প্রবল গণ্য কর। কেননা প্রেরিতদূত নিজে বলেন, তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত (ক); আরও, প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের উর্ধ্বে, সকলের দ্বারা, ও সকলের অন্তরে (খ)। ‘ঈশ্বর এক’ ও ‘প্রভু এক’ এ শব্দ দু’টো থেকে আমরা দেখতে পাই যে একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে কেবল ঈশ্বরকেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়, কেননা ঐক্যের খোদ বৈশিষ্ট্যই অন্যান্যদের সঙ্গে সহভাগিতাকে মানে না। আহা, কেমন দুঃপ্রাপ্য ও অর্জন করতে কঠিন অনুগ্রহদানগুলো। আহা, আত্মার অভিব্যক্তি কেমন সত্যিকারেই এ বহুবিধ উপকারী অনুগ্রহদান-আরোপণে প্রতিষ্ঠিত। এবং কেমন যুক্তিসঙ্গত ভাবেই অনুগ্রহদানগুলো বিতরণে এই অনুক্রম রক্ষা করা হয়েছে যাতে করে প্রজ্ঞার ভাষা প্রথম পদ ধারণ করে—কেননা একথা সত্যিকারে সত্য যে ‘পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না যিশু প্রভু’ কারণ এই প্রজ্ঞার ভাষার মধ্য দিয়ে ছাড়া খ্রিষ্ট যে প্রভু তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়—; এটাও কেমন

যুক্তিসঙ্গত যে জ্ঞানের ভাষা দ্বিতীয় পদ ধারণ করে যাতে আমরা যা জানি তা জ্ঞান অনুসারেই বলতে পারি যার ফলে প্রজ্ঞার কথা বুঝতে পারি; এটাও কেমন যুক্তিসঙ্গত যে তৃতীয় অনুগ্রহদান বিশ্বাসেই স্থান পায়, কারণ আমরা যদি না বিশ্বাস করতাম যে খ্রিষ্টই প্রভু তবে আগেকার অত্যাব্যশ্যক সেই অনুগ্রহদানগুলো অনর্থক হয়ে যেত। তাই এখন প্রেরিতদূতের গুরুত্বপূর্ণ ও অতি সুন্দর সাক্ষ্যদানের গভীর অর্থের ভিত্তিতে কোনও ভ্রান্তমতপন্থী প্রজ্ঞার ভাষার অধিকারী নয়, জ্ঞানের ভাষারও নয়, ভক্তিময় বিশ্বাসেরও নয়, কারণ উপলব্ধি-শক্তি বিহীন সেই ভ্রান্তমত বাণীর জ্ঞান থেকে ও বিশ্বাসের সরলতা থেকে বঞ্চিত। কেননা কেউই এমনটা ঘোষণা করতে পারে না যা নিজে জানে না, যা ঘোষণা করতে পারে না সে তা বিশ্বাস করতেও পারে না। তাই বিধান থেকে আগত ও খ্রিষ্টের সুসমাচারে আহূত সেই প্রেরিতদূত যখন ঈশ্বরের ঐক্যের কথা ঘোষণা করলেন, তখন সিদ্ধ বিশ্বাস-স্বীকারে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু পাছে, বলতে গেলে অসতর্কই একটা কথার সরলতা ভ্রান্তমতপন্থীদের এমন সুযোগ দেয় যার ফলে তারা একমাত্র ঈশ্বরের কথা প্রচারের মধ্য দিয়ে পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্মকে অস্বীকার করে, সেজন্য তিনি একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করলেন ও তাঁর যা বিশিষ্ট তা এইভাবে ব্যক্ত করলেন, ‘আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্ম’। তিনি এমনটা ইচ্ছা করছিলেন, যিনি ঈশ্বর, তাঁকে যেন পিতাও বলে বিশ্বাস করা হয়। তারপর, যেহেতু পরিত্রাণ লাভের জন্য একমাত্র ঈশ্বরে এই আন্তরিক ও সরল বিশ্বাস যথেষ্ট নাও হতে পারত, সেজন্য তিনি এও বললেন, ‘এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত’। তিনি এটা দেখান যে, পরিত্রাণদায়ী বিশ্বাসের আন্তরিকতা একমাত্র ঈশ্বর ও একমাত্র প্রভুকে প্রচারেই স্থিত, যাতে করে আমরা একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতায় ও একমাত্র প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি। তিনি তো এবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না যে প্রভু বলেছিলেন, এটাই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পায় (গ)। কিন্তু মণ্ডলীর বিশ্বাসের অনুক্রম স্থির ক’রে ও আমাদের বিশ্বাসকে পিতায় ও পুত্রে স্থিতমূল ক’রে তিনি সেই অবিচ্ছেদ্য ও অখণ্ডনীয়

ঐক্য ও বিশ্বাস সংক্রান্ত রহস্য এই কথায় ব্যক্ত করলেন, ‘মাত্র এক ঈশ্বর’ ও ‘মাত্র এক প্রভু’।

৩৫। সর্বপ্রথমে, যেহেতু তুমি, হে ভ্রান্তমতপন্থী, প্রেরিতদূত যে আত্মা বিষয়ে কথা বলেন সেই আত্মার বাইরে জীবনযাপন কর, সেজন্য বুঝে নাও তুমি কতই না মূর্খ। কেননা যদি খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করার জন্য একমাত্র ঈশ্বরের স্বীকারোক্তি ব্যবহার কর যেহেতু যখন ‘একাই’ এর কথা বলা হয়, তখন, তোমার মতে, সেই ‘একাই’ একাকী বলে বিবেচনাযোগ্য, ও যে কেউ একজনমাত্র তার জন্য একাই হওয়াটাই হলো তার নিজস্ব ও বিশিষ্ট শর্ত, তাহলে ‘যিশু খ্রিস্ট যে একমাত্র প্রভু’ উক্তিটায় কেমন অর্থ আরোপ করবে? কেননা, যখন, তোমার মতে, ‘একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা’ উক্তিটা খ্রিস্টের পক্ষে ঈশ্বরত্বের সম্ভাবনা আর রাখে না, তখন, তোমার ঘোষণা অনুসারে, এটা দরকার হবে যে, খ্রিস্টের একমাত্র প্রভু হওয়াটা ঈশ্বরের পক্ষেও প্রভু হওয়ার সম্ভাবনা আর রাখবে না, যেহেতু তুমি এমনটা সমর্থন কর যে, একাই হওয়াটাই হলো একাকী একজনের বৈশিষ্ট্য। তাই একমাত্র প্রভু সেই খ্রিস্ট যে ঈশ্বরও, তা তুমি যদি অস্বীকার কর, তবে তুমি এটাও অস্বীকার করবে যে, একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতাও প্রভু। তেমনটা হলে তবে, যখন প্রভু হওয়াটাই প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর করে তোলে ও ঈশ্বর হওয়াটাই প্রভুকে ঈশ্বর করে তোলে, তখন ঈশ্বর প্রভু না হলে তবে ঈশ্বরের পরাক্রমের আর বাকি কী থাকবে, ও প্রভু ঈশ্বর না হলে তবে প্রভুর প্রতাপের বাকি কী থাকবে?

৩৬। কিন্তু, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’, প্রভুর এই বাণীর গভীর অর্থ অনুধাবন করে প্রেরিতদূত একথা ঘোষণা করতে করতে যে উভয় এক, এটাই বোঝান যে, ‘উভয় যে এক’ ধারণাটা একাকী একজনের একাকীত্বের অবস্থা নির্দেশ করে না, কিন্তু আত্মার ঐক্যকেই নির্দেশ করে। কেননা একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা ও একমাত্র প্রভু সেই খ্রিস্ট এক একজন একাধারে প্রভু ও ঈশ্বর হওয়ায় উভয়েই এমনটা মেনে নেন না যে, আমাদের বিশ্বাসে দু’টো ঈশ্বর বা দু’টো প্রভু থাকবেন। তাই উভয়ই ঐক্য, ও ঐক্য হওয়ায় একজনও একাই নন, অন্যজনও একাই নন। কিন্তু আমরা প্রেরিতদূতের কণ্ঠ দ্বারা ছাড়া বিশ্বাসের রহস্য ব্যক্ত করতে সক্ষম হব না। একমাত্র ঈশ্বর ও একমাত্র প্রভু

আছেন : এবং ‘একমাত্র ঈশ্বর ও একমাত্র প্রভু’ বলায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরে প্রভুও আছেন ও প্রভুতে ঈশ্বরও আছেন। তুমি এমন ব্যক্তির ঐক্য পাচ্ছ না যার ফলে একক ঈশ্বর থেকে যাবেন, তথাপি সেই ব্যক্তিদ্বয় যেন ঐক্য হন তা বাধা দেবার জন্য তুমি আত্মাকেও বিচ্ছিন্ন করতে পার না। যিনি প্রভু তিনি যেন ঈশ্বরও না হন বা যিনি ঈশ্বর তিনি যেন প্রভুও না হন, এজন্য তুমি সেই একমাত্র ঈশ্বরে ও সেই একমাত্র প্রভুতে পরাক্রমকে পৃথক করতে পারবে না। নামগুলো উপস্থাপনের ব্যাপারে প্রেরিতদূত দু’টো ঈশ্বর ও দু’টো প্রভুর কথা প্রচার না করায় যথেষ্ট সতর্ক হলেন ; এবং তিনি এধরনের শিক্ষা এলক্ষ্যেই অবলম্বন করেছেন যেন একমাত্র প্রভু সেই খ্রিষ্টে একমাত্র ঈশ্বরকেও দেখাতে পারেন, ও একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতায় একমাত্র প্রভুকেও দেখাতে পারেন। এবং প্রেরিতদূত, যে বিশ্বাস-ঘোষণা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের [অনন্তকালীন] জন্মকে বাতিল করতে পারত, ব্যক্তির ঐকের তেমন ভক্তিহীন ঘোষণায় আমাদের না টানবার জন্য পিতাকেও স্বীকার করলেন, পুত্রকেও স্বীকার করলেন।

৩৭। যদি না এমনটা হয় যে, চরম নিরাশার ক্ষিপ্ততা দৈবাৎ এতে বিস্তারিত হতে দুঃসাহস করে যে, যেহেতু প্রেরিতদূত খ্রিষ্টকে প্রভু বলে অভিহিত করলেন সেজন্য কেউই তাঁকে প্রভু বলেই ছাড়া অন্য নামে স্বীকার করবে না ; এবং এমনটাও যেন না হয় যে, কেউ এটা বলতে দুঃসাহস করে যে, তিনি প্রভুর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় তিনি সত্যকার ঈশ্বরত্বেরও অধিকারী নন। কিন্তু খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর, এবিষয়ে পল অঙ্গ নন, কেননা তিনি বলেন, পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সবকিছুর উপরে ঈশ্বর **(ক)**। এখানে এমন একটা সৃষ্টজীবের ব্যাপার নয় যা ঈশ্বর বলে পরিগণিত, কিন্তু সৃষ্টির সেই ঈশ্বরেরই ব্যাপার ‘যিনি সবকিছুর উপরে ঈশ্বর’।

৩৮। যিনি সবকিছুর উপরে ঈশ্বর, তিনি যে পিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য আত্মাও, একথা তুমি প্রেরিতদূতের এই একই বচন থেকে শিখে নাও যা আমরা ব্যাখ্যা করে আসছি। যখন তিনি ‘যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়’ একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতাকে ও ‘যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’ একমাত্র প্রভু সেই খ্রিষ্টকে স্বীকার করলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : যখন তিনি

এ কথা বলেন যে সমস্ত কিছু ঈশ্বর থেকে আগত ও সমস্ত কিছু খ্রিস্টের দ্বারা সৃষ্ট, তখন তিনি কী পার্থক্য রাখেন? সেইজন ‘যাঁর থেকে’ ও সেইজন ‘যাঁর দ্বারা’ সমস্ত কিছু হয়, সেই দু’জন হয় তো কি একে অপর থেকে ভিন্ন এমন স্বরূপ ও আত্মার অধিকারী বলে গণ্য হতে পারেন? সমস্ত কিছু পুত্রের দ্বারা শূন্য থেকে অস্তিত্ব পেয়েছিল, এবং প্রেরিতদূত সেই সমস্ত কিছু সেই ঈশ্বরে আরোপ করলেন ‘যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়’, কিন্তু পুত্রের উপরেও সেই সমস্ত কিছু আরোপ করলেন ‘যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’। তবে [তাদের মধ্যে] যে কেমন পার্থক্য থাকতে পারে আমি তা খুঁজে পাচ্ছি না যেহেতু উভয়ের একই পরাক্রম দরকার। কেননা বিশ্বের অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য যদি এটাই বলা সম্ভব ও যথেষ্ট হত যে সৃষ্টবস্তুগুলো ঈশ্বর থেকে আগত, তাহলে এটা মনে করিয়ে দেওয়ার কী দরকার ছিল যে, যা কিছু ঈশ্বর থেকে আগত তা খ্রিস্টের দ্বারা অস্তিত্বশীল যদি না খ্রিস্টের দ্বারা ও ঈশ্বর থেকে আগত হয়ে অস্তিত্বশীল হওয়া এক ও একই জিনিস না হত? কিন্তু, যেমন উভয়ের এক একজনকে প্রভু ও ঈশ্বর নাম আরোপ করা হয়েছে যাতে উভয়েই সেই নাম দু’টোর অধিকারী হন, তেমনি ‘যাঁর দ্বারা’ ও ‘যাঁর থেকে’ বাক্য দু’টো উভয়কে লক্ষ করে, ও তেমনটা এজন্য হয়, যেন উভয়ের ঐক্য দেখানো হয়, কিন্তু একক এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব ইঙ্গিত করার জন্য নয়। প্রেরিতদূতের ভাষা ভ্রান্তমতকে কোন সুযোগ দেয় না, ও তাঁর বিশ্বাস-প্রচার সূক্ষ্মতার অভাবী নয়। এই উপযোগী কথা দ্বারা তিনি নিজেকে সুরক্ষিত করলেন ও আমাদের সম্ভাব্য এমন সন্দেহও এড়ালেন যা দ্বারা আমরা মনে করতে পারতাম যে তিনি দু’টো ঈশ্বরকেও নির্দেশ করছিলেন, একাকী একটা ঈশ্বরকেও নির্দেশ করছিলেন। তিনি ব্যক্তি-ঐক্যকে প্রত্যাখ্যান করতে করতে ঐশ্বরিক ঐক্যকে বিযুক্ত করেন না। ‘যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়’ ও ‘যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’ বাক্য দু’টো যদিও নিজের পরাক্রমের প্রতাপ ক্ষেত্রে একক একটা ঈশ্বরত্বকে নির্দিষ্ট না করে, তবু কার্যকারিতা ক্ষেত্রে সেই ঈশ্বরত্বকে ভিন্ন বলে নির্দেশ করে না, কারণ ‘যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়’ ও ‘যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’ বাক্য দু’টো একই স্বরূপের এমন প্রণেতাকে নির্দেশ করে যিনি একই কর্মে নিবিষ্ট। প্রেরিতদূত এটা স্পষ্ট করে তোলেন যে, উভয় একই স্বরূপের অধিকারী। কেননা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা নির্দেশ করার পর, তাঁর দুর্জয় বিচার সকল জানবার অসাধ্যতা স্বীকার করার পর, ও

সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ জানার ক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতা দেখাবার পর (ক) তিনি মানব বিশ্বাসের ভূমিকা অবলম্বন করে এই কথায় স্বর্গের দুর্ভেদ্য ও সন্ধানের অতীত রহস্যগুলোর প্রতি সম্মান দেখালেন, কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন (খ)। তাই, একমাত্র স্বরূপ নির্দেশ করার জন্য তিনি এমন কিছুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যা একমাত্র স্বরূপের কর্ম না হয়ে পারে না।

৩৯। কেননা, যেহেতু তিনি বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের কাছেই এমনটা আরোপ করেছেন যে সমস্ত কিছু তাঁর কাছ থেকে আগত, ও খ্রিস্টের স্বীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে এমনটা আরোপ করেছেন যে সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারা হয়; আরও, যেহেতু উপরে এইমাত্র উল্লিখিত বচনে এটাই ঈশ্বরের গৌরব যে সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই জন্য হয়; যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা হলেন খ্রিস্টের আত্মার একই আত্মা; যেহেতু প্রভুর দ্বারা সেবাকর্ম বিতরণে ও ঈশ্বর দ্বারা কর্মক্রিয়া বিতরণে একমাত্র আত্মা কাজ করেন ও বিতরণ করেন, সেজন্য যাঁরা একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাঁরা এক না হয়ে পারেন না, কেননা একই প্রভু সেই পুত্রে ও একই ঈশ্বর সেই পিতায় এক ও একই আত্মা সেই একই পবিত্র আত্মার গুণে বিতরণ করতে করতে সমস্ত কিছু সম্পন্ন করেন। যিনি স্বর্গের মহৎ রহস্যগুলো জানবার যোগ্য হলেন ও ঈশ্বরের রহস্যগুলোর সহভাগী হিসাবে মনোনীত হলেন— বাস্তবিকই, যা কিছু অনির্বচনীয় তিনি সেই সমস্ত বিষয়ে উচিত নীরবতা রাখলেন— ও খ্রিস্টের সত্যকার প্রেরিতদূত হলেন, স্পষ্ট বাণী ঘোষণা দ্বারা পিতাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে ও যিশু খ্রিস্টকে একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার করায়, আহা, মানব জঘন্যতার কল্পনা-জল্পনার বিরুদ্ধে তিনি কেমন বাধাবিঘ্ন দাঁড় করালেন। তাই, ইতিমধ্যে, কেউই এমনটা ঘোষণা করতে পারে না যে দু'টো ঈশ্বর আছেন, এও ঘোষণা করতে পারে না যে একক ব্যক্তি আছেন, কেননা যিনি একক ব্যক্তি নন তিনি নিজেকে দু'টো ঈশ্বরে রূপান্তরিত করতে পারেন না; ও যাঁরা দু'টো ঈশ্বর নন তাঁরা একাকী ঈশ্বর বলে পরিগণিত হতে পারেন না। এবং একই সময়ে পিতা হিসাবে ঈশ্বরের প্রকাশ খ্রিস্টের সিদ্ধ জন্মকে ব্যক্ত করে।

৪০। এখন, হে ভ্রাত্তমতের সাপ, তোমাদের হিস করা ও কম্পমান জিহ্বা বের কর : তুমি, হে সাবেল্লিউস, তুমি, হে ফতিনুস, অথবা সেই তোমরা যারা এখন প্রচার করছ একমাত্র জনিত ঈশ্বর সৃষ্টজীব মাত্র। যে কেউ পুত্রকে অস্বীকার করে, সে এটা শুনবে যে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা আছেন, কেননা যেহেতু এক পিতা পিতা হতে পারেন না যদি না তিনি একটা পুত্রের পিতা না হন, সেজন্যই ‘পিতা’ নামে আপনা আপনি পুত্রের অস্তিত্ব নির্দেশিত হয়। আরও, যে কেউ পুত্র থেকে সেই একই স্বরূপের ঐক্যকে অপসরণ করে, সে এটা জেনে নিক যে একমাত্র প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট আছেন। কেননা আত্মার ঐক্যের মধ্য দিয়ে তিনি একমাত্র প্রভু না হলে তবে পিতা ঈশ্বরের জন্য প্রভু হতে আর সম্ভব হবে না। উপরন্তু, যে কেউ পুত্রকে কালের গণ্ডিতে ও মাংস অনুসারে সঞ্জাত বলে ভাবে, সে এটা জেনে নিক যে, তাঁরই দ্বারা সমস্ত কিছু হয় ও আমরাও হই, এবং কালবিহীন তাঁর অসীমতাই কাল হবার আগে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছে। এবং ইতিমধ্যে সে এটা পুনরায় পড়ুক যে আহুত হবার জন্য একমাত্র প্রত্যাশা রয়েছে ও একমাত্র বাপ্তিস্ম ও একমাত্র বিশ্বাস রয়েছে। এখন, এসমস্ত কিছুর পর, যে কেউ প্রেরিতদূতের শিক্ষার বিরোধিতা করে, নিজের উদ্ভাবন দ্বারা অদ্ভুত তত্ত্ব তৈরি করে বিধায় বিনাশ-মানতের বস্তু হওয়ায় সে আহুতও নয়, বাপ্তিস্মপ্রাপ্তও নয়, বিশ্বাসীও নয়, কেননা একমাত্র পিতা সেই ঈশ্বরে ও একমাত্র প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেই রয়েছে একমাত্র প্রত্যাশার ও বাপ্তিস্মের একমাত্র বিশ্বাস। এবং অন্য কোন তত্ত্ব এতে গর্ব করতে পারবে না, সেও সেই সত্যগুলোর মধ্যে স্থান পাবে যেগুলো একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র প্রভু, একমাত্র প্রত্যাশা, একমাত্র বাপ্তিস্ম, এমনকি একমাত্র বিশ্বাসেরই অধিকার।

৪১। সুতরাং, বিশ্বাস এক, তথা, অখণ্ডনীয় স্বরূপের ঐক্যের মধ্য দিয়ে পুত্রে পিতাকে ও পিতায় পুত্রকে স্বীকার করা; এ এমন ঐক্য যা একীকরণের ফল নয় কিন্তু অবিচ্ছেদ্য, মিশ্রণের ফল নয় কিন্তু পার্থক্য বিহীন, সংযোজনের ফল নয় কিন্তু সম অস্তিত্বশীল, অপূর্ণাঙ্গ নয় কিন্তু সিদ্ধতাপ্রাপ্ত। কেননা এখানে রয়েছে [অনন্তকালীন] জন্ম, দত্তক নয়, রয়েছেন ঈশ্বর, সৃষ্টজীব নয়। এখানে অন্য ধরনের ঈশ্বর নেই, কিন্তু পিতা ও পুত্র এক। কেননা জন্ম দ্বারা সেই স্বরূপ নবীকৃত হয়নি যার ফলে এমন বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হলো যেগুলো তার উৎপত্তির বৈশিষ্ট্যগুলোর চেয়ে পরকীয়। সেজন্য, যখন প্রেরিতদূত

এটা ঘোষণা করেন যে, তাঁর কাছে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা ও একমাত্র প্রভু সেই খ্রিষ্ট রয়েছেন, তখন তিনি ঠিক এই বিশ্বাসকেই আঁকড়িয়ে ধরেন, তথা, পুত্র পিতাতে অবস্থান করেন ও পিতা পুত্রে অবস্থান করেন। কেননা প্রভু সেই খ্রিষ্টে ঈশ্বরও আছেন, ও ঈশ্বর সেই পিতায় প্রভুও আছেন; উভয়ই হলেন সেই ঐক্য যা সেই ঈশ্বর, ও উভয়ই হলেন সেই ঐক্য যা সেই প্রভু, কারণ ঈশ্বর প্রভু না হলে তবে এমনটা ভাবা উচিত ঈশ্বর কোন না কোন ত্রুটির অধিকারী, এবং পুত্র ঈশ্বর না হলে তবে একইপ্রকারে এমনটা ভাবা উচিত প্রভু সিদ্ধতাপ্রাপ্ত নন। এবং এইভাবে, যেহেতু উভয় হলেন একমাত্র ঈশ্বর ও উভয় একমাত্র [ঈশ্বর] নাম বহন করেন ও উভয়ের একজনও ঐক্যের বাইরে বিদ্যমান নন, সেজন্য নিজের শিক্ষায় প্রেরিতদূত সুসমাচারের শিক্ষা অতিক্রম করেন না, এবং যখন খ্রিষ্ট পলের হয়ে কথা বলেন, তখন এমন কথা বলেন না যা সেই কথা থেকে ভিন্ন যা তিনি দেহ-পরিবৃত হয়ে জগতে অবস্থান কালে উচ্চারণ করেছিলেন।

৪২। সুসমাচারে প্রভু বলেছিলেন, ‘নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়, যা মানবপুত্রই তোমাদের দান করবেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাক্ষনে চিহ্নিত করেছেন। তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের কী করতে হবে? যিশু তাদের এই উত্তর দিলেন, তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ (ক)। নিজের দেহধারণ ও ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত রহস্য প্রকাশ করতে গিয়ে প্রভু আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা সংক্রান্ত শিক্ষাবাণীও উচ্চারণ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেন, আমরা নশ্বর খাদ্যের জন্য নয় কিন্তু অনন্ততার উদ্দেশে থেকে যায় এমন খাদ্যেরই জন্য কাজ করব, যেন এটা মনে রাখি যে, অনন্ততার উদ্দেশে সেই খাদ্য মানবপুত্র দ্বারা আমাদের দেওয়া হয়, যেন এটাও জানি যে, পিতা ঈশ্বর পুত্রকে নিজের মুদ্রাক্ষনে চিহ্নিত করেছিলেন, যেন এটাও জানতে পারি যে, ঈশ্বরের কাজ এটা: তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা। এবং পিতা যাঁকে প্রেরণ করেছেন তিনি কে? অবশ্যই [সেই] তিনি যাঁকে ঈশ্বর নিজের মুদ্রাক্ষনে চিহ্নিত করেছেন। এবং ঈশ্বর যাঁকে নিজের মুদ্রাক্ষনে চিহ্নিত করেছেন তিনি কে? নিঃসন্দেহেই তিনি হলেন সেই মানবপুত্র, হ্যাঁ, যিনি অনন্ত জীবনের খাদ্য দান করেন,

তিনি। অবশেষে, তিনি যাদের কাছে সেই খাদ্য দান করেন তারা কারা? যারা অবিনশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই। এবং এইভাবে এই খাদ্যের জন্য যে কাজ, তা একইসময়ে হলো ঈশ্বরের কাজ, অর্থাৎ, তিনি যাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা। কিন্তু এসমস্ত কথা মানবপুত্রই উচ্চারণ করেন। এবং কেমন করে মানবপুত্র অনন্ত জীবনের খাদ্য দান করবেন? কেন! সে-ই নিজের পরিভ্রাণ রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ যে এমনটা জানে না যে, যিনি অনন্ত জীবনের খাদ্য দান করেন, সেই মানবপুত্র পিতা ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছেন। এই পর্যায়ে আমি জিজ্ঞাসা করি : পিতা, অর্থাৎ ঈশ্বর, মানবপুত্রকে নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন, এ বাণীগুলো কোন্ অর্থেই বা উপলব্ধি করা দরকার?

৪৩। প্রথমে আমাদের এটা চিনে নেওয়া উচিত যে, ঈশ্বর নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য কথা বলেছেন, এবং আমাদের দুর্বল স্বভাবের জ্ঞান-সীমা মেনে নিয়ে নিজের বচনের ভাষা আমাদের উপলব্ধি-শক্তির উপযোগী করেছেন। কেননা পুরাকালে যেহেতু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র করে তোলায় তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান করেছিলেন বলে তাঁকে ইহুদীদের দ্বারা ভৎসনা করা হয়েছিল, সেজন্য তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তিনি পিতাকে যা করতে দেখছিলেন সেই সমস্তই করছিলেন ও পিতা থেকে সমস্ত বিচারের ভার পেয়েছিলেন ও পিতাকে যেমন, তাঁকেও তেমনি সম্মান করা উচিত ছিল। এবং এসমস্ত কিছু ক্ষেত্রে তিনি আগে নিজেকে এমন পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন যিনি সম্মান, অধিকার ও স্বরূপে পিতার সমান। পরে তিনি এটা বলেছিলেন যে, পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছিলেন; ও তেমনটা বলে তিনি এটা বুঝিয়েছিলেন যে, [অনন্তকালীন] জন্ম-রহস্যের গুণে তিনি একই স্বরূপের ঐক্যের অধিকারী ছিলেন। কেননা যখন তিনি এমনটা বলেন যে, পিতার যা আছে তা তাঁরও আছে, তখন তিনি বলতে ইচ্ছা করেন যে, স্বয়ং পিতাই তাঁর আছেন; কেননা ঈশ্বর মানবীয় ভাবে সংযোজিত নানা কিছুর এমন ফলাফল নন যার জন্য তাঁর মধ্যে অধিকৃত ও অধিকারীর মধ্যকার পার্থক্য রয়েছে। বরং তিনি যা, তা সবই জীবন অর্থাৎ এমন সিদ্ধ, পূর্ণ ও অসীম স্বরূপ যা অসদৃশ উপাদান দ্বারা গঠিত নয় কিন্তু এমন জীবন দ্বারা গঠিত যা সমস্তই ঘিরে ফেলে। এবং অধিকৃত

জীবন যেমন, দেওয়া জীবন তেমন, এটা স্পষ্ট বোঝায় যে, যাকে সেই জীবন দেওয়া হয়েছিল তিনি জনিতই হয়েছিলেন, তথাপি ব্যাপারটা সত্তার পার্থক্য দাবি করে না, কারণ দেওয়া জীবন যেমন, অধিকৃত জীবনও তেমন।

৪৪। তাঁর নিজের মধ্যে পিতার উপস্থিতি সংক্রান্ত তেমন বহুবিধ ও সূক্ষ্ম প্রকাশের পর তিনি বলে চলেছিলেন, কারণ পিতা তাঁকে নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন (ক)। মুদ্রাঙ্কনের স্বরূপ এটাই যে, মুদ্রাঙ্কনে খোদাই করা প্রতিকৃতির গোটা রূপ ঠিক তা-ই প্রদর্শন করা কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেতে খোদাই করা প্রতিকৃতিটা বজায় রাখা; এবং যা খোদাই করা রয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে করতে মুদ্রাঙ্কনটা নিজেতে যা খোদাই করা রয়েছে তা গোটাই নিজেতে প্রদর্শন করে। কিন্তু ঐশ্বরিক জন্ম ক্ষেত্রে এই উদাহরণ কোন কাজে আসে না, কেননা মুদ্রাঙ্কন ক্ষেত্রে পদার্থ রয়েছে, স্বরূপের পার্থক্যও রয়েছে, ও খোদাই করার প্রক্রিয়াও রয়েছে; ও এসব কিছু মাধ্যমে কঠিনতর ধরনের স্বরূপে গঠিত প্রতিকৃতি সেটার চেয়ে বেশি নরম ধরনের স্বরূপে খোদাই করা হয়। কিন্তু সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর, যিনি আমাদের পরিভ্রাণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে মানবপুত্রও, সেই তিনি এটা দেখাতে ইচ্ছা ক'রে যে তিনি পিতার স্বরূপকে নিজেতে ধারণ করে আছেন, এটা বললেন যে, তিনি পিতার মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছিলেন, কারণ মানবপুত্র অনন্ত জীবনের খাদ্য দিতে উদ্যত ছিলেন ও তিনি এমনটা ইচ্ছা করছিলেন, আমরা অনন্ত জীবনের খাদ্য দেওয়ার সেই অধিকার তাঁর মধ্যেই চিনে নিতে পারব যেহেতু, যে ঈশ্বর নিজের মুদ্রাঙ্কনে তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি সেই ঈশ্বরের রূপের গোটা পূর্ণতাকে নিজেতেই ধারণ করছিলেন, যাতে করে, ঈশ্বর নিজের মুদ্রাঙ্কনে যাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি যেন, যিনি মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই ঈশ্বরের রূপ ছাড়া অন্য কিছু প্রদর্শন না করেন। বস্তুতপক্ষে প্রভু এসমস্ত কিছু সেই ইহুদীদেরই উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যারা অবিশ্বাসের কারণে তাঁর বাণী গ্রহণ করতে অক্ষম ছিল।

৪৫। কিন্তু, যিনি প্রেরিতদূতের মধ্য দিয়ে কথা বলেন, সেই খ্রিস্টের আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে সুসমাচারের সেই প্রচারক তখনই আমাদের অন্তরে [খ্রিস্টের] এই নিজস্ব স্বরূপ-জ্ঞান স্থাপন করেন যখন বলেন, যিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন, তিনি ঈশ্বরের সমান

হওয়াটা আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের রূপ ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন (ক)। যাঁকে ঈশ্বর নিজের মুদ্রাক্ষনে চিহ্নিত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের রূপ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতেন না (খ), ও যা কিছু ঈশ্বরের রূপে মুদ্রাক্ষন গ্রহণ করেছে, তার বিষয়ে এমনটা ভাবতে হয়, তা নিজেতে সেই সবকিছু ধারণ করে যা ঈশ্বরের। এবং এই কারণেই প্রেরিতদূত এটা শিখিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বর নিজের মুদ্রাক্ষনে যাঁকে চিহ্নিত করেছেন তিনি হলেন ঈশ্বরের রূপে অবস্থানকারী ঈশ্বর। কেননা, যখন তিনি তাঁর ধারণকৃত ও তাঁর মধ্যে সঞ্জাত দেহের কথা বলতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, ‘তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়াটা আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের রূপ ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন’। যেহেতু তিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন সেজন্য তিনি ঈশ্বর হয়ে থাকলেন সেই ঈশ্বরেরই প্রভাবে যিনি নিজের মুদ্রাক্ষনে তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁর পক্ষে দাসের রূপ ধারণ করার কথা ছিল ও মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা দেখানোর কথা ছিল, সেজন্যই তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়াটা আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের রূপ ধারণ করে তিনি বাধ্যতায় নিজেকে শূন্য করলেন। এবং ঈশ্বরের রূপ থেকে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর যা সমান ছিল তিনি তা থেকে নিজেকে শূন্য করলেন। এবং তিনি ঈশ্বরের রূপে থাকলেও, ও যেহেতু ঈশ্বর ঈশ্বরত্বের মুদ্রাক্ষনে তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন সেজন্য তিনি ঈশ্বরের সমান হলেও তবু ঈশ্বরের সেই সমন হওয়াটাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না।

৪৬। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি: যিনি ঈশ্বরের স্বরূপে ঈশ্বর হয়ে থাকেন, তিনি কি সেইভাবেই অন্য ধরনের ঈশ্বর হন যেভাবে আমরা সীলগুলো ক্ষেত্রে নকলকৃত ছবি বা নকলকারী ছবির বেলায় দেখি? কেননা, সীসায় ছাপা লোহার পাশা ও মোমে ছাপা মণিমুক্তা নিজেতে কাটা আকৃতির আমেজ গঠন করে বা নিজের উপরে আকৃতির রেখাগুলো খচিত আকারে রাখে। কিন্তু, এত মূর্খ ও অবুঝ এমন কেউ থাকলে যে এমনটা ভাবে, ঈশ্বর, ঈশ্বর রূপে, ঈশ্বর থেকে ভিন্ন অন্য কিছু অনুসারে নিজেকে গঠন করেন, ও এমনটা মনে করে যে, ঈশ্বরের রূপ যিনি ধারণ করেন তিনি মানবধারণ-রহস্যের গুণে ও ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা দ্বারা সম্পন্ন অবমাননার গুণে গোটা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন অন্য কিছু, তবে সেই অবুঝ লোক স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে যা কিছু আছে সেই সমস্ত কিছুর ও

প্রতিটি জিহ্বারও সাক্ষ্য দ্বারা এটা শুনবে যে, যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে রয়েছেন (ক)। সুতরাং, ইতিমধ্যে দাসের রূপ হওয়ার পর তিনি যদি তেমন গৌরবে অবস্থান করবেন, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, যখন তিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন, তখন তিনি কেমন ছিলেন? যিশু হিসাবে খ্রিষ্ট অর্থাৎ মানুষ রূপে সঞ্জাত খ্রিষ্ট যে পিতার গৌরবে অবস্থান করবেন একথা যখন সত্য, তখন আত্মা হিসাবে খ্রিষ্ট কি ঈশ্বরের স্বরূপের সহভাগী না হয়ে পারলেন? কেননা এটাই ‘ঈশ্বরের গৌরবে’ এর অর্থ।

৪৭। ধন্য প্রেরিতদূত সবকিছুতে সুসমাচারের বিশ্বাসের অপরিবর্তনশীল শিক্ষা অনুসরণ করেন ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে প্রভু বলে ঘোষণা করেন যাতে করে প্রেরিতিক বিশ্বাস তাঁকে অন্য ধরনের ঈশ্বর বলে না মনে ক’রে দু’টো ঈশ্বর-স্বীকারে পতিত হয়; ও পিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বর বলে পুত্র সংক্রান্ত এই ধারণাও যেন একমাত্র ও একক ঈশ্বরকে ঘোষণা করার অজুহাত না দেয়। যখন তিনি বলেন ‘ঈশ্বরের রূপে’ ও ‘পিতা ঈশ্বরের গৌরবে’, তখন তিনি আমাদের শেখাতে ইচ্ছা করেন যে, একজন অন্যজন থেকে পৃথক নন ও তিনি এটা আদৌ ইচ্ছা করেন না, আমরা ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে অস্তিত্বশীল নন বলে ভাবব। কেননা যিনি ঈশ্বরের রূপে রয়েছেন তিনি অন্য ঈশ্বরে নিজেকে রূপান্তরিত করেন না, ও তাছাড়া তিনি নিজের ঈশ্বরত্বকে হারান না, কারণ তাঁকে ঈশ্বরের রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না যেহেতু তিনি সেই রূপেই রয়েছেন; এবং যিনি ঈশ্বরের রূপে রয়েছেন তিনি ঈশ্বরত্ব বিহীন নন। একই প্রকারে, যিনি ঈশ্বরের গৌরবে বিদ্যমান, তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না; এবং যেহেতু তিনি ঈশ্বরের গৌরবে ঈশ্বর, সেজন্য তাঁকে অন্য ঈশ্বর ও ঈশ্বর থেকে ভিন্ন ঈশ্বর বলেও ঘোষণা করা সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি ঈশ্বরের গৌরবে রয়েছেন, সেজন্য তিনি যাঁর গৌরবে রয়েছেন তাঁরই কাছ থেকে আপনা আপনিই সেই ঈশ্বরত্ব-গুণের অধিকারপ্রাপ্ত।

৪৮। একমাত্র সত্যকার বিশ্বাস প্রচারের পদ্ধতি একাধিক হয়েও সেই বিশ্বাস যে তেমনটাই থেকে যাবে না এতে কোন বিপদ নেই। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের প্রভু বললেন, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (ক)। কিন্তু বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু সেই পল তখনই কি প্রভুর বাণীর অর্থ বিস্মৃত হলেন বা

সেবিষয়ে নীরব থাকলেন যখন বললেন, তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি? (খ)। জিজ্ঞাসা করি: তিনি কি অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্য প্রতিমূর্তি? এবং অসীম ঈশ্বরকে কি সীমাবদ্ধ রূপের প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে দৃশ্যগত করা যেতে পারে? কেননা একটা প্রতিমূর্তি অবশ্যই তারই রূপ দেখাবে রূপটা যার প্রতিমূর্তি। তবে, যারা এটা সমর্থন করে, পুত্র ভিন্ন ধরনের স্বরূপের অধিকারী, তারা বুঝিয়ে দিক, পুত্রকে কোন্ ধরনের অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হতে হবে। সেটা কি এমন দেহগত ও দৃশ্যগত প্রতিমূর্তি যা চলাচল ক’রে ও এগিয়ে যেতে যেতে একটা স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘোরাফেরা করে? তথাপি তারা মনে রাখুক যে, সুসমাচার ও নবীসকল অনুসারে খ্রিষ্ট তো আত্মা ও ঈশ্বরও তো আত্মা। তারা যদি এই আত্মাস্বরূপ খ্রিষ্টকে একটা রূপের ও একটা দেহের সীমায় সীমাবদ্ধ করে, তাহলে তেমন দেহগত খ্রিষ্ট অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আর হবেন না, যেভাবে সীমাবদ্ধ একটা গন্ডিও অসীমতার প্রতিমূর্তি হবে না।

৪৯। কিন্তু প্রভু ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’ বাণীটার অর্থ অনিশ্চিত রাখেননি, এবং প্রেরিতদূত ‘যিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি’ তিনি যে কোন্ স্বরূপের অধিকারী সেবিষয়ে নীরব থাকেননি। প্রভু বলেছিলেন, আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাতে বিশ্বাস করবেন না (ক); একথা দ্বারা তিনি শেখাচ্ছিলেন পিতাকে তাঁরই নিজেতে দেখতে হয়, কারণ তিনি পিতার কাজ করছিলেন। তিনি ইচ্ছা করছিলেন, তাঁর স্বরূপের পরাক্রম-জ্ঞান সেই পরাক্রমের স্বরূপকে বোঝাবে যা বিষয়ে তারা জ্ঞাত হয়েছিল। এজন্য যখন প্রেরিতদূত এটা প্রকাশ করেন যে, খ্রিষ্টের স্বরূপের এই পরাক্রমে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বিরাজ করে, তখন তিনি বলেন, তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে—যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক’রে; সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ। তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন। এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে, এবং তাঁরই দ্বারা সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত

করবেন (খ)। সুতরাং, এসমস্ত কর্মের পরাক্রম দ্বারাই তিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। কেননা অদৃশ্য সমস্ত কিছুই স্রষ্টা যে নিজের স্বরূপগত প্রয়োজনীয়তার কারণেই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হতে বাধ্য নন একথা সুনিশ্চিত। তিনি এই কারণেই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলে অভিহিত, পাছে তিনি স্বরূপের চেয়ে রূপেরই প্রতিমূর্তি বলে গণ্য হন। কারণ তাঁর মধ্যে স্থিত ঐশ্বরিক স্বরূপ তাঁর নিজের স্বরূপের পরাক্রম দ্বারাই জ্ঞাত হতে পারে, সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা নয় যেগুলো অদৃশ্য।

৫০। তাই তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সবই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, এবং পাছে কেউ না কেউ সেই সবই তাঁর উপর আরোপ করবে না বলে দুঃসাহস করে সেজন্য প্রেরিতদূত বলেন, ‘সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক’রে; সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ’। সুতরাং, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ যিনি সমস্ত কিছুর আগেই আছেন ও যাঁর মধ্যে সবই রয়েছে। এবং প্রকৃতপক্ষে এসমস্ত কিছু সৃষ্টির আদি সংক্রান্ত। কিন্তু আমাদের দেহ ধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা ক্ষেত্রে তিনি বলেন, ‘তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন। এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে, এবং তাঁরই দ্বারা সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন’। প্রেরিতদূত আত্মিক রহস্যগুলোর জন্য তাদের নিজ নিজ দৈহিক কর্মফল স্থির করেছেন। কেননা যিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথাও; এবং যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, তিনি তো আদি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত। এইভাবে তিনি সবকিছুতে শীর্ষপদের অধিকারী, কারণ যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি আমাদের সবার দেহ, কারণ যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, তিনি একইসময়ে চিরকাল ধরেই প্রথমজাত। ফলত, যে আত্মিক বিষয়গুলো সেই প্রথমজাততে সৃষ্ট হয়েছে, সেগুলো যেমন নিজেদের চিরকালীন অস্তিত্ব ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি দায়ী, তেমনি মানবীয় যত বিষয়ও এতেই তাঁর প্রতি দায়ী যে, মৃতদের মধ্য থেকে সেই প্রথমজাততেই তারা অনন্ততার উদ্দেশ্যে নবজন্ম লাভ করে। কেননা তিনি তো আদি, ও পুত্র হিসাবে প্রতিমূর্তি; যখন তিনি প্রতিমূর্তি, তখন তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি (ক)। তিনি নিখিল

সৃষ্টিরও প্রথমজাত, কারণ নিজেতে বিশ্বের আদিকে ধারণ করে আছেন। আরও, তিনি দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত যাতে করে সবকিছুতে শীর্ষপদের অধিকার রাখেন। তবে, যেহেতু সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ, সেজন্য ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করতে প্রসন্ন হলো। কেননা যেমন তাঁর মধ্যে, তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে, তেমনি তাঁর মধ্যে, তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য সমস্তই পুনর্মিলিত হয়।

৫১। তবে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়াটা যে কি, তুমি এখন তা উপলব্ধি কর? তার অর্থ হলো এ, সমস্ত কিছু তাঁর মধ্যে তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। যখন সমস্ত কিছু তাঁর মধ্যে সৃষ্ট, তখন তুমি এটা বুঝে নাও যে, তিনি যাঁর প্রতিমূর্তি তিনিও তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। এবং যখন যা কিছু তাঁর মধ্যে সৃষ্ট, সেই সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারাও সৃষ্ট, তখন তুমি এটা জেনে নাও যে, প্রতিমূর্তি-খ্রিষ্টেও তাঁরই স্বরূপ বসবাস করে তিনি নিজে যাঁর প্রতিমূর্তি। কারণ তাঁর মধ্যে যা সৃষ্ট, তিনি নিজের দ্বারাই সেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন, সেইভাবে যেভাবে তাঁর দ্বারা সমস্তই তাঁর মধ্যে পুনর্মিলিত হয়। যখন সেই সমস্ত তাঁর মধ্যে পুনর্মিলিত হয়, তখন তাঁর মধ্যে সেই পিতার ঐক্য উপলব্ধি কর যিনি তাঁর মধ্যে সমস্তই নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেন। যখন সমস্তই তাঁর দ্বারা পুনর্মিলিত হয়, তখন এটা জেনে নাও যে, যা কিছু নিজের দ্বারা পুনর্মিলিত করছিলেন, সেই সমস্ত কিছুকে তিনি নিজের মধ্যেই পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন। কেননা একই প্রেরিতদূত বলেন, এসব কিছু সেই ঈশ্বর থেকেই আগত, যিনি খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঈশ্বরই খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন (ক)। একথাগুলোর সঙ্গে সুসমাচারে ব্যক্ত বিশ্বাসের গোটা রহস্যকে তুলনা কর। যখন খ্রিষ্টকে দেখা হয় তখন যাঁকে দেখা হয়, তাঁর কাজে যিনি কাজ করেন, তাঁর কথায় যিনি কথা বলেন, তিনি তাঁর সাধিত পুনর্মিলনেও পুনর্মিলিত করেন। এজন্যই তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা পুনর্মিলন ঘটে, কারণ পিতা সদৃশ স্বরূপ দ্বারা তাঁর মধ্যে অবস্থান করে তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সাধিত পুনর্মিলন দ্বারা জগৎকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনছিলেন (খ)।

৫২। তাই ঈশ্বর মানব দুর্বলতার খাতিরে অনিশ্চিত ও নগ্ন কথায় বিশ্বাস বিষয়ে শিক্ষা দেননি। যদিও প্রভুর বাণীর অধিকার আপনা আপনিই বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তায় মানুষকে বাধ্য করছিল, তথাপি তিনি স্পষ্ট অর্থযুক্ত প্রকাশ দ্বারা আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যাতে করে, যে ঐক্যের কথা আমরা বলে এসেছি সেই ঐক্যের প্রকৃত কারণ দ্বারাই আমরা একথা উপলব্ধি করতে পারতাম, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’। কেননা তেমনটা বলায় যখন পিতা পুত্রের বাণীর মধ্য দিয়ে কথা বলেন, তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে কাজ করেন, তাঁর বিচারের মধ্য দিয়ে বিচার করেন, তাঁকে দেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখা হতে দেন, তাঁর সাধিত পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে পুনর্মিলিত করেন ও সেই পুত্রকে অবস্থান করেন যিনি নিজেও পিতায় অবস্থান করেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, উভয়ের ঐক্যকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি নিজের শিক্ষাদানে অন্য কোন্ কথা ব্যবহার করতে পারতেন যা আমাদের উপলব্ধি-শক্তির জন্য একথারই চেয়ে আরও বেশি উপযোগী হত যে কথা দ্বারা, [অনন্তকালীন] জন্ম সংক্রান্ত ও স্বরূপের ঐক্য সংক্রান্ত সত্যের মধ্য দিয়ে এমনটা ঘোষিত হয় যে, পুত্র যা কিছু করুন ও বলুন পিতা তা-ই বলেন ও করেন? এই অবস্থা ঈশ্বরের পরকীয় স্বরূপের অবস্থা নয়, বা তাঁর কাছে যুক্ত করা স্বরূপের অবস্থাও নয়, বা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সঞ্জাত স্বরূপের অবস্থাও নয়, বরং এমন অবস্থা যা সিদ্ধ জন্মের মধ্য দিয়ে সিদ্ধতাবিশিষ্ট ঈশ্বর হবার জন্য জনিত ঈশ্বরত্বের সমুচিত অবস্থা, এমন ঈশ্বরত্ব যা নিজের স্বরূপ বিষয়ে এমন আত্মপূর্ণ নিশ্চয়তার অধিকারী যার জন্য তিনি বলেন, আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন (ক), আরও, যা কিছু পিতার, তা সবই আমার (খ)। ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে পুত্র কোন দিকেই অভাবী নন: তাঁর কর্মে, কথায় ও দর্শনে ঈশ্বর কাজ করেন, কথা বলেন ও দৃষ্ট হন। তাঁরা এমন দু’টো ঈশ্বর নন যাঁরা কর্মে বা কথায় বা দর্শনে একমাত্রজনের মত প্রতীয়মান। তিনি একাকী এমন ঈশ্বরও নন যিনি যখন ঈশ্বর কাজ করেন, কথা বলেন ও দৃষ্ট হন তখন ঈশ্বর বলে কাজ করেন, কথা বলেন ও দৃষ্ট হন। মণ্ডলী এইসব উপলব্ধি করে, সমাজগৃহ এইসব বিশ্বাস করে না, তত্ত্ববিদ্যা এইসব জানে না, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা এটা জানে না যে ‘এক থেকে এক’, ‘সমস্ত থেকে সমস্ত’ ও ঈশ্বর ও পুত্র হওয়ায় খ্রিস্ট নিজের জন্ম দ্বারা পিতাকে তাঁর পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত করেননি ও জন্মসূত্রে

[ঈশ্বরত্বের] এই পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হননি। এবং যে কেউ অবিশ্বাসের এই মূৰ্খতায় ধরা পড়বে, সে হয় ইহুদীদের, না হয় বিজাতীয়দের অনুসারী।

৫৩। তবে, যখন প্রভু বলেন, ‘যা কিছু পিতার, তা সবই আমার’, তখন তুমি যেন তাঁর এই উক্তি বুঝতে পার, তবে প্রেরিতদূতের শিক্ষা ও বিশ্বাস শিখে নাও যখন তিনি বলেন, দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিষ্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে (ক)। যে কেউ খ্রিষ্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে চিনে নেয় না, যে কেউ তাঁর মধ্যে বিরাজিত ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বিষয়ে অজ্ঞ, সে জগৎ থেকে উদ্ধৃত, মানবীয় শিক্ষায় ভোগে ও তত্ত্ববিদ্যার শিকার। মানুষের মন যা বোঝে তা-ই মাত্র চিনে নেয়, ও জগৎ তা-ই বিশ্বাস করে যা উপলব্ধি করতে পারে যেহেতু দৈহিক বিষয়াদি সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে তা-ই মাত্র সম্ভব বলে বিবেচনা করে যা সে নিজে দেখে ও করে। কেননা জগতের পদার্থগুলো শূন্য থেকে অস্তিত্ব পেল, কিন্তু খ্রিষ্ট যা অস্তিত্বশীল নয় তা থেকে অস্তিত্ব পাননি, অস্তিত্বশীল হতেও শুরু করেননি, বরং আদি থেকে এমন আদি ধারণ করেছেন যা অনন্তকালীন। কেননা জগতের পদার্থগুলো, হয় নিষ্প্রাণ, না হয় প্রাণী হয়ে গেল, কিন্তু খ্রিষ্ট স্বয়ং জীবন, তিনি জীবনময় ঈশ্বর থেকে জীবনময় ঈশ্বর বলে সঞ্জাত। জগতের পদার্থগুলো ঈশ্বর দ্বারা নির্দিষ্ট, কিন্তু সেগুলো ঈশ্বর নয়; কিন্তু ঈশ্বর যা, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর হওয়ায় খ্রিষ্ট নিজেই সম্পূর্ণরূপে তা। জগতের পদার্থগুলো সীমাবদ্ধ হওয়ায় সীমাবদ্ধ না হবার জন্য নিজেদের সীমা অতিক্রম করতে পারে না; কিন্তু খ্রিষ্ট রহস্যময় ভাবে নিজেতে ঈশ্বরকে ধারণ করলেও তথাপি তিনি নিজে ঈশ্বরে আছেন। জগতের পদার্থগুলো যখন নিজ নিজ প্রজাতির জীবনের জন্য নিজ নিজ থেকে প্রজনন করে, তখন নিজ নিজ দৈহিক গতির ফলে নিজ নিজ থেকে জীবন উৎপন্ন করে, কিন্তু যে প্রাণীগুলো জন্ম নেয় সেগুলোতে তারা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়; কিন্তু ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপেই খ্রিষ্টে বিরাজিত।

৫৪। তবে আমি জিজ্ঞাসা করি : কার ঈশ্বরত্ব তাঁর মধ্যে বিরাজিত? একমাত্র ঈশ্বরের হে মিথ্যা প্রচারক, সেই পূর্ণতা পিতার ঐশ্বরিক পূর্ণতা না হলে তবে তুমি অন্য কোন্ ঈশ্বরকে আমার এখানে আনতে পার যাঁর ঈশ্বরত্ব নিজের পূর্ণতায় খ্রিষ্টে বসবাস করবে? কিন্তু সেই পূর্ণতা পিতারই পূর্ণতা হলে তবে আমাকে বোঝাও এই পূর্ণতা কেমন করে তাঁর মধ্যে দেহগতরূপে বসবাস করে। কেননা যদি তুমি এমনটা ধর যে পিতা দৈহিক ভাবে পুত্রতে বসবাস করেন, তাহলে, যেহেতু পিতা পুত্রতে বসবাস করেন সেজন্য তিনি নিজেতে অস্তিত্বশীল হবেন না। অন্যদিকে, এবং এটা অধিকতর ভাবে যুক্তিসঙ্গত কথা, যে ঈশ্বরত্ব দেহগতরূপে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, সেই ঈশ্বরত্ব যদি তাঁর মধ্যে ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’ অনুযায়ী সত্যকার স্বরূপকে দেখায়—কেননা ঈশ্বর তাঁর মধ্যে প্রসন্নতার খাতিরেও নয়, ইচ্ছাক্রমেও নয়, কিন্তু প্রজননের মধ্য দিয়েই বিরাজ করেন, ও তিনি নিজে যেমন, ঠিক সেইভাবেই তিনি দেহগত পূর্ণতায় প্রকৃত ও সমস্তই বলে বসবাস করেন; আরও, তাঁর সমস্ত সত্তা তাঁর ঐশ্বরিক জন্মের গুণে ঈশ্বরত্বের উদ্দেশে সঞ্জাত, এবং ঈশ্বর এমন কিছু নন যা তা থেকে ভিন্ন ও অসদৃশ যা খ্রিষ্টে দেহগতরূপে বসবাস করে, ও যা কিছু দেহগতরূপে তাঁর মধ্যে বসবাস করে তা সমস্তই ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় বসবাস করে—তাহলে তুমি কেন মানবীয় শিক্ষা অনুসরণ কর? কেন অসার প্রতারণার শিক্ষায় নিজেকে জড়াও? কেন আমাকে ‘সমতাব’, ‘মনের মিল’ ও ‘সৃষ্টজীব’ কথাগুলো শোনাও? ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা খ্রিষ্টে দেহগতরূপেই বিরাজ করে।

৫৫। তবে, এক্ষেত্রেও প্রেরিতদূত, এটা শিখিয়ে দিয়ে যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা খ্রিষ্টে দেহগতরূপেই বসবাস করে, নিজের বিশ্বাসের নিয়ম পালন করেছেন। তিনি অভিপ্রায় করছিলেন পাছে বিশ্বাসের শিক্ষা ব্যক্তিদ্বয়ের ঐক্য অভক্তিময় স্বীকারোক্তিতে বিচ্ছোরিত হয়। কেননা ঈশ্বরত্বের যে পূর্ণতা খ্রিষ্টে দেহগতরূপে বসবাস করে, তা একাকীও নয়, বিচ্ছেদ্যও নয়, যেহেতু দেহগত পূর্ণতা এমনটা মানে না যে তাকে দেহগত পূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোক, এবং বসবাসকারী ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরত্বের বসবাসও বলে গণ্য হতে পারে না। এবং খ্রিষ্ট এমন যে, ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা তাঁর মধ্যে দেহগতরূপেই বসবাস করে; আরও, খ্রিষ্টে দেহগতরূপে বসবাসকারী ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা এমন যে তাঁর মধ্যে বসবাসকারী পূর্ণতা খ্রিষ্ট ছাড়া অন্য কিছ বলে উপলব্ধ হওয়ার নয়। তোমার বকাবকির

জন্য যত খুশিই অজুহাত ধর, তোমার অভ্যস্তিময় বুদ্ধির হুল ধারালো করে তোল। অন্তত সেই কাল্পনিক জীবের নাম বল যার ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা খ্রিষ্টে দেহগতরূপে বসবাস করে। কেননা তিনি হলেন খ্রিষ্ট, ও ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা তাঁরই মধ্যে দেহগতরূপে বসবাস করে।

৫৬। এবং যদি তুমি জানতে ইচ্ছা কর সেই ‘দেহগতরূপে বসবাস করা’ যে কি, তাহলে এমন একজনের মধ্যে থেকে কথা বলা যে কথা বলে, এমন একজনের মধ্যে থেকে দৃষ্ট হওয়া যে দৃষ্ট, এমন একজনের মধ্যে থেকে কাজ করা যে কাজ করে, ঈশ্বরে ঈশ্বর হওয়া, সমস্ত থেকে সমস্ত, এক থেকে এক, এসবই বুঝতে চেষ্টা কর। এবং এইভাবে ‘দেহগতরূপে ঈশ্বরের পূর্ণতা’ এর অর্থ বুঝে নাও। এটাও মনে রেখ যে, যে ঈশ্বরত্ব খ্রিষ্টে দেহগতরূপে সম্পূর্ণভাবে বসবাস করে, সেই ঈশ্বরত্ব যে কার, সেবিষয়ে প্রেরিতদূত নীরব থাকেন না, কেননা তিনি বলেন, তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে (ক)। সুতরাং, পিতার ঈশ্বরত্বই খ্রিষ্টে দেহগতরূপে বিরাজ করে, আংশিক ভাবে নয় কিন্তু সমস্তই, সীমিত মাত্রায় নয় কিন্তু পূর্ণ মাত্রায়; এবং সেই ঈশ্বরত্ব এমনভাবে দেহগতরূপে অবস্থান করে যার ফলে উভয়ই [পিতা ও পুত্র] এক; হ্যাঁ, উভয় এমন ঐক্য যে, ঈশ্বর ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নন [অর্থাৎ, একমাত্র ঈশ্বরত্বে পিতা ও পুত্র ভিন্ন নন], ঈশ্বরত্বে একে অন্যের সঙ্গে এমন সমান যে, সিদ্ধতাবিশিষ্ট জন্ম সিদ্ধতাবিশিষ্ট ঈশ্বরকে উদ্ভূত করল। এইভাবে জন্মটা নিজের সিদ্ধতায় অস্তিত্বশীল, কেননা ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ঈশ্বরে দেহগতরূপে বসবাস করে।

১ (ক) তীত ১:৯-১০ দ্রঃ। পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে স্বরূপের ঐক্য রয়েছে, তা প্রমাণ করতে উদ্যত হয়ে সাধু হিলারিউস বাস্তব ক্ষেত্রে একটা অপরিহার্য ও জরুরী একটা দাবি অনুভব করেন যা উল্লিখিত বচনে সুন্দরভাবে ব্যক্ত: ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে সত্য প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেটা জানা, শেখানো ও রক্ষা করাও একান্ত দরকার। এর ফলে এ লক্ষ্যে এমন সেবাকর্মী দরকার যারা অনিন্দনীয় জীবন যাপনে ও যথার্থ প্রচার কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। এইভাবে সাধু হিলারিউস আগ্নেয় পালকের আদর্শ চিত্রিত করেন।

(খ) তীত ২:৭-৮।

(গ) ১ তি ২:১৭।

২ (ক) ‘ঈশ্বর ও ঈশ্বর’, অর্থাৎ একাকী কোন ঈশ্বর নেই। এটা ছিল ৪র্থ পুস্তকের বিষয়বস্তু।

(খ) ৫ম পুস্তক দ্রঃ।

(গ) ৬ষ্ঠ পুস্তক দ্রঃ।

(ঘ) ৭ম পুস্তক দ্রঃ।

৩ (ক) ৩য় পুস্তক ৮ অধ্যায় দ্রঃ।

৪ (ক) যোহন ১০:৩০।

(খ) যোহন ১৪:৭।

(গ) যোহন ১৪:৯।

(ঘ) যোহন ১৪:১০।

(ঙ) যোহন ১৪:১১।

৫ (ক) প্রেরিত ৪:২১।

(খ) ১ করি ৩:৮।

(গ) যোহন ১৭:২০-২১।

৭ (ক) এফে ৪:৪-৫ দ্রঃ।

৮ (ক) গা ৩:২৭-২৮।

১২ (ক) যোহন ১৭:২১।

(খ) যোহন ১৭:২২।

(গ) যোহন ১৭:২২।

১৩ (ক) যোহন ১:১৪ দ্রঃ।

(খ) ‘স্বরূপের ঐক্যই’: খ্রিষ্ট মাংসধারণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মাংস আপন করে নেন ও তাঁর নিজের মাংসকে আমাদের দান করেন সেই এউখারিস্তিয়ার মধ্য দিয়ে যা হলো খ্রিষ্টের সঙ্গে, ও খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে পিতারও সঙ্গে আমাদের সিদ্ধ ঐক্যের সাক্ষ্যমন্ত ও বন্ধন: এসব কিছু ফলাফল হলো স্বরূপের প্রকৃত ঐক্য।

১৪ (ক) যোহন ৬:৫৫-৫৬।

(খ) ‘আমাদের বিশ্বাস’ অর্থাৎ মন্ডলীর বিশ্বাস। সাধু হিলারিউসের মতে বাইবেল-ব্যাখ্যা স্বয়ং খ্রিস্টের বাণীর উপরে স্থাপিত হওয়া চাই, ও খ্রিস্টের বাণী মন্ডলীর স্থির করা অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করা চাই।

১৫ (ক) যোহন ১৪:১৯-২০ দ্রঃ।

(খ) আমরা খ্রিস্টের মধ্যে স্বরূপগত ভাবে রয়েছি যেহেতু তিনিও আমাদের মধ্যে স্বরূপগত ভাবে রয়েছেন : এমনটা ঘটে এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্টের গুণে।

১৬ (ক) যোহন ৬:৫৬।

(খ) যোহন ৬:৫৭।

১৭ (ক) বলতে গেলে, খ্রিস্টের ত্রিবিধ দেহ রয়েছে : কুমারী থেকে নেওয়া দেহ ; এউখারিস্তিয়ায় পাওয়া সাক্রামেন্টীয় দেহ ; ও সেই গৌরবময় দেহ যে দেহের তিনি স্বর্গেই অধিকারী।

১৯ (ক) যোহন ১৫:২৬।

(খ) ‘একই স্বরূপের এক ব্যক্তির বহির্গমন’ : এখানে ‘বহির্গমন’ শব্দের মধ্য দিয়ে, যে ব্যক্তি বের হয় তাকে সেই ব্যক্তি থেকে চিহ্নিত করা হয় যার কাছ থেকে সেই ব্যক্তি বের হয়। এটা সেকালের কৃষ্টি অনুযায়ী ধারণা যা আমাদের কাছে তত বোধগম্য নাও হতে পারে। যাই হোক, সাধু হিলারিউস একই বিষয় ৪র্থ পুস্তক ৩১ অধ্যায় ও ১২শ পুস্তক ৫৪ অধ্যায়ে আলোচনা করেন।

২০ (ক) এখানে (বিশেষভাবে একটু নিচে) পবিত্র আত্মার ‘বের হয়ে এগিয়ে চলা’ বিষয় নির্দেশিত ; সাধু হিলারিউসের সময়ে মন্ডলী এবিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। পরবর্তীকালে মন্ডলী এক্ষেত্রে ‘περιχώρησις’ (পেরিখোরেসিস ; লাতিন ভাষায় ‘circumincessio’, কির্কুমিন্কেসিও) তত্ত্ব উপস্থাপন করবে ; গ্রীক শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা নিজেদের মধ্যে অবিরত পারস্পরিক ঘোরাঘুরি বা গমনাগমন করে থাকেন ; লাতিন শব্দের অর্থ হলো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার অবিরত পারস্পরিক গমনাগমন। প্রাচীন শব্দ দু’টো এটা তুলে ধরতে অভিপ্রেত যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা অবিরত পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ।

(খ) যোহন ১৬:১২-১৫।

(গ) যোহন ১৭:১০।

২১ (ক) রো ৮:৯-১২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ঈশ্বরের আত্মা হলেন পিতার আত্মা, খ্রিস্টের আত্মা হলেন পুত্রের আত্মা : যখন পিতার ও পুত্রের আত্মা একই, তখন তাঁদের স্বরূপও এক।

২২ (ক) সাধু হিলারিউস আরিউসপন্থীদের সামনে এ প্রশ্ন রাখেন : ‘ঈশ্বরের আত্মা’ সংজ্ঞাটা কি পিতার স্বরূপকে নির্দেশ করে? নাকি সংজ্ঞাটা এমন কিছু নির্দেশ করে যা পিতার একই স্বরূপের অধিকারী হয়েও তবু পিতা থেকে ভিন্ন? ২য় পুস্তকে ৩২ অধ্যায়ে তিনি এটা বলেছিলেন যে, সেই পবিত্র আত্মা একটা কথা, ও যাঁর আত্মার যিনি অধিকারী ও অধিকার সেই তিনি আলাদা কথা। তাসত্ত্বেও, যেই ব্যাখ্যা বেছে নেওয়া হোক না কেন এটা থেকে যায় যে, পিতা ও পুত্র একমাত্র স্বরূপের অধিকারী, কারণ পিতার ও পুত্রের আত্মা এক ও একই।

২৩ (ক) লুক ৪:১৮ দ্রঃ।

(খ) মথি ১২:১৮।

(গ) মথি ১২:২৮।

২৫ (ক) লুক ৩:২২।

(খ) প্রেরিত ২:১৬-১৭ লাতিন পাঠ্য।

২৭ (ক) যোহন ১৪:২৩।

২৮ (ক) যোহন ১০:৩০।

(খ) ১ করি ১২:৩ দ্রঃ।

(গ) এখান থেকে ৩৫ অধ্যায় পর্যন্ত সাধু হিলারিউস এটা প্রমাণ করেন যে, পিতা ও পুত্র আলাদা ব্যক্তি কিন্তু উভয় হলেন এক আত্মা ও এক ঈশ্বরত্ব; এ ঈশ্বরত্বের অধিকার ও স্বরূপ তার দানগুলো দ্বারা প্রকাশিত।

২৯ (ক) ১ করি ১২:৪-৭।

(খ) ১ করি ১২:৮-১১।

৩০ (ক) প্রেরিত ১:৪-৫।

(খ) প্রেরিত ১:৮।

(গ) নবীয় ভাষা ও ভাববাণী আলাদা জিনিস; কেননা নবীয় ভাষা বলতে বাইবেল জ্ঞান বোঝায় ও ভক্তদের শিক্ষাদানও বোঝায়।

৩১ (ক) ১ করি ১২:১১।

(খ) ত্রিত্ব সম্পর্কে সাধু হিলারিউসের ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কেননা তাঁর মতে সক্রিয় দু’টো ব্যক্তি রয়েছেন ও সেই ব্যক্তি দু’টো ‘আত্মা’ একক নামে অন্তর্ভুক্ত। সঠিক ব্যাখ্যার জন্য উপরে ৪৬ টীকা দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১২:৬ দ্রঃ। সাধু পলের এ যুক্তি বুঝবার জন্য তাঁর এ আগের বচন মনে রাখা দরকার, ‘বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক’। তবেই স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, পিতাই ঈশ্বর, ও পুত্রই প্রভু।

৩২ (ক) ১ করি ১২:১২।

৩৩ (ক) ১ করি ১২:২৭-২৮ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১২:২৮ দ্রঃ।

(গ) এফে ৪:৭।

(ঘ) এফে ৪:১০-১২ দ্রঃ।

৩৪ (ক) ১ করি ৮:৬।

(খ) এফে ৪:৬।

(গ) যোহন ৬:৪০।

৩৭ (ক) রো ৯:৫।

৩৮ (ক) রো ১১:৩৩ দ্রঃ।

(খ) রো ১১:৩৬।

৪২ (ক) যোহন ৬:২৭-২৯।

৪৪ (ক) যোহন ৬:২৭।

৪৫ (ক) ফিলি ২:৬-৭ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) ‘ঈশ্বর নিজের মুদ্রাঙ্কনে যাকে চিহ্নিত করেছেন তিনি হলেন ঈশ্বরের রূপে অবস্থানকারী ঈশ্বর’: সাধু হিলারিউস ও সেকালের মণ্ডলীর যে পিতৃগণ আরিউসের ভ্রান্তমত খণ্ডন করতে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের ভাষায় ‘ঈশ্বরের রূপ’-ই ছিল সত্যকার ও প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ (২ করি ৪:৪; কল ১:১৫; হিব্রু ১:৩ ইত্যাদি দ্রঃ)।

৪৬ (ক) ফিলি ২:১০-১১।

৪৮ (ক) যোহন ১৪:৯।

(খ) কল ১:১৫।

৪৯ (ক) যোহন ১০:৩৭।

(খ) কল ১:১৫-২০।

৫০ (ক) ‘যখন তিনি প্রতিমূর্তি, তখন তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি’, এর ফলে তিনি ঈশ্বরের স্বরূপেরও সহভাগী।

৫১ (ক) ২ করি ৫:১৮-১৯।

(খ) ‘পিতা ... তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সাধিত পুনর্মিলন দ্বারা জগৎকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনছিলেন’: সাধু হিলারিউস ‘তাঁর মধ্য দিয়ে’ ও ‘তাঁর মধ্যে’ উক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করেন: ‘তাঁর মধ্যে’ শব্দটা পিতা ও পুত্রের স্বরূপের ঐক্যকে নির্দেশ করে; ‘তাঁর মধ্য দিয়ে’ শব্দটা পিতা ও পুত্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করে।

৫২ (ক) যোহন ১৪:১১।

(খ) যোহন ১৬:১৫।

৫৩ (ক) কল ২:৮-৯। ‘মানবীয় ঐতিহ্য’ হলো ‘প্রৈরিতিক ঐতিহ্যের’ (বা খ্রিস্টবিশ্বাসের পরম্পরার) বিপরীত।

৫৬ (ক) রো ১:২০।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

৯ম পুস্তক

এই ৯ম পুস্তক আগের পুস্তকে আলোচিত বিষয়সমূহ ও খণ্ডন করা প্রতিবাদগুলো পুনরায় উপস্থাপন করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১		
৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১		
৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫								

১। আগেকার পুস্তকে আমরা পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের অভিন্ন স্বরূপের কথা বলেছি ও এটা প্রমাণ করেছি যে, আমি এবং পিতা, আমরা এক (ক) বচনটা একাকী এমন ঈশ্বরকে নয়, কিন্তু প্রজননের ফলে অবিচ্ছেদ্য একমাত্র ঈশ্বরকে প্রমাণ করার জন্য উপনীত করে (খ)। কেননা ঈশ্বর থেকে ছাড়া ঈশ্বর অন্য কারও থেকে সঞ্জাত হতে পারেননি, এবং ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর যিনি, তিনি ঐশ্বরিক সত্তা না হয়ে পারেন না। আমরা ঈশ্বর ও প্রেরিতদূতদের সেই সাক্ষ্যসমূহ (যদিও সবগুলো নয় তবু আমাদের জ্ঞান আলোকিত করার জন্য যতগুলো যথেষ্ট ততগুলো) পরিদর্শন করেছি যা দ্বারা পিতা ও পুত্রের অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ ও অধিকার প্রমাণিত; এবং সেইভাবে প্রেরিতদূতের শিক্ষায় সেই বচনে এসে পৌঁছেছি যেখানে তিনি বলেন, দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিস্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে (গ)। আমরা এমনটা দেখিয়েছি যে ‘তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে’ বাক্যটা এমন ঈশ্বরকে লক্ষ করে যিনি

সত্যকার, সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও পিতার স্বরূপের সহভাগী ; কিন্তু এমনটা করায় আমরা তাঁকে পিতা থেকে বিচ্ছিন্নও করিনি, পিতার সঙ্গে একীভূতও করিনি । একদিকে, অশরীরী ঈশ্বর যে দেহগতরূপে খ্রিষ্টে বসবাস করেন, তা এটা শেখায় যে, ঈশ্বর থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত ঈশ্বর বলে পুত্র হলেন ঈশ্বরের একই স্বরূপের অধিকারী ; অন্যদিকে, ঈশ্বর যে খ্রিষ্টে বসবাস করেন, তা খ্রিষ্টের মধ্যে সেই বসবাসকারী ঈশ্বরে ব্যক্তিময় খ্রিষ্টের জন্ম ব্যক্ত করে । সুতরাং, আমার মতে আমি তাদেরই উত্তর দেবার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছি যারা অভক্তি ভরে প্রভুর এ বাণীগুলোতে ইচ্ছার সম্ভাব ও মনের মিল আরোপ করে, তথা, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (৬), আরও, পিতা আমাতে আছেন ও আমি পিতাতে আছি (৭) ; আরও, আমি এবং পিতা, আমরা এক', আরও, 'যা কিছু পিতার, তা সবই আমার (৮) । শাস্ত্রের বাণীকে অস্বীকার করতে সাহস না ক'রে ভ্রান্তিজনক শিক্ষায় স্থাপিত তাদের মিথ্যা ধর্ম কথাগুলোর অর্থ বিকৃত করতে চেষ্টা করে, এবং যেখানে স্বরূপের ঐক্য ঘোষিত যেহেতু সেখানে ইচ্ছার মিল অস্বীকৃত হতে পারে না, সেজন্য [অনন্তকালীন] জন্মের ফল যে ঐক্য, তা বাতিল করার লক্ষ্যে [ভ্রান্তমতপন্থীরা] ঘোষণা করে যে, ব্যাপারটা পারস্পরিক সম্ভাবের ব্যাপার মাত্র । কিন্তু যেহেতু ধন্য প্রেরিতদূত, খ্রিষ্টের সত্যকার ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ে অস্পষ্ট নয় এমন বহু ঘোষণার পর, আমাদের জানান যে, সেই খ্রিষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, সেজন্য যত অভক্তিময় দুঃসাহস জনিত ঘোষণা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় ; কেননা অশরীরী ঈশ্বর যে দেহগতরূপে খ্রিষ্টে বসবাস করেন, তা উভয়ের [তথা, পিতা ও পুত্রের] স্বরূপের ঐক্য ব্যক্ত করে । সুতরাং, পুত্র যে একা নন কিন্তু পিতা তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন, এমনকি পিতা যে অবস্থান করেন তা শুধু নয় কিন্তু তিনি যে কাজ করেন ও কথা বলেন, এমনকি তিনি যে কাজ করেন ও কথা বলেন তা শুধু নয় কিন্তু তিনি যে দৃষ্টও হন, এসমস্ত কিছু কথার ব্যাপার নয় বরং বাস্তবই একটা সত্য ; কেননা [অনন্তকালীন] জন্ম-রহস্যের ফলে তাঁর পরাক্রম হয়ে ওঠে পিতারই পরাক্রম, তাঁর অধিকার হয়ে ওঠে পিতার অধিকার, তাঁর স্বরূপ হয়ে ওঠে পিতার স্বরূপ । সেই [অনন্তকালীন] জন্মের ফলে তাঁর নিজের স্বরূপ সেই সবকিছুর অধিকারী যা পিতার, ও পিতার প্রতিমূর্তি বলে তিনি পিতা থেকে সেই সমস্ত কিছু প্রতিফলিত করেন যা পিতাতে রয়েছে, কারণ তিনি নিজের প্রণেতার

প্রতিমূর্তি ও সত্যকার সত্তা, কেননা সিদ্ধ জন্ম সিদ্ধ প্রতিমূর্তিকে জন্মায় ও ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা তাঁর মধ্যে দেহগতরূপে বসবাস করে বলে তিনি তাঁর সত্যকার স্বরূপকে [অর্থাৎ পিতার ঈশ্বরত্বকে] অর্জন করেন।

২। ব্যাপারটা ঠিক তাই যেইভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা যিনি স্বরূপে ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, ঈশ্বর যে স্বরূপের অধিকারী, তাঁর জন্মে তিনি অবশ্যই সেই স্বরূপের অধিকারী না হয়ে পারেন না, ও জীবনময় স্বরূপের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যও জীবনময় স্বরূপের জন্ম দ্বারা বিভক্ত হতে পারে না। তথাপি ভ্রান্তমতপন্থীরা সুসমাচারের বিশ্বাসের পরিব্রাজনাদায়ী স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে সত্যকে বিনাশ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে এগিয়ে চলে যার ফলে পুত্রকে স্বরূপের ঐক্য-বঞ্চিত করে, কারণ, এক নির্দিষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে উচ্চারিত কথাগুলোকে অন্য অর্থ ও উদ্দেশ্য বহন করতে বিকৃত করে। এর ফলে, তারা যখন ঈশ্বরের পুত্রকে অস্বীকার করতে চায় তখন তাঁর এই বাণীর অধিকার উপস্থাপন করে তথা, আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয় (ক)। এইভাবে, তাদের মতে, যেহেতু তাঁর সেই বাণী একমাত্র ঈশ্বরকে ঘোষণা করে, সেজন্য সেসময় থেকে যা কিছু ‘ঈশ্বর’ নাম বহন করবে তা ঈশ্বরের স্বরূপের আর অধিকারী হবে না কারণ ঈশ্বর এক। এবং তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর এর জন্য নয় বরং নামেই মাত্র ঈশ্বর বলে অভিহিত, তাদের এই অভিমত তারা এই কথার ভিত্তিতেই সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তথা, এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে জানবে (খ); এবং তাঁকে সত্যকার ঈশ্বরত্বের অধিকার-বঞ্চিত করার জন্য তারা এই বচনকেও যোগ করে, নিজে থেকে পুত্র কিছুই করতে পারেন না: তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন (গ)। তারা এই বচনকেও ব্যবহার করে, পিতা আমার চেয়ে মহান (ঘ)। অবশেষে, কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—একাই পিতাই জানেন (ঙ) তারা যখন এই বচন বলতে থাকে, তখন তারা যা অস্বীকার করে, সেই ঈশ্বরত্বের অখণ্ডনীয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর বিশ্বাসকে উল্টিয়ে দিয়েছে বলে গর্ব করে। তাদের মতে, অজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা যে স্বরূপকে ভিন্ন করে, জন্মটা সেই স্বরূপকে [ঐশ্বরিক] সমতার পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে না। পিতার জ্ঞান ও পুত্রের অজ্ঞতা

ঈশ্বরত্বের বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করে, কেননা কোন বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া ঈশ্বরের পক্ষে চলবে না, এবং অজ্ঞকে জ্ঞানপ্রাপ্তজনের সঙ্গে তুলনা করাও চলবে না। কিন্তু এসমস্ত কিছু যুক্তিসঙ্গত ভাবে উপলব্ধি না করে, অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে বিচার-বিবেচনা না করে, সুসমাচারের রহস্যাদির শিক্ষা গ্রহণ না করে, সঠিক অর্থ অনুসারে কথাগুলো না বুঝে ভ্রান্তমতপন্থীরা মূর্খ ও রূঢ় ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ঈশ্বরত্বের স্বরূপের বিরুদ্ধে কথা বলে; এতে তারা অজ্ঞদের কান ভরাট করার জন্য একক ও অসংলগ্ন বচনগুলো যোগ করে ও বর্ণনার ব্যাখ্যামূলক পরিণতি ও সেটার পূর্বকারণ বিষয়ে নীরব থাকে; অথচ বচনগুলোর অর্থ সেগুলোর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বচনগুলো থেকে অনুসন্ধান করা উচিত।

৩। যেহেতু আমরা অভিপ্রায় করছি, উপরে উল্লিখিত বচনগুলোকে সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের খোদ ঘোষণা দ্বারা ব্যাখ্যা করব, সেজন্য একই বিশ্বাসে আমাদের সহভাগী যারা, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত মনে করি যাতে, যে স্বীকারোক্তিতে জীবনের অনন্ততা রয়েছে, সেই স্বীকারোক্তি হয়ে ওঠে অনন্ততা-জ্ঞান। যিশু খ্রিষ্ট যেমন সত্যকার ঈশ্বর তিনি তেমনি যে সত্যকার মানুষ, যে কেউ এবিষয়ে অজ্ঞ, সে অবশ্যই নিজের জীবন সম্পর্কেও অজ্ঞ। এবং ‘যিশু খ্রিষ্ট যে আত্মা রূপে ঈশ্বর’ ও ‘তিনি যে আমাদের দেহের মাংস’ এমনটা অস্বীকার করা সমান বিপদ: তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব (ক)। ঠিক একথাই উচ্চারণ করছিলেন মানুষ-হওয়া সেই বাণী, ও ঠিক একথাই শেখাছিলেন সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট যিনি ঐশ্বর্যদার প্রভু; তিনি তো মণ্ডলীর পরিত্রাণের জন্য নিজেতেই মধ্যস্থ বলে নিযুক্ত হয়েছিলেন, ও ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে তেমন মধ্যস্থ-রহস্যের গুণে তিনি নিজেতেই ঈশ্বর ও মানুষ। কেননা সেই মধ্যস্থতার লক্ষ্যে সংযুক্ত দু’টো স্বরূপের অধিকারী হওয়ায় তিনি একাধারে উভয় স্বরূপের স্বীয় সত্তার অধিকারী। তথাপি, তিনি উভয় স্বরূপে অবস্থান করতে করতে সেই দু’টো স্বরূপের একটারও অভাবী নন, এবং এইভাবে এমনটা হতে পারে না যে, জন্মের মধ্য দিয়ে মানুষ হওয়ার পর তিনি আর ঈশ্বর নন, ও, একইপ্রকারে [এমনটাও হতে পারে না যে], অনন্তকালীন ঈশ্বর হওয়ায় তিনি আর মানুষও নন। সুতরাং এটাই

হলো মানব সুখ দানকারী সত্যকার বিশ্বাস : ঈশ্বর ও মানুষকে প্রচার করা ও বাণী ও মাংসকে স্বীকার করা ; তিনি মানুষ হওয়ায় তাঁকে ঈশ্বর বলে অস্বীকার না করা, তিনি বাণী হওয়ায় তাঁকে মাংস বলে অস্বীকার না করা ।

৪। তিনি যে মানুষ হয়ে জন্ম নেন ও সেইসঙ্গে ঈশ্বর হয়ে থাকেন, যদিও তা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রকৃতির অতীত ধারণা, তথাপি মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও তিনি যে ঈশ্বর হয়ে থাকেন, তা আমাদের প্রত্যাশার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধারণা নয়। যখন উচ্চতর একটা স্বরূপ নিম্নতর স্বরূপে জন্ম নিয়েছে, তখন এটাও বিশ্বাসযোগ্য যে, নিম্নতর স্বরূপ উচ্চতর স্বরূপে জন্ম নেবে। এবং প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন ও স্বভাব অনুসারে, ঈশ্বর-রহস্য ক্ষেত্রে আমরা সেটার প্রাপ্তির চেয়ে সেটার প্রত্যাশাকেই বেশি অনুভব করি (ক)। কেননা যা কিছু জন্ম নেয়, প্রকৃতি তা বৃদ্ধি করার শক্তি রাখে, কিন্তু তা হ্রাস করার অধিকার রাখে না। গাছ-গাছালি, ফসলাদি ও পশুপাল লক্ষ কর। যুক্তিবিশিষ্ট মানুষকেও লক্ষ কর : সে তো বৃদ্ধিক্রমেই বড় হয়, কিন্তু হ্রাসক্রমে কখনও ছোট হয় না, এবং নিজেতে সে যা বৃদ্ধি করেছে তা কখনও হারায় না। কেননা যদিও সে কালের দরুন ক্ষয় হয় বা মৃত্যুর দরুন বিনষ্ট হয়, তবু সে, হয় কাল-জনিত পরিবর্তনের অধীন হয়, না হয় জীবন-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে স্থিরীকৃত পরিণামে গিয়ে পৌঁছয়, কিন্তু সে যা, তা হওয়া শেষ করার এমন ক্ষমতা রাখে না যাতে করে হ্রাস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে নিজের পুরনো আমি থেকে নতুন একটা আমিকে তৈরি করতে পারে অর্থাৎ কিনা, যাতে করে সে বৃদ্ধ থেকে শিশু হয়। তেমনিভাবে, প্রকৃতির নিয়ম আমাদের মানব স্বভাবের উপর যে অবিরত বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা চাপিয়ে দেয়, তা যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যাশা পোষণ করে যে আমরা উচ্চতর স্বভাবের দিকে বৃদ্ধিশীল হব, কেননা বৃদ্ধি প্রকৃতির অনুরূপ, ও হ্রাস প্রকৃতির বিপরীত। সেজন্য ঈশ্বরের বিষয়ে বৈশিষ্ট্য এটাই যে, তিনি আগে যা ছিলেন তার চেয়ে আলাদা হওয়া, কিন্তু আগে যা সবসময় ছিলেন তা হওয়া শেষ না করা, অর্থাৎ মানব গর্ভে ঈশ্বর বলে জন্ম নেওয়া ও সেইসঙ্গে ঈশ্বর হওয়া শেষ না করা ; গর্ভ, দোলনা ও শিশুকালের সীমায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করা ও সেইসঙ্গে ঈশ্বরের স্বীয় পরাক্রম থেকে দূরে সরে না যাওয়া, এটাই ঈশ্বরের বিষয়ে বৈশিষ্ট্য। এটা তাঁর জন্য রহস্য নয়, আমাদেরই জন্য রহস্য (খ)। আমাদের মানব স্বরূপ ধারণ তাঁর

পক্ষে বৃদ্ধি নয়, কিন্তু নিজেকে অবনমিত করার তাঁর যে মঙ্গল-ইচ্ছা তা আমাদের পক্ষে বৃদ্ধি, কেননা তিনি নিজের ঈশ্বরত্বকে হারান না ও মানুষকে ঈশ্বর হওয়ার সুযোগ মঞ্জুর করেন।

৫। অতএব, যিনি মানুষ বলে কুমারী থেকে সঞ্জাত ও কালের পূর্ণতায় মানুষকে ঈশ্বরে উন্নীত করার কথা, সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর সুসমাচারের সমস্ত বচনে এই অনুক্রম পালন করলেন, অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র তা বিশ্বাস করতে শেখালেন ও তিনি যে মানবপুত্র তা প্রচার করতে আদেশ করলেন। মানুষ হিসাবে তিনি তা-ই বললেন ও করলেন যা ঈশ্বরের স্বীয়, ও পরে ঈশ্বর হিসাবে তা-ই বললেন ও করলেন যা মানুষের স্বীয়; তথাপি সেই সমস্ত সাক্ষ্যদানের দ্বিবিধ দিক দ্বারা নিজের মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ না করে কখনও কথা বলেননি। যদিও তিনি একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতাকে সবসময় নির্দেশ করলেন ও নিজের সত্যকার [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে নিজেকে একমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী বলে ঘোষণা করলেন, তবু পুত্র হিসাবে তাঁর সম্মানের খাতিরে ও মানুষ হিসাবে তাঁর অবস্থার খাতিরে তিনি নিজেকে পিতা ঈশ্বরের বশীভূত করলেন; কারণ যা কিছু জন্ম নেয় তা অবশ্যই নিজের প্রণেতাকে লক্ষ্য করবে ও সমস্ত মাংস অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে দুর্বল বলে ঘোষণা করবে। এজন্য সরলমনা ও অজ্ঞদের ভোলাবার জন্য ভ্রান্তমতপন্থীরা এ থেকেই অজুহাত নেয়: মানুষ হিসাবে যা তিনি বলেছেন তা তারা ভ্রান্তিময় ভাবে ঐশ্বরিক স্বরূপের দুর্বলতায় উচ্চারিত বলে ভাবে। এবং যেহেতু নিজের উচ্চারিত সমস্ত উক্তি তে তিনি হলেন একমাত্র ও একই ব্যক্তি, সেজন্য তারা এটা সমর্থন করে যে, তিনি যা কিছু বলেছেন, তা তাঁর নিজের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কেই বলেছেন।

৬। নিজের সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে যা এখনও রয়েছে তা যে তাঁর স্বরূপকে নির্দেশ করে, তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি না। কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট যখন মানুষ ও ঈশ্বর, এবং মানুষ হওয়ার ক্ষণেই যে প্রথমবারের মত ঈশ্বর হলেন তা নয়, ও সেইক্ষণে যে তিনি ঈশ্বর হতে শেষ করলেন তাও নয়; আরও, তিনি ঈশ্বরে মানুষ হওয়ার পর যখন তিনি কম সিদ্ধ মানুষও ছিলেন না ও কম সিদ্ধ ঈশ্বরও ছিলেন

না, তখন অবশ্যই এটা দাঁড়ায় যে, তাঁর বাণীগুলোর রহস্য ও তাঁর স্বরূপের রহস্য এক ও একই রহস্য। এবং কাল ক্ষেত্রে, যখন তুমি তাঁর মধ্যে ঈশ্বর থেকে মানুষকে নির্ণয় কর, তখন এসো, ঈশ্বর হিসাবে তাঁর ভাষা থেকে মানুষ হিসাবে তাঁর ভাষাও নির্ণয় করি। এবং যখন তুমি তাঁকে একইসময় ঈশ্বর ও মানুষ স্বীকার কর, তখন একইসময় ঈশ্বর হিসাবে উচ্চারিত তাঁর বাণীগুলো থেকে মানুষ হিসাবে উচ্চারিত বাণীগুলো নির্ণয় কর। এবং তিনি মানুষ ও ঈশ্বর হওয়ার পর যখন তুমি সেই কাল ধর যে কালে সেই সিদ্ধ মানুষ সিদ্ধ ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন, তখন সেই কালকে নির্দেশ করার জন্য যদি এমন কিছু বলা হয়ে থাকে, তাহলে যা বলা হয়ে থাকে তা সেই কালেরই উচ্চারিত কথা বলে মেনে নাও। এইভাবে, তিনি যে মানুষ হওয়ার আগে ঈশ্বর ছিলেন যেহেতু তা একটা জিনিস, ও তিনি যে মানুষ ও ঈশ্বর ছিলেন যেহেতু তা আলাদা জিনিস, এবং মানুষ ও ঈশ্বর হওয়ার পর তিনি যে সিদ্ধ মানুষ ও সিদ্ধ ঈশ্বর হলেন যেহেতু তাও আলাদা জিনিস, সেজন্য নানা কাল ও স্বরূপ-দু'টো সংক্রান্ত ঐশ্বরিক ব্যবস্থা-রহস্যকে তুমি একীভূত করবে না। কেননা, তাঁর ভিন্ন স্বরূপ-দু'টোর বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসারে, আমরা যদি তাঁর মনুষ্যত্ব-রহস্যের কথা ধরি, তাহলে তিনি জন্মের আগে এক ভাবে কথা বললেন, যখন মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত ছিলেন তখন অন্য ভাবে কথা বললেন, এবং অনন্তকালীন অবস্থায় অন্য ভাবেও কথা বললেন।

৭। সুতরাং, আমাদের উপকারার্থে এসমস্ত বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত রেখে ও আমাদের দেহে মানুষ হিসাবে সঞ্জাত হয়ে তিনি আমাদের স্বরূপের স্বভাব অনুসারে কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপের যা স্বীয় তা ভুলে না গিয়েই সেই কথা বলেছেন। তাঁর জন্ম, যজ্ঞাভোগ ও মৃত্যু ক্ষেত্রে তিনি আমাদের স্বরূপের স্বীয় অবস্থা-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন কাটালেন; তথাপি তিনি সমস্ত অবস্থা-পরিস্থিতি তাঁর [ঐশ্বরিক] স্বরূপের পরাক্রম দ্বারাই বহন করলেন, কারণ তিনি নিজেই নিজের জন্মের কারণ, তাঁর পক্ষে যা যজ্ঞাভোগ করা উচিত নয় তা ভোগ করতে ইচ্ছা করেন, ও জীবন যিনি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবং ঈশ্বর এসমস্ত কিছু করেন মানুষের মধ্য দিয়েই শুধু নয়—কেননা তাঁর জন্ম, যজ্ঞাভোগ ও মৃত্যুতে মানবস্বরূপের সঙ্গে তাঁর বাস্তব সহভাগিতা প্রদর্শিত—, কিন্তু মানুষ হিসাবেও এসমস্ত কিছু করেন, কারণ তিনি সত্যিকারে জন্ম নিলেন,

যজ্ঞগাভোগ করলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন। তবে এসমস্ত কিছু হলো জগৎপত্তনের পূর্বেও স্থিরীকৃত স্বর্গীয় গুপ্ত সঙ্কল্পগুলোর রহস্যাদি, অর্থাৎ, যেহেতু মানুষ অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরে জীবনযাপন করার জন্য নিরুপিত, সেজন্য একমাত্র জনিত ঈশ্বর মানুষ বলে জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন; যেহেতু ঈশ্বর আমাদের দুর্বলতা আপন করে নিলেন, সেজন্য ঈশ্বর যজ্ঞগাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন যাতে দিয়াবল মানব দুর্বলতা-বিশিষ্ট ভাবাবেগ দ্বারা কর্মরত থেকে আমাদের মধ্যে পাপের বিধান বলবৎ না রাখে; ঈশ্বর মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করলেন যাতে, অমর ঈশ্বর মৃত্যুর বিধান নিজের অধীনে বশীভূত করার পর, যেন কোন না কোন দুঃসাহসী প্রভাব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মাথা উচু করতে বা তাঁর বিরুদ্ধে স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাকৃতিক প্রতাপ ব্যবহার করতে দুঃসাহস না করে। সেজন্য ঈশ্বর আমাদের মানবস্বরূপ ধারণ করার লক্ষ্যে জন্ম নেন, পরে নিরপরাধিতা আমাদের ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে যজ্ঞগাভোগ করেন, অবশেষে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেবার লক্ষ্যে মৃত্যুবরণ করেন। কেননা আমাদের মনুষ্যত্ব অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরে জীবনযাপন করে, ও আমাদের দুর্বলতার ভাবাবেগ ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে মিলিত, ও আমাদের মাংসের জয়যাত্রায় অনিষ্টের ও শঠতার আত্মিক প্রতাপগুলো বশীভূত, কারণ ঈশ্বর মাংসের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৮। সুতরাং, যিনি এই রহস্য জানতেন ও স্বয়ং প্রভু থেকেই বিশ্বাস-জ্ঞান গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রেরিতদূত যেহেতু এবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না যে, জগৎ বা মানবজাতিও বা তত্ত্ববিদ্যাও তাঁকে উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল, সেজন্য বললেন, দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিস্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মাথা (ক)। তাই, ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা যে দেহগতরূপে তাঁর মধ্যে অবস্থান করে একথা ব্যক্ত করার পর তিনি অবিলম্বেই আমাদের [মানবস্বরূপ] ধারণ-রহস্যকে যোগ করে এই কথা লিখেছিলেন, ‘তোমরা তো তাঁরই মধ্যে নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর’। যেমন ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বিরাজিত, তেমনি আমরাও তাঁর মধ্যে নিজেদের পূর্ণতা লাভ করি। তিনি তো

এমনি ‘তোমরা নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর’ বলেন না, কিন্তু বলেন, ‘তোমরা তাঁরই মধ্যে নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর’। কেননা, বিশ্বাস-জনিত প্রত্যাশা দ্বারা যারা অনন্ত জীবনে নবজন্ম লাভ করেছে বা লাভ করবে, তারা সবাই এখনই খ্রিস্টের দেহে বিরাজিত। পরে তারা তাঁর মধ্যে নয়, নিজেদেরই মধ্যে সেই পূর্ণতা লাভ করবে সেই সময়ে যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক’রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন (খ)। তবে, আমরা এখনই তাঁর মধ্যে নিজেদের পূর্ণতা লাভ করি, অর্থাৎ তাঁরই মাংস ধারণের মধ্য দিয়ে যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে। তাঁর মধ্যে আমাদের এই প্রত্যাশা কম অধিকার রাখে না। কেননা তাঁর মধ্যে নিজেদের পূর্ণতা লাভ করাটা হলো সমস্ত প্রতাপের মূল উৎস, যেভাবে এবচনে ব্যক্ত, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়, ও প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, পিতা ঈশ্বরের গৌরবে যিশুই প্রভু (গ)। তবে স্বীকারোক্তি এটাই হবে, যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে বিদ্যমান, ও মানুষে সঞ্জাত হয়ে এখন আমাদের দুর্বল দেহে আর অবস্থান করবেন না, ঐশ্বরিক গৌরবেই অবস্থান করবেন। এবং প্রতিটি জিহ্বা এই সত্য স্বীকার করবে। কিন্তু, যদিও স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত জানু [তাঁর নামে] আনত হয়, তবু তিনিই যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের শীর্ষপদের অধিকারী, কারণ সমস্ত বিশ্ব জানু আনত করায় তাঁরই অধীনে বশীভূত যাঁর পূর্ণতা আমরা লাভ করি, যিনি তাঁর মধ্যে দেহগতরূপে বসবাসকারী ঈশ্বরত্বের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের গৌরবে স্বীকার্য।

৯। তবে, খ্রিস্টের স্বরূপ ও আমাদের মনুষ্যত্ব-ধারণ সংক্রান্ত রহস্য প্রদর্শন করার পর —কেননা তাঁর মধ্যে আমরা সেই ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা লাভ করি যা বিষয়ে তিনি মানুষ বলে জন্মলাভের মধ্য দিয়ে অধিকার রাখেন—প্রেরিতদূত মানব পরিব্রাণের বাকি অংশ একথায় ব্যক্ত করেন, তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রিস্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ: কেননা বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ (ক)।

সুতরাং, আমরা মাংস অনুযায়ী পরিচ্ছেদনে নয়, কিন্তু খ্রিষ্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত, অর্থাৎ নব মানুষ হবার জন্যই নবজন্ম লাভ করেছি। যখন আমরা তাঁর বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাহিত তখন আমাদের পুরাতন মানুষের কাছে মরতে হয়, কারণ বাপ্তিস্মের নবজন্ম হলো পুনরুত্থানের পরাক্রম। এবং খ্রিষ্টের এই পরিচ্ছেদন অগ্রচর্ম-ত্যাগে নয়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুবরণে সাধিত, ও সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জীবনযাপনে সিদ্ধ। আমরা তাঁর মধ্যে পুনরুত্থান করি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যিনি মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাই আমাদের সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে যাঁর কর্মশক্তি গুণে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, কারণ এই বিশ্বাস খ্রিষ্টের সঙ্গে খ্রিষ্টে পুনরুত্থান ঘটায়।

১০। তারপরে মানবস্বরূপ-ধারণ রহস্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় : এবং অপরাধের কারণে ও আমাদের দেহ পরিচ্ছেদিত না হওয়ার কারণে মৃত অবস্থায় এই তোমাদের ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন ; সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন ; মাংস[-বস্তু] থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে যত কর্তৃত্বের উপরে নিজেতেই বিজয়ী হয়ে তিনি নিজেতে ভরসা রাখায় প্রকাশ্যে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন (ক)। জাগতিক মানুষ প্রেরিতদূতের বিশ্বাস ধারণ করতে পারে না, ও তাঁর সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা প্রেরিতদূতের কথার অর্থ বোঝাতে পারে না। ঈশ্বর খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলেন, সেই খ্রিষ্টকেই জাগিয়ে তোলেন যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তিনি আমাদেরও পুনরুজ্জীবিত করেছেন আমাদের পাপ ক্ষমা ক'রে ও পাপের বিধানে সংযুক্ত সেই যে ঋণপত্র আগেকার বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল তা মুছে দিয়ে ও বাতিল ক'রে ও তা তাঁর ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে, মৃত্যুর বিধান দ্বারা মাংস[-বস্তু] খুলে দিয়ে ও সমস্ত কর্তৃত্বের উপরে নিজেতেই বিজয়ী হয়ে প্রকাশ্যে তাদের শেষ দশা দেখিয়ে [আমাদের পুনরুজ্জীবিত করেছেন]। যত কর্তৃত্বের উপরে নিজেতে সাধিত বিজয় সম্পর্কে, সেগুলোর শেষ দশা প্রকাশ্যে প্রদর্শন সম্পর্কে, সেই যে ঋণপত্র তিনি ছিঁড়ে

ফেললেন সেসম্পর্কে ও তিনি যে জীবন আমাদের দিলেন সেসম্পর্কে আমরা আগেই কথা বলেছিলাম (খ)। কিন্তু এই রহস্যকে কেইবা উপলব্ধি [করতে] বা ব্যক্ত করতে পারবে? ঈশ্বরের কর্মশক্তি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে, এবং এই একই কর্মশক্তি খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করে, এবং এই একই কর্মশক্তি পাপ ক্ষমা করে, ঋণপত্রটা বাতিল করে ও তা দ্রুশে বিঁধিয়ে দেয়; মাংস[-বস্ত্র] ফেলে রেখে, সমস্ত কর্তৃত্বের শেষ দশা দেখিয়ে তাদের উপর নিজেতে জয়ী হয়। তুমি তো মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানকারী কর্মশক্তির অধিকারী, তুমি তো সেই খ্রিষ্টের অধিকারী যিনি নিজেতেই সেই একই কাজ সম্পাদন করেন যা ঈশ্বর সম্পাদন করেন। কেননা খ্রিষ্টই মাংস[-বস্ত্র] খুলে দিয়ে মরলেন। সুতরাং মনে রেখ যে মানুষ হিসাবে খ্রিষ্টকে ঈশ্বর দ্বারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়; মনে রেখ যে ঈশ্বর হিসাবে মরতে উদ্যত সেই খ্রিষ্টই আমাদের পরিত্রাণকর্ম সাধন করেন। তেমনিভাবে, যখন ঈশ্বর এসমস্ত কিছু খ্রিষ্টে সম্পাদন করেন, তখন ঈশ্বর কাজ সম্পাদন করলেও তবু খ্রিষ্টই মরবার জন্য মাংস[-বস্ত্র] খুলে দেন। এবং মৃত্যুর আগে যিনি ঈশ্বর হিসাবে কর্মরত যদিও সেই খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করেন, তথাপি ঈশ্বরের কর্মশক্তিই মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করে, কেননা মৃতদের মধ্য থেকে যিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন তিনি সেই খ্রিষ্ট যিনি মৃত্যুর আগে কর্মরত ছিলেন, এমনকি মরবার জন্য মাংস[-বস্ত্র] খুলে দিলেন (গ)।

১১। তবে তুমি কি এখন প্রেরিতদূতের বিশ্বাসের রহস্যগুলো উপলব্ধি কর? তুমি কি মনে কর তুমি এখন খ্রিষ্টকে জান? কেননা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি: কে মাংস[-বস্ত্র] খুলে দেন ও সেই খুলে দেওয়া মাংস কী? আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রেরিতদূত দ্বারা দ্বিবিধ ধারণা ব্যক্ত: খুলে দেওয়া সেই মাংস (ক) সংক্রান্ত ধারণা ও যিনি মাংস[-বস্ত্র] খুলে দেন তাঁরই সংক্রান্ত ধারণা; ও সেইসঙ্গে আমি তো ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত সেই খ্রিষ্টের বিষয়েও কথা শুনতে পাচ্ছি। তবে যখন একথা সত্য যে, ঈশ্বরই মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেন এবং একথাও সত্য যে, খ্রিষ্টকেই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যিনি মাংস[-বস্ত্র] খুলে দেন তিনি কে, ও যিনি মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেন ও খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুজ্জীবিত করেন তিনি কে? যদি সেই মৃত খ্রিষ্ট ও সেই

খুলে দেওয়া মাংস এক নয়, তাহলে তুমিই আমাকে সেই খুলে দেওয়া মাংসের নাম দেখাও, এবং পরে তাঁরই স্বরূপের কথা আমাকে বোঝাও যিনি মাংস[-বস্তু] খুলে দিলেন। কেননা আমি এটা পাই যে, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হল সেই খ্রিষ্ট ঈশ্বর হলেন সেই একই খ্রিষ্ট যিনি মাংস[-বস্তু] খুলে দিলেন, ও এটাও পাই যে, সেই খুলে দেওয়া মাংস হলো সেই একই খ্রিষ্ট যিনি মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হলেন; তারপর আমি দেখতে পাই, তিনি যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের শেষ দশা প্রকাশ্যে দেখান ও তাদের উপরে নিজেতে জয়ী হন। যিনি সমস্ত কর্তৃত্বের উপরে নিজেতে জয়ী হন, তুমি কি তাঁকে চিনে নিতে পার? তুমি কি এটা উপলব্ধি কর যে, সেই খুলে দেওয়া মাংস ও যিনি মাংস[-বস্তু] খুলে দেন তাঁরা ভিন্ন নন? কেননা খ্রিষ্ট নিজেতে জয়ী হন, অর্থাৎ সেই মাংসে জয়ী হন যা তিনি [বস্তুের মত] খুলে দিলেন। তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে এইভাবে তাঁর ঈশ্বরত্ব ও তাঁর মনুষ্যত্ব প্রচারিত? এও দেখতে পাচ্ছ যে, মৃত্যু মানুষকে কিন্তু পুনরুত্থান ঈশ্বরকে আরোপিত, কিন্তু এমনভাবে নয় যার ফলে এমনটা দাঁড়ায় যে, যাঁর মৃত্যু হয়েছে তিনি একজন, ও যাঁর গুণে সেই মৃতজন পুনরুত্থিত হন তিনি অন্য একজন। সেই খুলে দেওয়া মাংস হলো মৃত খ্রিষ্ট, আবার, খ্রিষ্টকে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেন তিনি সেই একই খ্রিষ্ট যিনি মাংস[-বস্তু] খুলে দেন। পুনরুত্থানের পরাক্রমে তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ উপলব্ধি কর, মৃত্যুতে তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা জেনে নাও। এবং যদিও উভয় ঘটনা [তথা মৃত্যু ও পুনরুত্থান] নিজ নিজ স্বরূপ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে, তথাপি মনে রেখ যে, যিনি উভয় স্বরূপ [অর্থাৎ যিনি উভয় স্বরূপের অধিকারী], সেই খ্রিষ্ট যিশু একজনমাত্র।

১২। আমি এটাও স্মরণ করি যে, প্রেরিতদূত মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টের পুনরুত্থান প্রায়ই পিতা ঈশ্বরের উপর আরোপ করেন। কিন্তু প্রেরিতদূত নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না বা সুসমাচারের বিশ্বাসের বাইরেও নিজেকে দাঁড় করান না, বিশেষভাবে এই কারণে যে, প্রভু বলেন, পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আশ্রয় আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি (ক)।

তাছাড়া, যেহেতু তাঁকে নিজের বিষয়ে একটা চিহ্ন দেখাবার দাবি রাখা হয়েছিল যাতে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সেজন্য তিনি নিজের দেহ-মন্দির বিষয়ে বলেন, এই মন্দির ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব (খ)। নিজের জীবন ফিরিয়ে নেবার অধিকার দ্বারা ও মন্দির পুনরুত্তোলন করার পরাক্রম দ্বারা খ্রিষ্ট নিজেকে ঈশ্বর ও পুনরুত্থানকে নিজের কাজ বলে দেখান, কিন্তু এসমস্ত কিছু নিজের পিতার আজ্ঞার অধিকারের উপরে আরোপ করেন। এটা প্রেরিতদূতের ধারণার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় যখন তিনি খ্রিষ্টকে ‘ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা’ (গ) বলে প্রচার করেন ও খ্রিষ্টের সমস্ত মহত্বকে পিতার গৌরবে আরোপ করেন, কেননা খ্রিষ্ট যা কিছু করেন তা ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞাই করে, এবং ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা যা কিছু করে, তা নিঃসন্দেহে সেই ঈশ্বরই করেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞা। সুতরাং, খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের কর্মশক্তি দ্বারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছিল যেহেতু তিনি ঈশ্বরের কাজ এমন স্বরূপ দ্বারা সম্পাদন করলেন যা ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে ভিন্ন নয়। এবং পুনরুত্থানে আমাদের বিশ্বাস সেই ঈশ্বরে স্থিত যিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন।

১৩। ধন্য প্রেরিতদূত খ্রিষ্টে বিদ্যমান এ দ্বিবিধ দিক তুলে ধরেন। এতে তিনি খ্রিষ্টে মানবীয় দুর্বলতা ও সেইসঙ্গে তাঁর ঐশ্বরিক পরাক্রম ও স্বরূপ স্পষ্ট করে তোলেন। তিনি করিন্থীয়দের কাছে লিখলেন, তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন (ক), এবং এতে দেখালেন যে মৃত্যু মানবীয় দুর্বলতা সংক্রান্ত, ও জীবন ঐশ্বরিক পরাক্রম সংক্রান্ত। এবং রোমীয়দের কাছে লিখলেন, বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করেছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত (খ); এবং [প্রেরিতদূত] তাঁর মৃত্যুকে পাপের উপরে অর্থাৎ আমাদের দেহের উপরে, কিন্তু তাঁর জীবনকে সেই ঈশ্বরের উপরে আরোপ করলেন জীবিত হওয়াই যাঁর স্বরূপগত গুণ। সুতরাং প্রেরিতদূত বলেন, আমাদের উচিত দেহের কাছে মৃত্যুবরণ করা যাতে সেই খ্রিষ্ট

যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হতে পারি যিনি আমাদের পাপদেহ ধারণ করার পর আমাদের সঙ্গে যে স্বরূপের নিজেই সহভাগী সেই স্বরূপকে ঐশ্বরিক অনন্ততার সহভাগিতায় মিলিত ক’রে এখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে জীবিত আছেন।

১৪। আমি এসমস্ত বিষয় স্বল্প কথায় দেখাতে বাধ্য হয়েছি যাতে আমরা স্মরণ করতাম যে, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দু’টো স্বরূপ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বলে পরিগণিত, কারণ যিনি ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করছিলেন তিনি দাসের রূপ (ক) ধারণ করলেন ও সেটায় মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন (খ)। মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা ঈশ্বরের রূপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, যেভাবে ঈশ্বরের রূপও দাসের রূপে অন্তর্নিহিত নয়। কিন্তু সুসমাচারের ব্যবস্থারহস্যের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে যিনি দাসের রূপে রয়েছেন তিনি ঈশ্বরের রূপে রয়েছেন, যদিও দাসের রূপ ধারণ করা ও ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করা এক জিনিস নয়। অন্যদিকে, যিনি ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করছিলেন, তিনি নিজেকে শূন্য না করলে তবে তাঁর পক্ষে দাসের রূপ ধারণ করা সম্ভব হত না, কারণ সেই দু’টো রূপের সংযোজন সমুচিত হত না। তথাপি, যিনি নিজেকে শূন্য করলেন ও দাসের রূপ ধারণ করলেন, তিনি যে এর ফলে অন্য ও ভিন্ন হয়ে যান তা নয়। যিনি নেই, তাঁর বিষয়ে ‘ধারণ করলেন’ বলা যায় না; সুতরাং রূপ বর্জন করা ও স্বরূপ বাতিল করা এক নয়, কারণ যিনি নিজেকে শূন্য করেন তিনি নিজের সত্তা হারান না, ও যিনি [নতুন রূপ] ধারণ করেন, তিনি [যা ছিলেন] তা-ই হয়ে থাকেন। আরও, যিনি নিজেকে শূন্য করেন ও যিনি নতুন রূপ ধারণ করেন তিনি যখন এক, তখন তাঁর সেই শূন্য হওয়াটা ও ধারণ করাটার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে কিন্তু এমন বিনাশ নেই যার ফলে যিনি [রূপ ক্ষেত্রে] নিজেকে শূন্য করেন তিনি অস্তিত্বশীল হওয়া শেষ করেন ও যিনি [নতুন রূপ] ধারণ করেন তিনি অস্তিত্ববিহীন। সেজন্য নিজেকে শূন্য করাটা এমনটা করে যাতে দাসের রূপ ধারণ করা হয়, কিন্তু এমনটা করে না যে যিনি ঈশ্বরের রূপের অধিকারী ছিলেন সেই খ্রিষ্ট খ্রিষ্ট হয়ে থাকতে পারবেন না, কারণ খ্রিষ্ট শুধু এটাই করলেন যে, তিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন। যখন তিনি নিজেকে শূন্য করলেন যেন খ্রিষ্ট-আত্মা হয়ে থেকে খ্রিষ্ট-মানুষও হন, তখন দেহ ও [দৈহিক] স্বরূপ ধারণ ক্ষেত্রে তাঁর বেশের পরিবর্তন তাঁর অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বের স্বরূপকে ধ্বংস করেনি, কারণ যখন খ্রিষ্ট নিজের

বেশ পাল্টান ও [নতুন একটা] ধারণ করেন, তখন তিনি সেই এক ও একই খ্রিষ্ট হয়ে থাকেন।

১৫। আমরা রহস্যগুলোর সেই ব্যবস্থা দেখিয়েছি যা দ্বারা ভ্রান্তমতপন্থীরা সরলমনাদের ভোলায়, ধারণ করা সেই মানবস্বরূপ দ্বারা যা কিছু বলা হয়েছে ও করা হয়েছে সেইসব কিছু ঈশ্বরত্বের দুর্বলতার উপর আরোপ করে, ও যা কিছু দাসের রূপের উপর আরোপণীয় সেই সব ঈশ্বরের রূপের উপর আরোপ করে। এখন তাদের সমস্ত ঘোষণাগুলোর প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে সবসময় দুই ধরনের সাক্ষ্যদান নির্ণয় করতে পারি, কারণ একমাত্র সত্যকার বিশ্বাস যিশু খ্রিষ্টকে বাণী ও মাংস বলে অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার করাটায় স্থিত। অতএব, ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা মনে করে যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে তাঁর স্বরূপ গুণে ঈশ্বর বলে গণ্য করা উচিত নয় যেহেতু তিনি বলেছেন, তুমি আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউই নয় (ক)। প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত উত্তর অবশ্যই প্রশ্নের বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে থাকা চাই, কেননা কেবল এক্ষেত্রেই উপস্থাপিত প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর পাওয়া যাবে। তবে, যে কেউ উপরোল্লিখিত বচন বিষয়ে মিথ্যা ব্যাখ্যা দেয়, আমি যে প্রথম প্রশ্ন তাদের কাছে রাখি এটা হলো, তাদের বিবেচনায়, প্রভু ‘মঙ্গলময়’ বলে অভিহিত হওয়ায় বিরক্তি বোধ করেছিলেন, নাকি তিনি এর চেয়ে ‘খারাপ’ বলে অভিহিত হতে বেশি পছন্দ করতেন? কেননা, ‘আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন’ তাঁর এই উত্তর ঠিক এই অর্থই উপস্থাপন করতেও পারে। যিনি বলেছিলেন, তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে। হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার (খ), তাঁকে খারাপ বলে স্বীকার করার মত এমন অবস্থা কেউ যে থাকবে, আমি তা মনে করি না। তিনি নিজেকে কোমল ও নম্রহৃদয় বলে ঘোষণা করেন; তবে আমরা এটা কি বিশ্বাস করতে পারি যে, তাঁকে ‘মঙ্গলময়’ বলা হল বিধায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন? যিনি নিজের মঙ্গলময়তা বিষয়ে সাক্ষ্য দেন তিনি যে নিজের জন্য ‘মঙ্গলময়’ নামটা প্রত্যাখ্যান করেন, এ বাক্য দু’টো পরস্পর

বিরোধী। সুতরাং আমরা এমনটা ভাবতে পারি না, ‘মঙ্গলময়’ বলে অভিহিত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হন। এবং যখন আমাদের এমনটা বিশ্বাস করতে নেই যে তিনি নিজের বিষয়ে ‘মঙ্গলময়’ নামের জন্য বিরক্তি বোধ করলেন, তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, তাঁর বিষয়ে উপস্থাপিত অন্য কোন্ ঘোষণায় তিনি বিরক্তি বোধ করলেন।

১৬। তবে এসো, এটা দেখি: যে যুবকটা তাঁর কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, সেই যুবকটা ‘মঙ্গলময়’ নাম বাদে অন্য কীবা বলেছিল। সে বলেছিল, মঙ্গলময় গুরু, আমাকে মঙ্গলকর কী করতে হবে? (ক)। তাই যুবকটা মঙ্গলময় নামের সঙ্গে গুরু নামটা যোগ করেন। এবং যেহেতু [খ্রিস্ট] ‘মঙ্গলময়’ বলে অভিহিত হওয়ায় বিরক্ত হন না, সেজন্য এটা আবশ্যিক যে, তিনি ‘মঙ্গলময় গুরু’ অভিহিত হওয়ায় বিরক্তি বোধ করলেন। কিন্তু যে যুবকটা তাঁর কাছে প্রশ্ন রেখেছিল তার বিশ্বাস তিরস্কার করার জন্যই তিনি ‘মঙ্গলময় গুরু’ বলে অভিহিত হওয়ায় বিরক্তি বোধ করেন, তাঁর বিষয়ে ব্যবহৃত ‘মঙ্গলময়’ ও ‘গুরু’ নামের ব্যাপারে তিরস্কার করেন না। যে যুবক বিধান পালন ক্ষেত্রে গর্ব করে ও বিধানের লক্ষ্য (খ) তথা খ্রিস্টকে জানে না; যে যুবক মনে করে তাকে কাজকর্মের ভিত্তিতেই ধার্মিক বলে সাব্যস্ত করা হবে ও এটা জানে না যে খ্রিস্ট ‘ইস্রায়েলকুলের হারানো মেসগুলোর জন্যই’ এসেছেন, ও এটাও জানে না যে বিধান ধর্মময়তায় বিশ্বাস দ্বারা (গ) বিশ্বাসীদের ত্রাণ করতে পারে না, সেই যুবক বিধানের প্রভু ও একমাত্র জনিত ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখে কেমন যেন তিনি বিধান সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মবিধি ও লেখার গুরু। কিন্তু, যে অবিশ্বাস তাঁকে বিধানের গুরুই যেন সম্বোধন করে, তেমন অভক্তিময় অবিশ্বাস ঘৃণা করে প্রভু এই উত্তর দেন, ‘আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন?’ এবং আমাদের কেমন করে তাঁকে ‘মঙ্গলময়’ বলে গণ্য করতে ও অভিহিত করতে হয় এমনটা দেখাবার জন্য তিনি বলে চলেন, ‘একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউই নয়’, এবং তিনি ‘মঙ্গলময়’ নাম প্রত্যাখ্যান করেন যদি না নামটা তাঁকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করে।

১৭। অবশেষে, তিনি যে ‘মঙ্গলময় গুরু’ নামটায় তারই বিশ্বাসের কারণে বিরক্তি বোধ করছিলেন যে তাঁকে মানুষই যেন জ্ঞান করে জিজ্ঞাসা করছিল, ও যে যুবক বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ পালনে গর্ব করছিল তার গর্বের কারণেও যে তিনি বিরক্তি বোধ করছিলেন,

তা স্পষ্ট করার জন্য এ বলে উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার একটা বিষয় বাকি রয়েছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর (ক)। তিনি যে নিজের বিষয়ে ‘মঙ্গলময়’ নামটা এড়াতে ইচ্ছা করেন তা নয়, তিনি বরং স্বর্গীয় ধন প্রতিশ্রুত হন; তিনি যে ‘গুরু’ বলে পরিগণিত হতে পছন্দ করেন না, তাও নয়, যেহেতু তিনি এই সিদ্ধ সুখ-বাণীর পথদিশারী বলে নিজেকে উপস্থাপন করেন; বরং এটা দেখিয়ে যে একমাত্র ঈশ্বরই মঙ্গলময়, তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে পার্থিব মনোভাব জনিত বিশ্বাস তিরস্কার করেন। এবং তিনি যে একাধারে ঈশ্বর ও মঙ্গলময়, তা দেখাবার জন্য মঙ্গলময়তা সংক্রান্ত ভূমিকা অনুশীলন করেন তথা স্বর্গীয় ধন উন্মুক্ত করেন ও সেই ধন অভিমুখে নিজেকেই পথদিশারী বলে উপস্থাপন করেন। এইভাবে, একদিকে, মানুষ মাত্রই হিসাবে তাঁকে যা কিছু আরোপ করা হয় তিনি সেইসব অস্বীকার করেন, অন্যদিকে যা কিছু তিনি ঈশ্বরকে আরোপ করেন সেইসব কিছুর কাছে নিজেকে পরকীয় নয় বলে ঘোষণা করেন। একমাত্র ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলে স্বীকার করতে করতে তিনি এমন কিছু বলেন ও করেন যা একমাত্র ঈশ্বরের পরাক্রম, মঙ্গলময়তা ও স্বরূপের যোগ্য।

১৮। সুতরাং, খ্রিষ্ট যে মঙ্গলময় নামটা এড়াননি ও গুরু ভূমিকাও অস্বীকার করেননি, কিন্তু এমন একজনের অভিমত তিরস্কার করতে চাইলেন যে তাঁর মধ্যে দেহ ও মাংস ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করেনি, তা তাঁর সেই ভাষা থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যা তিনি তাঁদেরই বেলায় ব্যবহার করলেন যারা তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করছিলেন; সেসময়ে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই (ক); এবং অন্য সময়ে বললেন, তোমরা নিজেদের গুরু বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনমাত্র, তিনি খ্রিষ্ট (খ)। তিনি যার গুরু, সেই বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে তিনি এনামটা প্রশংসাবাদের সঙ্গে গ্রাহ্য করেন ও নামটা প্রকাশ্যে ব্যবহার করেন, কিন্তু উপরে উল্লিখিত বচনে ‘মঙ্গলময় গুরু’ নামটা গ্রাহ্য করেন না কেননা সেই বচনে তিনি প্রভু বলেও স্বীকৃত নন, খ্রিষ্ট বলেও গৃহীত নন। তিনি একমাত্র একাই ঈশ্বরকেই মঙ্গলময় বলে অভিহিত করেন, কিন্তু নিজের ও ঈশ্বরের মধ্যে

কোন পার্থক্য রাখেন না, যেহেতু তিনি নিজেকে প্রভু বলেও ও খ্রিষ্ট বলেও ঘোষণা করেন ও স্বর্গীয় ধন অভিমুখে পথদিশারী বলে প্রকাশ করেন।

১৯। প্রভু মণ্ডলীর বিশ্বাসের এ বিশেষ নিয়ম সবসময় পালন করেছেন তথা, একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কিন্তু ঈশ্বরের ঐক্য-রহস্য থেকে নিজেকে পৃথক না করা। [অনন্তকালীন] জন্মসূত্রে যে স্বরূপ তাঁরই, সেটা অবলম্বন করে তিনি নিজেকে দ্বিতীয় ঈশ্বর ও একমাত্র ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেন না, কারণ একমাত্র ঈশ্বরের যে স্বরূপ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান, তা এমনটা হতে দেয় না তিনি ভিন্ন ধরনের ঈশ্বর হবেন, ও সেই [অনন্তকালীন] জন্ম এমনটা হতে দেয় না, তিনি সিদ্ধ নন এমন পুত্র হবেন। এর ফলে তিনি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ্য হতে পারেন না, তাঁকে সেই একমাত্র ঈশ্বরেও একীভূত করা চলবে না। এজন্যই তাঁর প্রতিটি উক্তির অর্থ সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট, এবং তিনি পরিমিত ভাষায় দেখান যে, পিতা ঈশ্বরের জন্য যে সম্মান তিনি দাবি করেন, তিনিও সেই সমস্ত সম্মানের অধিকারী। যখন তিনি বলেন, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, আমাতেও বিশ্বাস রাখ (ক), তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : তিনি যখন সম্মানে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তখন স্বরূপ ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বর থেকে কিসেতেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন? কেননা, ‘তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ’ বলার পর যখন তিনি ‘আমাতেও বিশ্বাস রাখ’ বলেন, তখন ‘আমাতে’ শব্দটা এমনটা কি বোঝায় না যে তিনি নিজের স্বরূপকেও নির্দেশ করছিলেন? [হে ভ্রাতৃমতপন্থী,] সেই দু’টো স্বরূপ বিচ্ছিন্ন কর, কিন্তু তোমাকে ভিন্ন দু’টো বিশ্বাসকেও দাঁড় করাতে হবে। অন্যদিকে, [তোমার মতে] যখন খ্রিষ্টকে ছাড়া ঈশ্বরে সেই বিশ্বাস জীবন, তখন খ্রিষ্টকে ঐশ্বরিক যত নাম ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিহীন কর। কিন্তু, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যদি খ্রিষ্টে বিশ্বাসই তাদের জীবন দান করে, তাহলে মনোযোগী পাঠক ‘তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, আমাতেও বিশ্বাস রাখ’ বাক্যটা মূল্যায়ন করুক। যখন তিনি বলেন ‘তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, আমাতেও বিশ্বাস রাখ’, তখন খ্রিষ্ট নিজের প্রতি বিশ্বাসকে ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত করে নিজের স্বরূপকে ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে মিলিত করলেন, কারণ, যাঁর উপরে বিশ্বাস রাখা কর্তব্য, সেই ঈশ্বরকে উল্লেখ করার পর তিনি নিজেতে বিশ্বাস রাখার বাধ্যবাধকতা মনে করিয়ে দিলেন। তিনি যে ঈশ্বর তা তিনি সেইভাবে শিখিয়ে দিলেন, কারণ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে তারা তাঁর নিজের উপরেই

বিশ্বাস রাখতে বাধ্য। তথাপি তিনি ধর্মবিরোধী ঐক্যের ব্যাখ্যা বাদ দিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরেও ও সেইসঙ্গে নিজেতেও বিশ্বাস রাখার বাধ্যবাধকতা ঘোষণা করলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে একাকীত্বে বিরাজমান [ঈশ্বর] বলে ধারণা করার জন্য স্থান রাখলেন না।

২০। বেশির ভাগ উপদেশে, এমনকি প্রায় সমস্ত উপদেশে খ্রিষ্ট ঐক্য থেকে নিজেকে পৃথক না করে এ রহস্যকে ব্যাখ্যা করেছেন, বিশেষভাবে তখনই যখন তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে স্বীকার করেন; ও তখনই যখন নিজেকে একাকী ও একক বলে ঘোষণা না করে তাঁর সঙ্গে ঐক্য স্থান নেন। তথাপি নিজের ঐক্য ও [অনন্তকালীন] জন্ম সংক্রান্ত রহস্যকে তিনি বিশেষভাবে এই বচনেই স্পষ্টভাবে শেখান যখন বলেন, কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যদানের চেয়ে আমার মহত্তর সাক্ষ্যদান রয়েছে: যে কাজ সম্পাদনের ভার পিতা আমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমার দ্বারা সাধিত এই সমস্ত কাজই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তাছাড়া, পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন; তাঁর কণ্ঠস্বর তোমরা কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি, তাঁর বাণীও তোমাদের অন্তরে স্থান পাচ্ছে না, কারণ তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে তোমরা বিশ্বাস কর না (ক)। যখন পিতাকে দেখা হয়নি ও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা হয়নি, তখন কেমন করে এটা সত্যিকারে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে পিতা পুত্র বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেছেন? হ্যাঁ, আসলে আমার মনে পড়ে যে স্বর্গ থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা হয়েছিল যা বলছিল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন (খ)। তবে কেমন করে ঘোষণা করা যেতে পারে, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা হয়নি যখন শোনা সেই কণ্ঠস্বরই নিজেতে এমন নির্দেশনা রাখে যে কণ্ঠস্বরটা হলো পিতার কণ্ঠস্বর? (গ)। কিন্তু হয় তো এটাই হতে পারে যে, যারা যেরুশালেমে ছিল তারা সেই কণ্ঠস্বর শোনেনি যেহেতু একাই যোহনই তা মরুপ্রান্তরে শুনেছিলেন (ঘ)। তেমনটা হলে তবে আমাদের এ প্রশ্ন রাখা দরকার, পিতা কেমন করে যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিলেন? কেননা, সেই যে যোহন স্বর্গ থেকে আগত কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, এবার খ্রিষ্ট তাঁর সাক্ষ্যদান আর ব্যবহার করেন না, কিন্তু যোহনের সাক্ষ্যদানের চেয়ে তাঁর মহত্তর সাক্ষ্যদান রয়েছে। এবং সেই সাক্ষ্যদান কি, সেবিষয়ে তিনি অবিলম্বেই বলে চলেন, যে কাজ সম্পাদনের ভার পিতা আমার হাতে ন্যস্ত

করেছেন, আমার দ্বারা সাধিত এই সমস্ত কাজই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন (৩)। আমি এই সাক্ষ্যদানের অধিকার মেনে নিচ্ছি, কেননা পিতার প্রেরিত পুত্র ছাড়া অন্য কেউই সেই ধরনের কাজ সম্পাদন করতে পারত না। সুতরাং, পিতার সাক্ষ্যদান তাঁর কাজই লক্ষ্য করে। কিন্তু তারপর কি লেখা আছে? ‘তাছাড়া, পিতা নিজে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেছেন; তাঁর কণ্ঠস্বর তোমরা কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি; তাঁর বাণীও তোমাদের অন্তরে স্থান পাচ্ছে না (৪)। তবে, যাঁকে কখনও দেখা হয়নি ও কখনও শোনা হয়নি ও যাঁর বাণী তাদের অন্তরে স্থান পায় না, সেই পিতার সাক্ষ্যদান বিষয়ে যারা অজ্ঞ, তারা কি নিরপরাধী? না। পিতার সাক্ষ্যদান যে তাদের কাছে অজানা, এমন অজুহাত তারা উত্থাপন করতে পারে না, কারণ খ্রিষ্ট বলেন যে, তাঁর সম্পাদিত কাজই হলো নিজের বিষয়ে পিতার সাক্ষ্যদান। পুত্র বিষয়ে কাজগুলো সাক্ষ্য দেয় তিনি পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু কাজগুলোর এই সাক্ষ্য পিতারই দেওয়া সাক্ষ্য; এবং যেহেতু পুত্রের কর্মকাণ্ড হলো পিতারই দেওয়া সাক্ষ্য, সেজন্য অবশ্যই এসিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, খ্রিষ্টে সেই স্বরূপ কার্যকর ছিল যা দ্বারা পিতাও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। এইভাবে যিনি পিতার কাজ করেন সেই খ্রিষ্ট, ও যিনি তাঁর কাজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন সেই পিতা, তাঁরা উভয়েই সেই [অনন্তকালীন] জন্মের ফলে অবিচ্ছেদ্য স্বরূপের অধিকারী বলে প্রদর্শিত (৫)। কেননা খ্রিষ্টের কর্মই খ্রিষ্টের বিষয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বলে নির্দেশিত।

২১। সুতরাং, যখন তারা সেই সাক্ষ্যদান চিনে নেয়নি, তখন তারা নিরপরাধী নয়, কেননা খ্রিষ্টের কাজই হলো সেই সাক্ষ্য যা স্বয়ং পিতা তাঁর বিষয়ে দেন। তারা যে সাক্ষ্যদাতার কণ্ঠস্বর শোনেনি, তাও তারা বলতে পারে না, কেননা তাঁর বাণী তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। কণ্ঠস্বর যে শোনা হয়নি, চেহারা যে দেখা হয়নি, পুত্রের বাণী যে তাদের অন্তরে স্থান পায়নি যদিও পুত্রের বিষয়ে পিতা ‘তাঁর কণ্ঠস্বর তোমরা কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি; তাঁর বাণীও তোমাদের অন্তরে স্থান পাচ্ছে না’ এ বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এসমস্ত কিছুই কারণ যেন বোঝা যেতে পারত সেই লক্ষ্যে খ্রিষ্ট অবিলম্বেই একথা যোগ করে বললেন, ‘কারণ তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তাঁতে

তোমরা বিশ্বাস কর না’। এতে তিনি এটা দেখান যে, যে কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে অবশ্যই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনে, ঈশ্বরের চেহারা দেখে, ও ঈশ্বরের বাণী বিশ্বাসীদের অন্তরে স্থান পায়, কেননা স্বরূপের ঐক্যের গুণে পিতাকে পুত্রে শোনা হয়, দেখা হয়, পাওয়া হয়। তিনি যখন পিতা দ্বারা প্রেরিত, তখন তিনি কি পিতার অভিব্যক্তিও নন? যখন তিনি বলেন, পিতা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও যাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, যেহেতু তারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখছিল না সেইজন্য সেই পিতাকে শোনাও হয়নি, দেখাও হয়নি, বোঝাও হয়নি, তখন তিনি কি হয় তো স্বরূপের কোন না কোন পার্থক্য দ্বারা পিতা থেকে নিজেকে পৃথক করেন? অতএব, একমাত্র জনিত ঈশ্বর ঈশ্বরকে পিতা বলে স্বীকার করে পিতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন না, কিন্তু ‘পিতা’ শব্দ দ্বারা এটা প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের পিতা, ও ঈশ্বরকে দেয় সম্মানে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

২২। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক এই যে বচনে পুত্র এটা প্রকাশ করেন তাঁর কাজই হলো সেই প্রমাণ যে তিনি পিতা দ্বারা প্রেরিত, ও এটাও ঘোষণা করেন যে পিতাই তাঁকে প্রেরণ করেছেন বলে সাক্ষ্য দেন, এই সেই বচনে তিনি বলেন, একমাত্র ঈশ্বর থেকে আগত যে গৌরব, তোমরা তার অন্বেষণ কর না (ক)। তথাপি তিনি এই বচনটাকে নগ্ন রাখেননি, পিতার সঙ্গে নিজের ঐক্য-বিশ্বাসের কোন না কোন প্রস্তুতি ছাড়াও রাখেননি। কেননা আগে তিনি বলেছিলেন, তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে সম্মত নও। মানব গৌরব আমি গ্রাহ্য করি না; তাছাড়া তোমাদের জানি: তোমাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম নেই। আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু তোমরা আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত নও; অন্য কেউ নিজের নামে এলে তাকেই বরং গ্রহণ করবে। তোমরা কেমন করেই বা বিশ্বাস করতে পার, যখন পারস্পরিক গৌরব গ্রাহ্য করতে করতে একমাত্র ঈশ্বর থেকে আগত যে গৌরব, তার অন্বেষণ কর না? (খ)। তিনি মানব গৌরব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ ঈশ্বরের কাছেই বরং গৌরব অন্বেষণ করা দরকার, এবং একে অন্যের কাছ থেকে গৌরব গ্রহণ করাটা অবিশ্বাসীদের চিহ্ন। মানুষ অন্য মানুষকে কেমন গৌরব দেবে? তাই তিনি এব্যাপারে সচেতন হয়ে বলেন, তাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রেম নেই। তাদের অন্তরে যে ঈশ্বর-প্রেম অবস্থান করে না, তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, তারা তাঁকে আপন পিতার

নামে আগত ব্যক্তি বলে গ্রহণ করে না। জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে ‘পিতার নামে আগত’, এটা বলার উদ্দেশ্য কি? তা বলাটা কি ‘ঈশ্বরের নামে আগত’ ছাড়া অন্য অর্থ বহন করে? তা হয় তো কি এমনটা হতে পারে যে, তারা ঈশ্বরের নামে আগতজনকে গ্রহণ করে না বিধায়ই ঈশ্বর-প্রেম তাদের অন্তরে স্থান পায় না? যখন তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে সম্মত নও’, তখন তিনি কি এমনটা দেখিয়েছিলেন না যে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপও বিদ্যমান ছিল? সেই একই বচনে তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনবে, এবং যারা তা শুনবে তারা জীবিত হবে **গ**। তবে, যখন তিনি পিতার নামে আগত, তখন তিনি নিজে পিতা নন, কিন্তু পিতা যে ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী, তিনি সেই স্বরূপ-বঞ্চিত নন, কেননা পুত্র বলে ও ঈশ্বর বলে তাঁর জন্য পিতা ঈশ্বরের নামে আসা স্বাভাবিক ব্যাপার। পরে তাঁর নামে অন্য কেউ এলে তারা তাকে গ্রহণ করবে; কিন্তু এই লোকটা এমন, যার কাছে মানুষেরা নিজেদেরই জন্য গৌরব প্রত্যাশা করে ও যার কাছে তারাও প্রতিদানে গৌরব দেবে, যদিও লোকটা পিতার নামে আগত হয়েছে বলে ভান করবে। কিন্তু এখানে কোন সন্দেহ নেই যে সেই খ্রিস্টবৈরী নির্দেশিত যে পিতার নাম মিথ্যায় ব্যবহার ক’রে গর্ব করে; হ্যাঁ, তারা এরই দ্বারা গৌরবান্বিত হবে (কেননা তারা ভ্রান্তির এই আত্মাকে গ্রহণ করবে), তাঁরই গৌরবের অন্বেষণ করবে না যিনি একমাত্র ঈশ্বর।

২৩। এজন্যই ঈশ্বর-প্রেম তাদের নেই, কারণ পিতার নামে যিনি আসছিলেন তারা সেই খ্রিস্টকে গ্রহণ করেনি, বরং সেই একই নামে যে আসছিল তাকে গ্রহণ করায় ও একে অন্যের কাছ থেকে গৌরব গ্রহণ করায় তাঁরই গৌরব অবহেলা করে যিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর। তবে, যখন খ্রিস্ট এমনটা বলেন যে, তারা সেই খ্রিস্টবৈরীকে গ্রহণ করতে করতে তাঁকে গ্রহণ করেনি বিধায় তারা একমাত্র ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করে না, তখন আমরা কি এমনটা ভাবতে পারি যে খ্রিস্ট একমাত্র ঈশ্বরের গৌরব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন? কেননা খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করা মানে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের গৌরব অবহেলা করা; সুতরাং, যখন তাঁকে গ্রহণ করাটা ছিল একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করা, তখন তাঁর আপন গৌরব ছিল একমাত্র সত্যকার

ঈশ্বরের গৌরব। এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয় এই বচন যেটার শুরুতে একথা রয়েছে, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে; পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না (ক)। যা কিছু একই স্বরূপের অধিকারী, কেবল তা-ই সম্মানে সমান, ও যারা সেই সম্মান গ্রহণ করে, সেই সমান সম্মান তাদের আলাদা করে না। তথাপি সম্মানে সমতা [অনন্তকালীন] জন্ম-প্রকাশের সঙ্গে দাবীকৃত; কারণ পুত্রকে পিতার মত সম্মানিত হতে হবে, এবং যিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, যেহেতু তারা তাঁর সম্মান অন্বেষণ করে না, সেজন্য যিনি ঈশ্বরের সমান ও একই সম্মানের অধিকারী, তিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের সম্মান থেকে বঞ্চিত নন, কারণ যেমন পুত্রকে যে কেউ সম্মান করে না সে পিতাকেও সম্মান করে না, তেমনি যে কেউ একমাত্র ঈশ্বরের সম্মান অন্বেষণ করে না সে খ্রিষ্টের সম্মানও অন্বেষণ করে না। সুতরাং, খ্রিষ্টের সম্মান ঈশ্বরের সম্মান থেকে অবিচ্ছেদ্য। তিনিই তখন আমাদের শেখান কেমন করে উভয়ের সম্মান এক ও সমান যখন লাজারের অসুস্থতার কথা তাঁকে জানানো হয়; তিনি বলেন, এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরের পুত্র গৌরবান্বিত হন (খ)। লাজার ঈশ্বরের গৌরবার্থে মরেন যাতে লাজারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্র গৌরবান্বিত হন। ঈশ্বরের কাছে গৌরবময় সেই লাজারের মৃত্যু যে ঈশ্বরের পুত্রের জন্য গৌরব জন্মাবে একথা যখন সত্য, তখন ঈশ্বরের পুত্রের গৌরব যে ঈশ্বরের গৌরব এবিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে? এবং খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে [তাঁর অনন্তকালীন] জন্ম দ্বারা পিতা ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে তাঁর নিজের স্বরূপের ঐক্য এইভাবে প্রকাশিত যেহেতু লাজারের অসুস্থতা ঈশ্বরের গৌরবার্থেই ছিল; এবং একইসময়ে বিশ্বাস-রহস্যও অন্ধুগ্ন থেকে যায়, কারণ লাজারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রকে গৌরবান্বিত হতে হয়। ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বর বলে গণিত হওয়া চাই, তথাপি এমনভাবে নয় যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকৃত হবেন না, কেননা ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে করতে নিজেই গৌরবান্বিত হন।

২৪। জীবনময় ঈশ্বর থেকে জীবনময় ঈশ্বর যিনি, তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম ঐশ্বরিক স্বরূপ-রহস্য থেকে অবিচ্ছেদ্য, পুত্র যে ভিন্ন সত্তা-বিশিষ্ট তাও এমনভাবে স্বীকার্য নয় যার ফলে তাঁর মধ্যে পিতার সত্যকার স্বরূপ বিদ্যমান নয়। কেননা উপরে উল্লিখিত সেই

যে বাক্যগুলোতে এমনটা মনে হতে পারে তিনি ‘একমাত্র’ শব্দ ব্যবহারে নিজের ক্ষেত্রে একমাত্র ঈশ্বর-স্বীকৃতি অস্বীকার করেন, সেই বাক্যগুলোতেই তিনি একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস ধ্বংস না করে পিতার সঙ্গে স্বরূপের ঐক্যে স্থান নেয়। বিধানের প্রথম আঞ্জা কোন্টা এবিষয়ে সেই শাস্ত্রী তাঁকে প্রশ্ন রাখলে তিনি উত্তর দিলেন, শোন, ইস্রায়েল! আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এটাই প্রথমটা। আর দ্বিতীয়টা এটার মত: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আঞ্জা দু’টোর চেয়ে বড় আর কোন আঞ্জা নেই (ক)। ইহুদীরা এমনটা মনে করে, খ্রিষ্ট যখন ঘোষণা করেন, ‘শোন, ইস্রায়েল! আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু’, তখন তিনি নিজেকে একমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন, এবং পরে, সেই দ্বিতীয় আঞ্জায়, নিজেকে উপাসনার পাত্রও করেন না। তারা বলে, বিধান আমাদের প্রতিবেশীর ভালবাসতে আঞ্জা করে যেইভাবে একমাত্র প্রভুকে উপাসনা করতে আঞ্জা করে। তবে, আমাদের সেই শাস্ত্রীর উত্তর উপেক্ষা করতে নেই যিনি বলেন, ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য: তিনি এক, এবং তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই; তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (খ)। এমনটা মনে হয়, শাস্ত্রীর উত্তর প্রভুর কথার সঙ্গে মিল রাখে, কেননা উত্তরটা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অন্তরঙ্গ ও গভীর ভালবাসা ঘোষণা করে ও সত্যিকারেই প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে বলে প্রতিশ্রুত হয়, এবং এটাই উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দেখতে হয় বর্ণনার পরবর্তী অংশ কি।

২৫। ‘তিনি সুবিবেচিত উত্তর দিয়েছেন দেখে যিশু তাঁকে বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য থেকে আপনি দূরে নন’ (ক)। তেমন পরিমিত উত্তর দেওয়ার কারণ কী? যে বিশ্বাস মানুষকে স্বর্গরাজ্যের জন্য সিদ্ধ করে তোলে যখন সেই বিশ্বাস হলো একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা, তাঁকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাসা, তখন কোন্ কারণেই বা এই শাস্ত্রী ইতিমধ্যে

ঈশ্বরের রাজ্যে নন, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে নন? অন্য এক বচনে খ্রিষ্ট ঈশ্বরের রাজ্যকে তাদেরই মঞ্জুর করেন যারা বস্ত্রহীনদের কাপড় পরায়, ক্ষুধার্তদের খেতে দেয়, পিপাসিতদের জল খেতে দেয়, পীড়িতদের সেবাযত্ন করে, কারারুদ্ধদের দেখতে যায় : এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (খ)। অথবা, আত্মায় দীনহীন যারা, তাদের জন্য মজুরি এ, আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই (গ)। তাদের পুরস্কার সিদ্ধ, তাদের উত্তরাধিকার সুরক্ষিত, তাদের জন্য প্রস্তুত করা রাজ্য-বণ্টন অনিশ্চিত নয়। এমনটা কি হতে পারে যে, সেই যুবক এসমস্ত কিছুই চেয়ে কম স্বীকার করছিল? কেননা সে যদি প্রতিবেশীকে ভালবাসাকে নিজেকে ভালবাসার পর্যায়ে স্থান দিত, তবে নিজের সাধনায় কীবা তাকে মঙ্গল অর্জন করতে বাধা দিয়েছিল? প্রতিবেশীকে মাঝে মাঝে ভালবাসতে ও সাহায্য করতে সম্মত হওয়াটা সিদ্ধ ভালবাসা নয়, কিন্তু সিদ্ধ ভালবাসা তখনই সব দিক দিয়ে দয়ার ঋণ শোধ করে থাকে যখন মানুষ নিজেকে যত দেয় প্রতিবেশীকে তত দেয় ও অন্যান্যদের বেলায় অমিমাংসিত কিছুই রাখে না। কিন্তু সেই শাস্ত্রী সিদ্ধতা থেকে এইজন্য বঞ্চিত ছিল যে, রহস্য যে সিদ্ধ হয়েছিল তা জানতেন না। নিজের বিশ্বাস-ঘোষণার জন্য তিনি প্রভুর প্রশংসা পেলেন ঠিকই, তিনি যে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে বেশি দূরে ছিলেন না তেমন উত্তরও পেলেন, কিন্তু তাঁকে সুখময় প্রত্যাশার বাস্তব উত্তরাধিকারে স্থান দেওয়া হয়নি। তিনি সেবিষয়ে অজ্ঞ হলেও তবু তাঁর গতিপথ সুখময় ছিল, কেননা তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসাকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন ও প্রতিবেশীকে ভালবাসাকে নিজেকে ভালবাসার একই পর্যায়ে স্থান দিয়েছিলেন। এবং যখন তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসাকে প্রতিবেশীকে ভালবাসার উর্ধ্বতর স্থানে স্থান দিলেন, তখন আল্লাহ ও বলিদানের নিয়মবিধির গণ্ডিতে আর আবদ্ধ হলেন না : এটাই সুসমাচার-রহস্য থেকে দূরে ছিল না।

২৬। স্বয়ং প্রভুর বাণী থেকে আমরা এটাও উপলব্ধি করতে পারি কেনই বা তিনি সেই শাস্ত্রী বিষয়ে এমনটা না বলে যে তিনি একদিন ঈশ্বরের রাজ্যে থাকবেন, বরং এটা বলেন, তিনি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে নন। বাস্তবিকই পরবর্তী কথা এ, এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না। এবং মন্দিরে উপদেশ দানকালে যিশু

কথা প্রসঙ্গে বললেন, শাস্ত্রীরা কেমন করে বলতে পারেন যে, খ্রিষ্ট দাউদের সন্তান? দাউদ নিজেই তো পবিত্র আত্মার আবেশে একথা বলেছেন, প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ। দাউদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেন, তবে নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন? (ক)। সুতরাং, সেই শাস্ত্রী যখন একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করেন যাকে, তাঁর মতে, সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসা দরকার, তখন তিনি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে নন। কিন্তু ঠিক তাঁর সেই স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তাঁকে ভ্রম সনা করা হয় কারণ তিনি বিধানের রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ ও এটা জানেন না যে, তাঁর আপন [অনন্তকালীন] জন্মের স্বরূপের গুণে ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে একমাত্র প্রভু সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিতে স্থান দিতে হয়। এবং যেহেতু বিধান অনুসারে একমাত্র প্রভু সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি একমাত্র প্রভু সংক্রান্ত রহস্যে থাকবার জন্য ঈশ্বরের পুত্রকে কোন স্থান রাখছিল না, সেজন্য তিনি শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেমন করে খ্রিষ্টকে দাউদসন্তান বলে অভিহিত করতে পারেন যখন দাউদ প্রভুকে আপন প্রভু বলে ঘোষণা করেন ও যখন এটা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধই যে তেমন মহান পিতৃকুলপতির সন্তান তাঁর প্রভুও হবেন। তিনি অভিপ্রায় করছিলেন, তাঁর মাংসের খাতিরে ও মারীয়া থেকে তাঁর জন্মের খাতিরে যিনি তাঁকে কেবল দাউদসন্তান বলে গণ্য করছিলেন, সেই শাস্ত্রী যেন এটা স্মরণ করতেন যে, [পবিত্র] আত্মা অনুসারে তিনি দাউদের সন্তানের চেয়ে বরং ছিলেন দাউদের প্রভু; এবং ‘শোন, ইস্রায়েল! আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু’ বাক্যটা খ্রিষ্টকে একমাত্র প্রভু সংক্রান্ত রহস্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, কেননা সেই মহান পিতৃকুলপতি ও নবী তাঁকেই আপন প্রভু বলেন যিনি প্রভুর ‘গর্ভ থেকে প্রভাতী তারার আগে’ জন্মিত হয়েছিলেন [সাম ১১০:৩ লাতিন পাঠ্য]। তিনি অবশ্যই বিধান বিষয়ে বিস্মৃত নন, ও ভাল করেই জানেন যে দ্বিতীয় কোন প্রভুকে স্বীকার করতে নেই বরং, বিধানের বিশ্বাস লঙ্ঘন না করেও তাঁকেই প্রভু বলে চিনে নিতে হয় যিনি স্বরূপগত জন্ম-রহস্যের গুণে অশরীরী ঈশ্বরের গর্ভ থেকে অস্তিত্বশীল হয়েছিলেন। যিনি একমাত্র প্রভুর স্বরূপের মধ্য দিয়ে এক থেকে এক, তিনি যে স্বরূপগত ভাবে প্রভু, তা তাঁর সহজাত অধিকার।

২৭। তবে, সন্দেহের জন্য আর কোন্ স্থান বাকি রয়েছে? এটাই ঘোষণা ক'রে যে বিধানের প্রথম আঙ্গা হলো একমাত্র প্রভুকে স্বীকার করা ও তাঁকে ভালবাসা, প্রভু নিজেই শাস্ত্রীকে উদ্দেশ্য করা বাণী দ্বারা নয় কিন্তু নবীর সাক্ষ্যদান দ্বারাই প্রমাণ করেছেন তিনিই প্রভু; তথাপি তিনি সবসময় নিজেকে প্রভু বলে প্রকাশ করেন এই ভিত্তিতেই যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর [অনন্তকালীন] জন্মের গুণে তিনি একমাত্র ঈশ্বর সংক্রান্ত রহস্যে অবস্থান করেন, কারণ যে জন্ম তাঁকে ঈশ্বরের স্বরূপ মঞ্জুর করে, তা নিজেতে ঈশ্বরের স্বরূপ বজায় রেখে ভিন্ন স্বরূপের দ্বিতীয় এক ঈশ্বরে সিদ্ধিলাভ করে না; এবং যেহেতু সেই প্রজনন সত্যকার প্রজনন, সেজন্য সেই প্রজনন পিতাকে প্রভু হতে বাধা দেয় না, ও পুত্র যে প্রভু নন তেমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হয় না। এইভাবে পিতা নিজের অধিকার হারান না ও পুত্র নিজের স্বরূপ বজায় রাখেন; এর ফলে পিতা ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু, ও একমাত্র জনিত ঈশ্বর সেই প্রভু তাঁরই থেকে বিচ্ছিন্ন নন যিনি একমাত্র প্রভু, যেহেতু প্রভু হিসাবে নিজের স্বরূপ তাঁরই থেকে অস্তিত্বশীল যিনি একমাত্র প্রভু। বিধানের ভিত্তিতে তিনি নিজে যেভাবে এটা শেখান যে একমাত্র প্রভু আছেন, সেইভাবে তিনি নবীর সাক্ষ্যদান দ্বারা নিজেকে প্রভু বলেও সপ্রমাণ করেন।

২৮। সুসমাচারের বিশ্বাস প্রতিবাদ করতে গিয়ে অভক্তিময় ক্ষিপ্ততার বাকি বিবাদ দ্বারা লাভবান হয়ে সংগ্রামরত থাকুক ও যে অস্ত্র দ্বারা সে নিজে আক্রান্ত সেই অস্ত্রাদি দ্বারা নিজেকে প্রতিরক্ষা করুক; এবং তার নিজের ধ্বংসের জন্য তৈরী অস্ত্র হাতিয়ার ক'রে জয়ী হতে হতে এটা প্রমাণ করুক যে, একমাত্র [পবিত্র] আত্মার বাণীই হলো একমাত্র বিশ্বাসের তত্ত্ব। খ্রিস্ট যেভাবে ঘোষিত তা-ই ছাড়া তিনি আর কোন কিছু নন, তথা, তিনি সত্যকার ঈশ্বর, তিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের গৌরবে নিত্য বিদ্যমান। যেমন যদিও এমনটা মনে হতে পারে তিনি বিষয়টা অস্বীকার করেন তবু তিনি নিজেকে বিধান অনুসারে প্রভু বলে ঘোষণা করেন, তেমনি যদিও এমনটা মনে হতে পারে তিনি নিজেকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন না তবু তিনি সুসমাচারেও সত্যকার ঈশ্বর বলে নিজেকে ঠিক তা-ই প্রকাশ করেন। তাঁকে তেমনটাই [অর্থাৎ তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর] স্বীকার না করার লক্ষ্যে ভ্রান্তমতপন্থীরা অজুহাত হিসাবে তাঁর এই বাণী উপস্থাপন করে, এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি

প্রেরণ করেছে, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে (ক)। কেননা যখন খ্রিস্ট বলেন, ‘তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর’, তখন তারা এমনটা ভাবে তিনি [ঈশ্বরের] একাকীত্বের ব্যতিক্রম দ্বারা সত্যকার ঈশ্বরত্ব থেকে নিজেকে পৃথক করেন। তাদের মতে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে একাকী ঈশ্বর বলে ছাড়া অন্যভাবে ভাবা যায় না। সত্যি কথা বলতে গিয়ে, আমরা যে সত্যকার দু’টো ঈশ্বরে বিশ্বাস করব, তা প্রৈরিতিক বিশ্বাস মানায় না, কারণ একমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ ক্ষেত্রে যা পরকীয়, তা সেই স্বরূপের সত্যের সমতুল্য বলে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কেননা একমাত্র ঈশ্বরের সত্যে একমাত্র ঈশ্বর থাকতে পারবেন না যদি না একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের স্বরূপের বাইরে অন্য ধরনের এমন সত্যকার ঈশ্বর রয়েছেন যিনি নিজের [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে তাঁর সঙ্গে একই স্বরূপের অধিকারী নন।

২৯। তাসত্ত্বেও, উপরোল্লিখিত বচনে তিনি যে নিজেকে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বর বলে ঘোষণা করলেন, তা যেন স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে, সেজন্য দরকার আছে আমরা আমাদের উত্তর আগেকার সেই ঘোষণার সঙ্গে জড়িত করব যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে ও ধারাবাহিক ভাবে এ বচনের সঙ্গে জড়িত। এইভাবে, বিশ্বাসের ক্রমগত প্রমাণসমূহের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তির আস্থা খ্রিস্টের সত্যকার ঈশ্বরত্ব বিষয়ক আমাদের বক্তব্যের শীর্ষে অবশেষে স্বস্তি পাবে। প্রথমে তিনি এবাণীর রহস্য উপস্থাপন করেন, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (ক), আরও, তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর (খ)। বহু রহস্যে পূর্ণ এই বিবিধ উপদেশের পরে উত্তরে শিষ্যদের একথা আসে, এখন আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন ও কারও প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকা আপনার দরকার হয় না। এতেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন (গ)। তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক পরাক্রম গুণেই শিষ্যেরা তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন; তাঁরা ভাবেন, সবই জানা ও মনের চিন্তা-ভাবনা

বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যে তাঁরই বৈশিষ্ট্য যিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত কিন্তু ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত নন, তা হতে পারে না। তাই, তাঁরা ঘোষণা করেন, তিনি যে ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন, তা তাঁরা বিশ্বাস করেন, কারণ তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকার বিরাজ করে।

৩০। প্রভু তাঁদের উপলব্ধি-শক্তির প্রশংসা করে উত্তরে বললেন, তিনি যে প্রেরিত হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছিলেন, অর্থাৎ ‘বেরোনো’ শব্দের দ্বারা তিনি অশরীরী ঈশ্বর থেকে নিজের [অনন্তকালীন] জন্মের মহাঘটনা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আগেও নিজের [অনন্তকালীন] জন্ম বিষয়ে কথা বলেছিলেন ও ‘বের হওয়া’ শব্দটাও আগে থেকে ব্যবহার করেছিলেন যখন বলেছিলেন, তোমরা তো আমাকে ভালবাস, ও বিশ্বাস কর যে, আমি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছি। আমি পিতা থেকে এই জগতের কাছে এসেছি (ক)। তিনি পিতা থেকে এই জগতে এসেছিলেন যেহেতু ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছিলেন। কেননা, আমরা যেন বুঝতে পারতাম যে ‘বেরিয়েছি’ শব্দ দ্বারা তাঁর [অনন্তকালীন] জন্মকেই নির্দেশ করছিলেন, সেজন্য এটাও যোগ দিলেন যে, তিনি পিতা থেকে বেরিয়েছিলেন। এবং যেহেতু তিনি পিতা থেকে বেরিয়েছিলেন যেহেতু ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছিলেন, সেজন্য ঈশ্বর থেকে তাঁর সেই বের হওয়াটা হলো প্রকৃতই একটা জন্ম যেটার পর পরে ‘পিতা’ নাম স্বীকারোক্তি অনুসরণ করে। তাই, যারা ঈশ্বর থেকে তাঁর বের হওয়া সংক্রান্ত এই রহস্য বুঝতেন, সেই প্রেরিতদূতদের তিনি একথা বললেন, তোমরা এখন বিশ্বাস করছ। দেখ, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এসেই গেছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়বে আর আমাকে একাই রেখে যাবে। আমি কিন্তু একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন (খ)। তাঁর সেই বের হওয়াটা যে পিতা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ নয় কিন্তু এমন জন্ম যা জন্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের স্বরূপকে বজায় রাখছিল, তেমনটা শেখাবার জন্য তিনি এটাও যোগ করে বললেন যে তিনি একা ছিলেন না বরং পিতা তাঁর সঙ্গে অর্থাৎ পরাক্রমে ও স্বরূপের ঐক্যেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কেননা সেই যে পিতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন ও তাঁর মধ্যে অবস্থান করছিলেন, সেই পিতাই তখন কাজ করছিলেন ও কথা বলছিলেন যখন তিনি কাজ করছিলেন ও কথা বলছিলেন। পরে, নিজের এই উপদেশের কারণ দেখাবার জন্য তিনি বলে চললেন, আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, তোমরা যেন আমাতে শান্তি পেতে পার। এই

জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ হবে, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি (গ)। তিনি এসমস্ত কিছু বললেন যেন তাঁরা তাঁর মধ্যে শান্তি পান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিবাদ-জনিত অনৈক্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপন না করেন। যাঁকে একা ফেলে রাখা হচ্ছিল তিনি একা ছিলেন না, ও যিনি ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে সেই ঈশ্বর ছিলেন যাঁর থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন। পরে, যখন তাঁরা জগতের ক্লেশ ভোগ করবেন, তখন যেন সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, কারণ তিনি জগৎকে জয় করেছিলেন যেহেতু ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছিলেন ও ঈশ্বর সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

৩১। পরিশেষে, গোটা রহস্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য তিনি স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, কারণ তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মাংসের উপর অধিকার দিয়েছ (ক)। যখন তিনি গৌরবান্বিত হবার জন্য যাচনা করেন, তখন তোমার কাছে তাঁকে কি দুর্বল মনে হয়? যাঁর দ্বারা তিনি গৌরবান্বিত হন, তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্য যদি তিনি গৌরবান্বিত হতে যাচনা না করতেন তবেই তিনি স্পষ্টভাবেই দুর্বল হতেন। গৌরব দান ও গৌরব প্রতিদান বিষয়ে আমরা অন্য পুস্তকে আলোচনা করেছি (খ), ও একই বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা একেবারে নিষ্পয়োজন। যাই হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যিনি তাঁকে গৌরব দান করেন, তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্যই তিনি গৌরব যাচনা করেন। নাকি, তিনি এজন্যই দুর্বল যে, সমস্ত মাংসের উপর অধিকার পেয়েছেন (গ)। প্রকৃতপক্ষে সেই অধিকার পাওয়াটা তবেই দুর্বলতারই চিহ্ন হত যদি যাদের তিনি পেয়েছিলেন তাদের অনন্ত জীবন দান করতে সক্ষম হতেন না। অথচ তিনি যে ‘পান’, ঠিক এই পাওয়াটাই তাঁর স্বরূপের নিম্নতা প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত। খ্রিষ্ট যদি জনিত বলে নয় কিন্তু অজনিত বলেই সত্যকার ঈশ্বর হতেন, তবে অবশ্যই সেই পাওয়াটা দুর্বলতার চিহ্ন হত। কিন্তু সেই অধিকার পাওয়াটা যখন শুধু সেই [অনন্তকালীন] জন্ম নির্দেশ করার জন্যই উল্লিখিত যা গুণে তিনি সমস্ত অস্তিত্ব পেয়ে আছেন, তখন পাওয়াটা দুর্বলতার চিহ্ন বলে গণ্য করা উচিত নয়, কারণ যিনি জন্ম নেন, সেই পাওয়াটা তাঁকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও

সিদ্ধ ঈশ্বর করে তোলে। একমাত্র জনিতজনের জন্য যখন অজনিত ঈশ্বর হলেন ঐশ্বরিক সুখে নিজের সিদ্ধ জন্মের প্রণেতা, তখন পিতা সংক্রান্ত রহস্য এটাই যে, পিতা সেই জন্মের প্রণেতা। অন্যদিকে, যখন তাঁকে প্রকৃত জন্ম দ্বারা তাঁর নিজের প্রণেতার প্রতিমূর্তি করে তোলা হয়, তখন সেই অধিকার পাওয়া [পুত্রের জন্য] কোন হ্রাসের কারণ হয় না। তাঁকে সমস্ত মাংসের উপরে অধিকার দেওয়া ও তিনি যেন সেই সমস্ত মাংসের কাছে অনন্ত জীবন দান করেন সেই লক্ষ্যেই তাঁকে সেই অধিকার দেওয়া, এসমস্ত কিছু দাতার পিতৃত্বও দেখায়, গ্রহীতার ঈশ্বরত্বও দেখায়। অধিকার দেওয়ায় পিতৃত্ব নির্দেশিত, অনন্ত জীবন দান করার জন্য অধিকার পাওয়ায় ঈশ্বর বলে পুত্র নির্দেশিত। সুতরাং পুত্রের পক্ষে সেই সমস্ত অধিকার স্বরূপগত ও সহজাত; এবং যেহেতু সেই অধিকার প্রদত্ত, এজন্যই তা তাঁকে প্রণেতা থেকে পৃথক করে না যেহেতু সেই অধিকার প্রদত্ত। যা প্রদত্ত, তা সেটার প্রণেতার নিজস্ব অধিকার তথা অনন্ত জীবন দান করা ও যা ক্ষয়শীল তা অক্ষয়শীলতায় রূপান্তরিত করা। তবে, পিতা সবই দান করেছেন ও পুত্র সবই গ্রহণ করেছেন; এবং পুত্র যে এটা বলেছেন, যা কিছু পিতার, তা সবই আমার (ঘ), তাতে দ্ব্যর্থতার শেলমাত্র নেই। এবং এক্ষেত্রে তাঁর বাণী কোন সৃষ্টবস্তুকে ও জড়পদার্থের কোন প্রক্রিয়াকে লক্ষ করে না (ঙ), কিন্তু তিনি আমাদের কাছে সুখময় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বরত্বের গৌরব প্রকাশ করেন, এটাও দেখান যে, ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি অনুসারেই বিবেচনা করা দরকার, যেমন তাঁর পরাক্রম, তাঁর অনন্ততা, তাঁর দূরদৃষ্টি, তাঁর অধিকার। এমনটা ভাবতে নেই যে ঈশ্বর এসমস্ত কিছুর অধিকারী কেমন যেন এসমস্ত কিছু বাদে অন্য কিছু বাকী থাকত; কিন্তু তিনি তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হলেন যাতে আমরা আমাদের ধীশক্তি অনুসারে তাঁর বিষয়ে কোন না কোন ধারণা ধারণ করতে পারি। অতএব, সেই একমাত্র জনিতজন, যা কিছু পিতার, আমাদের সেই সবই প্রকাশ করেন, ও পবিত্র আত্মা যে তাঁরই কাছ থেকে সেই সবই তুলে নেবেন একথা ঘোষণা করার পর তিনি বলে চলেন, যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন (চ)। যা কিছু পিতার, তা সবই তাঁর, অর্থাৎ তা দেওয়া হয়েছে ও

পাওয়া হয়েছে। কিন্তু যা যা দেওয়া হয়েছে তা তাঁর ঈশ্বরত্বকে নিম্নতর করে না, কেননা তাঁকে পিতার একই বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী করে তোলে।

৩২। যে নানা ধাপ দ্বারা তিনি নিজের বিষয়ে জ্ঞান দেবার জন্য ব্যবহার করে এসেছেন, আপাতত সেই ধাপ এ : তিনি শিখিয়েছেন তিনি পিতা থেকে বেরিয়েছেন, এটা ঘোষণা করেছেন যে, পিতা তাঁর সঙ্গে আছেন, এবিষয় সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি জগৎকে জয় করেছেন, পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হবেন ও তিনি নিজে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, তিনি পাওয়া অধিকারকে সমস্ত মাংসকে অনন্ত জীবন দেবার জন্য ব্যবহার করবেন ; অবশেষে তিনি এ গোটা তালিকা এবাণী দিয়ে সমাপ্ত করেন, এটিই অনন্ত জীবন : তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে (ক)। হে ভ্রাতৃমতপন্থী, যে বিশ্বাস অনন্ত জীবন দান করে, তুমি যদি সেটায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক নও, তাহলে সেবিষয়ে অন্তত কথা বলতেই শেখ। এবং তোমার পক্ষে সাধ্য হলে তবে খ্রিস্টকে ঈশ্বর থেকে পৃথক কর ; পিতা থেকে পুত্রকে, বিশেষভাবে সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার পুত্রকে পৃথক কর, কেননা যিশু খ্রিস্ট হলেন একমাত্র প্রভু ; অবশ্যই যদি এমনটা হয় যে, যেভাবে তুমি বল সেই অনুসারে অনন্ত জীবন হলো যিশু খ্রিস্ট-ছাড়া একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। কিন্তু, যে স্বীকারোক্তি খ্রিস্টকে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর থেকে পৃথক করে, যখন একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের সেই স্বীকারোক্তিতে অনন্ত জীবন নেই, তখন, আমাদের বিশ্বাস ক্ষেত্রে, আমরা কেমন করে তাঁকে সত্যকার ঈশ্বরকে পৃথক করতে পারি যখন, আমাদের পরিভ্রাণ ক্ষেত্রে, তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর থেকে পৃথক করতে পারি না ?

৩৩। আমি জানি, দুরূহ বিষয়ের অধিক স্থগিত করা সমাধান পাঠকদের প্রত্যাশার কাছে অসন্তোষজনক হয়। তথাপি আমি মনে করি যে, বিশ্বাসের পক্ষে এটা বেশ কয়েকটা সুবিধা হবে যদি পূর্ণ সত্যের বর্ণনা একটু সময় ধরে স্থগিত করতে পারি ও সুসমাচারের উপরোল্লিখিত বাণীকে হাতিয়ার করে আমি তোমার বিরুদ্ধে, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, লড়াই করতে পারি। তুমি তো প্রভুর এ ঘোষণা শুনছ, এটিই অনন্ত জীবন : তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে

জানবে (ক)। আমি জিজ্ঞাসা করি, খ্রিষ্ট যে সত্যকার ঈশ্বর নন, এই ধারণা কিসের দ্বারা উত্থাপিত হয়? খ্রিষ্ট বিষয়ে তোমাকে যে কি ভাবতে হবে, সেবিষয়ে তোমাকে অন্য কোন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে না; ‘যিশু খ্রিষ্ট’ ছাড়া অন্য কিছু নেই; তিনি যেভাবে প্রায়ই নিজেকে নির্দেশ করেন, সেই ‘মানবপুত্র’ নামটা নেই, সেই ‘স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনময় রুটি’ এর কথাও নেই যা দ্বারা তিনি অনেকের পদস্খলন ঘটিয়ে নিজের বিষয়ে ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি ‘তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ’ বলায় স্বাভাবিক ও ধারণা-করা নিজের সমস্ত নাম ও উপাধি ফেলে রেখেছেন। এইভাবে, যেহেতু একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সংদ্রান্ত ও যিশু খ্রিষ্ট সংদ্রান্ত স্বীকারোক্তি অনন্ত জীবন দান করে, সেজন্য ‘যিশু খ্রিষ্ট’ নামটা অবশ্যই ‘ঈশ্বর’ ছাড়া আর কোন কিছুই বোঝায় না।

৩৪। কিন্তু এমনটা হতে পারে যে, ‘তোমাকে, একমাত্র’ বলাটা খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা ও ঐক্য থেকে পৃথক করে। হ্যাঁ, বাক্যটা তাঁকে পৃথক করতে পারত যদি ‘তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর’ বাক্যের পর পরে তিনি যোগ না করতেন ‘এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে’। আমি পাঠকের সুবুদ্ধির কাছে জিজ্ঞাসা করি: পিতাকে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করার এ কর্তব্য ছাড়া যখন আমাদের খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করার কর্তব্যও রয়েছে, তখন যিশু খ্রিষ্ট বিষয়ে আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে? এমনটা কি হতে পারে যে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর খ্রিষ্টকে ঈশ্বর হতে দেন না? হ্যাঁ, তেমনটা হতেও পারত, যদি একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা খ্রিষ্টকে একমাত্র প্রভু হতে না দিতেন। কিন্তু যখন একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা খ্রিষ্টকে একমাত্র প্রভু হতে বাধা দেন না, তখন একই প্রকারে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতা খ্রিষ্টকে সত্যকার ঈশ্বর হতে বাধা দেন না, যেহেতু অনন্ত জীবনের যোগ্য হবার জন্য একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করা যথেষ্ট নয়, কিন্তু খ্রিষ্টেও বিশ্বাস করা দরকার।

৩৫। তবে, হে ভ্রান্তমতপন্থী, এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি: তোমার মূর্খ বোধশক্তি দিয়ে তুমি খ্রিষ্ট সম্পর্কে আমাদের কী বিশ্বাস করতে শেখাতে চাও? তিনি যে অনন্ত

জীবন দান করেন, তিনি যে যাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত হন তাঁকে গৌরবান্বিত করেন, তিনি যে জগৎকে জয় করেছেন, তিনি যে একা বলে পরিত্যক্ত হবার জন্য নিরুপিত ছিলেন তবু একা নন বরং নিজের সঙ্গে তাঁর পিতাই আছেন, তিনি যে ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছেন ও পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন, তা-ই কি আমাদের বিশ্বাস করতে শেখাতে চাও? তুমি কোন্ ঐশ্বরিক স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তাঁকেই আরোপ করবে যিনি তেমন মহৎ পরাক্রমের অধিকারী বলে [অনন্তকালীন] জন্ম নিলেন? ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছেন, সেই যিশু খ্রিস্টকেও যদি বিশ্বাস না করি, তবে পিতা যে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর তা বিশ্বাস করা অনর্থক। কেন তুমি দ্বিধাগ্রস্ত? খ্রিস্টের বিষয়ে স্বীকারোক্তি কেমন হওয়া উচিত তা আমাদের শেখাও। কেননা যা লেখা হয়েছে তা যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহলে যা লেখা হয়নি তা ছাড়া বিশ্বাস করার মত তোমার আর কীবা থেকে যায়? হে দুর্ভাগা ইচ্ছার মানুষ, হে সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মিথ্যা। যখন খ্রিস্ট বিশ্বাসে ও স্বীকারোক্তিতে সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তখন, জিজ্ঞাসা করি, কোন্ বিশ্বাস তাঁর সত্যকার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করবে ও তাঁকে সৃষ্টজীব মাত্র বলে ঘোষণা করবে যখন খ্রিস্টকে ছাড়া একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরে বিশ্বাস শূন্যই বিশ্বাস? কিন্তু, হে ভ্রান্তমতপন্থী, তোমার সঙ্কীর্ণতায়, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার তোমার অক্ষমতায়, স্বর্গীয় বাণীর অর্থ তোমার কাছে পৌঁছয় না; বরং ভ্রান্তির সাপ-জাতীয় বিষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি এটা জান না যে, অনন্ত জীবন পাবার জন্য একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সংক্রান্ত বিশ্বাসে খ্রিস্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করা দরকার।

৩৬। কিন্তু মণ্ডলীর বিশ্বাস একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতাকে স্বীকার করতে করতে খ্রিস্টকেও [সত্যকার ঈশ্বর] বলে স্বীকার করে। পিতাকে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার না করে মণ্ডলী খ্রিস্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করে না; একই প্রকারে, খ্রিস্টকে ছাড়া সে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতাকেও স্বীকার করে না। সে খ্রিস্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করে যেহেতু একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতাকে স্বীকার করে থাকে (ক)। এইভাবে, পিতা ঈশ্বর যে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, তা এটা সপ্রমাণ করে যে খ্রিস্ট সত্যকার ঈশ্বর। সেই স্বরূপগত জন্ম একমাত্র জনিত ঈশ্বরে কোন পরিবর্তন আনেনি, ও ঐশ্বরিক প্রজননের স্বরূপ অনুসারে যিনি অস্তিত্বশীল ঈশ্বর থেকে

ঈশ্বর বলে অস্তিত্বশীল হলেন, তিনি তাঁরই থেকে বিচ্ছেদ্য নন যিনি নিজের সত্যকার ঐশ্বরিক স্বরূপে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর। উপরন্তু, প্রকৃতি নিজের সাধারণ গতিপথ পালন করেছে, এর ফলে সত্যকার ঐশ্বরিক একটা স্বরূপ সত্যকার ঐশ্বরিক জন্ম ঘটাল, ও একমাত্র ঈশ্বর যিনি, তিনি নিজে থেকে অন্য ধরনের ঈশ্বরকে উৎপন্ন করেননি। এইভাবে ঈশ্বর-রহস্য একাকীত্বও উৎপন্ন করে না, ভিন্নতাও উৎপন্ন করে না, কেননা দ্বিতীয় এমন ঈশ্বর নেই যিনি নিজস্ব স্বরূপ সহ ঈশ্বর থেকে অস্তিত্ব পেয়েছেন, এবং সেই [অনন্তকালীন] জন্ম যাকে পিতা বলে স্বীকার করতে শেখায়, তিনিও [পুত্রের সঙ্গে] একক ব্যক্তি নন। সুতরাং, সঞ্জাত ঈশ্বর নিজের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য হারাননি ও তাঁরই স্বরূপগত পরাক্রমের অধিকারী, স্বরূপগত জন্মের গুণে যাঁর স্বরূপ নিজেতে রাখেন। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের পরিবর্তন বা অধঃপতন হয়নি, কারণ [অনন্তকালীন] জন্ম যদি কোন না কোন খুঁত এনে দিত, তাহলে সেই জন্ম সেই স্বরূপকে অপমানিত করত যা দ্বারা পুত্র অস্তিত্বশীল ছিলেন যেহেতু পিতা থেকে যে সত্তা আসছিল সেই সত্তা পিতার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর হত না। এর ফলে, যিনি [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে নতুন স্বরূপে পার হয়েছিলেন, সেই পরিবর্তন পুত্রকে অধঃপতিত করত না বটে, কিন্তু সেই পিতাকেই অধঃপতিত করত যিনি পুত্রের জন্মে নিজের স্বরূপের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছিলেন ও এমন কিছু জনিত করেছিলেন যা তাঁর কাছে বহিঃস্থ ও পরকীয়।

৩৭। কিন্তু, যেইভাবে আমি প্রায়ই মনে করিয়ে দিয়ে এসেছি, সেই অনুসারে পিতা ঈশ্বরের ও পুত্র ঈশ্বরের ঐক্যে সেই সমস্ত অপর্യാপ্ততা নেই যা মানবীয় ধারণার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেই ঐক্যে সম্প্রসার বা পরম্পরা বা নিঃসরণ নেই, কেমন যেন এমন একটা ঝরনার মত যা উৎস থেকে নিজের নানা জলস্রোত প্রবাহিত করে, বা এমন গাছের মত যা কাণ্ডে নিজের ডাল বহন করে, বা এমন আগুনের মত যা স্থানে স্থানে নিজের তাপ ছড়ায়। এসমস্ত ক্ষেত্রে রয়েছে বিচ্ছেদ ছাড়া সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়া : নানা অঙ্গ একত্রে আবদ্ধ ও নিজ নিজ থেকে অস্তিত্বশীল নয়, কারণ তাপ আগুনে, ডাল গাছে, ও জলস্রোত উৎসে রয়েছে। এইভাবে এক একটা বস্তুটা নিজেতে আলাদা অস্তিত্বের অধিকারী, কিন্তু এমন বস্তু নেই যা অন্য বস্তু থেকে উদ্গত, কারণ গাছ ডালের চেয়ে, আগুনও তাপের চেয়ে, ও ঝরনাও জলস্রোতের চেয়ে আলাদা কিছু হতে পারে না। কিন্তু একমাত্র জনিত ঈশ্বর

নিজেই ঈশ্বর, ও সিদ্ধ ও অনির্বচনীয় জন্ম গুণে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে অস্তিত্বশীল ; যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়, এ হলো সেই ঈশ্বরের সত্যকার প্রজন্ম, এ হলো অশরীরী স্বরূপের অশরীরী প্রজনন, এ হলো সত্যকার ও জীবনময় ঈশ্বর থেকে সত্যকার ও জীবনময় ঈশ্বর, এ হলো সেই ঈশ্বর যিনি ঈশ্বর থেকে অবিচ্ছেদ্য স্বরূপের অধিকারী। সেই [অনন্তকালীন] অস্তিত্ববিশিষ্ট জন্ম তাঁকে ভিন্ন স্বরূপের ঈশ্বর করেনি, ও সেই যে প্রজনন তাঁর সত্তাকে উৎপন্ন করছিল, জাত ক্ষেত্রে তা তাঁর সত্তাকে পরিবর্তন করেনি।

৩৮। কিন্তু, মাংসধারণ-ব্যবস্থার ফলে ও সেই বাধ্যতার মধ্য দিয়ে যা দ্বারা তিনি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করলেন, মানুষ বলে সঞ্জাত খ্রিষ্ট নিজের পরাক্রমকে ও ঐশ্বরিক স্বরূপকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে কিন্তু নিজের অবস্থাকে পরিবর্তন ক'রে নবীন একটা স্বরূপ আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করেছিলেন ও জন্মের পরে দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যে স্বরূপ দিয়ে তিনি স্বরূপগত ঐক্যে ছিলেন, পিতার সেই স্বরূপ এই মাংসধারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, কিন্তু নিজের সাময়িক অবস্থায় ধারণ করা নবীন স্বরূপ (ক) ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রম অধিকারী হয়েও মানবধারণের ফলে ঈশ্বরের স্বরূপকে শুধু নয়, [গৌরবে নিজের] ঐক্যও হারিয়েছিল (খ)। কিন্তু মাংসধারণের শেষ পরিণাম হলো এ : নিজের সম্পূর্ণতায় অর্থাৎ নিজের মনুষ্যত্বে ও নিজের ঈশ্বরত্বে পিতার ইচ্ছার প্রসন্নতায় পুত্র এখন পিতার স্বরূপের ঐক্যের সহভাগী হতে চলছিলেন, এবং যিনি ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রমে অবস্থান করছিলেন তিনি সেই স্বরূপের [ঐশ্বরিক] জাতেও অবস্থান করছিলেন। এতে মানুষ ঈশ্বর হবার সুযোগ অর্জন করছিল। কিন্তু ধারণ করা মানব স্বরূপ কোন মতেই ঈশ্বরের ঐক্যে অবস্থান করতে পারত না যদি না ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যে গিয়ে না পৌঁছত। যেহেতু বাণী-ঈশ্বর ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী ছিলেন, সেজন্য মাংস-হওয়া-বাণীও একইভাবে ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী হচ্ছিলেন। তাই, যদি মাংস বাণীর গৌরবের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হত, তাহলে মানুষ যিশু খ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বরের গৌরবে অবস্থান করতে পারতেন ও মাংস-হওয়া-বাণী মানবস্বরূপ অনুসারেও পিতার স্বরূপের ঐক্যে ফিরে আসতে পারত, কারণ ধারণ করা মাংস বাণীর গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। এটা দরকার ছিল যে, পিতা বাণীকে পিতার ঐক্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন যাতে পিতার

স্বরূপের অধিকারী পুত্র পুনরায় পিতাতে গৌরবান্বিত হতে পারতেন। মাংসধারণে ধারণ করা নবীন স্বরূপ [গৌরবেরই] সেই ঐক্যকে নষ্ট করেছিল, ও সেই ঐক্য যেমন আগে সিদ্ধ ছিল তেমনি এখন আর কিছুই হতে পারত না যদি না পিতা নিজেই [পুত্রের] ধারণ করা মাংসকে নিজের সাক্ষাতে গৌরবান্বিত না করতেন।

৩৯। [শিষ্যদের] মন অনেক দিন থেকে এই সত্য উপলব্ধি করতে প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেজন্য প্রভু এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিস্টকে জানবে (ক) বলার পর নিজের মাংসধারণে দেখানো বাধ্যতাকে নির্দেশ ক'রে বলে চললেন, তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি (খ)। পরে, আমরা যেন তাঁর বাধ্যতার ফল ও গোটা ঐশ্বরিক ব্যবস্থার রহস্য জানতে পারতাম, সেজন্য তিনি একথা যোগ করলেন, পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর (গ)। যে কেউ একেবারে এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে খ্রিস্ট ঐশ্বরিক স্বরূপকে রাখেন ও এটা বিশ্বাস করে না যে তিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হতে পারেন না, সে বলুক সে কেমন করে এ পরবর্তী যাচনা বুঝিয়ে দেবে, ‘পিতা, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে গৌরবান্বিত কর’। কোন্ কারণেই বা পিতা নিজের সাক্ষাতে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন? অথবা, এই বাক্যের অর্থ কী? বাক্যের অর্থের ফলাফল কী? কেননা পিতার পক্ষে গৌরবের কোন দরকার হয় না ও তিনি নিজের গৌরবের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করেননি। তিনি পুত্রকে নিজের সাক্ষাতে কেমন গৌরবান্বিত করবেন ও তাঁকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করবেন জগৎ হবার আগে পুত্রের যে গৌরব তাঁর কাছে ছিল? কিন্তু, ‘তাঁর কাছে ছিল’ এর অর্থ কী? খ্রিস্ট তো এমনটা বলেন না: জগৎ হবার আগে আমার যে গৌরব ছিল, যখন তোমার কাছে ছিলাম; কিন্তু তিনি বলেন ‘তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল’। কেননা ‘তোমার কাছে হওয়া’ বলতে তোমার পাশে আসীন হওয়া বোঝায়; কিন্তু ‘তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল’ বলতে তাঁর নিজের স্বরূপের রহস্যকে প্রকাশ করে। তাছাড়া, ‘তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে গৌরবান্বিত কর’ ও ‘আমাকে

গৌরবান্বিত কর' এক জিনিস নয়। তিনি যেন নিজের জন্য বিশেষ কোন গৌরবের অধিকারী হতে পারেন, এজন্যই যে তিনি গৌরবান্বিত হতে অনুরোধ করেন তা শুধু নয়, কিন্তু পিতাকে যাচনা করেন তিনি যেন তাঁর নিজের সাক্ষাতেই তাঁকে গৌরবান্বিত করেন। যাতে পুত্র আগের মত গৌরবের ঐক্যে অবস্থান করতে পারতেন এজন্য পিতার দরকার ছিল তিনি তাঁকে নিজের সাক্ষাতে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ গৌরবের ঐক্য মাংসধারণ-সূচিত বাধ্যতা দ্বারা বিলীন হয়েছিল। অর্থাৎ, এটাই দরকার ছিল, গৌরব আরোপণের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট সেই স্বরূপেই ফিরবেন যার সঙ্গে তাঁর [অনন্তকালীন] ঐশ্বরিক জন্ম-রহস্যের গুণে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন ও পিতা দ্বারা তাঁর নিজেরই সাক্ষাতে গৌরবান্বিত হবেন; এটাই দরকার ছিল, পিতার কাছে যা তাঁর আগে ছিল, তিনি পুনরায় সেটার অধিকারী হতে চলবেন, ও দাসের সেই রূপ-ধারণটা ঈশ্বরের রূপের স্থায়ী স্বরূপকে তাঁর পক্ষে পরকীয় করবে না, কিন্তু [এটাই দরকার ছিল,] পিতা তাঁর নিজের সাক্ষাতে দাসের সেই রূপকে গৌরবান্বিত করবেন যেন সেই রূপ সবসময়ের মত ঈশ্বরের রূপ হয়। কেননা যিনি ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করেছিলেন, তিনি এখন দাসের রূপে ছিলেন। এবং যেহেতু দাসের রূপের পক্ষে ঈশ্বরের রূপে গৌরবান্বিত হওয়া দরকার ছিল, সেইজন্যই দাসের রূপের পক্ষে গৌরবান্বিত হওয়া দরকার ছিল তাঁরই সাক্ষাতে যার রূপে দাসের রূপের স্থায়ী অবস্থার পক্ষে গৌরবান্বিত হওয়া দরকার ছিল।

৪০। কিন্তু প্রভুর এই বাণী যে নতুন বা সুসমাচারের শিক্ষার মধ্যে প্রথমবারের মত সন্নিবিষ্ট, তা নয়। তিনি নিজের প্রত্যাশার সেই অতিসুন্দর আনন্দের সঙ্গে পিতা ঈশ্বর সংক্রান্ত এই রহস্য বিষয়ে অর্থাৎ তাঁর নিজের সাক্ষাতে পুত্রের গৌরবারোপণ সংক্রান্ত রহস্য বিষয়ে সেই ক্ষণেই সাক্ষ্যদান করেছিলেন যে ক্ষণে যুদা তাঁকে ধরিয়ে দেবার লক্ষ্যে এগিয়ে আসছিলেন। সেই ক্ষণে, পরিত্রাণ-ব্যবস্থার আসন্ন সিদ্ধির জন্য আনন্দিত হয়ে তিনি বললেন, এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, আর তাঁকে অবিলম্বেই গৌরবান্বিত করবেন (ক)। আমরা, যাদের প্রাণ মাটির গড়া দেহ দ্বারা ভারাক্রান্ত, যাদের মন পাপের দুর্গন্ধময় চেতনায় দূষিত ও কলঙ্কিত, সেই আমরা কেমন করে এত দুঃসাহসে স্ফীত হতে পারি যে

তাঁর ঐশ্বরিক দাবি বিচার করব? আমাদের অভ্যন্তরীণ অপবাদ দিয়ে ঐশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমরা কেমন করে স্পর্ধা ভরে তাঁর স্বর্গীয় স্বরূপকে সমালোচনা করব? আমাদের স্বরূপের দুর্বলতা যেইভাবে তাঁকে করতে দিল, সেইভাবে প্রভু নিজের স্বরূপের মহিমার অযোগ্য কিছু না ব'লে সুসমাচারের বিশ্বাসকে অধিক সাধারণ কথায় ব্যক্ত করলেন ও নিজের উপদেশকে আমাদের বোধশক্তির জন্য উপযোগী করলেন। আমার মতে তাঁর এই প্রথম কথার অর্থ সন্দেহের বিষয় হতে পারে না, ‘এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন’। কেননা সমস্ত গৌরব বাণীর নয়, তাঁর মাংসেরই সুবিধার্থে নির্ধারিত ছিল; অর্থাৎ, তাঁর ঐশ্বরত্বের [অনন্তকালীন] জন্মের নয়, কিন্তু সেই ব্যবস্থার সুবিধার্থে নির্ধারিত ছিল যা মাংসধারণে সিদ্ধি লাভ করেছিল। জিজ্ঞাসা করি, পরবর্তী যে বাক্য, তথা ‘এবং ঐশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন’, সেই বাক্যের অর্থ কি? আমি তাঁকে একথা বলতে শুনতে পাচ্ছি, ঐশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, কিন্তু, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে সেই বাক্যের অর্থ যে কি, তা আমি জানি না। ঐশ্বর তাঁর মধ্যে, অর্থাৎ মানবপুত্রে, গৌরবান্বিত হলেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, মানবপুত্র ও ঐশ্বরের পুত্র, তা কি একই কথা? এবং যেহেতু এমনটা নয় যে, মানবপুত্র একজন ও ঐশ্বরের পুত্র অন্য একজন—কেননা বাণী হলেন মাংস—, এবং যেহেতু যিনি ঐশ্বরের পুত্র তিনি আবার একাধারে মানবপুত্রও, সেজন্য জিজ্ঞাসা করি: কোন্ ঐশ্বর এই মানবপুত্রে গৌরবান্বিত, সেই যে মানবপুত্র আবার একাধারে ঐশ্বরের পুত্রও?

৪১। ঐশ্বর সেই মানবপুত্রে গৌরবান্বিত যিনি ঐশ্বরের পুত্রও। যা তৃতীয় বচন হিসাবে যোগ করা হয়, এসো, দেখি সেটার অর্থ কী, ঐশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঐশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন (ক)। জিজ্ঞাসা করি, এই রহস্যে নিহিত সত্য কী? মানবপুত্রের গৌরবলাভে যে ঐশ্বর গৌরবান্বিত, ঐশ্বর তাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেন। ঐশ্বরের গৌরব মানবপুত্রে স্থিত, ও ঐশ্বরের পুত্রের গৌরবে রয়েছে ঐশ্বরের গৌরব। ঐশ্বর নিজেতে গৌরবান্বিত করেন। মানুষ নিজের দ্বারা আদৌ গৌরবান্বিত হয় না। আরও, যে ঐশ্বর মানুষে গৌরবান্বিত হন তিনি গৌরব পাওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর ছাড়া অন্য কেউ নন। কিন্তু যেহেতু মানবপুত্রের গৌরবলাভে যে ঐশ্বর ঐশ্বরকে গৌরবান্বিত করেন সেই ঐশ্বর তাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেন, সেজন্য আমি এটা

পাই যে, [মানব] স্বরূপের গৌরব সেই [ঐশ্বরিক] স্বরূপে ধারণকৃত হয় যা [মানব] স্বরূপকে গৌরবান্বিত করে। কেননা ঈশ্বর নিজেই গৌরবান্বিত করেন না কিন্তু নিজেতে সেই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেন যিনি মানুষে গৌরবান্বিত হন। ‘নিজেতে’ গৌরবান্বিত করা বলতে নিজেই গৌরবান্বিত করা বোঝায় না, তথাপি এটা বোঝায় যে, যিনি গৌরবান্বিত করেন তিনি সেই স্বরূপকে ধারণ করেন যা তাঁর নিজের স্বরূপের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছে। যে ঈশ্বর ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেন, তিনি তাঁকে গৌরবান্বিত করেন কারণ তিনি মানুষে গৌরবান্বিত হয়েছেন; তাই তিনি এটা বুঝিয়ে দেন যে, তিনি যে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেছেন সেই ঈশ্বর তাঁর মধ্যে রয়েছেন যেহেতু তাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেন। হে ভ্রাতৃমতপন্থী, তুমি যেই হও না কেন, তোমার কুটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যাশীল প্রতিবাদ উপস্থিত কর। একটা অন্যটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জোড়ানো হয়েও তথাপি সেই প্রতিবাদগুলো যেই বেশে নিজেদের উপস্থিত করুক না কেন নিজেদের ফাঁদ দিয়ে আমাদের চিন্তিত করবে না। মানবপুত্র গৌরবান্বিত ও ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত; এবং ঈশ্বর নিজেতে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন যিনি মানুষে গৌরবান্বিত হয়েছেন। মানবপুত্র যে গৌরবান্বিত, তা বলতে, ও ঈশ্বর যে মানবপুত্রে গৌরবান্বিত, তা বলতে, বা ঈশ্বর যে নিজেতে তাঁকে গৌরবান্বিত করেন যিনি মানুষে গৌরবান্বিত হন, তা বলতে একই কথা নয়। আমাদের বল, তোমার অভক্তিময় বিশ্বাসের ধারণা অনুসারে তুমি ‘ঈশ্বর মানবপুত্রে গৌরবান্বিত’ বাক্যে কী অর্থ আরোপ করতে ইচ্ছা কর? অবশ্যই এমনটা ভাবতে হয় যে ঈশ্বরের বাণী সেই খ্রিস্টকে নির্দেশ করে যিনি মাংসে গৌরবান্বিত হন; অথবা পিতাকেই নির্দেশ করে যেহেতু তিনি খ্রিস্টে গৌরবান্বিত হন। তবে, সেই বাণী যদি খ্রিস্টকেই নির্দেশ করে, তাহলে খ্রিস্ট অবশ্যই হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মাংসে গৌরবান্বিত হন। সেই বাণী যদি পিতাকে নির্দেশ করে, তাহলে ঐক্য-রহস্যই স্বীকৃত যেহেতু পিতা পুত্রে গৌরবান্বিত। তাই, যদি তুমি এটা মেনে নাও যে ‘ঈশ্বর’ শব্দটা খ্রিস্টকে নির্দেশ করে, তাহলে ইচ্ছা না করলেও তুমি তো তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার কর, অথবা, তুমি যদি ‘ঈশ্বর’ শব্দটা দ্বারা পিতাকে বোঝাও তাহলে খ্রিস্টে [বিদ্যমান] পিতা ঈশ্বরের স্বরূপকে অস্বীকার করতে পারবে না। মানবপুত্রের গৌরবায়ন ও খোদ ঈশ্বরত্বে গৌরবায়ন বিষয়ে একথা যথেষ্ট। তাছাড়া, ঈশ্বর যে নিজেতে সেই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত

করেন যিনি মানবপুত্রে গৌরবান্বিত হয়েছেন, তোমার মতে এতে তোমার অভক্তির জন্য এমন কোন্ বিকল্প দিক বাকি রয়েছে যাতে তুমি এটা সমর্থন কর যে, নিজের সত্যকার ঐশ্বরিক স্বরূপের ফলে খ্রিষ্ট সত্যকার ঈশ্বর নন? কেননা ঈশ্বর নিজেতে মানুষ বলে সঞ্জাত খ্রিষ্টকেই গৌরবান্বিত করেন; তিনি যে তাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেন, এর অর্থ হয় তো কি এমনটা হতে পারে যে, খ্রিষ্ট তাঁর বাইরে রয়েছেন? তিনি নিজেতে খ্রিষ্টকে সেই গৌরব ফিরিয়ে দেন যে গৌরব তাঁর সাক্ষাতে খ্রিষ্টের ছিল; এবং খ্রিষ্ট যে দাসের রূপ আপন করে নিয়েছিলেন, যখন সেই রূপ ঈশ্বরের রূপে ধারণ করা হয়, তখন [পিতা] ঈশ্বর নিজেতে মানুষে গৌরবান্বিত ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেন; হ্যাঁ, যে সঙ্কল্প অনুসারে খ্রিষ্ট নিজেকে শূন্য করেছিলেন, সেই সঙ্কল্পের আগে যে ঈশ্বর পিতাতে ছিলেন ও এখন দাসের রূপ দ্বারা ও তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম থেকে উদ্ভূত স্বরূপ দ্বারা পিতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, [পিতা] ঈশ্বর ঠিক সেই ঈশ্বরকেই গৌরবান্বিত করেন। কেননা সেই [অনন্তকালীন] জন্ম যে তাঁকে নবীন বা পরকীয় স্বরূপ-বিশিষ্ট ঈশ্বরকে করেছিলেন এমন নয়, বরং সেই প্রজনন দ্বারা তিনি স্বরূপগত পিতার স্বরূপগত পুত্র হয়েছিলেন। এবং মানুষ বলে তাঁর জন্মের পরে, যখন তিনি নিজের মনুষ্যত্বে গৌরবান্বিত হন, তখন পুত্র পুনরায় নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপের গৌরবে দীপ্তিমান হয়ে ওঠেন। মাংসধারণ-ব্যবস্থা ক্রমে পুত্র যে গৌরব থেকে নিজেকে শূন্য করেছিলেন, পিতার স্বরূপের সেই গৌরবে পুত্রকে ধারণ করায় ঈশ্বর নিজেতে পুত্রকে গৌরবান্বিত করেন।

৪২। প্রৈরিতিক বিশ্বাস তোমার একেবারে দুঃসাহসী অভক্তির ক্ষিপ্ততাকে বন্ধ করে দেয় পাছে তুমি খামখেয়ালী ব্যাখ্যা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আরও পথভ্রষ্ট হও, কারণ সেই বিশ্বাস বলে, এবং প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করবে, পিতা ঈশ্বরের গৌরবে যিশুই প্রভু (ক)। পিতা যাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেছেন, আমাদের তাঁকে পিতার গৌরবে স্বীকার করতে হয়; এবং যাঁকে পিতার গৌরবে স্বীকার করতে হয় ও যাঁকে পিতা নিজেতে গৌরবান্বিত করেছেন, তাঁর বিষয়ে আমাদের মেনে নিতে হয়, যা কিছু পিতার, অবশ্যই সেই সবই তাঁর, যেহেতু [পিতা] তাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেছেন, ও একইসঙ্গে আমাদের তাঁকে পিতার গৌরবে স্বীকার করতে হয়। এইমাত্র উল্লিখিত বচন অনুসারে তিনি ঈশ্বরের গৌরবে শুধু নয়, পিতা ঈশ্বরেরই গৌরবে রয়েছেন। এবং পিতা বাহ্যিক

একটা গৌরবে তাঁকে গৌরবান্বিত করেননি বরং তাঁকে ‘নিজেতেই’ গৌরবান্বিত করেছেন। যখন তিনি তাঁর নিজেরই গৌরবে, ও আগে, পিতার কাছে, তাঁর যে গৌরব ছিল, সেই গৌরবে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন, তখন পিতা তাঁকে নিজের কাছেও ও নিজেতেও গৌরবান্বিত করেন। এইভাবে এটা জানা যায় যে খ্রিষ্ট নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননায়ও এই বিশ্বাস থেকে অবিচ্ছেদ্য, কারণ তিনি ঠিক একথা বলেন, এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে (খ)। সুতরাং, প্রথমত, খ্রিষ্টকে ছাড়া পিতাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে চিনে নিলে অনন্ত জীবন হয় না; দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্ট পিতাতে গৌরবান্বিত হোন। অনন্ত জীবন ঠিক এটা: একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে ও যাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন তথা যিশু খ্রিষ্টকে জানা; তাই খ্রিষ্টকে ছাড়া ঈশ্বরে বিশ্বাস জীবন হলে তবে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বকে একেবারে অস্বীকার করা হোক। এবং পিতা ঈশ্বর যে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, এসত্য খ্রিষ্ট-ঈশ্বর সম্পর্কে অসত্য হোক যদি খ্রিষ্টের গোটা গৌরব সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতাতে স্থিত না থাকে। পিতা যখন তাঁকে নিজেতে গৌরবান্বিত করেন, ও পিতা যখন একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, তখন খ্রিষ্ট একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের কাছে পরকীয় নন, কারণ একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতা ঈশ্বরের গৌরবে উন্নীত খ্রিষ্টকে গৌরবান্বিত করেন। এবং যখন তিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর দ্বারা গৌরবান্বিত হন, তখন একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর থেকে পরকীয় কিছু বলে বিচ্যুত নন, কারণ একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর নিজেতেই তাঁকে গৌরবান্বিত করেন।

৪৩। কিন্তু এমনটা হতে পারে যে তোমার ভক্তিহীন অবিশ্বাস আমাদের এই ভক্তিময় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এটা সমর্থন করবে যে, পরবর্তী বচনে উল্লিখিত অক্ষমতা-স্বীকার সত্যকার ঈশ্বরের ধারণা ক্ষেত্রে পরকীয়, আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন (ক)। ইহুদীদের দ্বিবিধ বিরক্তি (খ) যদি দ্বিবিধ প্রতিবাদ দাবি না করত, তবে এমনটা বলা যে পুত্র নিজে থেকে এমন কিছুই করতে পারেন না যা তা করতে পিতাকে দেখেছেন, তা অবশ্যই দুর্বলতা-স্বীকার হত। কিন্তু, সেই যে ইহুদীরা খ্রিষ্টকে শাব্বাৎ-লঙ্ঘন দায়ে অভিযুক্ত করছিল ও এটা সহ্য করছিল না যে ঈশ্বরকে

নিজের পিতা বলে ডেকে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান করতেন, যখন খ্রিষ্ট, সেই একই বচনে, সেই ইহুদীদের দ্বিবিধ প্রতিবাদে উত্তর দিয়েছেন, তখন তুমি কি এমনটা মনে কর যে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই উত্তরের বাহ্যিক রূপে মন স্থির করায় বচনের সত্য গুপ্ত থেকে যাবে? আমরা এবচন সম্পর্কে অন্য একটা পুস্তকে (গ) আলোচনা করেছি, কিন্তু, যেহেতু বিশ্বাসের সত্যগুলো পুনরাবৃত্তি ক্ষতিকর নয় বরং উপকারিতা আনে, সেজন্য এসো, সেই বচনটা পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে পাঠ করি।

৪৪। [যিশুর] উত্তরের প্রয়োজনীয়তা একথা থেকে উঠেছিল, এজন্যই ইহুদীরা যিশুকে নিপীড়ন করছিল ও তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করছিল, কেননা তিনি শাব্বাৎ দিনে এই সমস্ত করছিলেন (ক)। সুতরাং, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ঈর্ষায় এতই জ্বলছিল যে তাঁকে হত্যা করতে আকাঙ্ক্ষা করছিল কারণ তিনি নিজের কাজ শাব্বাৎ দিনে সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু, এসো, সেই উত্তরও দেখি যা তিনি দিয়েছিলেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি (খ)। হে ভ্রাতৃমতপন্থী, তোমাকে অনুরোধ করি, আমাকে বল পিতার এ কাজ কী। কেননা দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু পুত্রের দ্বারা ও পুত্রতেই হয়। এবং তুমি যে সুসমাচারের চেয়ে বেশি জান, সেই তুমি অবশ্যই অন্য কোন গুপ্ত উৎস থেকে পিতার কাজ সম্পর্কে এমন জ্ঞান অর্জন করেছ যাতে পিতাকে তাঁর নিজের কর্মকাণ্ডে আমাদের প্রকাশ করতে পার। কিন্তু পিতা পুত্রতেই কাজ সাধন করেন সেইভাবে যেভাবে পুত্র নিজে বলেন, আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন (গ)। তবে তুমি কি, ‘আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন’ বাক্যের অর্থ ধরতে পার? পুত্র এজন্য একথা বলেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে পিতার স্বরূপের সেই অধিকার চিনে নিতে পারি যা শাব্বাৎ দিনের কাজে তাঁর স্বরূপের পরাক্রম ব্যবহার করে। যখন পুত্র কাজ করেন, যেহেতু তখন পিতাই পুত্রতে কাজ করেন, সেজন্য এটা আবশ্যিক যে, যখন পিতা কাজ করেন তখন পুত্রই কাজ করেন, ও সেইজন্যই তিনি বলেন, ‘আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন’ যাতে করে তাঁর সমস্ত কথা ও কাজের প্রকৃত ফলাফলও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান পিতৃস্বরূপের কাজ বলে গণ্য হয়। তিনি ‘এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন’ বাক্যটা কাজ করার কাল ও কথা বলার কাল একই কাল

বলে উপস্থাপন করে, এবং এর ফলে যেন এমনটা বিশ্বাস করা না হয় যে, পিতার কাজ তাঁর নিজের এইকালে সম্পাদিত কাজ থেকে ভিন্ন; আরও, ‘পিতা এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন’ বাক্যটা বোঝাতে চায় যে পিতার কাজ পুত্রের কথা বলার একই সময়েই হয়। তাছাড়া, পাছে পিতা-জ্ঞানেই মাত্র গন্ডিবদ্ধ এমন বিশ্বাস অনন্ত জীবনের প্রত্যাশাবিহীন হয়, সেজন্য তিনি অবিলম্বে একথা বলে চললেন, ‘আর আমিও কাজে রত আছি’ অর্থাৎ, পিতা এখন যা করেন, পুত্রও তা করেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধ বিশ্বাস বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, কেননা যা ‘এখন’ সম্পাদিত হয়, তা যৌথভাবেই সম্পাদিত; এমনকি পিতা যা করেন পুত্রও তা করেন এমনটা বলাটা তাঁদের ঐক্য যে একক ব্যক্তিতে একীভূত, তেমন তত্ত্ব বর্জন করে। কিন্তু শ্রোতাদের বিরক্তি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে; বাস্তবিকই বচনের পরবর্তী বাণী এ, এজন্যই ইহুদীরা আরও প্রবল ভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করতে লাগল, কারণ তিনি যে শাব্বাৎ দিন লঙ্ঘন করছিলেন, তা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলছিলেন ও এইভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন (ষ)। এবং এখানে আমি আর একবার মনে করিয়ে দেব যে, সুসমাচার-রচয়িতার বিবেচনায় ও মানবজাতির মিলিত সম্মতিক্রমে পুত্র পিতার স্বরূপের সমান স্বরূপের অধিকারী; আরও, একই স্বরূপ থেকে উদ্ভূত না হলে সমতা হয় না, কারণ যে জন্ম নেয় সে নিজের উৎপত্তি থেকে ছাড়া অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না, ও যে কেউ জনিত সে জনকের কাছে পরকীয় হতে পারে না, যেহেতু সে যা, তাতে অস্তিত্বশীল হবার জন্য সেই জনকের কাছ থেকেই অস্তিত্ব পায়। সুতরাং এবার দেখি, সেই দ্বিবিধ বিরক্তির সামনে প্রভু কি উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা-ই করেন’।

৪৫। যদি আমরা একথাগুলো বচনের অখণ্ড অংশ বলে গণ্য না করি, তবে জোর দিয়েই সেগুলোর উপরে স্বেচ্ছাকারী ও বিশ্বাস-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা আরোপ করি। কিন্তু যদি খ্রিস্টের উত্তর ইহুদীদের বিরক্তির কারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিল রাখে, তাহলে আমাদের বিশ্বাস যা শেখাতে অভিপ্রায় করে তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে, ও অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস নিজের ভক্তিহীন ভ্রান্তি রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং, এসো, দেখি উত্তরটা শাব্বাতের দিনে

কাজ করা ক্ষেত্রে অভিযোগ সম্পর্কে উপযোগী কিনা, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন (ক)। একথা বলার কিছুক্ষণ আগে তিনি বলেছিলেন, আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি (খ)। তবে, যদি নিজের মধ্যে বিদ্যমান পিতার স্বরূপের অধিকার গুণে পুত্র যা কিছু করেন তা তিনি এজন্যই করেন যেহেতু পিতাই কাজ করেন—এবং তিনি ঠিক শাব্বাৎ দিনেই এখন পর্যন্ত কাজে রত আছেন—তাহলে পুত্র পিতার কাজের অধিকারের কথা উত্থাপন করায় শাব্বাৎ দিনে কাজ করার ব্যাপারে দোষমুক্ত হন। ‘পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না’ বাক্যের মধ্য দিয়ে তিনি অক্ষমতা নয় কিন্তু অধিকারেরই কথা নির্দেশ করেন; কেননা তিনি যা দেখেছেন তা ছাড়া নিজে থেকে অন্য কিছুই করতে পারেন না। তবে দেখাটা [কোন কিছু] করার অধিকার দেয় না, এবং যেহেতু দেখাটা [কোন কিছু] করার অধিকার দেয় না, সেজন্য না দে’খে [কোন কিছু] করতে না পারাটা স্বরূপকে দুর্বল করে না, কিন্তু এটা দেখায় যে, তাঁর অধিকার দেখার উপরে নির্ভর করে। ‘যা করতে দেখেন’ বাক্যটা দেখা ক্ষেত্রে চেতনা নির্দেশ করে, সেইভাবে যেভাবে তিনি প্রেরিতদূতদের বলেন, চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে (গ)। অতএব, নিজের মধ্যে বিদ্যমান ও নিজের কাজের মধ্য দিয়ে সক্রিয় পিতার স্বরূপ বিষয়ে সচেতন হয়ে তিনি বলেন, ‘নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন’। তাঁর অভিপ্রায়, পাছে এমনটা ভাবা হয় যে শাব্বাতের প্রভু শব্বাতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন; আরও, তিনি এটা দেখাতে ইচ্ছা করেন যে, পুত্র যা কিছু করেন, তা নিজের মধ্যে সক্রিয় স্বরূপ বিষয়ে চেতনা থেকে আসে; তিনিও এজন্যই শাব্বাৎ দিনে সক্রিয় যেহেতু পিতা এখন পর্যন্ত শাব্বাৎ দিনে সক্রিয়। কিন্তু পরবর্তী কথায় তিনি ইহুদীদের বিরক্তির দ্বিতীয় কারণটা নির্দেশ করেন, কারণ পিতা যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা-ই করেন (ঘ)। পিতা যা কিছু করেন, পুত্রও যদি তা না করেন, পিতার কাজের চেয়ে যদি পুত্রের পরাক্রম ও কার্যকারিতা ক্ষেত্রে কোন না কোন পার্থক্য মান্য করা হয়, পরাক্রম ও স্বরূপ ক্ষেত্রে যা নিজস্ব তা সম্পর্কে যদি সমান গৌরব স্বীকৃত না হয়, তবে, [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] ঈশ্বরের পুত্রের উপরে দুর্বলতার অভিযোগ চাপাও ও

স্বরূপের সমতাও অস্বীকার কর। তিনি নিজেই অবিলম্বে একথা বলে চলেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না ৬। যখন গৌরব ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে না, তখন, যদি পার, তবে সেই অসমতা আবিষ্কার কর; যখন উভয় [অর্থাৎ পিতা ও পুত্র] কর্মে একই পরাক্রম দেখান, তখন স্বরূপের দুর্বলতা প্রমাণ কর।

৪৬। কেন তুমি তাঁর ঈশ্বরত্বকে অবনমিত করার জন্য তাঁর উত্তরের কারণকে মিথ্যা ব্যাখ্যা কর? শাক্ষাৎ দিনে কাজ করার অভিযোগে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি কিছুই করতে পারতেন না যদি না পিতাকে তা করতে না দেখতেন; পিতার সঙ্গে নিজের সমতা প্রমাণ করার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন, পিতা যা করতেন তিনি সেই সবই করতেন। পিতা যা কিছু করেন তা যদি পুত্রও একইভাবে না করেন, তবেই শাক্ষাৎ দিন সংক্রান্ত তাঁর উত্তর ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিষয়ক তোমার অভিযোগ প্রয়োগ কর। কিন্তু যদি সেই ‘যা কিছু’ শব্দটা সবকিছু নির্বিশেষেই অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে যখন কোন ক্ষেত্রেও এমন কিছু নেই যা পিতা করতে সক্ষম ও পুত্রও তা করতে অক্ষম, তখন কোথায়ই বা তুমি সেই দুর্বলতা পাবে? অথবা, যখন উভয়ের জন্য এক ও একই গৌরব দাবীকৃত, তখন দুর্বলতার একটা প্রমাণ উপস্থাপন ক’রে কোন্ ক্ষেত্রে উভয়ের সমতা অস্বীকার করা যায়? উভয় যখন কর্মক্ষেত্রে একই পরাক্রমের অধিকারী ও উপাসনা ক্ষেত্রে একই ভক্তির অধিকারী, তখন, যেহেতু পিতা ও পুত্র উভয়েই কর্মক্ষেত্রে একই পরাক্রমের অধিকারী ও গৌরবে সমতার অধিকারী সেজন্য আমি বুঝে উঠতে পারি না নিম্নতর স্বরূপের অবমাননা কিসেতে রয়েছে।

৪৭। আমরা উপরে উল্লিখিত বচন বিষয়ে আলোচনা করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যা বাস্তবতার উপরে স্থাপিত; তাসত্ত্বেও, ‘নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন’ প্রভুর এই বাণী যেন ভক্তিহীন ভাবে তাঁর স্বরূপের নিম্নতা সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু, যে স্বরূপের জোরে তিনি শাক্ষাৎ দিনে বৈধভাবে কাজ করেছিলেন, পুত্রকে বিদ্যমান পিতার সেই স্বরূপের সচেতন অধিকার প্রমাণ করার জন্যই যেন প্রভুর সেই বাণী ব্যবহৃত হয়, সেজন্য

এক্ষেত্রে সেই ধারণা উপস্থাপন করা দরকার যা প্রভুর আর একটা বচনে ব্যক্ত। এই বচনে তিনি বলেন, আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা যা আমাকে শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি (ক)। পুত্র যে পিতাকে যা করতে দেখেন তা ছাড়া কিছুই করতে পারেন না, তুমি কি একথার অর্থ বোঝ? এবং ‘আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না’ বাক্যে নিহিত রহস্যও বুঝতে পার? আরও, ‘তিনি আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি’ বাক্যের অর্থও বুঝতে পার? পিতা তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন বিধায় যখন তিনি নিজে থেকে কিছুই করেন না, তখন, তিনি পিতার মনোমত কাজ করে থাকেন বিধায় কেনই বা পিতা তাঁকে একা রেখে যাননি? হে ভ্রাতৃমতপন্থী, এ দু’টো ভিন্ন বাক্যের মধ্যে, তথা, তিনি যে নিজে থেকে কিছুই করেন না ও কেবল তা-ই করেন যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান পিতা তাঁকে শেখান, ও অন্যদিকে এমনটা বলা যে, তিনি পিতার মনোমত কাজ করেন বিধায় পিতা তাঁর মধ্যে রয়েছেন, হ্যাঁ, তোমার দৃষ্টিকোণে এই বাক্য দু’টোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। পিতা যে তাঁর মধ্যে রয়েছেন, এই কারণেই যদি তিনি কিছুই না করেন, তবে, তিনি যে পিতার মনোমত কাজ করেন, এভিত্তিতে তিনি কেমন করে এমন যোগ্যতা অর্জন করলেন যাতে পিতা তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন? তিনি যা করেন, তা যে নিজে থেকে করেন না, তাতে যোগ্যতা বলতে কিছুই নেই। অন্যদিকে, পুত্র যা করেন, সেই কাজ কেমন করে পিতার মনোমত হলো যখন পিতা পুত্রে অবস্থান করেন বিধায় স্বয়ং পিতাই সেই কাজ করেছেন? হে অভক্তি, তুমি সঙ্কুচিত, এবং আমাদের বিশ্বাসের অন্ধ-সুসজ্জিত ভক্তি তোমাকে চারদিকে চাপ দেয়। হয় পুত্র কাজ করেন, না হয় তিনি কাজ করেন না: যদি তিনি কাজ না করেন, তাহলে নিজের কাজের জন্য কেমন করে পিতার মনোমত হতে পারেন? কিন্তু যদি কাজ করেন, তাহলে কোন্ অর্থে তিনি নিজে থেকে না করা কাজে কাজ করেন? কেননা, এক দিকে তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পিতার মনোমত কাজ করেছেন, অন্যদিকে, যা করা হয়েছে, তা নিজে থেকে করা হয়নি বিধায় তাতে কোন যোগ্যতা নেই।

৪৮। হে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বরূপের ঐক্য এ বৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত : তা সেই উভয়তে [পিতা ও পুত্রতে] যদিও স্বতন্ত্রভাবে নয় তবু বিশিষ্টভাবেই সক্রিয়, ও যদিও বিশিষ্টভাবে সক্রিয় তবু স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় নয়। ভালো মত বোঝ : পুত্র সক্রিয় ও পিতা তাঁর মধ্য দিয়ে সক্রিয়। তিনি নিজে থেকে সক্রিয় নন, যেহেতু আমরা দেখাতে পারি যে, পিতা তাঁর মধ্যে রয়েছেন। তিনি বিশিষ্টভাবে সক্রিয়, কারণ পুত্র হিসাবে তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে পিতার মনোমত কাজ করেন। তিনি যা করেন তা যদি এমনভাবেই করতেন যা পিতার মনোমত নয়, তবেই তিনি যে নিজে থেকে কাজ করেন না, তা দুর্বলতা নির্দেশ করতে পারত। তিনি যা করেন ও যা দ্বারা তিনি মনোমত, তা যদি নিজেই না করতেন কিন্তু তাঁর মধ্যে অবস্থানকারী পিতার কাজ দ্বারাই মাত্র উদ্দীপিত হয়ে তা করতেন, তবে তিনি ঐশ্বরিক স্বরূপের ঐক্যে থাকতেন না। সুতরাং, তাঁর মধ্যে অবস্থান করায় পিতা তাঁকে দিক-নির্দেশনা দেন, এবং পুত্র কাজ করায় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন না ; এবং যদিও পুত্র স্বতন্ত্রভাবে কাজ না করেন, তবু নিজেই কাজ করেন যেহেতু পিতার মনোমত কাজ করেন। এইভাবে স্বরূপের ঐক্য উভয়ের কাজে সংরক্ষিত, কারণ একজন প্রত্যক্ষভাবে কাজ করলেও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেন না, ও অন্যজন কাজ না করলেও তবু সক্রিয়।

৪৯। এটার সঙ্গে সেই বচনও যোগ কর যা দুর্বলতা বিষয়ে দুর্বলতা দায়ে তাঁকে দোষী বলে সাব্যস্ত করার জন্য তুমি অন্যায়ভাবে দখল কর, তথা, পিতা আমাকে যা কিছু দান করেন, তা আমার কাছে আসে, এবং যে কেউ আমার কাছে আসে, তাকে আমি আদৌ বিচ্যুত করি না, কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি (ক)। কিন্তু এবিষয়ে একজন বলতে পারত : ইচ্ছা ক্ষেত্রে পুত্রের স্বাধীনতা নেই, তাই তাঁর স্বরূপের দুর্বলতা তাঁর উপরে নিজের অনিবার্য নিয়ম চাপিয়ে দেয় ; এর ফলে তিনি স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি নয়, বাধ্যবাধকতার প্রতিই বশীভূত, যাতে পিতা থেকে আগত হয়ে যাদের তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তাদের যেন বিচ্যুত না করতে পারেন। তথাপি প্রভু ঐক্য-রহস্য এতে বুঝিয়ে দেন, কারণ, তাঁকে যাদের দেওয়া হয়েছে তিনি তাদের বিচ্যুত করেন না, ও নিজের ইচ্ছা পালন না করে বরং তাঁরই ইচ্ছা পালন করেন যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি এ

শেষ কথা পুনরায় বলার পর যখন ইহুদীরা গজগজ করতে শুরু করে তখন তিনি এই বলে আমাদের এই ব্যাখ্যার অর্থ সপ্রমাণ করেন, যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে। কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে (খ)। তবে আমি সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করি কোথায় পিতাকে শোনা হয়েছিল ও কোথায় তিনি শ্রোতাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই পিতাকে দেখেনি তিনি ছাড়া যিনি ঈশ্বর থেকে আগত। এবং কেউই যাঁকে কখনও দেখেনি, কেমন করে একজন তাঁকে শুনতে পেরে? যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে সে-ই পুত্রের কাছে আসে; ও যে কেউ পুত্রের শিক্ষা শুনেছে, সে সেই পিতার স্বরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ শুনেছে ও শিখেছে যিনি পুত্রে বিদ্যমান। এর ফলে, যিনি শিক্ষা দেন যখন সেই পুত্রকে শোনা হয়, তখন এটা ভাবতে হয় যে, পিতারই শিক্ষা শোনা হয়। কেননা কেউই পিতাকে দেখেনি, ও যে কেউ পিতার কাছে আসে সে পুত্রের কাছে আসবার জন্য পিতার শিক্ষা শোনে; সুতরাং এ স্পষ্ট যে, পিতা পুত্রের বাণীর মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করেন, ও যদিও কেউই তাঁকে দেখেনি, তবু তিনি পুত্রের অভিব্যক্তিতেই কথা বলেন, কারণ সিদ্ধ জন্মের গুণে পুত্র নিজেতে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করেন যা পিতার স্বরূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাই, একমাত্র জনিত ঈশ্বর পিতার অধিকার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা ক’রে ও একইসঙ্গে পিতার স্বরূপের সঙ্গে নিজের ঐক্যকে রক্ষা ক’রে একদিকে পিতা দ্বারা যাদের তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছে তাদের বিচ্যুত করেন না, অন্যদিকে নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছা পালন করেন। তিনি যা করেন তা যে তিনি করতে ইচ্ছা করেন না এজন্যই যে তেমনটা ঘটে এমন নয়, অথবা, তিনি যখন শিক্ষা প্রদান করেন তখন যে তিনিই কথা বলেন না এজন্যও যে তেমনটা ঘটে এমন নয়, কিন্তু তেমনটা ঘটে যাতে তিনি তাঁকেও প্রকাশ করতে পারেন যিনি তাঁকে পাঠান, ও যাঁকে ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সহ পাঠানো হয়েছিল সেই নিজেকেও প্রকাশ করতে পারেন। কেননা তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন, সম্পাদন করেন ও বলেন—তিনি নিজেই তো একথা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেন—তা সবই হলো পিতার ইচ্ছা, কাজ ও বাণী।

৫০। কোন দ্ব্যর্থতার লেশমাত্র না রেখে পুত্র তখনই দেখান তিনি স্বাধীন ইচ্ছা বিহীন নন যখন বলেন, পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন (ক)। যখন পরাক্রমের অধিকার ও গৌরবের মর্যাদা পিতাতে ও পুত্রেতে সমান বলে নির্দেশ করা হয়, তখন ইচ্ছার স্বাধীনতাও প্রকাশিত হয়; এবং যখন তাঁদের ঐক্যকে দেখানো হয়, তখন পিতার ইচ্ছার প্রতি পুত্রের আসক্তি নির্দেশ করা হয়। পুত্র তা করেন যা পিতা ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে ইচ্ছা পালন করা অনেক বেশি, কারণ ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়া এমনটা নির্দেশ করে যে, বাহ্যিক একটা অধিকার রয়েছে, কিন্তু ইচ্ছা পালন করা ঐক্যেরই চিহ্ন যেহেতু তা ইচ্ছাকৃতই একটা কাজ বোঝায়। তবে, যখন পুত্র পিতার ইচ্ছা পালন করেন, তখন উভয়ের স্বরূপের সমতার মধ্য দিয়ে তিনি এটা শেখান যে, স্বরূপে, তাঁর ইচ্ছা পিতার ইচ্ছার সঙ্গে সমান, কারণ তিনি যা করেন সেই সবই হলো পিতার ইচ্ছা। অবশ্যই, পুত্র সেই সবই ইচ্ছা করেন যা পিতা ইচ্ছা করেন, একই স্বরূপের ইচ্ছাও ভিন্নতা মানায় না। সেটাই পিতার ইচ্ছা যেটা পুত্র এবাণী দিয়ে নির্দেশ করেন, এটিই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং আমি যেন শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করি (খ)। অতএব, এবার শোন যদি পুত্রের ইচ্ছা পিতার ইচ্ছা থেকে ভিন্ন, কেননা তিনি বলেন, পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে (গ)। তাই এতে আর কোন সন্দেহ নেই যে পুত্র ইচ্ছা করতে পারেন, কারণ, পিতা যখন ইচ্ছা করেন যারা পুত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা অনন্ত জীবন পায়, তখন পুত্র ইচ্ছা করেন বিশ্বাসীরা সেইখানে থাকবে যেখানে তিনি আছেন। যদি না এমনটা হয় যে, খ্রিস্টের সঙ্গে সহবাস করাটা অনন্ত জীবন নয়, অথবা যদি না এমনটা হয় যে, যখন পুত্র বলেন, পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও সে-ই ছাড়া যার কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন (ঘ), তখন যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে খ্রিস্ট তাদের সিদ্ধ ও সুখময় দানগুলো প্রদান করেন না। হয় তো এমনটা কি হতে পারে যে, পুত্র যখন পিতা সংক্রান্ত রহস্য-জ্ঞান আমাদের দিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর ইচ্ছা করার স্বাধীনতা নেই? নাকি তাঁর ইচ্ছা তত স্বাধীন নয় যার

ফলে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে নিজের বিষয়ে ও পিতা বিষয়ে জ্ঞান দান করতে পারেন না? এইভাবে, [অনন্তকালীন] জন্ম ও ঐক্যের গুণে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সম-স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ইচ্ছা ক্ষেত্রে পুত্র স্বাধীন, হ্যাঁ, তিনি যা স্বেচ্ছায় করেন, তা পিতার ইচ্ছার কাজ।

৫১। যে কেউ আমাদের বিশ্বাসের সত্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, সে সেটার রহস্যগুলো উপলব্ধি করতে পারে না, ও যে কেউ সুসমাচারের সমস্ত শিক্ষাদান গ্রাহ্য করেনি, সে সুসমাচারের প্রত্যাশা থেকে দূরে চলাচল করে। স্বরূপের ঐক্যে, পরাক্রমের প্রতাপে, গৌরবের সমতায় ও [পুত্রের অনন্তকালীন] জন্মের প্রজননে পিতা যে পুত্রে ও পুত্র যে পিতাতে তা বিশ্বাস করা দরকার। প্রতিবাদে তুমি একথা বলতে পার যে, প্রভুর এই সাক্ষ্যদান আমাদের এই ঘোষণার বিরোধী কেননা তিনি বলেন, পিতা আমার চেয়ে মহান (ক); তবে, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, এটাই কি তোমার অভক্তির বর্শা? এটাই কি তোমার ক্ষিপ্ততার অঙ্গ? মণ্ডলী যে অজানিত দু'জনকে মানে না ও দু'জন পিতাকে স্বীকার করে না, তা তুমি কি লক্ষ করনি? তুমি কি সেই মধ্যস্থের [পরিদ্রাণ] ব্যবস্থা, ও সেইসঙ্গে সেই প্রসব, শিশুকাল, যজ্ঞগাভোগ, ক্রুশ ও মৃত্যু ভুলে গেছ? এবং যখন নবজন্ম লাভ করেছিলে তখন তুমি কি মারীয়া থেকে সঞ্জাত ঈশ্বরের পুত্রকে স্বীকার করনি? যাঁর বিষয়ে এসমস্ত কিছু সত্য, যখন সেই পুত্র বলেন, ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’, তখন তুমি কি এবিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে পার যে, তোমার পরিদ্রাণের জন্য এই ব্যবস্থা এটা দাবি করছিল যে, তিনি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করবেন, এটা দাবি করছিল যে, পিতা মানুষেরই নিজস্ব এই অবস্থা ধারণে পরকীয় হয়ে আমাদের মাংস ধারণ না করে সেই সুখময় অনন্ততায় বিরাজ করে থাকলেন যা তাঁর অক্ষয়শীল স্বরূপের চিহ্ন? আমরা এটা ঘোষণা করি যে, একমাত্র জনিত ঈশ্বর ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করে ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থান করলেন, কিন্তু দাসের রূপে তাঁর ঐক্যকে আমরা ঐশ্বরিক ঐক্যের উপর সরাসরি আরোপ করি না (খ)। আরও, পিতা যে কেমন যেন শারীরিক ভাবে অনুপ্রবেশ করে পুত্রে বিদ্যমান, তা আমরা প্রচার করি না, কিন্তু এটা প্রচার করি যে, পিতার দ্বারা জনিত ও জনকের [ঐশ্বরিক] স্বরূপের অধিকারী সেই স্বরূপ আমাদের দেহের দুর্বল স্বরূপের রূপ আপন করে নিল। ঐশ্বরিক স্বরূপের যা স্বকীয়, পুত্র ছিলেন সেই সবকিছুর

অধিকারী, কিন্তু ঐশ্বরিক রূপ তাঁর আর ছিল না, কারণ সেই রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করে দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন। স্বরূপ যে অস্তিত্বশীল হওয়াটা শেষ করেছিল তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ অস্তিত্বশীল থেকেও পার্থিব জন্মের নিম্নাবস্থা নিজেতে গ্রহণ করে নিয়েছিল ও ধারণ করা সেই নিম্নাবস্থায় ঐশ্বরিক সত্তার স্বকীয় প্রতাপ অনুশীলন করছিল। এইভাবে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত সেই ঈশ্বর দাসের রূপে মানুষ বলে নিজেকে পেয়ে কিন্তু পরাক্রমকর্ম সাধনে ঈশ্বর বলে ব্যবহার করে একইসময়ে ছিলেন ঈশ্বর যেইভাবে তাঁর কর্মকাণ্ড শেখাচ্ছিল, ও ছিলেন মানুষ যেইভাবে তাঁর সেই অবস্থা দেখাচ্ছিল।

৫২। এই কারণেই, উপরে উল্লিখিত আলোচনায়, পুত্র নিজের ও পিতার মধ্যকার স্বরূপের ঐক্য বিষয়ে সাক্ষ্য উপস্থাপন করে বলেছিলেন, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (ক) এবং ‘পিতা আমাতে আছেন ও আমি পিতাতে আছি’ (খ)। স্বরূপের সমতা ক্ষেত্রে এ বচন দু’টো আদৌ কোন বৈষম্য দেখায় না, কারণ পুত্রকে দেখা ও পিতাকে দেখা একেবারে সমান, এবং একজন যে অন্যজনে অবস্থান করেন তা এমনটা করে যাতে একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন না হন। আরও, মানুষ তাঁর দেহ দেখে পাছে মনে করে সেটায় পিতাকে দেখে, সেজন্য পুত্র একথা যোগ করেছিলেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর : আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন ; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর (গ)। তাঁর পরাক্রম তাঁর স্বরূপেরই অধিকার ও তাঁর কাজও সেই প্রতাপের অনুশীলন স্বরূপ, সেজন্য তিনি ইচ্ছা করছিলেন, তাঁর সেই পরাক্রমের অনুশীলন পিতার স্বরূপের সঙ্গে তাঁর ঐক্যকে প্রকাশ করবে ; কেননা একজন তাঁর স্বরূপের পরাক্রমের খাতিরে যতখানি তাঁকে ঈশ্বর বলে চিনে নেবে, সে পিতার স্বরূপের পরাক্রমের খাতিরে ততখানি পিতাকে চিনে নেবে। পিতার সমান যিনি, সেই পুত্র নিজের কাজ দ্বারা দেখান যে তাঁর নিজের মধ্যে পিতাকে দেখা যেতে পারে, যাতে মানুষ পুত্রতে অধিকার ক্ষেত্রে পিতার স্বরূপের সমান স্বরূপকে চিনে নিয়ে এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, পিতাতে ও পুত্রতে স্বরূপের কোন পার্থক্য নেই।

৫৩। মাংসে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে গিয়ে ও দাসের রূপ ধারণ-রহস্য পূর্ণ করতে গিয়ে একমাত্র জনিত ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব আপন করে নিয়ে

বললেন, তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত, কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান (ক)। এই একই উপদেশের আগেকার একটা অংশে তিনি নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপ সংক্রান্ত শিক্ষাদান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেজন্য তেমন ঘোষণার জোরে কেমন করে পুত্র থেকে স্বরূপের সেই সমতা অপসরণ করা যেতে পারে যে-সমতাকে সত্যকার জন্ম পূর্ণ করে তোলে? যেহেতু যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় সেই ঈশ্বর থেকে একমাত্র জনিত বলে তাঁর জন্ম তাঁকে একমাত্র জনিত স্বরূপের সত্তা দান করে, সেজন্য তাঁর পিতা যে সেই ঈশ্বর যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়, একথা কি একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্য অবমাননা? পুত্র তো নিজের উৎপত্তির প্রণেতা নন, তাঁর জন্মও শূন্য থেকে হয়নি যার ফলে তিনি নিজস্ব অস্তিত্ব বিহীন, কিন্তু জীবনময় স্বরূপ থেকে জীবনময় স্বরূপ বলে অস্তিত্বশীল হওয়ায় তিনি নিজেতেই সেই স্বরূপের অধিকার রাখেন; এবং নিজের গৌরব বিষয়ে, ও তাঁর সেই গৌরবের সঙ্গে তাঁর গৃহীত জন্মের সঙ্গে যুক্ত অনুগ্রহ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য তিনি সেই স্বরূপের প্রণেতাকে ঘোষণা করেন। তিনি পিতার কাছে এই ঋণ শোধ করতে ইচ্ছা করেন কারণ প্রেরণকর্তার ইচ্ছার উপরে নিজের বাধ্যতা আরোপ করতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু যে বাধ্যতায় তিনি নিজেকে অবনমিত করেন, সেই বাধ্যতা যে তাঁর স্বরূপের ঐক্য বিলীন করতে পারে এজন্য যে তিনি সেই ঋণ শোধ করেন তা নয়; তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে তিনি সমস্ত নামের উর্ধ্বে বিরাজমান (খ)।

৫৪। তথাপি, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করার পরেই তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছে (ক), সেজন্য যদি পুত্রের সমতা সন্দেহের বিষয় মনে হতে পারে, তাহলে তার কারণ এটা যে, তিনি যে অবমাননা মেনে নিলেন, আমরা সেই অবমাননা-রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ। কেননা যখন মানুষ হিসাবে সেই জন্ম তাঁকে নতুন স্বরূপ আরোপ করল ও দাসের রূপ ধারণের ফলে তাঁর অবমাননা তাঁর রূপের পরিবর্তন ঘটাল, তখন, এখন, সেই নাম-দান (খ) রূপের সমতাকে ফিরিয়ে দেয়। যা দান করা হয়েছে তা যে কী সেবিষয়েই প্রশ্ন রাখ। কেননা যদি সেই দান এমন কিছু যা ঈশ্বরের, তাহলে তিনি যে স্বরূপের অধিকারী, এই স্বরূপ-দান সেই স্বরূপের ঈশ্বরত্বকে নিম্নতর করে না। অবশেষে,

এই যে নাম তাঁকে দেওয়া হয়, তাতে সেই দানে অবশ্যই একটা রহস্য নিহিত, কিন্তু এমনটা নির্দেশ করা হয় না যে, নাম হলো ভিন্ন একটা নাম। কেননা যিশুকে এটাই দেওয়া হয় যাতে তাঁর কাছে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয় ও প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রভু (গ)। তাই তাঁকে পিতা ঈশ্বরের গৌরবে স্বীকৃত হবার সম্মান দেওয়া হয়। তুমি কি তাঁকে একথা বলতে শোন, ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’? তবে তাঁকেই চিনে নাও যাঁর বাধ্যতার প্রতিদানে তাঁকে বলা হয়েছিল, তিনি তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের উর্ধ্বে যে নাম (ঘ)। এটাও শোন, ‘আমি এবং পিতা, আমরা এক’, আরও, ‘যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’, আরও, ‘আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’। সেই স্বীকারোক্তির সম্মান উপলব্ধি কর, কারণ যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রভু। তবে, কবেই বা এমনটা হয় যে পিতা পুত্রের চেয়ে মহান? অবশ্যই, যখন পিতা পুত্রকে সকল নামের উর্ধ্বস্থিত নাম দান করেন, তখনই। অন্যদিকে, কবেই বা পুত্র এবং পিতা উভয়েই এক? অবশ্যই, যখন প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, যিশু পিতা ঈশ্বরের গৌরবে প্রভু, তখনই। তাই, যখন পিতা নিজের দাতা-অধিকারে পুত্রের চেয়ে মহান, তখন যেহেতু পুত্র স্বীকার করেন তিনি গ্রহীতা, সেজন্য কি তিনি নিম্নতর? দাতা মহান, কিন্তু যাঁকে এমনটা দেওয়া হয় তিনি [দাতার সঙ্গে] এক হবেন, তিনি যে নিম্নতর তা নয়। যদি যিশুকে এমনটা না দেওয়া হত তিনি পিতা ঈশ্বরের গৌরবে স্বীকৃত হবেন, তবে তিনি পিতার নিম্নতর হতেন। কিন্তু যখন তাঁকে পিতার একই গৌরবের অধিকারী হতে দেওয়া হয়, তখন এটা দাঁড়ায় যে, দাতা হিসাবে দাতা মহান, ও দান স্বীকৃতিতে উভয়েই এক। সুতরাং, পিতা পুত্রের চেয়ে মহান: এবং এটাও সুস্পষ্ট যে, তিনিই মহান যিনি সম্পূর্ণরূপে যা তা সম্পূর্ণরূপে দান করেন, যিনি অন্যকে [অনন্তকালীন] জন্ম-রহস্য গুণে নিজের অজনিত স্বরূপের প্রতিমূর্তি হতে দেন, যিনি তাঁকে নিজে থেকে নিজের রূপে জনিত করেন ও তাছাড়া এমনটা করেন যেন যিনি পিতা ঈশ্বরের গৌরবে আত্মা অনুসারে ঈশ্বর থেকে সজ্জাত কিন্তু এখন মাংসে মৃত, সেই যিশু খ্রিষ্ট পুনরায় পিতার গৌরবে ঈশ্বর হতে পারেন। তাই খ্রিষ্ট সেই কারণ দেখান যার জন্য, যদি শিষ্যেরা তাঁকে ভালবাসতেন, তবে তিনি পিতার কাছে যাচ্ছেন বলে তাঁদের আনন্দিত হতে হত যেহেতু পিতা তাঁর চেয়ে মহান।

৫৫। তিনি শেখান, এই আনন্দ ভালবাসা থেকেই উৎসারিত, কারণ যিহু যে পিতা ঈশ্বরের গৌরবে স্বীকৃত তাতে ভালবাসা আনন্দিত; এবং পর পরে তিনি এই গৌরব ফিরে পাবার সঙ্গত দাবি একথায় ব্যক্ত করেন, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই (ক)। এই জগতের অধিপতি এই কারণেই তাঁর উপর কোন অধিকার রাখে না, কারণ আকারে প্রকারে মাংসের পাপের কাছে পরকীয় এমন মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়েও তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে অবস্থান করছিলেন, এবং পাপের কারণে মাংসে অবস্থান করলেও পাপকে অভিযুক্ত করছিলেন। তাছাড়া, এসমস্ত কিছু পিতার একটা আঙ্গুর প্রতি বাধ্যতার উপর আরোপ করে পুত্র একথাও বললেন, কিন্তু জগৎকে এ জানতে হবে যে, আমি পিতাকে ভালবাসি, এবং পিতা আমাকে যেমন আঙ্গুর দিয়েছেন, আমি সেইমত করি। তবে ওঠ, এখান থেকে চলে যাই (খ)। যে ভালবাসা তাঁকে পিতার আঙ্গুর পূরণ করতে উদ্দীপিত করে, সেই ভালবাসার আগ্রহে তিনি ওঠেন ও মানুষ হিসাবে যন্ত্রণাভোগ-রহস্য সিদ্ধ করতে ত্বরান্বিত করেন; কিন্তু তিনি দেহধারণ-রহস্যকে অবিলম্বে বুঝিয়ে দেন, সেই যে দেহধারণ গুণে আমরা তাঁর মধ্যে সেইভাবে রয়েছি যেভাবে, বলতে গেলে, শাখা আঙুরলতায় রয়েছে; অন্যথা আমরা ভাল ফল না ধরতে নিরুপিত, সেইভাবে যেভাবে সেই শাখার বেলায় ঘটে যা আঙুরলতায় নিজেকে রূপান্তরিত করেনি। তাছাড়া তিনি নিজের দেহধারণে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরে বসবাস করতে আমাদের উৎসাহিত করেন যেন মাংস-হওয়া-বাণী গুণে আমরা তাঁর মাংসের স্বরূপে জীবিত থাকতে পারি যেইভাবে শাখা-প্রশাখা আঙুরলতায় জীবিত রয়েছে। যে মাংস তিনি ধারণ করেন, সেই নিম্নাবস্থার মাংস থেকে তিনি তখনই পিতার মর্যাদার রূপ সরিয়ে দেন যখন শাখা-প্রশাখার নিম্নাবস্থাকে নির্দেশ করার জন্য নিজেকে আঙুরলতা বলেন ও পিতাতে এই আঙুরলতার প্রতি যত্নপূর্ণ সেই কৃষককে নির্দেশ করেন যিনি অকেজো ও অনুর্বর শাখাগুলো কেটে সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেবার জন্য নিষ্কিঞ্চ করেন। ‘যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে’, ‘আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন’, ‘তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন’, এসমস্ত কথা বলার পর তিনি নিজের

[অনন্তকালীন] জন্ম-সত্য ও দেহধারণ-রহস্যও প্রকাশ করার জন্য উপদেশ চালিয়ে একথা বলেন, ‘কারণ পিতা আমার চেয়ে মহান’। এবং পর পরে, একথার অর্থ সিদ্ধ করার জন্য অবিলম্বে কৃষক, আঙুরলতা ও শাখার রূপক উপস্থাপন করেন ও সেটা দ্বারা আমাদের এটা প্রকাশ করেন যে, তিনি সেই দৈহিক নিম্নাবস্থা মেনে নিলেন। এবং এমনটা বলেন যে, পিতার কাছে তাঁর যাবার কারণ ও সেই ভালবাসার আনন্দের কারণ এটাই হওয়া উচিত যে, পিতা তাঁর চেয়ে মহান; অর্থাৎ সেই পিতা যাঁর কাছ থেকে তাঁর পক্ষে গৌরব ফিরিয়ে নেওয়া, ও যাঁর সঙ্গে ও যাঁর মধ্যে তাঁর পক্ষে নতুন সম্মানে নয় কিন্তু আগেকার সম্মানে, পরকীয় কোন না কোন সম্মানে নয় কিন্তু পিতার সাক্ষাতে আগে তাঁর যে সম্মান ছিল সেই সম্মানেই গৌরবান্বিত হওয়া অবধারিত ছিল। সুতরাং, পিতার গৌরবে অবস্থান করার জন্য পুত্র যদি পিতার গৌরবে প্রবেশ ক’রে গৌরবান্বিত না হন, তাহলেই, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, তুমি তাঁর স্বরূপ অবজ্ঞা করতে পারবে। কিন্তু যে গৌরব তিনি পিতা থেকে গ্রহণ করেন সেই গৌরবের যদি কোন অধিকার থাকে, তাহলে এটা মেনে নাও যে, সেই গৌরব আরোপ করার অধিকার রাখেন বলে [পুত্রের চেয়ে] পিতাই মহান।

৫৬। তুমি কেন মাংসধারণ-ব্যবস্থা অভক্তিতে বিকৃত কর? কেন আমাদের পরিভ্রাণ-রহস্যকে মৃত্যুর অস্ত্রে পরিণত কর? পুত্রকে গৌরবান্বিত করার অধিকার রাখেন বলে পিতাই [পুত্রের চেয়ে] মহান; পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত বলে পুত্র যে নিম্নতর তা নয়। যিনি পিতা ঈশ্বরের গৌরবে বিরাজমান তিনি কেমন করে নিম্নতর হতে পারেন? এবং পিতা যে [পুত্রের চেয়ে] মহান তা কি সত্য নয়? পিতা হওয়ায় পিতা মহান, কিন্তু পুত্র হওয়ায় পুত্র যে নিম্নতর তা নয়। পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্ম পিতাকে [পুত্রের চেয়ে] মহান করে, কিন্তু সেই জন্ম পুত্রকে যে স্বরূপ আরোপ করে, সেই স্বরূপ এমনটা হতে দেয় না, পুত্র নিম্নতর হবেন। পিতা এজন্যই [পুত্রের চেয়ে] মহান, কারণ পুত্র নিজের ধারণ করা মনুষ্যত্বকে গৌরবান্বিত করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন; পুত্র [পিতার চেয়ে] এজন্যই নিম্নতর নন, কারণ পিতার কাছে তাঁর যে গৌরব, তা তিনি ফিরিয়ে নেন। এইভাবে একাধারে জন্ম-রহস্য ও মাংসধারণ-ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। কেননা পিতা এজন্যই [পুত্রের চেয়ে] মহান, কারণ তিনি পিতা ও যিনি এখন মানবপুত্র তাঁকে

তিনি গৌরবান্বিত করেন; এবং পিতা ও পুত্র এজন্যই এক, কারণ পিতা থেকে সঞ্জাত পুত্র পার্থিব দেহ ধারণ করার পর পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত হন।

৫৭। সুতরাং সেই [অনন্তকালীন] জন্ম স্বরূপের নিম্নতা স্থির করে না, কারণ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত বলে পুত্র ঈশ্বরের রূপের অধিকারী। এবং অজনিতজন ও জনিতজন শব্দ দু'টো নিজ নিজ অর্থের জোরে পরস্পর বিরোধী শব্দ বলে পরিগণিত হলেও তথাপি জনিতজন যিনি তিনি অজনিতজনের স্বরূপ থেকে বহিস্কৃত হতে পারেন না, কারণ তাঁর যে সত্তা তা তিনি অন্য কোন কিছু থেকে নেননি। কেননা পিতার সঙ্গে অজনিত হওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত না হয়েও তবু পুত্র অজনিত ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরত্বের সত্তা গ্রহণ করলেন। সেজন্য যদিও আমাদের বিশ্বাস তাঁর [অনন্তকালীন] জন্মের আরম্ভ স্থির করতে না পারে, তবু একমাত্র জনিত ঈশ্বরের অনন্ততা ঘোষণা করে কারণ তাঁর স্বরূপ এমনটা হতে দেয় না, আমরা এটা ঘোষণা করব, যাঁর জন্ম সর্বযুগের আদির অতীতে হয়েছে তিনি কালের মধ্যে অস্তিত্বশীল হতে শুরু করলেন। কিন্তু, তাঁকে সবসময় ও সর্বযুগের পূর্বে বিদ্যমান বলে স্বীকার করতে করতে বিশ্বাস নির্দিধায় ঘোষণা করে, তিনি কালাতীত অনন্ততায় সঞ্জাত হলেন। তবু বিশ্বাস এটাও স্বীকার করে যে, তিনি এমন জন্ম থেকে উদ্ভূত যা আমরা জানি আদিবিহীন।

৫৮। কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীরা পুত্রের স্বরূপ অবজ্ঞা করার লক্ষ্যে এই বাণী আঁকড়ে ধরে, ‘পিতা আমার চেয়ে মহান’, অথবা এই বচন উপস্থাপন করে, কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—একাই পিতাই জানেন (ক)। সেজন্য একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে এমনটা নিন্দা আরোপ করা হয় তিনি সেইদিন ও সেইক্ষণ সম্পর্কে অজ্ঞ, যার ফলে—তারা বলে—ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ঈশ্বর হয়েও পুত্র সেই স্বরূপের সিদ্ধতার অধিকারী নন যা ঈশ্বরেরই সিদ্ধতা। যখন তিনি এই অজ্ঞতার প্রভাবে বশীভূত, তখন তাঁর মধ্যে তাঁর চেয়ে প্রভাবশালী এমন বাহ্যিক প্রভাব রয়েছে যা, বলতে গেলে, তাঁর দুর্বলতার উপর বিজয়ী হয়ে তাঁকে অজ্ঞতাজনিত সীমাবদ্ধতায় আটকিয়ে রাখে। এমনকি, ভ্রান্তমতপন্থীদের ক্ষিপ্ততা আমাদের এই ভক্তিহীন ব্যাখ্যা মেনে নিতে বাধ্য করতে চায়, কেমন যেন তেমন স্বীকারোক্তি মেনে নেওয়া

আবশ্যকীয় ভাবে অনিবার্য। তাদের মতে এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া আবশ্যিক, কারণ, প্রথমত, সেই বাণী স্বয়ং প্রভুরই উচ্চারিত বাণী ও দ্বিতীয়ত, কারণ তিনি নিজে নিজের বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দেন, তা আমাদের ভিন্ন ব্যাখ্যার অভিমত দ্বারা বিকৃত করা একেবারে অভক্তি বলে প্রতীয়মান হতে পারবে।

৫৯। তবে, উপরে উল্লিখিত বচনের অর্থ ও পরিস্থিতি স্মরণ করার আগে, সাধারণ সুমতি জনিত ধারণার ভিত্তিতে আমাদের সর্বোপরি বিচার-বিবেচনা করতে হবে যদি এমনটা বিশ্বাস করা যায় যে, যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে, সেসমস্ত কিছুর যিনি প্রণেতা, তিনি সেই সবকিছুর মধ্যে কোন একটা কিছু বিষয়ে অজ্ঞ হতে পারেন কিনা। যখন খ্রিষ্টের দ্বারা ও খ্রিষ্টেই সবকিছু হয়, ও সেই সবকিছু তাঁর দ্বারা এমনভাবে হয় যার ফলে তাঁর মধ্যেও থাকে, তখন যা কিছু তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা হয়, সেই সবকিছু কেমন করে তাঁর জ্ঞানেরও অংশ না হয়ে পারে যখন, যে স্বরূপ অজ্ঞ হতে পারে না এমন স্বরূপের গুণে তাঁর সেই জ্ঞান সময় সময় এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাঁর মধ্যেও নেই ও তাঁর দ্বারাও হয়নি? (ক)। কিন্তু খ্রিষ্ট থেকে ছাড়া অন্য কিছু থেকে যা উৎপত্তি পায় না ও যার অবস্থা ও অগ্রগতির কারণ তাঁর মধ্যে স্থিত, তা কেমন করে তাঁর সেই স্বরূপের কাছে অজ্ঞাত হতে পারে যে-স্বরূপ দ্বারা তা নির্মিত ও যে-স্বরূপের মধ্যে, যা কিছু রয়েছে ও যা কিছু হবে, তা ধারণকৃত? কেননা খ্রিষ্ট প্রভু মানব চিন্তা জানেন, যা বর্তমান কারণ জনিত সেগুলো শুধু নয়, কিন্তু ভাবী বাসনার তাগিদে প্রণোদিত হয়ে যেগুলো আগামীকাল আমাদের মনের মধ্যে থাকবে, সেগুলোও তিনি জানেন, কারণ সুসমাচার-রচয়িতা এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, কেননা যিশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে (খ)। তাই তাঁর সেই যে পরাক্রমী স্বরূপ এখনও অস্তিত্বশীল নয় এমন বিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত ও এখনও শান্তশিষ্ট মনের ভাবী অস্থিরতা বিষয়ে অজ্ঞ নয়, আমরা কি এমনটা ভাবব যে, যা তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যে হয়, তাঁর সেই স্বরূপ সেটার বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। এবং অন্যান্যদের যা, যিনি সেইসব কিছুর প্রভু, তিনি কি তাঁর নিজের যা সেটার প্রভু নন? তাঁরই বিষয়ে তো বলা হয়েছিল, ‘সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক’রে, এবং তিনি সমস্ত কিছুর আগেই আছেন’ ও ‘এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা : সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে এবং

তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন' (গ)। সুতরাং, যখন সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে রয়েছে ও তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্তই [ঈশ্বরের সঙ্গে] পুনর্মিলিত করা হয়েছে, ও আমরা সেই পুনর্মিলনের দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি, তখন, যে দিনের সময় তাঁর উপর নির্ভর করে ও তাঁর নিজের রহস্য দ্বারা স্থিরীকৃত, তিনি কি এই দিন বিষয়ে অজ্ঞ? কেননা এই দিন হলো তাঁর সেই আগমনের দিন যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে (ঘ)। এমন কেউই নেই যে নিজের দ্বারা ও নিজেতে যা ঘটবার কথা সেবিষয়ে অজ্ঞ: খ্রিষ্ট আগমন করবেন, ও তিনি কি নিজের আগমনের দিন জানেন না? তাঁর একটা দিন আছেই, সেবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, চোর যেমন রাত্রিবেলায় আসে, প্রভুর দিন ঠিক সেইভাবে আসবে (ঙ), তবে এমনটা কি ভাবা যেতে পারে, তিনি সেই দিন জানেন না? মানব স্বরূপগুলো, নিজ নিজ সম্ভাবনার সীমায়, আগে থেকে তা জানে যা নিজেরা করবে বলে স্থির করে, ও লক্ষ্য বিষয়ে জ্ঞান সেগুলোর কাজ করার ইচ্ছার পাশে পাশে চলে: তবে, ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত যিনি, তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা যা কিছু হয়, তিনি কি তা জানেন না? কাল তাঁরই গুণে হয়, ও দিন তাঁরই হাতে রয়েছে, কারণ যা হবার তিনিই তা স্থির করেন ও তাঁর আগমন নির্ধারণ করা তাঁর উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু, তিনি যা নির্ধারণ করলেন, তাঁর মনের অবশ স্বরূপের কারণে তাঁর বোধশক্তি কি এত নিস্তেজ যে এমনটাও জানে না যা তিনি নির্ধারণ করলেন? যে পশু ও বন্যজন্তু সুচিন্তিত ও দূরদর্শিতা-বিশিষ্ট যুক্তি ক্ষেত্রে অচেতন হয়ে যা করছে তাও পর্যন্ত জানে না যেহেতু অযৌক্তিক বাসনা-স্থিরীকৃত তাগিদ দ্বারা তাড়িত হয় ও আকস্মিক ও অনিশ্চিত চলাচলে কোন না কোন লক্ষ্যের দিকে আকর্ষিত, তিনি কি এ পশুগুলোর তুল্য?

৬০। উপরন্তু, এমনটা কেমন করে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, গৌরবের প্রভু নিজের আগমনের দিন জানতে অক্ষম হওয়ায় অমিলযুক্ত ও অসিদ্ধ এমন স্বরূপের অধিকারী যা আগমনের প্রয়োজনীয়তায় বশীভূত ও নিজের আগমনের কাল বিষয়ে অজ্ঞ? এমনটা ঈশ্বরের চেয়ে অজ্ঞতাই প্রভাবশালী করত, কারণ এই অজ্ঞতা তাঁকে জ্ঞান-পরাক্রম বিহীন করত। আরও, খ্রিষ্টকে দুর্বলতার দায়ে অভিযুক্ত করা ছাড়া যদি পিতা ঈশ্বরকেও

একটা দোষের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় অর্থাৎ যদি এটা সমর্থন করা হয় যে তিনি একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে, তাঁর ভালবাসার সেই পুত্রকে এদিন সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান-বঞ্চিত করলেন ও নিজের শঠতায় সেই ঘটনার ভাবী পূরণ বিষয় জ্ঞান দিতে অস্বীকার করলেন, তাহলে অভক্তির জন্য আর কতগুলো সুযোগ না বৃদ্ধি করা হত। এমনটা কি ভাবা যেতে পারে যে, তিনি তাঁকে তাঁর যজ্ঞগাভোগের দিন ও ক্ষণ জানতে দিলেন কিন্তু তাঁর পরাক্রমের দিন ও তাঁর আপন পবিত্রজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর গৌরবের ক্ষণ জানতে অস্বীকার করলেন? এমনটা কি ভাবা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর কাছ থেকে সুখের জ্ঞান কেড়ে নিলেন কিন্তু তাঁকে মৃত্যুর পূর্বজ্ঞান মঞ্জুর করলেন? মানব বিবেকের কম্পমান অনুভূতি ঈশ্বর ক্ষেত্রে তেমন চঞ্চল মন মানতে পারে না, মানব অস্থিরতার স্বীয় দোষ-ত্রুটিকেও তাঁর উপর আরোপ করতে পারে না যার ফলে, হয় পিতা পুত্রকে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করবেন, না হয় ঈশ্বর-সঞ্জাত পুত্র অসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে দাঁড়াবেন।

৬১। কিন্তু ঈশ্বর ভালবাসা ছাড়াও অন্য কিছু হতে জানেন না, পিতা ছাড়াও অন্য কিছু হতে জানেন না। এবং যিনি ভালবাসেন, তিনি ঈর্ষাপরায়ণ নন, যিনি পিতা তিনিও সম্পূর্ণরূপেই পিতা। এই নাম এমন আপস মানে না যার ফলে ঈশ্বর আংশিক ভাবে পিতা ও আংশিক ভাবে পিতা নন। পিতা তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রেই পিতা: তিনি যা, তা সমস্তই সেই পুত্রেতে রয়েছে যিনি পিতার সত্তা ক্ষেত্রে কম অধিকারী হতে পারেন না। পিতৃত্ব যে আত্মপ্রজনন তা নয়, কিন্তু পিতা নিজ থেকে উদ্ভূত পুত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে ও তাঁর সমস্ত গুণাবলিতে পিতা। যে মানব দেহগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত ও নানা অঙ্গ-বিশিষ্ট, সেগুলোর স্বরূপ ধরে নিলে এটা দেখা যায় যে, যে পিতা, সে যা তার স্বকীয়, সেই সবকিছুর ছাড়া অন্য কিছুর পিতা হতে পারে না, কারণ যে জন্ম সিদ্ধ, তা নিজের সন্তানদের মধ্যে সেই সমস্ত উপাদান ও অঙ্গ বজায় রাখে যা প্রতিটি পিতাতে উপস্থিত। সুতরাং, যে পিতা, যা তারই সে সেইসব কিছুর পিতা, কারণ জন্ম পিতার সম্পূর্ণতা থেকে আগত ও সন্তানের সম্পূর্ণতায় ধারাবাহিকতা রাখে। ঈশ্বরে জড় পদার্থ বলতে কিছুই নেই, তিনি একক সত্তা স্বরূপ; তাঁর মধ্যে নানা অঙ্গ নেই, কিন্তু এমন সব রয়েছে যা সবই ধারণ করে; এমন সব যা পুনরুজ্জীবিত নয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জীবনময়;

ঈশ্বর সম্পূর্ণ জীবন, একক ঐক্য যেহেতু তিনি অঙ্গবিশিষ্ট নন, কিন্তু নিজের এককত্বে সিদ্ধতাবিশিষ্ট। সেজন্য এটা আবশ্যিক যে, তাঁর পিতৃত্ব ক্ষেত্রে পিতা যাকে নিজে থেকে জনিত করলেন তাঁর কাছে হবেন সেই সবকিছুর পূর্ণতায় পিতা : নিজের সিদ্ধতায় পুত্রের জন্ম তাঁকে সেই সবকিছুতে সিদ্ধ পিতা করে তোলে যা তাঁরই স্বকীয়। তাই যখন তিনি পুত্রের কাছে প্রকৃত পিতা, তখন এটা আবশ্যিক যে, পুত্র পিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। কিন্তু পুত্র পূর্বজ্ঞানের অধিকারী না হলে বা নিজের জন্মে তিনি নিজের প্রণেতার কোন কিছু অত্যাধিকারী হলে, তবে এমনটা কি ভাবা যেতে পারবে যে তিনি পিতার সবকিছুর অধিকারী? কিন্তু ঈশ্বরের যা স্বকীয়, তিনি দৈবাৎ তেমনটার অত্যাধিকারী হলে তবে তিনি প্রায়ই সবকিছুতে অত্যাধিকারী হবেন। তবে, যে স্বরূপ দৃশ্য অদৃশ্য ও এখনও অস্তিত্বশীল নয় এমন বিষয়গুলোকে ঘিরে রাখে ও যা এখনও হয়নি কিন্তু ভাবীকালে হবে তা নিজেতে ধারণ করে, সেই স্বরূপের অধিকারী হওয়ার চেয়ে, তথা ভাবী সবকিছুর তেমন জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেয়ে কোন্ বিষয় ঈশ্বরের বেশি স্বকীয়?

৬২। যে ভ্রান্তমত অনুসারে একমাত্র জনিত ঈশ্বর সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু সেই পল তখনই আমাদের কাছ থেকে সেই ভ্রান্তমতের অভ্যস্তময় ধারণা দূর করে দেন যখন বলেন, [যেন তাদের হৃদয় আশ্বাস পায়, ফলে] ভালবাসায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তারা যেন অধ্যাত্ম ধীশক্তির পূর্ণ ঐশ্বর্য লাভে ধনবান হয়ে ওঠে ও ঈশ্বরের রহস্যকে তথা সেই খ্রিস্টকেই উপলব্ধি করতে পারে, যার মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত (ক)। খ্রিস্ট ঈশ্বরই সেই রহস্য, ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন তাঁরই মধ্যে নিহিত। কিন্তু ‘অংশ’ বলা এক জিনিস, ও ‘সমস্ত’ বলা আলাদা জিনিস : একটা অংশ যে সমস্তই হয় তা ভাবা যায় না, ও সমস্তকে একটা অংশ বলে ভাবা সম্ভব নয়। পুত্র যদি [বিচারের] সেই দিন জানেন না, তাহলে তাঁর মধ্যে জ্ঞানের সেই সমস্ত ধন আর নেই; কিন্তু, যেহেতু তিনি নিজেতে জ্ঞানের সমস্ত ধন ধারণ করেন সেজন্য তিনি সেই দিন বিষয়ে অজ্ঞ নন। কিন্তু আমাদের পক্ষে এটাই স্মরণ করা উপযোগী যে, যখন জ্ঞানের সমস্ত ধন তাঁর মধ্যে নিহিত, তখন এর অর্থ এই নয় যে, নিহিত হওয়ায় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ছিল না; না, সেগুলো তাঁর মধ্যে রয়েছে যেহেতু তিনি ঈশ্বর, কিন্তু সেগুলো নিহিত রয়েছে কারণ একটা রহস্য রয়েছে (খ)। তবে, যে রহস্যে জ্ঞানের সমস্ত

ধন নিহিত, সেই খ্রিষ্ট ঈশ্বর সংক্রান্ত রহস্য আমাদের কাছে নিহিতও নয়, অজ্ঞাতও নয়। এবং যেহেতু তিনিই সেই রহস্য, সেজন্য এসো, অনুসন্ধান করে দেখি, যে বিষয় তিনি জানেন না, সেবিষয় সম্পর্কে তিনি সত্যিই অজ্ঞ কিনা (গ)। কেননা যেমন অন্যান্য বচনে তাঁর অজ্ঞতা-স্বীকার এমনটা মানায় না যে তিনি অজ্ঞ, তেমনি এক্ষেত্রেও তিনি যা জানেন না সেবিষয়ে তিনি অজ্ঞ নন। কেননা, জ্ঞানের সমস্ত ধন তাঁর মধ্যে নিহিত হওয়ায় যেহেতু তাঁর সেই অজ্ঞ হওয়াটা অজ্ঞতার চেয়ে বরং ঈশ্বরের গুণ ব্যবস্থাই বোঝায়, সেজন্য তিনি যে জ্ঞানবিহীন ছিলেন তা না ভেবে আমরা বরং তাঁর সেই না জানবার কারণ দেখাতে পারি।

৬৩। যতবার ঈশ্বর বলেন তিনি জানেন না, ততবার তিনি অবশ্যই অজ্ঞতা ঘোষণা করেন, কিন্তু তিনি অজ্ঞতার বন্দি নন। তিনি যে জানেন না, তা যে অজ্ঞতা-দুর্বলতাজনিত তা নয়, কিন্তু প্রকৃত কারণ এটা হলো যে, হয় কথা বলার সময়, না হয় কাজ করার ব্যবস্থার সময় তখনও আসেনি। ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে এইভাবে কথা বলেন, সদোম ও গমোরার বিরুদ্ধে মানুষের চিৎকার অধিক তীব্র হয়ে উঠেছে, তাদের পাপও এত ভারী হয়ে উঠেছে যে, আমি নিজে নিচে গিয়ে দেখব, আমার কানে যে চিৎকার এল, সেই অনুসারে তারা সত্যিই এমন অধর্ম করেছে কিনা। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি জানতে চাই (ক)। সুতরাং, এখানে আমরা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে রয়েছি যিনি সেটা জানেন না যা প্রকৃতপক্ষে ভালই জানেন। পাপটা যে এত তীব্র তা তিনি জানেন, তথাপি সেই পাপকর্ম সাধিত হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্য নিচে নামেন, এবং পাপকর্মটা তখনও সাধিত না হলে তা জানবার জন্য নিচে যান। সেজন্য আমরা এটা বুঝতে পারি যে, তিনি যে জানেন না এজন্যই যে তিনি জানেন না তা নয়, কিন্তু তিনি জানেন কারণ কাজ করার সময় এসে গেছে। সুতরাং, ঈশ্বরের জানাটা অজ্ঞতার পরিবর্তন নয় কিন্তু সময়ের পূর্ণতা বোঝায়। তিনি জানবার আগে তখনও অপেক্ষা করেন, যদিও আমরা এমনটা ভাবতে পারি না যে তিনি জানেন না; এবং যেহেতু তিনি যে জানেন তা বলার আগে তখনও অপেক্ষা করেন, সেজন্য তিনি যে জানেন সেবিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা, ও যা সম্পর্কে তিনি বলেন তিনি তা জানেন না তার সেই জানাটা, এসমস্ত কিছুই অর্থ শুধু এমনটা হতে পারে যে, কথা বলায় ও কাজ করায় এটা ঈশ্বরের রহস্যময় ব্যবস্থা।

৬৪। সুতরাং, এবিষয়ে দ্যর্থতায় থাকা উচিত নয় : ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সঙ্কল্পিত কোন না কোন পরিবর্তনের সঙ্গে নয়, কিন্তু সেই সময়ের পরিস্থিতির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত করতে হয়। যখন বলা হয়, ঈশ্বর জানেন, তখন তাতে সেই সময় নির্দেশিত নয় যে সময়ে ঈশ্বর সেবিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু সেই সময় নির্দেশিত হয় যেসময় তিনি যা জানেন তা প্রকাশ করেন। এই অর্থে আব্রাহামের কাছে উদ্দেশ্য করা এই কথায় আমাদের শিক্ষা দেয়, ছেলেটির উপর হাত বাড়িয়ে না, তার কোন ক্ষতি করো না, কেননা এখন আমি জানি, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর; তুমি আমাকে তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকে দিতেও অস্বীকার করনি (ক)। অতএব, ঈশ্বর এখন জানেন, কিন্তু সেই এখন জানাটা এমন প্রমাণ যে তিনি আগে জানতেন না। কিন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে এটা হয় না, ও এটাও সত্য নয় যে আব্রাহামের বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, কারণ তাঁর বিষয়ে বলা হয়, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (খ)। সুতরাং ‘এখন আমি জানি’ বাক্যটা সেই সময় নির্দেশ করে যখন আব্রাহাম এই সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন, সেই সময় নির্দেশ করে না যখন ঈশ্বর জানতে শুরু করলেন। কেননা আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি নিজের ভালবাসা নিজের ছেলের আহুতির মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন; হ্যাঁ, ঈশ্বর যখন কথা বলেন তখন প্রকাশ করেন, তিনি সেই বিষয় জানেন। কিন্তু যেহেতু এমনটা ভাবা যেতে পারে না যে তিনি আগে তা জানতেন না, সেজন্য এটা মেনে নিতে হয় যে তিনি যখন কথা বলেন তখন জানেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের জানা-সম্পর্কিত যত উদাহরণ রয়েছে আমরা তা থেকে কেবল এই বচন উপস্থাপন করেছি যাতে প্রমাণ করতে পারি যে, যখন ঈশ্বর জানেন না, তখন তাঁর অজ্ঞতা নয়, সময়ই সেটার কারণ (গ)।

৬৫। তাছাড়া, সুসমাচারগুলোতে আমরা এটাও পাই যে, প্রভু বহু কিছু জানা সত্ত্বেও তা জানেন না। যারা শঠতা সাধন করে ও তাঁর নামে সাধিত বহু অলৌকিক কাজ বিষয়ে গর্ব করে, তাদের তিনি জানেন না, কারণ বলেন, তখন আমি দিব্যি দিয়ে বলব : আমি কখনও তোমাদের জানিনি; হে শঠতার সাধক, আমা থেকে দূর হও (ক)। তিনি দিব্যি দিয়েও ঘোষণা করেন তিনি তাদের জানেন না যদিও এবিষয়ে অজ্ঞ নন যে তারা শঠতার সাধক। সুতরাং, তিনি যে তাদের জানেন না এর কারণ এ নয় যে তিনি তাদের জানেন

না, কিন্তু এই কারণেই তাদের জানেন না যে, তাদের কর্মের শঠতার কারণে তারা তাঁর জ্ঞানের যোগ্য নয়। তিনি দিব্যি দিয়েও নিজের কথা সপ্রমাণ করেন, যদিও জানাটা তাঁর স্বরূপের পরাক্রমে রয়েছে ও না-জানাটা তাঁর ইচ্ছার রহস্যে রয়েছে। তাছাড়া একমাত্র জনিত ঈশ্বর যখন তাঁর গৌরবময় আগমনে বিবাহ-কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তিনি নির্বোধ সেই কুমারীদের জানেন না, ও যারা তেল ব্যবস্থা করার ব্যাপারে অযত্নবান হয়েছিল তাদেরও জানেন না। তারা তাঁর কাছে ছুটে এসে অনুরোধ রাখে, ও তিনি তাদের জানা থেকে এত দূরে রয়েছেন যে তাদের এই উত্তর দেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের জানি না (খ)। তাদের আসাটা ও তাদের প্রার্থনা এমনটা হতে দেয় না, তিনি তাদের জানবেন না, কিন্তু তাদের না জানা বিষয়ে তাঁর উক্তি তাঁর স্বরূপের পরাক্রম সংক্রান্ত নয় বরং তাঁর ইচ্ছাই সংক্রান্ত, কারণ যিনি সবই জানেন, তারা তাঁর কাছে জ্ঞাত হবার যোগ্য নয়। অবশেষে, পাছে আমরা এমনটা ভাবি, তিনি প্রকৃতির দুর্বলতার কারণেই অজ্ঞ, সেজন্য তিনি অবিলম্বে প্রেরিতদূতদের একথা বললেন, সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না (গ)। তাঁরা সেই দিন ও সেই ক্ষণ জানেন না বলে যখন তিনি তাঁদের জেগে থাকবার সতর্কবাণী দেন, তখন এটা বোঝাতে ইচ্ছা করেন যে, তিনি সেই কুমারীদের জানেন না কারণ ঘুম ও অবহেলার কারণে তাদের তেল ছিল না, ফলে তারা তাঁর নিজের বিবাহ-কক্ষের অযোগ্য ছিল।

৬৬। তাই, যিনি হৃদয় ও কটিদেশ পরীক্ষা করেন (ক) সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট প্রাকৃতিক এমন অবস্থায় নন যার জন্য না জানবার অবস্থায় রয়েছেন: এবিষয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর না-জানাটা তাঁর স্বরূপের সর্বজ্ঞান থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এমন কেউ থাকলে যারা তাঁকে অজ্ঞ বলে সাব্যস্ত করবে, তবে তারা এটা ভয় করুক যে, যিনি তাদের চিন্তা-ভাবনা জানেন তিনি তাদের বলবেন, তোমরা কেন মনে মনে তেমন মন্দ ভাবনা ভাব? (খ)। যিনি সবই জানেন যেহেতু এমন চিন্তা-ভাবনা বা কাজ নেই যা বিষয়ে তিনি অজ্ঞ, তিনি সময় সময় চিন্তা-ভাবনা ও কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন কেমন যেন সেই সবকিছু জানতেন না; যেমন সেসময় যখন সেই স্বীলোককে জিজ্ঞাসা করেন কে তাঁর পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করেছে, বা প্রেরিতদূতদের জিজ্ঞাসা করেন কেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবালি করছেন, বা যারা কাঁদছিল তাদের জিজ্ঞাসা করেন লাজার

কোথায়। কিন্তু তবুও এমনটা ভাবা উচিত, তাঁর অজ্ঞতা কেবল কথায়ই অজ্ঞতা। যিনি দূরে থাকতেও লাজারের মৃত্যু ও সমাধিদানের কথা জানেন, তিনি যে তাঁর সমাধিগৃহের স্থান বিষয়ে অজ্ঞ তা তো যুক্তিবিরুদ্ধ; এটাও যুক্তিবিরুদ্ধ যে, যিনি চিন্তা-ভাবনা তলিয়ে দেখেন তিনি সেই স্বীলোকের বিশ্বাস বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন; এটাও যুক্তিবিরুদ্ধ যে, যাঁর কোন দরকার হয় না লোকে কোন বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখবে, তিনি প্রেরিতদূতদের বলাবলি বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু যিনি সবই জানেন, তিনি গুপ্ত সঙ্কল্প ক্রমে সময় সময় এমনটা বলেন, তিনি যা ভাল করে জানেন ঠিক তাই জানেন না। সেই অনুসারে, আব্রাহাম ক্ষেত্রে তিনি কোন এক সময়কাল ধরে না জানার ভান করেন; সেই নির্বোধ কুমারীদের ক্ষেত্রে ও যারা শঠতার সাধক তাদের ক্ষেত্রে, এসমস্ত ক্ষেত্রে তিনি বলেন, তারা অযোগ্য বলে তিনি তাদের জানেন না; মানবপুত্র-রহস্য ক্ষেত্রে তাঁর জিজ্ঞাসা করাটা তাঁর মনুষ্যত্ব-জনিত, কেমন যেন তিনি সেবিষয়ে অজ্ঞ। মানুষ হিসাবে আমাদের দুর্বল প্রকৃতি যা কিছুতে অধীনস্থ, সেই সবকিছুতে তিনি দৈহিক জন্মের বাস্তবতায় নিজেকে উপযোগী করেন। তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ যে দুর্বল হয়ে যায় তা নয়, কিন্তু মানব-সজ্জাত ঈশ্বর বলে তিনি মানব-বিশিষ্ট সমস্ত দুর্বলতা ধারণ করেন, ও সেই দুর্বলতা সকল তিনি এমনভাবে ধারণ করেন না যার ফলে তাঁর রূপান্তরের অতীত স্বরূপ দুর্বল স্বরূপে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এমনভাবে সেই দুর্বলতা সকল ধারণ করেন যাতে মাংসধারণ-রহস্য রূপান্তরের অতীত এমন স্বরূপে সিদ্ধতা পায়; যিনি ছিলেন ঈশ্বর তিনি মানুষ হন, কিন্তু যিনি মানুষ তিনি ঈশ্বর হয়ে থাকায় ক্ষান্ত হন না। সুতরাং তিনি মানুষ ব'লে সজ্জাত মানুষের মত ব্যবহার করেন, ও তিনি ঠিক তা-ই [অর্থাৎ মানুষ ব'লেই] নিজেকে দেখান, ও ঈশ্বর হয়ে থেকেও অর্থাৎ বাণী হয়ে থেকেও প্রায়ই মানুষের বলার ভঙ্গি ব্যবহার করেন। কেননা আত্মপ্রকাশ করায় ঈশ্বরও মানুষের বলার ভঙ্গি প্রায়ই ব্যবহার করেন, যেমন, কাল ক্ষেত্রে যা এখনও জ্ঞাত হওয়ার নয় বা যা কিছু জ্ঞাত হওয়ার যোগ্য নয়, সেসমস্ত ক্ষেত্রে তিনি বলেন, সেইসব তিনি জানেন না (গ)।

৬৭। তাই এখন বোঝা যেতে পারে কেনই বা তিনি বলেছিলেন, তিনি সেই দিন জানতেন না। যদি এমনটা বিশ্বাস করা হয় তিনি আসলে দিনটা জানেন না, তাহলে প্রেরিতদূত প্রতিবাদ করে বলেন, তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত (ক)।

সুতরাং এই নিহিত জ্ঞান আছে, ও যেহেতু তেমন জ্ঞান নিহিত রাখা দরকার, সেজন্য তা যেন নিহিত অবস্থায় রাখা যেতে পারে সময় সময় তা অজ্ঞতাও বলে ঘোষিত হওয়া দরকার আছে। কেননা প্রকাশিত একটা জ্ঞান আর নিহিত হয়ে থাকবে না। সুতরাং খ্রিষ্ট ঘোষণা করেন, তিনি জানেন না যাতে তাঁর জ্ঞান নিহিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু, তাঁর জ্ঞান যেন নিহিত থাকে যখন তিনি ঘোষণা করেন তিনি জানেন না, তখন যিনি সর্বজ্ঞ, যখন তিনি যা বিষয়ে বলেন তিনি তা জানেন না যাতে তা নিহিত থাকে, তখন তিনি স্বরূপের খুঁতের কারণেই যে সেবিষয়ে অজ্ঞ তা নয়। তবে, বিচারের দিন বিষয়ক জ্ঞান যে কারণে নিহিত রাখা হয়, সেই কারণ তো গুপ্ত নয়। যেহেতু তিনি অবিচল বিশ্বাসে অটল হয়ে থাকবার ব্যাপারে আমাদের সতর্কবাণী দিতে ইচ্ছা করছিলেন, সেজন্য, যে নিশ্চয়তা সেই দিন ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারত, তা তিনি আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্কল্প ছিল, দ্ব্যর্থতায়ুক্ত প্রতীক্ষার অনিশ্চয়তায় চিন্তিত আমাদের মন তাঁর আগমনের দিন প্রতীক্ষা করতে করতে যেন প্রতীক্ষা করলেও অবিরতই প্রত্যাশা রাখত। তিনি ইচ্ছা করছিলেন, যে সময়টা অবশ্যই আসবে, সেই সময়ের খোদ অনিশ্চয়তাই আমাদের তৎপর ও সতর্ক করবে। কেননা প্রভু একথা বলেন, এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন’ এবং ‘সুখী সেই দাস, যাকে তাঁর প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন (খ)। সেই অজ্ঞতা তো ভোলাবার জন্য নয়, কিন্তু নিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দেবার জন্যই একটা উপায় ছিল। জ্ঞান বিষয়ে যে অজ্ঞতা বৃদ্ধি ঘটায়, সেই অজ্ঞতা ক্ষতিকর নয়, কেননা জ্ঞান বিষয়ে নিশ্চয়তা এখন-নিহিত বিশ্বাস ক্ষেত্রে অসতর্কতা জন্মাতে পারে, কিন্তু প্রতীক্ষার অনিশ্চয়তা মানুষকে অবিরতই প্রস্তুত করে রাখে। এই সতর্কতাই চোরের ভয়ঙ্কর আগমন থেকে মানুষকে সবসময় রক্ষা করে, কারণ চোর চুরি করার জন্য ঘুমের সময় বেছে নেয়, কিন্তু ক্ষতির ব্যাপারে সবসময় ভীত গৃহস্থামী জেগেই থাকে।

৬৮। সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের যে অজ্ঞতা তা অজ্ঞতা নয় কিন্তু রহস্য, কারণ তাঁর কর্মগুলো, তাঁর সাক্ষ্যসকল, ও তাঁর আত্মপ্রকাশসমূহ ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক ব্যবস্থা গুণে তিনি জানেন না কিন্তু একইসময় জানেন; তিনি জানেন কিন্তু একইসময় জানেন না। তথাপি এটা দেখা দরকার, তথা, এমনটা কি হতে পারে যে, যদিও তিনি মানব হৃদয়ের

চিন্তা-ভাবনা জানতে পারেন, তবু তিনি এত দুর্বল যে, পিতা যা জানেন তিনি তা জানতে সক্ষম নন? উচ্চতর স্বরূপ নিজের সমস্ত গতিতে নিম্নতর স্বরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারে, এবং, বলতে গেলে, নিজের প্রবল শক্তি দ্বারা সেটার দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে দখল করতে পারে, কিন্তু নিম্নতর যে স্বরূপ, তা উচ্চতর স্বরূপে প্রবেশ করতে সক্ষম নাও হতে পারে, কেননা, যেমন ভারী বস্তু লঘু বস্তুকে, ঘন বস্তু পাতলা বস্তুকে, জড় বস্তু তরল বস্তুকে পেরিয়ে যেতে পারে, তেমনি, বিপরীতে, লঘু বস্তু ভারী বস্তু দ্বারা, পাতলা বস্তু ঘন বস্তু দ্বারা, তরল বস্তু জড় বস্তু দ্বারা প্রবেশ্য নয়; কারণ যা শক্ত তা যা দুর্বল তার কাছে অগম্য, কিন্তু যা দুর্বল তা যা শক্ত তার দ্বারা প্রভাবান্বিত। সুতরাং ভক্তিশ্রীনেরা বলে, পুত্র এজন্যই পিতার চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে অজ্ঞ কারণ দুর্বল হওয়ায় তিনি তাঁর চেয়ে শক্তিশালীর কাছে যেতে ও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম; এমনকি দুর্বল বলেই তিনি শক্তিশালীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন না।

৬৯। দুঃসাহসী মুখের অধিকারী এমন কেউ থাকলে যে একমাত্র জনিত ঈশ্বর বিষয়ে এই ধরনের কথা বলতে সাহস করবে এমনকি ভক্তিশ্রীনেরা তা ভাববারও সাহস করবে, তবে সে তা-ই জেনে নিক যা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রেরিতদূত বিশ্বাস করছিলেন যখন করিস্থীয়দের কাছে লিখলেন, আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না (ক)। কিন্তু আমরা যারা জড় বিষয়ে স্থাপিত অর্থশূন্য উদাহরণ প্রত্যাখ্যান করি, সেই আমরা, মানব অবস্থা নয় কিন্তু তাঁরই পরাক্রম বিচার-বিবেচনা ক’রে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত ঈশ্বরকে, [পবিত্র] আত্মা থেকে [পবিত্র] আত্মাকে বিবেচনা করি। এসো, আমরা তাঁকে আমাদের বোধশক্তির মাপকাঠিতে নয় কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া প্রকাশের ভিত্তিতেই বিচার-বিবেচনা করি, তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি বলেন, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে (খ)। এসো, তাঁকে উপেক্ষা না করি যিনি বলেছেন, সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখ; তাতেই তোমরা জানবে ও বুঝবে যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি (গ); এবং যেন তাঁরই বিষয়ে অজ্ঞ না থাকি যিনি ঘোষণা করেছেন,

আমি এবং পিতা, আমরা এক (য)। যদি প্রকৃত নামগুলো তাদের স্বাভাবিক অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হলে আমাদের ধর্মতত্ত্বগুলোর সঙ্গে মিল রাখে, তাহলে যিনি মনশ্চক্ষু দ্বারা অন্যজনে দৃষ্ট হন, তিনি স্বরূপ ক্ষেত্রে সেই অন্যজন থেকে ভিন্ন নন। যাঁর মধ্যে অন্যজন অবস্থান করেন, জাত ক্ষেত্রে তিনি সেই অন্যজন থেকে ভিন্ন নন ও তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন যিনি, তাঁর মধ্যে তিনিও অবস্থান করেন; এবং যাঁরা এক, তাঁরা ভিন্ন নন। তাঁদের ঐক্য বুঝতে চেষ্টা কর, কারণ তাঁদের স্বরূপ বিচ্ছেদ্য নয়। অন্যদিকে, সেই অবিচ্ছেদ্য স্বরূপের রহস্যকেও উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর একথা ভেবে যে, একজন অন্যজনের আয়নাই যেন; তিনি তো আয়না, কিন্তু এই অর্থে নয় যে সেই স্বরূপ হলো বাহ্যিক একটা স্বরূপের বিতার প্রতিবিম্বিত প্রতিমূর্তি, কিন্তু এই অর্থে যে, সেই স্বরূপ এমন জীবনময় স্বরূপ যা জীবনময় স্বরূপ থেকে ভিন্ন নয়, কারণ সেই সমস্ত স্বরূপ পিতার সমস্ত স্বরূপ থেকে উদ্ভূত, কারণ একমাত্র জনিত স্বরূপ হিসাবে সেই স্বরূপ নিজেতে পিতার অধিকারী, কারণ ঐশ্বরিক হওয়ায় সেই স্বরূপ পিতাতে অবস্থান করে।

৭০। ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, এসমস্ত কথা প্রভু দ্বারা এই উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছিল যাতে তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম-রহস্যকে নির্দেশ করে; এজন্য তারা এটা ব'লে যে, সেই কথাগুলো ইচ্ছার মিল ব্যক্ত করে, এতে তারা সেই কথাগুলো অকেজো করতে চেষ্টা করে যাতে করে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ঈশ্বরত্বে নয় কিন্তু ইচ্ছায়ই ঐক্যের অধিকারী হন। তারা এমন ভাবে কথা বলে কেমন যেন ঈশ্বরের শিক্ষার জন্য ভাষা অকেজো, ও কেমন যেন প্রভু 'আমি এবং পিতা, আমরা এক ইচ্ছার অধিকারী' উক্তিটা বলতে পারতেন না; অথবা কেমন যেন এই কথাগুলোর অর্থ 'আমি এবং পিতা, আমরা এক' এর একই অর্থ বহন করত; অথবা, কেমন যেন কথা বলতে অক্ষম হওয়ায় তিনি এটা বলতে পারতেন না 'যে আমার ইচ্ছা দেখেছে, সে আমার পিতার ইচ্ছাকেও দেখেছে', এবং 'যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে' উক্তিটাও সেই কথাগুলোর একই অর্থ বহন করত; বা, অন্তত, কেমন যেন ঈশ্বর 'আমার পিতার ইচ্ছা আমাতে আছে ও আমার ইচ্ছা আমার পিতাতে আছে' বচনটা ব্যবহার করতে পারতেন না কিন্তু ধারণাটা উপযোগী ভাবে শুধু 'আমি পিতাতে ও পিতা আমাতে আছেন' বচনে ব্যক্ত হতে পারত। কিন্তু এসব কিছু জঘন্য, অকেজো ও ভক্তিহীন, এবং সাধারণ

সুমতি এমন মূর্খ অভিমত মেনে নিতে পারে না যে, প্রভু যা বলতে ইচ্ছা করতেন তা বলতে পারতেন না, বা, তিনি যা বললেন তা যা বলতে ইচ্ছা করছিলেন তা থেকে ভিন্ন। আমরা এমনটা দেখতে পাই যে, তিনি উপমা ও রূপক অবলম্বন করতেন, কিন্তু [ভ্রান্তমতের মূর্খ অভিমতের চেয়ে] চিত্রণ দ্বারা কথাগুলোকে আরও প্রবল করা, বা প্রবচনকে চিত্তগ্রাহী ব্যবহার দ্বারা উপদেশের মর্যাদা আরও ফুটিয়ে তোলা, বা ক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার জন্য ভাষা উপযোগী করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তথাপি, আমরা যা বিষয়ে আলোচনা করে আসছি, ঐক্য সংক্রান্ত এই বচন, অর্থ ক্ষেত্রে, এমনটা করতে দেয় না, কথাগুলো যা ব্যক্ত করে মানুষ তা ভিন্ন অর্থে বুঝবে। উভয় [অর্থাৎ পিতা ও পুত্র] যদি তাঁদের ইচ্ছার ঐক্যের জোরেই এক (কিন্তু বিচ্ছেদ্য স্বরূপগুলো ইচ্ছার ঐক্যের অধিকারী হতে পারে না যেহেতু সেগুলো পরস্পর বিরোধী, কারণ সেই স্বরূপগুলোর ভিন্ন জাত অবশ্যই এমন ইচ্ছার দিকে তাদের আকর্ষণ করে যা ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী হওয়ায় ভিন্ন ইচ্ছা), তখন যারা জ্ঞানের ঐক্যের অধিকারী নয় তারা কেমন করে ইচ্ছার ঐক্যের অধিকারী হতে পারে যখন একথা সত্য যে, জ্ঞান ও অজ্ঞতার মধ্যে ইচ্ছার ঐক্য থাকতে পারে না? সুতরাং, যেহেতু জানা ও অজানা পরস্পর বিরোধী, সেজন্য যা বিরোধী তা একক ইচ্ছার অধিকারী হতে পারে না।

৭১। কিন্তু, হয় তো এমনটা হতে পারে যে: একাই পিতা [বিচারের দিন] জানেন, পুত্রের এই ঘোষণা এটা সপ্রমাণ করার জন্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পুত্র সেই দিন জানেন না যেহেতু তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি তা জানেন না। যদি তিনি স্পষ্টভাবে না বলতেন, একাই পিতা তা জানেন, তাহলে আমাদের বোধশক্তির কাছে অধিক বিপজ্জনক সমস্যা ফেলে রাখা হত, কারণ আমরা ধরে নিতে পারতাম যে পুত্রও তা জানেন না। কেননা, যেহেতু পুত্রের না জানাটা এমন কথার কথা যা নিহিত জ্ঞান নির্দেশ করে, তা প্রকৃত অজ্ঞতা নয়, সেজন্য এমনটা ভাবতে নেই যে, যেহেতু তিনি বলেন, একাই পিতা তা জানেন, সেজন্য তিনি এখন তা জানেন না। যেভাবে উপরে দেখিয়েছি, সেই অনুসারে ঈশ্বরের জ্ঞান এমনভাবে উপলব্ধি করতে নেই কেমন যেন তিনি যা জানেন না তিনি তা আবিষ্কার করেন, কিন্তু প্রকাশের এক ক্ষণ বলেই তা উপলব্ধি করা দরকার। এবং একাই পিতা যে জানেন, তার অর্থ এই নয় যে পুত্র জানেন

না: পুত্র বলেন, তিনি জানেন না যাতে অন্যেরাও না জানে; এবং এটা বলেন যে, একাই পিতা জানেন যাতে দেখাতে পারেন যে, তিনিও জানেন। যখন আমরা বলি, ঈশ্বর তখনই আব্রাহামের ভালবাসা জানলেন যখন নিজের জ্ঞান লুকোনো বন্ধ করলেন (ক), তখন আমাদের এটাও বলতে হবে যে পিতা সেই দিন জানেন যেহেতু তিনি পুত্রের কাছে তা গুপ্ত রাখেননি। কেননা ঈশ্বর আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন না, কিন্তু উপযুক্ত সময়েই তা প্রকাশ করেন। অতএব, রহস্য অনুসারে যখন সেই দিনের কথা প্রকাশ না করার জন্য পুত্র বলেন তিনি সেই দিন জানেন না, তখন আমরা এটাও দেখি যে, যেহেতু পিতা সেই দিন প্রকাশ করেন, সেজন্য অবশ্যই একাই পিতা তা জানেন।

৭২। পিতা ও পুত্রে দৈহিক রূপান্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবীনতার কথা ভাবা, দূরের কথা, কেমন যেন পিতা সময় সময় পুত্রের কাছে কথা বলতেন ও সময় সময় নীরব থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা এটা স্মরণ করি যে, কোন এক সময়ে আমাদের জন্য একটা কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়েছিল যাতে পিতার বাণী নিজের নির্দেশনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে পুত্র-রহস্যটা সপ্রমাণ করে, যেইভাবে প্রভু বলেন, এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য স্বর্গ থেকে এসেছে (ক)। অন্যদিকে, ঈশ্বরের স্বরূপের পক্ষে সেই মানব প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যের দরকার হয় না যেমন জিহ্বার গতি, মুখের অভিযোজন, শ্বাসের কষ্ট, হাওয়ার কম্পন। ঈশ্বর তো একক, আমাদের তাঁকে ধর্মভাবের সঙ্গে উপলব্ধি করা দরকার, ভক্তির সঙ্গে ঘোষণা করা দরকার। তাছাড়া তাঁকে চিন্তা-ভাবনা দিয়ে অনুধাবন করতে নেই, কিন্তু তাঁকে উপাসনা করতে হয়, কারণ সীমাবদ্ধ ও দুর্বল একটা স্বরূপ নিজের মনের অভিমত দ্বারা অসীম ও সর্বশক্তিমান একটা স্বরূপের রহস্য ধারণ করতে অক্ষম। তিনি পরিবর্তন সাপেক্ষ নন, তিনি এমন নানা অংশে গঠিত নন যেগুলো তাঁকে যৌগিক ঈশ্বরত্ব করে তোলে। তিনি উদাসীন অবস্থা থেকে ইচ্ছাজনিত কর্মসাধনে, নীরবতা থেকে কথনে, বিশ্রাম থেকে কর্মে স্থানান্তর করেন না। এমনটা ভাবতে নেই যে তিনি আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হয়েই কোন কিছু ইচ্ছা করেন, বা নিজের স্বরূপনি দিয়ে নীরবতা না ভেঙে কিছুই বলতে পারেন না, বা কোন কিছুই সম্পাদন করতে পারেন না যা একটা অলৌকিক কাজে পরিণত হয়। যাঁর থেকে সমস্ত প্রকৃতি বিধিনিয়ম পেয়েছে, তিনি প্রকৃতির নিয়মের অধীন নন; যাঁর শক্তি অসীম, তিনি কাজ

সম্পাদনে দুর্বলতা ও রূপান্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, যেহেতু প্রভু বলেছেন, পিতা, সবই তোমার সাধ্য (খ); বাস্তবিকই, মানব চিন্তা-ভাবনা যা কল্পনা করতে পারে, সেটার চেয়ে ঈশ্বর আরও বেশি করতে পারেন। কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমানতার পরাক্রম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি, কেননা তিনি বললেন, পিতা যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা করেন (গ)। যখন দুর্বলতা নেই, তখন কঠিন বলতে কিছু নেই, কারণ যে প্রতাপ কর্মসাধনে দুর্বল, সেটাই কাঠিন্যে পরাভূত হয়। কেননা প্রতাপের দুর্বলতাই কাঠিন্যের কারণ; যে প্রতাপ সীমাহীন, তা দুর্বলতার নিয়ম দ্বারা অবদ্ধ নয়।

৭৩। আমরা এবিষয়ে আলোচনা করেছি যাতে সেই ধারণা দূর করে দিতে পারতাম যে, ঈশ্বর নীরব হওয়ার পর পুত্রের কাছে কথা বললেন, বা, পুত্র অজ্ঞ হওয়ার পর জ্ঞান লাভ করলেন। অন্যদিকে, আমরা দেখাতে চাচ্ছিলাম যে, আমাদের বুদ্ধি আমাদের স্বরূপের অনুরূপ কথা দ্বারাই প্রশিক্ষিত হওয়া দরকার, কেননা আমাদের বুদ্ধি মুখের কথা দ্বারা ছাড়া কোন কিছুই ধারণ করতে পারে না, শেখার মাধ্যমে ছাড়া কোন জ্ঞানও অর্জন করতে পারে না। সুতরাং, পুত্র সেই দিনের কথা জানেন না যেহেতু তিনি তা প্রকাশ করেন না, এবং তিনি বলেন, একাই পিতা তা জানেন যেহেতু তিনি কেবল পুত্রের কাছে তা প্রকাশ করেন। কিন্তু, যেমনটা আগে বলেছি, সেই অনুসারে তিনি এমনটা ধরে নিতে দেন না যে তাঁর স্বরূপ ক্ষেত্রে কোন না কোন দুর্বলতা রয়েছে অর্থাৎ এমনটা নয় যে তিনি তখনই জানেন যখন না জানা বন্ধ করেছেন, তিনি তখনই শোনে যখন পিতা কথা বলতে শুরু করেন। তিনি সেই একমাত্র স্বরূপকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন, তিনি একমাত্র জনিতজন বলে পিতার সঙ্গে যা বিষয়ে অধিকারী, এক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন, যা কিছু পিতার, তা সবই আমার (ক)। তবে, তিনি যে অধিকারী হতে শুরু করলেন, তা তো বলেননি, কারণ যা পিতার বাইরে সেটারই অধিকারী হওয়া একটা জিনিস, তাঁর নিজের সত্তার অধিকারী হওয়া আলাদা জিনিস; স্বর্গ, পৃথিবী ও সমস্ত বিশ্বের অধিকারী হওয়া একটা জিনিস, পুত্রের যা যা অধিকার সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে পিতার সত্তাই নির্দেশ করা আলাদা জিনিস; এবং তিনি যে বাহ্যিক ও অধীনস্থ বিষয় হিসাবে সেই বিষয়াদির অধিকারী তা নয়, কিন্তু সেই বিষয়াদি এমন কিছু বলে গণ্য যা থেকে তিনি নিজেই সত্তার অধিকারী। তাই যখন তিনি বলেন, যা কিছু পিতার, তা সবই তাঁর, তখন

তিনি [পিতা থেকে] গৃহীত দানগুলো ক্ষেত্রে পিতার সঙ্গে যে মিলিত অধিকার রাখেন তা নির্দেশ করেন না, বরং ঐশ্বরিক স্বরূপকেই নির্দেশ করেন। কেননা তিনি যে কথা বলছিলেন, অর্থাৎ, যা তাঁরই, পবিত্র আত্মা তা থেকে তুলে নেবেন (খ), সেই কথার পরে বললেন, ‘যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম, তা-ই তুলে নেবেন’। এইভাবে তিনি দেখাতে চান, যেহেতু যা তাঁর, পবিত্র আত্মা তা থেকে তুলে নেন, সেজন্য যা পিতার, তা থেকেও তুলে নেন; এতে তিনি বোঝাতে চান, পবিত্র আত্মা যখন যা পিতার তা থেকে তুলে নেন, তখন সেই পবিত্র আত্মা যা তাঁর তা থেকেও তুলে নেন। এবং যিনি ঈশ্বরের আত্মা, যেহেতু সেই পবিত্র আত্মা সৃষ্টজীবদের কাছ থেকে তুলে নিচ্ছিলেন না, সেজন্য আমরা দেখতে পাই, পবিত্র আত্মা এসমস্ত দান তুলে নেন কারণ সেই সমস্ত দান সবই ঈশ্বরের। যা কিছু পিতার তা সবই পবিত্র আত্মার, কিন্তু আমাদের এমনটা ভাবতে নেই, পবিত্র আত্মা পুত্র থেকে যা তুলে নেন তা পিতা থেকেও তুলে নেননি, কারণ যা কিছু পিতার অধিকার, তা পুত্রেরও অধিকার বলে গণ্য।

৭৪। এই স্বরূপের কোন পরিবর্তনের, বা প্রশ্নের, বা উত্তরের দরকার হয় না, ফলে স্বরূপটা অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভে স্থানান্তর করে না, যিনি নীরব ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না, প্রশ্নের পরে উত্তরের অপেক্ষায় থাকে না, কিন্তু নিজের পূর্ণতায় [পিতা] ঈশ্বরের ঐক্য-রহস্যে অবস্থান ক’রে যেইভাবে সেই [পিতা] ঈশ্বর থেকে নিজের উৎপত্তি প্রাপ্ত, সেইভাবে সেই [পিতা] ঈশ্বর থেকে নিজের সমস্ত সত্তাও প্রাপ্ত। তবে, সেই স্বরূপ যেহেতু তাঁর সমস্ত সত্তার অধিকারী, সেজন্য তাঁর সত্তার সমস্ত অত্যাৱশ্যক বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী যেমন জ্ঞান ও ইচ্ছা; এবং এমনটা হয় না যে, পুত্র [পিতার] একটা প্রশ্নের পরেই তা জানেন যা পিতা জানেন বা [পিতার] একটা আজ্ঞার পরেই পুত্র তা ইচ্ছা করেন যা পিতা ইচ্ছা করেন; বরং, যেহেতু যা কিছু পিতার অধিকার তা সবই পুত্রের অধিকার, সেজন্য পুত্র এমন স্বরূপের অধিকারী হয়ে ওঠেন যে-স্বরূপ কেবল সেইভাবেই ইচ্ছা করে ও জানে যেইভাবে পিতা ইচ্ছা করেন ও জানেন। উপরন্তু, নিজের উৎপত্তি প্রকাশ করার জন্য পুত্র প্রায়ই নিজের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করেন, যেমন তখনই ঘটে যখন তিনি বলেন, আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি এসেছি (ক)। তিনি নিজের

ইচ্ছা নয়, পিতারই ইচ্ছা পালন করেন, কেননা ‘যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন’ বলায় তিনি নিজের পিতাকে ছাড়া অন্য কাউকেই নির্দেশ করেন না। অন্যদিকে, তিনি তখনই স্পষ্টভাবে দেখান তাঁদের ইচ্ছা একই, যখন বলেন, পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে (খ)। তাই, যেহেতু পিতা ইচ্ছা করেন আমরা সেই খ্রিস্টের সঙ্গে থাকি যাঁর মধ্যে—প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—জগৎপত্তনের আগে তিনি আমাদের বেছে নিয়েছিলেন (গ), এবং পুত্র একই জিনিস ইচ্ছা করেন অর্থাৎ আমরা যেন তাঁর সঙ্গে থাকি, সেজন্য একই স্বরূপের অধিকারী হওয়া ছাড়া পুত্র একই ইচ্ছারও অধিকারী, যদিও এই ইচ্ছার উৎপত্তি দেখাবার জন্য, এই ইচ্ছা পিতার ইচ্ছা থেকে বিশিষ্ট।

৭৫। সুতরাং, পিতা যা কিছু জানেন সেবিষয়ে পুত্র কিছুতেই অজ্ঞ নন, কিন্তু একাই পিতা যে জানেন এথেকে এমনটা দাঁড়ায় না যে পুত্র অজ্ঞ, কারণ পিতা ও পুত্র স্বরূপের ঐক্যে অবস্থান করেন। তাছাড়া, যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত, সেই পুত্রের অজ্ঞতা হলো নীরবতা সংক্রান্ত ঐশ্বরিক ব্যবস্থা। এই সত্য স্বয়ং প্রভু দ্বারা তখনই ঘোষিত হয়েছিল যখন কাল সংক্রান্ত প্রেরিতদূতদের প্রশ্নে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয় (ক)। তাঁদের কাছে জ্ঞান[-মঞ্জুর] অস্বীকৃত; এবং জ্ঞান[-মঞ্জুর] যে তাঁদের কাছে অস্বীকৃত তা শুধু নয়, কিন্তু তাঁদের জানবার ভাবনা-চিন্তাও প্রত্যাখ্যাত কারণ এই সকল কাল তাঁদের জানবার নয়। অথচ, এখন যে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন তাঁরা সেই সকল কাল সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞাসা রাখেন যদিও তাঁর আগেকার জিজ্ঞাসায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, পুত্রও তা জানতেন না। এমনটা ভাবা যায় না, তাঁরা সেই কথা আক্ষরিক অর্থে ধরে এটা ধরে নিয়েছিলেন পুত্র সেই কাল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, কারণ তাঁরা আরও একবার তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখেন কেমন যেন তিনি তা জানতেন। এমনকি, যেহেতু তাঁরা এটা উপলব্ধি করেন যে তাঁর অজ্ঞতা-রহস্য হলো নীরবতা সংক্রান্ত ঐশ্বরিক ব্যবস্থা, সেজন্য এখন, অর্থাৎ পুনরুত্থানের পরে, তাঁরা ধরে নেন, এবার কথা বলার কাল এসে গেছে, তাই তাঁরা তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখেন। এবং উত্তর দিতে গিয়ে পুত্র এমনটা আর বলেন না, তিনি জানেন না, কিন্তু উত্তর দিয়ে বলেন যে, সেই সকল কাল তাঁদের

জানবার নয়, কারণ পিতা সেই কালসকল নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন। সুতরাং, পুত্র নিজের বিষয়ে যে ঘোষণা করেন, তিনি সেই দিন জানেন না, যখন প্রেরিতদূতেরা সেই ঘোষণাকে দুর্বলতার নয় কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থা বলে বিবেচনা করেন, তখন আমরা এটা কি বলতে পারি যে, পুত্র এই কারণেই সেই দিনের কথা জানেন না যেহেতু তিনি ঈশ্বর নন? সেই দিন যেন মানুষদের কাছে জ্ঞাত না হয়, সেই লক্ষ্যে যিনি দিনটা নিজের অধিকারের অধীনে রেখেছিলেন, তিনি কি পিতা ঈশ্বর নিজেই ছিলেন না? এটা কি সত্য নয় যে, প্রথমবারে যখন তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, তখন পুত্র উত্তরে বলেছিলেন, তিনি সেই দিন জানতেন না, কিন্তু এখন এমনটা আর বলেন না তিনি দিনটা জানেন না বরং এটা বলেন যে, তা তাঁদের জানবার নয়। ‘কাল’ শব্দতে দিন ও লগ্ন অন্তর্ভুক্ত, তাই এমনটা ভাবা যায় না যে, যিনি ইস্রায়েল রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরূপিত, সেই খ্রিষ্ট নিজেই তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দিন ও লগ্ন জানেন না। বরং, যে অধিকার শুধু পিতারই, তিনি শেখান যেন আমরা পিতার এই অধিকারে তাঁর নিজের [অনন্তকালীন] জন্ম বিষয়ে একটা প্রমাণ দেখি, কিন্তু এমনটা বলেন না, তিনি সেই দিন জানেন না; এবং দিনটা যে তাঁদের জানবার নয় এটা বলতে বলতে তিনি এটাও ঘোষণা করেন যে, সেই জ্ঞান হলো পিতার অধিকার সংক্রান্ত রহস্য।

[খ) যেহেতু পুত্র বলেন তিনি দিন ও লগ্ন জানেন না, এজন্য আমাদের এমনটা বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তিনি সত্যিই তা জানেন না। একই প্রকারে আমাদের এমনটা সমর্থন করা উচিত নয় যে, ঈশ্বর অশ্রুজল বা ভয় বা ঘুমের অধীনস্থ, কারণ মানুষ হিসাবে পুত্র অশ্রুজল ফেলেন, ঘুমিয়ে পড়েন ও কষ্ট পান। তাঁর মাংসের দুর্বলতা অনুসারে যেমন তিনি অশ্রুজল ফেলেন, ঘুমিয়ে পড়েন, ও ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, ক্লান্ত, ভীত হন তবু এতে তাঁর একমাত্র জনিতজনের সত্যকার স্বরূপ দুর্বল হয় না, তেমনি, তিনি যে দিন ও ক্ষণ জানেন না, এসমস্ত কথা আমরা তাঁর মানব স্বরূপের উপরে আরোপ করব।]

১ (ক) যোহন ১০:৩০।

(খ) এই প্রথম অধ্যায় পিতা ও পুত্রের স্বরূপের ঐক্য ও তাঁদের সমসত্ত্বা প্রমাণার্থে ৮ম পুস্তকে উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করে। তারপর, ৯ম-১২শ পুস্তকগুলো সুবিন্যস্ত ও

যুক্তিসঙ্গত কার্যসূচী অনুসারে সেই সমস্ত সমস্যা পরীক্ষা ও খণ্ডন করে যা আরিউসপন্থীরা সেবিষয়ে তথা পিতা ও পুত্রের স্বরূপের ঐক্য ও তাঁদের সমসত্তা বিষয়ে উত্থাপন করত।

(গ) কল ২:৮-৯।

(ঘ) যোহন ১৪:৯।

(ঙ) যোহন ১০:৩৮।

(চ) যোহন ১৬:১৫।

২ (ক) মার্ক ১০:১৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ১৭:৩।

(গ) যোহন ৫:১৯।

(ঘ) যোহন ১৪:২৮।

(ঙ) মার্ক ১৩:৩২।

৩ (ক) মথি ১০:৩২-৩৩।

৪ (ক) ‘ঈশ্বর-রহস্য ক্ষেত্রে...’: অর্থাৎ, আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে মানুষ যে ঈশ্বর হতে পারে, তা আমরা আরও সহজে উপলব্ধি করতে পারি; অপরদিকে, ঈশ্বর-রহস্য অনুসারে ঈশ্বর যে মানুষ হয়েছেন তা কম সহজে বুঝি।

(খ) ১১শ পুস্তক ৪৮-৪৯ অধ্যায় দ্রঃ।

৮ (ক) কল ২:৮-১০।

(খ) ফিলি ৩:২১।

(গ) ফিলি ২:১০-১১ লাতিন পাঠ্য।

৯ (ক) কল ২:১১-১২।

১০ (ক) কল ২:১৩-১৫ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ১ম পুস্তক ১৩ অধ্যায় দ্রঃ।

(গ) সাধু হিলারিউসের ধারণা এ: প্রেরিতদূত ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন না; অর্থাৎ, যিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেন ও বিশ্বাসীদের সঞ্জীবিত করে তোলেন, তিনি এক ও একই ঈশ্বর।

১১ (ক) খুলে দেওয়া সেই ‘মাংস[-বস্তু]’ হলো মনুষ্যত্ব।

১২ (ক) যোহন ১০:১১-১২।

(খ) যোহন ২:১৯ লাতিন পাঠ্য।

(গ) ১ করি ১:২৪।

১৩ (ক) ২ করি ১৩:৪।

(খ) রো ৬:১০-১১।

১৪ (ক) ‘ঈশ্বরের রূপ’ ও ‘দাসের রূপ’ সংজ্ঞা দু’টো দু’টো অর্থ অনুসারে ব্যবহৃত : প্রথম অর্থ অনুসারে ‘ঈশ্বরের রূপ’ হলো ঐশ্বরিক স্বরূপ, ও ‘দাসের রূপ’ হলো মানব স্বরূপ; দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে ‘ঈশ্বরের রূপ’ হলো তাঁর গৌরবময় অবস্থা, ও ‘দাসের রূপ’ হলো মানব স্বরূপের স্থায়ী নিম্নাবস্থা।

(খ) ফিলি ২:৭ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

১৫ (ক) মার্ক ১০:১৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মার্ক ১০:২৮-৩০।

১৬ (ক) মার্ক ১০:১৭ লাতিন পাঠ্য।

(খ) রো ১০:৪ দ্রঃ।

(গ) রো ৮:৩; গা ৩:২ দ্রঃ।

১৭ (ক) মার্ক ১০:২১।

১৮ (ক) যোহন ১৩:১৩।

(খ) মথি ২৩:১০ লাতিন পাঠ্য।

১৯ (ক) যোহন ১৪:১ লাতিন পাঠ্য।

২০ (ক) যোহন ৫:৩৬-৩৮।

(খ) মথি ১৭:৫।

(গ) ‘কণ্ঠস্বরটা হলো পিতার কণ্ঠস্বর’ : যখন সেই কণ্ঠস্বর বলে ‘ইনি আমার পুত্র’, তখন ‘পুত্র’ শব্দটা পিতার বিদ্যমানতা দাবি করে, কারণ পিতা না থাকলে কোন পুত্র হয় না।

(ঘ) ‘একাই যোহনই তা মরুপ্রান্তরে শুনেছিলেন’ : প্রকৃতপক্ষে মথি-সুসমাচার অনুসারে (মথি ৩:১৭) যিশুর বাপ্তিস্মের সময়ে পিতা বলেছিলেন, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন’; অর্থাৎ হিলারিউসের যোগ করা ‘তাঁর কথা শোন’ বাক্যটা মথির এই বচনে নেই, কিন্তু

রূপান্তরের বর্ণনায়ই উল্লিখিত; সুতরাং এটা স্পষ্ট যে হিলারিউস বাপ্তিস্মের বর্ণনায় উল্লিখিত কণ্ঠস্বর উপস্থাপন না করে ভুলবশত রূপান্তরের বর্ণনায় উল্লিখিত কণ্ঠস্বর উপস্থাপন করেন।

(ঙ) যোহন ৫:৩৬.

(চ) যোহন ৫:৩৭-৩৮.

(ছ) ‘তঁারা উভয়েই সেই [অনন্তকালীন] জন্মের ফলে অবিচ্ছেদ্য স্বরূপের অধিকারী বলে প্রদর্শিত’: সাধু হিলারিউসের ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিসম্মত: খ্রিষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর কিন্তু পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী। তাঁর কর্মগুলো তাঁর ঈশ্বরত্বকে সপ্রমাণ করে, ও কর্ম-সম্পাদনে পিতা ও পুত্রের যে ঐক্য, তা তাঁদের সমসত্তাকে সপ্রমাণ করে। কেননা কর্মগুলো পিতার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে। তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবে এটা সমর্থন করা হয় যে, খ্রিষ্টে যে স্বরূপ সক্রিয়, তা হলো পিতার স্বরূপ।

২২ (ক) যোহন ৫:৪৪।

(খ) যোহন ৫:৪০-৪৪।

(গ) যোহন ৫:২৫।

২৩ (ক) যোহন ৫:২৩।

(খ) যোহন ১১:৪।

২৪ (ক) মার্ক ১২:২৯-৩১ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মার্ক ১২:৩২-৩৩।

২৫ (ক) মার্ক ১২:৩৪।

(খ) মথি ২৫:৩৪।

(গ) মথি ৫:৩।

২৬ (ক) মার্ক ১২:৩৪-৩৭।

২৮ (ক) যোহন ১৭:৩ লাতিন পাঠ্য।

২৯ (ক) যোহন ১৪:৯।

(খ) যোহন ১৪:১০-১১।

(গ) যোহন ১৬:৩০।

৩০ (ক) যোহন ১৬:২৭-২৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ১৬:৩২-৩৩ লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোহন ১৬:৩৩ লাতিন পাঠ্য।

৩১ (ক) যোহন ১৭:১-২।

(খ) ৩য় পুস্তক ১২ অধ্যায় দ্রঃ।

(গ) ‘নাকি, তিনি এজন্যই দুর্বল যে, সমস্ত মাংসের উপর অধিকার পেয়েছেন’ : যুক্তির জোর ‘পেয়েছেন’ শব্দের উপরে স্থিত, কেমন যেন গ্রহীতা-পুত্র ‘পেয়েছেন’ ব’লেই দাতার চেয়ে ছোট ও দুর্বল।

(ঘ) যোহন ১৬:১৫।

(ঙ) ৭২ অধ্যায় দ্রঃ]

(চ) যোহন ১৬:১৫।

৩২ (ক) যোহন ১৭:৩।

৩৩ (ক) যোহন ১৭:৩ লাতিন পাঠ্য।

৩৬ (ক) মণ্ডলী ‘খ্রিস্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করে যেহেতু একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতাকে স্বীকার করে থাকে’ : মণ্ডলী খ্রিস্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করে যেহেতু সে পিতাকে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করে। পিতা হওয়ায় ঈশ্বরের অবশ্যই একটি পুত্র আছেন ; এবং ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর না হয়ে পারেন না। এইভাবে পিতা-ঈশ্বরে বিশ্বাস পুত্র-ঈশ্বরে বিশ্বাসকে দাবি করে।

৩৮ (ক) ‘নবীন স্বরূপ’ অর্থাৎ মানব স্বরূপ।

(খ) ‘স্বরূপগত ঐক্য’ হলো সেই গৌরবেই ঐক্য যা নিজের ঈশ্বরত্বের জোরে খ্রিস্টের অধিকার ছিল ও যা তিনি মনুষ্যত্ব ও দাসের রূপ ধারণ করার ফলে সাময়িক ভাবে হারিয়েছিলেন।

৩৯ (ক) যোহন ১৭:৩।

(খ) যোহন ১৭:৪।

(গ) যোহন ১৭:৫।

৪০ (ক) যোহন ১৩:৩১-৩২ লাতিন পাঠ্য।

৪১ (ক) যোহন ১৩:৩২। যোহনের বচনের তিনটে অর্থ এ : ১) মানবপুত্রের গৌরবায়ন ; ২) মানবপুত্রের গৌরবায়নে ঈশ্বরের গৌরবায়ন ; ৩) পিতার মধ্যে মানবপুত্র কীভাবে গৌরবান্বিত হন।

৪২ (ক) ফিলি ২:১১।

(খ) যোহন ১৭:৩ লাতিন পাঠ্য।

৪৩ (ক) যোহন ৫:১৯।

(খ) ‘ইহুদীদের দ্বিবিধ বিরক্তি’: প্রভু ১) শাব্বাৎ দিন লঙ্ঘন করছিলেন ও ২) ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলছিলেন ও এইভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন, এই দু’টো কারণেই ইহুদীরা প্রভুকে হত্যা করতে চেষ্টা করছিল।

(গ) ৭ম পুস্তক ১৫ অধ্যায় দ্রঃ।

৪৪ (ক) যোহন ৫:১৬।

(খ) যোহন ৫:১৭।

(গ) যোহন ১৪:১০।

(ঘ) যোহন ৫:১৮।

৪৫ (ক) যোহন ৫:১৯।

(খ) যোহন ৫:১৭।

(গ) যোহন ৪:৩৫।

(ঘ) যোহন ৫:১৯।

(ঙ) যোহন ৫:২৩।

৪৭ (ক) যোহন ৮:২৮-২৯।

৪৯ (ক) যোহন ৬:৩৭-৩৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ৬:৫-৪৭ লাতিন পাঠ্য।

৫০ (ক) যোহন ৫:২১।

(খ) যোহন ৬:৪০।

(গ) যোহন ১৭:২৪।

(ঘ) মথি ১১:২৭।

৫১ (ক) যোহন ১৪:২৮।

(খ) ‘একমাত্র জনিত ঈশ্বর ঈশ্বরের রূপে...’: সাধু হিলারিউস এটা সমর্থন করেন যে, ঈশ্বরের রূপে খ্রিষ্ট সবসময় ঈশ্বরের স্বরূপে, ঐক্যে ও গৌরবে ছিলেন যদিও তিনি দাসের রূপ অনুসারে ঐশ্বরিক স্বরূপের ঐক্য মাংসধারণের পর পরে নয় কিন্তু পুনরুত্থানের পরেই পেয়েছিলেন।

৫২ (ক) যোহন ১৪:৯।

(খ) যোহন ১০:৩৮।

(গ) যোহন ১৪:১১।

৫৩ (ক) যোহন ১৪:২৮।

(খ) ফিলি ২:৮-৯ দ্রঃ।

৫৪ (ক) ‘তাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে’: পুত্র মৃত্যুর পরে সেই নাম পেলেন ‘সকল নামের উর্ধ্বে যে নাম’ অর্থাৎ যিশু খ্রিষ্ট নাম।

(খ) ‘সেই নাম-দান’, অর্থাৎ সেই নাম ‘সকল নামের উর্ধ্বে যে নাম’।

(গ) ফিলি ২:১০-১১ দ্রঃ।

(ঘ) ফিলি ২:৯।

৫৫ (ক) যোহন ১৪:৩০।

(খ) যোহন ১৪:৫১।

৫৬ (ক) মার্ক ১৩:৩২।

৫৯ (ক) ‘সেই জ্ঞান সময় সময় এমন কিছু প্রকাশ করে ...’: উদাহরণ স্বরূপ, প্রভু যিশু পরের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতেন।

(খ) যোহন ৬:৬৪।

(গ) কল ১:১৬-১৭, ১৯-২০ দ্রঃ।

(ঘ) কল ৩:৪।

(ঘ) ১ থে ৫:২।

৬২ (ক) কল ২:২-৩।

(খ) ‘কারণ একটা রহস্য রয়েছে’: রহস্যটা হলো, খ্রিষ্ট দাসের রূপে গুপ্তই স্বয়ং ঈশ্বর।

(গ) ‘যে বিষয় তিনি জানেন না, সেবিষয় সম্পর্কে তিনি সত্যিই অজ্ঞ কিনা’: সাধু হিলারিউস ‘না জানা’ ও ‘অজ্ঞ হওয়ার’ মধ্যে পার্থক্য রাখেন। ‘না জানাটার’ অর্থ হলো অভ্যন্তরীণ অজানা; কিন্তু ‘অজ্ঞ হওয়াটার’ অর্থ হলো, যা জানা তা প্রকাশ না করা।

৬৩ (ক) আদি ১৮:২০-২১।

৬৪ (ক) আদি ২২:১২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) রো ৪:৩।

(গ) ‘যখন ঈশ্বর জানেন না, তখন তাঁর অজ্ঞতা নয়, সময়ই সেটার কারণ’: অর্থাৎ, ‘জানাটা’ প্রকাশ করার সময় তখনও হয়নি।

৬৫ (ক) মথি ৭:২৩ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ২৫:১২।

(গ) মথি ২৫:১৩।

৬৬ (ক) সাম ৭:১০ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ৯:৪।

(গ) সাধু হিলারিউস যা তত্ত্ব ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করেন, তা *dokein* (দকেইন, মনে হওয়া) ভ্রান্তমত নয়। কেননা খ্রিস্টের প্রকৃত অভ্যন্তরীণ জানা ও তাঁর বাহ্যিক অজ্ঞতার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা তাঁর ব্যক্তিত্বে উপস্থিত মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের মধ্যকার ঐক্য গুণে খ্রিস্টের মনুষ্যত্বের অলৌকিক সর্বজ্ঞানের উৎপত্তিকে দেখায়। অপরদিকে *dokein* (দকেইন, মনে হওয়া) ভ্রান্তমত হলো প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর একটা ভ্রান্তমত যা অনুসারে ঐশবাণীর মাংসধারণ সত্যকার ও প্রকৃত ছিল না, অর্থাৎ সেই মতে যিশু কখনও জন্ম নেননি, কষ্টও ভোগ করেননি, মৃত্যুবরণও করেননি বরং ‘মনে হচ্ছিল’ তিনি জন্ম নিলেন, কষ্টভোগ করলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন।

৬৭ (ক) কল ২:৩।

(খ) মথি ২৪:৪৪, ৪৬।

৬৯ (ক) ১ করি ২:১০-১১।

(খ) যোহন ১৪:৯।

(গ) যোহন ১০:৩৮।

(ঘ) যোহন ১০:৩০।

৭১ (ক) যোহন ১২:৩০ দ্রঃ।

৭২ (ক) যোহন ১২:৩০ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মার্ক ১৪:৩৬।

(গ) যোহন ৫:১৯ লাতিন পাঠ্য।

৭৩ (ক) যোহন ১৬:১৫।

(খ) যোহন ১৬:১৫ দ্রঃ।

৭৪ (ক) যোহন ৬:৩৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ১৭:২৪।

(গ) এফে ১:৪ দ্রঃ।

৭৫ (ক) প্রেরিত ১:৭।

(খ) এই অংশ অপ্রামাণিক বলে গণ্য, এমনকি, বেশ কয়েকটা পাণ্ডুলিপিতে অংশটা স্থান পায় না। তাছাড়া, অংশটার বক্তব্য সাধু হিলারিউসের এতদ্রুপে উপস্থাপিত শিক্ষার সঙ্গে মিল রাখে না এমনকি বিপরীত ধারণা সমর্থন করে। সুতরাং অংশটা সাধু হিলারিউসের প্রকৃত লেখার অংশ নয় বলে গণ্য করা উচিত।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

১০ম পুস্তক

১০ম পুস্তকের ১-৪ অধ্যায় সাধু হিলারিউসের আধ্যাত্মিকতা আরও স্পষ্ট করে তোলে। কেননা যে নানা কারণ ভ্রান্তমতসমূহকে উৎপন্ন করে তিনি সেবিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে করতে ও আরিউসপন্থীদের সেচ্ছাচারী ধারণাগুলো খণ্ডন করতে করতে এতে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দেন যে, এই লেখা তাঁর নির্বাসন কালেই লিখিত হয়েছিল, সেইভাবে যেভাবে তিনি ৪র্থ অধ্যায়ে বলেন, ‘আমাদের নির্বাসনের দেশ থেকেও আমরা এ পুস্তকগুলোর মধ্য দিয়ে কথা বলব, ও যা শৃঙ্খলিত করা যায় না সেই ঈশ্বরের বাণী স্বাধীন হয়ে ছুটে চলবে’।

এই ১০ম পুস্তকের প্রকৃত বিষয়বস্তু হলো খ্রিষ্টতত্ত্ব। আরিউসপন্থীরা যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ, তাঁর ভয়, কষ্ট ও শোক ভিত্তিতে এমনটা বলত, তিনি ঈশ্বর নন, কারণ ঈশ্বর যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন। তেমন অভক্তিময় ধারণা খণ্ডন করার জন্য সাধু হিলারিউস এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন যা যথেষ্ট অদ্ভুত মনে হতে পারে, কেননা তিনি এটা সমর্থন করেন যে, জীবনকালে ও বিশেষভাবে যন্ত্রণাভোগ কালে যিশু দেহে কষ্ট ভোগ করলেন কিন্তু প্রাণে ভয় ও ব্যথা পাননি। ধারণাটা যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, তবু ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়; এবং তেমন অনুসন্ধানের পরেই পাঠক মনে স্থির করবেন সাধু হিলারিউসের ধারণা গ্রহণযোগ্য কিনা।

এক্ষেত্রে, সর্বপ্রথমে আমাদের দেখতে হবে সাধু হিলারিউসের এ ‘অদ্ভুত’ ধারণা মণ্ডলীর বিশ্বাস-স্বীকৃতির বিরুদ্ধ কিনা। কেননা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ১ম ও ২য় শতাব্দীতে গ্রীক জ্ঞানমার্গ নামক একটা ভ্রান্তমত প্রচলিত ছিল যা অনুসারে যিশুর দেহ বাস্তব ছিল না, যার ফলে তিনি যাই কিছু করতেন, যেমন চলাচল করা, খাওয়া-দাওয়া করা, ঘুমানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ড, তা তিনি প্রকৃতপক্ষে করতেন না। কিন্তু, সাধু হিলারিউস যা বলেন ও সেই ভ্রান্তমত যা সমর্থন করে তা এক নয়, কেননা সাধু হিলারিউস স্পষ্টই বলেন, যিশুর দেহ বাস্তবই ছিল (৪১ অধ্যায় দ্রঃ)। ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে আমরা এখন তাঁর সেই ‘অদ্ভুত’ ধারণা স্পষ্ট করার জন্য এগোতে পারি :

যেমন উপরে বলা হয়েছে, সাধু হিলারিউসের ধারণা অনুসারে যিশু দেহে ভয় অভিভূত ছিলেন ও যন্ত্রণাভোগ করতেন কিন্তু প্রাণে ভয় ও ব্যথা অনুভব করতেন না। এবিষয়ে সাধু হিলারিউস আমাদের স্মরণ করান যে, যেহেতু যিশু ছিলেন একাধারে মানুষ ও ঈশ্বর, সেজন্য মানুষ হিসাবে ভয় ও ব্যথা অনুভব করতেন কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে ভয় ও ব্যথা অনুভব করতেন না। ধারণাটা উপলব্ধি করার জন্য স্বয়ং সাধু হিলারিউসের দেওয়া একটা উদাহরণ ভিত্তি করে (৪৪ অধ্যায় দ্রঃ) কয়েকটা উদাহরণ উপস্থাপন করা হোক : সাক্ষ্যমেরেরা যখন ভয়ানক পীড়ন-যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সম্মুখীন ছিলেন, তখন দেহে অবশ্যই ভয়ে অভিভূত ছিলেন ও তীব্র কষ্ট ভোগ করতেন কিন্তু বিশ্বাস গুণে ও স্বর্গীয় সুখের প্রত্যাশায় মনে সেই ভয় ও কষ্টের ব্যথা অনুভব করতেন না এমনকি প্রভুর গুণকীর্তন করতেন ও একে অন্যকে সাহস দিতেন। প্রতিটি মাও প্রসবকালে ভয়ে কম্পিত হন ও তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু সেই যন্ত্রণায় চিৎকার করলেও তবু তাঁর শিশু যে জন্ম নিচ্ছে ও তিনি যে সেই শিশুকে লালন-পালন করবেন ও মানুষ করবেন এই চিন্তায় সেই সমস্ত ভয় ও ব্যথা মিলিয়ে যায়। সাধু হিলারিউস ঠিক এই ধারা অনুসারে বলেন, মানুষ হিসাবে যিশু দেহে ভয় পেতেন ও ব্যথা অনুভব করতেন, কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য এত চিন্তিত ছিলেন ও স্বর্গীয় সুখ বিষয়ে এত সচেতন ছিলেন যে ভয় ও কষ্ট অনুভব করতেন না; বস্তুত যার কান কাটা হয়েছিল তিনি যখন মহাযাজকের সেই দাসকে নিরাময় করতেই ব্যস্ত ছিলেন, অর্থাৎ যখন যিনি পরেরই ব্যথা এমনকি সর্বমানুষেরই ভয়-আশঙ্কা ও ব্যথা রোধ করতে চিন্তিত ছিলেন, তখন, সাধু হিলারিউসের মতে, কেমন করে বলা যেতে পারে তিনি আসন্ন পেরেকের চিন্তায় বা অন্যান্য পীড়নের আশঙ্কায় প্রাণে ভয়ে অভিভূত হতে পারতেন? সুতরাং, সাধু হিলারিউসের উপস্থাপিত ধারণা অনুসারে যিশু মানবদেহে ভয় ও ব্যথা অনুভব করতেন কিন্তু একাধারে তাঁর ঐশ্বরিক চেতনা গুণে সেই ভয় ও সেই ব্যথা অনুভব করতেন না। তাই, সাধু হিলারিউসের ধারণা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত হয়েও তবু উপস্থাপিত উদাহরণ যোগে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যও বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

তবু উদাহরণ যোগেও যদি কেউ না কেউ সাধু হিলারিউসের ধারণা গ্রহণযোগ্য মনে না করে, তাহলে সে এপুস্তকের ২৩ অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত (এমনকি পরবর্তী পুস্তকগুলোতে) যখন এধরনের ধারণার সামনে দাঁড়াবে, তখন নির্দিধায় তা মেনে না নিক। এক কথায়, আমরা সাধু হিলারিউসের এ ধারণা গ্রহণ করতে পারি, নাও গ্রহণ করতে পারি।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	
	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	
	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১											

১। এতে কোন সন্দেহ নেই যে মানুষ যা কিছু বলেছে, তা সবসময়ই প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হল, কারণ যখন ইচ্ছার গতিসকল পরস্পর বিরোধী, তখন ধারণাও পরস্পর বিরোধী; ধারণাগুলো বিরোধীদের অভিমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে লড়াই করে ও সেই অভিমতে যা পছন্দ করে না ধারণাগুলো সেগুলোর প্রতিবাদ করে। প্রতিটি কথা সত্য-যুক্তি দ্বারা প্রণোদিত হলে তবে সেই কথা অখণ্ডনীয়, কিন্তু যেহেতু একজন একটা জিনিস দেখে ও ভালবাসে, ও অন্যেরা অন্য একটা কথা দেখে ও ভালবাসে, সেজন্য সত্যের বাণী তার প্রতিরোধীদের খুঁতখুঁতে যুক্তির সম্মুখীন হতে বাধ্য, কারণ মূর্খ ও জঘন্য ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তমত সত্যকে না বুঝুক বা সত্যকে পছন্দ না করুক সবসময়ই সেই সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সচেষ্ট। স্থিতমূল ব্যক্তিগত অভিমত দ্বারা নিরূপিত জেদ সীমাহীন; যখন ইচ্ছা যুক্তির আর অধীন নয় ও সেই মানসিক গতি সত্যের প্রতি আর বশীভূত নয়, বরং আমরা আমাদের ব্যাখ্যা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের উপযোগী করি, তখন প্রতিবাদ করার মানসিক যত গতি অবাধে চলতে থাকে। তবে, সেই পরিস্থিতিতে, উপস্থাপিত ধর্মতত্ত্ব আর সত্যকার নয় বরং হবে শুধু মুখে সমর্থিত ধর্মতত্ত্ব; সত্যপ্রিয়ী যুক্তিও আর থাকবে না, থাকবে স্বেচ্ছাকৃত যুক্তি, এমন যুক্তি যা ইচ্ছে নিজের খেয়ালখুশি মত রক্ষা করবে, সেই যুক্তি নয় যা যুক্তিসঙ্গত সত্য-জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম। সুতরাং, এই যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি যা প্রকৃতপক্ষে দলাদলি-প্রিয় ইচ্ছার স্বকীয় চিহ্ন, তেমন ভুলভ্রান্তি থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারণার মধ্যে যত প্রতিবাদ জেগে ওঠে। সত্য ঘোষণা ও ব্যক্তিগত অভিমতের মধ্যে জেদি সংগ্রাম চলতে থাকে; সত্য নিজেকে স্থিতমূল রাখে ও পূর্বস্থিরীকৃত কল্পনা-জল্পনা সত্যকে রোধ করে। অন্যদিকে, যদি ব্যক্তিগত অভিমত যুক্তির স্থানে প্রাধান্য না নিত বরং সত্য-জ্ঞান যুক্তিকে

যা সত্য তা ইচ্ছা করতে উদ্দীপিত করত, তাহলে আমরা ব্যক্তিগত অভিমতের উপরে স্থাপিত ধর্মতত্ত্বকে কখনও অনুসন্ধান করতাম না, কিন্তু যুক্তির উপরে স্থাপিত ধর্মতত্ত্বই আমাদের গোটা ইচ্ছাকে প্রভাবান্বিত করত; এবং সত্যের বাণী প্রতিবাদ ছাড়াই নিজেকে ব্যক্ত করতে পারত, কারণ আমরা এক একজন যা ইচ্ছা করি তা সত্য বলে আখ্যায়িত করতাম না, বরং যা সত্য তা-ই ইচ্ছা করতে শুরু করতাম।

২। তেমন খুঁত-আক্রান্ত ইচ্ছা বিষয়ে অচেতন না হয়ে প্রেরিতদূত বিশ্বাস-স্বীকার ও বাণী-প্রচার সংক্রান্ত বহু সতর্কবাণীর মধ্যে তিমথির কাছে পত্রে বলেন, কারণ এমন সময় আসবে, যখন লোকেরা যথার্থ ধর্মশিক্ষা আর সহ্য করবে না, কিন্তু নতুন নতুন কিছু শুনবার জন্য তাদের কান চুলকাবে, এবং তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে নিজেদের চারপাশে রাশি রাশি গুরু জমিয়ে রাখবে; এবং রূপকথার দিকে ফেরার জন্য সত্যের দিকে কান দিতে আর চাইবে না (ক)। কেননা, যখন অভক্তির প্রতি ভালবাসা মানুষকে যথার্থ ধর্মশিক্ষা সহ্য করতে বাধা দেবে, তখন তাদের যা রুচিকর তা পাবার জন্য তারা নিজেদের চারপাশে রাশি রাশি গুরু রাখবে (অর্থাৎ নিজেদের চারপাশে তারা এমন গুরু রাখবে যারা তাদের রুচিমত ধর্মতত্ত্ব বানাবে ও উদ্ভাবন করবে), ও প্রশিক্ষিত হবার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করবে না, কিন্তু তারা যা কামনা করে তার জন্য গুরুর মহৎ ভিড় জমাবে, অর্থাৎ, যাতে সবদিক থেকে সন্ধান করা ও জড় করা সেই গুরুর ভিড় নিজ নিজ দলের পছন্দ অনুসারে তাদের তুষ্ট করে। তেমন মূর্খ অভক্তির বিরূপ ক্ষিপ্ততা যা যথার্থ তত্ত্ব আর সহ্য করে না, সেই ক্ষিপ্ততা যদি দৈবাৎ এটা জানে না, সেই যথার্থ সত্যকে তারা কেমন আত্মায় বিকৃত করবে, তাহলে প্রেরিতদূতের এবাণী শুনুক যা তিনি সেই একই তিমথির কাছে লেখেন, আত্মা স্পর্ষই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে: তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাগুলিতে ও শয়তানীয় নানা মতবাদে সায দেবে যেহেতু তারা মিথ্যাবাদীদের কপটতায় প্রবঞ্চিত (খ)। তবে, সত্যকার ধর্মতত্ত্বের লক্ষ্যে, সত্য অনুযায়ী জিনিসের স্থানে আমাদের পছন্দমত জিনিসের অনুসন্ধান কোন্ সুবিধা এনে দেয়? এবং সত্য-ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা বাসনা না করে আমরা যদি আমাদের পছন্দমত ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলি, তাহলে সত্য-ধর্মতত্ত্বের প্রতি কোন্ সম্মান থেকে যায়? কিন্তু সেই প্রলুব্ধকারী আত্মাগুলোর প্ররোচনা ঠিক তা-ই সরবরাহ করে; সেই আত্মাগুলো ভান

করা ভক্তির মিথ্যা-মিথ্যি সপ্রমাণ করে; কেননা বিশ্বাস-ত্যাগের পর এমন মিথ্যা ভণ্ডামি এসে পড়ে যা, অন্তত কথায়ই, এমন ভক্তি দেখাতে চায় যা বিবেক ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। এবং এই ভান করা ভক্তিকে সবধরনের মিথ্যাকথা দ্বারা ভক্তিহীন করা হয়, ও বিশ্বাসের পবিত্রতাকে মিথ্যা ধর্মতত্ত্বের উদ্ভাবন দ্বারা লঙ্ঘন করা হয়, কারণ ধর্মতত্ত্বকে সুসমাচারের বিশ্বাস অনুসারের চেয়ে নিজেদের দলীয় কামনা দ্বারাই দৃঢ়তর করে তোলা হয়েছে। তাদের কান চুলকানিতে প্রণোদিত, কারণ শুনবার অধৈর্যশীল পছন্দ তাদের কামনা অনুযায়ী প্রচার দ্বারা কানকে সুড়সুড়ি দেয়, এবং সত্য শ্রবণ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরকীয় হয়ে উঠে তারা রূপকথার হাতে নিজেদের ছেড়ে দেয়। এবং এমনটা এমনভাবে ঘটে যার ফলে তারা যা বলে তা সত্যের রূপ ধারণ করে যেহেতু তারা সত্য বলতে বা শুনতে অক্ষম হয়েছে।

৩। হ্যাঁ, এটা স্পষ্ট যে, আমরা প্রেরিতদূতের ভাববাণীর অনিষ্টকর সময়ে এসে গেছি। কেননা ঈশ্বরকে নয় কিন্তু একটা সৃষ্টজীবেরই কথা প্রচার করে এমন গুরুদের অনুসন্ধান করার পর মানুষ আজকালে সত্যকার বিশ্বাসের শিক্ষার চেয়ে মানুষদের কামনার বিষয়েই বেশি চিন্তিত। কানের চুলকানি মানুষকে নিজেদের পছন্দমত কথা শুনতে এমন ভাবে উত্তেজিত করেছে যে, এখন গুরুর ভিড়ের মধ্যে সেই প্রচার এমন একটা ধর্মতত্ত্বের হাতে রয়েছে যা অনুসারে একমাত্র জনিত ঈশ্বর পিতার পরাক্রম ও সত্যকার স্বরূপের পরকীয়, এবং এর ফলে সেই ঈশ্বর অন্য ধরনের ঈশ্বর হন এমনকি তিনি আদৌ ঈশ্বর নন। উভয় বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ভক্তিহীন ও মৃত্যুজনক: তাদেরই সেই স্বীকারোক্তি হোক যারা ভিন্ন ঐশ্বরিক মর্যাদা বিশিষ্ট দু'টো ঈশ্বরের কথা বলে, বা তাদেরই সেই স্বীকারোক্তি হোক যারা তাঁরই ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে যিনি [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী। যে কান সত্য শ্রবণ ক্ষেত্রে পরকীয় হয়ে রূপকথার দিকে ফিরল, সেই কান ঠিক এ ধর্মতত্ত্ব দু'টোকেই পছন্দ করে: সত্যকার ধর্মতত্ত্ব শোনা অসহ্য হয়েছে ও তার প্রচারকদের সঙ্গে মিলে সেই ধর্মতত্ত্ব একেবারে নির্বাসিত।

৪। সত্যিই, আজ সত্যকার ধর্মতত্ত্ব সেই অনেকের জন্য নির্বাসিত যারা নিজ নিজ রুচি অনুসারে নিজেদের চারপাশে রাশি রাশি গুরু রাখে, কিন্তু পবিত্রজনদের সঙ্ঘ থেকে

সত্য-প্রচার কখনও নির্বাসিত হবে না। আমাদের নির্বাসনের দেশ থেকেও আমরা এ পুস্তকগুলোর মধ্য দিয়ে কথা বলব, ও যা শৃঙ্খলিত করা যায় না সেই ঈশ্বরের বাণী স্বাধীন হয়ে ছুটে চলবে আমাদের এ সতর্কবাণী শুনিয়ে যে, আমরা ঠিক সেই কালে জীবনযাপন করছি যা বিষয়ে প্রেরিতদূত ভাববাণী দিয়েছিলেন, এর ফলে, যখন দেখা যায় যে সত্য-শ্রবণ একেবারে অসহ্য হয়ে গেছে ও মানুষের রুচি অনুসারে গুরুর সেই মহৎ ভিড় উপস্থিত, তখন সেই কাল সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ না থাকুক, কিন্তু সবাই এতে সচেতন হোক যে, যখন সত্যকার ধর্মতত্ত্বের রক্ষকেরা নির্বাসনে রয়েছে সত্যও সেই নির্বাসনের দেশে তাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু আমরা কালের ব্যাপারে বিলাপ করব না, বরং এতে আনন্দ করব, কারণ শঠতা ঠিক আমাদের এই নির্বাসনকালেই নিজেকে প্রকাশ করবে যে কালে, সত্যকে সহ্য করতে অক্ষম হয়ে সেই শঠতা চারপাশে নিজের রুচিমত গুরুরা রাখার জন্য সত্যকার ধর্মতত্ত্বের প্রচারকদের নির্বাসিত করে। আমাদের নির্বাসনের বিষয়ে আমরা আনন্দিত ও প্রভুতে উল্লসিত, কারণ প্রেরিতদূতের ভাববাণী আমাদের ব্যক্তিত্বে পূর্ণতা লাভ করেছে।

৫। তবে, পূর্ববর্তী পুস্তকগুলোতে আমি আমার মতে যথার্থ ও অক্ষুণ্ণ সত্যের এমন বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি রক্ষা করতে গিয়ে (যদিও মানব স্বভাবের নিয়ম অনুসারে এমনটা বলা হয় যে সবকিছুরই জন্য প্রতিবাদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে) আমি মনে করি যে, আমার আলোচনার প্রতিটি বিষয়ের জন্য এমন পদ্ধতি পালন করেছি যা, অভক্তি-ঘোষণা না করা বাদে কেউই প্রতিবাদ করতে পারে না। কেননা, ভ্রান্তমতপন্থীরা নিজেদের মিথ্যা কৌশল হাতিয়ার করে সুসমাচারগুলো থেকে যে বচনগুলো অন্যায়ভাবে দখল করে, আমি সেই বচনগুলোর সত্যকার অর্থ এমনভাবে দেখিয়েছি যে, তারা অজ্ঞতার অজুহাত দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু নিজেদের অভক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। পবিত্র আত্মার দান অনুসারে আমি এক্ষেত্রেও বিশ্বাস-প্রমাণ দেওয়ায় এমন সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি যাতে তারা আমার বিষয়ে নূনতম ত্রুটিও খুঁজে পেতে না পারে। কেননা যখন তারা আমাদের [অর্থাৎ কাথলিকদের] বিষয়ে কথা বলে, তখন অজ্ঞদের কান ভরিয়ে তুলতে অভ্যস্ত, যার ফলে এটা ঘোষণা করে যে, আমরা খ্রিস্টের [অনন্তকালীন] জন্ম অস্বীকার করি; তাছাড়া তারা এটাও বলে যে, আমি

এবং পিতা, আমরা এক (ক) বচন দ্বারা আমরা নাকি একাকী এমন ঈশ্বরের কথা প্রচার করি। তাদের মতে, আমরা এটা ঘোষণা করি যে, যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নন সেই ঈশ্বর কুমারীতে নেমে এসে মানুষ হলেন; আরও, সেই ‘আমি’ প্রথম শব্দ দিয়ে তিনি নিজের মাংস সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দেশ করতে ইচ্ছা করছিলেন কিন্তু নিজের ঈশ্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ ‘এবং পিতা’ যোগ দিয়েছিলেন, তিনি কেমন যেন বলতে চাচ্ছিলেন যে তিনি হলেন তাঁর এই মনুষ্যত্বের পিতা; এবং তাছাড়া, তিনি দু’টো ব্যক্তি দিয়ে অর্থাৎ মানবীয় ও ঐশ্বরিক ব্যক্তি দিয়ে গঠিত বলে তিনি বলেছিলেন ‘আমরা এক’।

৬। কিন্তু আমরা সেই জন্মকে কালের বাইরে স্থিত বলে সবসময় সমর্থন করতে করতে এটা প্রচার করেছি যে, পুত্র ঈশ্বর এমন স্বরূপের অধিকারী যা পিতা ঈশ্বরের স্বরূপের চেয়ে ভিন্ন নয়; এটাও প্রচার করেছি যে, যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় [তথা পিতা], পুত্র যে তাঁর সমসমান নন যেহেতু তাঁর নিজেরও জন্ম সম্ভব নয়, তা নয়, কিন্তু তিনি তাঁরই সমসমান যেহেতু একমাত্র পুত্র বলে জনিত; এটাও প্রচার করেছি যে, পিতা ও পুত্র এক, কিন্তু একক ব্যক্তিতে দু’টো নাম আরোপণের ফলে নয় বরং একই স্বরূপেই জন্মের ফলে; এটাও প্রচার করেছি যে, আমাদের বিশ্বাসে নিজ নিজ সত্তায় আলাদা দু’টো ঈশ্বর নেই, এবং, অন্যদিকে, একমাত্র জনিত ঈশ্বর সংক্রান্ত রহস্য স্বীকার করার ব্যাপারে, ঈশ্বর যে এক বলতে এমনটা বোঝায় না যে তিনি একাকী। এমনকি, আমরা এটা প্রচার করেছি, পুত্র পিতাতে প্রকাশিত ও অস্তিত্বশীল, কারণ তাঁর মধ্যে পিতার স্বরূপ ও সেই স্বরূপের নাম রয়েছে [তথা পিতার মত তিনিও ‘ঈশ্বর’ নাম বহন করেন]; আরও, পুত্রে পিতা উপলব্ধ হন ও অবস্থান করেন, কারণ একটি পুত্র ‘পুত্র’ বলে অভিহিত ও পুত্রও হতে পারেন না যদি না তিনি একটি পিতা থেকে সঞ্জাত না হন। আমরা এটাও প্রচার করেছি যে, তিনি হলেন জীবনময় স্বরূপের জীবনময় প্রতিমূর্তি; এটাও প্রচার করেছি যে, সেই যে ঐশ্বরিক মুদ্রাঙ্কনে তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ চিহ্নিত, সেই মুদ্রাঙ্কন তাঁকে পিতার অধিকার ও সত্তার সমান এমন অধিকার ও সত্তা আরোপ করে যে, পুত্রের কাজ, কথা ও রূপ পিতার কাজ, কথা ও রূপের চেয়ে ভিন্ন নয়। কিন্তু, যেহেতু প্রকৃতিগত ভাবে প্রতিমূর্তি নিজের প্রণেতার স্বরূপের অধিকারী, সেজন্য নিজের স্বরূপগত প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে প্রণেতা নিজেও কাজ করেছেন, কথা বলেছেন ও দৃষ্ট হয়েছেন।

৭। আমরা এমনটা প্রচার করেছি যে, সেই একমাত্র জনিতজনের প্রজনন কালের বাইরে, অনির্বচনীয়, ও মানব মনের উপলব্ধি-শক্তির অতীত, কিন্তু একাধারে আমরা কুমারীর প্রসবের ফলে মানুষ বলে সঞ্জাত ঈশ্বর সংক্রান্ত রহস্য শিখিয়েছি। মাংসধারণ-ব্যবস্থা অনুসারে আমরা প্রমাণ করেছি যে, যখন তিনি ঈশ্বরের রূপ ছেড়ে দাসের রূপ আপন করে নিলেন, তখন ধারণ করা মনুষ্যত্বের দুর্বলতা ঐশ্বরিক স্বরূপকে দুর্বল করেনি, কিন্তু ঐশ্বরিক অধিকার মনুষ্যত্বকে এমনভাবে আরোপ করা হলো যার ফলে ঐশ্বরিক পরাক্রম মনুষ্যত্ব-ধারণে বিলীন হয়নি। কেননা মানুষ বলে সঞ্জাত হওয়ায় ঈশ্বর ঈশ্বর হওয়া শেষ করার জন্য তো জন্ম নেননি, কিন্তু এজন্য জন্ম নিলেন যেন ঈশ্বর ঈশ্বর হয়ে থাকতেই মানুষ ঈশ্বর বলে জন্ম নেন। কেননা তাঁর নামও ইমানুয়েল যার অর্থ আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর (ক); এর ফলে ঈশ্বর মানুষের পর্যায়ে নমিত হন না, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত হয়। অন্যদিকে, যখন এমনটা প্রার্থনা করেন তিনি যেন গৌরবান্বিত হন (খ), তখন তাঁর এই প্রার্থনা ঐশ্বরিক স্বরূপের খাতিরে নয়, কিন্তু তাঁর ধারণ করা নিম্ন স্বরূপের খাতিরেই হয়। কেননা তিনি সেই গৌরবই প্রার্থনা করেন জগৎপত্তনের আগে ঈশ্বরের কাছে যার অধিকারী তিনি ছিলেন।

৮। ভ্রান্তমতপন্থীদের অধিক মূর্খ ঘোষণায় উত্তর দিতে গিয়ে আমরা সেই অজ্ঞাত লগ্নের আলোচনায় আসি। আচ্ছা, তারা যেইভাবে বলে, সেই অনুসারে যদিও সেই লগ্ন পুত্রের কাছে অজ্ঞাত হত, তবু ব্যাপারটা একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ হত না, কারণ প্রকৃতিও এটা মানে না যে, জন্ম সেই আদিবিহীন অস্তিত্বে পর্যন্ত তাঁকে পিছনে আনতে পারে যা যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় তাঁরই বৈশিষ্ট্য। কেননা যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় সেই পিতা নিজের তেমন প্রতাপ দেখাবার জন্য এখনও অস্থিরীকৃত সেই লগ্ন স্থির করার অধিকার নিজেই রাখেন। অন্যদিকে, সিদ্ধ জন্ম যা যা দিতে পারে, যে স্বরূপ জন্মের অধিকার-সূত্রে পূর্ণমাত্রায় সেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী, সেই স্বরূপ যে পুত্রতে দুর্বল হতে পারে তা ভাবাও যায় না; এবং একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে ভিন্ন ঈশ্বরত্বের অধিকারী করার জন্য সেই দিন ও লগ্ন বিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষেত্রেও পুত্রকে দায়ী করা যায় না : সাবেল্লিউস-পন্থীদের বিরুদ্ধে পিতার অজনিত ও আদিবিহীন অধিকার প্রমাণিত করার জন্যই অজনিত এই অধিকার পুত্রকে

মঞ্জুর করা হয় না। কিন্তু, যেহেতু আমরা এটা সমর্থন করেছি যে, পুত্র যে সেই দিন জানেন না এমন ঘোষণা অজ্ঞতা-দুর্বলতা সংক্রান্ত নয় কিন্তু ঐশ্বরিক নীরবতা-ব্যবস্থাই (ক) সংক্রান্ত, সেজন্য ভক্তিহীন ঘোষণাগুলোর জন্য সমস্ত সুযোগ বাদ দেওয়া ও ভ্রান্তমতের ঈশ্বরনিন্দাজনক সমস্ত শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের এখনকার কর্তব্য, যেন, যে সমস্ত কথা দ্বারা সুসমাচারের সত্যকে অন্ধকারময় করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে, আর আমরা এই প্রচেষ্টা ভাল মতই দেখতে পাচ্ছি, সেই সুসমাচারের সত্য যেন দীপ্তিমান হয়ে ওঠে।

৯। কেননা বেশির ভাগ ভ্রান্তমতপন্থী এটা মেনে নেয় না যে, খ্রিষ্ট ছিলেন যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নয় এমন স্বরূপের অধিকারী, কারণ তাদের মতে তিনি যন্ত্রণাভোগ ভয় করলেন ও কষ্টভোগে নিজেকে দুর্বল দেখালেন। তারা বলে, যিনি ভয় পেলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন তিনি, যে আস্থা ভয় পায় না, সেই প্রতাপজনিত আস্থার অধিকারী ছিলেন না, বা সেই আত্মাজনিত অক্ষয়শীলতারও অধিকারী ছিলেন না যা কষ্ট জানে না। বরং পিতা ঈশ্বরের স্বরূপের চেয়ে নিম্নতর স্বরূপের অধিকারী হওয়ায় তিনি মানব যন্ত্রণার ভয়ে কম্পিত হলেন ও শারীরিক কষ্টের তীব্রতার সামনে হাহাকার করলেন। এরা নিজেদের ভক্তিহীন ঘোষণা একথার উপরে দাঁড় করায়, যেমন, আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত শোকার্ত, আরও, পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক (ক); আরও, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার আমায় ত্যাগ করেছে কেন (খ), এবং এবচনের সঙ্গে এটাও যোগ করে, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই (গ)। তারা নিজেদের অভক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই আমাদের পবিত্র বিশ্বাসের এসমস্ত কথা দখল করে। তারা এটা বলে যে, খ্রিষ্ট ভয় পাচ্ছিলেন কারণ অবসন্ন ছিলেন ও পানপাত্রটা যেন সরে যায় এলক্ষ্যে প্রার্থনা করছিলেন; আরও, তিনি শোকাচ্ছন্ন ছিলেন কারণ নিজের যন্ত্রণাভোগে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন; তিনি দুর্বলতাও দেখালেন কারণ পিতার কাছে আত্মা তুলে দিলেন। তারা বলে, একমাত্র জনিতজনের জন্মের কথা ধরে তাঁর মনের উদ্বেগ এমনটা হতে দেয় না তাঁকে সেই সাদৃশ্য আরোপ করা হবে যা সেই স্বরূপকে মানায় যা ঈশ্বরের স্বরূপের সমান। এই স্বরূপ তখনই নিজের দুর্বলতা ও নিম্নাবস্থা দেখায় যখন তিনি

প্রার্থনা করেন যেন পানপাত্রটা সরে যায়, আবার তখনই, যখন তিনি পরিত্যক্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ জানান, আবার তখনই, যখন তিনি নিজের আত্মাকে তুলে দেন।

১০। সর্বপ্রথমে, ঠিক এসমস্ত বচন দ্বারা, খ্রিস্ট ক্ষেত্রে, এটা দেখাবার আগে যে তিনি কোন মতেই দুর্বলতা, ভয় ও কষ্টের অধীন হননি, আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যদি, আমাদের বিবেচনায়, তিনি এতই ভীত হলেন যে অসহ্য কষ্টের ভয়ে পড়েছিলেন। এবিষয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাঁর ভয়ের কারণ হিসাবে তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু ছাড়া অন্য কারণ উপস্থাপিত নয়। কিন্তু যারা তেমনটা ভাবে, তাদের আমি জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুজনিত সমস্ত ভয় থেকে প্রেরিতদূতদের দূর করার জন্য যিনি একথা দ্বারা সাক্ষ্যমরণের গৌরব বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন যে কেউ নিজের দ্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়। যে কেউ নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে (ক), তিনি যে মৃত্যু বিষয়ে ভীতি ছিলেন তা কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে সমর্থন করা যায়? যেহেতু তাঁর পক্ষে মৃত্যুবরণ করাটা হলো জীবন, সেজন্য, মৃত্যু-রহস্য ক্ষেত্রে, যারা তাঁর খাতিরে মৃত্যুবরণ করে তাদের যিনি জীবন প্রতিদানে পুরস্কৃত করেন, আমাদের বিবেচনায়, তিনি কেমন কষ্ট ভোগ করলেন? এবং যখন তিনি এই উপদেশ দেন যে, যারা দেহ মেরে ফেলে তাদের ভয় করতে নেই (খ), তখন এমনটা কি হতে পারে যে, মৃত্যু তাঁকে এতই ভীত করল যে তিনি দৈহিক কষ্টে ভীত হলেন?

১১। আরও, যিনি নিজের অধিকারের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার ফলে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছিলেন, তিনি কোন্ কষ্টই বা ভয় করতে পারতেন? মানবজাতির ক্ষেত্রে, জ্বর, ক্ষত, দুর্বিপাক বা পতনের মত একটা বাহ্যিক শক্তি আকস্মিক মৃত্যুকে নিয়ে আসতে পারে যা দেহকে আক্রমণ করে, অথবা আমাদের দেহের প্রকৃতিই বয়স দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হাতে আত্মা সমর্পণ করে। কিন্তু, জীবন বিসর্জন দেওয়ার যাঁর যেমন অধিকার আছে, তেমনি তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আছে (ক), সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর সর্বক পান করার পর একথা ঘোষণা ক'রে যে মানব যন্ত্রণা সংক্রান্ত তাঁর সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয়েছিল, তিনি মৃত্যু-রহস্য নিজেতে পূরণ করার জন্য মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন (খ)।

যখন মানব স্বরূপকে স্বেচ্ছায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার ও মৃত্যুতে বিশ্রাম করার অধিকার মঞ্জুর করা হয়, যখন দেহকে বিনষ্ট না ক'রে ক্ষতবিক্ষত প্রাণ সেই দেহ ত্যাগ করতে পারে, অথবা যখন আত্মা, বলতে গেলে, নিজের অঙ্গে ভাঙ্গন, বিধিগণ বা আঘাতের ফলে লঙ্ঘন করা না হয়ে বের হয়ে উড়ে চলে যায়; যখন প্রভু আত্মা ত্যাগ করার সময়ে ও মরার সময়ে সেই মৃত্যুতে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুশীলন করলেন না, তখন মৃত্যুর ভয়-বিভীষিকা জীবনের প্রভুকে ধরে ফেলুক। অন্যদিকে, যখন তিনি নিজে থেকেই মরলেন ও নিজের ইচ্ছাক্রমেই আত্মা সঁপে দিলেন, তখন তাঁর জন্য কোনও মৃত্যু-ভয় নেই, কারণ মৃত্যুবরণ করাটা তাঁরই অধিকারে রয়েছে।

১২। কিন্তু এমনটাও হতে পারে, মানব অজ্ঞতার ভয়েই তিনি সেই মৃত্যুর প্রভাব ভয় করলেন যা তাঁর নিজের মধ্যে স্থিত ছিল; তাই স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেও তিনি হয় তো মরবার এই স্বাধীনতা ভয় করলেন। তবে, এমন কেউ থাকলে যে তেমনটা ভাবে, তাহলে সে সূক্ষ্মভাবে বলুক, তার মতে কে মৃত্যু ভয় করতে পারত, আত্মা নাকি দেহ? দেহটা হলে তবে সে সম্ভবত এটা জানে না যে, সেই পবিত্রজন অবক্ষয় দেখবেন না (ক); সম্ভবত সে এটাও জানে না যে, খ্রিষ্ট নিজের দেহ-মন্দির তিন দিনে পুনরুত্তোলিত করবেন (খ)। অন্যদিকে, আত্মাই হলে ভয় পাবার কারণ, তাহলে, যখন লাজার আব্রাহামের কোলে আনন্দিত (গ), তখন কি খ্রিষ্ট পাতাল-গহবরের জন্য ভয় পাবেন? যিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে ও ফিরিয়ে নিতে সক্ষম ছিলেন, মানব পরিত্রাণ-রহস্য পূরণ করার জন্য যাঁর স্বেচ্ছায়ই মরার কথা ছিল, তিনি যে মৃত্যুকে ভয় পাবেন, তা মূর্খ ও হাস্যকর কথা। যিনি মরতে ইচ্ছা করেন ও কেবল অল্পকালেরই মত মরতে সক্ষম, তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতে পারেন না, কেননা ভয় এবং মরবার ইচ্ছা ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে কোন মিল নেই, কারণ যখন একজন মরতে ইচ্ছা করে ও জীবনে ফিরে আসার অধিকার রাখে, তখন মৃত্যু ভয়ের বস্তু হতে পারে না।

১৩। কিন্তু এমনটা কি হতে পারে যে, তিনি দ্রুশারোপণেরই দৈহিক যন্ত্রণা, বা যে দড়ি দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হলো সেই কড়া দড়ি, বা বিধিয়ে দেওয়া সেই পেরেক জনিত

নিষ্ঠুর ক্ষত ভয় করলেন? তবে, এসো, এবার দেখি, সেই মানুষ-খ্রিস্টের কেমন দেহ ছিল যার ফলে যন্ত্রণা তাঁর ক্রুশারোপিত, বাঁধা ও বিদ্ধ দেহে অবস্থান করতে পারবে।

১৪। আমাদের দেহের স্বরূপ এমন যে, যখন প্রাণের সংসর্গে দেহ সঞ্জীবিত হয় ও সংবেদী প্রাণ-জনিত অনুভূতি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বরূপ জড় ও নিষ্প্রাণ পদার্থ আর নয়; কিন্তু যখন তাকে স্পর্শ করা হয় তখন সে অনুভব করে, যখন তাকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয় তখন সে কষ্ট পায়, যখন তার শীত লাগে তখন সে কাঁপে, যখন তাকে প্রাঞ্জল করা হয় তখন সে তৃপ্তি পায়, যখন সে অনাহারে ভোগে তখন নিঃশেষিত হয়, ও খাদ্যের প্রাচুর্যে মোটা-সোটা হয়। যা তাকে সুস্থির করে ও তার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই প্রাণের একপ্রকার স্থানান্তর গুণে সেই মানব স্বরূপ যে যে অবস্থা-পরিস্থিতি বিরাজ করে সেই অনুসারে তৃপ্তি বা কষ্ট পায়। যখন খোঁচানো বা বিঁধিয়ে দেওয়া দেহ কষ্ট পায়, তখন সেই দেহে ব্যাপ্ত অনুভূতিই সেই কষ্টের উপলব্ধি তার কাছে আনে। যেমন, মাংসে যে ক্ষত তা হাড় পর্যন্ত কষ্ট দেয়, কিন্তু মাংসের বাইরে প্রসারিত লম্বা নখের একটা অংশ কাটলে আঙুল কিছুই টের পায় না। এবং কোন না কোন রোগের আকস্মিক আগমনের ফলে যদি সময় সময় অঙ্গগুলোর একটা নির্জীব হয় ও জীবন্ত মাংসের অনুভূতি হারায়, তাহলে সেই অঙ্গ কাটা হলে বা পুড়িয়ে দেওয়া হলে, তবে যে সমস্ত ব্যথা অনুভব করতে পারত তা আর অনুভব করে না, কারণ প্রাণ সেই অঙ্গের সঙ্গে আর যুক্ত নয়। আরও, যখন দেহের কোন না কোন অঙ্গ কাটার জরুরী কারণ উপস্থিত হয়, তখন ঔষধের মাধ্যমে প্রাণের তেজ ঘুম পড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, এবং সেই প্রবল রসে বশীভূত হয়ে মন নিজের অনুভূতির এমন বিস্মৃতিতে পড়ে যা মৃত্যুর মত। সেসময় অঙ্গগুলো কাটা হতে পারে, কোন ব্যথা টের পাওয়া যাবেই না : মাংস নিজের অনুভূতি-শক্তি হারায় ও ক্ষত যতই ব্যাপ্ত হোক সে সেই গভীর ক্ষত অনুভব করে না কারণ প্রাণ তন্দ্রাচ্ছন্ন। সুতরাং, ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণের সংসর্গে জীবনযাপন করে বলেই দেহ কষ্টের ব্যাধির বশীভূত।

১৫। অতএব, আমাদের দেহ ও প্রাণের জীবন যেভাবে শুরু হয়, যদি খ্রিস্ট নিজের দৈহিক জীবন সেইভাবে শুরু করে থাকেন; যখন তিনি মানুষের সাদৃশ্যে গঠিত হলেন, মানব রূপে আবির্ভূত হলেন ও মানুষ হিসাবে জন্ম নিলেন, তখন তিনি ঈশ্বর বলে যদি

নিজের দেহের ও প্রাণের প্রত্যক্ষ প্রণেতা না হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা এটা ধারণা করতে পারি, তিনি আমাদের দেহের কষ্ট-ব্যথা অনুভব করলেন। কেননা তাঁর গর্ভধারণ ও তাঁর প্রাণ ও দেহের উৎপত্তি আমাদেরটার মত হয়, তিনি এমন দেহের অধিকারী যা আমাদেরটার মত জীবনযাপন করে। কিন্তু যদি নিজের ইচ্ছার ফলে তিনি কুমারীর মাংস নিজের জন্য নিয়ে থাকেন ও নিজের ইচ্ছাক্রমে সেইভাবে নিজের গর্ভস্থ দেহকে প্রাণের সঙ্গে মিলিত করে থাকেন, তাহলে এটা আবশ্যিক যে, তাঁর কষ্টভোগের স্বরূপও তাঁর প্রাণ ও দেহের স্বরূপের অনুরূপ হবে। যখন তিনি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করলেন ও দাসের রূপ ধারণ করলেন, যখন ঈশ্বরের পুত্র নিজের সত্তা ও পরাক্রম না হারিয়ে মানবপুত্র বলেও জন্ম নিলেন, তখন সেই বাণী-ঈশ্বর নিখুঁত জীবনময় মানুষ হলেন। ঈশ্বরের পুত্র কেমন করে মানবপুত্র বলে জন্ম নিতে পারতেন, কেমন করে ঈশ্বরের রূপ বজায় রেখেও তিনি দাসের রূপ ধারণ করতে পারতেন যদি না যিশু খ্রিষ্ট (যেহেতু ঈশ্বর বলে বাণী নিজের ইচ্ছাক্রমে কুমারীর গর্ভে মাংসও ধারণ করতে পারেন ও মাংসকে প্রাণও দিতে পারেন) আমাদের প্রাণ ও দেহের মুক্তিকর্মের লক্ষ্যে সিদ্ধ মানুষ বলে জন্ম না নিতেন ও কুমারী থেকে গর্ভস্থ সেই দেহ ধারণ না করতেন যা তাঁকে দাসের রূপ আরোপ করল? (ক)। সেই কুমারী তা-ই মাত্র গর্ভধারণ করলেন যা তাঁর [তথা খ্রিষ্টের] পবিত্র আত্মা থেকেই মাত্র গর্ভধারণ করলেন। এবং যদিও মাংসে [খ্রিষ্টের] জন্ম ক্ষেত্রে সেই কুমারী নিজের পক্ষ থেকে সেই অবদান রাখলেন যা প্রতিটি নারী দেহ-গঠনের জন্য গৃহীত বীজকে দান করে, তথাপি যিশু খ্রিষ্ট প্রকৃতিগত মানব গর্ভধারণ দ্বারা গঠিত হননি; কিন্তু কেবল [পবিত্র] আত্মারই দ্বারা প্রদত্ত নিজের জন্মপ্রক্রিয়ার যে কারণ, সেই কারণ কুমারী থেকে সেইসব কিছু পেল যা মানবজন্ম দানকালে একটি মা অর্পণ করে, যদিও তিনি নিজের উৎপত্তির গুণে ঈশ্বর হওয়া কখনও শেষ করেননি।

১৬। স্বয়ং প্রভু মানব-ধারণ সংক্রান্ত সেই মহত্তম ও অধিক সুন্দর রহস্য তখনই প্রকাশ করেন যখন বলেন, স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি সেই মানবপুত্র যিনি স্বর্গে রয়েছেন (ক)। ‘স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন’ বাক্যটা পবিত্র আত্মা থেকে গর্ভস্থ হওয়ার উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করে। মারীয়া তাঁর দেহের উৎপত্তি ঘটাননি যদিও নিজের গর্ভে সেই দেহের বৃদ্ধিতে ও সেই দেহ-প্রসবলগ্নে

তাঁর স্ত্রীলিঙ্গের প্রকৃতি অনুসারে অবদান রাখলেন। ‘মানবপুত্র’ শব্দটা কুমারীতে গর্ভস্থ সেই মাংসের জন্ম নির্দেশ করে। এবং ‘যিনি স্বর্গে রয়েছেন’ বাক্যটা তাঁর নিত্যস্থায়ী স্বরূপকে নির্দেশ করে। তাঁর নিজের ইচ্ছাক্রমে মাংসকে উৎপন্ন ও গঠন করার পর এই স্বরূপ তার নিজের অধিকৃত অসীমতা গুণে গণ্ডিবদ্ধ দেহের সীমায় নিজেকে আটকাইল। [পবিত্র] আত্মার পরাক্রমে ও ঈশ্বরের অধিকার ক্রমে, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু সেই বাণী যদিও দাসের রূপে অবস্থান করছিলেন তবু তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর চক্রের মধ্যে ও অতীতে সর্বদা বিদ্যমান ছিলেন। সেইজন্য প্রভু ‘স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন’, তিনি ‘সেই মানবপুত্র’ ও ‘স্বর্গে রয়েছেন’, কারণ সেসময় এই মাংস-হওয়া-বাণী বাণী হওয়া শেষ করেননি। যেহেতু তিনি বাণী, সেজন্য তিনি ‘স্বর্গে রয়েছেন’; যেহেতু তিনি মাংস, সেজন্য তিনি ‘সেই মানবপুত্র’; যেহেতু ‘বাণী হলেন মাংস’, সেজন্য তিনি একইসময় স্বর্গ থেকে আগত, মানবপুত্র ও স্বর্গে বিদ্যমান। কেননা বাণীর অনন্তকালস্থায়ী ও অশরীরী পরাক্রম তখনও সেই স্বর্গে বিদ্যমান ছিল যা থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন; এবং তাঁর মাংস সেই বাণী থেকে ছাড়া অন্য কারও থেকে উৎপত্তি নেয়নি,; এবং মাংস-হওয়া-বাণী মাংস হয়েও তবু বাণীও হওয়া শেষ করছিলেন না।

১৭। ধন্য প্রেরিতদূত [খ্রিষ্টের] দেহের অনির্বচনীয় জন্মের রহস্যকেও সূক্ষ্মরূপে তখনই নির্দেশ করেন যখন বলেন, প্রথম মানুষ স্থলভূমির মাটি থেকে আগত; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত (ক)। যখন তিনি তাঁকে ‘মানুষ’ বলেন, তখন সেই কুমারী থেকে জন্মের কথা শেখালেন যিনি নিজের মাতৃভূমিকা অনুশীলন করে মানুষের গর্ভধারণে ও জন্মদানে নিজের স্ত্রীলিঙ্গের ভূমিকা পালন করলেন। এবং যখন তিনি ‘দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত’ বলেন, তখন তিনি কুমারীতে পবিত্র আত্মার আগমনের ফলে তাঁর উৎপত্তি বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। তাই ‘মানুষ’ ও ‘স্বর্গ থেকে’ শব্দ দু’টোতে কুমারী থেকে এই মানুষের জন্ম ও পবিত্র আত্মার গুণে তাঁর গর্ভধারণ নির্দেশিত। প্রেরিতদূত নিজেই এইভাবে কথা বলেন।

১৮। অন্যদিকে, নিজের এই জন্মের রহস্যকে প্রকাশ করে স্বয়ং প্রভু একথা বললেন, আমিই সেই জীবনময় রুটি যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি: যে কেউ আমার এই রুটি

খাবে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে (ক), এবং তিনি নিজেকে ‘রুটি’ বলে অভিহিত করলেন কেননা তিনি প্রত্যক্ষভাবে হলেন নিজের দেহের উৎপত্তি। তাছাড়া, পাছে এমনটা ভাবা হয় যে, বাণীর পরাক্রম ও স্বরূপ সেই দেহধারণে নিঃশেষ হয়েছিল, সেজন্য তিনি এটাও বলেন যে সেটা ছিল তাঁর নিজেরই রুটি। ‘স্বর্গ থেকে’ ব’লে তিনি আমাদের এতে সতর্ক করতে অভিপ্রায় করেন যে, তাঁর দেহের উৎপত্তি মানব গর্ভধারণ থেকে উৎপন্ন নয়, কারণ তাঁর দেহ স্বর্গীয় দেহ বলে নির্দেশিত। ‘আমার এই রুটি’ শব্দগুলো বাণী দ্বারা দেহ ধারণের কথা সপ্রমাণ করে, কেননা তিনি এও বলেন, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন থাকবে না (খ)। যিনি মানবপুত্র তিনি স্বর্গ থেকে রুটি বলেও নেমে এসেছেন : ‘স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি’ ও ‘মানবপুত্রের মাংস ও রক্ত’ বাক্য দু’টো দ্বারা খ্রিষ্ট নিজের সেই মাংসধারণের কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করছিলেন, যে মাংস পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ ও কুমারী থেকে সঞ্জাত হয়েছিল।

১৯। তাই, মানুষ হওয়ায় ও উল্লিখিত দেহের অধিকারী হওয়ায় খ্রিষ্ট একাধারে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবপুত্র; তাছাড়া, ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করায় তিনি দাসের রূপ আপন করে নিলেন। যিনি মানবপুত্র তিনি তাঁরই থেকে ভিন্ন নন যিনি ঈশ্বরের পুত্র, ও যিনি ঈশ্বরের রূপে রয়েছেন তিনি তাঁরই থেকে ভিন্ন নন যিনি দাসের রূপে সিদ্ধ মানুষ বলে জন্ম নিলেন। এইভাবে, আমাদের উৎপত্তির প্রণেতা সেই ঈশ্বরের স্থির করা আমাদের সেই স্বরূপের ফলে মানুষ যেমন দেহ ও প্রাণ নিয়ে জন্মলাভ করে, তেমনি তাঁর অধিকৃত পরাক্রম গুণে যিশু খ্রিষ্ট হলেন দেহে ও প্রাণে মানুষ ও ঈশ্বর, কারণ নিজেতে বহন করেন পূর্ণ ও সত্যকার মনুষ্যত্ব, পূর্ণ ও সত্যকার ঈশ্বরত্ব।

২০। নিজেদের ভ্রান্তমত সপ্রমাণ করার লক্ষ্যে কুটিলতা হাতিয়ার ক’রে অনেকে অশিক্ষিতদের কান ভোলাবার অভ্যাসে এটা সমর্থন করে যে, আদমের দেহ ও প্রাণ পাপে অবস্থান করত, এবং প্রভুও কুমারী থেকে সেই আদমের দেহ ও প্রাণ গ্রহণ করেছিলেন, ও সেই কুমারী পবিত্র আত্মা থেকে পূর্ণতাবিশিষ্ট একটা মানুষকে গর্ভধারণ করেননি। এরা যদি মাংসধারণ রহস্যকে উপলব্ধি করত, তাহলে একই সময়ে মানবপুত্র

ও ঈশ্বরের পুত্র সংক্রান্ত রহস্যকেও উপলব্ধি করত। এরা এমনভাবে ভাবে কেমন যেন খ্রিষ্ট কুমারী থেকে তেমন দেহ ধারণ করায় কুমারী থেকে প্রাণকেও ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সত্য এটা যে, প্রতিটি প্রাণ হলো ঈশ্বরের কাজ, কিন্তু মাংস-প্রজনন সবসময় মাংস থেকে আগত।

২১। কেউ না কেউ এটা সমর্থন করে যে, বাণী বলে যিনি আদিতে ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর, সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর বিশিষ্ট অস্তিত্বশীল ঈশ্বর নন, কিন্তু ঈশ্বরের নিঃসৃত কণ্ঠ মাত্র। তাই, তাদের বিবেচনায়, বক্তা সম্পর্কে উচ্চারিত কথা যা, পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে পুত্র তা। এর ফলে এরা এই ধারণা কুটিলভাবে অনুপ্রবেশ করাতে চায় যে, সদা-অস্তিত্বশীল বাণী ঈশ্বর নন ও মানুষ বলে সঞ্জাত খ্রিষ্ট ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করেন না। তাদের মতে, আত্মিক গর্ভধারণ রহস্য নয়, কিন্তু যা মানুষের উৎপত্তির কারণ, সেটাই সেই মানুষকে জীবন দান করল; এর ফলে তারা এটা বলে যে, যিনি কুমারীর প্রসবের ফলে মানুষ হলেন, সেই বাণী ঈশ্বর ছিলেন না; কিন্তু, নবীয় বাণীর আত্মা যেভাবে নবীদের অন্তরে অবস্থান করছিলেন সেইভাবে ঈশ্বরের বাণী যিশুতে অবস্থান করছিলেন। তাছাড়া তারা প্রায়ই আমাদের এতে অভিযুক্ত করে কারণ আমরা এটা ঘোষণা করি যে, খ্রিষ্ট আমাদের দেহ ও প্রাণের চেয়ে ভিন্ন দেহ ও প্রাণে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, কিন্তু আমরা মাংস-হওয়া-বাণীর কথা প্রচার করি, সেই খ্রিষ্টকে প্রচার করি যিনি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করেন ও দাসের রূপ ধারণ করেন, সেই মানুষকে প্রচার করি যিনি মানব গঠনের অবস্থা অনুসারে ও আমাদের সাদৃশ্যে সিদ্ধ মানুষ বলে জন্ম নিলেন। তাই, যিনি সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র তিনি সত্যিকার মানবপুত্র বলে জন্ম নিলেন : ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত বলে তিনি কম মানুষও নন, ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত বলে তিনি কম ঈশ্বরও নন (ক)।

২২। কিন্তু, যেমন খ্রিষ্ট নিজে থেকেই কুমারী থেকে দেহ ধারণ করলেন, তেমনি তিনি নিজে থেকেই প্রাণ ধারণ করলেন; এবং মানবজন্মে এই প্রাণ জনক-জননী থেকে কখনও আগত নয় (ক)। কেননা, যখন সেই কুমারী কেবল ঈশ্বর থেকেই গর্ভধারণ করলেন, তখন মহত্তর কারণে এটা আবশ্যিক যে, সেই দেহের প্রাণ কেবল ঈশ্বর থেকেই এল। আরও, যখন মানবপুত্র তাঁরই একই যিনি ঈশ্বরের পুত্রও যেহেতু যিনি সবদিক

দিয়ে মানবপুত্র তিনি সবদিক দিয়ে ঈশ্বরের পুত্র, তখন, যখন প্রভু যিশু খ্রিষ্ট মানবপুত্রও ও ঈশ্বরের পুত্রও, তখন কোন্ অদ্ভুত ধারণার ভিত্তিতেই বা আমরা মাংস-হওয়া-বাণী সেই ঈশ্বরের পুত্রকে ছাড়া ঈশ্বরের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত নবীর মত অপরিচিত অন্য একজনের কথা প্রচার করব? এবং তাঁর প্রাণ যে মৃত্যু পর্যন্ত শোকার্ত, ও তিনি যে নিজের প্রাণকে বিসর্জন দেবার ও তা পুনরায় নেবার অধিকার রাখেন, তাঁর একথা থেকে ভ্রান্তমতপন্থীরা তাঁর প্রাণকে তাঁর দেহের গর্ভধারণের প্রণেতা সেই পবিত্র আত্মা থেকে নয়, বাহ্যিক কোনও একটা উৎস থেকেই উৎপন্ন করতে চায়; অথচ বাণী-ঈশ্বর নিজের স্বরূপের রহস্যে অবস্থান করেই মানুষ হলেন। উপরন্তু, বিচ্ছিন্ন দু'টো জীব ছিলেন বিধায়ই যে তিনি জন্ম নিলেন তা নয়, কিন্তু এজন্যই জন্ম নিলেন যেন এটা স্পষ্ট হতে পারত যে, মানুষ হবার আগে যিনি ছিলেন ঈশ্বর, তিনি মনুষ্যত্ব ধারণ ক'রে ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষ। কেননা ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিষ্ট কেমন করে মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন যদি না এইজন্যই যে, বাণী হলেন মাংস, অর্থাৎ এইজন্যই যে, যখন ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরের রূপে ছিলেন তখন দাসের রূপ ধারণ করলেন? যিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন, যখন তিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন, তখন বিপরীত দু'টো স্বরূপ একত্রে মিলিত হয়; সুতরাং তিনি যে ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করছিলেন তা যতখানি সত্য, তিনি যে দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন তা ততখানি সত্য। দু'টো স্বরূপ নির্দেশ করার জন্য 'রূপ' একক শব্দ যে ব্যবহৃত, তা আমাদের এটা মেনে নিতে বাধ্য করে যে, তিনি সত্যিকারে উভয় স্বরূপের অধিকারী। কেননা যিনি দাসের রূপে রয়েছেন তিনি ঈশ্বরের রূপেও রয়েছেন। এবং যদিও ঈশ্বরের রূপ হলো তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু দাসের রূপ হলো পরিত্রাণ-ব্যবস্থারই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তবু 'রূপ' শব্দটা উভয় ক্ষেত্রে নিজের অর্থ সমানভাবে ধারণ করে, কারণ খ্রিষ্ট তো উভয়: তিনি ঈশ্বরের রূপে ততখানি সত্যকার, দাসের রূপে যতখানি সত্যকার। যেমন দাসের রূপ ধারণ করা ও মানুষ বলে সঞ্জাত হওয়া একই কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়, তেমনি ঈশ্বরের রূপে থাকা ও ঈশ্বর হওয়া একই বিষয় ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। তথাপি আমরা তাঁর মধ্যে এক ও একই ব্যক্তিকে ঘোষণা করি, তিনি যে নিজের ঈশ্বরত্ব হারিয়েছেন এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি আমাদের মনুষ্যত্ব ধারণ করেছেন, এবং তিনি তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপের গুণেই ঈশ্বরের রূপে প্রতিপন্ন

হলেন ও পবিত্র আত্মার সাধিত গর্ভধারণের ফলে মানুষের অবস্থায় দাসের রূপে প্রতিপন্ন হলেন। এটাই সেই কারণ যার জন্য যিশু খ্রিষ্ট জন্ম নেবার পর, যজ্ঞগাতোগ করার পর, মৃত্যুবরণ করার পর ও সমাহিত হওয়ার পর পুনরুত্থানও করলেন। ভিন্ন ভিন্ন এসমস্ত রহস্যে আমরা তাঁকে নিজে থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না যার ফলে তিনি আর খ্রিষ্ট নন। যিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন, তিনি ছাড়া অন্য এমন খ্রিষ্ট আর কখনও হননি যিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন; যিনি সজ্জাত হলেন, তিনি ছাড়া অন্য এমন খ্রিষ্ট আর কখনও হননি যিনি মৃত্যুবরণ করলেন; যিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তিনি ছাড়া অন্য এমন খ্রিষ্ট আর কখনও হননি যিনি পুনরুত্থান করলেন; যিনি পুনরুত্থান করলেন, তিনি ছাড়া স্বর্গে অন্য কোনও খ্রিষ্ট নেই; কিন্তু যিনি আগে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন, তিনি ছাড়া স্বর্গে অন্য কোনও খ্রিষ্ট নেই।

২৩। তাই, যিনি মাংস ও বাণী হওয়ায় একাধারে মানবপুত্র ও ঈশ্বরের পুত্র, একমাত্র জনিত ঈশ্বর সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট, তিনি নিজে যা তথা ঈশ্বর তা হওয়া শেষ না ক'রে আমাদের মনুষ্যত্বের সাদৃশ্যে সত্যকার মনুষ্যত্ব ধারণ করলেন। এ মনুষ্যত্বে তিনি আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হলেও বা প্রহারে প্রহারিত হলেও বা গিঁটে আবদ্ধ হলেও বা তাঁর দেহ ঝুলানো অবস্থায় হলেও এসমস্ত কিছু যজ্ঞগাতোগের তীব্রতা দেখাচ্ছিল কিন্তু সেটার কষ্ট দিচ্ছিল না। এইভাবে একটা তীর জলের ভিতর দিয়ে চ'লে বা শিখা বিঁধিয়ে বা হাওয়া আহত ক'রে সেই সমস্ত আঘাত হানে যা তার প্রকৃতি হেনে দিতে পারে যথা ভিতর দিয়ে চলা, বিঁধিয়ে দেওয়া, আঘাত করা; কিন্তু এসমস্ত কিছু যা ভোগ করে, সেটার উপরে সেইসব কিছু ফলহীন, কারণ জলে যে ছিদ্র করা হবে বা শিখা যে বিদ্ধ হবে বা হাওয়া যে আঘাতগ্রস্ত হবে তা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী নয় যদিও তীরের পক্ষে আহত করা, ছিদ্র করা ও ভেদ করা প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ। প্রভু যিশু খ্রিষ্ট অবশ্যই আঘাতগ্রস্ত হলেন, তাঁকে ঝুলানো হলো, ত্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হলো ও মৃত্যু ভোগ করলেন, কিন্তু যে যজ্ঞগা প্রভুর দেহতে তীব্রতার সঙ্গে প্রবেশ করল, তা কষ্টকর হওয়া শেষ না করেও কষ্টভোগের প্রাকৃতিক ফলাফলের অধিকারী নয়; সেই যজ্ঞগা নিজের তীব্রতা দ্বারা নিজের দণ্ডমূলক ভূমিকা অনুশীলন করল, কিন্তু খ্রিষ্টের দেহ নিজের পরাক্রম গুণে কষ্টভোগ না করে দণ্ডের আঘাত ভোগ করল। একথা সত্য যে, যে কষ্ট

প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে, প্রভুর দেহ সেই কষ্ট অনুভব করতে পারত, কিন্তু এই শর্তে তথা যদি নিজের পথে বাধাগ্রস্ত না হয়ে বা আমাদের পায়ের চাপের ফলে জল দু'ভাগ না হলে আমাদের দেহ প্রকৃতিগত ভাবে জলের উপরে পাদার্পণ করা ও ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটাফেরা করার ক্ষমতা রাখত ও জড় পদার্থের ভিতর দিয়েও চলাচল করতে পারত ও একটা ঘরের রুদ্ধ দরজা দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হতে পারত। কিন্তু, যে প্রাণ প্রভুর দেহকে চালিত করে সেই প্রাণ দ্বারা যখন কেবল প্রভুর দেহই সপরাক্রমে এমন অধিকার রাখে যার জন্য সেই দেহ জলের উপর দিয়ে হাঁটাফেরা করতে, ঢেউয়ের উপরে পায়ে দাঁড়াতে, দেওয়ালের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, তখন পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ মাংসকে মানবদেহের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে আমরা সেই মাংস কেমন বিচার-বিবেচনা করব? সেই মাংস অর্থাৎ সেই রুটি তো স্বর্গ থেকে আগত; সেই মনুষ্যত্ব ঈশ্বর থেকে আগত; তিনি এমন দেহের অধিকারী যা যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে এমনকি যন্ত্রণা ভোগ করেছে, কিন্তু তিনি এমন স্বরূপের অধিকারী নন যা কষ্ট অনুভব করতে পারে। কেননা সেই যে দেহ পর্বতে স্বর্গীয় গৌরবের গুণে রূপান্তরিত (ক), যা স্পর্শ করা মাত্র জ্বর দূর করে দেয় (খ) ও নিজের থুথু দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয় (গ), সেই দেহ এমন স্বরূপের অধিকারী যা বিশিষ্ট ও তারই নিজস্ব।

২৪। কিন্তু হয় তো এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যাঁর মধ্যে কান্না, পিপাসা ও ক্ষুধার স্বভাব অবস্থান করছিল তিনি অবশ্যই মানব স্বরূপের অন্যান্য অনুভূতিরও অধিকারী ছিলেন। যে কেউ তাঁর কান্না, পিপাসা ও ক্ষুধা সংক্রান্ত রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ, সে জানুক যে, যিনি কাঁদেন তিনি মৃতদের জীবন দান করেন, লাজারের মৃত্যুর জন্য কাঁদেন না বরং সেবিষয়ে তিনি আনন্দিত; যিনি পিপাসিত তিনি নিজের অন্তর থেকে জীবনময় জলের নদনদী অর্পণ করেন, ও যিনি পিপাসিতদের জল খেতে দেওয়ার অধিকার রাখেন তিনি পিপাসায় দগ্ধ হতে পারেন না। সেই অজ্ঞ জেনে নিক যে, যিনি ক্ষুধার্ত তিনি সেই গাছকে দগ্ধিত করেন যা ক্ষুধার্তকে নিজের ফল নিবেদন করেনি, ও যে স্বরূপ ক্ষুধায় পরাভূত হতে পারে না সেই স্বরূপ গাছটাকে শুকিয়ে দিয়ে গাছটার প্রাকৃতিক সবুজ পাল্টাতে পারেন। এবং কান্না, পিপাসা ও ক্ষুধা সংক্রান্ত রহস্য বাদে যদি সেই ধারণা করা মাংস অর্থাৎ তাঁর গোটা মনুষ্যত্ব আমাদের ভাবাবেগের প্রভাবাধীন ছিল, তবু তা সেই

ভাবাবেগের শিকার হতে দেওয়া হয়নি; তাই যখন তিনি কাঁদেন তখন নিজের জন্য কাঁদেন না, যখন তিনি পিপাসিত তখন পিপাসা মেটাবার জন্য তাঁর পান করার দরকার হয় না, যখন তিনি ক্ষুধার্ত তখন ক্ষুধা পূরণের জন্য তাঁর কোন খাদ্য দরকার হয় না। এবং এমনটা বলা হয় না যে যখন প্রভু পিপাসিত বা ক্ষুধার্ত বা শোকাক্ত ছিলেন তখন তিনি পান করলেন, খেলেন ও কষ্টভোগ করলেন। তিনি তাঁর নিজের দেহের বাস্তবতা দেখাবার জন্যই মানবীয় নানা আচরণ ব্যবহার করলেন, আমাদের স্বরূপ যেভাবে ব্যবহার করে তিনি সেইভাবে ব্যবহার ক’রে নিজেকে আমাদের দেহের স্বাভাবিক ব্যবহারের অনুরূপ করলেন। যখন পানীয় ও খাদ্য নিলেন তখনও নিজের প্রয়োজনীয়তার খাতিরে নয়, কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাসেরই খাতিরে সেই পানীয় ও খাদ্য নিলেন।

২৫। খ্রিস্টের একটা দেহ ছিল, কিন্তু তাঁর উৎপত্তি অনুযায়ী যথার্থই একটা দেহ। যে দুর্বলতা মানব গর্ভধারণকে চিহ্নিত করে তিনি সেই দুর্বলতার ফলে নয়, কিন্তু নিজের প্রতাপের গুণে আমাদের দেহের রূপে অস্তিত্বশীল হলেন। তিনি দাসের রূপে আমাদের মনুষ্যত্ব বহন করলেন বটে, কিন্তু মানবদেহের যত খুঁত থেকে মুক্ত ছিলেন: তিনি ইচ্ছা করলেন আমরা কুমারীর প্রজননের মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে থাকব, কিন্তু এটাও ইচ্ছা করলেন, তাঁর মধ্যে আমাদের সেই সমস্ত খুঁত থাকবে না—সেই মূল কারণ গুণে যা তাঁর নিজে থেকেই উৎসারিত। তিনি মানুষ বলে জন্ম নিলেন, কিন্তু যে সমস্ত খুঁত মানব গর্ভধারণকে চিহ্নিত করে তিনি সেই সমস্ত খুঁত নিয়ে জন্ম নিলেন না। প্রেরিতদূত ঠিক তাঁর এই জন্মের কথা ভাবছিলেন ও প্রকাশ করতে ইচ্ছা করছিলেন যখন বললেন, মানুষের সদৃশ হয়ে ও আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি দাসের রূপ ধারণ করে নিজেকে অবনমিত করলেন (ক)। প্রেরিতদূত আমাদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন, দাসের রূপ ধারণ করে তিনি মানুষের রূপে জন্ম নিলেন। তাছাড়া, যেহেতু তিনি মানুষের সদৃশ হলেন ও আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন, সেজন্য তাঁর দেহের রূপ ও সত্যতা নিঃসন্দেহে তাঁর মনুষ্যত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু যিনি আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন তিনি মানুষের পাপময় স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞ। জন্ম স্বরূপের সাদৃশ্য দাবি করে, দুর্বলতাও যে অধিকৃত তা বোঝায় না। কেননা, যেহেতু ‘দাসের রূপ ধারণ

করলেন’ বাক্যটা সাধারণ জন্মের কথা ইঙ্গিত দিতে পারত, সেজন্য প্রেরিতদূত বলে চললেন, ‘মানুষের সদৃশ হয়ে ও আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে’ ইত্যাদি। তিনি এমনটা এড়াতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর জন্মের বাস্তবতা খুঁতের কারণেই দুর্বল একটা স্বরূপের কথা ভাবতে দেয়, কেননা ‘দাসের রূপ’ কথাটা তাঁর জন্মের বাস্তবতা নির্দেশ করে ও ‘আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন’ কথা আমাদের স্বরূপের সাদৃশ্য ইঙ্গিত দেয়। তিনি সপরাক্রমে কুমারীর মধ্য দিয়ে মানুষ বলে জন্ম নিলেন ও পাপের বিকৃত মাংসের সাদৃশ্যে প্রতিপন্ন হলেন। প্রেরিতদূত এই সত্য বিষয়ে রোমীয়দের কাছে পত্রে সাক্ষ্য দিলেন যখন বললেন, বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন (খ)। তিনি মানুষের বেশে নিজেকে দেখাননি, মানুষ বলেই প্রকাশ করলেন; ও সেই মাংস পাপময় মাংস ছিল না, কিন্তু ছিল পাপময় মাংসের সদৃশ মাংস। মাংসের বাহ্যিক রূপ দেখায়, তাঁর জন্ম বাস্তব জন্ম, ও পাপময় মাংসের সাদৃশ্য তাঁকে মানব দুর্বলতার খুঁত থেকে আলাদা বলে দেখায়। এইভাবে মানুষ হিসাবে মানুষ যিশু খ্রিষ্ট সত্যকার জন্মের অধিকারী; [ঐশ্বরিক] খ্রিষ্ট হিসাবে তাঁর পাপ নেই। কেননা যিনি মানুষ তিনি মানুষ না হয়ে পারেননি যেহেতু তিনি জন্ম নিলেন; ও যিনি [ঐশ্বরিক] খ্রিষ্ট তিনি [ঐশ্বরিক] খ্রিষ্ট হওয়া শেষ করতে পারেননি। সুতরাং, যেহেতু যিশু খ্রিষ্ট মানুষ, সেজন্য মানুষ বলে তাঁর মানব জন্মও আছে; তথাপি [ঐশ্বরিক] খ্রিষ্ট বলে তিনি খুঁতবিশিষ্ট মানব দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

২৬। সুতরাং, প্রেরিতদূতের বিশ্বাস যখন এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে যিশু খ্রিষ্ট আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন ও পাপময় মাংসের সদৃশ মাংসে মানুষ বলে প্রেরিত হলেন, তখন সেই বিশ্বাস এই রহস্য উপলব্ধি করতে আমাদের প্রস্তুত করে। মানুষ বলে আবির্ভূত বলে তিনি দাসের রূপে রয়েছেন, কিন্তু মানব স্বরূপের খুঁতে নন; এবং পাপময় মাংসের সদৃশ মাংসে আছেন বলে বাণী তো মাংস বটে, কিন্তু এমন মাংস যা পাপময় মাংসের সদৃশ মাংসে রয়েছে, সেই মাংস পাপময় সেই একই মাংস নয়। এবং মানুষ হওয়ায় যিশু খ্রিষ্ট তো মানুষ বটে, কিন্তু সেই মানুষের মধ্যে খ্রিষ্ট ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারে না; তাঁর দেহ জনিত হলো বিধায় তিনি মানুষ বলে জন্ম নিলেন, কিন্তু

মানুষের খুঁতে জন্ম নেননি যেহেতু উৎপত্তিতে তিনি মানুষ নন। যেহেতু বাণী হলেন মাংস, সেজন্য তিনি যা হলেন তা মাংস না হয়ে পারেনি, ও যদিও বাণী হলেন মাংস, তবু বাণী সর্বদা বাণী হয়ে থাকলেন। যেমন মাংস-হওয়া-বাণী নিজের উৎপত্তির স্বরূপ বিহীন হতে পারেন না, তেমনি বাণী নিজের উৎপত্তিতে অবস্থান না করে পারেননি; কিন্তু একইসময়ে এটা স্বীকার করা দরকার যে মাংসটা হলো সেই মাংস যে মাংস বাণী হয়েছিলেন; তবু এবিষয়ে মনে রাখা উচিত যে, যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন, সেজন্য সেই মাংস বাণী ছিল না, কিন্তু ছিল মাংসে বসবাসকারী বাণীর মাংস। ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবু এসো, দেখি, তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করলেন, সেই গোটা যন্ত্রণাভোগ জুড়ে আমরা আমাদের প্রভুতে দৈহিক ব্যথার দুর্বলতা আবিষ্কার করতে পারি কিনা। যে যে বচনের জোরে ভ্রান্তমত প্রভুর উপরে যে ভয়-ভীতি আরোপ করেছে, কিছুকাল ধরে সেই বচনগুলোর পরীক্ষা বাদ দিয়ে, এসো, ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটল, সেই অনুসারে সেগুলোর দিকে ফিরি। কেননা যাঁর কাজে আস্থা প্রকাশ পায়, সেই খ্রিস্টের বাণীগুলো যে তাঁর নিজের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করবে তা আদৌ হতে পারে না।

[যোহন ১৮:৩-৮ দ্রঃ]

২৭। হে ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি কি এমনটা মনে কর গৌরবের প্রভু যন্ত্রণাভোগে ভয় পেয়েছিলেন? অথচ, যখন পিতর অজ্ঞতাবশত এই ভুল করেন, তখন প্রভুর কাছে তিনি ‘শয়তান’ ও ‘পথের বাধা’ (ক) হলেন। এবং তেমন কঠিন তিরস্কারে তিনি সেই পিতরকে বিশ্বাসে দৃঢ় করে তুললেন যিনি সেই খ্রিস্টের প্রতি ভালবাসার খাতিরে যন্ত্রণাভোগ রহস্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই যে খ্রিস্টকে রক্ত ও মাংস নয় কিন্তু স্বর্গস্থ পিতাই তাঁর কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যখন তুমি অস্বীকার কর যে খ্রিস্ট স্বয়ং ঈশ্বর ও যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে তাঁর উপর ভয় আরোপ কর, তখন কেমন প্রত্যাশার পিছনে ছুটছ? তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য যাদের অশ্রুসজ্জিত করা হয়েছিল, যিনি তাদের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি কি ভীত ছিলেন? এবং তাঁর আগমনে তিনি শেকলের কাছে নিজেকে অর্পণ করলে যখন সেই নির্ধাতকদের দল তাঁর মহিমা সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায় স্তম্ভিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হল ও চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, তখন তাঁর দেহে কি দুর্বলতা ছিল?

তাই, যখন তাঁর স্বরূপ তত পরাক্রমের অধিকারী হলো, তখন তোমার বিবেচনায় কেমন দুর্বলতা তাঁর সেই দেহের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারল?

[যোহন ১৮:১০ দ্রঃ]

২৮। কিন্তু এমনটা হতে পারে, খ্রিষ্ট ক্ষতজনিত ব্যথা ভয় পেলেন। জিজ্ঞাসা করি, যিনি একটা কাটা কান এমনিই স্পর্শ করে সেটার মাংস নিরাময় করলেন, তিনি মাংসে প্রবিষ্ট পেরেক কেমন ভয় পেতে পারেন? [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তুমি যে প্রভুর দুর্বলতার কথা সমর্থন কর, যেসময় তাঁর মাংস দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিল, সেই যন্ত্রণাভোগের সময়েই সম্পাদিত এই পরাক্রম-কর্ম ব্যাখ্যা কর। যখন পিতর খড়্গা বের করে আঘাত হানলেন, তখন যাজকের সেই চাকর কান কাটা অবস্থায় সেখানে দাঁড়াচ্ছিল। যখন খ্রিষ্ট সেই কান স্পর্শ করলেন, তখন কেমন করে কাটা কানের যথার্থ এমন ক্ষত ছাড়া সেই কানের মাংস পুনরায় সুস্থ হল? রক্তপ্রবাহের মধ্যে ও খড়্গের ফাটলজনিত দাগের পর ও দেহ অঙ্গ-ছেদিত অবস্থায় থাকাকালের সেই কষ্টদায়ক ক্ষণে, সেই ক্ষণে, যা নেই তা কোথা থেকেই বা বের হয়, প্রথমক্ষণে যার অস্তিত্ব নেই তা কোথা থেকেই বা আসে, যা হারিয়ে গেছে তা কোথা থেকেই বা আনা যায়? সুতরাং, এই যে হাত একটা কান সৃষ্টি করল, সেই হাত কি পেরেকের কারণে ব্যথা পেল? যিনি ক্ষতজনিত ব্যথা পরের কাছে রাখেন না, তিনি কি নিজের জন্য ব্যথা পান? অঙ্গচ্ছেদের পর যিনি স্পর্শের মাধ্যমেই মাত্র মাংস পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, তিনি কি নিজের মাংসে দেওয়া ক্ষত ভয় পেতে পারেন? এবং যখন খ্রিষ্টের দেহ এই পরাক্রমের অধিকারী হলো, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যে পরাক্রমের স্বরূপগত শক্তি মানুষের স্বরূপগত সমস্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল, কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে এমনটা সমর্থন করা যায়, সেই স্বরূপ দুর্বলতা-প্রবণ?

[মথি ২৬:৩৮ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ]

২৯। কিন্তু হয় তো এমনটা হতে পারে যে, ভ্রান্তমতপন্থীরা নিজেদের মূর্খ ও জঘন্য অবিশ্বাসে এটা ঘোষণা করতে দুঃসাহস করবে যে, খ্রিষ্টের স্বরূপ দুর্বল যেহেতু ‘তাঁর প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত শোকার্ত’। হে ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি যে বাক্যের অর্থ বোঝ না, তোমার মুখের সামনে তা বলার সময় এখনও হয়নি। তবু আমি আপাতত তোমাকে জিজ্ঞাসা

করতে চাই কেনই বা তোমার এটা মনে পড়ে না যে, যখন যুদা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এগিয়ে গেলেন তখন তিনি বললেন, এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন (ক)। যজ্ঞগাভোগ যখন তাঁকে গৌরবান্বিত করার কথা, তখন সেই যজ্ঞগাভোগের ভয় কেমন করে তাঁকে শোকার্ত করতে পারল? অবশ্যই, যদি না তিনি এমন উন্মাদ যে, ব্যথাগ্রস্তকে যা কিছু গৌরবান্বিত করবে, তিনি তাতে ব্যথা পেতে ভয় পাচ্ছিলেন।

[মার্ক ১৪:৩৬; যোহন ১৮:১১ দ্রঃ]

৩০। কিন্তু হয় তো এমনটা মনে হতে পারত যে, তিনি এতই ভীত হলেন যার জন্য প্রার্থনা করলেন যেন পানপাত্রটা তাঁর থেকে দূর করে দেওয়া হয়, কারণ তিনি বললেন, ‘আব্বা, পিতা, সবই তোমার সাধ্য; আমা থেকে সেই পানপাত্র দূর করে দাও’। আমার সমালোচনার ক্ষেত্র সীমিত করার জন্য তুমি কি তোমার অবুঝ অভক্তিকে সংস্কার করতে পারতে না? কেননা তুমি একথা পড়েছিলে, ‘তোমার খড়া কোষে রেখে দাও; এই যে পাত্র পিতা আমকে দিয়েছেন, আমি কি তা পান করব না?’ কেননা, ঈশ্বরের সঙ্কল্প সম্পন্ন করার চিন্তায় তিনি যা পূরণ করতে আগ্রহী ছিলেন, কেমন করে ব্যথার ভয় তাঁকে এই প্রার্থনা করতে প্রভাবান্বিত করতে পারত যেন পাত্রটা দূর করে দেওয়া হয়? যখন একজন কষ্টভোগ করতে ইচ্ছা করেন তখন সে যে কষ্টভোগ করতে ইচ্ছা করেন না তার বিষয়ে তা বলা অর্থহীন। এবং যদি তুমি জানতে যে খ্রিস্ট কষ্টভোগ করতে ইচ্ছা করছিলেন, তবে, যখন তুমি জানতে তিনি কষ্টভোগ করতে ইচ্ছা করছিলেন তখন, তিনি যে কষ্টভোগ না করার জন্যই প্রার্থনা করেছিলেন, ভক্তিহীন ও দুঃসাহসী ক্ষিপ্ততায় এমনটা ঘোষণা করার চেয়ে তুমি যে বচনটার অর্থ বোঝনি এমনটাই ঘোষণা করা কি বরং অধিক ভক্তিসম্মত হত না?

[মার্ক ১৫:৩৪; মথি ২৬:৬৪ দ্রঃ]

৩১। কিন্তু আমি মনে করি, তোমার ভক্তিহীন সংগ্রামের জন্য তুমি প্রভুর এবাণী দ্বারাও নিজেকে অঙ্গসজ্জিত করতে চাইবে, তথা, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?’ এবিষয়ে তুমি ভাবতে পারতে যে, দ্রুশের অবমাননার পরে পিতার

সাহায্যের প্রসন্নতা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছিল এবং এর ফলেই সেই চিৎকার ধ্বনিত হয়েছিল যে তাঁকে নিজের দুর্বলতায় একা ফেলে রাখা হয়েছিল। যদি তুমি খ্রিষ্টের অবমাননা, তাঁর দুর্বলতা ও তাঁর দ্রুশ অসম্মান বলে বিবেচনা কর, তাহলে তোমার পক্ষে পরবর্তী এ বাণী ভুলে যাওয়া উচিত ছিল না, ‘আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে তোমরা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘে করে আসতে দেখবে’।

৩২। আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁর যজ্ঞগাভোগে কোথায় ভয় দেখা যেতে পারে? দুর্বলতা কোথায়? কষ্ট কোথায়? অসম্মান কোথায়? ভক্তিহীনেরা কি এমনটা বলে, তিনি ভীত? কিন্তু তিনি নিজেই ঘোষণা করেন, তিনি যজ্ঞগাভোগ করতে ইচ্ছা করেন। তারা কি এমনটা সমর্থন করে, তিনি দুর্বল? কিন্তু যখন তাঁর নির্ধাতকেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে সহ্য করে না, তখন তিনি নিজেকে বলবানই দেখান। তারা এমনটা কি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, নিজের মাংসের ক্ষতের জন্য তিনি ব্যথা পান? কিন্তু যখন তিনি কানের ক্ষতগ্রস্ত মাংস নিরাময় করেন, তখন এটা দেখান যে, তিনি মাংস হয়েও তবু এমন মাংসময় স্বরূপের অধিকারী নন যে-মাংস ক্ষতের জন্য ব্যথা পায়। কেননা যখন তিনি হাত দিয়ে ছেদিত কান স্পর্শ করেন, তখন সেই হাত তাঁর দেহেরই একটা অঙ্গ; এবং যখন হাত ক্ষতহীন কান সৃষ্টি করে তখন এটা স্পষ্ট যে, সেই হাত দুর্বলতা সাপেক্ষ দেহের হাত নয়।

৩৩। কিন্তু তারা বলে, তাঁর পক্ষে দ্রুশ ছিল অসম্মান। অথচ ঠিক সেই দ্রুশের দ্বারাই আমরা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসা দেখতে পাই; কুমারীর গর্ভে মানুষ বলে জন্ম নিয়ে তিনি সেই দ্রুশের দ্বারাই আকাশের মেঘে করে নিজের মহিমায় ফিরে যেতে পারলেন। [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তোমার অভক্তিতে তুমি তো কার্য-কারণের মধ্যকার সাধারণ সম্পর্ক ধারণ করছ না, এবং অভক্তি ও ভ্রান্তির আত্মায় পূর্ণ হয়ে বিশ্বাস রহস্যকে উপলব্ধি না করে বরং ভ্রান্তমতের স্বকীয় নির্বুদ্ধিতার দরুন জগতের সাধারণ প্রজ্ঞা থেকে দূরে সরে যাও। কেননা আমরা যা কিছু ভয় পাই, তা ভয় পাই বলেই অবশ্যই তা এড়াই; এবং যে দুর্বল, এর ফলে সে নিজের দুর্বলতা ভয় পায়; যা কিছু ব্যথা পায়, তা

অবশ্যই ব্যথা সাপেক্ষ স্বরূপের অধিকারী ; যা কিছু অসম্মানের কারণ হয়, তা সবসময়ই অসম্মানের বস্তু হয়ে থাকে ; কিন্তু তুমি কোন্ যুক্তির জোরে এমনটা ভাববে বলে দুঃসাহস কর যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট একটা কিছু ভয় পান যখন অধৈর্য হয়ে সেটার দিকে ধাবিত? তিনি বলবানদের স্তম্ভিত করতে করতে তুমি কেমন করে বলতে পার, তিনি নিজের দুর্বলতার কারণে কম্পিত? তিনি ক্ষতের ব্যথা রোধ করতে করতে তুমি কেমন করে বলতে পার, তিনি নিজের ব্যথায় ব্যথা পান? তিনি যখন সেই ত্রুশের দ্বারা পিতার কাছে বসতে যাচ্ছেন ও নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন, তখন তুমি কেমন করে বলতে পার, তিনি ত্রুশের অবমাননা দ্বারা অসম্মানে পতিত?

৩৪। কিন্তু হয় তো তুমি এমনটা ভাবছ যে, তোমার হাতে অন্তত এই অজুহাত এখনও রয়েছে যে, পাতালে অবরোহণ ও মৃত্যু প্রয়োজনীয়তা ক্ষেত্রে খ্রিষ্ট ভয় পেলেন ; এমনকি তুমি হয় তো এই বাণীতে এটার প্রমাণ পাচ্ছ, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই (ক)। যখন তুমি এবাণী পড়ে তা বুঝতে না, তখন সম্মানের সঙ্গে নীরব থাকতে বা ভক্তির সঙ্গে তা বুঝবার জন্য যাচনা করতে পারতে, এর ফলে, তোমার মূর্খ ক্ষিপ্ততার কারণে সত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে তুমি তেমন লজ্জাকর ঘোষণা উচ্চারণে আর পথভ্রষ্ট হতে না। যিনি ত্রুশে সেই অপকর্মাকে বলেন আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে (খ), তুমি কি বিশ্বাস করতে পার, তিনি সেই গভীরতম পাতাল, সেই জ্বলন্ত শিখা ও প্রতিশোধমূলক দণ্ড-সহ সেই গোটা গহ্বরের ব্যাপারে ভীত ছিলেন? তেমন পরাক্রম-বিশিষ্ট স্বরূপ ভয়ের শুধু নয়, পাতাল-আসনের সীমারও বন্দি হতে পারে না। যখন সেই স্বরূপ পাতালে অবরোহণ করে, তখন সেই স্বরূপ পরমদেশে অনুপস্থিত নয় ; (একই প্রকারে, যখন মানবপুত্র পৃথিবীতে কথা বলেন, তখনও স্বর্গে অবস্থান করেন,) কারণ তিনি তাঁর সেই সাক্ষ্যমরকে পরমদেশ দানের প্রতিশ্রুত হন ও পরিপূর্ণ সুখের আনন্দ দান বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যিনি পাতাল পর্যন্তও ভেদ করেন কিন্তু নিজের স্বরূপের পরাক্রমে সর্বস্থানে উপস্থিত, দৈহিক ভয় তাঁকে নিজের বশীভূত করতে পারে না। পাতালের সেই গহ্বর ও মৃত্যু-বিভীষিকা জগতের প্রভু এমন স্বরূপকে নিজের বলে দাবি করতে পারে না, সেই যে স্বরূপ নিজের আত্মিক পরাক্রমে অসীম ও পরমদেশের যত আনন্দের মধ্যে অনুপস্থিত হতে পারে না। যিনি পাতালে

অবরোধ করবেন, সেই প্রভু পরমদেশেও অবস্থান করে চলবেন। তাই তুমি এতে সক্ষম হলে তবে তাঁর অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ থেকে সেই অংশ ছিন্ন কর যা ব্যথায় ভয় পায়; খ্রিস্টের একটা অংশ পাতালে, ও বাকি অংশটা পরমদেশে রাজত্ব করতে পাঠাও। কেননা সেই অপকর্মা খ্রিস্টকে পরমদেশেই তাঁর কথা মনে রাখতে অনুন্নয় করেন। আমি মনে করি, যখন পেরেক [প্রভুর] হাতের পাতা বিঁধিয়ে দিচ্ছিল, তখন সেই অপকর্মা যে হাহাকার শুনল, সেই হাহাকারই তাঁর অন্তরে বিশ্বাসের এই পবিত্র স্বীকারোক্তি জাগাল: [অথচ তুমি কি এটাই ভাব যে] অবশ্যই খ্রিস্টের নির্বল দেহের ব্যথার মধ্য দিয়েই অপকর্মা খ্রিস্টের রাজ্য চিনে ফেললেন? (গ)। অপকর্মা এমন অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন যেন তাঁর রাজ্যে তাঁর কথা মনে রাখা হয়, অন্যদিকে তুমি এমনটা ভাব, খ্রিস্ট ক্রুশমৃত্যু ভয় পান। প্রভু অপকর্মাকে প্রতিশ্রুত হন, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর সঙ্গে পরমদেশে থাকবেন, আর তুমি খ্রিস্টকে কষ্টের ভয়ে ভারাক্রান্ত অবস্থায় পাতালে কারারুদ্ধ কর। তোমাদের এই বিশ্বাস বিপরীত প্রত্যাশা জাগায়। ক্রুশে ঝোলানো খ্রিস্টকে রাজ্যে উপস্থিত বলে স্বীকার করায় সেই অপকর্মা পরমদেশ পাবার যোগ্য হলেন; কিন্তু খ্রিস্টের উপর কষ্টের ব্যথা ও মৃত্যুর ভয় আরোপ করায় তুমি অবশ্যই তাঁর পরমদেশ ও তাঁর রাজ্য বঞ্চিত হবে।

৩৫। খ্রিস্টের বাণী ও কাজ মূল্যায়ন করে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে তাঁর দেহের স্বরূপ দৈহিক স্বরূপের স্বকীয় দুর্বলতার অংশী ছিল না, কারণ তাঁর স্বরূপ সমস্ত দৈহিক রোগ-ব্যাদি বাতিল করার অধিকার রাখল, এবং যদিও যন্ত্রণাভোগ তাঁর দেহ স্পর্শ করল তবু সেই দেহে ব্যথার বাস্তবতা আনেনি। আমাদের দেহের রূপ প্রভুর ছিল বটে, কিন্তু তিনি যে দেহের অধিকারী ছিলেন তা আমাদেরটার মত অসিদ্ধ ও দুর্বল ছিল না। তাঁর উৎপত্তি আমাদেরটার মত ছিল না, কারণ কুমারী পবিত্র আত্মার প্রভাবে ঘটিত গর্ভধারণের ফলে তাঁকে জন্ম দিলেন; এবং যদিও কুমারী নিজের স্ত্রীলিঙ্গের ভূমিকা অনুশীলনে সেই দেহ জনিত করলেন, তবু পার্থিব গর্ভধারণের উপাদান দ্বারা গর্ভস্থ হলেন না। তিনি নিজের গর্ভ থেকে একটা দেহ প্রসব করলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মাই সেই দেহটির গর্ভাগমন ঘটালেন, সেই দেহ এমন যা নিজেতে কুমারীর দেহের বাস্তবতা বহন করছিল, কিন্তু মানব স্বরূপের দুর্বলতা বহন করছিল না: সেই দেহ সত্যকার দেহ, কারণ কুমারী দ্বারা

জনিত ও আমাদের দেহের দুর্বলতা থেকে মুক্ত কারণ আত্মিক গর্ভধারণ দ্বারা উৎপত্তি ধারণ করেছিল।

৩৬। প্রেরিতদূতের বিশ্বাসে স্থাপিত প্রমাণের বিপক্ষে ভ্রান্তমতপন্থীরা এবচন দিয়ে প্রতিবাদ করে, ‘আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত শোকাকর্ষ’। যিনি নিজেকে শোকাকর্ষ ঘোষণা করেন, তাদের মতে সেই খ্রিষ্টের বাণী তাঁর স্বরূপের দুর্বলতা প্রমাণসিদ্ধ করে, অর্থাৎ, তিনি এই দুর্বলতা বিষয়ে চেতনার জন্যই শোকাকর্ষ হতে লাগলেন। তবে, প্রথমে, আমি সুবুদ্ধির কাছে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যু পর্যন্ত শোকাকর্ষ হওয়ার অর্থ কি। ‘মৃত্যুর কারণে শোকাকর্ষ হওয়া’ উক্তির অর্থ ও ‘মৃত্যু পর্যন্ত শোকাকর্ষ হওয়া’ উক্তির অর্থ এক নয়। যখন আমরা মৃত্যুর কারণে জনিত শোকের কথা বলি, তখন মৃত্যুই হলো শোকের কারণ, কিন্তু যখন আমরা মৃত্যু পর্যন্ত শোকের কথা বলি, তখন মৃত্যু শোকের কারণ আর নয়, কিন্তু মৃত্যু শোকের পরিণাম হয়। সুতরাং যখন একজন ‘মৃত্যুর কারণে’ নয় কিন্তু ‘মৃত্যু পর্যন্ত’ শোকাকর্ষ (ক), তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে সে কেন শোকাকর্ষ। তাছাড়া, মানুষের অজ্ঞতা নির্দিষ্ট করতে অক্ষম এমন অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য যে সে শোকাকর্ষ তা নয়, সে মৃত্যু পর্যন্তই শোকাকর্ষ। তার শোক যে মৃত্যুজনিত তা আদৌ নয়, বরং মৃত্যু সেই শোক শেষ করে দেয়।

৩৭। কিন্তু, যাতে আমরা শোকের কারণ চিনে নিতে পারি, সেজন্য এসো, সেই শোক-স্বীকারের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কথা লক্ষ্য করি। পাস্কা-ভোজ চলাকালে প্রভু নিজের যজ্ঞগাভোগ-রহস্য ও বিশ্বাস-রহস্য [অর্থাৎ এউখারিস্তীয় যজ্ঞ রহস্য] সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন। পরে তিনি বলেন, তাঁর বিষয়ে সকলের পতন হবে, কিন্তু প্রতিশ্রুত হন, তিনি গালিলেয়ায় তাঁদের আগে আগে যাবেন। পিতর প্রতিবাদ করে বলেন, তাঁর বিষয়ে অন্যদের পতন হলেও তিনি নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে পতিত হবেন না। কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছিল নিজের ঐশ্বরিক স্বরূপ গুণে এবিষয়ে অজ্ঞ না হয়ে প্রভু উত্তরে বলেন, পিতর তাঁকে তিনবার অস্বীকার করবেন। অভিপ্রায় ছিল, আমরা যেন পিতরের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে অন্যদেরও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারতাম, কেননা তাঁকে তিনবার অস্বীকার করায় পিতর নিজের বিশ্বাসের ব্যাপারে গুরুতর বিপদে পতিত

হলেন। পরে, পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে (প্রথম দু'জনকে তিনি নিজের সাক্ষ্যের হবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু যোহনকে সুসমাচার-প্রচারের জন্য দৃষ্টিকৃত হতে হত) তিনি বললেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত শোকার্ত ছিলেন। পরে, এগিয়ে গিয়ে এবলে প্রার্থনা করলেন, হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক; তথাপি আমার যেমন ইচ্ছা সেইমত নয়, তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমতই হোক (ক)। তিনি তখন প্রার্থনা করেন যেন পানপাত্র তাঁর থেকে সরে যায় যখন নিঃসন্দেহে সেই পানপাত্র তাঁর সামনেই ছিল ও পানপাত্রটা অনেকের পাপের জন্য নূতন নিয়মের রক্তে পাতিত হতে সেসময়ই শুরু করছিল। পানপাত্র যেন তাঁর সামনে না থাকে এজন্য নয়, কিন্তু তা যেন তাঁর থেকে সরে যায় এজন্যই তিনি প্রার্থনা করেন। পরে তিনি প্রার্থনা করেন যেন তাঁর নিজের ইচ্ছা না হয়, এবং তিনি এমনটা ইচ্ছা করেন যেন ঠিক তা-ই তাঁকে মঞ্জুর করা না হয় যা তিনি তা ঘটতে ইচ্ছা করেন; কেননা তিনি বলেন, 'তথাপি আমার যেমন ইচ্ছা সেইমত নয়, তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমতই হোক'। যখন তিনি পানপাত্র সরাবার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তখন তিনি মানব দুশ্চিন্তায় নিজের সহভাগিতা জ্ঞাত করার ও পিতার সঙ্গে তিনি যে অবিচ্ছেদ্য ইচ্ছার অধিকারী সেই ইচ্ছার সিদ্ধান্তের সহযোগী হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আরও, তিনি যে নিজের জন্য প্রার্থনা করেন না তা বুঝিয়ে দেবার জন্য, তিনি যা ইচ্ছা করেন ও প্রার্থনা করেন, তিনি যে সেটার সিদ্ধি ইচ্ছা করেন না তা স্পষ্ট করার জন্য তিনি নিজের এই পুরো অনুরোধ একথা বলে শুরু করেন, 'হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়'। পিতার পক্ষে সম্ভব কিনা, এবিষয়ে অনিশ্চিত এমন কিছু কি থাকতে পারে? কিন্তু, যখন পিতার কাছে অসম্ভব কিছুই নেই, তখন দেখতে হয় 'যদি সম্ভব হয়' বাক্যটা কোন্ অবস্থা লক্ষ করে। এই প্রার্থনার পর পরে অবিলম্বে একথা আসে, সেই শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন; তিনি পিতরকে বললেন, তবে এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকবার শক্তি তোমাদের হয়নি? জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে প্রবেশ না কর; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল (খ)। তবে, শোকের কারণ ও পানপাত্র সরানো সংক্রান্ত প্রার্থনা এখনও কি অস্পষ্ট? তিনি জেগে থাকতে ও প্রলোভনে প্রবেশ না করার জন্য তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করতে আঞ্জা করেন কারণ আত্মা প্রস্তুত কিন্তু মাংস দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে,

বিশ্বস্ততা ক্ষেত্রে নিজেদের চেতনার দৃঢ়তার ভিত্তিতে যাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা তাঁর বিষয়ে পতিত হবেন না, তাঁরা তাঁদের মাংসের দুর্বলতার কারণে পতিত হতে যাচ্ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের ব্যাপারে শোকার্ত নন ও নিজের জন্যও প্রার্থনা করেন না, কিন্তু যাঁদের তিনি জাগ্রত অবস্থায় প্রার্থনা করতে উপদেশ দেন তাঁদেরই জন্য প্রার্থনা করেন যাতে যন্ত্রণাভোগের তেমন পানপাত্র তাঁদের ভাগ্য না হয়; পাছে সেই পানপাত্র তাঁদের মধ্যে অবস্থান করে, সেইজন্যই তিনি প্রার্থনা করেন সেই পানপাত্র তাঁর থেকে সরে যাক।

৩৮। [মার্ক ১৪:৩৬] যদি সম্ভব হয় তবে পানপাত্র তাঁর থেকে সরে যাক, যে কারণে তিনি এই প্রার্থনা রাখেন, সেই কারণ এ। ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই যেইভাবে তিনি নিজে বলেন ‘পিতা, সবই তোমার সাধ্য।’ কিন্তু কষ্টের ভয় জয় করা মানুষের সাধ্য নয়, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাড়া বিশ্বাসও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, মানুষ বলে তিনি মানুষদের খাতিরে ইচ্ছা করেন পানপাত্র সরে যাক, কিন্তু ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে তাঁর ইচ্ছা পিতার ইচ্ছার লক্ষ্যের অনুরূপ। তিনি ‘যদি সম্ভব হয়’ উক্তির অর্থও সেই বাণী দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যা পিতরকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করেন, দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান তোমাদের সন্ধান করছে, কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায় (ক)। প্রভুর যন্ত্রণাভোগের এই পানপাত্র দ্বারা সকলেরই পরীক্ষিত হবার কথা ছিল। তিনি পিতরের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করেন যেন তাঁর বিশ্বাস লোপ না পায়। তিনি ইচ্ছা করেন, যখন পিতর দুর্বলতাবশত তাঁকে অস্বীকার করেন, তখন যেন অনুশোচনার দুঃখই অন্তত লোপ না পায়, কেননা বিশ্বাস যে লোপ পায়নি, সেটার প্রমাণ অনুশোচনায়ই রয়েছে।

৩৯। সুতরাং, প্রভুর পক্ষে শোক মৃত্যু পর্যন্ত হয়, কারণ মৃত্যুক্ক্ষেপে সেই ভূমিকম্প, দিনটা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, পরদাটা যে ছিঁড়ে যায়, কবরগুলো যে খুলে যায়, মৃতদের সেই পুনরুত্থান এসমস্ত কিছু প্রেরিতদূতদের সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তুলবে যা সেই রাত্রিকালীন গ্রেপ্তার দ্বারা, কশাঘাত সহ গোটা যন্ত্রণাভোগের অপমানজনক কথা দ্বারা, চপেটাঘাত, থুথু, কাঁটার মুকুট, ত্রুশের ভার ও অবশেষে অভিশাপতুল্য ত্রুশ-দণ্ডের দ্বারা ভয়ে

বিচলিত হয়েছিল। পান না করলে পাত্রটা যে সরে যাবে না, প্রভু একথা জানেন, কারণ তিনি বলেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করলে এ পাত্র আমা থেকে সরে যেতে পারে না: তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক (ক); অর্থাৎ তিনি বলেন, নিজের যন্ত্রণাভোগ পূর্ণতা লাভ করলে সেই পাত্র-জনিত ভয় সরে যাবেই, কিন্তু তিনি পান না করলে পাত্রটা সরে যেতে পারবে না। তখনই মাত্র তাঁর ভয়ের শেষ হবে যখন যন্ত্রণাভোগ পূর্ণতা লাভ করবে ও ভয় তাঁর মধ্যে নিঃশেষিত হবে, কারণ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রেরিতদূতদের দুর্বলতা জনিত পতন তাঁর পরাক্রমের গৌরবের গুণে সরিয়ে দেওয়া হবে।

৪০। এবং পাত্র সংক্রান্ত পতনের ব্যাপারে তথা তাঁর নিজের যন্ত্রণাভোগের ব্যাপারে যদিও তিনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক’ বলায় প্রেরিতদূতদের তাঁর নিজের পিতার ইচ্ছার সিদ্ধান্তের হাতে ফেলে রাখলেন, তথাপি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের মত তাঁর সেই প্রার্থনা উচ্চারণ করেন; পরে বলেন, ‘এবার ঘুমাও ও বিশ্রাম কর (ক)। তাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন বলে যিনি আগে তাঁদের ভৎসনা করেছিলেন, তিনি যে এখন তাঁদের ঘুমোতে ও বিশ্রাম করতে আঞ্জা করেন, তা কোন না কোন গুপ্ত লক্ষ্য বিষয়ক চেতনা ছাড়া বলা হয়নি। মনে হয়, লুক আমাদের এই আদেশের অর্থ জানিয়ে দিলেন। শয়তান যে গমের মত প্রেরিতদূতদের চেলে নেবার দাবি করেছিল ও প্রভুর কাছে যে প্রার্থনা করা হয়েছিল যেন পিতরের বিশ্বাস লোপ না পায়, একথা বলার পর লুক, প্রভুর দীর্ঘ একটা প্রার্থনার পর এটা যোগ করেন যে এক দূত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দেখা দিলেন। এবং দূত দেখা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি আরও একাগ্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলেন, এমনকি তাঁর দেহের ঘাম রক্তের ফোঁটা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। প্রেরিতদূতদের রক্ষায় দূতকে পাঠানো হলেই ও সেই দূতের উপস্থিতিতে প্রভু তাঁদের ব্যাপারে শোকার্ত না হওয়ার জন্য সান্ত্বনা পেলেই তিনি ভয় ও শোক থেকে মুক্ত মনে বললেন, ‘এবার ঘুমাও ও বিশ্রাম কর’। আসলে, দূত ও শয়তানের সেই দাবি সম্পর্কে মথি ও মার্ক নীরব থাকেন। কিন্তু নিজের প্রাণ যে শোকার্ত, প্রভুর এই ঘোষণার পর, যারা ঘুমোচ্ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য করা ভৎসনার পর, পাত্র যেন সরে যায় এপ্রার্থনার পর ঘুমে আক্রান্ত প্রেরিতদূতদের কাছে যে সতর্কবাণী দেওয়া হয়, সেই সতর্কবাণীর এই লক্ষ্য ছাড়া অন্য লক্ষ্য নেই, তথা: তিনি তাঁদের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর কাছে প্রেরিত সেই দূতের

সহায়তায় আশ্বাস পেয়ে, যারা নিরাপদ রক্ষায় আশ্রিত হতে যাচ্ছিলেন তাঁদের তিনি ঘুমে ফেলে রাখছিলেন।

৪১। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের এব্যাপার উপেক্ষা করতে নেই যে গ্রীক ও লাতিন বহু পাণ্ডুলিপিতে দূতের দেখা দেওয়া ও রক্ত-ঘামের কথা আদৌ উল্লিখিত নয়। সেজন্য, যে যে পাণ্ডুলিপিতে সেই বচন নেই তা যে বাতিল করা হয়েছে অথবা যে যে পাণ্ডুলিপিতে বচনটা রয়েছে তা যে প্রক্ষেপণের ব্যাপার হয়, এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যকার অনৈক্যের ভিত্তিতে আমরা অনিশ্চিত: পাণ্ডুলিপিগুলোর অনৈক্যই ব্যাপারটা অনিশ্চিত রাখছে। কিন্তু এটা সন্দেহের অতীত যে, এক্ষেত্রে যদি ভ্রান্তমতপন্থীরা উৎসাহিত হয়ে এমনটা ঘোষণা করে যে খ্রিষ্ট এজন্যই দুর্বল হলেন যেহেতু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একটা দূতের সাহায্য দরকার হলো, তবে তারা মনে রাখুক যে দূতদের স্রষ্টার পক্ষে নিজের সৃষ্টজীবদের সাহায্যের দরকার ছিল না; তাছাড়া তাঁকে দেওয়া সান্ত্বনাও অবশ্যই সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে শোক যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। কেননা তিনি আমাদের খাতিরে শোকাক্ত হলে অর্থাৎ তিনি আমাদের কারণে শোকাক্ত হলে তবে তাঁকে আমাদের কারণে ও আমাদের খাতিরে সান্ত্বনা করা দরকার। আমাদের কথা ভেবে যিনি শোকাক্ত, তাঁকে আমাদের জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হলো। যে কারণে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় ও যে কারণে তিনি শোকাক্ত সেই কারণ একই। অন্যদিকে, এমন কেউই নেই যে সেই ঘাম দুর্বলতার উপর আরোপ করতে দুঃসাহস করবে, কারণ ঘাম যে রক্তের ফোঁটা হয়ে যায় তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এবং খ্রিষ্টের যে অধিকার প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বৈষম্যে কার্যকারী হলো তা যে দুর্বলতার চিহ্ন তাও নয়। যে ভ্রান্তমত দুর্বলতার কথা বলে, ঘাম যে রক্তের ফোঁটা হয় ব্যাপারটা সেই ভ্রান্তমতের সমর্থনে আনা যায় না, বরং, যে ভ্রান্তমত তাঁর দেহকে অবাস্তব গণ্য করে, সেটার বিপক্ষে সেই দেহকে বাস্তব বলে সপ্রমাণ করে। যেহেতু তাঁর শোক আমাদের লক্ষ করে ও তাঁর প্রার্থনা আমাদের মঙ্গলের জন্য উচ্চারিত, সেজন্য আমরা এসিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য যে, সবকিছু আমাদের কারণে ঘটেছিল; তাঁর প্রতিটি প্রার্থনা ছিল আমাদের মঙ্গলের জন্য, সেই আমরা যারা ছিলাম তাঁর ভয়ের কারণ।

৪২। অন্যদিকে সুসমাচারগুলো একে অন্যকে পরিপূরণ করে : এমন কিছু রয়েছে যা আমরা একটা সুসমাচার থেকে, অন্য কিছু রয়েছে যা আমরা অন্য সুসমাচার থেকে জ্ঞাত হই, কারণ সেই সবকিছু হলো একক আত্মার অভিব্যক্তি। প্রেরিতদূতদের খাতিরে প্রভুর এই যে প্রার্থনা অন্যান্য সুসমাচারে অব্যক্ত, তা সেই যোহনই ব্যক্ত করেন যিনি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি করে আত্মিক বিষয়ের প্রচারক। তিনি এটা বলেন যে প্রভু এইভাবে প্রার্থনা করলেন, পবিত্র পিতা, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর : যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, আমি তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা করে এসেছি ; যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ আমি তাদের রক্ষাও করেছি (ক)। সুতরাং সেই প্রার্থনা তাঁর নিজের জন্য নয়, প্রেরিতদূতদেরই জন্য ছিল ; যিনি প্রেরিতদূতদের প্রার্থনা করার ব্যাপারে সতর্কবাণী দেন তাঁরা যেন প্রলোভনের সম্মুখীন না হন, তিনি যে নিজের জন্য শোকার্ত তাও নয় ; সেই দূত যে খ্রিষ্টের সুবিধার জন্যই প্রেরিত হলেন তাও নয়, কারণ তাঁর ইচ্ছা হলে তবে তিনি স্বর্গ থেকে বারো হাজার দূতবাহিনীকে আনাতেন ; যিনি মৃত্যু পর্যন্ত শোকার্ত তিনি মৃত্যুর কারণেই যে ভয়ে অভিভূত তাও নয় ; এবং পাত্রটা যেন তাঁকে স্পর্শ না করে এজন্য যে তিনি প্রার্থনা করেন তাও নয়, কিন্তু এজন্য প্রার্থনা করেন যেন সেই পাত্র তাঁর থেকে সরে যায়, কিন্তু পাত্র এমন যা তিনি পান না করলে সরে যেতে পারে না। তাছাড়া, সরে যাওয়ার অর্থ এমনই একটা স্থান ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আদৌ অস্তিত্বশীল না হওয়াই বোঝায়। সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের কথা ঠিক এই সত্য নির্দেশ করে যখন আমরা পড়ি ‘আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না (খ)। আরও, প্রেরিতদূত বলেন, প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে (গ)। তিনি আরও বলেন, এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে (ঘ)। সুতরাং, যে পাত্রের বিষয়ে তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তা সরে যায়, পান করা না হলে সেই পাত্র সরে যেতে পারে না ; এবং প্রভু যে প্রার্থনা রাখেন, তা নিঃসন্দেহে এমন প্রার্থনা যা তাঁদেরই লক্ষ করে যাঁদের তিনি ত্রাণ করেছেন যেহেতু তিনি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ও তাঁদের পরিত্রাণের জন্য পিতার কাছেও রেখে গিয়েছেন। এখন, নিজের মৃত্যু-রহস্য পূর্ণ করতে উদ্যত হয়ে তিনি পিতাকে তাঁদের রক্ষা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর জন্য প্রেরিত সেই দূতের উপস্থিতি (যদি ব্যাপারটা ঠিক তা-ই

হয়), তাও অনিশ্চিত সন্দেহের বিষয় নয়; প্রার্থনাটায় যে সাড়া দেওয়া হয়েছে, সেই নিশ্চয়তা তখনই সুস্পষ্ট হয় যখন নিজের বাণীর শেষে তিনি শিষ্যদের ঘুমোতে আজ্ঞা করেন। এই প্রার্থনাজনিত ফলাফল ও ঘুমাবার আজ্ঞাজনিত নিশ্চয়তা সুসমাচার-রচয়িতা দ্বারা যন্ত্রণাভোগের সময়েও তখনই জ্ঞাত করা হয় যখন, নিজেদের নির্ধাতকদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে উদ্যত সেই শিষ্য সকলকে তিনি বলেন, এমনটি ঘটল, তিনি যে কথা বলেছিলেন তা যেন পূর্ণ হয়: যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের মধ্যে একজনকেও হারাইনি ৩। তিনি যা অনুরোধ করলেন তা পূর্ণতা লাভ করল, এবং সবাই ত্রাণ পেলেন। কিন্তু তিনি যাদের ত্রাণ করলেন, পিতা নিজেই যেন এখন তাঁর নিজের নামে তাঁদের ত্রাণ করেন, এজন্য প্রার্থনা করেন, এবং পিতা তাঁদের এমন ভাবে ত্রাণ করেন যে, পিতরের আতঙ্কিত বিশ্বাস অবিলম্বেই পরবর্তী অনুশোচনার গুণে লোপ পায় না।

৪৩। যোহানে প্রভুর কাছে প্রার্থনা, লুকে শয়তানের দাবি, মার্ক ও মথিতে মৃত্যু পর্যন্ত শোক, ঘুমের জন্য ভর্ৎসনা ও ঘুমাবার জন্য পরবর্তী আজ্ঞা, এসমস্ত কিছু সন্দেহ করার মত আর কোন স্থান রাখে না। যোহানে উল্লিখিত সেই যে প্রার্থনায় তিনি প্রেরিতদূতদের তাঁর পিতার কাছে সঁপে দেন, সেই প্রার্থনা শোকের কারণ ও পাত্র যেন সরে যায় বিষয়ক প্রার্থনারও কারণ সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যা করে। যন্ত্রণাভোগ যেন তাঁর থেকে দূরে যায় এজন্যই প্রভু মিনতি করেন তা নয়, কিন্তু তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করেন যেন যন্ত্রণাভোগের সময়ে তিনিই প্রেরিতদূতদের রক্ষা করেন। দিয়াবলের বিরুদ্ধে যে প্রার্থনা লুক উল্লেখ করেন, সেই প্রার্থনা সেই নিশ্চিত আশ্বাস ব্যক্ত করে যা দ্বারা তিনি সেই ঘুম অনুমোদন করেন যা আগে নিষেধ করেছিলেন।

৪৪। মানুষের স্বরূপের চেয়ে উর্ধ্বতর সেই স্বরূপ মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও আতঙ্কের অধীন নয়, ও যে দেহ পার্থিব পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তা পার্থিব দেহের অনিষ্ট থেকে পরকীয় নয়, যদিও পবিত্র আত্মা গর্ভধারণ-রহস্য দ্বারা মানবপুত্রের উৎপত্তি সম্ভব করে তুলেছেন। অন্য কথায়, পবিত্র আত্মার ঘটিত গর্ভধারণের ফলে কুমারী যে দেহ জনিত করছিলেন, পরাৎপরও সেই দেহে নিজের পরাক্রম প্রদান করলেন। কেননা

প্রাণবিশিষ্ট যেকোন দেহ দেহে ব্যাপ্ত প্রাণের সংসর্গের গুণেই নিজের চেতনাবিশিষ্ট অস্তিত্বকে পায়, এবং দেহের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাণই দেহতে দেওয়া ব্যথা ও কষ্ট বিষয়ে দেহকে সচেতন করে। যখন আত্মা স্বর্গীয় প্রত্যাশার ও নিজের বিশ্বাসের সুখময় একাগ্রতা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে দেহ ক্ষেত্রে নিজের পার্থিব উৎপত্তি ঘৃণা করে, তখন কষ্ট ক্ষেত্রে দেহ প্রাণের সেই অনুভূতি ও আত্মিক শক্তি এমনভাবে অর্জন করে যে, সে যে কষ্ট ভোগ করে সেবিষয়ে অনুভব করা শেষ করে। তবে, প্রভুর দেহের স্বরূপ সম্পর্কে, স্বর্গ থেকে নেমে আসা মানবপুত্রেরই দেহের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা আর কীবা বলতে পারি? ভয় ও কষ্ট যখন আবশ্যকীয় তখন পার্থিব দেহগুলোও সময় সময় ভয় ও কষ্টের সামনে উদাসীন হয়ে থাকে।

৪৫। আমি জিজ্ঞাসা করি, যাঁদের জিয়ন্তে পুড়িয়ে দেওয়ার কথা সেই ইস্রায়েলীয় বালকেরা কি বাবিলনের চুলার ইন্ধন করা আগুনের শিখা ভয় পাচ্ছিলেন? সেই ভয়ঙ্কর আগুনের ভয় কি আমাদের দেহের মত গর্ভস্থ তাঁদের সেই দেহে অনুপ্রবেশ করেছিল? আরও জিজ্ঞাসা করি, আগুনের শিখা যখন তাঁদের ঘিরে রাখছিল তখন তাঁরা ব্যথা পাচ্ছিলেন কি? কিন্তু তুমি হয় তো এটা বলবে যে, তাঁদের কোন ব্যথা হয়নি কারণ তাঁরা দন্ধ হননি; তুমি পরে এটাও ভাববে যে, সেই শিখাগুলো তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী জ্বলবার ক্ষমতাহীন শিখা ছিল। দেহের পক্ষে পুড়ে যাবার ভয়ও স্বাভাবিক ছিল, পুড়ে যাবার সম্ভবনাও স্বাভাবিক ছিল; বিশ্বাসজনিত আত্মার পক্ষে তাঁদের পার্থিব দেহকে— অর্থাৎ সাধারণ বাস্তবতা অনুসারে উৎপন্ন সেই দেহগুলোকে—পোড়ানোও সম্ভব হয়নি, ভয় পাওয়াও সম্ভব হয়নি। কিন্তু মানুষদের ক্ষেত্রে এ অধিকার দু'টো হলো প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে বিচার্য নয়, কারণ সেই অধিকার দু'টো [পবিত্র] আত্মার পরাক্রম দ্বারাই উৎপন্ন। তাই বাঁধা বালকেরা আগুনের মধ্যে রয়েছেন: তাঁরা ভীত নন, চিতায় ওঠেন; প্রার্থনা করতে করতে আগুনের শিখা অনুভব করেন না; আগুনের মধ্যে থাকাকালে দন্ধ হতে পারেন না। তাঁদের দেহ ও আগুন উভয়ই নিজ নিজ প্রকৃতি হারায়: দেহগুলোও পুড়ে যায় না ও আগুনও জ্বলে না, তথাপি অন্যদের জন্য আগুন ও দেহ নিজ নিজ প্রকৃতি রাখে, কারণ চারপাশে যারা রয়েছে তারা নিঃশেষিত হলো ও দণ্ড-পূরণের সেবাকর্মীরা নিজেরা দণ্ডিত হয়। হে

ভক্তিহীন ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি কি এটা সমর্থন কর যে, যখন পেরেক খ্রিস্টের হাতের পাতা বঁধিয়ে দিল তখন তিনি ব্যথা পেলেন ও যখন সেই বর্শা তাঁকে বিদ্ধ করল তখন তিনি সেই ক্ষতজনিত তীব্র কষ্ট অনুভব করলেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই বালকেরা কেন আগুনের শিখা ভয় পাননি ও কোন ব্যথা অনুভব করেননি? অথবা, তাঁদের দেহ কেমন স্বরূপের অধিকারী ছিল যা আগুনের স্বরূপ অতিক্রম করল? তাঁদের বিশ্বাসের উত্তাপ গুণে ও পবিত্র সাক্ষ্যমরণের গৌরবের গুণে যখন সেই বালকেরা সেই সমস্ত কিছুতে ভীত নন যা বিষয়ে মানুষ সাধারণত ভীত, তখন খ্রিস্ট কি দ্রুশের ভয়ে শোকার্ত হতে পারেন? আমাদের পাপময় স্বরূপ নিয়ে গর্ভস্থ হয়েও যিনি দ্রুশেও ঈশ্বর হয়ে থাকবার জন্য, জগৎকে বিচার করার জন্য ও আসন্ন যত যুগের রাজা হবার জন্য নিরুপিত, সেই খ্রিস্ট কি তত মহৎ অধিকার বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে অসম্মানজনক ভয়ের চিন্তায় কম্পিত হতে পারেন?

৪৬। যাঁর খাবার এক নবীর খাবার হওয়ার কথা ছিল, সেই দানিয়েল সিংহদের গর্ত ভয় পান না (ক)। প্রেরিতদূতেরা খ্রিস্ট-নামের খাতিরে কষ্ট করতে ও মরতে আনন্দিত (খ)। পলের বিবেচনায় তাঁর পানীয়-নৈবেদ্য হলো ধর্মময়তার মুকুট স্বরূপ (গ)। সাক্ষ্যমরবৃন্দ স্তুতিগান করতে করতে ঘাতকদের কাছে ছেদিত হবার জন্য ঘাড় অর্পণ করেন ও গীতিকা গাইতে গাইতে কাঠের চিতায় আরোহণ করেন। দেহে স্থিত আমাদের স্বরূপে বিরাজমান সেই দুর্বলতার ভয় বাতিল করার পর বিশ্বাসের চেতনা দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলো এমন ভাবে রূপান্তরিত করে যে সেই ইন্দ্রিয়গুলো ব্যথা অনুভব করে না, এর ফলে দেহ প্রাণের সঙ্কল্প দ্বারা বলবান হয়, ও স্থিরমনা হয়ে প্রাণের উৎসাহী প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করে না। এইভাবে, গৌরবলাভের বাসনায় প্রাণ যে কষ্ট অবজ্ঞা করে, দেহ তা অনুভব করে না, কারণ প্রাণ দেহকে বলবান করে। যখন গৌরবের আকাঙ্ক্ষায় জ্বলন্ত প্রাণের উত্তাপ সকলের মধ্যে নিজ নিজ ব্যথার প্রতি উদাসীনতাকে স্বাভাবিক করে, ক্ষতের কষ্টকে অনুপলব্ধ করে, মৃত্যুর প্রতি মানুষকে নিশ্চিত করে, তখন আমরা কি এমনটা ভাবব যে, যাঁর পোশাকের প্রান্ত নিরাময় করে, যাঁর থুথু ও বাণী দেহকে সুস্থতা ফিরিয়ে দেয় (কেননা সেই যে খোঁড়া মানুষ তাঁর আজ্ঞায় আর খোঁড়া না হয়ে হাত বাড়ায়, জন্মান্ত লোক নিজের জন্মের খুঁত আর অনুভব করে না, যার কান কেটে ফেলা

হয়েছে তার গায়ে কানটা আবার লাগানো হয়—তবে গৌরবের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের বিদ্ধ ও কষ্টভোগী দেহে সেই দুর্বলতা বিরাজ করে যা থেকে সেই গৌরবময় ও পবিত্র সাক্ষ্যমরেরা মুক্ত হলেন যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

৪৭। সুতরাং, একমাত্র জনিত ঈশ্বর আমাদের স্বরূপের স্বীয় সমস্ত দুর্বলতার আক্রমণ নিজেতে ভোগ করলেন, কিন্তু তিনি সেইভাবে নিজের স্বরূপের পরাক্রমেই সেই সমস্ত কষ্ট ভোগ করলেন যেইভাবে তিনি নিজের স্বরূপের পরাক্রমে সঞ্জাত হয়েছিলেন। জন্মের ফলে তিনি নিজের সর্বশক্তিমত্তা-বিশিষ্ট স্বরূপ হারাননি। মানব অবস্থার অধীন হয়ে জন্ম নিয়েও তবু তিনি সেইভাবে গর্ভস্থ হননি: কেননা প্রসবে তিনি মানব অবস্থায় স্থিত কিন্তু উৎপত্তিতে তিনি সেই মানব অবস্থার বাইরে বিরাজিত। এজন্য তিনি আমাদের রোগ-ব্যাদিগ্রস্ত দেহ অনুসারে দেহে কষ্টভোগ করলেন, কিন্তু আমাদের দেহের দুর্বলতা নিজের দেহের পরাক্রমে আপন করে নিলেন। আমাদের বিশ্বাসের এই দিক সম্পর্কে নবীর বাণী সাক্ষ্যদান করে যখন নবী বলেন, তিনি আমাদেরই পাপ তুলে বহন করেন; বরণ করে নেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, [ঈশ্বর দ্বারা] আঘাতগ্রস্ত, অবনমিত! তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের পাপের জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন (ক) যদি মানব বিবেচনার অভিমত মনে করে তিনি কষ্টভোগ করেন বলে ব্যথা পান, তাহলে সেই অভিমত মিথ্যা। তিনি আমাদের পাপ তুলে বহন করেন বটে, অর্থাৎ তিনি আমাদের পাপময় দেহ তুলে বহন করেন, কিন্তু তিনি পাপ করেন না। কেননা যখন তিনি পাপময় মাংসের সদৃশ মাংসে প্রেরিত হলেন, তখন নিজের মাংসে পাপ বহন করছিলেন, কিন্তু সেই পাপ ছিল আমাদেরই পাপ। এবং তিনি আমাদের জন্য ব্যথা পান, কিন্তু আমরা যে অনুভূতিতে ব্যথা পাই তিনি সেই অনুভূতিকে নিয়ে ব্যথা পান না, কারণ আকারে প্রকারে তিনি নিজেতে ব্যথার দেহ বহন করে এমন মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন যে মানুষ কিন্তু কষ্টভোগ করার স্বরূপ বহন করে না। কেননা যদিও এক দিকে তাঁর চেহারা মানুষের চেহারা, তবু অন্য দিকে তাঁর উৎপত্তি মানুষের উৎপত্তির চেয়ে ভিন্ন, কারণ তিনি পবিত্র আত্মা-জনিত গর্ভধারণ দ্বারা সঞ্জাত হলেন। এজন্যই তিনি প্রহারিত, [ঈশ্বর দ্বারা] আঘাতগ্রস্ত ও অবনমিত। তিনি একটা দাসের রূপ ধারণ করলেন ও একটি কুমারী থেকে

মানুষ বলে সঞ্জাত হয়ে এমন একজনের ধারণা আমাদের জন্য রেখে দিলেন যাঁর স্বরূপ, যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে, ব্যথার অধীন। ‘তিনি কিন্তু বিদ্ধ হলেন’, কিন্তু ‘আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য’। কেননা তাঁকে বিদ্ধ করা হলেও সেই ক্ষত যে তাঁরই দোষে হয়েছিল তা নয়; এবং তিনি যত কষ্ট ভোগ করেন, তা নিজের জন্য ভোগ করেন না। নিজের জন্য তিনি মানুষ বলে জন্ম নিলেন না, নিজের কর্মেও কোন দোষ করেননি। এসব কিছু কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, খ্রিস্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও। যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন (খ)। মাংসে স্থিত পাপকে পাপ দ্বারা দণ্ডিত করার জন্য পাপমুক্ত-তিনি নিজেকে পাপ করলেন অর্থাৎ পাপময় মাংস দ্বারা মাংসে স্থিত পাপ দণ্ডিত করে তিনি মাংস না জেনেও আমাদের জন্য মাংস হলেন; এজন্য আমাদের কৃত অন্যায়-অপরাধের কারণে তিনি বিদ্ধ হলেন।

৪৮। আরও, খ্রিস্ট যে ব্যথার জন্য কম্পিত সেবিষয়ে প্রেরিতদূত কিছুই জানেন না। কেননা যখন তিনি যন্ত্রণাভোগ-ব্যবস্থা বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই ব্যবস্থাকে ঈশ্বরত্ব-রহস্যেই স্থান দেন, তিনি বলেন, তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক’রে, সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, তিনি তা মুছে ফেলে দ্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন; মাংস[-বস্তু] থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে যত কর্তৃত্বের উপরে নিজেতেই বিজয়ী হয়ে তিনি নিজেতে ভরসা রাখায় প্রকাশ্যে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন (ক)। তাই তুমি কি এমনটা মনে কর যে তেমন পরাক্রম একটা পেরেকজনিত ক্ষতে পরাভূত হয় ও ঘাতকের আঘাতে আতঙ্কিত হয়ে ব্যথা সাপেক্ষ স্বরূপে নিজেতে রূপান্তরিত হয়? অথচ খ্রিস্ট তাঁর অন্তরে কথা বলেন বিধায় যে প্রেরিতদূত কথা বলেন, তিনি প্রভুর সাধিত আমাদের পরিদ্রাণকর্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর মৃত্যুকেই সেই ঘটনা বলে চিহ্নিত করেন যা দ্বারা তিনি মাংস[-বস্তু] খুলে ফেলেন, যত আধিপত্যকে প্রকাশ্যে ক্ষমতা-বঞ্চিত করেন ও তাদের উপরে নিজেতে জয়ী হন। যদি তোমার পরিদ্রাণের জন্য তাঁর যন্ত্রণাভোগ হলো প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা কিন্তু [স্বেচ্ছাকৃত একটা] দান নয়; যদি দ্রুশ হলো ক্ষতের ব্যথা মাত্র কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সেই লিখিত ঋণপত্র নিজের সঙ্গে তুলে নেওয়াটা নয়; যদি তাঁর মৃত্যু হলো

মৃত্যুজনক তীব্রতার একটা ঘটনা মাত্র কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমের গুণে মাংস[-বস্তুকে] খুলে দেওয়া নয়; অবশেষে, যদি সেই মৃত্যু ক্ষমতামালাীদের ক্ষমতা-বঞ্চিত করা নয়, সৎসাহসের প্রমাণও নয়, জয়লাভও নয় বরং অন্য কিছু হয়; এসমস্ত ক্ষেত্রে যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল; যদি জোর-প্রয়োগ, ভয় ও অসম্মান দেখা দিল, তবে তাঁর উপরে দুর্বলতা আরোপ কর। কিন্তু যজ্ঞগাভোগ-রহস্যে আমাদের যা প্রচার করা হয় তা যদি এসমস্ত কিছুর বিপরীত, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি: প্রেরিতদূতদের শেখানো বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান ক’রে নিজেদের ধর্মীয় মনোভাব পরিবর্তন করার এই ক্ষিপ্ততা কি? যা স্বাধীন ইচ্ছা ও রহস্যের ব্যাপার তা প্রাকৃতিক দুর্বলতার দোষে পরিণত করারও এই ক্ষিপ্ততা কি? এসমস্ত কি পরাক্রম, সৎসাহস, জয়লাভেরই অভিব্যক্তি নয়? তারা যে তাঁকে ত্রুশে দিতে চেষ্টা করে ও তিনি এগিয়ে এলে তারা যে তাঁর সেই উপস্থিতি সহ্য করে না, তা অবশ্যই জয়লাভ; তিনি যে মৃত্যুদণ্ড মেনে নেন ও কিছুক্ষণ পরে পরাক্রমের ডান পাশে আসন নিতে পারেন; তিনি যে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ হন ও নিজের নির্ধানতকারীদের হয়ে প্রার্থনা করেন; তিনি যে সিকা পান করেন কিন্তু রহস্যটার সিদ্ধি ঘটান; তিনি যে অপকর্মাদের মধ্যে পরিগণিত হন কিন্তু পরমদেশ দান করেন; তিনি যে ত্রুশে উত্তোলিত হন কিন্তু ভূমি কম্পিত হয়; তিনি যে সেই ত্রুশে ঝোলেন কিন্তু সূর্য ও দিবস পালিয়ে যায়; তিনি যে নিজের দেহ বিসর্জন দেন কিন্তু দেহগুলোতে প্রাণ ফিরিয়ে ডাকেন; তিনি যে মৃত বলে সমাহিত হন কিন্তু ঈশ্বর বলে পুনরুত্থিত হন; তিনি যে আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ বলে সবধরনের অমঙ্গল ভোগ করলেন কিন্তু ঈশ্বর বলে এই সমস্ত অমঙ্গলের উপর জয়ী হলেন, এসমস্ত কিছু অবশ্যই তাঁর পক্ষে জয়লাভ।

৪৯। ভ্রান্তমতপন্থীদের মতে স্পষ্ট দুর্বলতার আরও একটা মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ এমন স্বীকারোক্তি রয়েছে যা এজন্যই বিশেষভাবে মূল্যবান কারণ স্বয়ং প্রভুর দ্বারাই প্রকাশিত যখন তিনি বলেন, ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে ত্যাগ করেছে? (ক)। তাঁকে যে একা ও দুর্বলতার হাতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে, তা তারা তিন্ত অভিযোগের অভিব্যক্তি বলে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু ভক্তিহীন ব্যাখ্যায় স্থাপিত এই অযৌক্তিক ধারণা নিজে থেকেই প্রভুর বাণীর অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করে। যিনি মৃত্যুর দিকে ত্বরান্বিত করেন, যিনি সেই মৃত্যু দ্বারা গৌরবান্বিত হবেন, তিনি যে সেই মৃত্যুর পরে

পরাক্রমের ডান পাশে আসন নিতে নিরুপিত, সুখলাভের এসমস্ত কারণের মধ্যে তিনি কেমন করে মৃত্যুকে ভয় করতে পারেন? এর ফলে, যখন সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি চিরকাল ধরে সুখে বিরাজ করবেন, তখন তিনি কেমন করে এমন অভিযোগ জানাবেন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর বাধ্যবাধকতায় একা ফেলে রেখেছেন?

৫০। আর শুধু তা নয়, সেই ভ্রান্তমত কুটিলতার সঙ্গে নিজের জন্য প্রস্তুত করা এই অভক্তির পথে এগিয়ে চলে, কারণ এটাও সমর্থন করে যে, বাণী-ঈশ্বর দেহের প্রাণে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হলেন, এর ফলে মানবপুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র এক নন। এবং, তাদের মতে, হয় বাণী-ঈশ্বর তখনই নিজে [তথা ঈশ্বর] হওয়া শেষ করলেন যখন একটা দেহকে পুনরুজ্জীবিত করতে করতে একটা প্রাণের ভূমিকা পালন করলেন, না হয় যে মানুষ জন্ম নিলেন তিনি আদৌ খ্রিষ্ট ছিলেন না, কারণ ঈশ্বরের বাণী তাঁর মধ্যে সেইভাবে অবস্থান করলেন যেভাবে নবীদের মধ্যে অবস্থান করতেন (ক)। এই অদ্ভুত জঘন্যতার ভ্রান্তি তখনই এমন গুরুতর দুঃসাহস ও অভক্তির পর্যায়ে বেড়ে উঠল যখন সেই ভ্রান্তি ঘোষণা করল, মারীয়া থেকে জন্ম নেবার আগে যিশু খ্রিষ্ট খ্রিষ্ট নন (খ), কারণ পূর্বাস্তিত্বশীল এক জীব জন্ম নেননি, কিন্তু একটা জীব জন্মলগ্নে অস্তিত্বশীল হতে শুরু করল। তাই সেই ভ্রান্তি এই ভুল-ধারণাও যোগ করে যা অনুসারে বাণী-ঈশ্বর, বলতে গেলে, অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতায় সম্প্রসারী ঐশ্বরাক্রমের কোন না কোন অংশ রূপে সেই মানুষে অবস্থান করলেন যিনি মারীয়া থেকে নিজের অস্তিত্বের উৎপত্তি গ্রহণ করেছেন ও তাঁকে সেই পরাক্রমে বেষ্টিত করেছেন যা ঈশ্বরের কার্যক্ষমতার চিহ্ন; যদিও সেই মানুষ নিজের প্রাণের স্বরূপ দ্বারা জীবনময় ও গতিশীল।

৫১। এই কুটিল ও মারাত্মক ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে ভ্রান্তমতপন্থীরা এই ধারণায় আকর্ষিত হয় যে, বাণী-ঈশ্বর এমন স্বরূপের রূপান্তর দ্বারা খ্রিষ্টের দেহের প্রাণে রূপান্তরিত হলেন যে স্বরূপ দুর্বল হল যার ফলে বাণী ঈশ্বর হওয়া শেষ করলেন; অন্যথা, মানুষ-যিশু নিজের নিম্নাবস্থায় ও নিজের স্বরূপের একাকীত্বে কেবল তাঁর নিজের প্রাণের জীবন ও প্রেরণা দ্বারাই সঞ্জীবিত হলেন ও তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ, বলতে গেলে, তাঁর কর্ত্তের প্রতাপ তাঁর মধ্যে প্রসারিত হল ও বসবাস করল। এইভাবে সব ধরনের তত্ত্বের

জন্য পথ উন্মুক্ত, সেই তত্ত্ব যতই ভক্তিহীন হোক না কেন। তাই, হয় বাণী-ঈশ্বর প্রাণে রূপান্তরিত হলেন ও বাণী-ঈশ্বর হওয়া শেষ করলেন, না হয়, মারীয়া থেকে তাঁর জন্মের আগে খ্রিষ্ট আদৌ অস্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না যেহেতু কেবল সাধারণ প্রাণ ও দেহ বিশিষ্ট মানুষ সেই যিশু খ্রিষ্ট নিজের অস্তিত্বশীলতা নিজের মানবীয় জন্ম দিয়ে শুরু করলেন ও তাঁর মধ্যে প্রসারিত বাণীর বাহ্যিক প্রতাপের গুণে ঈশ্বরের কার্যক্ষমতার স্বকীয় প্রতাপে দৃঢ়ীকৃত হলেন। ঈশ্বরের বাণী নিজের মধ্যে এই প্রসারণের পরে নিজেকে প্রত্যাহার করেন এবং এই অবস্থায় একা হয়ে পড়ে খ্রিষ্ট চিৎকার করে বলেন, ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে ত্যাগ করেছে?’ অথবা, অন্তত, যখন বাণীর ঐশ্বরিক স্বরূপ দেহের প্রাণকে স্থান দেয়, তখন যিনি এতক্ষণে সবকিছুতেই নিজের পিতার সাহায্যে উপকৃত হয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্ট এখন পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও মৃত্যুর হাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজের একাকীত্ব বিষয়ে অভিযোগ জানান ও যিনি তাঁকে ত্যাগ করেন তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। তাই সেই অভিযোগের চিৎকার বাণী-ঈশ্বরে স্বরূপের দুর্বলতা নির্দেশ করুক, অথবা, যেহেতু মারীয়া থেকে যিশু খ্রিষ্টের জন্মই হলো তাঁর অস্তিত্বশীলতার আরম্ভ, সেজন্য বাণী-ঈশ্বর পূর্বাস্তিত্বশীল বলে পরিগণিত না হোন, উভয় ক্ষেত্রে বিশ্বাসের জন্য সবদিক দিয়েই ভ্রান্তির একটা মারাত্মক বিপদ উপস্থিত।

৫২। তবুও, এসমস্ত ভক্তিহীন ও দুর্বল-ভিত্তিতে স্থাপিত ব্যাখ্যার মধ্যে প্রেরিতদূতদের শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত মণ্ডলীর বিশ্বাস খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর জন্ম মেনে নেয়, কিন্তু তাঁর যে একটা আদি হয়েছে তা মণ্ডলী মানে না। মণ্ডলী বিভাজনের নয়, [মাংসধারণ] ব্যবস্থারই কথা জানে। মণ্ডলী এমনটা মেনে নেয় না যে যিশু খ্রিষ্টে এমন বিচ্ছেদ হোক যার ফলে যিশু একজন ও খ্রিষ্ট অন্যজন হন; মণ্ডলী ঈশ্বরের পুত্র থেকে মানবপুত্রকেও বিচ্ছিন্ন করে না পাছে ঈশ্বরের পুত্র মানবপুত্র বলেও গণ্য না হন। মণ্ডলী ঈশ্বরের পুত্রকে মানবপুত্রে একীভূত করে না; তাঁর সেই যে জামায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে সমস্তই একটানা বোনা ছিল (ক), সেই জামা যেমন ছেঁড়া হয়নি, তেমনি মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টকে বাণীতে ও এক দেহে ও এক প্রাণে বিচ্ছিন্ন না করে তিন ভাগে বিভক্ত বিশ্বাস দ্বারা সেই খ্রিষ্টকে ছেঁড়ে না; অন্যদিকে বাণীকে এক প্রাণে ও এক দেহেও রূপান্তরিত করে না। মণ্ডলীর জন্য সিদ্ধতাবিশিষ্ট এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই বাণী; তার জন্য

সিদ্ধতাবিশিষ্ট এক মানুষ আছেন, তিনি সেই খ্রিষ্ট। তাঁর রহস্য সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিতে মণ্ডলী শুধু এটাই আঁকড়ে ধরে আছে, অর্থাৎ মণ্ডলী এটা বিশ্বাস করে যে, যিশু ছাড়া খ্রিষ্ট অন্য কেউ নন, এটা প্রচার করে যে, খ্রিষ্ট ছাড়া যিশু অন্য কেউ নন।

৫৩। আমি এবিষয়ে অজ্ঞ নই যে, মানবীয় ক্ষীণ বুদ্ধির পক্ষে স্বর্গীয় রহস্যের মহত্ত্ব কেমন বাধা স্বরূপ দাঁড়ায় যার ফলে কেবল অধিক কঠিন ভাবেই আমরা এসমস্ত কিছু কথায় ব্যক্ত করতে বা যুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করতে বা চিন্তা দ্বারা ঘিরতেও সক্ষম। প্রেরিতদূত ভালই জানেন যে আমাদের পার্থিব স্বরূপের পক্ষে ঈশ্বরের কাজ করার পদ্ধতি উপলব্ধি করা দুর্লভ ও একেবারে বাধাবিঘ্নে পূর্ণ কাজ—কেমন যেন কাজ সম্পাদনে ঈশ্বর যতখানি কার্যকর তার চেয়ে আমাদের বিচার-বিবেচনাই উপলব্ধি করতে আরও বেশি সূক্ষ্ম হত—সেজন্য যিনি পবিত্র শাস্ত্র শিশুকাল থেকে গ্রহণ করেছেন, প্রেরিতদূত বিশ্বাসে তাঁর সেই প্রকৃত সন্তানের কাছে একথা লেখেন, মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি এফেসসে থেকে সেখানকার কয়েকজন লোককে আদেশ দিয়ে বলবে, যেন তারা ভিন্ন ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে না দেয়, এবং রূপকথা ও সীমাহীন বংশতালিকায় মন দেওয়ায় ব্যস্ত না থাকে; কেননা বিশ্বাসে প্রকাশিত ঐশ্বর্যের চেয়ে সেগুলো বরং অসার তর্কাতর্কিই পোষণ করে **(ক)**। তিনি সীমাহীন বংশতালিকা ব্যক্ত করতে ও এমন রূপকথায় ব্যস্ত থাকতে নিষেধ করেন যেগুলো অসীম তর্কাতর্কি জাগায়। তিনি বলেন, ঈশ্বরের সঙ্কল্প বিশ্বাসে স্থাপিত: তিনি মানুষের ভক্তি ঐশ্বর্যশক্তিমত্তায় সীমিত করতে ইচ্ছা করেন ও এমনটা এড়াতে চান আমাদের দুর্বলতা তা-ই শেষ পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করবে যা আমাদের স্বরূপগত দৃষ্টিশক্তিকে ক্লান্ত করে তোলে। আমরা যখন সূর্যের দিকে তাকাই তখন যদি আমাদের দৃষ্টি-ক্ষমতা এতই টানা হয় যে, যদি সময় সময় অধিক কৌতূহল স্থিরতার সঙ্গে জাজ্বল্যমান আলোর উৎস লক্ষ্য করি, তাহলে চোখ নিজের স্বরূপগত ক্ষমতা হারায়, এমনকি দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষিত হয় এবং এমনটা হয় যে, আরও বেশি দেখবার প্রচেষ্টার ফলে একজন আর আদৌ কিছু দেখে না, তখন ঈশ্বরের বিষয়ে ও ধর্মময়তার সূর্য বিষয়ে আমরা কী প্রত্যাশা রাখতে পারি? যারা বেশি জানতে চায়, তারা কি মূর্খ হবার বিপদের সম্মুখীন হয় না? অবুঝ উন্মাদনার মূর্খতা কি সেই জাজ্বল্যমান আলোর তথা বুদ্ধিরই স্থান দখল করবে না?

নিম্নতর স্বরূপ উচ্চতর স্বরূপের প্রাথমিক যুক্তি ধারণ করতে অক্ষম : স্বর্গীয় সঙ্কল্প মানবীয় বিচার-বুদ্ধির অধীন নয়। কেননা সীমিত স্বরূপ যা কিছু জানতে পারে তাও সীমিত। ঐশ্বরিক প্রতাপ মানবীয় মনের ক্ষমতা অতিক্রম করে; এবং যদি সীমিত একটা সৃষ্টজীব সেই প্রতাপে পৌঁছতে চেষ্টা করে, তাহলে, যেহেতু স্বর্গীয় বিষয়ের উচ্চতর স্বরূপ তাকে চমকাবার ক্ষমতা রাখে, সেজন্য সেই সীমিত জীব আরও বেশি ক্ষীণ হয়ে যাবে, কারণ সে যার অধিকারী তাও হারাতে বাধ্য। ঘিরে রাখবার অতীত এমন উচ্চতর স্বরূপ, তাকে ধরার জন্য যে তার পিছনে ছোট্টে, তার জেদ নিঃশেষিত করে। সুতরাং, সূর্যকে এমন ভাবে লক্ষ করতে হয় যাতে তাকে দেখতে পাই ও তার আলোর শুধু সেইটুকু গ্রহণ করতে হয় যতটুকু আমাদের চোখ সহ্য করে পাছে, আরও বেশি দেখতে চাইলে, যা পেতে পারতাম তার চেয়ে আরও কম পাই। তেমনি স্বর্গীয় সঙ্কল্প সেই সীমার মধ্যে জ্ঞাত হোক যে সীমায় সেগুলো উপলব্ধ হতে পারে। সেগুলোকে সেই সীমায়ই মাত্র উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে হয়, যে সীমায় সেগুলো নিজেদের স্থিরীকৃত হতে দেয়, যাতে করে মঞ্জুর করা সীমার প্রতি আমাদের অসহ্যতায় মঞ্জুর করা বিষয়ও না হারাই। সুতরাং, ঐশ্বরে এমন বিষয় রয়েছে যা উপলব্ধ; ইঁা তেমন উপলব্ধ বিষয়গুলো রয়েছে, কিন্তু এই শর্তে যে, যা উপলব্ধ তা তুমি তাতে তুষ্ট হও। যেমন সূর্যের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তুমি দেখতে পাও যদি তুমি যা দেখা যেতে পারে তা দেখতে ইচ্ছা কর, কিন্তু যদি তুমি তা-ই দেখতে চেষ্টা কর যা দেখা সম্ভব নয় তাহলে যা দেখতে পাও তাও হারাতে পার, তেমনি ঐশ্বরের বিষয়গুলোতে এমন কিছু আছে যা তুমি উপলব্ধি করতে পার যদি যা উপলব্ধ তা উপলব্ধি করতে তুষ্ট হও। অন্যদিকে, যদি তোমার ক্ষমতার অতীত প্রত্যাশা কর, তবে যা ছিল তোমার ক্ষমতার আয়ত্তে তা নাও পেতে পারবে।

৫৪। কালের বাইরে সেই অন্য জন্ম-রহস্য বিষয়ে এখন আলোচনা করব না : সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত সময় দরকার। আপাতত আমি মাংসধারণ-রহস্যের বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করি। তবে, যারা স্বর্গীয় রহস্যগুলো অনুসন্ধান করে, তাদের আমি অনুরোধ করি তারা যেন, যিনি একটি কুমারী থেকে সঞ্জাত, সেই খ্রিস্টের বিষয়ে ও তাঁর স্বরূপ বিষয়ে আমাকে কিছু বলে। সেই কুমারী যে গর্ভধারণ করলেন ও তিনি যে প্রসব করলেন, বিষয়টা তারা কেমন ব্যাখ্যা করবে? তাদের তর্কাতর্কির

ফলাফল অনুসারে, সেই জন্মের দৈহিক কারণ কী ছিল? তিনি কেমন করে সেই মাতৃগর্ভের আড়ালে গঠিত হলেন? তাঁর দেহ ও তাঁর মনুষ্যত্ব কোথা থেকে আগত? তাছাড়া, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর, মানবপুত্র যে স্বর্গে অবস্থান করেও স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, এর অর্থ কী? দৈহিক নিয়ম অনুসারে এমন কেউ নেই যে একই সময়ে নেমে যাবার ও অবস্থান করার ক্ষমতা রাখে। প্রথম ক্ষেত্রে নেমে যাওয়ার গতি দ্বারা ঘটিত একটা পরিবর্তন রয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই বিশ্রামরত শান্তশিষ্টতা রয়েছে। শিশু বলে তিনি কাঁদেন কিন্তু তিনি স্বর্গে রয়েছেন; বালক বলে তিনি বড় হন কিন্তু নিজের পূর্ণতায় ঈশ্বর হতে থাকেন। উপরন্তু, যখন আমরা দেখি, তিনি যেখানে আগে ছিলেন সেখানে আরোহণ করেন ও যিনি স্বর্গে রয়েছেন তিনি নেমে আসেন, তখন আমরা মানুষের যুক্তি অনুসারে কোন্ অর্থে একথা বুঝব? কেননা প্রভু বলেন, তবে মানবপুত্র যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন কীবা বলবে? (ক)। মানবপুত্র যেখানে আগে ছিলেন সেখানে আরোহণ করেন: এই উক্তির কী অর্থ বহন করবে? যিনি স্বর্গে রয়েছেন, সেই মানবপুত্র স্বর্গ থেকে নেমে আসেন: কোন্ যুক্তি তেমন ব্যাপারের ব্যাখ্যা আমাদের দেবে? ‘বাণী হলেন মাংস’: কোন্ কথা এই সত্য ব্যক্ত করতে পারবে? বাণী মাংস হন, অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষ হন, এবং যিনি মানুষ তিনি স্বর্গে রয়েছেন, ও যিনি ঈশ্বর তিনি স্বর্গ থেকে আসেন। যিনি আরোহণ করেন তিনি হলেন সেই তিনি যিনি নেমে আসেন, কিন্তু তিনি স্বর্গ থেকে দূরে না গিয়েই নেমে আসেন। যিনি ছিলেন তিনি আছেন, কিন্তু তিনি এখন যা, সেসময় তা তিনি ছিলেন না (খ)। আমরা কারণগুলোর ধারাবাহিকতা [ধারা] দেখতে পাই কিন্তু তা কিভাবে হলো তা বোঝাতে পারি না, তা যে কিভাবে হলো আমরা তা দেখতে পাই কিন্তু সেটার কারণগুলো বুঝতে পারি না। তবু, আমরা যিশু খ্রিস্টকে এইটুকু মাত্রও বুঝলে তবে তাঁকে জানব; কিন্তু তাঁকে আরও বেশি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলে তবে তাঁকে আদৌ জানব না।

৫৫। তাছাড়া, কথায় ও কর্মে কেমন গভীর সেই রহস্য যা খ্রিস্টের কান্না সংক্রান্ত ও সেই অশ্রুজল সংক্রান্ত যা তাঁর শোকের ফলে তাঁর চোখ থেকে নির্গত হয়? তাঁর প্রাণের এপ্রকার দুর্বলতা কোথা থেকে আসে যার ফলে তিন্তু একটা কষ্ট তাঁর দেহ থেকে চোখের

জল কেড়ে নেয়? এবং কোন্ তিক্ত ঘটনা, কোন্ অসহ্য কষ্ট সেই স্বর্গ থেকে নেমে আসা মানবপুত্রকে অশ্রুসিক্ত করে? তাছাড়া, সেটা কী যা তাঁর মধ্যে কাঁদল? ঈশ্বর, নাকি বাণী, নাকি তাঁর দেহের প্রাণ? কেননা একথা সত্য যে কান্না দেহের একটা ভূমিকা, কিন্তু এই কান্না, বলতে গেলে, তাঁর থেকে প্রাণের একটা তিক্ততাকেই ফোঁটা ফোঁটা নির্গত করে, এবং দেহ মাধ্যম মাত্র হিসাবেই কাজে আসে। আরও, তাঁর কান্নার কারণ কী হতে পারবে? ভক্তিহীন পিতৃঘাতক সেই যে যেরুশালেমকে তত সংখ্যক প্রেরিতদূত ও নবীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য ও তাঁর আপন প্রভুকে হত্যা করার জন্য কোনও কষ্টও মুক্তিমূল্য দিতে পারে না, তিনি কি সেই যেরুশালেমকেই অশ্রুজলের দেয় কর দিয়ে সম্মানিত করতে ইচ্ছা করেন? এই বিশ্বাসহীন ও আশাহীন জাতির ধ্বংসের জন্য তিনি কি সেইভাবে শোক করতে পারেন যেভাবে সেই দুর্বিপাক ও মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন যা মানবজাতিকে আঘাত করে? তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁর এই কান্না-রহস্য কী? নিজের শোকে প্রাণ কাঁদে, কিন্তু এটাই কি সেই প্রাণ নয় যা নবীদের প্রেরণ করেছিল? এটাই কি সেই প্রাণ নয় যা বহুবার মুরগির বাচ্চাদের নিজের ডানার নিচে জড় করল? কিন্তু বাণী-ঈশ্বর শোক করবেন এমনটা হয় না, [পবিত্র] আত্মা কাঁদবেন এমনটাও হয় না। কিন্তু দেহ অস্তিত্বশীল হওয়ার আগে প্রাণের পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও যিশু খ্রিষ্ট যে সত্যিকারে কাঁদলেন তা সন্দেহের অতীত।

৫৬। তেমনিভাবে লাজারের জন্য খ্রিষ্টের অশ্রুজলও কম বাস্তব নয়। তবে এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন এ : লাজার ক্ষেত্রে কাঁদবার কি কারণ ছিল? অবশ্যই, কারণটা সেই মৃত্যু ছিল না, সেই যে মৃত্যু মৃত্যুর উদ্দেশ্যে নয় বরং ঈশ্বরের গৌরবার্থে। প্রভু বলেন, এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরের পুত্র গৌরবান্বিত হন (ক)। সুতরাং, যা কান্নার শোক জাগায়, তা ঈশ্বরের গৌরবার্থে সেই মৃত্যু নয়। কিন্তু যখন লাজার মরলেন তখন তিনি যে দূরে ছিলেন, এতেও কান্নার প্রয়োজনীয়তা নয়, কেননা তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন, লাজার মারা গেছে, এবং সেখানে ছিলাম না বলে আমি তোমাদের জন্য খুশি, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার (খ)। প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসের জন্য উপকারী তাঁর সেই দূরে থাকাটা তাঁর কান্নার কারণ ছিল না, কারণ নিজের ঐশ্বরিক চেতনা দ্বারা তিনি দূরে থাকলেও অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর কথা

আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে কাঁদবার আর বাকি কোন কারণ নেই, কিন্তু তবুও তিনি কাঁদলেন। তাছাড়া আমি জিজ্ঞাসা করি: সেই কান্না কার উপরে আরোপণীয়? ঈশ্বরের উপরেই কি? নাকি প্রাণের উপরে? নাকি দেহের উপরেই আরোপণীয়? কিন্তু দেহ শোকার্ত প্রাণজনিত কষ্টের জন্য যে অশ্রু ফেলে, সেই অশ্রু ছাড়া নিজে থেকে তার অন্য কোনও অশ্রু নেই। যিনি লাজারে গৌরবান্বিত, সেই ঈশ্বর যে কাঁদলেন তা তো আরও বেশি কম গ্রহণযোগ্য ধারণা। অন্যদিকে, খ্রিস্টের প্রাণ যে লাজারকে সমাধিগুহা থেকে ডাকে (গ), ও সেই আঞ্জায় ও তাঁর দেহের সঙ্গে যুক্ত প্রাণের প্রতাপে যে লাজারের যে প্রাণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল সেই প্রাণ সেই মৃত দেহে ডাকা হলো, তেমনটা বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। যিনি গৌরবান্বিত হতে যাচ্ছেন, তিনি কি শোকার্ত হতে পারেন? যিনি জীবন ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন, তিনি কি কাঁদতে পারেন? যিনি জীবন দিতে যাচ্ছেন তাঁর পক্ষে অশ্রুজল মানায় না, যিনি গৌরবান্বিত হতে যাচ্ছেন তাঁর পক্ষেও শোক মানায় না; কিন্তু তবুও যিনি কাঁদলেন ও শোক করলেন তিনিই জীবন দান করেন।

৫৭। আমরা যে বহু বিষয়ে অল্প কথা বলি, এর কারণ এ নয় যে সেবিষয়ে আলোচনা করার মত বেশি কিছু নেই বা সেই বক্তব্য ক্ষেত্রে আমরা অজ্ঞ, কিন্তু কারণটা এটা হলো যে, আমরা ইচ্ছা করি, দীর্ঘ আলোচনা এড়ালে বিষয়গুলো আরও আকর্ষণীয় হবে। প্রভু এমন কিছু করেন ও এমন বিষয়ে কথা বলেন যা ক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট চেতনা নেই, যা ক্ষেত্রে আমরা অজ্ঞ না হলেও তবু বুঝতে অক্ষম কারণ ঘটনাগুলো বাস্তব কিন্তু একইসময়ে যে প্রভাব সেগুলোকে নিরূপণ করে তা রহস্যময়, যেইভাবে আমরা তাঁর এই বাণী ভিত্তি করে অধিক স্পষ্টভাবে দেখাব, পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আঞ্জা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি (ক)। তিনি নিজে থেকেই প্রাণ বিসর্জন দেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি: কে তা বিসর্জন দেন? খ্রিস্ট যে বাণী-ঈশ্বর এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই; অন্যদিকে, ঈশ্বরের পুত্র যে প্রাণ ও দেহ বিশিষ্ট তা বিষয়ে আমরা অজ্ঞ নই,

কারণ ব্যাপারটা যোসেফকে উদ্দেশ্য করা দূতের এবাণীও সপ্রমাণ করে, ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে করে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা শিশুটির প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তারা মারা গেছে (খ)। আমি জিজ্ঞাসা করি এই প্রাণ কার্: তাঁর দেহের প্রাণ নাকি ঈশ্বরের প্রাণ? প্রাণটা যদি তাঁর দেহেরই প্রাণ তবে, যখন দেহ কেবল জীবনের দিকে প্রাণের কাজের দ্বারাই চালিত তখন প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ক্ষেত্রে দেহ কি অধিকার রাখে? তাছাড়া, প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন দেহ যখন জড় ও মৃত, তখন কেমন করে সেই দেহ একটা আঞ্জা পেতে পারল? এমন কেউ থাকলে যে এটা ভাববে, বাণী-ঈশ্বরই প্রাণ ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রাণ দিলেন, তবে সে এটা প্রমাণ করুক যে বাণী-ঈশ্বর মরে গেলেন অর্থাৎ তিনি একটা লাশের মত চেতনাহীন ও জীবনবিহীন হলেন যেহেতু জীবিত হবার জন্য আর একবার নিজের প্রাণ নিলেন যাতে সেই প্রাণের দ্বারা পুনরায় জীবনে চালিত হন।

৫৮। কিন্তু যে কেউ যুক্তিসম্পন্ন, সে কখনও ঈশ্বরকে একটা প্রাণ আরোপ করবে না যদিও লেখা রয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রাণ শাব্দাৎ ও অমাবস্যা ঘৃণা করে ও তাছাড়া কোনও একটা বিষয়ে প্রসন্ন (ক)। কিন্তু এটা প্রথাসিদ্ধই একটা কথা যা অন্য অর্থে ধারণযোগ্য, যেইভাবে তখনই হয় যখন আমরা অশরীরী ঈশ্বরকে হাত, চোখ, আঙুল, বাহ ও হৃদয়কে আরোপ করি। প্রভুর নিজের বাণী অনুসারে আত্মার হাড়-মাংস নেই (খ), সুতরাং যিনি আছেন ও যাঁর কোন পরিবর্তন নেই (গ), নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাঁর পক্ষে দৈহিক অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গগুলো মানায় না, তিনি বরং অশরীরী ও সুখবিশিষ্ট একটা স্বরূপ, একক এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা যা সবই আলিঙ্গন করেন। সুতরাং দেহগুলোর বেলায় যেমন ঘটে তেমনি ঈশ্বরও যে নিজের অভ্যন্তরে সক্রিয় প্রাণের কর্মশক্তি দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্যে চালিত, তা নয়, তিনি নিজেই বরং নিজের কাছে জীবন।

৫৯। তবে কেমন করে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন ও পুনরায় সেই বিসর্জন দেওয়া প্রাণকে ফিরিয়ে নেন? অথবা, এই আঞ্জার অর্থ কি? ঈশ্বর তো মৃত্যুর উদ্দেশ্যেও প্রাণ বিসর্জন দেন না, জীবনের উদ্দেশ্যেও তা ফিরিয়ে নেন না। কিন্তু দেহও তা ফিরিয়ে নেবার আঞ্জা পায় না, কারণ তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার নেই। কেননা নিজের

দেহ-মন্দির বিষয়ে তিনি বললেন, এই মন্দির ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব (ক)। সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বর নিজের দেহ-মন্দির উত্তোলন করেন। এবং নিজের প্রাণ ফিরিয়ে নেবার জন্য কে তা বিসর্জন দেন? দেহ তো তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার রাখে না, বরং দেহটা ঈশ্বর দ্বারা পুনরুত্তোলিত হয়। সুতরাং যে মৃত তাকেই পুনরুত্তোলিত করা হয়, ও যে জীবিত সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয় না। তাই ঈশ্বর মৃত নন ও তাঁকে সমাধিও দেওয়া হয়নি, অথচ তিনি বললেন, আমার দেহে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে সে আমার সমাধির লক্ষ্যেই একাজ করল (খ)। তাঁর দেহে সেই সুগন্ধি তেল ঢালাটা তাঁকে সমাধি দেবার জন্যই হয়েছিল। এবং ‘তাঁর’ বলতে ‘তাঁকে’ বোঝায় না। এবং তাঁর সমাধির লক্ষ্যেই কাজ করা বলতে ও তাঁর দেহে সুগন্ধি তেল ঢালা বলতে এক জিনিস নয়; এবং তাঁর দেহকে সমাধি দেওয়া হল ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল বাক্য দু’টোর অর্থ এক নয়।

৬০। ঐশ্বরিক রহস্যের প্রকৃত উপলব্ধি এ: সেই খ্রিষ্টে মানুষের বিষয়ে অজ্ঞ না হয়ে ঈশ্বরকে দেখা (ক), ও ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞ না হয়ে মানুষকে দেখা; খ্রিষ্ট থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন না করা, কারণ বাণী হলেন মাংস; তাঁকেই সমাহিত বলে গণ্য না করা যিনি—তুমি তো একথা ভালই জান—তাঁকে পুনরুত্তোলিত করেছেন; তাঁকেই পুনরুত্তোলিত বলে সন্দেহ না করা যাঁর সমাধি তুমি অস্বীকার করতে দুঃসাহস কর না। যিশু খ্রিষ্টকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল ঠিক একারণেই যে তিনি মারা গেছিলেন। কিন্তু যিনি মরলেন তিনি আবার সে-ই যিনি মৃত্যুশ্রমে বললেন, ‘ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?’ তবে, যিনি সেই বাণী উচ্চারণ করলেন তিনি আবার সে-ই যিনি বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে (খ), ও পরমদেশে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি করতে করতে জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই। আর এই বলে তিনি আত্মা বিসর্জন দিলেন (গ)।

৬১। তবে, তোমরা যারা খ্রিষ্টকে তিন ভাগে তথা বাণী, প্রাণ ও দেহে বিভক্ত কর, ও তোমরাও যারা সেই সব তথা খ্রিষ্ট, ঈশ্বর ও বাণীকে আমাদের মানবজাতির সাধারণ একটামাত্র মানুষে সঙ্কুচিত কর, সেই তোমরা মহা ধর্মভক্তির সেই রহস্যকে প্রকাশ কর

যা মাংসে আবির্ভূত হলো (ক)। আমাদের বল, খ্রিষ্ট কোন্ আত্মা সঁপে দিলেন? কে নিজের আত্মা পিতার হাতে তুলে দিলেন? কে সেই একই দিনে পরমদেশে ছিলেন? কে অভিযোগ জানিয়ে বললেন, তিনি ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত? কেননা পরিত্যক্ত হওয়ার অভিযোগ মরণাপন্নজনের দুর্বলতা দেখায়, কিন্তু পরমদেশের প্রতিশ্রুতি জীবনময় ঈশ্বরের রাজকীয় অধিকার দেখায়। নিজের আত্মা তুলে দেওয়া তাঁরই আত্মা প্রকাশ করে যিনি তুলে দেন, নিজের আত্মা সঁপে দেওয়া প্রকাশ করে মরণাপন্নজনের প্রস্থান। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, কে মরছেন? অবশ্যই তিনি যিনি নিজের আত্মা সঁপে দেন। আরও, কে নিজের আত্মা সঁপে দেন? অবশ্যই, তিনি যিনি পিতার হাতে নিজের আত্মা তুলে দিয়েছেন। এবং যিনি নিজেকে তুলে দিয়েছেন তিনি যদি সেই একই ব্যক্তি যিনি নিজের আত্মা সঁপে দিয়ে মরে গেছেন, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, দেহটাই কি প্রাণকে তুলে দেয়? নাকি ঈশ্বরই দেহের প্রাণ তুলে দেন? কেননা এটা জানা কথা যে, ‘আত্মা’ শব্দটা দিয়ে প্রায় প্রাণকে নির্দেশ করা হয়; এবং এটা আমাদের উল্লিখিত কথায়ও প্রকাশ পায়, অর্থাৎ, যখন যিশু মরতে উদ্যত ছিলেন তিনি নিজের আত্মা সঁপে দিলেন। তাই, এমন কেউ থাকলে যে এসিদ্ধান্ত সমর্থন করবে যে দেহটাই প্রাণকে তুলে দিল, যা বিলীন হবার জন্য নিরূপিত তা-ই তা তুলে দেয় যা জীবনময়, যা ক্ষয়শীল তা-ই সনাতনকে তুলে দেয়, যার পুনরুত্থান করার কথা তা-ই তা তুলে দেয় যা অপরিবর্তনীয়, তবে তেমনটা হলে, যিনি পিতার হাতে নিজের আত্মা তুলে দিয়েছেন যেহেতু তাঁর অবশ্যই সেই একই দিনে সেই অপকর্মার সঙ্গে পরমদেশে অবস্থান করার কথা ছিল, সেজন্য আমি এটাও জানতে চাই, যখন সমাধিগুহা তাঁকে গ্রহণ করল, তখন তিনি কি পরমদেশে অবস্থান করছিলেন? এবং তিনি যখন পরমদেশে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি কি ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন?

৬২। সেই মাংস-হওয়া বাণী সেই এক ও একই প্রভু যিশু খ্রিষ্টই আছেন যিনি এসমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। যখন তিনি বলেন, তাঁকে মৃত্যুর হতে ফেলে রাখা হয়েছে তখন তিনি মানুষ, কিন্তু যেসময়ে তিনি মানুষ সেই একই সময়ে তিনি ঈশ্বর বলে পরমদেশে রাজত্ব করেন; আরও, যেহেতু তিনি পরমদেশে রাজত্ব করেন, সেজন্য ঈশ্বরের পুত্র বলে পিতার কাছে নিজের আত্মা তুলে দেন, সেইভাবে যেভাবে মানবপুত্র

যে আত্মাকে পিতার কাছে তুলে দিয়েছেন সেই আত্মাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেন। তবে, যা রহস্য, তা আমরা কেন অবমাননা বলে গণ্য করি? তুমি এজন্যই তাঁকে এই অভিযোগ জানাতে শুনতে পাচ্ছ যে তাঁকে মৃত্যুর হাতে পরিত্যক্ত করা হয়েছে, কারণ তিনি মানুষ; তাঁর মৃত্যুক্ষেণে তুমি এজন্যই তাঁকে একথা ঘোষণা করতে শুনতে পাচ্ছ যে তিনি পরমদেশে রাজত্ব করছেন, কারণ তিনি ঈশ্বর। যা তিনি নিজের মৃত্যুর কথা বোঝাবার জন্য উচ্চারণ করেছেন, আমরা কেন অভক্তিময় লক্ষ্যে শুধু সেই বাণীই মনে রাখি ও একইসময়ে, যা তিনি নিজের অমরতার প্রমাণ স্বরূপ ঘোষণা করেছেন সেবিষয়ে নীরব থাকি? যখন তিনি পরিত্যক্ত হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ জানান ও যখন নিজের রাজকীয় অধিকার ঘোষণা করেন, তখন যদি সেই কণ্ঠও তাঁরই ও সেই বাণীসকলও তাঁরই, তাহলে অবিশ্বাসের যুক্তি পালন করে কেন আমরা আমাদের বিশ্বাস দু'ভাগে বিভক্ত করি ও এটা অস্বীকার করি যে যিনি মরেছেন তিনি একই সময়ে সে-ই যিনি রাজত্ব করেন? তিনি নিজেই তো উভয় বিষয়ে তখনই সাক্ষ্য দিলেন যখন নিজের আত্মা তুলে দিলেন ও যখন তা ত্যাগ করলেন। অন্যদিকে, যিনি নিজের আত্মা তুলে দেন ও যিনি তা সঁপে দেন যখন তিনি এক, ও তিনি রাজত্ব করা সত্ত্বেও মরেন ও মরলেও রাজত্ব করেন, তখন মানবপুত্র ও ঈশ্বরের পুত্র সংক্রান্ত রহস্য আমাদের স্পর্শই দেখায় যে, যিনি রাজত্ব করতে করতে মরেন ও যিনি মৃত্যুবরণ করতে করতে রাজত্ব করেন তিনি এক।

৬৩। সুতরাং, যারা ভক্তিহীন ও ঈশ্বরের রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম, সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা সবাই সরে যাক। তারা তো জানে না যে খ্রিষ্ট নিজের জন্য নয় আমাদেরই জন্য কাঁদেন কারণ মানুষদের স্থায়ী ভাবাবেগ মেনে নেওয়ায় তাঁর ধারণ করা মনুষ্যত্বকে সত্যকার বলে সপ্রমাণ করতে ইচ্ছা করেন। তারা এটা জানে না যে খ্রিষ্ট নিজের জন্য নয় কিন্তু আমাদেরই জীবনের জন্য মরেন কারণ তিনি অমর ঈশ্বরের মৃত্যু দ্বারা মরণশীলদের জীবনকে নবীকৃত করতে বাসনা করেন। তারা পরিত্যক্তজনের অভিযোগ ও রাজত্বকারী জনের আস্থা নির্ণয় করতে অক্ষম, যার ফলে বুঝতে পারে না যে যিনি ঈশ্বর বলে রাজত্ব করেন ও মরতে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ জানান তিনি একাধারে হলেন সেই মানুষ যিনি মরেছেন ও সেই ঈশ্বর যিনি রাজত্ব করেন; যিনি মরেন তিনি সেই রাজত্বকারী ছাড়া অন্য কেউ নন, যিনি নিজের আত্মা তুলে দেন তিনি

সেই আত্মা-সমর্পণকারী ছাড়া অন্য কেউ নন, যিনি সমাহিত হন তিনি সেই পুনরুত্থিতজন ছাড়া অন্য কেউ নন, যিনি স্বর্গে আরোহণ করেন তিনি সেই অবরোহণকারী ছাড়া অন্য কেউ নন।

৬৪। এক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসের কথা শোন যা প্রেরিতদূতের শিক্ষাদানে উপস্থাপিত, এমন বিশ্বাস যা মাংসময় উপলব্ধির উপরে নয় কিন্তু [পবিত্র] আত্মার দানের উপরে স্থাপিত। সেই যে গ্রীকেরা প্রজ্ঞা দাবি করে, ও সেই যে ইহুদীরা চিহ্ন দাবি করে, তাদের তিনি বলেন, কিন্তু আমরা এমন দ্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহুত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে তিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (ক)। খ্রিস্ট কি বিভক্ত, যার ফলে দ্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট হলেন একজন ও ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা সেই খ্রিস্ট হলেন অন্যজন? কিন্তু এটা ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের পক্ষে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আমাদের কাছে যিশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, কিন্তু এমন প্রজ্ঞা যা জগতের কাছে অজানা ও এযুগের প্রজ্ঞাবানদের কাছে উপলব্ধ নয়। এবং এই প্রজ্ঞা যে কত কমই উপলব্ধ হয়েছে, তা তুমি সহজে জানতে পার, কারণ ধন্য প্রেরিতদূত নিজেই বলেন, কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে দ্রুশে দিত না (খ)। তবে, এই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা যে রহস্যেই গুপ্ত ও এযুগের শাসনকর্তাদের দ্বারা জ্ঞাত হতে পারে না, প্রেরিতদূত কি তা জানেন না? তিনি কি খ্রিস্টকে এমনভাবে বিভক্ত করেন যার ফলে একজন হলেন গৌরবের প্রভু ও অন্যজন হলেন দ্রুশবিদ্ধ যিশু? না, তিনি বরং এই মূর্খ ও অভক্তিময় অভিমত প্রতিবাদ করে বলেন, আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিস্টকে ছাড়া, দ্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিস্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু জানব না (গ)।

৬৫। [উপরের কথা ছাড়া] প্রেরিতদূত অন্য কিছু জানেন না ও মনে স্থির করেন, অন্য কিছু জানবেন না; কিন্তু ক্ষীণ বুদ্ধি ও আরও বেশি ক্ষীণ বিশ্বাসের মানুষ এই আমরা, যা

অজ্ঞাত সেবিষয়ে নিজেদের বিচারক বানিয়ে ও সেই গুপ্ত রহস্য বিষয়ে নিজেদের ঈশ্বরনিন্দুক ক'রে যিশু খ্রিস্টকে ছিঁড়ে ফেলি, তাঁকে বিভক্ত করি, তাঁকে দ্বিবিধ করি, কারণ আমাদের জন্য দ্রুশবিদ্ধ যিশু একজন ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই খ্রিস্ট অন্য একজন; সমাহিত খ্রিস্ট একজন, স্বর্গ থেকে নেমে আসা খ্রিস্ট অন্য একজন; মানবপুত্র খ্রিস্ট একজন, ঈশ্বরের পুত্র খ্রিস্ট অন্য একজন। আমরা না বুঝে শেখাই ও না জেনে অস্বীকার করি, এবং মানুষ মাত্র যে আমরা ঈশ্বরের বাণী সংস্কার করি। এবং প্রেরিতদূতের অনুসরণ করে একথা বলতেও তুষ্ট নই, ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রিস্ট যিশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন (ক)। যিনি আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখেন, তিনি কি, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, তাঁর থেকে ভিন্ন? অথবা, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, তিনি কি সেই একই নন যিনি পুনরুত্থান করেছেন? অথবা, যিনি পুনরুত্থান করেছেন, তিনি কি, যিনি মরেছেন, তাঁর থেকে ভিন্ন? অথবা, যিনি মরেছেন, তিনি কি, যিনি দণ্ডিত করেন, তাঁর থেকে ভিন্ন? অথবা, যিনি দণ্ডিত করেন, তিনি কি, যিনি ঈশ্বর বলে ধর্মময় করে তোলেন সেই একই ঈশ্বর নন? তবে যদি পারি, তাহলে এসো, দণ্ডদানকারী খ্রিস্টকে ধর্মময়তা-দানকারী ঈশ্বর থেকে, যিনি মরেছেন সেই খ্রিস্টকে দণ্ডদানকারী খ্রিস্ট থেকে, যিনি ডান পাশে আসীন ও আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন সেই খ্রিস্টকে যিনি মরেছেন সেই খ্রিস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করি। তবে, যখন একই ও একমাত্র খ্রিস্ট হলেন এসব কিছু ও যখন মৃত একজন খ্রিস্ট ও সমাহিত অন্য একজন খ্রিস্ট নেই, যখন পাতালে নেমে যাওয়া এমন একজন খ্রিস্ট ও স্বর্গে আরোহণ করেন এমন অন্য একজন খ্রিস্ট নেই (কেননা প্রেরিতদূত বলেন, তিনি আরোহণ করলেন, এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের উর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন (খ)), তখন আমরা আর কত দূরেই আমাদের অভক্তির চিহ্ন স্বরূপ আমাদের সেই মূর্খ বকাবকির অজ্ঞতা টানব ও যা কিছু ঐশ্বরিক রহস্যে নিহিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে

পারি বলে ঘোষণা করব? যিনি অবরোহণ করেছেন তিনি সেই একই যিনি আরোহণ করেছেন। আমরা এমনটা কি সন্দেহ করতে পারি যে, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন ও সমস্ত স্বর্গের উর্ধ্বে আরোহণ করেন, সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন নন? আমরা কি এমনটা বলব যে, সমাধিগুহায় শায়িত সেই দেহই পাতালে অবরোহণ করল? সুতরাং, যখন যিনি অবরোহণ করলেন তিনি সেই একই যিনি আরোহণ করলেন, যখন বিশ্বাস করি যে দেহটা পাতালে অবরোহণ করেনি, যখন এটা সন্দেহ করি না যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তাঁর দেহ স্বর্গে আরোহণ করল, তখন, জগতের কাছে ও যুগের শাসনকর্তাদের কাছে অজ্ঞাত সেই গুপ্ত রহস্যে বিশ্বাস করা ছাড়া বাকি আর কি রয়েছে? অর্থাৎ, যিনি অবরোহণ করেন ও যিনি আরোহণ করেন তিনি যে এক ও একই যার ফলে সেই যিশু খ্রিষ্ট যে আমাদেরও জন্য একক ব্যক্তি; তিনি যে একাধারে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবপুত্র, বাণী-ঈশ্বর ও মাংসে মানুষ; তিনি যে যন্ত্রণাভোগ করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন, সমাহিত হলেন, পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে গৃহীত হলেন ও ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন, এসমস্ত বিশ্বাস করা ছাড়া বাকি আর কি রয়েছে? ঐশ্বরিক ব্যবস্থা ও ঐশ্বরিক স্বরূপের ফলে যিনি ঈশ্বরের রূপে ও দাসের রূপে এক ও একই, তাঁর মধ্যে যে বিনা বিচ্ছেদে ও বিনা বিভাজনে মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব রয়েছে, তা বিশ্বাস করা ছাড়া বাকি আর কি রয়েছে?

৬৬। তাই, আমাদের অসতর্ক ও অজ্ঞ ধারণার জন্য উপযোগী সত্য উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রেরিতদূত এই বিশ্বাসের রহস্য বিষয়ে একথা বলেন, তিনি তাঁর দুর্বলতার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন **(ক)**। প্রেরিতদূত মানবপুত্রকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা ক'রে—তিনি পরিত্রাণ-ব্যবস্থা গুণে মানুষ কিন্তু তাঁর অনন্তকালস্থায়ী স্বরূপ গুণে তিনি ঈশ্বর—এটা বলেন যে, নিজের দুর্বলতার কারণে যিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন তিনি সেই একই যিনি নিজের ঐশ্বরিক পরাক্রমের ফলে জীবিত হয়ে আছেন। সেই দুর্বলতা হলো দাসের রূপের ফলাফল, অনন্তকালস্থায়ী স্বরূপ হলো ঈশ্বরের রূপের ফলাফল। যেহেতু ঈশ্বরের রূপে হয়েও তিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন, সেজন্য, তিনি যে যন্ত্রণাভোগ করলেন ও একইসময়ে অনন্তকালস্থায়ী হয়ে জীবিত হয়ে আছেন এরহস্য বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে

না। তাঁর মধ্যে কষ্টভোগ করার দুর্বলতা ও ঈশ্বরের স্বকীয় গুণ তথা জীবন দান করার পরাক্রম দু'টোই সমানভাবে ছিল, সেজন্য যিনি কষ্টভোগ করেন ও অনন্তকালস্থায়ী হয়ে জীবিত হয়ে আছেন, তিনি একমাত্র ও অবিচ্ছেদ্য না হয়ে পারেন না।

৬৭। মানুষ যত যজ্ঞগা ভোগ করতে পারে, একমাত্র জনিত ঈশ্বর তা সবই সত্যিকারে ভোগ করলেন। কিন্তু এসো, প্রেরিতদূতের সাক্ষ্য ও বাণী ব্যবহার করি, ‘তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন (ক)। প্রেরিতদূত ভ্রান্তিতে চালনা করতে পারে এমন অসতর্ক কথা ব্যবহার করেননি, কিন্তু আমাদের সতর্ক করলেন যেন কথার অসারতা দ্বারা তত নয় বরং শাস্ত্রের অধিকার দ্বারাই সেই মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিচার-বিবেচনা করি যাতে করে আমরা তাঁর মৃত্যুকে শাস্ত্রের দেওয়া সঠিক অর্থ অনুসারেই উপলব্ধি করতে পারি। বিশ্বাস ক্ষেত্রে যেন কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য তিনি সেবিষয়ে কোনও অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ না রাখার জন্য তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘোষণার সঙ্গে ‘শাস্ত্র অনুযায়ী’ এই মহৎ শেষ কথাও যোগ করলেন। তিনি এমনটা করলেন পাছে আমরা শূন্য তর্কাতর্কির অসারতা দ্বারা চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বা অকেজো সমস্যার মূর্খ কুটিলতা দ্বারা জড়িত হয়ে অস্থির হই। তিনি বরং ইচ্ছা করছিলেন, সবসময় অক্ষত হয়ে থেকে বিশ্বাস নিজের ভক্তি-বন্দরে আশ্রয় পাবে অর্থাৎ মানবপুত্র ও ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থান শাস্ত্র অনুযায়ীই বিশ্বাস ও স্বীকার করবে। বিপক্ষদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভক্তির রক্ষা অর্পিত, কারণ আমাদের পক্ষে খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা সেইভাবেই বোঝা উচিত যেভাবে শাস্ত্রে তা উপস্থাপন করে। বিশ্বাসের জন্য কোন বিপদ নেই, ও ঈশ্বরের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত ভক্তিময় প্রতিটি স্বীকারোক্তি নিরাপদ। খ্রিস্ট কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হলেন। খ্রিস্ট কাঁদলেন, কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ীই কাঁদলেন (খ); তাই সেই কান্নায় আনন্দের একটা কারণ ছিল (গ)। খ্রিস্টের ক্ষিধে পেয়েছিল, কিন্তু, শাস্ত্র অনুযায়ী, খাদ্য না থাকায়, তিনি ঈশ্বরের পুত্র অবস্থায় ফলহীন সেই গাছের বিরুদ্ধে তাঁর সেই অধিকার ব্যবহার করলেন। খ্রিস্ট যজ্ঞগাভোগ করলেন,

কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি পরাক্রমের ডান পাশে আসীন হতে যাচ্ছিলেন। তিনি মৃত্যুর হাতে পরিত্যক্ত হচ্ছিলেন বলে অভিযোগ জানানেন, কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি সেসময়ে সেই অপকর্মাকে পরমদেশের রাজ্যে নিজের সঙ্গে গ্রহণ করলেন যিনি তাঁকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি মরলেন, কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী পুনরুত্থান করলেন ও প্রভুর ডান পাশে আসন নিলেন। এই রহস্যের প্রতি বিশ্বাসে রয়েছে জীবন: এই স্বীকারোক্তি কোনও অপবাদ-অপব্যখ্যা গ্রাহ্য করে না।

৬৮। প্রেরিতদূত এমন সন্দেহ করার স্থান আদৌ রাখেন না যার জন্য আমরা বলি, খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন, যন্ত্রণাভোগ করলেন, মরলেন, পুনরুত্থান করলেন, কিন্তু তিনি কেমন করে, কেমন অধিকারে ও কোন্ কোন্ ভাগে বিভক্ত হয়ে? কে কাঁদেন, কে আনন্দ করেন, কে অভিযোগ জানান, কে অবরোহণ করেন, কে স্বর্গে আরোহণ করেন? এমনকি, এক্ষেত্রে তিনি এটা বুঝিয়ে দেন যে, বিশ্বাসের যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে দ্বিধামুক্ত ভক্তির স্বীকারোক্তিতেই রয়েছে; তিনি বলেন, কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে তিনি এ ধরনেরই কথা বলেন, মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে আরোহণ করেছে? অর্থাৎ, খ্রিষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে আরোহণ করেছে? একথাও বলো না, কে অতল গহ্বরে নেমে গিয়েছে? অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে অতল গহ্বরে নেমে গিয়েছে? আসলে শাস্ত্র কী বলে? সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে। অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে (ক)। বিশ্বাস ধার্মিক মানুষকে পূর্ণ করে তোলে, যেইভাবে লেখা আছে, আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (খ)। যখন ঈশ্বর তাঁকে বিজাতীয়দের উত্তরাধিকার ও বংশধরদের বিষয়ে তারকারাজির ও বালুকণার মত মহৎ সংখ্যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, তখন আব্রাহাম কি প্রভুর এই বাণীতে অপবাদ তুললেন? যেহেতু ভক্তিময় বিশ্বাস ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে সন্দেহ করে না, সেজন্য তা মানব দুর্বলতার স্বকীয় সীমার বন্দি নয়, কিন্তু সেই বিশ্বাস নিজেতে যা নশ্বর ও পার্থিব তা অবজ্ঞা করে ও ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখে যদিও

সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের দৈহিক স্বরূপের সাধ্য অতিক্রম করে। যে নিয়মবিধি মানুষকে শাসন করে, সেগুলো কোনও মতেই ঐশ্বরিক পরাক্রমসমূহের পরিমাপ দিতে পারে না, কেননা মঙ্গল সাধনে ঈশ্বর তত মহৎ বদান্যতা দেখান যত মহৎ হলো প্রতিশ্রুতি দানে তাঁর মঙ্গলময়তা। সুতরাং বিশ্বাসের চেয়ে আরও বেশি ধর্মময় বলতে আর কিছুই নেই। মানব কর্মকাণ্ডে সাম্য ও আত্মসংযম অবশ্যই সম্মতির যোগ্য, কিন্তু মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের অসীম অধিকার স্বীকার দ্বারা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসের চেয়ে আরও বেশি ধর্মময় বলতে আর কিছুই নেই।

৬৯। বিশ্বাস থেকে আগত এই ধর্মময়তাকে আমাদের সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে প্রেরিতদূত সেই অবিশ্বাস বাতিল করে দিলেন যা অনিশ্চিত ও অবিশ্বাসযোগ্য দ্ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে। নবীর (ক) বাণীর অধিকারও মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি মনে মনে উদ্বেগপূর্ণ দুশ্চিন্তা স্থান দিতে নিষেধ করলেন। কেননা তিনি বলেন, ‘মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে আরোহণ করেছে?’ প্রেরিতদূত নবীর এ বাণী দ্বারা ব্যক্ত এই ধারণা এটা যোগ করে পূর্ণ করেন, ‘অর্থাৎ, খ্রিস্টকে নামিয়ে আনবার জন্য’। মানবীয় মনের অনুভূতি ঐশ্বরিক বিষয় জ্ঞানে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু অন্যদিকে ভক্তিময় বিশ্বাস ঈশ্বরের কর্ম বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। খ্রিস্টের এমন দরকার ছিল না মানবীয় কোনও শক্তি তাঁকে সাহায্য করবে, এমন কোনও একজনের দরকারও ছিল না যে স্বর্গে গিয়ে উঠে তাঁকে তাঁর নিজের সুখের আসন থেকে দেহে নামিয়ে দেবে; তাঁকে পৃথিবীতে আনবার জন্য বাহ্যিক কোনও শক্তি আদৌ দরকার হয়নি। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, তিনি সেইভাবে এসেছেন যেভাবে এসেছেন। সত্যকার ভক্তি এই স্বীকারেই রয়েছে যে, খ্রিস্টকে পৃথিবীতে আনা হয়নি, কিন্তু তিনি নিজে নেমে এলেন। তাঁর আসার কাল সংক্রান্ত হোক বা তাঁর আগমনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত হোক সেই রহস্যকে একাই তিনি জানেন। যেহেতু তিনি অল্পদিন আগে পৃথিবীতে এসেছেন এজন্য আমাদের এমনটা মনে করতে নেই যে তাঁকে কারও দ্বারা আনা হয়েছে বা এমনটাও ভাবতে নেই যে কালের সীমায় তাঁর আগমন এমন একজনের অধিকারের উপর নির্ভর করেছিল যে তাঁকে নিচে চালনা করেছে। কিন্তু প্রেরিতদূত আরও একটা দ্ব্যর্থতায় স্থাপিত অবিশ্বাসকেও মানেন না; কেননা তিনি অবিলম্বে নবীর এবাণী উপস্থাপন করেন, ‘কে অতল গহ্বরে নেমে

গিয়েছে?’ এবং সাথে সাথে উক্তির অর্থ যোগ করেন, ‘অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য’। স্বর্গে ফিরে যাবার তাঁর স্বাধীনতা পৃথিবীতে নেমে আসার তাঁর স্বাধীনতা থেকে আগত। তাতে সন্দেহজনিত সমস্ত দ্বিধা বাতিল করা হলো: আমাদের জ্ঞান বিশ্বাসে, বিশ্বাসের যুক্তি ঈশ্বরের পরাক্রমে, পরাক্রমের ফলাফল বস্তুতে, বস্তুগুলোর আদি কারণ সর্বশক্তিমত্তায় স্থিত রয়েছে।

৭০। কিন্তু এই লক্ষ্যে দৃঢ় নিশ্চয়তা চাই। শাস্ত্রের গোটা রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, ‘সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে’। স্বীকারোক্তির কথা ধীর ও দীর্ঘকালীন হতে নেই; তাছাড়া হৃদয়-মন ও মুখের মধ্যে কোনও ব্যবধান যেন না থাকে, পাছে আমাদের ভক্তি বিষয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য যে বাণী আমাদের উচ্চারণ করতে হয়, সেই বাণী অবিশ্বাসীদের চালাকি বলে গণ্য হয়। কিন্তু সেই বাণী আমাদের নিকটবর্তী ও আমাদের অন্তরেও থাকা চাই। হৃদয়-মন ও মুখের মধ্যে যেন কোনও অমিল না থাকে, সেই বাণী বরং আমাদের ধর্মভাবের অনুরূপ হোক; মুখ ও হৃদয়-মনের মধ্যেও যেন মিল থাকে ও উভয়ই যেন মনোভাবে ও কথায় অটল বিশ্বাস ব্যক্ত করে। আর আসলে প্রেরিতদূত যেভাবে অন্য ক্ষেত্রে, সেইভাবে এক্ষেত্রেও নবীর বাণীর ব্যাখ্যা যোগ করলেন, ‘অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে’। তবে ভক্তি সন্দেহ-বিতাড়ণে, ধর্মময়তা বিশ্বাসে, পরিত্রাণ স্বীকারেই স্থিত। দ্ব্যর্থতায় সময় নষ্ট না করা, নিরর্থক বলাবলিতে ব্যস্ত না থাকা, ঈশ্বরের পরাক্রম বিষয়ে তর্কাতর্কি না করা, তাঁর অধিকারে সীমা না রাখা, তাঁর সন্মানের অতীত রহস্যগুলোর যুক্তি অতিরিক্ত অনুসন্ধান না করা, বরং যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা ও ঈশ্বর যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন তা বিশ্বাস করা: এসমস্ত কিছুই পরিত্রাণ। তিনি যে প্রভু, যখন এই একমাত্র সত্যকে জানা-ই হলো পরিত্রাণ, তখন অভক্তির মনোভাবে খ্রিস্টের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচার করা, আহা, কেমন উন্মাদনা। আরও, ঈশ্বর যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, যখন অনন্ত জীবনের জন্য এটাই বিশ্বাস করা যথেষ্ট, তখন তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে বিবাদ উত্থাপন করা,

আহা, মানব অসারতার কেমন মতিভ্রম। সুতরাং, বিশ্বাস সরলতায়, ধর্মময়তা বিশ্বাসে, ভক্তি স্বীকারোক্তিতেই স্থিত। ঈশ্বর যে দুরূহ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সুখের জীবনে আহ্বান করেন তা নয়, তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের নানাবিধ কায়েদাও দাবি করেন না। আমাদের জন্য অনন্ততা অভিমুখে পথ স্পষ্ট ও সহজ: যিশুরে যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে তা বিশ্বাস করা, ও সেইসঙ্গে তিনি যে প্রভু তা স্বীকার করা। সুতরাং, আমাদের অজ্ঞতার খাতিরে যা কিছু বলা হয়েছে, নিজের অভক্তির অজুহাত হিসাবে কেউই যেন তা দখল না করে। কেননা যাতে আমরা যিশু খ্রিস্টে জীবিত হয়ে থাকতে পারতাম সেজন্য আমাদের এটা জানা দরকার ছিল যে, তিনি আমাদের জন্য মরেছিলেন।

৭১। তবে, যাতে আমরা এটা জানতে পারতাম যে তিনি [আমাদের জন্য] মরেছিলেন, সেজন্য যখন তিনি বললেন, ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন? (ক) ও পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই (ক), তখন হয় তো কি এমনটা হতে পারে যে আমাদের বিশ্বাসের জন্য চিন্তিত হয়ে তিনি আমাদের সন্দেহ বাতিল না করে বরং নিজের দুর্বলতা দেখিয়েছেন? বাস্তবিকই, যখন তিনি লাজারকে পুনরুত্থিত করতে উদ্যত, তখন পিতার কাছে প্রার্থনা করেন। যিনি বলেন পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই জন্য কথাটা বললাম, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ (গ), তাঁর পক্ষে কি প্রার্থনা করা দরকার ছিল? তাই তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন আমরা জানতে পারতাম তিনি ছিলেন পুত্র; এবং প্রার্থনার কথাগুলো যদিও তাঁর উপকারে আসছিল না, তবু তিনি আমাদের বিশ্বাসের উপকারার্থেই সেই কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন; তাই সেই পরিস্থিতিতে তাঁর কোনও সাহায্যের দরকার হয় না, কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য আমাদেরই সাহায্য দরকার। আরও, তিনি গৌরবান্বিত হবার জন্য প্রার্থনা করেন, ও সাথে সাথে স্বর্গ থেকে সেই পিতা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা হয় যিনি তাঁকে গৌরবান্বিত করেন। কিন্তু, যখন লোকের ভিড় সেই কণ্ঠে বিস্মিত হয়, তখন তিনি বলেন, এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল (ঘ)। পিতার কাছে প্রার্থনা আমাদেরই জন্য, পিতা আমাদের জন্য কথা

বলেন : সবকিছু ঘটে যেন আমাদের স্বীকারোক্তি উদিত হয়। যিনি গৌরবান্বিত করেন, যখন তাঁর উত্তর গৌরবের দাবিতে সাড়া দেবার জন্য নয়, কিন্তু শ্রোতাদের শিক্ষাদানের জন্যই মঞ্জুর করা হয়, তখন যখন খ্রিষ্ট কষ্টভোগেই তাঁর মহত্তম আনন্দ পান, তখন যন্ত্রণাভোগের বিষয়ে তাঁর যে অভিযোগ, সেটাও কি আমাদের গঠনার্থে ব্যক্ত বলে গণ্য হবে না? খ্রিষ্ট আপন নির্যাতকদের জন্য প্রার্থনা করেন কারণ তারা যা করেছে তা জানে না। খ্রিষ্ট ক্রুশ থেকে পরমদেশ দানের প্রতিশ্রুতি দেন কারণ ঈশ্বর বলে তিনি রাজত্ব করেন। সীকা পান করার পর সবই সিদ্ধ হয়েছে বলে খ্রিষ্ট ক্রুশের উপরে আনন্দিত, কারণ মৃত্যুক্ষণে তিনি ভাববাণীকে পূর্ণ করেছেন। তিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছেন, আমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, আমাদের জন্য পুনরুত্থান করেছেন। যখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ঈশ্বরের পুত্রকে স্বীকার করা-ই হলো একমাত্র আবশ্যকীয় শর্ত, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন এই অভক্তির অবস্থায় মরব? নিজের ঈশ্বরত্বের নিশ্চয়তায় যখন মৃত্যু বিষয়ে উদাসীন সেই খ্রিষ্ট তাঁর ধারণ করা মানব অবস্থা বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যুকে স্পষ্ট করেছেন, তখন যিনি আমাদের জন্য মানবপুত্র হলেন ও মরলেন, কেনই বা আমরা তাঁর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করার জন্য সেই ঈশ্বরের পুত্রের স্বীকারোক্তিকে প্রধান বিষয় বলে ব্যবহার করি?

২ (ক) ২ তি ৪:৩-৪।

(খ) ১ তি ৪:১-২।

৫ (ক) যোহন ১০:৩০।

৭ (ক) মথি ১:২৩।

(খ) যোহন ১৭:৫ দ্রঃ।

৮ (ক) ঐশ্বরিক নীরবতা-ব্যবস্থা হলো সেই গুপ্ত সঙ্কল্প যা দ্বারা ঈশ্বর মানুষদের কাছে বিচারের দিন গুপ্ত রাখবেন বলে উপযোগী মনে করেন।

৯ (ক) মথি ২৬:৩৮, ৩৯।

(খ) মথি ২৭:৪৬।

(গ) লুক ২৩:৪৬।

১০ (ক) মথি ১০:৩৮-৩৯।

(খ) মথি ১০:২৮ দ্রঃ।

১১ (ক) যোহন ১০:১৮ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৯:৩০ দ্রঃ।

১২ (ক) সাম ১৬:১০ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) যোহন ২:১৯ দ্রঃ

(গ) লুক ১৬:২৩ দ্রঃ।

১৫ (ক) বাণী যে দেহ ধারণ করলেন ও যে দেহে মানবপুত্র নিজেকে দৃশ্যমান করলেন, সেই দেহ কুমারী দ্বারা গড়া হয়েছিল। এধারণার মধ্য দিয়ে সাধু হিলারিউস লাওদিকেয়ার বিশপ আপল্লিনারিসের সমর্থিত ভ্রান্তমত খণ্ডন করতে অভিপ্রেত; এই ভ্রান্তমত অনুসারে, দেহধারণে বাণী কোন মানব প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না কিন্তু সরাসরিই একটা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন; অর্থাৎ, তাদের মতে, খ্রিষ্ট মানবদেহের অধিকারী হয়েও মানব-প্রাণের অধিকারী ছিলেন না।

১৬ (ক) যোহন ৩:১৩ লাতিন পাঠ্য।

১৭ (ক) ১ করি ১৫:৪৭ লাতিন পাঠ্য।

১৮ (ক) যোহন ৬:৫১ লাতিন পাঠ্য।

(খ) যোহন ৬:৫৩ লাতিন পাঠ্য।

২১ (ক) শেষ বাক্যের বিকল্প অনুবাদ: তাই, যিনি সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র তিনি সত্যকার মানবপুত্র বলে জন্ম নিলেন: এবং যেহেতু তিনি ঈশ্বর থেকে মানুষ বলে জন্ম নিলেন, সেজন্য ঈশ্বর থেকে মানুষ বলে জন্ম নিয়ে তিনি ঈশ্বর হওয়া শেষ করলেন না।

২২ (ক) প্রাণকে প্রজননের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষকে দেওয়া হয় না। সাধু হিলারিউস ২০ অধ্যায় মানব-উৎপত্তি ক্ষেত্রে স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘প্রতিটি প্রাণ হলো ঈশ্বরের কাজ, কিন্তু মাংস-প্রজনন সবসময় মাংস থেকে আগত’। এ বর্তমান বচনে তিনি অন্য একটা ভ্রান্তমত খণ্ডন করেন যা অনুসারে প্রাণ জনক-জননীর মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়।

২৩ (ক) মথি ১৭:১ প্রভৃতি দ্রঃ।

(খ) মথি ৮:১৫ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৯:৬ দ্রঃ।

২৫ (ক) ফিলি ২:৭-৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) রো ৮:৩।

২৭ (ক) মথি ১৬:২৩ দ্রঃ।

২৯ (ক) যোহন ১৩:৩১।

৩৪ (ক) লুক ২৩:৪৬।

(খ) লুক ২৩:৪৩।

(গ) সাধু হিলারিউসের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ সুস্পষ্ট।

৩৬ (ক) ‘মৃত্যু পর্যন্ত শোকার্ত’ উক্তির সাধারণ অর্থই যে সেই শোক অনির্বচনীয়; কিন্তু সাধু হিলারিউস এক্ষেত্রে সাময়িক অর্থ সমর্থন করেন অর্থাৎ এমন শোক যা মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী।

৩৭ (ক) মথি ২৬:৩৯।

(খ) মথি ২৬:৪০-৪২ লাতিন পাঠ্য।

৩৮ (ক) লুক ২২:৩১-৩২।

৩৯ (ক) মথি ২৬:৪২। উল্লেখ্য বিষয়: ‘হে আমার পিতা, আমি পান না করলে এ পাত্র সরে যেতে পারে না’ সাধু হিলারিউসের উল্লিখিত এই বচন গ্রীক ভাষার বচন থেকে ভিন্ন (হে আমার পিতা, আমি পান না করলে এ পাত্র যদি সরে যেতে না পারে, তবে...)।

৪০ (ক) মথি ২৬:৪৫।

৪২ (ক) যোহন ১৭:১১-১২ দ্রঃ। সাধু হিলারিউসের উপস্থাপিত এই পাঠ্যও গ্রীক বা লাতিন পাঠ্যের চেয়ে ভিন্ন।

(খ) মার্ক ১৩:৩১।

(গ) ২ করি ৫:১৭।

(ঘ) ১ করি ৭:৩১।

(ঙ) যোহন ১৮:৯।

৪৬ (ক) দা ১৪:৩০ ইত্যাদি দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ৫:৪১ দ্রঃ।

(গ) ২ তি ৪:৬, ৮ দ্রঃ।

৪৭ (ক) ইশা ৫৩:৪-৫ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ২ করি ৫:২০-২১।

৪৮ (ক) কল ২:১৩-১৪ লাতিন পাঠ্য।

৪৯ (ক) মথি ২৭:৪৬।

৫০ (ক) এ ভ্রান্তমত আপল্লিনারিস-পন্থীদের ও এউতিখিস-পন্থীদের দ্বারা সমর্থিত ছিল।

(খ) এ ভ্রান্তমত হেবিওন-পন্থীদের ও ফতিনুস-পন্থীদের দ্বারা সমর্থিত ছিল (৭ম পুস্তক ৭ অধ্যায় দ্রঃ)।

৫২ (ক) যোহন ১৯:২৩ দ্রঃ।

৫৩ (ক) ১ তি ১:৩-৪।

৫৪ (ক) যোহন ৬:৬২।

(খ) ‘তিনি এখন যা, সেসময় তা তিনি ছিলেন না’, কারণ দেহধারণের আগে তিনি ছিলেন ঈশ্বর কিন্তু মানুষ ছিলেন না।

৫৬ (ক) যোহন ১১:৪।

(খ) যোহন ১১:৩৪-৩৫।

(গ) বাস্তবিকই লাজারের পুনরুত্থান খ্রিষ্টের প্রাণ দ্বারা নয়, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা দ্বারাই সাধিত হয়েছিল।

৫৭ (ক) যোহন ১০:১৭-১৮।

(খ) মথি ২:২০।

৫৮ (ক) ইশা ১:১৪; ৪২:১ দ্রঃ।

(খ) লুক ২৪:৩৯ দ্রঃ।

(গ) মালা ৩:৬ দ্রঃ।

৫৯ (ক) যোহন ২:১৯ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ২৬:১২।

৬০ (ক) মাংসধারণ-রহস্যের যথার্থ ব্যাখ্যা হলো, খ্রিষ্টে দু’টো স্বরূপ (তথা ঐশ্বরিক ও মানব স্বরূপ), ও একমাত্র ব্যক্তি স্বীকার করা। কিন্তু আরিউসপন্থীরা এ রহস্য যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(খ) লুক ২৩:৪৩।

(গ) লুক ২৩:৪৬।

৬১ (ক) ১ তি ৩:১৬ দ্রঃ।

৬৪ (ক) ১ করি ১:২৩-২৪ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ২:৭-৮।

(গ) ১ করি ২:২।

৬৫ (ক) রো ৮:৩৩-৩৪।

(খ) এফে ৪:৯-১০।

৬৬ (ক) ২ করি ১৩:৪।

৬৭ (ক) ১ করি ১৫:৩-৪।

(খ) মথি ১:১৮; লুক ১:৩৫ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১১:১৫, ৩৫।

৬৮ (ক) রো ১০:৬-৯ লাতিন পাঠ্য।

(খ) রো ৪:৩।

৬৯ (ক) সেই নবী হলেন মোশি যাঁর বাণীকে প্রেরিতদূত পল উল্লেখ করেন (রো ৪:৩; দ্বিঃবিঃ ৩০:১২)।

৭১ (ক) মার্ক ১৫:৩৪।

(খ) লুক ২৩:৪৬।

(গ) যোহন ১১:৪১-৪২।

(ঘ) যোহন ১২:৩০।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

১১শ পুস্তক

বাইবেলের যে পুস্তকগুলো পিতার কাছে খ্রিষ্টের বশ্যতা ব্যক্ত করে, তেমন পুস্তকগুলোতে ভিত্তি ক’রে আরিউসপহীরা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে সমস্যা তুলে ধরত, এই ১১শ পুস্তক সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	
	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯													

১। এফেসীয়দের কাছে নিজের পত্রে প্রেরিতদূত সুসমাচারের বিশ্বাস সংক্রান্ত গোটা ও পূর্ণ রহস্যকে তার বহুবিধ দিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ঈশ্বর-জ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্যে এশিক্ষাও সন্নিবিষ্ট করলেন, ‘... যেমন তোমাদের আহ্বানের একমাত্র প্রত্যাশায়ও তোমরা আহুত হয়েছ: একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিশ্বাস, একমাত্র বাপ্তিস্ম; সকলের একমাত্র ঈশ্বর ও পিতা যিনি সকলের দ্বারা ও আমাদের সকলের অন্তরে (ক)। প্রেরিতদূত অনির্দিষ্ট একটা শিক্ষার অস্পষ্ট ও বিপজ্জনক শ্রমের হাতে আমাদের ফেলে না রেখে ও মানব-মনকে কল্পনা-জল্পনার পরিবর্তনশীল ইচ্ছার হাতে আমাদের না রেখে বরং প্রতিরোধমূলক বাধা স্থির করে ধীশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করেছেন। এইভাবে তিনি যা ঘোষণা করেছেন তা ছাড়া আমাদের আর অন্য কিছুই জানতে দেন না, কারণ অপরিবর্তনীয় বিশ্বাসের সেই সূক্ষ্ম সংজ্ঞা এদিক ওদিক চলাচল হতে দেয় না। তাই একমাত্র প্রভুর কথা প্রচার করতে করতে তিনি একমাত্র বিশ্বাসের কথা মনে করিয়ে দেন; পরে, একমাত্র প্রভুতে একমাত্র বিশ্বাসের কথা মনে করিয়ে দিয়ে একমাত্র বাপ্তিস্মের কথার দিকেও অঙুলি নির্দেশ করেন যাতে, যেমন একমাত্র প্রভুতে একমাত্র

বিশ্বাস আছে, তেমনি যেন একমাত্র প্রভুতে একমাত্র বিশ্বাসের একমাত্র বাপ্তিস্ম থাকে। এবং যেহেতু বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত হোক বা বিশ্বাস সংক্রান্ত হোক এই গোটা রহস্য শুধু একমাত্র প্রভু সংক্রান্ত নয় কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরও সংক্রান্ত রহস্য, সেজন্য তিনি একমাত্র ঈশ্বর-স্বীকারোক্তি দিয়ে আমাদের প্রত্যাশার পূর্ণতা পূরণ করেন, যার ফলে, যেমন একমাত্র প্রভুতে একমাত্র বাপ্তিস্ম ও একমাত্র বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি যেন একমাত্র ঈশ্বরেও একমাত্র বাপ্তিস্ম ও একমাত্র বিশ্বাস থাকে। উভয় [তথা প্রভু ও ঈশ্বর] যে ঐক্য স্বরূপ, তা ব্যক্তি-একাকীত্বের ফলে নয়, কিন্তু নিজ নিজ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁরা ঐক্য স্বরূপ। এক একজনের জন্য যা সেই ঐক্যকে নির্দিষ্ট করে, তা পিতা ক্ষেত্রে হলো তাঁর পিতৃত্ব, পুত্র ক্ষেত্রে তাঁর পুত্রত্ব, এবং এক একজনের জন্য যা হলো একে অন্যের সঙ্গে ঐক্য-রহস্য, তা এটাই যে, তাঁরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই ঐক্য স্বরূপ। যখন একমাত্র প্রভু সেই খ্রিষ্ট রয়েছেন তখন এটা এমনটা বোঝায় না যে পিতা ঈশ্বরও প্রভু হতে পারবেন না; এবং এমনটাও সমর্থন করা যায় না যে, যখন একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা আছেন তখন এটাও এমনটা বোঝায় না যে একমাত্র প্রভু সেই খ্রিষ্টও ঈশ্বর হবেন না। যেহেতু একমাত্র ঈশ্বর আছেন, সেজন্য যদি এমনটা মনে করা হয় যে ঈশ্বরত্ব খ্রিষ্টও সংক্রান্ত নয়, তাহলে এটাও অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, যেহেতু একমাত্র প্রভু সেই খ্রিষ্ট রয়েছেন, সেজন্য ঈশ্বরকেও প্রভু হতে দেওয়া হবে না: এটাই সেই অযৌক্তিক ধারণা যা তখনই দেখা দেয় যখন ‘ঐক্য’ শব্দটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করে না কিন্তু সম্পূর্ণ একাকীত্বকে নির্দেশ করে। সুতরাং, যেমন একমাত্র প্রভু ক্ষেত্রে, তেমনি একমাত্র পিতা ঈশ্বর ক্ষেত্রেও একমাত্র বাপ্তিস্ম ও একমাত্র বিশ্বাস রয়েছে।

২। কিন্তু একমাত্র প্রভু ও একমাত্র পিতা ঈশ্বর আছেন ক্ষেত্রে দৃঢ় ও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি না থাকলে বিশ্বাস আর একমাত্র বিশ্বাস হবে না। অন্যদিকে, যে বিশ্বাস একমাত্র বিশ্বাস নয়, সেই বিশ্বাস কেমন করে একমাত্র প্রভু ও একমাত্র পিতা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে পারে? প্রচারিত তত ভিন্ন তত্ত্ব থাকলে একমাত্র বিশ্বাস থাকবে না: অর্থাৎ, একজন এমনটা বিশ্বাস করবে যে, যখন পেরেক যিশুর হাতের পাতা বিঁধিয়ে দিচ্ছিল তখন প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আমাদেরই দুর্বলতার বিশিষ্ট ব্যথার জন্য হাহাকার করেছিলেন ও তাঁর স্বরূপ

ও অধিকার-যুক্ত পরাক্রম থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁর উপরে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আতঙ্কে ভয় পেয়েছিলেন; অন্য একজন তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম বিষয়ক মূলতত্ত্বকে অস্বীকার ক'রে তাঁকে সৃষ্টজীব বলে ঘোষণা করবে; অন্য একজন তাঁকে সত্যিকারে ঈশ্বর বলে স্বীকার না করে কেবল মুখেই তাঁকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করবে। কেননা, যখন ঈশ্বর বলে অভিহিত হওয়া সম্মানের চিহ্ন, তখন ঈশ্বর বলে উপলব্ধ হওয়া তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ে চেতনা স্বরূপ। যখন কারও কারও মতে খ্রিষ্ট যিশু ঈশ্বর বলে ব্যথা পান না; যখন অন্য কারও কারও মতে তিনি দুর্বল বলে ভয় পান; যখন অন্য কারও কারও মতে তিনি নামেই ঈশ্বর; যখন অন্য কারও কারও মতে তিনি প্রজননেই পুত্র; যখন অন্য কারও কারও মতে তিনি দত্তক গুণে পুত্র, তখন তিনি আর একমাত্র নন। এবং এর ফলে পিতা ঈশ্বরও বিশ্বাসে একমাত্র নন যদি কেউ কেউ তাঁকে তাঁর অধিকারের জন্য ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে, ও তিনি বিশ্বের পিতা হওয়ায় অন্য কেউ তাঁকে তাঁর জন্মদানকারী ক্ষমতার জন্য পিতা বলে বিশ্বাস করে। আরও, যে কেউ একমাত্র বিশ্বাসের বাইরে রয়েছে, সে যে বিশ্বাসের বাইরে রয়েছে, একথা কেইবা মেনে নেবে না? কেননা যেটা একমাত্র বিশ্বাস সেটায় একমাত্র খ্রিষ্ট প্রভু ও একমাত্র পিতা ঈশ্বর আছেন। কিন্তু একমাত্র খ্রিষ্ট-প্রভু যিনি, তিনি তো নামে নয় বিশ্বাসেই একমাত্র পুত্র; কিন্তু তিনি ঈশ্বর হলে তবেই তিনি ঈশ্বর, যদি তিনি অপরিবর্তনীয়, ও ঈশ্বরও ও পুত্রও হওয়া কখনও শেষ করেননি। তাই খ্রিষ্ট যা, যে কেউ তাঁকে তা থেকে অন্য ভাবে অর্থাৎ তাঁকে পুত্র ও ঈশ্বর বলে নয় কিন্তু অন্যভাবে প্রচার করবে, সে অন্য খ্রিষ্টকে প্রচার করবে। কিন্তু সেই লোক একমাত্র বাপ্তিস্মে একমাত্র বিশ্বাসেরও অধিকারী হবে না, কারণ প্রেরিতদূতের শিক্ষা অনুসারে একমাত্র বিশ্বাস হলো সেই একমাত্র বাপ্তিস্মে বিশ্বাস যে বাপ্তিস্মে একমাত্র প্রভু হলেন খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর।

৩। তবে, খ্রিষ্ট যে খ্রিষ্ট [অর্থাৎ, খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর], তা আর অস্বীকার করা যায় না; তিনি যে জগতের দ্বারা অজ্ঞাত হবেন, তাও হতে পারে না। নবীদের পুস্তকগুলো তাঁর বিষয়ে প্রমাণ দেয়, যে কালের পূর্ণতা প্রতিদিন পূর্ণতার দিকে চলছে তাও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদের সমাধিগুহাগুলোও বহু বহু অলৌকিক কাজের দ্বারা তাঁর বিষয়ে কথা বলে, তাঁর নামের অধিকার তাঁকে প্রকাশ করে, অশুচি আত্মাগুলো

তাকে স্বীকার করে, অপদূতেরা নিজেদের কষ্টে তর্জন-গর্জন করতে করতে তাঁর নাম ধনিত করে। কিন্তু এসব কিছুতে আমরা তাঁর পরাক্রমের ব্যবস্থা দেখতে পাই। অন্যদিকে, তিনি যেভাবে আছেন, আমাদের বিশ্বাস তাঁকে সেইভাবেই প্রচার করবে যাতে তিনি নামে নয় কিন্তু স্বীকারোক্তিতেই আমাদের জন্য একমাত্র প্রভু হন যেহেতু আমরা একমাত্র বাস্তব একমাত্র বিশ্বাস গুণেই তাঁকে একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার করি : কেননা একমাত্র খ্রিষ্ট-প্রভুতে বিশ্বাসের উপরেই একমাত্র পিতা-ঈশ্বরে স্বীকারোক্তি নির্ভর করে।

৪। কিন্তু নতুন খ্রিষ্টের এই আজকালের প্রচারকেরা খ্রিষ্টের যা তা সবই অস্বীকার ক’রে যেমন অন্য খ্রিষ্ট প্রভুকে প্রচার করে, তেমনি অন্য পিতা ঈশ্বরকেও প্রচার করে। কেননা, তাদের মতে, পিতা [পুত্রকে] জনিত করেননি কিন্তু সৃষ্টিই করেছেন; ও তিনি জনিত হননি কিন্তু সৃষ্ট হয়েছেন ও সেইজন্য এই খ্রিষ্ট সত্যকার ঈশ্বর নন যেহেতু [অনন্তকালীন] জন্মসূত্রে ঈশ্বরত্বের অধিকারী নন; ও সেজন্য বিশ্বাস ঈশ্বরকে পিতা বলে মেনে নেয় না যেহেতু এমন কোন জন্মদান নেই যা তাঁকে পিতৃত্ব দেবে। তারা যখন এটা ঘোষণা করে যে তিনি অগম্য, অদৃশ্য, অলঙ্ঘনীয়, অনির্বচনীয়, অসীম, সর্বজানা, সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময়, সবকিছুতে গতিশীল ও সবকিছুকে সবকিছুর আবেষ্টনকারী, সবকিছুতে বিদ্যমান ও সবকিছুর অতীত, চেতনা-বিশিষ্ট সবকিছুতে চেতনাসম্পন্ন, তখন তারা অবশ্যই যথার্থভাবে ও সমুচিতভাবে পিতা ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করে, কিন্তু যখন তারা গৌরবের সর্বোচ্চ নাম বলে এটাও যোগ করে যে তিনি একাই মঙ্গলময়, একাই সর্বশক্তিমান, একাই অমর, তখন কেবা এটা অনুভব করে না যে, তাদের এই প্রশংসাবাদের লক্ষ্য হলো প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করা যা ‘একাই’ সীমাবদ্ধতাসূচক শব্দটা দ্বারা কেবল ঈশ্বরের গৌরবেই আরোপ করা হয়? কেননা, যদি একাই পিতা হলেন সেই সবকিছুর অধিকারী, তাহলে খ্রিষ্ট মরণশীল, দুর্বল ও অমঙ্গলময় হয়ে দাঁড়ান; তাঁর বেলায় এজন্যই পিতা ঈশ্বর থেকে স্বরূপগত জন্ম অস্বীকৃত পাছে তেমন জন্ম দ্বারা তাঁর মধ্যে সেই সুখ পাওয়া যায় যা পিতা ঈশ্বরেরই স্বরূপগত অধিকার; কেননা যে কেউ জন্ম নেয়, যে স্বরূপ তাকে জন্ম দিল, সে সেই স্বরূপের পরাক্রমের অধিকারী।

৫। প্রেরিতদূতদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অঙ্ক সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা পিতা ঈশ্বরের মহিমার গুণকীর্তন করে, বিশ্বাসীর সততা দিয়ে নয়, কিন্তু ভক্তিশূন্য কুটিলতা দিয়ে, যাতে নিজেদের সেই ভক্তিশূন্য ভ্রান্তমতকে সপ্রমাণ করতে পারে। তারা নাকি বলে, পিতার স্বরূপের সঙ্গে কিছুই তুলনার যোগ্য নয়, যাতে করে, যেকোন তুলনা বাতিল হয়েছে বলে তারা যেন শেষে বলতে পারে, একমাত্র জনিত ঈশ্বর বিকৃত ও ক্ষীণ স্বরূপের অধিকারী। তারা সেই ঈশ্বরেরই বেলায় এসবকিছু বলে যিনি জীবনময় ঈশ্বরের জীবনময় প্রতিমূর্তি, যিনি সেই ঈশ্বরের সুখময় স্বরূপের পূর্ণতাবিশিষ্ট রূপ, ও যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয় তাঁরই সত্তার একমাত্র জনিত সঞ্জাতজন। এই সঞ্জাতজন যদি পিতার সুখের সিদ্ধ গৌরবের অধিকারী না হন ও তাঁর পূর্ণ স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না করেন, তাহলে তিনি [পিতার] সত্যকার প্রতিমূর্তি নন। অন্যদিকে, যদি একমাত্র জনিত ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তাঁর মধ্যে সেই সিদ্ধ ও পূর্ণ স্বরূপ বিদ্যমান যা দ্বারা এমনটা হয়, তিনি সত্যকার ঈশ্বরের সত্যকার প্রতিমূর্তি হবেন। পিতা সর্বশক্তিমান : কিন্তু পুত্র দুর্বল হলে তবে পুত্র সেই সর্বশক্তিমানের প্রতিমূর্তি আর নন। পিতা মঙ্গলময় : কিন্তু পুত্র অন্য জাতের ঈশ্বরত্বের অধিকারী হলে তবে অমঙ্গলের স্বরূপ মঙ্গলের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করে না। পিতা দেহাতীত : কিন্তু আত্মা অনুযায়ী সেই পুত্র দেহের সীমায় সীমাবদ্ধ হলে তবে যিনি দেহ-বিশিষ্ট তিনি দেহাতীতজনের রূপে বিদ্যমান নন। পিতা অনির্বচনীয় : কিন্তু ভাষা সেই পুত্রকে বর্ণনা করলে তবে তাঁর স্বরূপ যতখানি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, সেই অনুসারে সেই স্বরূপ সেই অনির্বচনীয় জনের প্রতিমূর্তি নয়। পিতা সত্যকার ঈশ্বর : কিন্তু পুত্র মিথ্যা ঈশ্বরত্বের অধিকারী হলে তবে যিনি মিথ্যা তিনি সত্যজনের প্রতিমূর্তি আর নন। প্রেরিতদূত এমনটা বলেন না, তিনি কেবল আংশিক ভাবেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও আংশিক ভাবেই মাত্র ঈশ্বরের রূপ, কিন্তু এটা ঘোষণা করেন যে, তিনি হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি (ক) ও ঈশ্বরের রূপটি (খ)। এবং ঈশ্বরের পুত্রের ঐশ্বরিক স্বরূপ ক্ষেত্রে প্রেরিতদূত এর চেয়ে স্পষ্টতর ঘোষণা করতে পারতেন না, তথা : ঈশ্বর অদৃশ্য যা কিছুই অধিকারী, তাতেই খ্রিষ্ট হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। অবশ্যই, তিনি দৃশ্য সত্তার অধিকারী হলে তবে তিনি অদৃশ্য স্বরূপের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করতে পারতেন না।

৬। কিন্তু, আমরা যেভাবে আগের পুস্তকগুলোতে দেখিয়েছি, সেই অনুসারে এই ভ্রান্তমতপন্থীরা ঈশ্বরত্বকে অবজ্ঞা করার লক্ষ্যেই দেহধারণ-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে, ও আমাদের পরিভ্রাণ-রহস্য থেকে অভক্তির অজুহাত হাতিয়ার করে। তারা যদি প্রৈরিতিক বিশ্বাস আঁকড়ে ধরত, তাহলে এটাই বুঝত যে, যিনি ছিলেন ঈশ্বরের রূপে, তিনি দাসের রূপ ধারণ করেছেন, ও ঈশ্বরের রূপের উপর অবজ্ঞা না চাপিয়ে দেবার লক্ষ্যে দাসের সেই রূপের কথা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করত না, কারণ ঈশ্বরের রূপ নিজেতে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা ধারণ করে আছে। এবং যা বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত ও যা রহস্য সংক্রান্ত, তারা তার মধ্যে ভক্তিময় মনোভাবে পার্থক্য রাখত যাতে করে ঈশ্বরত্ব অবজ্ঞাত না হয় ও ঐশ্বরিক ব্যবস্থা ভ্রান্তমতে চালনা না করে। কিন্তু এখন, আমার মতে যেহেতু আমরা সমস্ত প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করেছি ও ধারণ-করা-দেহের জন্ম ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক স্বরূপের পরাক্রম দেখিয়েছি, সেজন্য সন্দেহের জন্য আর কোন স্থান রইল না। এটা স্পষ্ট যে, যিনি একমাত্র জনিত ঈশ্বর ও মানুষ, তিনি নিজের ঐশ্বরিক পরাক্রম দ্বারা সবকিছু করেছেন, ও ঐশ্বরিক পরাক্রমের অধিকারী বলেই তিনি সেই সবকিছু সত্যকার মানবীয় স্বরূপের মধ্য দিয়ে সাধন করেছেন। নিজের কর্মসম্পাদনে তিনি নিজেতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান স্বরূপের অধিকারী যেহেতু তিনি ঈশ্বর দ্বারা সঞ্জাত; আবার তিনি পূর্ণ ও সিদ্ধ মনুষ্যত্বের অধিকারী যেহেতু কুমারী তাঁকে প্রসব করেছেন। সত্যকার দেহের অধিকারী হয়েও তিনি ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী, ও ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী হয়েও তিনি সত্যকার দেহে অবস্থান করেন।

৭। আমাদের উত্তর সমষ্টিগত ভাবে খ্রিস্টকে তাঁর গৌরবময় মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে: সুসমাচারের ও প্রেরিতদূতের শিক্ষা দ্বারা ভক্তিহীন প্রতিটি তত্ত্ব একটার পর একটা খণ্ডন করা হলো। তথাপি যেহেতু ভ্রান্তমতপন্থীরা পতিত স্বরূপের দুর্বলতা দেখাবার জন্য প্রমাণ হিসাবে পুনরুত্থানের গৌরবের পরবর্তীকালীন কতগুলো সাক্ষ্য ধরতে দুঃসাহস করেছে, সেজন্য এখন সেই সমস্ত কিছু প্রতিবাদ করাই আমাদের কর্তব্য। তাই, যেভাবে অন্য পরিস্থিতিতেও করেছি, সেইভাবে এবারও, তাদের উপস্থাপিত বচনগুলো থেকে শুরু করেই তাদের সেই উপস্থাপিত বচনগুলোর প্রকৃত অর্থ বের করতে হবে, যাতে করে তারা যেখানে সত্য অস্বীকার করে আমরা ঠিক সেইখানে

সত্য খুঁজে বের করতে পারি। কেননা প্রভু সরল ভাষায় ও বিশ্বাস-জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যা বলেছেন, তাঁর সেই সমস্ত কথার জন্য বাড়তি সমর্থনেরও দরকার হয় না, পরকীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যারও দরকার হয় না (ক)।

৮। তাদের অন্যান্য ভক্তিহীন দোষের মধ্যে ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রভুর এই বাণীকেও ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর (ক)। যখন তাঁর পিতা হলেন তাঁদের পিতা ও তাঁর ঈশ্বর হলেন তাঁদের ঈশ্বর, তখন, তারা বলে, তিনি ঈশ্বরের স্বরূপে বিদ্যমান নন যেহেতু তিনি ঘোষণা করেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে যেমন, তেমনি অন্যান্যদের সঙ্গেও একই সম্পর্কে রয়েছেন। তবে তাঁর বিশিষ্ট অবস্থা লোপ পায়, যেহেতু তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে একই স্বরূপের অংশী ও সেই একই জন্মেরও অংশী যা গুণে তিনি ঈশ্বর বলে সঞ্জাত ও পুত্র। তারা কিন্তু প্রেরিতদূতের এই বাণীও মনে রাখুক (খ), কিন্তু যখন তিনি বলবেন, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে (গ)। যেহেতু তারা সেই বশ্যতা খ্রিস্টের ক্ষীণ স্বরূপের প্রমাণ বলে ধরে নেবে, সেজন্য ক্ষীণ স্বরূপ যাকে উর্ধ্ব স্বরূপের পরাক্রমের বশীভূত করেছে, তিনি পিতার স্বরূপের পরাক্রমের অধিকারী হতে পারবেন না। তাঁর জন্মের সত্য মুছিয়ে দেবার জন্য তারা এই ধারণাই উপস্থাপন করুক যা, বলতে গেলে, তাদের গোটা ভ্রান্তমতের সবচেয়ে প্রবল ও অখণ্ডনীয় ধারণা, তথা: সেই বশ্যতার কারণে তিনি ঈশ্বর নন; যেহেতু তাঁর ঈশ্বর ও পিতা আমাদেরও ঈশ্বর ও পিতা, সেজন্য তিনি সৃষ্টজীবদের সঙ্গে সবকিছুরই অংশীদার, ফলত তিনিও ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট একটা জীব, তিনি জনিত নন, কারণ সৃষ্টজীব শূন্য থেকে হয়, কিন্তু জনিত জীব তাঁর প্রণেতার স্বরূপের অধিকারী।

৯। নিন্দা সবসময়ই জঘন্য ব্যাপার, কারণ মিথ্যাবাদী যখন লজ্জাবোধের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সে সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু তবুও সে সময় সময় এই মিথ্যাকে, বলতে

গেলে, অজুহাতের পরদার নিচে লুকোয় যাতে এমনটা মনে হতে পারে যে, অভিপ্রায়ে সে যাতে নির্লজ্জ, তা সততার সঙ্গে রক্ষা করে। কিন্তু, আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব খণ্ডন করার জন্য যত তত্ত্ব ভক্তিহীন ভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে, এখানে লজ্জা ও মিথ্যা অজুহাতের জন্য স্থান নেই, কারণ যেখানে অজ্ঞতার অজুহাতও লোপ পায়, সেখানে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ভক্তিহীন ব্যাখ্যার ইচ্ছা মাত্রই রয়েছে। সুসমাচারের উপরোল্লিখিত বচনের ব্যাখ্যা কিছুক্ষণের মত স্থগিত করা সত্ত্বেও প্রেরিতদূতের এই বাণী ভুলে যাওয়া কি সম্ভব ছিল? তিনি তো বলেন, আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান: তা মাংসে হল আবির্ভূত, আত্মায় ধর্মময় বলে হল প্রতিপন্ন, স্বর্গদূতদের দ্বারা হল দৃষ্ট, বিজাতীয়দের মধ্যে হল ঘোষিত, জগতে বিশ্বাস দ্বারা হল গৃহীত, সগৌরবে হল উর্ধ্বে উপনীত (ক)। এখনও কি অবুঝ মনা এমন কেউ রয়েছে যে ভাববে, প্রভুর ধারণ-করা-মাংস রহস্য ভক্তি-রহস্যের চেয়ে আলাদা জিনিস? কিন্তু, প্রথমত, যে কেউ এ স্বীকারোক্তি মেনে নেবে না, সে ঈশ্বরে বিশ্বাসের বাইরে দাঁড়াবে। এবিষয়ে প্রেরিতদূত কোনও সন্দেহ রাখেন না যে, সবাইকে, নির্বিশেষেই, এটা মেনে নিতে হবে যে, আমাদের পরিত্রাণ-রহস্য ঈশ্বরকে নিন্দায় নয় কিন্তু মহান ধর্মভক্তি-রহস্যেই স্থিত: এমন রহস্য যা আর গুপ্ত নয় কিন্তু মাংসে আবির্ভূত; আরও, এমন রহস্য যা মাংসের স্বরূপের কারণে অকার্যকর নয় কিন্তু [পবিত্র] আত্মায় ধর্মময় বলে সাব্যস্ত। তাই, [পবিত্র] আত্মায় ধর্মময়তা-প্রদানের গুণে আমাদের বিশ্বাস থেকে মাংসের দুর্বলতার ধারণা দূর করে দেওয়া হয়; মাংসে সেই আবির্ভাবের গুণে [মাংসধারণ] গুপ্ত বিষয়টা আর গুপ্ত নয়, এবং যেহেতু সেই গুপ্ত বিষয়ের কারণ দুর্জ্ঞেয়, সেজন্য মহান ধর্মভক্তি-রহস্যের ব্যাপারে শুধু স্বীকারোক্তিই রয়েছে (খ)। এইভাবে, আমাদের যা বিশ্বাস করা দরকার, তা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রেরিতদূত এই অনুক্রম পালন করলেন: ধর্মভক্তি থেকে রহস্য, রহস্য থেকে মাংসে আবির্ভাব, মাংসে আবির্ভাব থেকে [পবিত্র] আত্মায় ধর্মময়তা লাভ। কেননা মাংসে যে ধর্মভক্তি-রহস্য আবির্ভূত, তা যেন সত্যিকারে একটা রহস্য হয় সেজন্যই আত্মায় ধর্মময়তা লাভের দ্বারা তা মাংসে আবির্ভূত হয়। আরও, মাংসে এই আবির্ভাব আত্মায় যে কোন্ ধরনের ধর্মময়তা তা যেন অজ্ঞাত না থাকে, সেজন্য মাংসে আবির্ভূত ও [পবিত্র] আত্মায় ধর্মময়তা প্রাপ্ত রহস্যটা স্বর্গদূতদের দ্বারা দৃষ্ট হল,

বিজাতীয়দের কাছে ঘোষিত হল, এই জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হল : এই রহস্যটাই গৌরবে, উর্ধ্বে, উপনীত হল। এইভাবে ধর্মভক্তি-রহস্য প্রতিটি পর্যায়ে মহান : মাংসে আবির্ভাবে, [পবিত্র] আত্মায় ধর্মময়তা লাভে, স্বর্গদূতদের কাছে দর্শনে, বিজাতীয়দের কাছে ঘোষণায়, এই জগতে বিশ্বাস-গ্রহণে, গৌরবে উন্নয়নে। কেননা দর্শনের পরে ঘোষণা, ঘোষণার পরে বিশ্বাস, ও সবকিছুর শেষে গৌরবে উন্নয়ন হয়, কারণ গৌরবে উন্নয়নই হলো মহান ধর্মভক্তি-রহস্য, ও মাংসধারণ-ব্যবস্থায় তেমন বিশ্বাস দ্বারা প্রভুর গৌরবে উন্নীত হবার জন্য ও সেই গৌরবের অনুরূপ হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং, মাংস-ধারণ হলো সেই মহান ধর্মভক্তি-রহস্য, কেননা মাংস-ধারণে মাংস-রহস্যের আবির্ভাব সার্থকতা অর্জন করে। তথাপি, সেই মাংসে-আবির্ভাবকে আমাদের সেই মহান ধর্মভক্তি-রহস্য বলে স্বীকার করা ছাড়া অন্য কিছু বলে স্বীকার করতে নেই, কারণ মাংসে খ্রিস্টের আবির্ভাব হলো পবিত্র আত্মায় তাঁর ধর্মময়তা লাভ ও গৌরবে, উর্ধ্বে, তাঁর উন্নয়ন। এবং যখন সেই মহান ধর্মভক্তি-রহস্য গৌরবে, উর্ধ্বে, উন্নয়নের মধ্য দিয়েই স্বীকার্য, তখন কেমন প্রত্যাশায় আমরা এটা বিশ্বাস করব যে ধর্মভক্তি-ব্যবস্থার সেই গুপ্ত বিষয়টা হলো ঈশ্বরত্বের দুর্বলতা? এবং যেহেতু ব্যাপারটা দুর্বলতা সংক্রান্ত নয় কিন্তু রহস্যই সংক্রান্ত, ব্যাপারটা বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত নয় কিন্তু ধর্মভক্তিই সংক্রান্ত, সেজন্য এখন আমাদের সুসমাচার-রচয়িতার বাণীর অর্থ খোঁজ করা দরকার পাছে আমাদের পরিত্রাণের ও আমাদের গৌরবের গুপ্ত বিষয় ভক্তিহীন ঘোষণার জন্য একটা অজুহাতে পরিণত হয়।

১০। আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর (ক), একথা দ্বারা প্রভু যে নিজের বিষয়ে ঘোষণা করেন, তা তোমার পক্ষে, হে ভ্রাতৃমতপন্থী, অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অখণ্ডনীয়। একই পিতা হলেন আমাদের ও তাঁরই আপন পিতা, একই ঈশ্বর হলেন আমাদের ও তাঁরই আপন ঈশ্বর; এজন্য তোমার মতে, তিনি আমাদের একই দুর্বলতার অধিকারী, কারণ একই পিতা ক্ষেত্রে সেই অধিকার পুত্র হিসাবে আমাদের সমান করে, ও একই ঈশ্বরকে সেবা করা দাস হিসাবে আমাদের সমতুল্য করে। আমরা উৎপত্তি ক্ষেত্রে সৃষ্টজীব ও স্বরূপ ক্ষেত্রে দাস, কিন্তু, যেহেতু পিতা ও ঈশ্বর ক্ষেত্রে আমাদের তাঁর সঙ্গে সমান অধিকার আছে,

সেজন্য আমাদের সঙ্গে মিলে তিনি স্বরূপের ভিত্তিতে সমান সৃষ্টজীব ও দাস। নিজের উন্মাদনায় এই ভক্তিহীন তত্ত্ব নবীর এই বাণীও মনে করিয়ে দেয়, ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন (খ)। এতে সেই ভ্রান্তমত দেখাতে চায় যে, যে স্বরূপ ঈশ্বরের অধিকার, খ্রিস্ট সেই স্বরূপের একই অধিকারের সহভাগী নন, কারণ যিনি তাঁকে তৈলাভিষিক্ত করেন সেই ঈশ্বর তাঁর [অর্থাৎ খ্রিস্টের] আপন ঈশ্বর বলে অগ্রাধিকার পান।

১১। খ্রিস্ট যে ঈশ্বর বলে সঞ্জাত, যে কেউ তা জানে না, খ্রিস্ট যে ঈশ্বর, সে তা জানতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর বলে সঞ্জাত হওয়া বলতে ঈশ্বরের স্বরূপের সহভাগী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় না। ‘সঞ্জাত হওয়া’ সংজ্ঞা পুত্রের [অনন্তকালীন] জন্মের কারণ নির্দেশ করে বটে, কিন্তু জাত ক্ষেত্রে [অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে] তাঁকে তাঁর প্রণেতা থেকে ভিন্ন করে না। যা কিছু জাত ক্ষেত্রে ভিন্ন নয়, তা নিজের কারণের আপন প্রণেতার কাছে দায়ী থাকলেও তবু নিজের প্রণেতার স্বরূপ হারায় না, কারণ ঈশ্বরের পুত্র অন্য জন্মের অধিকারী হতে পারেন না, অন্য স্বরূপেরও অধিকারী হতে পারেন না। খ্রিস্ট অন্য জন্মের অধিকারী হলে তবে তিনি পুত্র নন; অন্য স্বরূপের অধিকারী হলে তবে তিনি ঈশ্বর নন। কিন্তু তিনি ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর’, এর ফলে পুত্র-ঈশ্বরের জন্য পিতা-ঈশ্বর হলেন তাঁর জন্মেরও ঈশ্বর ও তাঁর স্বরূপেরও ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরের জন্ম ঈশ্বর থেকে হয়, ও সেই জন্মে সেই জাতের [অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের] স্বরূপ রয়েছে যা ঈশ্বরের বিশিষ্ট স্বরূপ।

১২। প্রভু যা কিছু বললেন, সেই সমস্ত কথায় তিনি তাঁর এই ভক্তিময় ও উপযোগী ঘোষণা অধিক সতর্কতার সঙ্গেই ব্যক্ত করলেন পাছে তাঁর জন্ম-স্বীকার তাঁর ঈশ্বরত্বের অবমাননা ঘটাত, ও তাঁর ভক্তিময় বাধ্যতা তাঁর স্বরূপের মহিমা নমিত করত। তিনি ইচ্ছা করছিলেন, তাঁর জন্ম প্রণেতার দেয় সম্মান ঘোষণা করবে, কারণ নিজের অস্তিত্ব ক্ষেত্রে তিনি সেই প্রণেতার প্রতি দায়ী; তিনি ইচ্ছা করছিলেন, তাঁর স্বরূপ থেকে আগত আস্থা তাঁর এই চেতনাকে প্রকাশ করবে যে তিনি সেই স্বরূপেরই সহভাগী যা ঈশ্বর বলে তাঁর জন্ম গুণে তাঁর নিজস্ব অধিকার। এথেকেই এই সমস্ত বাণী আগত, যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে’ ও ‘আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না (ক)। তিনি যে কথা বলেন, নিজে থেকে তা বলেন না, কারণ তিনি যা বলেন,

তার জন্য তিনি অবশ্যই তাঁর প্রণেতার প্রতি দায়ী। আরও, যখন তিনি বলেন, যারা তাঁকে দেখেছে তারা পিতাকে দেখেছে, তখন তিনি এটা নির্দেশ করেন যে, তাঁরা উভয়েই এই প্রমাণের গুণেই সচেতন যে-প্রমাণ এটা দেখাবার জন্য দেওয়া হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে আছেন, জাত [অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব] ক্ষেত্রে ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে পরকীয় নয় এমন স্বরূপ সঙ্গাত হয়েছিল যাতে পুত্র ঈশ্বর বলে অস্তিত্বশীল হন। অথবা একথা বিবেচনা কর, ‘পিতা যা আমাকে দিয়েছেন, তা সবকিছুর চেয়ে মহান’ ও আমি এবং পিতা, আমরা এক (খ)। যখন পুত্র বলেন, পিতা দিয়েছেন, তখন এতে তিনি স্বীকার করেন তিনি সেই জন্ম পেয়েছেন, ও যখন ঘোষণা করেন তাঁরা উভয় এক, তখন জন্মের ফলাফল স্বরূপ অধিকৃত সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ নির্দেশ করেন। অথবা একথা লক্ষ কর, ‘কারণ পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে (গ)। কেননা পুত্রের হাতে সমস্ত বিচারের ভার ন্যস্ত করায় পিতা জন্মের কথা বিষয়ে নীরব থাকেন না; এবং তাঁকে সম্মানে সমান বলে গণ্য করায় তাঁর একই স্বরূপও স্বীকৃত। অথবা এই কথা স্মরণ কর, আমি পিতাতে ও পিতা আমাতে আছেন (ঘ) ও পিতা আমার চেয়ে মহান (ঙ)। একজন অন্যজনে আছেন: সুতরাং ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে জেনে নাও; পিতা তাঁর চেয়ে মহান: পিতার অধিকারের স্বীকৃতি দেখ। এইভাবে একথাও রয়েছে, নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা-ই করেন (চ)। তিনি নিজে থেকে কিছুই করেন না, অর্থাৎ, [অনন্তকালীন] জন্মের ফলে পিতা পুত্রের কাজের প্রণেতা; তথাপি পিতা যা কিছু করেন, পুত্রও একইভাবে ঠিক তা-ই করেন, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর বলে ছাড়া অন্য ভাবে অস্তিত্বশীল নন, ও যিনি তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন সেই পিতার সর্বশক্তিশালী স্বরূপ গুণে তিনি সেই সবই করতে পারেন যা পিতা ঈশ্বর করেন। তাই এসমস্ত সত্য [পিতার সঙ্গে] আত্মার ঐক্য দ্বারা ও সেই স্বরূপেরই বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারাও প্রমাণিত যা বিষয়ে নিজের [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে পুত্র অধিকারী। এইভাবে [অনন্তকালীন] জন্ম সেই পিতা ঈশ্বরকে স্বীকার করে যিনি পুত্রকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, ও পুত্রের অস্তিত্ব তাঁর নিজের স্বরূপ

বিষয়ে পুত্রের সচেতনা স্পষ্ট করে : পুত্র ঈশ্বর ঈশ্বরকে নিজের পিতা বলে স্বীকার করেন যেহেতু তাঁর দ্বারা জনিত হলেন, কিন্তু জনিত হওয়া ছাড়া তিনি সম্পূর্ণরূপেই ঐশ্বরিক স্বরূপেরও অধিকারী।

১৩। অতএব, সেই মহান ও ভক্তিময় রহস্য-ব্যবস্থা ঐশ্বরিক পুত্রের পিতাকে, পুত্রের মানব অবস্থা ধারণের ফলে, পুত্রের প্রভুও করে তোলে, কারণ যিনি ছিলেন ঈশ্বরের রূপে, তিনি দাসের রূপে প্রতিপন্ন হলেন। তিনি আগে দাস ছিলেন না, কারণ [পবিত্র] আত্মা অনুসারে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র-ঈশ্বর। এবং এতে সবাই একমত যে, যখন কোন দাস নেই তখন প্রভু নেই। নিজের পক্ষ থেকে ঈশ্বর একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম ক্ষেত্রে অবশ্যই পিতা; কিন্তু দাস-অবস্থা ক্ষেত্রে একমাত্র জনিত ঈশ্বরকে তখনই মাত্র এক প্রভুকে আরোপ করতে পারি যখন পুত্র দাস হন। আগে পুত্র নিজের স্বরূপে দাস ছিলেন না, কিন্তু পরে স্বরূপ অনুসারে এমন কিছু হতে লাগলেন যা আগে ছিলেন না। তাই আমাদের ধরে নিতে হবে যে, পিতা সেই কারণেরই গুণে প্রভু যে কারণের গুণে পুত্র দাস বলে অস্তিত্বশীল। কেননা পুত্র যে স্বরূপ গ্রহণ করেন সেটার গুণে তাঁর এক প্রভু আছেন, অর্থাৎ সেসময় থেকেই তাঁর এক প্রভু আছেন যে সময় থেকে তিনি মনুষ্যত্ব ধারণের ফলে নিজেকে দাস বলে উপস্থাপন করলেন।

১৪। সুতরাং, যিনি আগে ঈশ্বরের রূপে ছিলেন, দাসের রূপে অবস্থানকালে সেই মানব যিশু খ্রিস্ট ঘোষণা করলেন, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর (ক)। তবে, যখন তিনি এমন দাস হিসাবে এই কথা বললেন যিনি দাসদের কাছে কথা বলেন, তখন একথাগুলো কেমন করে দাসেরই কথা না হয়ে পারে, ও কেমন করে বরং [সেই কথাগুলো] সেই স্বরূপেই আরোপিত হতে পারবে যার দাসের স্বরূপের কিছুই নেই যেহেতু যিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন তিনি দাসের রূপ আপন করে নিলেন যেহেতু এই দাসের সেই রূপই ছিল কেমন যেন দাসদের সঙ্গে দাসের সহভাগিতার আবশ্যকীয় শর্ত? তাই পিতা তাঁরই পিতা ও মানুষদেরও পিতা, ও ঈশ্বর তাঁরই ঈশ্বর ও দাসদেরও ঈশ্বর। যখন দাসের রূপে মানুষ বলে যিশু খ্রিস্ট এসমস্ত কথা বলেন এমন মানুষদের কাছে যারা দাস, তখন এতে কোনও

সন্দেহ নেই যে, পুত্রের মানব অবস্থার দিক দিয়ে পিতা হলেন তাঁরও পিতা ও আমাদেরও পিতা; পুত্রের দাস-স্বরূপের দিক দিয়ে ঈশ্বর হলেন তাঁরও ঈশ্বর ও সকলেরও ঈশ্বর।

১৫। তাই, যে কথা দিয়ে তিনি নিজের সংবাদ শুরু করেন, সেই কথা এ, বরং আমার ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর (ক)। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি: তাঁর সেই ভাইয়েরা ঈশ্বরের রূপ অনুসারে বা দাসের রূপ অনুসারে ভাই বলে পরিগণিত হবে? এবং তাঁর মধ্যে অবস্থানকারী ঈশ্বরত্বের পূর্ণতার সঙ্গে আমাদের মাংস কি কোন সহভাগিতার সম্পর্ক রাখে যার ফলে তাঁর ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে আমরা তাঁর ভাই বলে পরিগণিত হতে পারি? কিন্তু আমরা যে কোন্ দিক দিয়ে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের ভাই, নবীয় আত্মা এবিষয়ে অঙ্গ নন। কেননা মানুষ হিসাবে তত নয় কিন্তু কীট হিসাবেই তিনি একথা বললেন, আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব (খ)। এখানে তিনি এমন কীট বলে কথা বললেন যে কীট গর্ভধারণের সাধারণ প্রক্রিয়া ছাড়া জীবিত ও পৃথিবীর গভীরতা থেকে ইতিমধ্যে জীবন্ত অবস্থায়ই উদিত, তিনি যেন এটা দেখাতে পারেন যে তিনি মাংস ধারণ করেছেন ও পাতাল থেকেও সেই মাংস সংজীবিত করেছেন (গ)। সমস্ত সামসঙ্গীত বরাবর তিনি নবীয় আত্মা দ্বারা নিজের যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত রহস্যগুলো পূর্বঘোষণা করেন ও এটা আবশ্যিক যে, সেই যন্ত্রণাভোগ-ব্যবস্থার ফলেই তাঁর ভাইয়েরাও আছে। প্রেরিতদূতও তাঁর সঙ্গে এই ভ্রাতৃত্ব-রহস্যকে প্রচার করেন, কেননা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত (ঘ) বলে শুধু নয়, কিন্তু বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত (ঙ) বলেও আখ্যায়িত করেন। কেননা খ্রিস্ট সেই অর্থে বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত যে একই অর্থে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত; এবং যেমন তাঁর মৃত্যু-রহস্য তাঁর দেহ সংক্রান্ত, তেমনি ভ্রাতৃত্ব-রহস্য মাংস সংক্রান্ত। অতএব, মাংস ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বহু ভাই আছে কারণ বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বসবাস করলেন (চ); কিন্তু একমাত্র জনিত ঈশ্বরের বিশিষ্ট অবস্থা ক্ষেত্রে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের কোন ভাই নেই।

১৬। কিন্তু, মাংসধারণের গুণে আমাদের সকলের স্বরূপ নিজেতে ধারণ করছিলেন বিধায়, তিনি আগে যা ছিলেন তা না হারিয়ে, আমরা যা তিনি তা হলেন। আগে তাঁর [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে ও এখনও তাঁর মানব অবস্থা গুণে ঈশ্বর ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর মানব অবস্থা গুণে পিতা এখনও তাঁর পিতা, কারণ সবই পিতা ঈশ্বর থেকে হয়। ঈশ্বর সবকিছুর পিতা, কারণ সবই তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যে। কিন্তু, বাণী যে হলেন মাংস, শুধু এই কারণেই যে ঈশ্বর একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পক্ষে পিতা তা নয়: বরং তিনি পিতা কারণ আদিতো বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর। কিন্তু যখন ‘বাণী হলেন মাংস’, তখন বাণী-ঈশ্বরের [অনন্তকালীন] জন্ম ক্ষেত্রে ও মাংস-অবস্থা ক্ষেত্রে পিতৃত্ব অস্তিত্বশীল হতে লাগল। পিতা তো গোটা মাংসের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বাণী-ঈশ্বরের জন্য যেমন, সেইভাবেই যে পিতা, তা নয়। আরও, বাণী-ঈশ্বর যদিও একদিকে ঈশ্বর হওয়া শেষ না করলেন, তবু অন্যদিকে মাংস হলেন। যে বাণী মাংস হলেন ও আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, যখন তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করেন তখন সত্যিকারে বাণী হতে চলেন, ও যখন বাণী মাংস হন, তখন তিনি সত্যিকারে ঈশ্বর ও মানুষ। সেই বসবাস করাটা অবশ্যই তাঁরই বৈশিষ্ট্য যিনি সতত অবস্থান করেন, কিন্তু মাংস হওয়া বলতে মানব জন্ম নেওয়া বোঝায়। আমাদের মাঝে বসবাস করার অর্থ এটা হলো যে, তিনি আমাদের মাংস আপন করে নিলেন: ঈশ্বর আমাদের দেহের বাস্তবতায় রয়েছেন, কারণ মাংস-হওয়া-ঈশ্বর আমাদের মাঝে বসবাস করেন। মাংস অনুসারে মানুষ সেই যিশু খ্রিষ্ট যদি বাণী-ঈশ্বর থেকে ঐশ্বরিক স্বরূপ হরণ করতেন, অথবা মানব-যিশু খ্রিষ্ট যদি ধর্মভক্তি-রহস্য অনুসারে বাণী-ঈশ্বর না হতেন, তাহলে পিতা যে যেমন খ্রিষ্টের তেমনি আমাদেরও পিতা ও যেমন খ্রিষ্টের তেমনি আমাদেরও ঈশ্বর, তা ঐশ্বরিক স্বরূপের নিন্দা হত। বরং, বাণী-ঈশ্বর যদি মানব-যিশু খ্রিষ্ট হওয়ার পর বাণী-ঈশ্বর হওয়া শেষ না করলেন, তাহলে, যে স্বরূপের ভিত্তিতে বাণী আমাদের ভাই, সেই ভিত্তিতে ঈশ্বর একইসময় তাঁর পিতা ও আমাদেরও পিতা, তাঁর ঈশ্বর ও আমাদেরও ঈশ্বর। ‘আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর’ কথায়, যিনি একমাত্র জনিত ঈশ্বর সেই বাণীর ভাইদের কাছে সংবাদ নেই, কিন্তু যে বাণী হলেন মাংস সেই বাণীরই ভাইদের কাছে সংবাদ রয়েছে।

১৭। প্রেরিতদূত এমন অসতর্ক ও অনিশ্চিত কথা ব্যবহার করেন না যা অভক্তিকে [প্রতিবাদ করার] অজুহাত দিতে পারে। তাই, এই বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন তিনি প্রভুর উপদেশের প্রথম অংশে ‘ভাই’ শব্দটা ব্যবহার করেন, তখন সুসমাচার-রচয়িতা এটা দেখাতে ইচ্ছা করেন যে, গোটা সংবাদ সেই সকলকে উদ্দেশ্য করে যারা তাঁর সঙ্গে সেই [মানব] স্বরূপেরই সহভাগী যা গুণে তিনি তাদের ভাই। তাঁর কথা তাঁর আপন ভাইদের উদ্দেশ্য করে, পাছে ধর্মভক্তি-রহস্য জ্ঞাত করার লক্ষ্যে যা ঘোষিত তা ঈশ্বরত্বের নিন্দা বলে পরিগণিত হয়। যে সহভাগিতা গুণে ঈশ্বর আমাদের ও তাঁরও পিতা, ঈশ্বর আমাদের ও তাঁরও ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই সহভাগিতা মাংস-ব্যবস্থার ভিত্তিতেই অস্তিত্বশীল, কারণ দেহে তাঁর জন্ম গুণে আমাদের তাঁর ভাই বলে গণিত হতে হয়। তাই, পিতা ঈশ্বর যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরও ঈশ্বর, সেবিষয়ে কেউই সন্দেহ পোষণ করে না, কিন্তু আমাদের এই ভক্তিময় স্বীকারোক্তি অভক্তির জন্য কোন অজুহাত দেয় না। ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বর, কিন্তু এজন্য নয় যে ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বরের চেয়ে অন্য জাত অনুযায়ী ঈশ্বর, কিন্তু এজন্য যে, খ্রিষ্ট পিতা দ্বারা ঈশ্বর বলে জন্ম নিলেন ও মাংসধারণ-ব্যবস্থা অনুসারে তিনি দাস : নিজের পিতা বলে তাঁর পক্ষে ঈশ্বর আছেন, কারণ সেই ঈশ্বর থেকেই তাঁর ঈশ্বরত্ব আগত ; নিজের ঈশ্বর বলে তাঁর পক্ষে ঈশ্বর আছেন, কারণ তিনি কুমারীর মাংস। এসমস্ত কিছু প্রেরিতদূত দ্বারা সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট উক্তি প্রমাণিত, তিনি বলেন, আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, যেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশ্বরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন (ক)। যখন তিনি খ্রিষ্টকে যিশু বলে উল্লেখ করেন তখন তিনি তাঁর ঈশ্বরকে উল্লেখ করেন ; যখন খ্রিষ্টের গৌরব উল্লেখ করেন তখন তাঁর পিতার কথা উল্লেখ করেন। গৌরবের অধিকারী সেই খ্রিষ্টের জন্য যিনি পিতা, যিশু হিসাবে সেই খ্রিষ্টের জন্য তিনি ঈশ্বর। কেননা, যাকে মারীয়ার প্রসব করার কথা ছিল যখন দূত সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কথা বলেন, তখন তাঁকে যিশু বলে অভিহিত করেন (খ)। কিন্তু যখন নবীরা খ্রিষ্ট প্রভুর কথা বলেন, তখন তাঁকে আত্মা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত কথা লাতিন ভাষার কারণে অনেকের কাছে একটু অস্পষ্ট লাগে, কারণ গ্রীক ভাষা যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে যে নির্দেশক পদ অবিরতই ব্যবহার

করে, লাতিন ভাষা তা ব্যবহার করে না। বাস্তবিকই আমরা এবাক্য পাই, ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ ὁ πατὴρ τῆς δόξης যা, নির্দেশক পদ থাকলে আমরা লাতিন ভাষায় এভাবে অনুবাদ করতে পারতাম, Ille Deus illius Domini nostri Jesu Christi, ille Pater illius claritatis (গ)। ‘যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বর’ ও ‘গৌরবের পিতা’ সংজ্ঞা দু’টোতে তাঁর স্বরূপের এমন বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত যা আমাদের মনের উপলব্ধি-শক্তি ধারণ করতে পারে। তেমনি, যেখানে খ্রিস্টের গৌরব-সম্পর্কিত কথা রয়েছে, সেখানে ঈশ্বরই তাঁর পিতা; অন্যদিকে, যেখানে খ্রিস্ট যিশু বলে নির্দিষ্ট, সেখানে পিতাই তাঁর ঈশ্বর। কেননা মাংসধারণ-ব্যবস্থা কালে খ্রিস্ট একটি দাস, তবে পিতাই তাঁর ঈশ্বর, কিন্তু গৌরব কালে খ্রিস্ট নিজেই ঈশ্বর এবং এর ফলে ঈশ্বর তাঁর পিতা।

১৮। যুগ ও কালের আবর্তন যেমন [পবিত্র] আত্মার পরিবর্তন ঘটায় না, তেমনি দেহে সেই একই ও সমান খ্রিস্ট রয়েছেন যিনি [পবিত্র] আত্মা দ্বারা নবীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন (ক)। যখন তিনি পিতৃকুলপতি সেই পবিত্র দাউদের মুখ দিয়ে বলেন ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর তোমার সঙ্গীদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন (খ), তখন তিনি দেহধারণ-ব্যবস্থা ছাড়া অন্য রহস্যকে নির্দেশ করেন না। কেননা যিনি এখন আপন ভাইদের এটা জানান যে তাঁদের পিতা হলেন তাঁর আপন পিতা ও তাঁদের ঈশ্বর হলেন তাঁর আপন ঈশ্বর, তিনি সেকালেও এটা বলতেন যে, আপন সঙ্গীদের চেয়ে তাঁকেই তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল। তাই, যদিও এমন কেউই নেই যে একমাত্র জনিত খ্রিস্টের পক্ষে অর্থাৎ বাণী-ঈশ্বরের পক্ষে সঙ্গী, তবু আমরা নিজেদের তাঁর সঙ্গী গণ্য করতে পারি সেই ধারণা-ব্যবস্থা গুণে যা তাঁকে মাংস করল। যিনি অনন্তকাল ধরে ঐশ্বরিক স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই তৈলাভিষেক সেই সুখময় ও অক্ষয়শীল পুত্রের জন্মকে কোন উন্নয়ন ঘটায়নি, কিন্তু তিনি যা ধারণ করেছিলেন তাঁর সেই দেহের ও মনুষ্যত্বের পবিত্রীকরণেরই উন্নয়ন ঘটাল। প্রেরিতদূত পিতার এবিষয়ে তখনই সাক্ষ্য দেন যখন বলেন, আর আসলে, যাঁকে তুমি তৈলাভিষিক্ত করেছ, তোমার পবিত্র দাস সেই যিশুর বিরুদ্ধে তারা এই নগরীতে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল (গ), আরও, যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক’রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী

ঘটেছে, আপনারা তা জানেন : অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন (ঘ)। সুতরাং যিশুকে তৈলাভিষিক্ত করা হয় যেন মাংসের নবজন্ম-রহস্য পূর্ণতা লাভ করে। এবং তিনি কেমন করে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত হলেন, তা তখনই সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়ায় যখন তিনি যর্দন থেকে বের হওয়ার সময়ে পিতা ঈশ্বরের এই কণ্ঠস্বর শোনা হয়, তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জনিত করলাম (ঙ)। এইভাবে তাঁর মাংসের পবিত্রীকরণ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হল, এই সাক্ষ্যদানে আমরা আত্মিক পরাক্রমে তাঁর তৈলাভিষেক চিনে নিতে পারি।

১৯। কিন্তু আদিতে বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর, তাই, সেই স্বরূপ যে আদিতে ছিল তাছাড়া আমরা সেই সম্পর্কে অন্য কিছু জানি না, ফলে সেই স্বরূপ সংক্রান্ত তৈলাভিষেক কারণবিহীন ও উপলব্ধির অতীত মনে হয়। ঈশ্বর যে [পবিত্র] আত্মায় ও পরাক্রমে নিজেকে তৈলাভিষিক্ত করবেন তাতে তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না যেহেতু তিনি নিজেই ছিলেন ঈশ্বরের আত্মা ও পরাক্রম। সুতরাং, যিনি ঈশ্বর তাঁকেই আপন সঙ্গীদের চেয়ে ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত করা হয়। এবং বিধান অনুসারে যদিও মাংসধারণের আগে বহু খ্রিস্ট [অর্থাৎ তৈলাভিষিক্তজন] রয়েছেন, তবু আপন সঙ্গীদের চেয়ে তৈলাভিষিক্ত যে খ্রিস্টের কথা আমরা বলছি, তিনি তো কালের দিক দিয়ে পরের মানুষ কারণ ইতিমধ্যে- তৈলাভিষিক্ত সঙ্গীদের চেয়েই তৈলাভিষিক্ত হন। অবশেষে, ভাববাণীটা এটা দেখায় যে, এই কালে ঘটিত এই তৈলাভিষেক অন্যান্য তৈলাভিষেকের পরবর্তীই তৈলাভিষেক, ‘তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ কিন্তু অধর্ম ঘৃণা করেছে, এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমার সঙ্গীদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন’। তবে, একটা ঘটনা যা অন্যান্য ঘটনার ফলে ঘটে ও পরবর্তীকালেও ঘটে, সেই ঘটনাকে সেই ঘটনাগুলোর আগে স্থান দেওয়া যায় না; কেননা পুরস্কার শর্ত হিসাবে এমনটা দাবি করে যে, এমন কেউ থাকবে যে সেই পুরস্কার পাবার যোগ্য। যোগ্যতা অর্জন এমন একজনের অস্তিত্ব দাবি করে যে নিজের জন্য সেই যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম। তাই যদি আমরা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের জন্ম এই তৈলাভিষেকের উপর আরোপ করি কেমন যেন এই তৈলাভিষেক ধর্মময়তাকে ভালবাসার ও অধর্মকে ঘৃণা করার যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করার জন্যই মঞ্জুর করা হল, তাহলে আমরা তাঁকে জনিত বলে নয় বরং তৈলাভিষেকের মধ্য

দিয়ে একমাত্র জনিত ঈশ্বর হবার জন্য উত্তীর্ণ বলেই গণ্য করব। এর ফলে, যেহেতু তিনি ঈশ্বর বলে সজ্ঞাত নন কিন্তু তাঁর যোগ্যতার খাতিরেই ঈশ্বর বলে তৈলাভিষিক্ত হলেন, সেজন্য তিনি পরবর্তীকালীন ক্রমাগত বৃদ্ধি ও পদোন্নতি দ্বারা সিদ্ধ ঈশ্বর হবেন; এর ফলে খ্রিষ্ট হবেন কার্যজনিত ঈশ্বর ও সমস্ত কিছু খ্রিষ্ট-ঈশ্বর দ্বারা কার্যজনিত হবে না। তবে প্রেরিতদূতের এবাণীর আর কি অর্থ থাকবে, সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁরই মধ্যে; সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে অস্তিত্বশীল (ক)। প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে কোন কিছুর কারণে বা কোন কিছুর দ্বারা ঈশ্বর তা নয়, বরং তিনি ঈশ্বর বলেই সজ্ঞাত। এবং যিনি জন্ম গুণে ঈশ্বর, তিনি জন্মের পরবর্তী কোন কারণের ফলে ঈশ্বরত্বে এগোতে এগোতে পৌঁছোননি, কিন্তু জনিত হয়েছিলেন বলে সেই জন্মই তাঁকে সিদ্ধ ঈশ্বর করে। অবশ্যই, তাঁর তৈলাভিষেক একটা কারণের ফলাফল; এজন্য তৈলাভিষেক-জনিত সিদ্ধতা এমন কিছু লক্ষ করে না যার অতিরিক্ত সিদ্ধতা দরকার হতে পারে, কিন্তু তা-ই লক্ষ করে যার সেই সিদ্ধতা দরকার ছিল যা সেই তৈলাভিষেক রহস্যের উন্নতিশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রদান করে অর্থাৎ, সেই তৈলাভিষেকের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টে আমাদের মনুষ্যত্বই পবিত্রীকৃত হচ্ছিল। তাই, যখন নবী এখানেও দাস-স্বরূপধারণ-রহস্যকে নির্দেশ করেন, ও এই স্বরূপধারণের ফলে খ্রিষ্টকে তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তাঁর সঙ্গীদের চেয়ে তৈলাভিষিক্ত করা হয় ও তিনি ধর্মময়তা ভালবেসেছেন বলে ও অধর্ম ঘৃণা করেছেন বলে তাঁকে তৈলাভিষিক্ত করা হয়, তখন নবীর বাণী কেন খ্রিষ্টের সেই স্বরূপ লক্ষ করবে না যে-স্বরূপের দ্বারা তাঁর ধারণ-করা-মাংসের গুণে তাঁর সঙ্গীরাও আছে? একথা বিশেষভাবে তখনই প্রযোজ্য যখন আমরা লক্ষ করি কেমন সতর্কতার সঙ্গে নবীয় আত্মা নিজের কথা বেছে নিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হন অর্থাৎ, তাঁর স্বরূপ ক্ষেত্রে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, কিন্তু তৈলাভিষেক-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে ঈশ্বর হলেন তাঁর ঈশ্বর। সুতরাং, ঈশ্বরকে তৈলাভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আদিতো যিনি ছিলেন ঈশ্বর, সেই বাণীকেই কি তৈলাভিষিক্ত করা হয়? দূরের কথা, কারণ তৈলাভিষেক তাঁর ঐশ্বরিক জন্মের পরেই আসে। এবং যেহেতু আদিতো যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর ছিলেন সেই জনিত বাণীকেই যে তৈলাভিষিক্ত করা হয় তা নয়, সেজন্য অবশ্যই ঈশ্বরে সেই স্বরূপকেই তৈলাভিষিক্ত করা হয় যার অধিকারী

তিনি হলেন পরবর্তীকালে, ঐশ্বরিক মাংসধারণ দ্বারা। এবং যখন ঈশ্বরকে তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত করা হয়, তখন তাঁর মধ্যে সেই দাসের গোটা স্বরূপকেও তৈলাভিষিক্ত করা হয় যা তিনি নিজের মাংস-রহস্যে ধারণ করলেন।

২০। অতএব, কেউই যেন ‘মাংসে আবির্ভূত সেই মহান ধর্মভক্তি-রহস্যকে’ লঙ্ঘন করার দুঃসাহস না দেখায় বা একমাত্র জনিতজনের ঐশ্বরিক সত্তা ক্ষেত্রে নিজেকে তাঁর সমান মনে না করে **(ক)**। যেহেতু ‘বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বসবাস করলেন’, যেহেতু যিশু খ্রিষ্ট মানুষ বলে ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ, সেজন্য তিনি হোন আমাদের ভাই ও সঙ্গী। দাসদের যেমন হয়, তেমনি আমাদের সঙ্গে তিনি একই পিতা ও একই ঈশ্বরের অধিকারী হোন; এবং যেহেতু তাঁর সঙ্গীদের চেয়ে তিনিই তৈলাভিষিক্ত, সেজন্য, যদিও তাঁর তৈলাভিষেক বিশেষ অধিকার-বিশিষ্ট তৈলাভিষেক, তবু তাঁর সঙ্গীরা **(খ)** যে স্বরূপে তৈলাভিষিক্ত তিনি সেই একই স্বরূপেরই অধিকারী হোন। মধ্যস্থতা-রহস্য ক্ষেত্রে তিনি যেমন সত্যকার মানুষ তেমনি সত্যকার ঈশ্বর হোন, এমনকি তিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর হোন, কিন্তু যে সহভাগিতায় তিনি আমাদের ভাই, সেই সহভাগিতায় তিনি আমাদের সঙ্গে সমান পিতা ও সমান ঈশ্বরের অধিকারী হোন।

২১। কিন্তু সেই বশ্যতা ও সেই রাজ্য-সমর্পণ ও অবশেষে সেই সমাপ্তি [তথা তাঁর সেই মৃত্যু] হয় তো এমনটা ইঙ্গিত দিতে পারে যে তাঁর স্বরূপ বিলীন হবে, তাঁর অধিকার লোপ পাবে, তাঁর ঈশ্বরত্ব দুর্বলতা প্রাপ্ত হবে। কেননা অনেকে এটা সমর্থন করে যে, যেহেতু সমস্ত কিছু ঈশ্বরের বশীভূত করার পরে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বশীভূত করেন, সেজন্য তাঁর বশ্যতা-অবস্থা তাঁর ঈশ্বরত্বকে বাতিল করে; অথবা যেহেতু তিনি রাজ্য সমর্পণ করেন সেজন্য আর রাজত্ব করেন না; অথবা যেহেতু সমাপ্তি হয় সেজন্য সেই সমাপ্তিই হলো তাঁর অধিকার লোপ পাবার অনিবার্য ফলাফল।

২২। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূতের বাণীর উপস্থাপিত দিক-নির্দেশনা বিচার-বিবেচনা করা অসঙ্গত হবে না; তবেই, এক একটা বচনের অর্থ উপস্থাপন ও স্পষ্ট করার পর, এক একটার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে আমরা পুরো রহস্যকে ধারণ করতে পারব।

তিনি বলেন, কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রিষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সমর্পণ করবেন। কেননা যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে। কিন্তু যখন তিনি বলবেন, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে (ক)।

২৩। যাঁকে মানুষদের পক্ষ থেকে নয়, মানুষের দ্বারাও নয় কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা বিজাতীয়দের শিক্ষাগুরু বলে বেছে নেওয়া হয়েছিল, সেই প্রেরিতদূত যথাসম্ভব সূক্ষ্ম ভাষায় সমস্ত স্বর্গীয় ব্যবস্থার গুপ্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করেন। যদিও তাঁকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হলে তিনি অনির্বচনীয় কথা শুনেছিলেন, তবু মানব উপলব্ধির জ্ঞান লাভের জন্য শুধু সেই বিষয়গুলো উপস্থাপন করলেন যা মানব স্বরূপ ধারণ করতে সক্ষম ছিল। তথাপি তিনি এটা ভুলে যাননি যে এমন কতগুলো সত্য রয়েছে যেগুলো যে ক্ষণে শ্রুত ঠিক সেই ক্ষণে উপলব্ধ হতে পারে না, কারণ যা কানে ঢালা হয়, মানব দুর্বলতা তা একটু দেরি করেই মনের সত্যকার ও নিখুঁত বিচারালয়ের সামনে হাজির করে। কথা ধারণ করা ক্ষেত্রে বুদ্ধি শ্রবণশক্তির চেয়ে বেশি ধীর, কারণ কান সেই কথা শোনে কিন্তু চেতনাই সেই কথার অর্থ ধারণ করে, যদিও যারা বুঝতে আগ্রহী যিনি তাদের কাছে সেই কথার গভীর অর্থ প্রকাশ করেন তিনি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। কেননা সেই যে তিমথি নিজের দিদিমার ও নিজের মায়ের গৌরবময় বিশ্বাস গুণে শিশুকাল থেকে পবিত্র শাস্ত্রে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করা বহুল সনির্বন্ধ আবেদন ছাড়া প্রেরিতদূত এটাও যোগ করেন, আমি যা বলছি, তা বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা কর; সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু নিশ্চয়

তোমাকে বুদ্ধি দেবেন (ক)। বুঝবার আবেদন বুঝবার অসুবিধা-জনিতই ছিল। কিন্তু বুঝবার ঐশ্বরিক দান হলো বিশ্বাসের পুরস্কার: মনের এই ক্ষীণতার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস [সত্য] প্রকাশের অনুগ্রহ অর্জন করে। সুতরাং, যখন প্রেরিতদূতের সাক্ষ্য অনুসারে ‘ঈশ্বরের মানুষ’ (খ) ও বিশ্বাসে পলের প্রকৃত সন্তান সেই তিমথিকে বুঝবার জন্য আবেদন জানানো হয় (যেহেতু প্রভুই সবকিছুতে তাঁকে জ্ঞান দান করতে ইচ্ছা করেন), তখন এসো, একথা মনে রাখি যে প্রেরিতদূত আমাদেরও বুঝতে সনির্বন্ধ আবেদন জানান একথা ভালই জেনে যে, প্রভু সবকিছু বুঝবার জ্ঞান মঞ্জুর করবেন।

২৪। এবং দৈবাৎ যদি আমাদের মানব অবস্থা-জনিত ভুলের কারণে আমরা কোন না কোন পূর্বধারণায় আটকে থাকি, তবে আমরা যেন প্রকাশ-দানের দেওয়া জ্ঞান-বুদ্ধি প্রত্যাখ্যান না করি। আমরা যে হয় তো কোন এক সময় ব্যক্তিগত কোন ব্যাখ্যা দান করেছি, তার ফলে আমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় শ্রেয়তর ব্যাখ্যা মেনে নিতে যেন দ্বিধা না করি। প্রজ্ঞা ও সতর্কতার সঙ্গে এই শ্রেয়তর জ্ঞানলাভের দিকে আমাদের চালনা করার লক্ষ্যে ধন্য প্রেরিতদূত ফিলিপ্পীয়দের কাছে একথাও লেখেন, সুতরাং এসো, আমাদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ যারা, তাদের সকলের যেন এই ধারণা থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য ধারণা থাকে, তবে তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাও স্পষ্ট করবেন। আপাতত এসো, আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে একই ধারায় চলতে থাকি (ক)। যুক্তি ব্যক্তিগত ধারণা দ্বারা ঈশ্বরের দেওয়া প্রকাশ পূর্বানুমান করতে পারে না। কেননা যারা সিদ্ধ প্রজ্ঞার অধিকারী, তারা যে কিসেতে প্রজ্ঞাবান, প্রেরিতদূত তা দেখিয়েছেন, ও যারা আলাদা ব্যাখ্যা দেয় তাদের জন্য তিনি ঈশ্বরের দেওয়া প্রকাশ অপেক্ষা করেন যেন তারা সেই সিদ্ধ প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারে। তাই, যদি কেউ না কেউ ভক্তিময় জ্ঞান সংক্রান্ত এই গভীর রহস্য ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে, ও আমরা তাদের কাছে যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য কিছু অর্পণ করি, তাহলে, তারা ঈশ্বরের দেওয়া প্রকাশের দ্বারা প্রেরিতদূতের তথাকথিত সেই সিদ্ধ প্রজ্ঞা গ্রহণ করতে যেন লজ্জাবোধ না করে; এবং এত দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যায় সময় কাটাবার দুঃখের চেয়ে যেন সত্য বিষয়ে অজ্ঞতাই পছন্দ না করে। যারা ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে ও যাদের কাছে ঈশ্বর সিদ্ধ প্রজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, প্রেরিতদূত তাদের আবেদন জানান, তারা যে পথে প্রবেশ করবে যেন ত্বরার

সঙ্গে সেই পথে চলে যাতে আগেকার অজ্ঞতার অবস্থার ধারণাসমূহ ছেড়ে, যে পথে উৎসাহের সঙ্গে প্রবেশ করেছে সেই পথে এগিয়ে চলতে চলতে সিদ্ধ জ্ঞান-প্রকাশ অর্জন করতে পারে। সুতরাং এসো, যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সেই পর্যায় থেকে এগিয়ে চলতে থাকি। এবং যদি দৈবাৎ ভ্রান্তপথে চলাচল করাটা আমাদের ত্বরাকে স্থগিত করে থাকে, তাসত্ত্বেও ঈশ্বরের দেওয়া প্রকাশ হাতিয়ার করে এসো, আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অভিমুখে পুনরায় এগিয়ে চলি, ও যে পথে সাগ্রহে পা বাড়িয়েছি সেই পথ থেকে যেন আমাদের পদক্ষেপ না সরিয়ে দিই। আমরা ত্বরা করে পা বাড়িয়েছি সেই যিশু খ্রিস্টের দিকে যিনি গৌরবের প্রভু, যিনি সর্বযুগের রাজা, যাঁর মধ্যে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সবকিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, যাঁর দ্বারা সবই অস্তিত্বশীল, যাঁর মধ্যে ও যাঁর সঙ্গে চিরকালের মত থাকব। তাই এই যাত্রাপথে এগিয়ে চললে আমরা সিদ্ধ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে উঠি; এবং পরে কোন না কোন ব্যাপারে ভিন্ন ধারণা পোষণ করলে তবে ঈশ্বরই আমাদের প্রকাশ করবেন কোন্টাই সিদ্ধ প্রজ্ঞা। অতএব এসো, আমাদের সামনে রয়েছে যে বাণী, প্রৈরিতিক বিশ্বাসের আলোতে সেই বাণীর রহস্য পুনরায় অনুসন্ধান করি ও যে পদ্ধতি দ্বারা আগেকার বচন পরীক্ষা করেছি সেই একই পদ্ধতি দ্বারা তা অনুসন্ধান করি যাতে প্রৈরিতিক বিশ্বাসের একই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাখ্যা প্রতিবাদ করতে পারি যা ভক্তিহীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও প্রৈরিতিক বাণীর অন্যায় ব্যবহারে উপস্থাপিত।

২৫। তাদের পরবর্তী বচনগুলো উপস্থাপনে ভ্রান্তমতপন্থীরা তিনটে বিষয় উত্থাপন করে : প্রথমটা সমাপ্তি সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টা সমর্পণ সংক্রান্ত ও শেষ একটা বশ্যতা সংক্রান্ত। লক্ষ্যটা হলো এটাই প্রমাণ করা যে, সমাপ্তি ক্ষণে খ্রিস্ট আর নেই, রাজ্য সমর্পণ করায় তিনি সেই রাজ্য হারান, ও ঈশ্বরের বশীভূত হওয়ার পর তিনি ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে বঞ্চিত।

২৬। সর্বপ্রথমে এটাই লক্ষ করা দরকার যে শিক্ষাদানে প্রেরিতদূত যে অনুক্রম পালন করেন, সেই অনুক্রম ভ্রান্তমতপন্থীদের উপরোল্লিখিত অনুক্রম থেকে ভিন্ন। কেননা প্রেরিতদূতের শিক্ষাদানে প্রথমে রাজ্য সমর্পণের কথা, পরে বশ্যতা ও শেষে সমাপ্তির কথা উপস্থাপিত। কিন্তু এক একটা বিষয় অন্য একটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যার জন্য

একটা বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে পার হতে হতে পরবর্তী বিষয়টা আগেকার বিষয়ের অধীনস্থ। সমাপ্তি তো হবেই, কিন্তু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের কাছে রাজ্য সমর্পণ করার পরে। পরে তিনি রাজ্য সমর্পণ করবেন, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরে। তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করবেন কারণ তাঁকে যে রাজত্ব করতে হয় তা অবধারিত। পরে যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। কিন্তু তিনি সমস্ত শত্রুকে নিজের পদতলে এনে রাখবেন কারণ ঈশ্বর সবকিছু তাঁর পদতলে এনে রেখে সেই সবকিছু তাঁর বশীভূত করেছেন। এমনকি ঈশ্বর সেই সবকিছু এমনভাবে বশীভূত করেছেন যাতে মৃত্যুই হয় সেই শেষ শত্রু যা তাঁর দ্বারা পরাজিত হবে। পরে, যিনি সবকিছু তাঁর বশীভূত করেছেন তাঁকে বাদে সবকিছু তাঁর বশীভূত হলে পর তখনই তাঁকে তাঁরই বশীভূত করা হবে যিনি সবকিছু তাঁর বশীভূত করেছেন। তবে, সেই বশ্যতার কারণ এটা, যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে; এটা ছাড়া আর অন্য কারণ নেই। সুতরাং ‘যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে’, এটাই সমাপ্তি।

২৭। সর্বপ্রথমে এখন অনুসন্ধান করা দরকার যদি সেই ‘সমাপ্তি’ হলো বিলুপ্তির নামান্তর, সেই [রাজ্য] সমর্পণ হলো [রাজ্য] হারানোর নামান্তর, সেই ‘বশ্যতা’ হলো দুর্বলতার নামান্তর। এই শব্দ তিনটে তাদের বিপরীত শব্দ তিনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত না হলে তবে আমরা সেই প্রকৃত অর্থ বুঝব যে অর্থে শব্দ দু’টো উচ্চারিত হয়েছিল।

২৮। খ্রিষ্টই বিধানের সমাপ্তি (ক); কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি: খ্রিষ্ট কি বিধানকে বিলুপ্ত করতে নাকি সেটার সিদ্ধি ঘটাতে এসেছেন? কিন্তু যিনি বিধানের সমাপ্তি তিনি যদি সেটা বাতিল না করেন বরং আমি বিধান বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি (খ) বাণী পালনে তিনি বিধান পূর্ণই করেন, তাহলে ‘সমাপ্তি’ বাতিল শব্দের নামান্তর নয় বরং শব্দটা শেষ সিদ্ধিই বোঝায়। কেননা সমস্ত কিছু যে নিজেদের বাতিল করার জন্য সমাপ্তির দিকে চলে তা নয়, কিন্তু, যে সিদ্ধির দিকে চলতে শুরু করেছে সেই সিদ্ধিতে সবসময় থাকবার জন্যই চলে। এবং সমস্ত কিছু সমাপ্তির খাতিরেই অস্তিত্বশীল, কিন্তু

সেই সমাপ্তি যে অন্য কিছুকে পাবার মাধ্যম তা নয়; বরং সমাপ্তি স্বয়ংসম্পূর্ণই একটা কিছু ও তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। এবং যেহেতু সমাপ্তি নিজে থেকে বের হয় না ও নিজের জন্য ছাড়া অন্য সময়ের বা বস্তুর জন্য কাজ করে না, সেজন্য, নিজের প্রচেষ্টায়, আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা সবসময় সেই সমাপ্তির দিকে [তথা লক্ষ্যের দিকে] ধাবিত। এজন্য প্রভু ভক্তিময় বিশ্বাসের ধৈর্য বিষয়ে উপদেশ দেন যা সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে জানে: তিনি বলেন, সে-ই সুখী যে সমাপ্তি পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে (গ)। বিলুপ্তি যে সুখময়, অস্তিত্বহীন হওয়া যে কল্যাণকর ও বিশ্বাসের পুরস্কার যে এক একজনের বাতিল হওয়াতেই স্থিত, তা তিনি অবশ্যই বলেন না। বরং, যেহেতু সমাপ্তি শব্দ দ্বারা তিনি প্রতিশ্রুত সুখের শেষ অর্জন বোঝান, সেজন্য যারা সিদ্ধ সুখের সমাপ্তি-লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকে তারাই সুখী, কারণ যে প্রত্যাশায় তারা বিশ্বাসী, সেই প্রত্যাশার প্রতীক্ষার জন্য অতীত আরও কোন লক্ষ্য নেই। সমাপ্তি হলো সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থা যার দিকে আমরা ধাবিত। অবশেষে, কেমন যেন বিলুপ্তির আতঙ্ক জাগাবার লক্ষ্যে প্রেরিতদূত এই বলে ভক্তিহীনদের সমাপ্তি বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেন, তাদের সমাপ্তি কিন্তু বিনাশ, কিন্তু আমাদের প্রতীক্ষা স্বর্গেই রয়েছে (ঘ)। সুতরাং, যদি আমরা সুখীদের ও ভক্তিহীনদের সমাপ্তির কথা বলি ও শব্দটা বিলুপ্তি অর্থেই বুঝি, তাহলে ‘সমাপ্তি’ শব্দটা অবশ্যই ভক্তপ্রাণ ও ভক্তিহীন দু’জনকেই একই পর্যায়ে রাখবে, কারণ উভয়ের জন্য স্থিরীকৃত সমাপ্তি হবে তাদের মিলিত বাতিল হওয়া। কিন্তু যদি যেমন ভক্তিহীনদের জন্য তেমনি আমাদেরও জন্য সমাপ্তি হলো অস্তিত্বহীনতা, তাহলে স্বর্গে আমাদের সেই প্রতীক্ষার আর কী বাকি থাকে? কিন্তু যদিও আমরা এমনটা বলি যে, পবিত্রজনদের জন্য একটা প্রতীক্ষা রয়েছে কিন্তু ভক্তিহীনদের জন্য তাদের যোগ্য সমাপ্তি রয়েছে, তথাপি তেমনটা হলেও আমরা এটা ভাবতে পারি না যে, ‘সমাপ্তি’ শব্দটা কোন এক প্রকার লোপ পাবার নামান্তর। কেননা, যখন কষ্টভোগ করার ক্ষমতা বিলুপ্তি দ্বারা বাতিল করা হয়েছে, তখন ভক্তিহীনের পক্ষে প্রতিশোধমূলক পীড়নের অনুভূতির বাইরে থাকা কেমন দণ্ড হবে? সুতরাং, সেই ‘সমাপ্তি’ এমন চরম ও অপরিবর্তনীয় অবস্থা যা আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে; এমন অবস্থা যা প্রতিশ্রুত সুখের জন্য সংরক্ষিত ও অভক্তির জন্য প্রস্তুত।

২৯। অতএব, ‘সমাপ্তি’ শব্দটা যে বিলুপ্তি অর্থে নয় কিন্তু চরম ও অপরিবর্তনীয় অবস্থা অর্থে অনুধাবনযোগ্য, এবিষয়ে আমরা আর কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না। যদিও বলার মত আরও এমন কিছুটা রয়েছে যা আমরা বচনের শেষ ব্যাখ্যার সময়ের জন্য সংরক্ষণ করছি, তবু আমাদের ধারণা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে এই যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি তাতে তুষ্ট হয়ে এসো, দেখি রাজ্য-সমর্পণটা রাজত্ব শেষ করা বোঝায় কিনা যার ফলে পুত্র যখন রাজ্য সমর্পণ করেন তখন তিনি পিতাকে যা দান করেন সেটার অধিকারী হওয়া শেষ করেন। নিজের মূর্খ অভক্তির উন্মাদনায় এমন কেউ থাকলে যে এই ধারণা সমর্থন করবে, যুক্তিসঙ্গত ফলাফল হিসাবে তার পক্ষে এটাও সমর্থন করতে হবে যে, যখন পিতা সমস্ত কিছু পুত্রের হাতে সমর্পণ করেন, তখন, যদি সমর্পণ করা বলতে যা সমর্পণ করা হয় তা হারানো বোঝায়, তাহলে, সেই সমস্ত কিছু সমর্পণ করায় তিনি সেই সবকিছুর অধিকারী আর হলেন না। প্রভু বলেন, সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে সমর্পণ করা হয়েছে (ক) ও স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে (খ)। তাই, যদি সমর্পণ করা বলতে অধিকার ছেড়ে দেওয়া বোঝায়, তাহলে পিতা যা সমর্পণ করেছেন, তিনিও সেটার অধিকারী আর নন। কিন্তু যদি পিতা সমর্পণ করার পর সেটার অধিকার হারিয়ে না থাকেন, তাহলে পুত্রের বিষয়েও এটা ভাবা যেতে পারে যে, তিনি যা সমর্পণ করেন সেটার অধিকার হারান না। তাই, যদি আমরা এমনটা মনে করি, সমস্ত কিছু সমর্পণ করায় তিনি যা সমর্পণ করলেন সেটার অধিকার হারাননি, তাহলে সমর্পণ করার ব্যাপারে এটা মনে নিতে হবে যে, কেবল মাংসধারণ-ব্যবস্থাই এটা বোঝায় কেন, সমর্পণ করা সত্ত্বেও পিতা সেটার অধিকার হারান না ও দান করা সত্ত্বেও পুত্র সেটার অভাবী হন না।

৩০। বশ্যতা সম্পর্কে এমন কয়েকটা ঘটনা রয়েছে যা আমাদের বিশ্বাসের সাহায্যে আসতে পারে ও সেক্ষেত্রে পুত্রকে কোন না কোন ভাবে অবজ্ঞা করা থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে; তথাপি এই বচনটাই প্রধান রক্ষা স্বরূপ দাঁড়াবে। সর্বপ্রথমে আমি সুবুদ্ধির কাছে জিজ্ঞাসা করি যদি আমরা এক্ষেত্রে মনে করি যে, বশ্যতা, বলতে গেলে, সেই অর্থেই অনুধাবনযোগ্য যা পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্য অনুসারে মনিবের প্রতি দাসের, বলবানের প্রতি দুর্বলের, উচ্চপদস্থের প্রতি নিম্নপদস্থের অধীনস্থতা চিহ্নিত

করে; এর ফলে যদি এটাও মনে করি যে, পুত্র ভিন্ন স্বরূপ জনিত বৈষম্যের কারণে পিতা ঈশ্বরের অধীনস্থ হন। কিন্তু ব্যাখ্যা এটা হলে তবে প্রেরিতদূতের বাণীতে এমন প্রতিরোধমূলক উপায় পাব যাতে এই ভুল এড়াতে পারি যা মানব পূর্বধারণা চিহ্নিত করে। তিনি বলেন যে, সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর, তখনই তাঁকে তাঁরই বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। ‘তখনই তাঁকে বশীভূত করা হবে’ বলায় তিনি কাল ক্ষেত্রে মাংসধারণ-রহস্যকে জ্ঞাত করতে ইচ্ছা করেছেন। বশ্যতা বিষয়ে আমরা অন্য ব্যাখ্যা দিলে তবে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, যখন খ্রিস্টকে ‘তখনই’ বশীভূত করা হবে তখন তিনি অবশ্যই ‘এখন’ বশীভূত নন; তাতে আমরা তাঁকে এমন অবজ্ঞাপূর্ণ ও ভক্তিহীন বিদ্রোহী করব যাকে কালের প্রয়োজনীয়তা তাঁর স্বেচ্ছাচারী ও ভক্তিহীন অহঙ্কার অবনত ও বলতে গেলে শ্বাসরুদ্ধ করার পর দেরি এমন বাধ্যতা দেখাতে বাধ্য করবে। কিন্তু এটা কেমন হতে পারে যখন তিনি বলেন, আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি (ক), আরও, এজন্যই পিতা আমাকে ভালবাসেন, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি (খ), আরও পিতা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক (গ)? অথবা, কেমন করে প্রেরিতদূত বলেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন? (ঘ)। অথচ, যিনি নিজেকে অবনমিত করেছেন তিনি এমন স্বরূপের অধিকারী যা অবমাননা জানে না, ও যিনি নিজেকে বাধ্য করেন তিনি স্বেচ্ছায় বাধ্যতা মেনে নেন: কেননা তিনি নিজেকে অবনমিত করেন বলেই বাধ্য হন।

সুতরাং, একমাত্র জনিত ঈশ্বর নিজেকে অবনমিত করেন ও ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত পিতার বাধ্য হন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁর কোন্ ধরনের বশ্যতায় নিজেকে পিতার বশীভূত করা দরকার হবে যখন সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হয়েছে? কিন্তু এই বশ্যতা নবীন বাধ্যতাকে নির্দেশ করে না, কিন্তু একটা রহস্য-উদ্ঘাটন, কারণ খ্রিস্টের বাধ্যতা অনন্তকালস্থায়ী, কিন্তু তাঁর বশ্যতা কালের গড়িতে সীমাবদ্ধ। তাই, [শব্দের] অর্থের দিক দিয়ে, বশ্যতা-স্বীকার একটা রহস্য-প্রদর্শন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৩১। তবে, আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রত্যাশাকে আমাদের দৃষ্টিতে আনে, আমরা সেই প্রত্যাশা মূল্যায়ন করলে তবেই সেই রহস্য যে কী, তা বুঝতে পারি। কেননা প্রভু যিশু

খ্রিষ্ট যে মৃতদের মধ্য থেকে জেগে উঠে ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নেন, এবিষয়ে অজ্ঞ হওয়া মানায় না। এবিষয়ে প্রেরিতদূতও সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, খ্রিষ্টে প্রকাশিত তাঁর শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন, তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন (ক)। কেননা প্রেরিতদূতের ভাষা যেমন ঈশ্বরের অধিকারের যোগ্য, তেমনি ভবিষ্যতের কথা এমনভাবে উপস্থাপন করে কেমন যেন সেই ভাবীকাল ইতিমধ্যে অতীত হয়েছে। কালের পূর্ণতার ফলে যা হবে, তা ইতিমধ্যে সেই খ্রিষ্টে অস্তিত্বশীল যাঁর মধ্যে সমস্ত পূর্ণতা বিরাজিত : এবং যা কিছু ভাবীকালে হবে, তা বস্তু ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক প্রকাশের কালক্রমিক অনুক্রমকেই মাত্র লক্ষ করে, তা ঘটনাগুলোর নতুন ক্রমবিকাশ লক্ষ করে না। ঈশ্বর সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন যদিও সেসমস্ত কিছু এখনও তাঁর বশীভূত করা হয়নি : ইতিমধ্যে ঘটিতই যেন এমন বশ্যতা দ্বারা, খ্রিষ্টের অপরিবর্তনীয় অধিকার নির্দেশিত ; ভাবীই যেন এমন বশ্যতা দ্বারা, কালের সমাপ্তিতে সেগুলোর সিদ্ধি এমনভাবে নির্দেশিত তা যেন কালের পূর্ণতার ফলাফল।

৩২। তাঁর বিরোধী যত পরাক্রম যে বশীভূত করা হবে এবং বায়ুলোকের সেই অপরাজকে ও আত্মিক শঠতার প্রতাপ যে চিরকালীন বিলুপ্তির হাতে তুলে দেওয়া হবে, এধারণা সহজে উপলব্ধি করা যায়, কেননা তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা ! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও (ক)। অন্যদিকে বাতিল করা ও বশীভূত হওয়া সমার্থক শব্দ নয়। কেননা শত্রুর অধিকার বাতিল করার অর্থ হলো সবসময়ের জন্য তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ও সেই অধিকার বাতিল করার মাধ্যমে তার রাজ্যের অধিকার শেষ করে দেওয়া। এবিষয়েও প্রভু তখনই সাক্ষ্য দিলেন যখন বললেন, আমার রাজ্য ইহলোকের নয় (খ), কারণ তিনি আগেও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, এই রাজ্যের প্রভু হলো জগতের অধিপতি, ও তার অধিকার তার রাজ্যের প্রভুত্ব বাতিল

হওয়াতেই শেষ হবে। কিন্তু যে বশ্যতা বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা দাবি করে, সেই বশ্যতা হলো সম্মতি ও পরিবর্তনশীলতার প্রমাণ।

৩৩। তাই, তাদের অধিকার বাতিল করা হলে তাঁর শত্রুদের বশীভূত করা হবে। এমনকি, তাদের এমনভাবে বশীভূত করা হবে যাতে তিনিই নিজের অধীনে তাদের বশীভূত করেন। আরও, তিনি তাদের এমনভাবে বশীভূত করবেন যাতে করে ঈশ্বরই নিজের অধীনে তাদের বশীভূত করেন। এমনটা কি হতে পারে যে প্রেরিতদূত পিতা আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না (ক) এই বচনের গুরুত্ব ভুলে গেছেন যে-বচন আর একটা বচনের পাশাপাশি থাকে তথা, পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়? (খ)। সেই অনুসারে, এখন খ্রিষ্ট শত্রুদের নিজের অধীনে বশীভূত করেন, কিন্তু তবুও যিনি সেই শত্রুদের তাঁর বশীভূত করেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং এইভাবেই তিনি দেখান যে, তিনি যা কিছু করেন তা সেই ঈশ্বরের কাজ যিনি তাঁর মধ্যে সক্রিয়। এবং যদিও আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ছাড়া পিতার কাছে যেতে পারি না, তবু তাঁর কাছেও আমরা যেতে পারি না যদি পিতা আমাদের চালনা করে না থাকেন। কেননা যখন আমরা খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে চিনে নিই, তখন তাঁর মধ্যে পিতার সত্যকার স্বরূপ চিনে নিই। তাই, যখন আমরা পুত্রকে চিনে নিতে শিখেছি, তখন পিতা ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন; যখন আমরা পুত্রে বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছি, তখন পিতা আমাদের গ্রহণ করে নেন: কেননা আমরা পিতাকে সেই পুত্রে অনুভব করি ও চিনে নিই যিনি নিজেতে পিতা ঈশ্বরকে দেখান, এবং আমরা ভক্তপ্রাণ হলে তবে পিতা পিতৃস্নেহে পুত্রের কাছে আমাদের চালনা করেন। সুতরাং, যদি আমরা তাঁকে পিতা বলে বিশ্বাস করি, আর এটা তো আবশ্যকীয় শর্ত, তবে পিতা আমাদের চালনা করেন। কিন্তু পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউই পিতার কাছে পৌঁছাতে পারে না, কারণ পিতাকে জানা যায় না, যদি পুত্রে বিশ্বাস সেই আমাদের মধ্যে কার্যকারী না হয় যারা পিতাকে উপাসনায় পৌঁছাতে পারি না যদি আগে পুত্র-ভক্তিকে মেনে নিয়ে না থাকি। এমনকি, যখন পুত্র বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে থাকি, তখন পিতা অনন্ত জীবন অভিমুখে আমাদের চালনা করেন ও গ্রহণ করে নেন: উভয় বিষয় পুত্রেরই সম্পাদিত কাজ, কারণ পিতা ক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশকারী কাজ দ্বারা, এক দিকে

পিতা তাঁর কাছে চালনা করেন, অপরদিকে তিনি পিতার কাছে চালনা করেন। সুতরাং, যে বচন অনুধাবন করছি, সেটার গভীরতর জ্ঞান লাভ করার লক্ষ্যে এ রহস্য স্মরণ করানো সমুচিত ছিল যাতে আমাদের দেখানো হয় যে, পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা আমাদের চালনা করেন ও গ্রহণ করে নেন; আরও, রহস্য স্মরণ করানো এজন্য সমুচিত ছিল যাতে আমরা বুঝতে পারি, তিনি যা কিছু নিজের বশীভূত করেছেন, তা কেমন করে ঈশ্বরই তাঁর বশীভূত করেছেন। অর্থাৎ, [অনন্তকালীন] জন্মের গুণে ঈশ্বরের স্বরূপ পুত্রতে অবস্থান করে ও তা-ই করে যা পুত্র করেন: পুত্র যা করেন তা ঈশ্বরই করেন, তথাপি পুত্র নিজেও তা করেন যা ঈশ্বর করেছেন; কিন্তু সাবধান, যখন এমনটা বলা হয় যে, পুত্র কাজ করেন, তখন এটা ভাবতে হয় যে যিনি কাজ করেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র; যখন এমনটা বলা হয় যে, ঈশ্বর কাজ করেন, তখন পুত্র হিসাবে সেই খ্রিষ্টে অস্তিত্বশীল পিতার স্বরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ উপলব্ধি করা দরকার।

৩৪। তাই, যখন সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বাতিল করা হবে তখন তাঁর শত্রুদের তাঁর পদতলে রাখা হবে **(ক)**। প্রেরিতদূত নিজেই শিথিয়ে দেন কোন্ শত্রুদের কথা বলা হচ্ছে; তিনি বলেন, সুসমাচারের কথা ধরে নিলে, ওরা শত্রু—তোমাদের ভালোর খাতিরে; অপরদিকে মনোনয়নের কথা ধরে নিলে, ওরা প্রিয়জন—তাদের পিতৃপুরুষদেরই খাতিরে **(খ)**। তাই আমরা এদের খ্রিষ্টের দ্রুশের শত্রু বলে স্মরণ করি, কিন্তু, যেহেতু তারা পিতৃপুরুষদের খাতিরে প্রিয়জন, সেজন্য আমরা জানি, তারা বশীভূত হবার জন্য সংরক্ষিত, প্রেরিতদূতের এবাণী অনুসারে, তাই, নিজেদের জ্ঞানী মনে করে পাছে তোমরা গর্ব কর, এজন্য আমি চাই না, এই রহস্যটা তোমাদের অজানা থাকবে: ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে; যেমনটি লেখা আছে: সিয়োন থেকে নিস্তারকর্তা আসবেন; তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন; এ-ই হবে তাদের পক্ষে আমার সন্ধি যখন আমি তাদের সমস্ত পাপ হরণ করব **(গ)**। তাই শত্রুদের তাঁর পদতলে রাখা হবে।

৩৫। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে সেই বশ্যতার অর্থ কি, অর্থাৎ এই বাণীর অর্থ বোঝা উচিত, সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে (ক)। তবে, মৃত্যুর উপরে বিজয়টা মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থান ছাড়া অন্য কিছু নয়, যখন মৃত্যুজনিত অবক্ষয় শেষ হলে ইতিমধ্যে-জীবিত ও স্বর্গীয় স্বরূপ অনন্তকালস্থায়ী করা হবে, যেভাবে লেখা আছে, ‘কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে লড়াইয়ের মধ্যে। ওহে মৃত্যু, তোমার হল কোথায়? ওহে মৃত্যু, তোমার লড়াই কোথায়? (খ)। সুতরাং, শত্রুদের বশ্যতায় মৃত্যু পরাজিত: ও মৃত্যুর উপরে বিজয়ের পর পরে অমরতায় যাপিত জীবন আসে। এই বশ্যতার বিশিষ্ট চিহ্ন যে কি, বিশ্বাসের বশে আমাদের বশ্যতার পরে যে চিহ্ন নিজের পূর্ণতায় প্রকাশ পায়, তা প্রেরিতদূত নিজেই ঘোষণা করেছেন, যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক’রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন (গ)। সুতরাং আরও একটা বশ্যতা রয়েছে যা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা স্থানান্তরে ব্যক্ত: কেননা আমাদের স্বরূপ নিজ বর্তমানকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে ফেলে সেই অবস্থায় বশীভূত করা হয় যার রূপে স্থানান্তর করে। তথাপি, স্বরূপ যখন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলে, তখন এর অর্থ এই নয় যে সে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, কিন্তু উচ্চতর অন্য কিছুতেই উন্নীত হবে; এবং তেমন বশ্যতা একটা রূপান্তরের ফলেই হয় কারণ আমাদের স্বরূপ সেই স্বরূপের রূপে (ঘ) স্থানান্তর করে যা নিজে গ্রহণ করে।

৩৬। অবশেষে, এই রহস্যের ব্যাখ্যা যেন পূর্ণ হয়, সেজন্য একথা বলার পর যে মৃত্যুই হবে সেই সর্বশেষ শত্রু যা পরাজিত হওয়ার কথা, প্রেরিতদূত একথা যোগ করেন, কিন্তু যখন তিনি বলবেন যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু, তখন পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে (ক)। সুতরাং রহস্যটির প্রথম পর্যায় এরূপ: সবকিছুই পুত্রের বশীভূত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় এরূপ:

পুত্রকে নিজেকে তাঁর বশীভূত করা হবে যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। যেমন আমরা তাঁর রাজকীয় দেহের গৌরবে বশীভূত, তেমনি একই রহস্য গুণে যিনি এখন দেহগত গৌরবে রাজত্ব করছেন, তিনি নিজেও তাঁরই বশীভূত যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। এবং আমাদের তাঁর দেহের গৌরবে বশীভূত করা হয় যেন সেই গৌরবেরই অংশীদার হতে পারি যে গৌরবে তিনি দেহে রাজত্ব করেন, কেননা আমরা তাঁর দেহের অনুরূপ হয়ে উঠব।

৩৭। সুসমাচারও তাঁর বর্তমান-রাজত্বকারী দেহের গৌরব বিষয়ে নীরব থাকে না; লেখা রয়েছে, এমনকি প্রভুই একথা বলেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর আশ্বাদ পাবে না (ক)। ছ' দিন পর পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক তুষারের মত মত নির্মল হয়ে উঠল (খ)। এইভাবে, যে দেহ নিজের রাজ্যে আসছিল, প্রেরিতদূতদের সেই দেহের গৌরব দেখানো হলো: প্রভু তাঁর গৌরবময় রূপান্তরের অবস্থায় প্রকাশ পেলেন ও নিজের রাজত্বকারী দেহের উজ্জ্বলতায় নিজেকে দেখালেন।

৩৮। তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে প্রতিশ্রুত হলেন, তাঁরা তাঁর এই গৌরবের সাহচর্যের অংশী হবেন; তিনি বললেন, অস্তিম কালে তেমনি ঘটবে: মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন; যা যা পতন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তাঁর রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক (ক)। এমনটা কি হতে পারে যে, কারও কারও প্রাকৃতিক ও শারীরিক দিক দিয়ে এমন কান নেই যা সেই বাণী শুনবার জন্য খোলা, যার ফলে, সেই বাণী শোনার জন্য তার পক্ষে প্রভুর সেই সতর্কবাণী দরকার ছিল? বরং এটাই সত্য যে, প্রভু রহস্য-জ্ঞান প্রবেশ করাতে করাতে বিশ্বাসেরই শিক্ষার দিকে কান

পাততে আঙ্গা করেছেন। সুতরাং, জগতের অন্তিম ক্ষণে যা কিছু পতনের কারণ তা তাঁর রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হয়। তাই, পতনের যত কারণ দূর করে দেওয়া না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রভুকে নিজের দেহের গৌরবে রাজত্ব করতে দেখি। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূর্যের দীপ্তির অংশী বলেই যেন উজ্জ্বল হয়ে আমরা নিজেরা পিতার রাজ্যে তাঁর দেহের গৌরবে উন্নীত হচ্ছি সেই দীপ্তিতেই পরিবৃত হয়ে, তিনি নিজে যে দীপ্তিতে পরিবৃত হয়ে তখনই প্রেরিতদূতদের কাছে তাঁর রাজ্যের চেহারা দেখালেন যখন সেই পর্বতে রূপান্তরিত হলেন।

৩৯। তাই খ্রিষ্ট রাজ্যকে পিতা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করবেন : রাজ্যকে সমর্পণ করায় তিনি যে, বলতে গেলে, নিজের অধিকার হারান এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তাঁর দেহের গৌরবে উত্তোলিত হয়ে আমরা নিজেরা ঈশ্বরের রাজ্য হব। তিনি তো বলেন না ‘তিনি নিজের রাজ্য সমর্পণ করবেন’, কিন্তু বলেন, ‘তিনি রাজ্য সমর্পণ করবেন’, কারণ তিনি ঈশ্বরকে এই আমাদের সমর্পণ করবেন যাদের তাঁর দেহের গৌরবারোপণে সেই রাজ্য করা হয়েছে। তিনি সুসমাচারের একথা অনুসারেই রাজ্য বলে আমাদের সমর্পণ করবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপতনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (ক)। তাই ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হবে। কেননা পুত্র নিজের রাজ্যরূপে তাদেরই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবেন যাদের তিনি নিজের রাজ্যে আহ্বান করেছেন ; তাদেরই আহ্বান করবেন যাদের কাছে এই রহস্যের সুখও দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তথা শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (খ)। সুতরাং, যখন তিনি রাজত্ব করবেন তখন যত পতনের কারণ দূর করে দেওয়া হবে এবং তখনই ধার্মিকেরা পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। পরে তিনি পিতা ঈশ্বরকে রাজ্য সমর্পণ করবেন, ও ঈশ্বরের কাছে রাজ্যরূপে যাদের সমর্পণ করবেন তারা তখনই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। যে রাজ্য তিনি সমর্পণ করবেন, সেই রাজ্য কেমন সেবিষয়ে তিনি নিজে ঘোষণা করলেন যখন প্রেরিতদূতদের বললেন, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝে উপস্থিত (গ)। তাই রাজা হিসাবে তিনি রাজ্য সমর্পণ করবেন। এবং যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে এমনটা জিজ্ঞাসা করবে, যিনি রাজ্য

সমর্পণ করবেন, তিনি কে, তাহলে সে উত্তরে শুনতে পাবে, খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান (ঘ)। এক্ষেত্রে এপর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তা দেহ-রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ খ্রিষ্ট হলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত। যে রহস্য গুণে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, সেই রহস্য যে কি, এসো, তা প্রেরিতদূতের এবাণী থেকে জানতে চেষ্টা করি, মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন (ঙ)। এইভাবে তিনি এটা শিখিয়ে দেন যে, যে ব্যবস্থা দ্বারা খ্রিষ্ট মাংস হন, কেবল সেই ব্যবস্থাই হলো সেই মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণ।

৪০। ইতিমধ্যে-গৌরবান্বিত করা যে দেহ, তিনি ঠিক তাঁর এই দেহেই রাজত্ব করেন যতক্ষণ সমস্ত আধিপত্য বাতিল হলে ও মৃত্যুর উপরে পূর্ণ বিজয় লাভ করলে তিনি তাঁর শত্রুদের বশীভূত না করে থাকেন। আর আসলে প্রেরিতদূত দ্বারা এই অনুক্রম পালন করা হয়েছে: আধিপত্য ও কর্তৃত্ব ক্ষেত্রে তিনি বাতিল করার কথা বলেন, কিন্তু শত্রুদের ক্ষেত্রে বশীভূত করার কথা বলেন। এরাই বশীভূত হলে তাঁকে তথা খ্রিষ্টকে তাঁরই বশীভূত করা হবে যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে (ক) ধারণ-করা আমাদের সেই দেহের স্বরূপে পিতার সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ আরোপণ দ্বারা (খ)। ঈশ্বর হবেন সবই সবকিছুর মধ্যে কারণ মাংসধারণ-ব্যবস্থা গুণে, ঈশ্বর ও মানুষ হিসাবে খ্রিষ্ট হয়ে ওঠেন ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ। সেই মাংসধারণ-ব্যবস্থার ফলে তিনি আমাদের মাংসময় স্বরূপের যা তা আপন করে নেন, ও সেই বশ্যতার ফলে সমস্ত কিছুতে ঈশ্বরত্ব অর্জন করবেন যাতে তিনি আংশিক ভাবে নয় কিন্তু সম্পূর্ণ রূপেই ঈশ্বর হন। সুতরাং, বশ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য এটা, যেন ঈশ্বর এমনভাবে সবই হন সবকিছুর মধ্যে যাতে খ্রিষ্টের মধ্যে খ্রিষ্টের পার্থিব দেহের স্বরূপের কোন অংশ না থাকে বরং তিনি যেন কেবলমাত্র ঈশ্বরই হয়ে ওঠেন যদিও আগে তাঁর মধ্যে যা মানবীয় ও ঐশ্বরিক তা সংযুক্ত ছিল। তবু এসমস্ত কিছু দেহ-ত্যাগের মাধ্যমে নয় কিন্তু বশ্যতা-জনিত স্থানান্তরের মাধ্যমেই হয়; বাতিল দ্বারা দেহ-হারানোর মাধ্যমে নয় কিন্তু গৌরবে রূপান্তরের মাধ্যমেই হয়; নিজের মনুষ্যত্ব দ্বারা ঈশ্বরত্ব থেকে নিজেকে বঞ্চিত

করার মাধ্যমে নয় কিন্তু নিজের ঈশ্বরত্বে মনুষ্যত্বকে যোগদানের মাধ্যমেই হয়। তিনি যেন আর না হন এজন্যই যে তিনি বশীভূত তা নয়, কিন্তু এজন্যই, যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে। কেননা বশ্যতা-রহস্যে তিনি যা আর নন (গ), তা হতে চলবেন, ও তাঁর অস্তিত্ব যেন বিলুপ্তি দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, এজন্যই যে তিনি নিজের সত্তা থেকে বঞ্চিত হবেন তা নয়।

৪১। প্রৈরিতিক অধিকার এই সত্য বিষয়ে ধর্মসম্মত নিশ্চয়তা দানের জন্য যথেষ্ট, সেই যে সত্য অনুসারে, নিদ্রাগতদের প্রথমফসল সেই প্রভু যিশু খ্রিস্টকে সময়মত ঐশ্বরিক ব্যবস্থা দ্বারা বশীভূত হতে হবে যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে। সেজন্য সেই বশ্যতা খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বকে ক্ষীণ করা নয় কিন্তু তাঁর ধারণ করা স্বরূপকে উন্নয়ন, কারণ যিনি ঈশ্বর ও মানুষ তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর। আমরা বিশ্বাস করি, খ্রিস্ট দেহে রাজত্ব করেন বলে তিনি দেহে গৌরবান্বিত; এটাও বিশ্বাস করি যে, তাঁকে বশীভূত হতে হবে ‘যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে’; তথাপি পাছে এমনটা ভাবা হয় আমরা সুসমাচারগুলোতেও যথেষ্ট অবলম্বন করিনি, সেজন্য আমরা কেবল প্রেরিতদূতের বাণী দ্বারা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভুর উক্তি দ্বারাও আমাদের বিশ্বাস বিষয়ে নানা সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে ইচ্ছা করি। আমরা এমনটা দেখাব যে, পলের আগে খ্রিস্ট নিজেই আগে থেকে তা ব্যক্ত করেছিলেন যা পরে পলের মুখ দিয়ে পুনরায় উচ্চারণ করলেন।

৪২। যখন প্রভু সুস্পষ্ট অর্থবাহক কথা দিয়ে নিজের প্রেরিতদূতদের কাছে এই গৌরবের কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন, এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করেছেন (ক)। ‘এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন’ বাক্যে আমরা আগে মানবপুত্রের গৌরব পাই, পরে মানবপুত্রে ঈশ্বরের গৌরব পাই। তাই প্রথমে দেহের সেই গৌরব নির্দেশিত যা দেহ ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে নিজের সংযোগের ফলে অর্জন করে; পরে পূর্ণতর সেই গৌরবে উন্নয়নের কথা আসে যা দেহকে ইতিমধ্যে-মঞ্জুর করা গৌরব-বৃদ্ধির ফলে অর্জন করা গৌরব: ‘ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে

গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বর নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করেছেন।’ ঈশ্বর তাঁকে নিজের মধ্যে গৌরবান্বিত করেছেন কারণ ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। কেননা খ্রিষ্টে ঈশ্বরের গৌরবারোপণ তাঁর দেহের গৌরব লক্ষ্য করে; সেই গৌরবের দ্বারাই ঈশ্বরের গৌরব মানবদেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হল, কারণ ঈশ্বরের গৌরব মানবপুত্রের গৌরবে চিনে নেওয়া যেতে পারে। ‘ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন ও সেইজন্য ঈশ্বর নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন’, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে যাঁর গৌরব বৃদ্ধি পেল তাঁকে ঈশ্বরত্বে উন্নয়ন দ্বারা ঈশ্বর তাঁকে নিজের মধ্যে গৌরবান্বিত করেছেন। যে গৌরব ঈশ্বর থেকে উদ্গত, এই ক্ষণের আগেও খ্রিষ্ট সেই গৌরবে রাজত্ব করেন, কিন্তু এখন থেকে তিনি নিজেও ঈশ্বরের গৌরবে স্থানান্তর করেন। কেননা ঈশ্বর ‘নিজের মধ্যেই’ তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন, অর্থাৎ সেই স্বরূপেই তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন যে-স্বরূপ দ্বারা ঈশ্বর যা হন তা হন যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে; অর্থাৎ: খ্রিষ্ট যে ব্যবস্থা অনুসারে মানুষ, সেই ঐশ্বরিক ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করেছে বলে এখন তাঁর সমস্ত সত্তা অনন্তকাল ধরে ঐশ্বরিক হবে। এসমস্ত কিছু কাল বিষয়েও তিনি নীরব থাকলেন না, কারণ তিনি বললেন, ‘ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করেছেন’। যে ক্ষণে যুদা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ক্ষণেই তিনি সেই গৌরবকে বর্তমান বলে নির্দেশিত করেছিলেন যা যজ্ঞগাতোলের পরেই তাঁর পাবার কথা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর যে গৌরবে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, সেই গৌরবকে তিনি ভাবীকালের জন্যই রেখেছিলেন। ঈশ্বরের গৌরব তাঁর মধ্যে পুনরুত্থানের পরাক্রমের মধ্য দিয়েই দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সেই বশ্যতা-ব্যবস্থা পূরণের ফলেই তিনি অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের গৌরবে অর্থাৎ সেই ঈশ্বরেই অবস্থান করবেন যিনি সবই সবকিছুর মধ্যে।

৪৩। এবং এক্ষেত্রে, সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের ক্ষিপ্ততা কতই না মূর্খ যখন মানুষ যে লক্ষ্য পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশা করে তারা সেই লক্ষ্য ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য ও এমনটাও মনে করে যে, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যা করতে পারেন তা নিজের মধ্যে করতে পারেন না। যে কেউ যুক্তিসঙ্গত ভাবে কথা বলে ও চিন্তা করে, সে তো বলে না, ঈশ্বর, বলতে গেলে, নিজের স্বরূপ দ্বারাই আমাদের সুখ যোগাতে বাধ্য কিন্তু নিজেকে কোন সুখ দিতে পারেন

না। যাঁর স্বরূপ ও পরাক্রম অপরিবর্তনীয়, সেই ঈশ্বরের পক্ষে বাড়তি আর কোন সুখ দরকার হয় না। কিন্তু, যেহেতু মহান ধর্মভক্তির ব্যবস্থা ও রহস্যক্রমে যিনি ঈশ্বর তিনি মানুষও হলেন, সেজন্য আমরা এমনটা বলতে পারি না যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর করতে অক্ষম, কেননা তিনি নিঃসন্দেহেই আমাদের এমনটা মঞ্জুর করবেন যাতে আমরা এখনও যা নই, তা হতে পারি। মানব জীবন ও মৃত্যুর সমাপ্তি হলো পুনরুত্থান : ও আমাদের সংগ্রামের নিশ্চিত মজুরি হলো অক্ষয়শীল অনন্ততা ; চিরকালীন দণ্ড যে অনন্তকাল ধরে চলবে এজন্যই যে সেই অনন্ততা অনন্তকালস্থায়ী তা নয়, কিন্তু আমরা যেন অনন্তহীন গৌরব ভোগ করতে ও সেই গৌরবে আনন্দিত হতে পারি সেইজন্য সেই অনন্ততা অক্ষয়শীল। সুতরাং, যখন পার্থিব উৎপত্তির এই আমাদের দেহ উচ্চতর স্বরূপের অবস্থায় উন্নীত হবে ও প্রভুর দেহের গৌরবের সদৃশ হবে, তখন যিনি দাসের রূপে থাকাকালেও দেহে ইতিমধ্যে গৌরবান্বিত হয়েও দাসের রূপে প্রতিপন্ন হলেন, সেই ঈশ্বর কি ঈশ্বরের সদৃশ হবেন না? যিনি নিজের গৌরবান্বিত দেহের রূপ আমাদের দান করবেন, তিনি, আমাদের সঙ্গে যাতে সহভাগী তা ছাড়া কি নিজের দেহকে কিছুই দিতে পারবেন না? ‘তাকেও তাঁর বশীভূত করা হবে যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন, যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে’ বাক্য বিষয়ে বেশির ভাগ ভ্রান্তমতপন্থীরা এই অর্থে ব্যাখ্যা দেয় যে, পুত্রকে পিতা ঈশ্বরের বশীভূত করা হবে যেন পুত্রের বশ্যতা দ্বারাই ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যে সবই হতে পারেন; পুত্রের বশ্যতার ফলে তাঁর যে পূর্ণতা নিরূপিত, কেমন যেন ঈশ্বর সেটার অভাবী। তেমনটা হলে তবে একথা স্পষ্ট যে, যখন ঈশ্বর কেবল কালের পূর্ণতায় সবকিছুর মধ্যে সবই হতে পারবেন, তখন তাঁকে পূর্ণ ও সুখময় ঈশ্বরত্ববিহীন (ক) বলে পরিগণিত হতে হবে।

৪৪। আমি মনে করি, ঈশ্বর-জ্ঞান কেবল ভক্তি দ্বারাই লব্ধ হতে পারে, ও সেজন্য এধরনের অভিযোগ সমর্থন করার চেয়ে সেই সমস্ত অভিযোগ প্রতিবাদ করাই কম ভক্তিময় মনে করি। কথা ব্যক্ত করার যার ক্ষমতা আমাদের জ্ঞান-ক্ষমতার চেয়ে সীমাবদ্ধ, যা মানব মনের উপলব্ধির ক্ষমতা অতিক্রম করে, ঈশ্বরের সেই স্বরূপ যে সেই কথা দিয়েই বর্ণনা করা যেতে পারে, এমনটা বিশ্বাস করা আমার কাছে ভক্তিহীন মনে হয়। আমার কাছে এটাও ভক্তিহীন মনে হয়, তথা, প্রথমত, এবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা

যে ঈশ্বর কোন না কোন বিষয়ে অভাবী, বা তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত কিনা, বা তিনি ইতিমধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েও অতিরিক্ত পূর্ণতা ক্ষেত্রে তাঁর এখনও পূর্ণতর হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। কিন্তু, যিনি নিজে নিজের অনন্তকালীন ঈশ্বরত্বের উৎস, সেই ঈশ্বর যদি এমন অগ্রগতি বিষয়ে সক্ষম হতেন যাতে আজকের চেয়ে আগামীকাল আরও পূর্ণতর হতেন, তাহলে তাসত্ত্বেও তিনি এমন পর্যায়ে কখনও পৌঁছোতে পারতেন না যে পর্যায়ে তিনি কোন না কোন কিছুতে অভাবী নন। কেননা অগ্রগতি-সক্ষম এমন স্বরূপের যে অধিকারী, তার বিষয়ে আমরা এমনটা ভাবতে পারি না, সে অগ্রসর হওয়ার বাকি আর কোন সম্ভাবনা ছাড়াই অগ্রসর হয়েছে। অগ্রগতি-নিয়ম সাপেক্ষ একটা স্বরূপ যদিও সবসময় অগ্রসর হয়, তথাপি সেই স্বরূপ সবসময়ই অতিরিক্ত অগ্রগতি-সক্ষম। তবে যে সত্তা সিদ্ধ পূর্ণতায় রয়েছে এমনকি সবসময়ের জন্যই সেই অবস্থায় রয়েছে, সেই সত্তার জন্য আরও বেশি পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আর রাখা হয় না, কারণ সিদ্ধ পূর্ণতা আরও পূর্ণতর পূর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারে না। ভক্তিময় ধারণার মনোভাব এটা: ঈশ্বর ক্ষেত্রে এমনটা বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বর কোন কিছুতে অভাবী নন, তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

৪৫। অন্যদিকে, আমাদের যে কেমন প্রকার স্বীকারোক্তিতে ঈশ্বর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত, সেবিষয়ে অবহেলা না করে প্রেরিতদূত বলেন, আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্জয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান? কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে (ক)। কোনও পার্থিব মন ঈশ্বরকে নির্ধারণ করতে পারে না, ও যখন মনের উপলব্ধি-শক্তি তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতায় নিমজ্জিত হয়, তখন সেই উপলব্ধি-শক্তি তাঁর সেই প্রজ্ঞার গভীরতার তলে প্রবেশ করতে পারে না; তাঁর বিচারসকল তাঁর সৃষ্টজীবদের কুটিল অনুসন্ধানকে এড়ায়, ও সন্ধানের অতীত যে কর্মপথ ঈশ্বর-জ্ঞানে চালনা করে, যারা সেই কর্মপথ সাগ্রহে অনুসন্ধান করে, তাদের সামনেও সেই কর্মপথ উন্মুক্ত হয় না। তাঁর সকল বিচার দুর্জ্জয়তার গভীরতায় নিমজ্জিত, ও ঈশ্বরের বিষয়াদি ক্ষেত্রে কিছুই আবিষ্কার করা যাবে না, কিছুই নাগাল পাওয়া যাবে না। কেউই তাঁর চিন্তা জানতে পারেনি, এবং নিজের

প্রজ্ঞা ছাড়া তিনি অন্য প্রজ্ঞার প্রয়োজন কখনও অনুভব করেননি। কিন্তু এসমস্ত কথা এখন আমাদেরই জন্য প্রযোজ্য, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়; মহাসুমন্ত্রণার দূত যে তিনি, তাঁর জন্যও প্রযোজ্য নন, সেই যে দূত এও বলেন, পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিহেঁ তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন (খ)। তথাপি, আমাদের উপলব্ধি-শক্তি যখন নিজের নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা ঐশ্বরিক স্বরূপের গভীরতায় নিজেকে নিমজ্জিত করতে চেষ্টা করে, তখন আমাদের সেই দুর্বল উপলব্ধি-শক্তিকে সংযত রাখবার জন্যই প্রৈরিতিক স্বীকারোক্তির ভাষার কথা আমাদের সযত্নে মনে রাখা উচিত, পাছে ঈশ্বর আমাদের যা দিতে প্রসন্ন হয়েছেন, আমাদের চিন্তাসকলের স্পর্ধা ঈশ্বরের কাছ থেকে তার চেয়ে আরও বেশি দাবি করে।

৪৬। প্রাকৃতিক তত্ত্ববিদ্যার সর্বস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধ সত্যই যে উপলব্ধি-ক্ষেত্রে এমন কিছুই পড়ে না যা সেটার উপলব্ধি-শক্তি সাপেক্ষ নয়। তেমনি চোখের সামনে রাখা কোন বস্তুর বেলায়ও হয় বা অন্য যেকোন ব্যাপারের বেলায়ও হয় যা মানবের উপলব্ধি বা বুদ্ধির জন্মের পরবর্তী বিষয়। প্রথমটা আমরা দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি ও মন সেবিষয়ে নিজের বিচার ব্যক্ত করতে সক্ষম যেহেতু মন স্পর্শন ও দর্শন ইন্দ্রিয় দ্বারা তা পরীক্ষা করতে পারে। দ্বিতীয়টা, কাল-ক্ষেত্র সংক্রান্ত এমন ঘটনা যা মানবের উৎপত্তির পরে ঘটিত বা শুরু করা ঘটনা হওয়ায় সেটাও উপলব্ধি-শক্তির বিচারের অধীন, কারণ কালের দিক দিয়ে তা আমাদের উপলব্ধি-শক্তির পূর্ববর্তী নয়। কেননা আমাদের দৃষ্টিশক্তি অদৃশ্য কোনও কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ দৃষ্টিশক্তি কেবল দৃশ্যগত বস্তুই নির্ণয় করতে পারে; এবং আমাদের চিন্তা যে কালে ছিল না সেই কালে প্রবেশ করতে পারবে না ও তার আগে জনিত বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে না যেহেতু তা-ই মাত্র বিচার করতে পারে যা কাল ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী। সেই যে চিন্তা নিজের প্রকৃতিগত দুর্বলতা জনিত সীমাবদ্ধতার কারণে অনিশ্চিত, সেই চিন্তা নিজেও কারণ-কার্যফলের সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী নয়; এমনকি, সেই মানব চিন্তা নিজের উৎপত্তির পূর্ববর্তী বিষয়ের অতীতেও পিছনের দিকে যেতে পারে না ও নিজের

উপলব্ধি-শক্তি দ্বারাও এমন বিষয় ধারণ করতে পারে না যা অনন্তকালীন হওয়ায় তার চিন্তার পূর্ববর্তী।

৪৭। যা কিছু কালে ঘটে না ও ইন্দ্রিয়শক্তির উৎপত্তির পূর্ববর্তী, তা জ্ঞাত হতে পারে না ; এজন্য ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার গভীরতা, তাঁর দুর্জ্জের বিচারসকলের অসীমতা, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ, তাঁর অগাধ মনের রহস্য, তাঁর অগম্য ও বোধের অতীত সুমন্ত্রণা মনে করিয়ে দেওয়ার পর প্রেরিতদূত বলে চলেন, আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিফল? কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে (ক)। আপন অনন্ততায় ঈশ্বর কোনও সীমাবদ্ধতার অধীন নন ও তাঁর নিজের অস্তিত্বের পূর্ববর্তী এমন যুক্তি ও উপলব্ধি-শক্তির কোনও কর্মক্রিয়াকেও সক্রিয় হতে দেন না। সেজন্যই তাঁর গোটা সত্তা অগম্য ও দুর্জ্জের গভীরতা স্বরূপ। আমরা তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করার জন্য যে তাঁর গোটা সত্তার কথা বলি তা নয়, বরং তা বলি যেন তাঁকে তাঁর অন্তহীন অসীমতায় উপলব্ধি করতে পারি। কেননা তিনি কারও কাছ থেকে নিজের সত্তা পাননি ও এমন কেউই নেই যে প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে যার ফলে তিনি সেই দাতাকে সৌজন্য প্রতিদান দিতে বাধ্য হন। ‘সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য’। যিনি সমস্ত কিছুর আদিকারণ, যিনি সমস্ত কিছুর নির্মাতা, যিনি সমস্ত কিছু নিজেতে ধারণ করে আছেন, যিনি সমস্ত কিছুর অতীতে বিদ্যমান, যিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা, সেই সমস্ত কিছু তাঁর দরকার হয় না ; ও যা কিছু তাঁরই, তিনি সেটার অভাব ভোগ করেন না। তাঁর আগে কিছুই নেই, তাঁর থেকে ছাড়া কোন কিছু উৎপন্ন নয়, তাঁর বাইরেও কিছুই নেই। পূর্ণতা ক্ষেত্রে তাঁর কেমন বৃদ্ধি দরকার যাতে অতিরিক্ত এক কালে ‘তিনি সবই হন সবকিছুর মধ্যে’? এবং যখন তাঁর বাইরে কিছুই নেই, তখন তিনি কোথা থেকে কিছুটা পাবেন? কিন্তু তাঁর বাইরে কিছু না থাকলেও তিনি সদা-বিদ্যমান। এবং যিনি সদা-বিদ্যমান ও যাঁর বাইরে কিছুই নেই, তাঁকে কোন্ অগ্রগতির ফলে পূর্ণতায় উপনীত করা হবে? ও তিনি যা, অতিরিক্ত কোন্ কিছুর সংযোজনের ফলে তাঁকে তা দ্বারা অন্য কিছু করে তোলা হবে যখন তিনি বলেন, আমি আছি, আমাতে কোন পরিবর্তন নেই? (খ)। কেননা তাঁর মধ্যে পরিবর্তনের জন্য স্থান নেই, উন্নতির জন্য জায়গা নেই, তাঁর অনন্ততার পূর্ববর্তী কোন কিছুর জন্য জায়গা

নেই, তাঁর ঈশ্বরত্বের চেয়ে অধিকতর ঐশ্বরিক কিছু জন্ম জায়গা নেই। তাই পুত্রের বশ্যতার মাধ্যমেই যে ঈশ্বর সবই হবেন সবকিছুর মধ্যে, তা নয় : এবং যাঁর থেকে, যাঁর দ্বারা ও যাঁর মধ্যে সমস্ত কারণ রয়েছে, তাঁকে অন্য কোন কারণ দ্বারা পূর্ণতায় উপনীত করা হবে না। তিনি ঈশ্বর, ও ঈশ্বর হয়ে থাকবেন, অতিরিক্ত অন্য পূর্ণতার তাঁর কোন দরকার হয় না, কারণ তিনি যা, তিনি অনন্তকালীন ভাবে নিজে থেকে ও নিজেতেই তা।

৪৮। কিন্তু একমাত্র জনিত ঈশ্বরও স্বরূপ-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার অধীন নন। তিনি তো ঈশ্বর, এবং এই নাম এমন যা পূর্ণ ও সিদ্ধ ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে। কেননা, আমরা আগে যেমন ব্যাখ্যা করেছি, সেই অনুসারে, তিনি যে গৌরব দাবি করেছেন, সেই গৌরবের অর্থ ও তাঁর বশ্যতার কারণ এটা যে, যেন ‘ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে’। কিন্তু, ঈশ্বর যে সবই হোন সবকিছুর মধ্যে, তা তো রহস্য, প্রয়োজনীয়তা নয়। ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করলেও খ্রিষ্ট দাসের রূপ ধারণ করেছেন : তাঁর পরিবর্তন হয়নি, বরং নিজেকে শূন্য করেও নিজের অধিকারে থেকেই তিনি নিজেকে শূন্য করেছেন ও নিজেতে লুকিয়ে রেখেছেন। পাছে তাঁর ধারণ করা আমাদের সেই নিম্নাবস্থা তাঁর স্বরূপের অধিকার ও অসীমতা সহ্য করতে অক্ষম হয় সেই লক্ষ্যে তিনি মানুষের রূপ ও অবস্থা ধারণ করা পর্যন্তই নিজেকে নমিত করলেন। তাঁর সীমাহীন অধিকার কোন না কোন সীমা গ্রহণ করে নিল, কারণ এটা দরকার ছিল যে, যে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাঁর সেই অধিকার সেই দেহকে সহ্য করা পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করবে। তিনি যে নিজেকে নিজেতে সীমাবদ্ধ করেছেন ও নিজেকে শূন্য করেছেন, তাতে তাঁর অধিকার হ্রাস পেল না। নিজেকে শূন্য করে তিনি যে নিম্নাবস্থা মেনে নিলেন, সেই অবস্থায় নিজেতে নিজের সেই অধিকারের সমস্ত পরাক্রম অনুশীলন করলেন যা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

৪৯। ঈশ্বর যে সবই হবেন সবকিছুর মধ্যে, তা তাঁর ধারণ করা আমাদের সেই মানব অবস্থা উন্নীত করে। যিনি দাসের রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের রূপে হলেও তাঁকে পিতা ঈশ্বরের গৌরবে পুনরায় স্বীকৃত হতে হবে, যাতে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, তাঁকে যাঁর গৌরবে স্বীকৃত হতে হবে তিনি সেই ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করেন। সুতরাং, এটা কেবল ঈশ্বরেরই ইচ্ছার ব্যবস্থা, এটা স্বরূপের কোনও পরিবর্তন নয় : তিনি যাঁর

মধ্যে ছিলেন, তাঁর মধ্যে হতে থাকেন। অপরদিকে, যখন নতুন স্বরূপ হয় অর্থাৎ মানুষ হিসাবে তাঁর জন্ম হয়, তখন সবকিছু সেই স্বরূপেরই উন্নতির জন্য অর্জিত যা আগে সেই ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য বিহীন ছিল, কারণ—এটা তো জানা কথা—[মাংসধারণ] ব্যবস্থারহস্যের পরে ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে। সুতরাং এক্ষেত্রে সমস্ত লাভ আমাদেরই, সমস্ত উন্নতি আমাদেরই, অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বরের দেহের গৌরবে উন্নীত করা হবে। এদিকে, মানুষ হিসাবেও সজ্ঞাত হয়েও সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর, যিনি সবই সবকিছুর মধ্যে, সেই ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নন। দেহের যে বশ্যতা দ্বারা তাঁর মধ্যে যা কিছু মাংসময় তা আত্মিক স্বরূপে কবলিত, দেহের সেই বশ্যতা এমনটা করবে যাতে যিনি ঈশ্বর হওয়া ছাড়া মানুষও, তিনি যেন ঈশ্বর হন ও সবই হন সবকিছুর মধ্যে। কিন্তু, এই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর তাঁর যে মনুষ্যত্ব, তা তো আমাদেরও। কেননা আমাদের এমন গৌরবে উন্নীত করা হবে যা তাঁরই গৌরবের সদৃশ যিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন, এবং আমরা ঈশ্বর-জ্ঞানে নবীকৃত হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পুনরায় নির্মিত হব, প্রেরিতদূতের এবাণী অনুসারে, তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে (ক)। এইভাবে মানুষ ঈশ্বরের সিদ্ধ প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। কেননা ঈশ্বরের দেহের গৌরবের অনুরূপ হয়ে মানুষ সেই প্রথম মানুষের জন্য স্থির করা নমুনা অনুসারে সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি হয়। সে পাপ ও পুরাতন মানুষকে পিছনে ফেলে রাখে ও ঈশ্বর-জ্ঞানে নতুন মানুষ হয়ে উঠে নিজের সৃষ্টির স্বকীয় সিদ্ধতায় গিয়ে পৌঁছায়, কারণ সে নিজের ঈশ্বরকে জানে ও তেমন জানার ফলে তাঁর প্রতিমূর্তি হয়। ভক্তি গুণে মানুষ অনন্ততায় উন্নীত হয়, অনন্ততা গুণে সে নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি বলে অনন্তকাল ধরে জীবনযাপন করবে।

১ (ক) এফে ৪:৪-৬ লাতিন পাঠ্য।

৫ (ক) কল ১:১৫ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৬ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৭ (ক) ঈশ্বরের ‘সেই সমস্ত কথার জন্য বাড়তি সমর্থনেরও দরকার হয় না, পরকীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যারও দরকার হয় না’: সাধু হিলারিউস সেকালের মণ্ডলীর নিয়ম উপস্থাপন করেন যা অনুসারে বাইবেল-ব্যাখ্যা বাইবেলের বচনাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অপরদিকে আরিউসপস্থীরা বাহ্যিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি ও উদাহরণ যোগে বাইবেল ব্যাখ্যা করত।

৮ (ক) যোহন ২০:১৭।

(খ) সাধু হিলারিউসের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি লক্ষণীয়।

(গ) ১ করি ১৫:২৭-২৮ লাতিন পাঠ্য।

৯ (ক) ১ তি ৩:১৬ লাতিন পাঠ্য।

(খ) অর্থাৎ, স্বীকারোক্তিই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ।

১০ (ক) যোহন ২০:১৭।

(খ) সাম ৪৫:৮ লাতিন পাঠ্য।

১২ (ক) যোহন ১৪:৯-১০।

(খ) যোহন ১০: ২৯-৩০ লাতিন পাঠ্য।

(গ) যোহন ৫:২২-২৩।

(ঘ) যোহন ১৪:১১।

(ঙ) যোহন ১১:২৮।

(চ) যোহন ৫:১৯।

১৪ (ক) যোহন ২০:১৭।

১৫ (ক) যোহন ২০:১৭।

(খ) সাম ২২:২৩।

(গ) সাম ২২:৭ খ্রিস্টকে ‘কীট’ বলে অভিহিত করে (‘আমি তো কীট, মানুষ নই’), তাই সাধু হিলারিউস এ শব্দকে ভিত্তি করে দু’টো দিক তুলে ধরেন যা অনুসারে খ্রিস্টকে একটা কীটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সেকালের বিজ্ঞান অনুসারে, অন্যান্য প্রাণীদের বৈষম্যে, একটা কীট দৈহিক সংসর্গের ফলে উৎপন্ন হয় না, এবং উৎপন্ন হওয়ার পর, প্রজননের আদিকারণকে মাটি থেকে গ্রহণ করে নেয়। সেই অনুসারে, প্রকৃতির নিয়মের বৈষম্যে, খ্রিস্ট পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারীর গর্ভে গর্ভস্থ হলেন ও সেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন; এবং যখন মৃত্যুর পরে তিনি জীবন্ত অবস্থায় পুনরুত্থান করলেন, তখন এক প্রকারে ভূগর্ভ থেকে উৎপন্ন হলেন।

এইভাবে কীট-উদাহরণটা পাতাল থেকেও খ্রিস্টের ধারণ করা ও সঞ্জীবিত করা মাংসকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত।

(ঘ) কল ১:১৮।

(ঙ) রো ৮:২৯।

(চ) যোহন ১:১৪।

১৭ (ক) এফে ১:১৬-১৭।

(খ) খ্রিস্ট নামটা তাঁর ঈশ্বরত্বকে, ও যিশু নামটা তাঁর মনুষ্যত্বকে নির্দেশ করে; এর ফলে খ্রিস্টে পিতাকে দেওয়া হয়, ও যিশুতে ঈশ্বরকে দেওয়া হয় (মথি ১:২১ দ্রঃ)।

(গ) অর্থাৎ, ‘তিনি আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের সেই ঈশ্বর, সেই গৌরবের সেই পিতা’।

১৮ (ক) যিনি [পবিত্র] আত্মা দ্বারা নবীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন, তিনি এবচনে হলেন পুত্র; অন্য বচনে তিনি হলেন পবিত্র আত্মা (২য় পুস্তক ৩ অধ্যায় দ্রঃ)।

(খ) সাম ৪৫:৮।

(গ) প্রেরিত ৪:২৭।

(ঘ) প্রেরিত ১০:৩৭-৩৮।

(ঙ) লুক ৩:২২।

১৯ (ক) কল ১:১৬-১৭ লাতিন পাঠ্য।

২০ (ক) কেউ যেন ‘নিজেকে তাঁর সমান মনে না করে’: বাস্তবিকই, নিজেদের সেই একমাত্র জনিতজনের সমান করার লক্ষ্যে আরিউসপস্থীরা বাণীর স্বরূপ নমিত করত।

(খ) ‘তাঁর সঙ্গীরা’, অর্থাৎ সেই সকলে যারা গ্রীক শাস্ত্রে ‘খ্রিস্ট’ অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে উল্লিখিত।

২২ (ক) ১ করি ১৫:২১-২৮।

২৩ (ক) ২ তি ২:৭।

(খ) ১ তি ৬:১১।

২৪ (ক) ফিলি ৩:১৫-১৬।

২৮ (ক) রো ১০:৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ৫:১৭।

(গ) মথি ১০:২২ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) ফিলি ৩:১৯-২০ লাতিন পাঠ্য।

২৯ (ক) লুক ১০:২২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ২৮:১৮।

৩০ (ক) যোহন ৬:৩৮।

(খ) যোহন ৮:২৯ লাতিন পাঠ্য।

(গ) মথি ২৬:৪২।

(ঘ) ফিলি ২:৮।

৩১ (ক) এফে ১:১৯-২১ লাতিন পাঠ্য।

৩২ (ক) মথি ২৫:৪১।

(খ) যোহন ১৮:৩৬।

৩৩ (ক) যোহন ৬:৪৪।

(খ) যোহন ১৪:৬।

৩৪ (ক) ১ করি ১৫:২৫ দ্রঃ।

(খ) রো ১১:২৮।

(গ) রো ১১:২৫-২৭।

৩৫ (ক) ১ করি ১৫:২৬।

(খ) ১ করি ১৫:৫৩-৫৪ লাতিন পাঠ্য।

(গ) ফিলি ৩:২১।

(ঘ) সুতরাং, বশ্যতা বলতে ঐশ্বরিক স্বরূপে মানব স্বরূপের রূপান্তর বোঝায় না, কিন্তু ঐশ্বরিক অবস্থায় মানব অবস্থার স্থানান্তর বোঝায়।

৩৬ (ক) ১ করি ১৫:২৭-২৮ লাতিন পাঠ্য।

৩৭ (ক) মথি ১৬:২৮ লাতিন পাঠ্য।

(খ) মথি ১৭:১-২ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৩৮ (ক) মথি ১৩:৪০-৪৩।

৩৯ (ক) মথি ২৫:৩ ৪।

(খ) মথি ৫:৮।

(গ) লুক ১৭:২১।

(ঘ) ১ করি ১৫:২০-২১।

(ঙ) ২ তি ২:৮।

৪০ (ক) ১ করি ১৫:২৭।

(খ) খ্রিস্টের ধারণ করা মনুষ্যত্ব যে পিতার ঐশ্বরিক স্বরূপে রূপান্তরিত হবে তা নয়, কিন্তু সেই মনুষ্যত্ব সেই গৌরবময় গুণ আপন করে নেবে যা পিতার ঐশ্বরিক স্বরূপের বিশিষ্ট গুণ।

(গ) ‘তিনি যা আর নন’: খ্রিস্ট আর মানুষ না হয়েও তবু মনুষ্যত্ব অনন্তকালীন।

৪২ (ক) যোহন ১৩:৩১-৩২ লাতিন পাঠ্য।

৪৩ (ক) ‘তিনি সবই হন সবকিছুর মধ্যে’: আরিউসপক্সীরা সাধু পলের এই বাণী পিতা ঈশ্বরকে আরোপ করত। কিন্তু সাধু হিলারিউস মানুষ হিসাবে খ্রিস্টেই বাণীটা আরোপ করেন; কেননা, তাঁর মতে, তেমনটা না হলে তবে পিতা পূর্ণ ও সুখময় ঈশ্বরত্ববিহীন হয়ে যেতেন।

৪৫ (ক) রো ১১:৩৩-৩৬।

(খ) মথি ১১:২৭।

৪৭ (ক) রো ১১:৩৫-৩৬।

(খ) মালা ৩:৬।

৪৯ (ক) কল ৩:৯-১০।

পোয়াতিয়ের বিশপ সাধু হিলারিউসের

ত্রিত্ব প্রসঙ্গ

১২শ পুস্তক

সাধু হিলারিউস এটা সমর্থন করেন যে, ভ্রান্তমতপন্থীদের প্রতিবাদও সত্যে চালনা করে। সেই অনুসারে তিনি ভ্রান্তমত খণ্ডন করতে করতে সত্যাশ্রয়ী খ্রিষ্টতত্ত্ব ব্যক্ত করে চলেন।

পুস্তকটা পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ নিয়ে শেষ হয়: এবিষয়ে সাধু হিলারিউস বলেন, পবিত্র আত্মা পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	
	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭					

১। অবশেষে এগিয়ে যাচ্ছি, কারণ পবিত্র আত্মা দৃঢ় বিশ্বাসের সুরক্ষিত ও শান্তিশিষ্ট বন্দর অভিमुखে আমাদের সহচর। আমাদের ঠিক তাই ঘটছে যা সমুদ্র ও বাতাসের বড় ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা এদিক ওদিক বিক্ষুব্ধ নাবিকদের প্রায়ই ঘটে: উত্তাল ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালা সময় সময় তাদের যাত্রা বন্দরের তীরের কাছাকাছি বন্ধ করে, কিন্তু পরিশেষে সেই উত্তাল ও ভয়াবহ তরঙ্গমালার রোষ পরিচিত ও নিরাপদ আশ্রয়স্থলে ঠেলে দেয়। আমার আশা, ঠিক তাই সেই আমাদের বেলায় ঘটবে যারা এই বর্তমান দ্বাদশ পুস্তকে ভ্রান্তমতের ঝড়ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সচেষ্ট, যাতে করে, আমরা এই পুস্তকে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য নৌকাকে তত যন্ত্রণাদায়ী তরঙ্গের মুখে ব্যক্ত করতে করতে সেই তরঙ্গই প্রত্যাশিত শান্তির বন্দরে আমাদের চালনা করে। এঘটনার ফলে যেহেতু সবাই তত্ত্বের অনিশ্চিত বাতাস দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সেজন্য ওই দেখ, ভয়; ওই দেখ, বিপদ; ওই

দেখ, প্রায়ই নৌকাডুবি। কেননা সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা সমর্থন করে যে, নবীদের অধিকারের ভিত্তিতে একমাত্র জনিত ঈশ্বর একটা সৃষ্টজীব মাত্র, এবং এইভাবে তাঁর বিষয়ে জন্মের কথা নয়, কিন্তু সৃষ্টিরই কথা বলা উচিত, কারণ স্বয়ং প্রজ্ঞার হয়ে বলা হয়েছে, প্রভু আপন পথগুলোর আদি বলে আমাকে সৃষ্টি করেছেন (ক)। এটাই ঝড়ঝঞ্ঝার সেই সবচেয়ে মহৎ তরঙ্গ যা তারা উত্তোলন করে, এটাই সেই ঘূর্ণির বড় ঢেউ। কিন্তু আমরা এই ঢেউকে মুকাবিলা করার পর যখন ঢেউটা আমাদের জাহাজের কোন ক্ষতি না ঘটিয়ে ভেঙে যাবে, তখন সেই ঢেউই প্রত্যাশিত তীরের নিরাপদ বন্দরে আমাদের সরাসরিই চালিত করবে।

২। আমরা নাবিকদের মত অনিশ্চিত ও অসার আশার হাতে নিজেদের সঁপে দিই না। এরা মাঝে মাঝে নিজেদের ইচ্ছামত ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া গতিপথ স্থির করে, যার ফলে পরিবর্তনশীল ও অস্থির বাতাস, হয় ঢেউয়ের হাতে তাদের ছেড়ে দেয়, না হয় গন্তব্যস্থান থেকে দূরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে আমাদের পাশে আমাদের পক্ষে বিশ্বাসের সেই সদা-উপস্থিত আত্মাই রয়েছেন যিনি একমাত্র জনিত ঈশ্বরের দানের গুণে আমাদের অন্তরে অবস্থান করেন ও অবিচল পথে শান্ত জলের দিকে আমাদের চালনা করেন। আমরা সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে সৃষ্টজীব বলে চিনে নিই না কারণ তিনি তা নন, যা কিছু হয়েছে তার মধ্যকার একটা বলেও তাঁকে চিনে নিই না কারণ যা কিছু হয়েছে তিনি নিজেই সেই সবকিছুর প্রভু; কিন্তু আমরা জানি, তিনি ঈশ্বর; অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরের সত্যকার জনিত পুত্র ঈশ্বর। আমরা সবাই, সত্যিকারে, তাঁর মঙ্গলময়তার প্রসন্নতা গুণে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হয়েছি ও দত্তক লাভ করেছি; কিন্তু পিতা ঈশ্বরের কাছে তিনি হলেন একমাত্র ও সত্যকার পুত্র, সেই সত্যকার ও সিদ্ধ জন্ম যার কথা কেবল পিতা ও পুত্র জানেন। কিন্তু কেবল এটাই আমাদের একমাত্র বিশ্বাস: দত্তক নন কিন্তু সঞ্জাত, নির্বাচিত নন কিন্তু জনিতই এমন পুত্রকে স্বীকার করা। তিনি যে সৃষ্ট হয়েছেন বা তিনি যে জন্ম নেননি আমরা তা বলি না, কারণ আমরা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টজীবদের সঙ্গে তুলনা করি না, এবং প্রজনন ছাড়া এমন জন্মের কথাও বলি না। জন্মের মধ্য দিয়ে যিনি আছেন তিনি যে নিজে থেকে আছেন তা নয়, যিনি পুত্র তিনি যে সঞ্জাত নন তাও নয়, যিনি পুত্র তিনি যে জন্মের মধ্য দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে পুত্র বলে আছেন তাও নয়।

৩। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অভক্তির ঘোষণা সবসময়ই সত্যকার বিশ্বাসের ঘোষণার বিরোধিতা করে ও প্রতিরোধ করে; এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, যা অভক্তিময় মনোভাবে গ্রহীত তা ভক্তিময় মনোভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেমন, প্রৈরিতিক বিশ্বাসের এই আধুনিক সংস্কারকেরা: তারা, হয় সুসমাচার-রচয়িতাদের [অনুপ্রেরণা দানকারী পবিত্র] আত্মাকে নবীদের আত্মার চেয়ে বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে উপস্থাপন করে, না হয়, তাদের মতে নবীরা একটা বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন ও সুসমাচার-রচয়িতারা অন্য একটা বিষয় প্রচার করেছেন যেহেতু একদিকে শলোমন একটা সৃষ্টজীবকে উপাসনা করতে আহ্বান করেন (ক) ও অপরদিকে যারা একটা সৃষ্টবস্তুকে আরাধনা করে পল তাদের নিন্দা করেন (খ)। ভ্রান্তমতপন্থীদের ব্যাখ্যা অনুসারে এ লেখা দু'টো অবশ্যই একে অপরের সঙ্গে মিল রাখে না। যিনি বিধানে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, যাকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ দ্বারা পৃথক করে নেওয়া হয়েছিল, যিনি সেই খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে কথা বলতেন যে-খ্রিস্ট তাঁর অন্তরে কথা বলছিলেন, ভ্রান্তমতপন্থীদের মতে, সেই প্রেরিতদূত হয় নবীদের বাণী বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, না হয় অজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু তা গ্রহণ করেননি। একইপ্রকারে তিনি খ্রিস্টকে সৃষ্টজীব বলে চিনে নেননি ও তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলে অভিহিত করেছেন; ও একটা সৃষ্টবস্তুকে আরাধনা করা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন কারণ তিনি এ উপদেশ দিয়েছেন যে কেবল সৃষ্টিকর্তাকেই হতে হবে আরাধনার পাত্র; তাঁর কথা এ, তারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে বিনিময় করেছে, এবং সৃষ্টবস্তুকেই আরাধনা করেছে—সেই সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য (গ)।

৪। যিনি ঈশ্বর, পলের মুখ দিয়ে কথা ব'লে সেই খ্রিস্ট কি এই জঘন্য ঈশ্বরনিন্দা খণ্ডন করতে অবহেলা করেন? তিনি কি সত্যের এই মিথ্যা-বিকৃতিকে নিন্দা করতে অবহেলা করেন? খ্রিস্ট প্রভুর দ্বারা সবই সৃষ্ট হয়েছিল, ও সেজন্য তাঁর প্রকৃত নাম সৃষ্টিকর্তাই হওয়া উচিত। তাঁর সৃষ্টবস্তুর স্বরূপ ও সেই 'সৃষ্টবস্তু' নাম তাঁকে মানায় না। এবিষয়ে সেই মেক্সিসেদেকই সাক্ষী যিনি একথা দ্বারা ঈশ্বরকে স্বর্গ ও মর্তের স্রষ্টা বলে ঘোষণা করেন, আব্রাহাম স্বর্গ ও মর্তের স্রষ্টা পরাৎপর ঈশ্বর দ্বারা আশিসধন্য হোন (ক)। এবিষয়ে হোশেয়াও সাক্ষী, তিনি বলেন, আমি তোমার ঈশ্বর প্রভু যিনি আকাশমণ্ডল স্থাপন করেছি ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি, ও আমার হাত গোটা স্বর্গীয় বাহিনীকে সৃষ্টি করেছে (খ)।

পিতরও সাক্ষী, তিনি লেখেন, তোমরা বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দাও (গ)। তবে আমরা কেন নির্মাণকাজের নাম [তথা ‘সৃষ্টবস্তু’] নির্মাতার উপর আরোপ করি? কেন ঈশ্বরকে এমন নাম দ্বারা অভিহিত করি যে নামগুলো আমাদেরই মানায়? তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি গোটা স্বর্গীয় বাহিনীর সৃষ্টিকর্তা।

৫। প্রেরিতদূতদের ও সুসমাচার-রচয়িতাদের বিশ্বাস অনুসারে যেহেতু এসমস্ত বচন প্রকৃত অর্থে সেই খ্রিস্টকে লক্ষ করে যার দ্বারা সবই হল, সেজন্য কেমন করে তাঁকে তাঁর নিজের হাতের কাজের সঙ্গে তুলনা করা যাবে ও স্বরূপ ক্ষেত্রে তিনি কেমন করে অন্যান্য যত বস্তুর শ্রেণিতে স্থান পাবেন? প্রথমত, ভ্রষ্টা যে সৃষ্টবস্তু, মানবযুক্তি একথা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ ভ্রষ্টা দ্বারাই সৃষ্টবস্তু হয়। ভ্রষ্টা সৃষ্টবস্তু হলে তবে তিনি অবক্ষয়ের অধীন হতেন, প্রতীক্ষার অনিশ্চয়তায় ব্যক্ত হতেন, দাসত্বের অধীন হতেন। কেননা ধন্য প্রেরিতদূত পল নিজেই বললেন, বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য (ক)। সুতরাং, খ্রিস্ট সৃষ্টবস্তু হলে তবে এটাও আবশ্যকীয় যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষায় জনিত প্রত্যাশায় আবদ্ধ হয়ে তিনি অনিশ্চিত হয়ে থাকবেন; আরও, আমাদের চেয়ে তিনিই আরও বেশি সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকবেন; আরও, সেই প্রতীক্ষাকালে তিনি অসারের বশীভূত হবেন ও এমন বশ্যতায় বশীভূত হবেন যা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা-জনিত নয় কিন্তু প্রয়োজনীয়তা-জনিত। কিন্তু, তিনি স্বেচ্ছায়ই বশীভূত না হলে তবে এটা আবশ্যকীয় যে, তিনি দাসও হবেন; আরও, তিনি দাস হলে তবে অবশ্যই ক্ষয়শীল স্বরূপে অবস্থান করবেন। প্রেরিতদূত এশিক্ষা দেন যে, এসমস্ত কিছু সৃষ্টবস্তুকেই লক্ষ করে ও যখন সৃষ্টি দীর্ঘ প্রতীক্ষার কারণে এসমস্ত থেকে মুক্ত হবে তখন সেই সৃষ্টি মানুষের যথাযোগ্য গৌরবে উজ্জ্বল হবে। আহা, ঈশ্বর ক্ষেত্রে কেমন অবিবেচক ও ঈশ্বরনিন্দুক এই তত্ত্ব যা সৃষ্টবস্তুর বিশিষ্ট অবজ্ঞা দ্বারা এই হাস্যকর জিনিস তাঁর উপর আরোপ করে যার ফলে তিনি প্রত্যাশা রাখবেন, দাস হবেন,

বাধ্যবাধকতার অধীন হবেন, তাঁরই নয় আমাদেরই স্বকীয় অবস্থায় প্রতিপন্ন ও বিমুক্ত হবেন যখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরই দান গুণে আমরা মঙ্গলের পথে কিছুটা এগিয়ে চলি।

৬। কিন্তু, এই অবৈধ ভাষার অনুমতিক্রমে মানব অভক্তি আরও গভীরতর অবিশ্বাসের পর্যায়ে এগিয়ে যায়, কারণ এমনটা বলে যে, যেহেতু পুত্র সৃষ্টজীব মাত্র, সেজন্য পিতাও সৃষ্টজীব থেকে পৃথক নন। কেননা খ্রিষ্ট ঈশ্বরের রূপে অবস্থান করে দাসের রূপ ধারণ করলেন; ও যিনি ঈশ্বরের রূপে রয়েছেন যখন তিনি সৃষ্টজীব, তখন ঈশ্বর সৃষ্টজীব থেকে পৃথক হবেন না যেহেতু ঈশ্বরের রূপে একটা সৃষ্টজীবই রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের রূপে হওয়া বলতে ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থান করা ছাড়া অন্য কিছুই বোঝায় না, এর ফলে, যেহেতু ঈশ্বরের স্বরূপে একটা সৃষ্টজীব রয়েছে (ক) সেজন্য ঈশ্বরও একটা সৃষ্টজীব। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের রূপে [অর্থাৎ অবস্থায়] ছিলেন তিনি ঈশ্বরের সেই সমান হওয়াটা আঁকড়ে ধরলেন না কেননা তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সেই সমতা থেকে অর্থাৎ ঈশ্বরের রূপ [অর্থাৎ অবস্থা] থেকে দাসের রূপে [অর্থাৎ অবস্থায়] স্থানান্তর করলেন (খ)। আরও, ঈশ্বর বলে তিনি যদি ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য না করতেন, তাহলে তিনি ঈশ্বর থেকে মানুষে নেমে যেতে পারতেন না। কিন্তু যখন তিনি নিজের মধ্য থেকে নিজেকে শূন্য করলেন, তখন তিনি যা, তা থেকে নিজেকে শূন্য করলেন না, কারণ এর ফলে তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে আলাদা কিছু হয়ে যেতেন। যিনি নিজের মধ্য থেকে নিজেকে শূন্য করলেন, তিনি যা তা হওয়া শেষ করলেন না, কারণ যদিও তিনি নিজের মধ্য থেকে নিজেকে শূন্য করতে পারেন, তবু তাঁর পরাক্রমের অধিকার টিকে থাকে, এবং দাসের রূপে স্থানান্তর করা ও ঐশ্বরিক স্বরূপকে হারানো একই কথা নয়, কারণ ঈশ্বরের রূপ থেকে নিজেকে শূন্য করা ঈশ্বরের অধিকারের পরাক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৭। তাছাড়া, ঈশ্বরের রূপে হওয়া ঈশ্বরের সমান হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়, এর ফলে, যিনি ঈশ্বরের রূপে রয়েছেন, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে সম্মানের সমতা [অর্থাৎ সমান সম্মান] দেয়, কারণ তিনি নিজে বলেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। পুত্রকে যে সম্মান করে না, যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না (ক)। যা যা সম্মানের পৃথক পদও রাখে না, সেই

বস্তুগুলোর মধ্যে কখনও কোন পার্থক্য থাকে না। সমান বস্তু সমান মর্যাদার অধিকারী; অন্যথা, হয় সর্বোচ্চ সম্মান নিম্নতর বস্তুর উপরে অযোগ্য ভাবেই মঞ্জুর করা হবে, না হয়, সম্মান ক্ষেত্রে, নিম্নতর বস্তুগুলো উচ্চতর বস্তুগুলোর অপমান ঘটিয়ে সেই উচ্চতর বস্তুগুলোর সমান করা হবে। কিন্তু যদি পুত্রকে জনিত বলে নয় বরং সৃষ্টজীব বলে গণিত ক’রে পিতার দেয় ভক্তির সমান ভক্তির পাত্র করা হয়, তাহলে আমরা পিতাকে সম্মানের বিশেষ কোন নাম আরোপ করব না, কারণ একটা সৃষ্টজীবকে যে ভক্তি আরোপ করি সেই ভক্তির সমান ভক্তি তাঁকে আরোপ করব। অপরদিকে, পুত্র পিতা ঈশ্বরের সমান, যেহেতু তাঁর দ্বারা ঈশ্বর বলে সঞ্জাত হলেন, ফলত সম্মান ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সমান। কেননা তিনি পুত্র, সৃষ্টজীব নন।

৮। পুত্র সম্পর্কে পিতার উল্লেখযোগ্য উক্তি এ, আমি গর্ভ থেকে, প্রভাতী তারার আগে তোমাকে জনিত করলাম (ক)। আমরা তো বারবার এটা বলে এসেছি যে, আমাদের উপলব্ধি-শক্তির দুর্বলতা ঈশ্বরকে অবনমিত করতে নেই। পিতা যে এমনটা বলেছেন, তিনি নিজের গর্ভ থেকে পুত্রকে জনিত করলেন, তা এমনটা বোঝায় না যে পুত্র এমন অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত নানা অংশ নিয়ে গঠিত যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হবার জন্য নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত, সেইভাবে যেভাবে সেই জীবগুলোর বেলায় ঘটে যেগুলো জড়পদার্থ থেকে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত প্রকৃতির সনাতন প্রভু বলে যিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও প্রকৃতির নিয়মবিধি সাপেক্ষ নন, তিনি আমাদের এটা প্রকাশ করেন যে, নিজের একমাত্র জনিতজনের বিশিষ্ট জন্ম হলো তাঁর নিজের অপরিবর্তনীয় স্বরূপের পরাক্রমের ফলাফল। কেননা, যদিও আত্মা আত্মা থেকে সঞ্জাত—ও আত্মা আত্মার সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ সহ সঞ্জাত হন যেগুলো গুণে তিনিও আত্মা—তবু তাঁর জন্মের আদিকারণ সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় আদিকারণগুলোর মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও হতে পারে না। আরও, সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় আদিকারণ থেকে সঞ্জাত হলেও তাঁকে অবশ্যই এমন আদিকারণ থেকে সঞ্জাত হতে হবে যা নিজের আদিকারণের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তবে, মানবজন্মের প্রক্রিয়া অবশ্যই সেই কারণগুলোর অধীন যেগুলো গর্ভে সক্রিয়। কিন্তু যিনি নানা অংশ নিয়ে গঠিত নন, সেই ঈশ্বর আত্মার গুণে অপরিবর্তনীয়—যেহেতু ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ—, তিনি তাঁর মধ্যে সক্রিয় কোন স্বরূপের নিয়মবিধির

অধীন নন। কিন্তু তিনি আত্মা থেকে আত্মার জন্মকে নির্দেশ করতে ইচ্ছা করছিলেন ও সেইজন্য আমাদের উপলব্ধি-শক্তিকে এমন উদাহরণ দ্বারা আলোকিত করলেন যে উদাহরণ আমাদের মধ্যে সক্রিয় আদিকারণের মধ্য থেকে নেওয়া। সেই জন্ম যে কীভাবে হয়েছিল, তিনি সেবিষয়ে কোন উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করছিলেন না, কিন্তু প্রজনন-ধারণাই চিহ্নিত করতে ইচ্ছা করছিলেন যাতে সেই উদাহরণ প্রজননটাকে বাধ্যবাধকতার অধীনস্থ বলে ব্যক্ত না ক’রে বরং যেন আমাদের মন আলোকিত করতে পারে। তবে, একমাত্র জনিত ঈশ্বর সৃষ্টজীব হলে, তবে, যে ঐশ্বরপ্রকাশ ঐশ্বরিক প্রজননকে উপলব্ধ করার জন্য মানবজন্মের সাধারণ ব্যাপারের উপর নির্ভর করে, সেই ঐশ্বরপ্রকাশের কি অর্থ আছে?

৯। আমাদের দেহের এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রায়ই নিজের কর্মকাণ্ডের অর্থ জানিয়ে দেন ও সাধারণত উপলব্ধ শব্দগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি-শক্তি আলোকিত করেন। তেমনটা তখনই হয় যখন তিনি বলেন, তাঁর হাত গোটা স্বর্গীয় বাহিনীকে সৃষ্ট করেছে (ক), বা ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ (খ), বা আমি যেসের সম্ভান দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ (গ)। ‘মন’ শব্দ দিয়ে সেই বাসনা চিহ্নিত যা দ্বারা দাউদ নিজের চরিত্রের সততার জন্য প্রসন্ন ছিলেন; ‘চোখ’ শব্দ দিয়ে গোটা বিশ্বের সেই জ্ঞান চিহ্নিত যে জ্ঞানের গুণে কোন কিছুই ঈশ্বরের জ্ঞান এড়াতে পারে না; ‘হাত’ শব্দ দিয়ে ঈশ্বরের সৃজনশীল কর্মক্রিয়া চিহ্নিত যেহেতু সবই তাঁর থেকে আগত। যিনি সবই ইচ্ছা করেন, সবই আগে থেকে দেখেন ও সবই করেন, সেই ঈশ্বর যখন এমন শব্দ ব্যবহার করেন যা দেহের কোন একটা কর্ম নির্দেশ করে, তখন এটা জানা কথা যে, কোন দেহের সাহায্য তাঁর দরকার হয় না; তবে, যখন তিনি বলেন, তিনি পুত্রকে গর্ভ থেকে জনিত করলেন, তখন আমরা কেনই বা মানব উৎপত্তির জড়পদার্থ থেকে এমন জন্ম-ধারণায় স্থানান্তর করি না যা আত্মার রূপেই ঘটিত জন্ম বলে উপলব্ধ? (ঘ)। কেননা একথা সত্য যে, যে অন্যান্য ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা উল্লিখিত, সেখানে তা ঘটে যাতে সেই অন্যান্য প্রতাপ প্রদর্শিত হয় যেগুলো ঈশ্বরেও সক্রিয়।

১০। যখন ‘মন’ শব্দটা বাসনা চিহ্নিত করে, ‘চোখ’ শব্দটা দর্শন চিহ্নিত করে, ‘হাত’ শব্দটা সম্পন্ন কর্ম চিহ্নিত করে—কেননা ঈশ্বর কোনও অর্থেই অঙ্গ দিয়ে গঠিত না হলেও তবু তিনি বাসনা করেন, দেখেন ও কাজ করেন; ও তেমন কর্ম মন, চোখ ও হাত শব্দত্রয় দ্বারা ব্যক্ত—তখন ‘গর্ভ থেকে তোমাকে জনিত করলাম’ বাক্যের অর্থ কি প্রজননের বাস্তবতার প্রমাণ নয়? এ দ্বারা এমনটা বলা হয় না যে তিনি নিজের গর্ভ থেকে পুত্রকে জনিত করলেন, ও সেই অনুসারে এমনটা বলা হয় না যে তিনি হাতের মধ্য দিয়ে কাজ করেন, চোখের মধ্য দিয়ে দেখেন, মনের মধ্য দিয়ে বাসনা করেন। কিন্তু উল্লিখিত এই শব্দগুলো ব্যবহার ক’রে যেমন তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেন তিনি সত্যিই সবই করেন, সবই দেখেন ও সবই ইচ্ছা করেন, তেমনি ‘গর্ভ’ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, যাকে তিনি জনিত করলেন তাঁকে সত্যিকারে নিজের মধ্য থেকে জনিত করলেন। ‘গর্ভ’ শব্দটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়, কিন্তু সেই প্রজনন-বাস্তবতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। একই প্রকারে, ঈশ্বর যে দৈহিক কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে ইচ্ছা করেন বা দেখেন বা সক্রিয় হন তা নয়, কিন্তু তিনি এ অঙ্গগুলোর নাম ব্যবহার করেন যাতে দেহের স্বকীয় কার্যক্ষমতার ভূমিকার মধ্য দিয়ে আমরা দৈহিক নয় এমন পরাক্রমের প্রতাপ উপলব্ধি করতে পারি।

১১। তবে, শিষ্য যে গুরুর উপরে প্রাধান্য পায় বা দাস যে মনিবকে আঞ্জা করে, যে প্রাকৃতিক নিয়ম মানব-সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা তেমনটা মানে না, অন্যদিকে আমাদের প্রভুর শিক্ষাও তা সমর্থন করে না। কেননা, অঞ্জজন ও জ্ঞানপ্রাপ্ত জনের মধ্যে যেমন হয়, তেমনি নিজের অঞ্জতার অবস্থার ফলে একজন অন্যজনের অধীন হয়; ও যেমন দাস ও মনিবের মধ্যে হয়, তেমনি নিজের সামাজিক অবস্থার ফলে একজন অন্যজনের অধীন হয়। ব্যাপারটা যে ঠিক তাই, এবিষয়ে সবাই একমত। সুতরাং, কেমন দুঃসাহসী উন্মাদনার ফলে আমরা এমনটা বলব ও মনে করব, ঈশ্বর সৃষ্টজীব, ও পুত্র নির্মিত জীব মাত্র? কেননা আমরা এমন কোনও বচন পাই না যেখানে আমাদের গুরু ও প্রভু নিজের বিষয়ে নিজের দাস ও শিষ্যদের কাছে এইভাবে কথা বললেন বা এমন শিক্ষা দিলেন যে তাঁর জন্ম ছিল সৃষ্টিকাজ বা নির্মাণকর্ম। বরং পুত্র বিষয়ে ছাড়া পিতা কখনও কোনও সাক্ষ্য দেননি; এবং পুত্র, ঈশ্বর যে তাঁর সত্যকার পিতা একথা

ছাড়া অন্য কিছু ঘোষণা করেননি। অর্থাৎ তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি সঞ্জাত, নির্মিত বা সৃষ্ট নন, বিশেষভাবে যখন বলেন, যে কেউ পিতাকে ভালবাসে, তাঁর থেকে যিনি জনিত, সে সেই পুত্রকেও ভালবাসে (ক)।

১২। অন্যদিকে, বিশ্বসৃষ্টির কর্মকাণ্ড হলো একটা নির্মাণকর্ম, তা প্রজনন-জনিত জন্ম নয়। আকাশ ঈশ্বরের পুত্র নয়, পৃথিবী তাঁর কন্যা নয়, জগৎ প্রজনন দ্বারা সঞ্জাত হয়নি, কারণ এক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল (ক); এবং নবী ঘোষণা করেছেন, আকাশমণ্ডল তোমারই হাতের কাজ (খ); একই নবী এও বলেছেন, নিজ হাতের কর্মকীর্তি করো না গো পরিত্যাগ (গ)। চিত্র কি চিত্রকারের পুত্র বা খড়া কি কর্মকারের কন্যা বা ঘর কি নির্মাতার কন্যা? সেগুলো হলো তাদের কর্মফল, কিন্তু যিনি পিতা থেকে সঞ্জাত, মাত্র তিনিই তাঁর পুত্র।

১৩। এবং আমরাও ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু আমরা পুত্র কারণ আমাদের পুত্র করা হয়েছে। একসময় আমরা ছিলাম ক্রোধের পুত্র (ক), কিন্তু দত্তকপুত্রত্বের আত্মা দ্বারা আমাদের ঈশ্বরের পুত্র করা হয়েছে ও সেই [পুত্র] নাম অনুগ্রহেই পেয়েছি, জন্মের অধিকারসূত্রে তা পাইনি। যা কিছু হয়েছে, তা হওয়ার আগে তা সেইরকম ছিল না; তেমনি আমরা পুত্র না হলেও, এখন আমরা যা, তাতে আমাদের রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমরা আগে পুত্র ছিলাম না, কিন্তু অনুগ্রহে এই নাম পাবার পর এখন আমরা পুত্র। কিন্তু আমরা পুত্র বলে জন্ম নিইনি, কিন্তু পুত্র হয়েছি। আমরা জনিত হইনি, কিন্তু আমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর নিজের জন্য এক জাতিকে কিনে নিয়েছেন (খ)। অন্যদিকে আমরা জানি যে, কথার প্রকৃত অর্থ অনুসারে ঈশ্বর কখনও পুত্রদের জনিত করেননি। আসলে তিনি আমি আমার পুত্রদের জনিত করেছি ও উন্নীত করেছি তা বলেননি, তিনি শুধু বলেন ‘আমি পুত্রদের জনিত করেছি ও উন্নীত করেছি (গ)।

১৪। কিন্তু, যেহেতু তিনি বলেন, ইস্রায়েল আমার প্রথমজাত পুত্র (ক), সেজন্য এমন কেউ না কেউ থাকবে যারা ‘আমার প্রথমজাত পুত্র’ কথাটা এমন প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করবে যাতে পুত্রকে প্রজননের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। তারা নাকি বলে,

ঈশ্বর ইস্রায়েলের বেলায়ও ‘আমার’ শব্দটা ব্যবহার করেন, ফলে, যাদের পুত্র করা হয়েছে তাদের দত্তক ভুলভাবেই প্রকৃত প্রজনন বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুত্রের বেলায় ইনি আমার প্রিয় পুত্র (খ) ব্যবহৃত বাক্য কেবল ঈশ্বরের জন্ম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ, (যেভাবে সমর্থন করা হয়) ‘আমার’ শব্দটা তাদেরও জন্য ব্যবহৃত যারা স্পষ্টভাবে জন্মসূত্রে পুত্র নয়। আরও, তারা সঞ্জাত বলে অভিহিত হলেও তারা যে তখনও প্রকৃতপক্ষে জন্ম নেয়নি, তা এ বচন থেকেও স্পষ্ট দাঁড়ায় যেখানে বলা হয়, সেই জাতি যে একদিন জন্ম নেবে, প্রভু যাকে করেছেন ... (গ)।

১৫। সুতরাং, ইস্রায়েল জাতি সেই অর্থে জন্ম নেয় যে অর্থ অনুসারে তাকে পুত্র করা হয়। এবং সেই জাতি যে জন্ম নেয় এমনটা বলা, সে যে পুত্র হয়ে ওঠে তা বিরোধী অর্থ বহন করে না। সেই জাতি প্রজনন দ্বারা নয়, দত্তক দ্বারা পুত্র; ও একটা পুত্রের বৈশিষ্ট্যের নয়, কিন্তু তার নামেরই অধিকারী। যদিও তার বিষয়ে ‘আমার প্রথমজাত পুত্র’ সংজ্ঞা ব্যবহৃত, তবু ‘আমার প্রিয় পুত্র’ ও ‘আমার প্রথমজাত পুত্র’ বাক্য দু’টোর মধ্যে মহৎ ও গভীর পার্থক্য রয়েছে। কেননা যেখানে প্রকৃত জন্ম রয়েছে সেখানে আমরা পাই ‘আমার প্রিয় পুত্র’, কিন্তু যেখানে জাতিগুলোর মধ্য থেকে মনোনয়ন ও ইচ্ছাকৃত দত্তক রয়েছে সেখানে আমরা পাই ‘আমার প্রথমজাত পুত্র’। এখানে সেই ‘আমার’ প্রথমজাতকে লক্ষ করে, আগের বাক্যে সেই ‘আমার’ পুত্রকেই লক্ষ করে। তাছাড়া, জন্ম ক্ষেত্রে আগে পিতার অধিকার নির্দেশিত, এবং এর ফলে পিতার ভালবাসা নির্দেশিত; কিন্তু দত্তক ক্ষেত্রে প্রধান ব্যাপার এটা হলো যে, সেই পুত্র প্রথমজাত, এবং পরে, এর ফলে, এটা নির্দেশ করা হয় যে, সেই পুত্র হলো পিতার অধিকৃত [পুত্র]। তাই, সকল জাতির মধ্য থেকে যে দত্তক বলে গৃহীত, সেই ইস্রায়েল ন্যায়সঙ্গত ভাবে ‘প্রথমজাত’ নামের অধিকারী; কিন্তু যিনি ঈশ্বর বলে সঞ্জাত, কেবল তিনিই ন্যায়সঙ্গত ভাবে ‘পুত্র’ নামের অধিকারী। অতএব, যেখানে পুত্রত্ব তত সত্যকার নয় কিন্তু একটা নাম মাত্র, সেখানে সত্যকার ও পুরো জন্ম হয় না, কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে জাতি পুত্র-অবস্থায় সঞ্জাত, সেই জাতি পুত্রও হয়ে যায়। কিন্তু যে বস্তু আগে যা ছিল না তা হয়ে যায়—আর সেই বস্তু অন্য কিছু হতে শুরু করেছে বিধায়ই আমরা সেসম্পর্কে বলি, তা জন্ম নিয়েছে—সেই বস্তুর সত্যকার জন্ম হয় না যেহেতু সঞ্জাত হবার আগে তা অন্য

কিছু ছিল। আরও, সে সঞ্জাত হবার আগে, অর্থাৎ পুত্র হয়ে যাবার আগে, সে পুত্র ছিল না, কারণ সকল জাতির মধ্য থেকে যে পুত্র, সে পুত্র হবার আগে একটা জাতিই ছিল : অতএব, সে সত্যকার পুত্র নয় যেহেতু সে সবসময় পুত্র ছিল না। কিন্তু একমাত্র জনিত ঈশ্বর অল্লক্ষণের মতও পুত্র হওয়া শেষ করেননি, পুত্র হবার আগে তিনি অন্য কিছু ছিলেন না, তিনি পুত্র ছাড়া অন্য কিছু নন। এইভাবে, যিনি সবসময় পুত্র, তিনি এমনটা হতে দেন না, আমরা তাঁর বিষয়ে এমনটা ভাবব এমন সময় ছিল যখন তিনি পুত্র ছিলেন না।

১৬। প্রকৃতপক্ষে মানব জন্ম আগেকার অস্তিত্বহীনতা দাবি করে : প্রথমত, এই কারণে যে, সবাই এমন মানুষ থেকে জন্ম নেয় যারা আগে ছিল না। কেননা, যে জন্ম নেয় যদিও তার উৎপত্তি এমন একজন থেকে হয় যে আগে ছিল, তবু সে যে জনক থেকে সঞ্জাত হয়, সেই জনক জন্ম নেবার আগে ছিল না। দ্বিতীয়ত, যে সঞ্জাত হয়েছে, সে এমন সময় সঞ্জাত হয়েছে যে সময়, সে যখন ছিল না, তখনকার সময়ের পরবর্তী সময়, কারণ সে জন্ম নেবার আগে সেই সময় ছিল। সে যদি আজ জন্ম নেয়, গতকাল যে সময় ছিল, সেসময়ে সে ছিল না : সে না-হওয়ার অবস্থা থেকে হওয়ার অবস্থায় এসেছে, ও আমাদের যুক্তি আমাদের এতে নিশ্চিত করে যে, যা আজ জন্ম নেয়, তা গতকাল ছিল না। এইভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, যে জন্মের গুণে সে আছে, সেই জন্ম, তার না-হওয়ার পরবর্তী একটা অবস্থায় স্থান পায়, কারণ অবশ্যই ‘আজ’টা গতকালের অস্তিত্ব দাবি করে ; এর ফলে এমনটা হয় যে, এমন সময় ছিল যে সময়ে সে ছিল না। এটাও স্বাভাবিক যে, মানব সংক্রান্ত বস্তুর উৎপত্তি ক্ষেত্রে, যেহেতু প্রতিটি বস্তু আগে ছিল না সেজন্য প্রতিটি বস্তুর একটা শুরু আছে : প্রথমত, যেভাবে আমরা দেখিয়েছি, সময় ক্ষেত্রে, ও দ্বিতীয়ত, কারণ ক্ষেত্রে। এবং সময় ক্ষেত্রে সত্যিই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যা কিছু এখন হতে শুরু করে, তা আগে ছিল না ; এবং এব্যাপার কারণ ক্ষেত্রেও সত্য, কারণ এ সুনিশ্চিত যে, তার অস্তিত্ব [পূর্ববর্তী] একটা কারণজনিত নয়। সমস্ত আদিকারণ সম্পর্কে ভাব ও সেই সমস্ত কিছুর পূর্বাবস্থার কথায় মন ফেরাও : তুমি এটা দেখবে যে, এমন কিছু নেই যা পূর্বকালীন কারণের গুণে অস্তিত্বে এসেছে ; যেহেতু ঈশ্বরের পরাক্রম সবই সৃষ্টি করে ও সেগুলো যা সেই পরাক্রমই তা হতে দেয়, সেজন্য সেই সবার আর কোন জনক নেই।

এজন্য, প্রতিটি বস্তুর শ্রেণি, প্রকৃত উত্তরাধিকার গুণে, এই বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী, অর্থাৎ, সেই শ্রেণি একসময় ছিল না ও পরে হতে শুরু করল, কারণ তা সময়ের পরবর্তী সময়ের মধ্যে অস্তিত্বশীল। এবং যখন যা কিছু রয়েছে তা সময়ের উৎপত্তির পরবর্তী উৎপত্তির অধিকারী, সেজন্য সেই সমস্ত কিছু এমন কিছু থেকে নিজ নিজ কারণের অধিকারী হয় যা আগে ছিল না, কারণ সেই সমস্ত কিছু এমন কিছু থেকে সঞ্চারিত যা আগে ছিল না। মানবজাতির আদি জনক সেই আদমকেও সেই মাটি থেকে গড়া হয়েছিল যে-মাটি শূন্য থেকে হয়েছিল ও সময়ের পরে, অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, দিন, সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষ্করাজির পরে হয়েছিল; এমনকি সেই আদমের উৎপত্তি যে জন্মজনিত তা নয়, কিন্তু অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বশীল হতে শুরু করল।

১৭। কিন্তু, যাঁর আগে পূর্বকালীন কোন সময় নেই, সেই একমাত্র জনিত পুত্রের বেলায় এমন সম্ভাবনা নেই যে তিনি কোন এক সময়ে ছিলেন না, কারণ সেই ‘কোন এক সময়’ তাঁর আগেকার সময় হয়ে যায়। আরও, তিনি যে ছিলেন না, তা বলাও সময়-ধারণা দাবি করে: এবং এমনটা হলে তবে সময় যে তাঁর পর থেকে হতে শুরু করবে তা নয়, কিন্তু তিনিই সময়ের পরে হতে শুরু করবেন, কারণ সঞ্চারিত হবার আগে যদি তিনি ছিলেন না, তাহলে যে সময়ে তিনি ছিলেন না, সেই সময় তাঁর আগে স্থান পাবে। আরও, যিনি তাঁরই থেকে জন্ম নিয়েছেন যিনি ‘আছেন’, তাঁর বিষয়ে আমরা এমনটা ভাবতে পারি না, তিনি তাঁরই থেকে জন্ম নিয়েছেন যিনি ছিলেন না; কারণ যিনি ‘আছেন’ তিনি হলেন তাঁর হওয়াটার কারণ, ও তাঁর জন্ম এমন কিছু থেকে উৎপন্ন হতে পারে না যা নেই। সময় ক্ষেত্রে যেহেতু এটা সত্য নয় যে তিনি ছিলেন না, এবং পিতা ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাঁর হওয়াটার প্রণেতা ক্ষেত্রে এটাও সত্য নয় যে তিনি শূন্য থেকে অস্তিত্বশীল হবেন, সেজন্য তাঁর বিষয়ে যা সম্পর্কযুক্ত, সেদিক থেকে তিনি এমন সম্ভাবনা রাখেননি যার ফলে এমনটা ভাবা যেতে পারে, তিনি শূন্য থেকে সঞ্চারিত হলেন বা জন্ম নেবার আগে তিনি ছিলেন না।

১৮। আমি ভালই জানি: যারা ঈশ্বর-রহস্য মানে না যেহেতু তাদের মন অভক্তি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে গেছে বা বিরোধী মন-মানসিকতায় প্রণোদিত হওয়ার ফলে যারা ভক্তির বেশে

তাকে অবজ্ঞা করার ভক্তিহীন প্রবণতায় আক্রান্ত, বেশির ভাগ তারা সাধারণত সরলমনা মানুষদের কানে পরবর্তী ধারণা অনুপ্রবেশ করায়। যেহেতু আমরা বলি, পুত্র সবসময় ছিলেন ও সময়ক্রমে এমন কোন কিছুই অধিকারী হননি যা বিষয়ে তিনি অত্যাধী ছিলেন, সেজন্য, যখন আমরা এটা সমর্থন করি, তিনি সবসময় ছিলেন, তাদের মতে আমরা এটা বলি যে, তিনি জন্মহীন, কারণ মানব যুক্তির নিয়ম অনুসারে যা সবসময় অস্তিত্বশীল তা জন্ম নিতে পারে না। তাদের মতে জন্ম-ধারণা এমনটা দাবি করে যে, তা-ই অস্তিত্বশীল হতে শুরু করবে যা ছিল না; অন্যদিকে, যা ছিল তা যে অস্তিত্বশীল হতে শুরু করে, তা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তার জন্ম ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। তারা এসমস্ত চিহ্ন ও শ্রুতিমধুর যুক্তি যোগ করুক: তিনি সঞ্জাত হলে তবে তিনি হতে শুরু করলেন; যে ক্ষণে তিনি হতে শুরু করলেন সেক্ষণে তিনি ছিলেন না; ও যখন তিনি ছিলেন না তখন তিনি যে ছিলেন তা সম্ভব নয়। আরও, জন্ম নেবার আগে তিনি ছিলেন না, কারণ তিনি এজন্যই জন্ম নিলেন যাতে যিনি ছিলেন তিনি নয়, কিন্তু যিনি ছিলেন না তিনিই যেন অস্তিত্বশীল হতে পারেন। এবং যিনি ছিলেন, তাঁর জন্ম নেবার দরকার ছিল না; কিন্তু যিনি ছিলেন না তিনি জন্ম নিলেন যাতে অস্তিত্বশীল হতে পারতেন: এসমস্ত কিছু বলা যে ভক্তির ভাষা, তা তারা প্রমাণ করুক।

১৯। তবে, সর্বপ্রথমে এটা প্রয়োজন ছিল যে, যারা ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয়ে ভক্তিময় জ্ঞান পছন্দ করে, যেখানে সুসমাচার-রচয়িতাদের ও প্রেরিতদূতদের প্রচারিত সত্য পথ দেখাচ্ছিল সেখানে তারা কুটিল তত্ত্ববিদ্যার জড়ানো ব্যাপার বাদ দিয়ে বরং সেই বিশ্বাসের অনুগমনে স্থান নেবে যা ঈশ্বরে স্থিত। তর্কাতর্কির সমস্যা-বিশিষ্ট কুতর্ক দুর্বল উপলব্ধি-শক্তিকে তার বিশ্বাসের রক্ষা থেকে সহজে বঞ্চিত করে, কারণ প্রশ্নের বেশে উপস্থাপিত জটিল একটা বিষয় সরল বিশ্বাসে দেওয়া ও উপস্থাপিত বিষয়ানুযায়ী উত্তরকে সবদিক দিয়ে অর্থহীন করতে পারে, যার ফলে এমনটা হয় যে, তার সেই উত্তরের কারণে যা হারিয়েছে, বিবেক সেটার অধিকারী আর হয় না। যেমন, তারা যখন আমাদের এই প্রশ্ন রাখে: জন্ম নেবার আগে কোনও বস্তু কি অস্তিত্বশীল? আমাদের কাছে যে সেই প্রশ্ন তারা রেখেছে, সেই প্রশ্নের এমন কোন উত্তর বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে যদি না আমরা এটা বলি যে, যা জন্ম নেয়, তার জন্মের আগে তা ছিল না। তবে, প্রকৃতি হোক

বা যুক্তি হোক এমন কিছুই নেই যা এমন দাবি রাখে যে, যা আছে তা জন্ম নেবে, যেহেতু যুক্তি এটাই দাবি করে যে, কেবল অস্তিত্বশীল হবার জন্যই একটা কিছু জন্ম নেবে, বস্তুটা ছিল বলেই যে জন্ম নেবে এর জন্য নয়। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ভাবে এটা মেনে নেওয়ার পর আমরা আমাদের বিশ্বাসের দেওয়া নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে ও তাদের ফাঁসে ধরা পড়ে তাদের ভক্তিহীন ও অবুঝ মতলবে সম্মতি দিতে বাধ্য হব।

২০। আমরা যেভাবে প্রায়ই দেখিয়ে এসেছি, সেই অনুসারে ধন্য প্রেরিতদূত পল আগে থেকে এই বিপদ অনুমান করে আমাদের সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিস্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে (ক)। সুতরাং, তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে সতর্ক থাকা চাই, ও মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক যত পদ্ধতি শুধু যে এড়ানো চাই তা নয়, প্রত্যাখ্যানও করা চাই। সেই সমস্ত পদ্ধতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে নেই, কেমন যেন সেগুলো আমাদের না ভুলিয়ে এমনি বশীভূত করে: আমরা যারা ঘোষণা করি, খ্রিস্টই ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, সেই আমরা যে মানবীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে দূরে থাকব তা শুধু নয়, কিন্তু সেগুলো যে খণ্ডনই করব তা আমাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত; সরলমনাদের সংযত ও প্রশিক্ষিত করা দরকার পাছে তারা এসত্য থেকে বঞ্চিত হয়। যেহেতু ঈশ্বর সবই করতে সক্ষম, ও নিজের প্রজ্ঞা গুণে সবকিছু প্রজ্ঞার সঙ্গেই করতে সক্ষম; যেহেতু তাঁর পরাক্রম সুমঞ্জগাহীন নয় ও তাঁর সুমঞ্জগা পরাক্রমহীন নয়, সেজন্য, যারা জগতের কাছে খ্রিস্টকে প্রচার করে তাদের পক্ষে জগতের ভক্তিহীন ও খুঁতপূর্ণ তত্ত্বকে সেই প্রজ্ঞাময় সর্বশক্তিমত্তার দেওয়া জ্ঞান দ্বারা প্রতিরোধ করা দরকার, যেইভাবে ধন্য প্রেরিতদূত বলেন, আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয় বটে, তবু এই অস্ত্রপাতির এমন ঐশ্বর্যপরাক্রম আছে যে, তা যত দুর্গও ভেঙে দিতে পারে। আমরা যত ধ্যানধারণা ও ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যত প্রাকার ভেঙে ফেলছি (খ)। প্রেরিতদূত আমাদের কাছে নগ্ন ও যুক্তিহীন বিশ্বাস রাখেননি: তেমন ধরনের বিশ্বাস পরিত্রাণের লক্ষ্যে সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র বটে, কিন্তু ধর্মতত্ত্বে অবলম্বন না পেলে সেই বিশ্বাস প্রতিকূলতার সময়ে পিছিয়ে যাবার জন্য নিরাপদ আশ্রয় হবে বটে, কিন্তু

প্রতিরোধ ক্ষেত্রে দৃঢ় নিশ্চয়তা দিতে অক্ষম হবে। সেই বিশ্বাস পলায়নের কারণে ভারাক্রান্ত লোকদের জন্য শিবিরের মত হবে; যাদের শিবির রক্ষা করতে হয়, তাদের সেই নির্ভীক সাহস এখনও সেই বিশ্বাসের নেই। সেজন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধ যত স্পর্ধাপূর্ণ ঘোষণা প্রতিরোধ করা, অসার ধ্যানধারণার তৈরী দুর্গ ভেঙে দেওয়া, অভক্তি থেকে উদ্ধতভাবে উৎপন্ন অমঙ্গলকর যত বুদ্ধি পিষে মারা দরকার, ও তা মাংসিক অস্ত্র দ্বারা নয় কিন্তু আত্মিক অস্ত্র দ্বারা ও পার্থিব শিক্ষা দ্বারা নয় কিন্তু স্বর্গীয় প্রজ্ঞা দ্বারাই করা দরকার যাতে করে স্বর্গীয় তত্ত্ববিদ্যা পার্থিব তত্ত্ববিদ্যা থেকে ততখানি পৃথক হয় ঐশ্বরিক বিষয় মানবীয় বিষয়কে যতখানি অতিক্রম করে।

২১। সুতরাং, অবিশ্বাসী যারা তারা তাদের প্রচেষ্টা ত্যাগ করুক, ও যেহেতু তারা বোঝে না, সেজন্য এমনটা যেন না ভাবে যে, আমরা এমন সত্য অস্বীকার করি যা প্রকৃতপক্ষে শুধু আমরাই বুঝি ও যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করি। কেননা আমরা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করি যে, তিনি জনিত হলেন; তিনি যে অজনিত তা আমরা ঘোষণা করি না। অজনিত হওয়া ও জনিত হওয়া একই ব্যাপার নয়: প্রথম সংজ্ঞা এটা দেখায় যে, উৎপত্তি কারও কাছ থেকে আগত নয়; দ্বিতীয় সংজ্ঞা এটা দেখায় যে, উৎপত্তি কোন একজনের কাছ থেকে আগত। প্রণেতা ছাড়া সদা-অনন্তকালীন হওয়া একটা জিনিস, ও পিতার সঙ্গে অর্থাৎ নিজের প্রণেতার সঙ্গে সহ-অনন্তকালীন হওয়া আলাদা জিনিস। যেখানে এক পিতা হলেন অস্তিত্বের উৎস, সেখানে অবশ্যই প্রজনন রয়েছে; কিন্তু, তাছাড়া, যেখানে অস্তিত্বের প্রণেতা অনন্তকালীন, সেখানে অবশ্যই প্রজনন অনন্তকালীন, কারণ যেমন প্রজনন একজন প্রণেতা থেকে আসে, তেমনি যে প্রজনন অনন্তকালীন একজন প্রণেতা থেকে আসে সেই প্রজননও অনন্তকালীন। তবে, যা কিছু সবসময় আছে, তা অনন্তকালীনও বৈকি। কিন্তু যা কিছু অনন্তকালীন, তা সবই যে অজনিতও, তা নয়। কারণ অনন্ততা থেকে যা জনিত, তা অনন্তকাল ধরে জনিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, কিন্তু যা অজনিত, তা একাধারে অজনিত ও অনন্তকালীন। তবে, যা অনন্ততা থেকে জনিত হয়েছে তা যখন অনন্তকালীন বলে জনিত হয়নি, তখন এমনটা দাঁড়াবে যে, পিতাও অনন্তকালীন প্রণেতা নন। সুতরাং, অনন্তকালীন পিতা থেকে যিনি জনিত হয়েছেন, অনন্ততা বিষয়ে যদি তাঁর কিছু অভাব থাকে, তাহলে এটা দাঁড়ায় যে, অনন্ততা

বিষয়ে সেই অভাব ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রণেতাও অভাবী, কারণ অসীম মাত্রায় যা জনকের অধিকার, তা অসীম মাত্রায় জনিতজনেরও অধিকার। যুক্তি ও বুদ্ধি দু'টোই এমনটা মানে না যে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম ও পিতা ঈশ্বরের প্রজননের মধ্যে মধ্যবর্তী কিছু না কিছু থাকবে, কারণ প্রজনন জন্মকে দাবি করে ও জন্ম প্রজননকে দাবি করে। একটা ঘটনা অন্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ দু'টোর একটা বা অন্যটা না থাকলে একটাও হয় না, অন্যটাও হয় না। তাই নিজের অস্তিত্ব ক্ষেত্রে যা কিছু উভয় ঘটনার প্রতি ঋণী, উভয় অনন্তকালীন না হলে তবে তাও অনন্তকালীন হতে পারে না। একটা অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দু'টোর কোন একটাও বাস্তব নয়, কারণ একটা অন্যটা ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে না।

২২। কিন্তু, এই ঐশ্বরিক রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম এমন কেউ প্রতিবাদ করে বলবে, যা কিছু সঞ্জাত, তা আগে ছিল না, কারণ অস্তিত্বশীল হবার লক্ষ্যেই তা জন্ম নিল।

২৩। যে মানুষেরা সঞ্জাত হয়েছে তারা যে একসময় ছিল না, এবিষয়ে কে সন্দেহ করবে? কিন্তু, এমন একজন থেকে সঞ্জাত হওয়া যে আগে ছিল না তা একটা কথা, ও এমন একজন থেকে সঞ্জাত হওয়া যিনি সবসময় 'আছেন' তা আলাদা কথা। সকলের পক্ষে শিশুকাল কালের নির্দিষ্ট এক কাল থেকে শুরু হয়, কারণ সেই শিশুকাল আগে ছিল না। পরে সেই শিশুকাল কিশোরকালে পার হয়, এবং অবশেষে যৌবনকাল পিতৃত্বকাল অভিমুখে ছুটে চলে। কিন্তু বাল্যকালের মধ্য দিয়ে যে কিশোরকালে গিয়ে পৌঁছেছে, ও প্রথমকালের মধ্য দিয়ে তথা শিশুকালের মধ্য দিয়ে বাল্যকালে গিয়ে পৌঁছেছে, সে যে সবসময় পিতা হয় তা নয়। সেজন্য, যে সবসময় পিতা নয়, সে সবসময় জনিত করতেও পারেনি। কিন্তু, যেখানে পিতা অনন্তকালীন, সেখানে পুত্রও অনন্তকালীন। তবে, তুমি যদি এমনটা ভাব ও বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর সবসময় জনিত পুত্রের পিতা ছিলেন না—এবং ঈশ্বরজ্ঞান সংক্রান্ত রহস্য ক্ষেত্রে পিতৃত্ব বিশিষ্টই এক দিক—তবে তুমি তো এটাও স্বীকার কর ও মেনে নাও যে, জনিত হলেন যিনি সেই পুত্র অনন্তকালীন নন। কিন্তু, যখন সবসময় পিতা হওয়াই হলো পিতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, তখন এটা অনিবার্য যে, সবসময় পুত্র হওয়াই হলো পুত্রের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এবং যাঁর বৈশিষ্ট্য

হলো, তিনি যা বলে সজ্ঞাত হয়েছেন অনন্তকাল ধরে তা হওয়া, তাঁর বেলায় আমরা কেমন করে বলতে ও ভাবতে পারব যে, সজ্ঞাত হবার আগে তিনি ছিলেন না?

২৪। সুতরাং, যেহেতু একমাত্র জনিত ঈশ্বর অদৃশ্য ঈশ্বরের রূপ ও স্বরূপ নিজেতে ধারণ করে আছেন, সেজন্য, পিতা ঈশ্বরের যা যা স্বকীয়, নিজের মধ্যে বিদ্যমান সত্যকার ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা গুণে তিনি সেই সমস্ত কিছুতে পিতা ঈশ্বরের সমান। আগের পুস্তকগুলো যে ভাবে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি, সেই অনুসারে। পরাক্রম ও ভক্তি ক্ষেত্রে তিনি পিতার মত প্রতাপশালী ও সম্মানের যোগ্য। আরও, যেমন পিতা সবসময় পিতা, তেমনি পুত্র হওয়ায় তিনিও সবসময় পুত্র হওয়ার সদৃশ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা ‘আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন’ মোশিকে বলা এই কথা অনুসারে আমরা এই দ্ব্যর্থহীন ধারণা অর্জন করি যে ঈশ্বর ‘হওয়া’ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কারণ যা ‘আছে’, সেসম্পর্কে তা যে ‘নেই’ তা ভাবা ও বলা যায় না। ‘হওয়া’ ও ‘নেই’ পরস্পর বিপরীত, ও তেমন বিপরীত ধারণা দু’টো একমাত্র ও সমান বস্তু ক্ষেত্রে একইসময় সত্যাপ্রয়ী হতে পারে না, কারণ একটা থাকলে অন্যটা থাকবে না। এর ফলে, যেখানে একটা কিছু আছে সেখানে যে তা নেই, তা ভাবা ও বলাও আদৌ সম্ভব নয়। যখন কাল ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা আগের দিকে ফেরে ও সেই যিনি আছেন তাঁর স্বরূপ জানবার জন্য অবিরতই ব্যস্ত থাকে, তখন [আমাদের চিন্তা] নিজের আগে আগে তাঁর বিষয়ে সবসময়ই শুধু এটাই পায় যে তিনি আছেন, কারণ সেই যে বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরে অসীম, সেই বৈশিষ্ট্য অশেষভাবে অনুশীলন করলেও সেই বৈশিষ্ট্য আমাদের ধ্যানধারণা থেকে নিজেকে সরিয়ে দেয়। এইভাবে, আমাদের ধারণার প্রচেষ্টা যখন কাল ক্ষেত্রে পিছনের দিকে ফেরে, তখন ঈশ্বরের যা স্বকীয় অর্থাৎ তাঁর অনন্তকালীন অস্তিত্ব, তার পূর্ববর্তী অন্য কিছুই ধারণ করতে অক্ষম; কারণ, যদিও আমরা অনন্তকাল ধরে অনুসন্ধান করে থাকতাম, তবু ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের সক্ষম করার ব্যাপারে তিনি নিজে এই স্থায়ী বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই উপস্থাপন করেন না, তথা, ঈশ্বর সবসময় আছেন। সুতরাং, মোশির দ্বারা নির্দেশ করা ঈশ্বরের সেই যে বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমাদের মানবীয় উপলব্ধি-শক্তি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না, সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুসমাচার সাক্ষ্য দেয় যে (ক), বৈশিষ্ট্যটা একমাত্র জনিত ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য,

কারণ ‘আদিতে ছিলেন বাণী’, কারণ ‘বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে’, কারণ তিনি ছিলেন সত্যকার আলো’, কারণ ‘একমাত্র জনিত ঈশ্বর পিতার বুকে বিরাজমান (খ)’, কারণ যিশু খ্রিষ্ট সবকিছুর উর্ধ্বে ঈশ্বর (গ)।

২৫। অতএব, তিনি ‘ছিলেন’ ও তিনি ‘আছেন’, কারণ তিনি তাঁর থেকে উদ্ভূত যিনি যা তিনি সবসময় তা (ক)। কিন্তু তাঁর থেকে অর্থাৎ পিতা থেকে হওয়া, তা জন্ম ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। আরও, যিনি সবসময় আছেন, তাঁর থেকে সবসময় হওয়া, তা অনন্ততা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়; কিন্তু পুত্র এই অনন্ততা নিজ থেকে নয়, কিন্তু সেই অনন্তকালীন [পিতা] থেকেই পান। কেননা, জনিতজন অনন্তকালীন না হলে তবে প্রজননের প্রণেতা সেই পিতাও অনন্তকালীন নন। যেহেতু এটাই হলো তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাঁর পিতা সবসময় ‘আছেন’ ও তিনি সবসময় তাঁর পুত্র, এবং যেহেতু ‘আছেন’ বলায় অনন্ততা নির্দেশিত, সেজন্য এটা দাঁড়ায় যে, যখন তিনি সেই ‘হওয়ার’ অধিকারী, তখন অনন্তকালীন ‘হওয়ারও’ অধিকারী। আরও, প্রজনন যে জন্ম দাবি করে ও জন্ম যে অস্তিত্বহীন একজনকে নয় কিন্তু অস্তিত্বশীল একজনকে দাবি করে, একথা কেউই সন্দেহ করে না। অন্যদিকে, এতেও আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, যে কেউ পূর্বাস্তিত্বের অধিকারী, সে জন্ম নিতে পারে না। কেননা স্বপরাক্রম গুণে যিনি অনন্তকালীন হয়ে অস্তিত্বশীল আছেন, তাঁর পক্ষে জন্ম নেওয়ার কোন দরকার হয় না। কিন্তু যিনি একাধারে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের পরাক্রম ও বাণী, যেহেতু সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর সঞ্জাত হলেন, সেজন্য তিনি সেই পিতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন যে, তিনিই তাঁর ‘হওয়ার’ প্রণেতা। যেহেতু তিনি তাঁর থেকে সঞ্জাত যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, সেজন্য তিনি শূন্য থেকে সঞ্জাত নন। যেহেতু তিনি অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে সঞ্জাত, সেজন্য তাঁর জন্ম অবশ্যই যেকোন ধরনের ধ্যানধারণার পূর্ববর্তী। ‘জন্ম নেবার আগে তিনি ছিলেন না’ তেমন বাক্চাতুরীর জন্য এখানে স্থান নেই। কেননা, তিনি আমাদের ধ্যানধারণার অধীন হলে, অর্থাৎ জন্ম নেবার আগে তিনি অস্তিত্বহীন হলে তবে আমাদের ধ্যানধারণা ও কালও তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী, কারণ যা কিছু একসময় ছিল না তা ধ্যানধারণা ও কালের অধীন নয় যেহেতু বাক্যটির অর্থই এটা যে, সেই বস্তু একসময় ছিল না: বাস্তবিকই, ‘ছিল না’ কথাটা একটা সময়কাল নির্দেশ করে। কিন্তু যিনি সেই

অনন্তকালীন থেকে উদ্ভূত ও সবসময় ছিলেন, তিনি অজনিত নন ও কখনও অস্তিত্বহীন ছিলেন না। কেননা ‘সবসময় অস্তিত্বশীল হওয়াটা’ হলো সময়ের অতিক্রান্ত অবস্থার শামিল, ও ‘সঞ্জাত হওয়াটা’ হলো জন্মের শামিল।

২৬। তাই আমরা স্বীকার করি, একমাত্র জনিতজন ঈশ্বর জন্ম নিলেন, কিন্তু অনন্তকালীন সর্বযুগের আগেই জন্ম নিলেন (ক)। কেননা আমাদের এই স্বীকারোক্তিকে প্রেরিতদূতদের ও নবীদের প্রচার-বাণীর স্থিরীকৃত সীমানার মধ্যে রাখা দরকার যদিও মানবীয় ধ্যানধারণা কালের বাইরের জন্মের কথা ধারণ করতে পারে না, কারণ পার্থিব জীবগুলোর স্বরূপ ক্ষেত্রে এমনটা হতে দেওয়া হয় না যে সেগুলোর কোন একটা সর্বযুগের আগে জন্ম নিল। কিন্তু তেমনটা ঘোষণা করার পর কেমন করে আমরা সেটার সঙ্গে একই ধর্মতত্ত্ব হিসাবে এটারই মিল ঘটাব যা অনুসারে জন্ম নেবার আগে তিনি ছিলেন না? কেননা প্রেরিতদূত অনুসারে একমাত্র জনিত ঈশ্বর অনন্তকালীন সর্বযুগের পূর্ববর্তী। তাই, তিনি যে অনন্তকালীন সর্বযুগের আগে জন্ম নিলেন, যখন একথা মানবীয় উপলব্ধি-শক্তির যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত শুধু নয় কিন্তু বিশ্বাস-ভিত্তিক প্রজ্ঞার অনুরূপ ঘোষণাও হয়—আমরা তো ভালই জানি যে, জন্ম একটা প্রণেতা দাবি করে, ও যা কালের অতীতে স্থিত তা অনন্তকালীন, ও অনন্তকালীন সর্বযুগের আগে যা সঞ্জাত তা মানবীয় ধ্যানধারণা অতিক্রম করে—তখন, জগতের ধ্যানধারণা অনুসরণ করে এটাই সমর্থন করা যে জন্ম নেবার আগে পুত্র ছিলেন না, তা অবশ্যই ভক্তিহীন ইচ্ছাক্রমে মানব উপলব্ধি-শক্তির একটা ধারণা উৎকীর্ণ করার শামিল। তাছাড়া, যা কিছু কাল অতিক্রম করে তা অনন্তকালীন।

২৭। কেননা আমরা সমস্ত কালকে, হয় কল্পনা দ্বারা, না হয় জ্ঞান দ্বারা আলিঙ্গন করতে পারি: কেননা আমরা জানি যে, যা আজ আছে তা গতকাল ছিল না, কারণ যা গতকাল ছিল তা এখন আর নেই; অন্যদিকে, যা এখন আছে, তা শুধু এখন আছে ও গতকাল তা ছিল না। কল্পনা দ্বারা আমরা অতীতকাল পরিমাপ করতে পারি, যার ফলে এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, একটা শহর স্থাপিত হবার আগে এমন সময় ছিল যখন সেই স্থাপিত শহর ছিল না। সুতরাং, সমস্ত কাল, হয় আমাদের জ্ঞানের গন্ডিতে, না হয়

আমাদের কল্পনার গণ্ডিতে রয়েছে, সেজন্য সেই কাল সম্পর্কে আমরা মানবীয় যুক্তির নিয়ম অনুসারে বিচার-বিবেচনা করি; তাই, কোন একটা কিছু বিষয়ে আমরা মনে করি, তখনই আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে কথা বলি যখন বলি, ‘জন্ম নেবার আগে তা ছিল না’, কারণ সবসময়ই এমন পূর্বকালীন কাল রয়েছে যা প্রতিটি বিষয়ের পূর্ববর্তী। কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়াদি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্ম ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই যা অনন্তকালীন কালের আগে ছিল; এর ফলে ঈশ্বর ক্ষেত্রে ‘জন্ম নেবার আগে’ সংজ্ঞাটা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়, এবং যিনি অনন্তকালীন কালের আগে অনন্তকালীন প্রতিশ্রুতির অধিকারী, ধন্য প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে তিনি যে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় বিরাজিত, সেই যে জীবন অনন্তকালীন কালের আগে দেবেন বলে সেই সত্যবাদী ঈশ্বর প্রতিশ্রুত হলেন (ক), তাঁর বিষয়ে এমনটাও বলা যুক্তিসঙ্গত নয়; এবং এমন কাল রয়েছে যে কালে তিনি ছিলেন না, তাঁর বিষয়ে এমনটাও বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। যাঁর অনন্তকালীন সর্বযুগের পূর্বাস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়, তিনি যে কোন কিছুর পরে অস্তিত্বশীল হতে শুরু করলেন, যুক্তি তেমন ধারণা প্রত্যাখ্যান করে।

২৮। কোন কিছু যে অনন্তকালীন কালের আগে জন্ম নেবে, তা মানব স্বরূপের সাধ্যের বাইরে ও এমন বিষয় যা আমরা উপলব্ধি করতে অক্ষম; তথাপি এক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজের বিষয়ে যা বলেন, আমরা তাঁর সেই সমস্ত ঘোষণা বিশ্বাস করি। তবে আমাদের আজকালের ভ্রান্তমত মানব যুক্তির ধ্যানধারণার ভিত্তিতে কেমন করে বলতে পারে যে, যাকে প্রৈরিতিক বিশ্বাস, মানুষের সমস্ত উপলব্ধি-সাধ্যের বাইরে, সবসময়ই সঞ্জাত বলে, বা অন্য কথায়, অনন্তকালীন কালের আগে অস্তিত্বশীল ছিলেন বলে ঘোষণা করে, তিনি জন্ম নেবার আগে ছিলেন না? যা কিছু কালের আগে সঞ্জাত, তা সবসময়ই সঞ্জাত, কারণ যা কিছু অনন্তকালীন কালের আগে আছে তা সবসময়ই আছে। অন্যদিকে, যা সবসময় সঞ্জাত, তা যে এককালে ছিল না তা হতে পারে না, কারণ এককালে অস্তিত্বের অধিকারী না হওয়া এমন ধারণা যা সবসময় অস্তিত্বশীল হওয়া থেকে ভিন্ন ধারণা। আরও, সবসময় অস্তিত্বশীল হওয়া এমন ধারণা বাদ দেয় যা অনুসারে একজন সবসময় ছিলেন না। এবং পুত্র যে সবসময় ছিলেন না, যেহেতু এই ধারণা এ দ্বারা অস্বীকৃত যে, তিনি সবসময় সঞ্জাত, সেজন্য তিনি যে জন্ম নেবার আগে ছিলেন না, তা আমরা ভাবতে

পারি না : এটা সুস্পষ্ট যে, যিনি অনন্তকালীন কালের আগে সঞ্জাত, তিনি সবসময় সঞ্জাত, যদিও আমরা ধ্যানধারণা দ্বারা সর্বযুগের পূর্ববর্তী জন্মের ধারণা স্থির করতে পারি না। কেননা যখন আমাদের স্বীকার করতে হয় যে—ও তেমন স্বীকারোক্তি যুক্তিসঙ্গতই বটে—যিনি সবসময় সঞ্জাত বলে সবসময় ‘আছেন’, তিনি অদৃশ্য বা দৈহিক সমস্ত সৃষ্টবস্তুর আগে, সর্বযুগের আগে, অনন্তকালীন কালের আগে, ও সমস্ত ধরনের ধ্যানধারণার আগে সঞ্জাত হয়েছেন, তখন আমাদের ধ্যানধারণা দ্বারা এটাও আদৌ ভাবতে পারি না যে, তিনি জন্ম নেবার আগে ছিলেন না : কারণ যিনি অনন্তকালীন কালের আগে সঞ্জাত, তিনি সমস্ত ধ্যানধারণার পূর্বকালীন, এবং যিনি সবসময় ছিলেন বলে স্বীকার্য, তিনি যে কোন এক কালে ছিলেন না তা একেবারে অচিন্তনীয়।

২৯। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষরা কুটিলতার সঙ্গে আমাদের সামনে এই চিক্ৰণ অভিযোগ উপস্থাপন করে : তারা নাকি বলে, পুত্র যে জন্মের আগে ছিলেন না, তা যখন অচিন্তনীয়, তখন অন্তত এটাই চিন্তা করা যেতে পারে যে, এমন একজন সঞ্জাত হলেন যিনি ইতিমধ্যে ছিলেন।

৩০। তবে আমি উত্তরে এই প্রতিবাদীকে বলব, তার এমনটা কি মনে পড়ে, আমি পুত্রকে সঞ্জাত ছাড়া অন্য ভাবে চিহ্নিত করেছি, অথবা আমি কি কখনও এটা বলেছি যে ‘অনন্তকালীন সর্বযুগের আগে অস্তিত্বশীল হওয়া’ বাক্যটা ‘অস্তিত্বশীল একজন জন্ম নেয়’ বাক্যটার শামিল? অস্তিত্বশীল একজন যে জন্ম নেয় তা তো প্রকৃত জন্ম নয় কিন্তু তা হলো জন্মের মধ্য দিয়ে নিজের পরিবর্তন মাত্র। অপরদিকে সবসময় সঞ্জাত হওয়া বলতে এটা বোঝায় যে, সেই জন্ম কালের যেকোন ধারণার পূর্বকালীন ব্যাপার, ও জন্মের পূর্বকালীন অস্তিত্বের কথা ভাবা উপলব্ধি-শক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এক কথায়, অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে সঞ্জাত হওয়া ও জন্মের আগে অস্তিত্বশীল হওয়া একই কথা নয়। আরও, অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে সবসময় সঞ্জাত হওয়াটা জন্মের আগের অস্তিত্বহীনতাকে মানায় না।

৩১। এদিকে, এই ঘটনা (ক) একথা সমর্থন করার সম্ভাবনা বাদ দেয় যে তিনি জন্মের আগে ছিলেন, কারণ যিনি ধ্যানধারণা অতিক্রম করেন তিনি কোন দিকেই ধ্যানধারণার অধীন নন। কেননা যদিও [অনন্তকালীন] জন্ম-ধারণাটা ধ্যানধারণাকে অতিক্রম করে, তবু তিনি যে জন্ম নেবার আগে ছিলেন না, তাও যে ধারণা করার ব্যাপার হতে পারে তা সম্ভব নয়। সুতরাং, যেহেতু এটা মেনে নিতে হবে যে সবসময় সঞ্জাত হওয়া বলতে বাস্তব জন্মের কথা ছাড়া অন্য কিছুই বোঝায় না, সেজন্য, তিনি যে জন্মের আগে ছিলেন বা ছিলেন না, এব্যাপার আমাদের ধ্যানধারণার সাধ্যের ব্যতীত, কারণ তিনি যে অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে জন্ম নিয়েছেন এটাই তাঁকে ধ্যানধারণার পক্ষে অনতিক্রমণীয় করে তোলে। তাই তিনি জন্ম নিয়েছেন ও সবসময় ‘আছেন’; তিনি জন্ম নিয়েছেন, একথা ছাড়া তিনি এমনটা হতে দেন না আমরা তাঁর বিষয়ে অন্য কিছু ভাবব বা বলব। কেননা, যে কালের মধ্যে ধ্যানধারণা রয়েছে, যেহেতু তিনি সেই কালের চেয়েও পূর্বকালীন—যেহেতু অনন্তকালীন কাল ধ্যানধারণার পূর্ববর্তী—সেজন্য তিনি এমনটা বাদ দেন যে, ধ্যানধারণা তাঁর বিষয়ে স্থির করবে জন্ম নেবার আগে তিনি ছিলেন বা ছিলেন না: কারণ একদিকে জন্মের আগের অস্তিত্ব জন্ম-ধারণার বিরোধী ব্যাপার, এবং অন্যদিকে, অস্তিত্বহীনতা কাল-ধারণা দাবি করে। শেষ কথা, অনন্তকালীন যুগগুলোর অসীমতা সমস্ত কাল-ধারণা সংক্রান্ত সমস্ত সংজ্ঞা অর্থাৎ তিনি যে ছিলেন না সংক্রান্ত ধারণাকে অসম্ভব করে তোলে, এবং অনন্তকালীন জন্ম সেই সবকিছু মানায় না যা সেটার সঙ্গে অর্থাৎ যে তিনি জন্ম নেবার আগে ছিলেন, এধারণার সঙ্গে মিল রাখে না। অন্যদিকে, তিনি ছিলেন বা ছিলেন না সংক্রান্ত ব্যাপার যদি আমাদের ধ্যানধারণা দ্বারা স্থির করা যেতে পারত, তাহলে এটা দাঁড়াত যে, সেই জন্ম কালেই ঘটে: কারণ যিনি সবসময় অস্তিত্বশীল নন, তিনি অবশ্যই কালের কোনও এক সময়ের পরেই অস্তিত্বশীল হতে শুরু করেছেন।

৩২। অতএব, বিশ্বাস, সাক্ষ্যগুলো ও যুক্তি যে সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে তা এ: প্রভু যিশু জন্ম নিয়েছেন ও সবসময় অস্তিত্বশীল। মন পুত্র সংক্রান্ত জ্ঞান অতীতকালে অনুসন্ধান করলে তবে, যে অনুসন্ধান করে, অবশ্যই তার চেতনায় কেবল এই সত্য বর্তমান থাকে যে, তিনি জন্ম নিয়েছেন ও সবসময় অস্তিত্বশীল। সুতরাং, পিতা ঈশ্বর ক্ষেত্রে যেমন

এটাই স্বকীয় যে, তিনি জন্ম ছাড়া সবসময় অস্তিত্বশীল, তেমনি পুত্র ক্ষেত্রে এটা মেনে নিতে হবে যে, [অনন্তকালীন] জন্ম গুণে তিনি অনন্তকালীন অস্তিত্বের অধিকারী। আরও, ‘জন্ম’ শব্দটা ‘এক পিতা আছেন’ একথা ছাড়া অন্য কিছু বোঝাবে না; ‘পিতা’ শব্দটা ‘একটা জন্ম রয়েছে’ একথা ছাড়া অন্য কিছু বোঝাবে না। এ শব্দ দু’টোর প্রকৃত অর্থ এড়ানো আদৌ সম্ভব নয়। হয় পিতা সবসময় পিতা নন যার ফলে পুত্র সবসময় পুত্র নন, না হয় পিতা সবসময় পিতা যার ফলে পুত্র সবসময় পুত্র। পুত্রকে যে-সময় থেকে বঞ্চিত করা হত যার ফলে তিনি অনন্তকালীন পুত্র হতে পারতেন না, পিতাও সেই সমস্ত সময় থেকে বঞ্চিত হতেন যার ফলে তিনি অনন্তকালীন পিতা হতে পারতেন না। এর ফলে তাঁর ঈশ্বরত্ব সবসময় অনন্তকালীন হত, কিন্তু তাঁর পিতৃত্ব তাঁর ঈশ্বরত্বের মত অনন্তকালীন হত না।

৩৩। ভ্রান্তমতপন্থীরা যে তাদের নানা অভিমতে পুত্রের উপরে কালের মধ্যে ঘটিত জন্ম আরোপ করার দুঃসাহস দেখায় তা শুধু নয়, কিন্তু পিতার প্রজননও কালের মধ্যে ঘটিত ব্যাপার বলে গণ্য করে, কারণ প্রজনন-প্রক্রিয়া জন্মের সময়কালে স্থান পায়।

৩৪। হে ভ্রান্তমতপন্থী, ঈশ্বর যে অবশ্যই সবসময় ছিলেন কিন্তু তিনি যে সবসময় পিতা ছিলেন না, এমনটা স্বীকার করা তুমি কি ভক্তিময় ও ধর্মসম্মত আচরণ বলে জ্ঞান কর? এইভাবে চিন্তা করা যদি তোমার কাছে ভক্তিময় ও ধর্মসম্মত ব্যবহার, তাহলে তুমি পলকে অভক্তি বিষয়ে অভিযুক্ত করতে বাধ্য, কারণ তিনি এটা বলেন যে, পুত্র অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে (ক) আছেন। যে প্রজ্ঞা নিজেই নিজের বিষয়ে এমনটা বলেন যে, তিনি যুগগুলোর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তুমি তাঁকেও অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে বাধ্য, কারণ যখন পিতা আকাশমণ্ডল প্রস্তুত করছিলেন তখন সেই প্রজ্ঞা তাঁর পাশে ছিলেন। কিন্তু, ঈশ্বর যে সময়ে পিতা হতে শুরু করেন, সেই সময় স্থির করার জন্য তোমাকে সর্বপ্রথমে সেই ক্ষণ স্থির করতে হয় যে ক্ষণে যুগগুলো হতে শুরু করেছে। অবশ্যই, সেগুলোর যদি একটা আদিকাল থাকে তাহলে প্রেরিতদূত মিথ্যাবাদী, কারণ তিনি সেগুলো অনন্তকালীন বলে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, যেহেতু লেখা রয়েছে, সেগুলো কাল ও বছরের জন্য চিহ্ন হোক (খ) সেজন্য তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টিকাল

গণনা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু যিনি আকাশমণ্ডলের আগে আছেন—এবং তোমাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে আকাশ কালেরও পূর্বকালীন—তিনি যুগেরও আগে আছেন। এমনকি তিনি যুগের পূর্বকালীন শুধু নন, কিন্তু যুগগুলোর পূর্বকালীন যত প্রজন্মের প্রজন্মেরও পূর্বকালীন। তাই যা ক্ষয়শীল, পার্থিব ও সঙ্কীর্ণ বিষয়, তা দ্বারা কেনই বা তুমি ঐশ্বরিক ও অসীম বিষয় সীমাবদ্ধ করতে চাও? খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে পল যুগগুলোর অনন্ততা ছাড়া আর অন্য কিছুই জানেন না। প্রজ্ঞা নিজের বিষয়ে এমনটা বলেন না, তিনি [অর্থাৎ প্রজ্ঞা] কোন একটা কিছুর পরে অস্তিত্বশীল, কিন্তু সবকিছুরই আগে তিনি অস্তিত্বশীল। তোমার বিচারমান অনুসারে কালগুলো সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টিকাল থেকেই শুরু করবে বলে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু দাউদ তখনই এটা নির্দেশ করেন যে, খ্রিষ্ট সূর্যের আগে অস্তিত্বশীল, যখন বলেন, সূর্যের আগেই তাঁর নাম (গ)। ঈশ্বরের বিষয়গুলো এজগতের উৎপত্তি নিয়ে শুরু হয়েছে পাছে তুমি এমনটা ভাব, সেজন্য সেই একই দাউদ বলেন, চন্দ্রের আগেই যত প্রজন্মের প্রজন্ম (ঘ)। উল্লিখিত বচনগুলোতে, সত্যিকারে মহান ও নবীয় আত্মার যোগ্য সেই মানুষেরা কালের কথা মূল্যহীন জ্ঞান করেন ও এমন ফাঁক রাখেন না যা দিয়ে মানবীয় ধ্যানধারণা সেই জন্মের অতীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে যা অনন্তকালীন কালের অতীত। কিন্তু ভক্তিময় মনোভাবের উপরে স্থাপিত বিশ্বাস অন্তত এ নিয়ম মেনে নিক, অর্থাৎ সে মনে রাখুক যে একমাত্র জনিত ঈশ্বর সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এমনভাবে জন্ম নিয়েছেন যাতে তাঁর বেলায় সিদ্ধ জন্ম স্বীকৃত হয়; এবং তাঁর ঈশ্বরত্বকে দেয় মর্যাদার খাতিরে এটা ভুলে না যাক যে, তিনি অনন্তকালীন।

৩৫। কিন্তু আমরা মিথ্যাকথা বলা বিষয়ে অভিযুক্ত হয়েছি, ও আমাদের সঙ্গে প্রেরিতদূতের প্রচার করা ধর্মতত্ত্বও আক্রান্ত হয়েছে কারণ সেই ধর্মতত্ত্ব জন্মের কথা স্বীকার করতে করতে সেই জন্মের অনন্ততা ঘোষণা করে। এর ফলে, ভ্রান্তমতপন্থীদের মতে, সেই [অনন্তকালীন] জন্ম এক প্রণেতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে দিতে, ঐশ্বরিক জন্ম-রহস্য ক্ষেত্রে অনন্ততার কথা বলাটা হলো মানবীয় ধ্যানধারণার সীমা অতিক্রম করা। কেননা আমাদের বিরুদ্ধে সেই ঘোষণা উত্থাপন করা হচ্ছে যা প্রজ্ঞা নিজের বিষয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মতে, প্রজ্ঞা এমন প্রমাণ দিয়েছিলেন যে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল; তাঁর কথা এ, প্রভু আপন পথগুলোর আদির জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন (ক)।

৩৬। হে ভ্রান্তমতপন্থী, তুমি কেমন দুর্ভাগা, তুমি যে মণ্ডলীর প্রচারিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র ফেরাও যা [ইহুদী] সমাজগৃহের বিরুদ্ধে মণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছে, এবং পরিত্রাণদায়ী ধর্মতত্ত্বের আক্রমণের অতীত এমন মূলধারণা সকলের পরিত্রাণের বিরুদ্ধে ফেরাও। কেননা, উপরে উল্লিখিত কথাগুলো হাতিয়ার করে তুমি এমনটা সমর্থন কর যে খ্রিস্ট একটা সৃষ্টজীব, ও অনন্তকালীন প্রজ্ঞার সেই কথা দ্বারা সেই ইহুদীকে স্তব্ধ কর না যে ইহুদী এমনটা অস্বীকার করে যে, খ্রিস্ট অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের কার্যকারিতা তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডে ও তাঁর সমস্ত শিক্ষাদানে উপস্থিত। উল্লিখিত বচনে, সেই প্রজ্ঞা বলেছেন, তিনি [অর্থাৎ প্রজ্ঞা] ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য জগতের প্রারম্ভ থেকে সৃষ্ট হয়েছিলেন পাছে দৈবাৎ এমনটা ভাবা যেতে পারত যে প্রজ্ঞা মারীয়ার আগে অস্তিত্বশীল ছিলেন না। এসমস্ত কিছুতে প্রজ্ঞা নিজের জন্ম যে একটা সৃষ্টিকর্ম তা দেখাবার জন্য ‘সৃষ্ট’ শব্দটা কখনও ব্যবহার করেননি, কারণ প্রজ্ঞা ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট হয়েছিলেন। আর শুধু তা নয়, কিন্তু পাছে কেউ না কেউ ‘পথগুলোর আদি’—যা ঐশ্বরিক বিষয় ক্ষেত্রে হলো মানবীয় জ্ঞানের সত্যকার আদ্যস্থল—কথাটা এমন অর্থে বোঝে যা অনুসারে সেই অসীম জন্ম কালের সীমার অধীন, সেজন্য প্রজ্ঞা নিজের বিষয়ে বললেন, তিনি সমস্ত কালের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রজ্ঞাকে যে পথগুলোর আদির জন্য ও ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা একটা কথা, এবং তাঁকে যে সমস্ত কালের আগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, তা অন্য কথা। সেজন্য প্রজ্ঞা এটা বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিলেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা তাঁর সৃষ্টি হওয়ার চেয়ে পূর্বকালীন ব্যাপার। প্রজ্ঞা যে জগতের আগে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তেমনটা বলার উদ্দেশ্য এটা ছিল, যেন সৃষ্টি-রহস্য প্রকাশিত হয়, কারণ প্রজ্ঞা জগতের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর সৃষ্টি জগতের আদির পরেই ঘটে।

৩৭। তবে, পাছে ‘সৃষ্টি’ ও ‘প্রতিষ্ঠিত’ শব্দ দু’টো ঐশ্বরিক জন্মে বিশ্বাসের জন্য বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সেজন্য প্রজ্ঞা একথা বলে চলেন, পর্বতমালার ভিত স্থাপিত হওয়ার আগে, উপপর্বতের উদ্ভবের আগে তিনি আমাকে জনিত করলেন (ক)। তাই যিনি

যুগগুলোর আগে স্থাপিত হলেন তিনি পৃথিবীর আগে জনিত হলেন : এবং পৃথিবীর আগে শুধু নয়, কিন্তু পর্বতের ও উপপর্বতের আগেও জনিত হলেন। এবং যেহেতু প্রজ্ঞা নিজের বিষয়ে কথা বলছেন, সেজন্য একথা দ্বারা তিনি কথার চেয়ে আরও বেশি কিছু বোঝাতে ইচ্ছা করেন। কেননা অসমতা সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য যা কিছু ব্যবহৃত, তা এমন স্বরূপের হওয়ার কথা যাতে কালের দিক দিয়ে কোন একটা বস্তুর বা বস্তুগুলোর কোন একটা শ্রেণিরও পরবর্তী বলে না দাঁড়ায়। কিন্তু যা কিছু কালে অস্তিত্বশীল, তা অনন্ততা ব্যক্ত করার জন্য বৃথাই ব্যবহৃত হবে : কারণ, অন্যান্য বস্তুর তুলনায় পরবর্তী হওয়ার ফলে সেই সমস্ত কিছু অসীমতার উৎপত্তি ব্যক্ত করার জন্য উপযোগী নয় যেহেতু সেই সমস্ত কিছু কালের মধ্যে নিজেদের উৎপত্তি পেয়েছে। যখন আমরা এটা দেখি যে, স্বর্গদূতদের উৎপত্তি পৃথিবীর সৃষ্টিকালের পূর্বকালীন ঘটনা, তখন ঈশ্বর যে খ্রিষ্ট প্রভুকে পৃথিবীর আগে জনিত করলেন তাতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? (খ)। আরও, যিনি পৃথিবীর আগে জনিত, তাঁর বিষয়ে যে এটাও ঘোষিত রয়েছে যে, তিনি পর্বতের আগে সজ্জাত, এবং পর্বতের আগে শুধু নয়, উপপর্বতেরও আগে সজ্জাত, এবং যুক্তি যে এমনটা দাবি করে, পর্বত যেন অস্তিত্বশীল হতে পারে সেজন্য আগে পৃথিবী অস্তিত্বশীল হতে হবে, এসমস্ত কিছুতে সমস্যা কি? এর ফলে এমনটা ভাবা যেতে পারে না, একথা এমনিই এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেন এটা বোঝানো যেতে পারত যে, যিনি পৃথিবী, পর্বত ও উপপর্বতের পূর্বকালীন সমস্ত কিছুর পূর্ববর্তী, তিনি নিজের অসীমতার অনন্ততা গুণে উপপর্বত, পর্বত ও পৃথিবীর আগে ছিলেন।

৩৮। কিন্তু ঐশ্বরিক বিবৃতি আমাদের মনকে আলোবঞ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখেনি, কারণ সেই বাক্যের কারণ একথা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে, ঈশ্বর অঞ্চলগুলো, বসবাসের অযোগ্য স্থানগুলো ও আকাশের নিচে বসবাসের যোগ্য পর্বতচূড়া গড়লেন। যখন তিনি আকাশ প্রস্তুত করছিলেন, যখন তিনি নিজের আসন আলাদা রাখছিলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম; যখন তিনি বায়ুমণ্ডলের উপরে, উর্ধ্বস্থানে, বিপুল মেঘমালা নির্মাণ করছিলেন ও যখন জলের উৎসধারা আকাশের নিচে স্থিরীকৃত ভাবে বসাচ্ছিলেন ও যখন পৃথিবীর ভিত্তিমূল অটল করছিলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম ও সবকিছু সুসংবদ্ধ করছিলাম (ক)। এটা কালের কোন্ সময়কাল? অথবা, মানবীয় ধ্যানধারণা একমাত্র

জনিত ঈশ্বরের অসীম জন্মের অতীতে আর কত দূরে নিজেকে প্রসারিত করতে পারে? এই যে সমস্ত কিছু যা আমরা সৃষ্টি বলে জানি, এসমস্ত কিছুর যিনি পূর্বকালীন, তাঁর প্রজননের কথা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; আরও, সাময়িক বস্তুর আগে জন্ম নেবার ব্যাপারে তাঁকে যে অগ্রাধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে, কেবল সেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই এমনটা সমর্থন করা যে তিনি কালের দিক দিয়ে সেই সমস্ত কিছুর পূর্ববর্তী হয়েও অসীম ছিলেন না, তাও সমর্থন করা সম্ভব নয়। তেমনটা হলে তবে, যেহেতু সবকিছু কালের সীমার অধীন সেজন্য তিনি সেসমস্ত কিছুর পূর্বকালীন হয়েও কালের সীমার অধীন হতেন কারণ, যা কালের মধ্যে ঘটে, সেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি তাঁরই জন্মের কাল নির্দেশ করত যিনি সেগুলোর আগে সঞ্জাত। কেননা যা কিছু সাময়িক বস্তুর পূর্বকালীন, তা সেই একই কাল-সম্পর্কে রয়েছে যা সেই সবকিছুর মধ্যে রয়েছে।

৩৯। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী ও সত্যকার প্রজ্ঞার শিক্ষা যখন এটা শেখায় যে প্রজ্ঞা সাময়িক বস্তুর চেয়ে শুধু নয় কিন্তু অসীম বস্তুর চেয়েও পূর্বকালীন, তখন সেই বাণী ও সেই প্রজ্ঞা সিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্য বিষয়ে কথা বলে। যখন আকাশমণ্ডল নিরূপণ করা হচ্ছিল তখন প্রজ্ঞা ঈশ্বরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। আকাশমণ্ডল-নিরূপণটা কি কালের মধ্যে ঈশ্বরের একটা কর্মক্রিয়া বলে গণ্য হতে পারে এই অর্থেই যে, চিন্তার একটা আকস্মিক প্রেরণা তাঁর মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করল—কেমন যেন সেই মন আগে অবশ ও নিস্তেজ ছিল—যার ফলে তিনি মানুষের অভ্যাস-মত আকাশমণ্ডল নির্মাণ করার লক্ষ্যে মাল ও যন্ত্রপাতি খোঁজ করলেন? অথচ এধারণার চেয়ে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড ক্ষেত্রে নবীর ধারণা একেবারে ভিন্ন: তিনি বলেন, প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই সেই আকাশের পরাক্রমের আবির্ভাব (ক)। তথাপি গড়ে ওঠার জন্য আকাশমণ্ডলের পক্ষে ঈশ্বরের বাণীর দরকার হল, কারণ, নিজের অবিচল গঠন চিহ্নিত করে এমন অবিচলতা দ্বারা আকাশমণ্ডল যে অনুক্রম ও শ্রেষ্ঠতা দেখায়, সেই অনুক্রম ও শ্রেষ্ঠতা কোন না কোন জড়পদার্থের উপযুক্ত প্রয়োগ বা মিশ্রণ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের ফুৎকার থেকেই আগত। সুতরাং, যখন ঈশ্বর আকাশমণ্ডল নিরূপণ করছিলেন, সেসময় ঈশ্বরের জনিত প্রজ্ঞা যে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এর অর্থ কি? কেননা আকাশমণ্ডল-সৃষ্টিকর্ম জড়পদার্থ-প্রস্তুতিকরণ নয়, ও নিজের কর্ম সংক্রান্ত প্রারম্ভিক

চিন্তায় বিলম্ব করা ঈশ্বরের স্বরূপকে মানায় না। যা কিছু সৃষ্টজগতে রয়েছে সেই সবকিছু সবসময়ই ঈশ্বরে ছিল: এসব কিছু যে নিজ নিজ সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একথা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান ও পরাক্রম ক্ষেত্রে সেইসব কিছুর কোন আদি নেই। এবিষয়ে নবী সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, হে ঈশ্বর, তুমি যে সেইসবই গড়েছ যা হবে (খ)। ভাবী বস্তুগুলোর সৃষ্টি হওয়া দরকার, সেজন্য সেগুলোর নির্মিত হওয়ার কথা, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে—তাঁর কাছে তো সৃষ্টিতে নতুন ও আকস্মিক বলতে কিছুই নেই—সবই গড়া হয়েই গেছে, কারণ সবগুলোর জন্য এমন ঐশ্বরিক সঙ্কল্প রয়েছে যা সেগুলোর সৃষ্টি ক্ষেত্রে কাল সংক্রান্ত, এবং একারণেও যে, সেগুলো ঈশ্বরের পরাক্রমের পূর্বজ্ঞান-প্রক্রিয়াতেও গড়া হয়েই গেছে। এর ফলে, এখন যখন প্রজ্ঞা আমাদের জানিয়ে দেন, তিনি যুগগুলোর আগে জন্ম নিলেন, তখন প্রজ্ঞা বুঝিয়ে দেন যে তিনি সৃষ্টি সমস্ত কিছুর পূর্বকালীন, আর শুধু তা নয়, এটাও বুঝিয়ে দেন যে, যা কিছু অনন্তকালীন, তিনিও [তথা প্রজ্ঞাও] সেই সবকিছুর সহ-অনন্তকালীন। কেননা ঈশ্বরের আসন যে তখনই নির্দিষ্ট হলো যখন তা গড়া হয়ে গেছিল তা নয়, কারণ নির্দিষ্ট করা একটা কথা ও আসন গড়া আলাদা কথা। আরও, আকাশমণ্ডল যে তখনই গঠন করা হলো যখন নিরূপিত হলো তাও নয়, কেননা যখন ঈশ্বর আকাশমণ্ডলকে নিরূপণ করছিলেন ও নির্দিষ্ট করছিলেন তখন প্রজ্ঞা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরে প্রজ্ঞা সেই আকাশমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করছিলেন তাঁরই পাশে যিনি আকাশমণ্ডল গড়েছিলেন; যিনি নিরূপণ করেন, তাঁর কাছে নিজের উপস্থিতি দ্বারা প্রজ্ঞা নিজের অনন্ততা বিষয়ে প্রমাণ দেন, ও যিনি গড়েন, তাঁর পাশে যখন প্রজ্ঞা আকাশমণ্ডল অলঙ্কৃত করেন তখন নিজের ভূমিকা প্রকাশ করেন। উপরে উল্লিখিত বচনে প্রজ্ঞা বললেন, তিনি পৃথিবী, পর্বত ও উপপর্বতের আগেও জনিত হয়েছিলেন, কারণ এটা বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিলেন যে, যখন আকাশমণ্ডল নিরূপিত হচ্ছিল তখন প্রজ্ঞাও উপস্থিত ছিলেন, এবং এটাও দেখাতে ইচ্ছা করছিলেন যে, যে সময় আকাশমণ্ডল নিরূপিত হচ্ছিল, সেই সময়ে ঈশ্বরের সঙ্কল্পে কর্মটা সম্পন্নই ছিল; কেননা তাঁর কাছে নতুন বলতে কিছুই নেই।

৪০। বিশ্বসৃষ্টির নিরূপণ চিরকালীন ও অনন্তকালীন। আগে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের কথা ভাবলেন ও পরে তাঁর মনের মধ্যে পৃথিবী সংক্রান্ত ধারণা ও সঙ্কল্প স্থান পেল, এই অর্থে

যে এই বিশ্বের পিণ্ড চিন্তার নানা স্বতন্ত্র ধারণার ফলাফল তা নয়। তিনি সবকিছুর প্রতিটি অংশের কথা এমনভাবে ভাবেননি যার ফলে আগে পৃথিবীকে স্থলের আকারে বিছিয়ে দিলেন; পরে, আরও ভাল সঙ্কল্প ক্রমে পর্বতমালার উচ্চতা সৃষ্টি করলেন; পরে উপপর্বতমালা দিয়ে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন করলেন; পরে পর্বতচূড়া পর্যন্তও পৃথিবীকে বসবাসের যোগ্য স্থান করলেন ও নিরূপিত আকাশমণ্ডলকে নিজের ঐশ্বরিক আসন থেকে পৃথক করলেন; আরও, এমনটাও নয় যে, বাতাসের তাড়িত বাষ্প আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে বিপুল মেঘমালা গড়ল; পরে আকাশের নিচে অবিচল জলের উৎস চলাচল করতে লাগল এবং অবশেষে পৃথিবী অবিচল ভিত্তিমূলে স্থির করা হল। প্রজ্ঞা ঘোষণা করেন, তিনি এসব কিছুর পূর্বকালীন। কিন্তু, যেহেতু আকাশের নিচে যা কিছু রয়েছে বা ঈশ্বর দ্বারা গড়া হয়েছে, ও আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার-ব্যবস্থাপনায় খ্রিষ্ট উপস্থিত ছিলেন, ও ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত আকাশমণ্ডলের অনন্ততার চেয়েও খ্রিষ্ট পূর্বকালীন, সেজন্য এসমস্ত কিছু আমাদের এমনটা হতে দেয় না, আলাদা আলাদা বস্তু ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরকে অযুক্ত চিন্তা আরোপ করব, কারণ সমষ্টিগত দিক দিয়ে এসমস্ত কিছুর নিরূপণ ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অনন্তকালীন। মোশিও এবিষয়ে সপ্রমাণ করেন, বিশ্বসৃষ্টি তার নিজস্ব একটা অনুক্রম দেখায়, অর্থাৎ, আকাশের সেই ফাঁপা শক্ত পরদা স্থির করা হয়, শুষ্ক স্থলভূমি অনাবৃত অবস্থায় রাখা হয়, সমুদ্রের জলরাশি পুঞ্জীভূত হয়, জ্যোতিষ্করাজি নানা স্থানে বসানো হয়, জল ও স্থলভূমির পক্ষ থেকে তখনই সেই প্রজনন হয় যখন জল ও স্থলভূমি নিজ থেকে প্রাণী উৎপন্ন করল, কিন্তু ঈশ্বরের কর্মসম্পাদনে আকাশমণ্ডলের, পৃথিবীর ও অন্যান্য পদার্থের সৃষ্টি-কর্মক্রিয়াটা কালের সবচেয়ে ক্ষুদ্র সময়কাল দ্বারাও বিচ্ছিন্ন নয়। সেগুলোর প্রস্তুতিকর্ম ঈশ্বরের সঙ্কল্পে সমান অনন্ততার অসীমতায় সম্পন্ন হয়েছিল।

৪১। তবে, যদিও এসমস্ত অসীম ও অনন্তকালীন বিচারের ব্যাপারে খ্রিষ্ট ঈশ্বরে উপস্থিত ছিলেন, তবু তিনি আমাদের কাছে কেবল তাঁর জন্ম বিষয়ক চেতনাই মঞ্জুর করেছেন। যেমন তাঁর জন্ম বিষয় জ্ঞান ঈশ্বরে বিশ্বাস অভিসুখে আমাদের চালনা করে, তেমনি তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁর জন্মের অনন্ততা চিনে নেওয়া আমাদের ভক্তি রক্ষা করা ক্ষেত্রে

উপযোগী হবে। কেননা যুক্তি ও উপলব্ধি-শক্তি এমনটা হতে দেয় না যে অনন্তকালীন সেই পিতা থেকে অনন্তকালীন নয় এমন পুত্র আগত হন।

৪২। কিন্তু হয় তো এমনটাও হতে পারে যে, ‘সৃষ্টি’ শব্দটা ও তিনি কেমন করে সেই শব্দ ব্যবহার করেন তাও আমাদের বিহ্বল অবস্থায় ফেলে। যদি ‘কালের আগে খ্রিস্টের জন্ম’ ও ‘ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্টি’ প্রকাশিত না হত, তাহলে অবশ্যই সৃষ্টি শব্দটা আমাদের বিহ্বল করতে পারত। জন্ম সৃষ্টি বলে অনুধাবনযোগ্য নয়, কারণ জন্ম সবকিছুর পূর্ববর্তী, কিন্তু সৃষ্টি কারণজনিত। যিনি ‘ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য’ সৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি আকাশমণ্ডল নিরূপিত হওয়ার আগে ছিলেন ও জগতের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে, এমনটা কি হতে পারে যে, ‘ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট হওয়া’ ও ‘সমস্ত কিছুর আগে জন্ম নেওয়া’ বাক্য দু’টো একই অর্থ বহন করে? প্রথম বাক্য কর্মক্রিয়াতে যাপিত কাল সংক্রান্ত; অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্য এমন অর্থ বহন করে কালের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

৪৩। নাকি তুমি এমনটা ইচ্ছা কর, ‘কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট’ বাক্যটা এই অর্থে নেওয়া হবে যে, তিনি সেই কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে সৃষ্ট হয়েছিলেন? অন্য কথায়, তোমার মতে খ্রিস্ট কি সেই কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই সৃষ্ট হয়েছেন কেমন যেন তিনি গৌরবের প্রভু বলে সজ্ঞাত হওয়ার চেয়ে বিশ্বের চাকর ও ব্যবস্থাপক হতেন, কেমন যেন তিনি জগৎকে গড়ার ভূমিকায় সৃষ্ট হতেন কিন্তু ভালবাসার পুত্র ও সর্বযুগের রাজা আর হন না? যদিও সুবুদ্ধিজনিত ব্যাখ্যা এ ভক্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিরোধী—কারণ ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট হওয়া একটা জিনিস ও যুগগুলোর আগে সজ্ঞাত হওয়া আলাদা জিনিস—তথাপি এই বচন এমনটা হতে দেয় না, আমরা ঘোষণা করব, খ্রিস্ট প্রভু বিশ্বগঠনের লক্ষ্যে সৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ বচনটা এটা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও নির্মাতা স্বয়ং পিতা ঈশ্বর। এটা অবশ্যই নিশ্চয়তা স্বরূপ, কারণ খ্রিস্ট প্রত্যক্ষভাবেই তাঁরই পাশে উপস্থিত ছিলেন যিনি সবকিছু গড়ছিলেন। কিন্তু যেমন একদিকে গোটা শাস্ত্র বিশ্বস্রষ্টা হিসাবেই প্রভু যিশু খ্রিস্টের কথা

বলার জন্য নিরুপিত ছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রজ্ঞা অভক্তির সমস্ত অজুহাত বাতিল করার জন্য এটা ঘোষণা করেন যে, পিতা ঈশ্বর বিশ্বনির্মাতা হলেও তবু যখন তিনি বিশ্ব নির্মাণ করছিলেন, তখন প্রজ্ঞা অনুপস্থিত ছিলেন না, কারণ যখন ঈশ্বর বিশ্বকে নিরুপণ করছিলেন সেসময়ও প্রজ্ঞা তাঁর পাশে ছিলেন। আরও, যখন পিতা জগৎকে গড়ছিলেন, সেসময় প্রজ্ঞাও তাঁর সঙ্গে জগৎকে অলঙ্কৃত করছিলেন, এবং যখন তিনি সেটার নিরুপণ করছিলেন, সেসময় প্রজ্ঞাও সেটার নিরুপণ করছিলেন। সুতরাং, প্রজ্ঞা আমাদের এটা বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন যে, তিনি ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে সৃষ্ট হননি, কারণ ভাবী বস্তুর প্রস্তুতির ব্যাপারে তিনি অনন্ততা-কাল থেকেই উপস্থিত ছিলেন। আরও, যিনি বিশ্ব গড়ছিলেন, প্রজ্ঞাও যে তাঁর পাশে বিশ্বকে অলঙ্কৃত করছিলেন তা প্রকাশ করে প্রজ্ঞা এটা দেখান যে, শাস্ত্র মিথ্যা বলে না।

৪৪। কিন্তু, হে ভ্রান্তমতপন্থী, কাথলিক ধর্মতত্ত্বের আলোতে তুমিও অবশেষে ‘খ্রিস্ট ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্ট হয়েছেন’ বাক্যটার অর্থ শিখে নাও, এবং তোমার ভক্তিহীন নির্বুদ্ধিতা যে কেমন অবুঝ, তা স্বয়ং প্রজ্ঞার উচ্চারিত বাণী থেকে জেনে নাও। তাঁর প্রথম বাণী এ, যদি তোমাদের এমন কথা বলি যা প্রতিদিনের কথা, তাহলে যা জগতের আদি থেকে, তাও বলতে ভুলে যাব না (ক)। আগে প্রজ্ঞা বলেছিলেন, হে মানুষ, তোমাদের উদ্দেশ্য করে আমি কথা বলছি, মানবসন্তানদের কাছেই আমার বাণী। হে অনভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি লাভে উদ্বুদ্ধ হও; হে নির্বোধ, সুবিবেচক হও (খ); আরও, আমি দ্বারা রাজারা রাজত্ব করে, জনপ্রধানেরা ন্যায়ধর্ম জারি করে; আমি দ্বারা গণপ্রধানেরা মহিমান্বিত হয়, ও শাসনকর্তারা পৃথিবীর অধিকারী হয় (গ); আরও, আমি ধর্মময়তা-মার্গে চলি, ন্যায্যতার পথে এগিয়ে চলি, যারা আমাকে ভালবাসে আমি যেন তাদের মঙ্গলদানে সজ্জিত করি ও তাদের ধনভান্ডার পরিপূর্ণ করি (ঘ)। প্রজ্ঞা নিজের প্রতিদিনের কাজ বিষয়ে নীরব থাকেন না। এবং সর্বপ্রথমে সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে তিনি সরলমনাদের বিচারবুদ্ধি অর্জন করতে ও যারা নির্বোধ তাদের সুবিবেচক হতে উপদেশ দেন যাতে আগ্রহী ও সুবিবেচক পাঠক কথাগুলোর ভিন্ন ও বিশিষ্ট অর্থ বিষয়ে ভাবতে পারে। এর ফলে প্রজ্ঞা এটা বুঝিয়ে দেন যে, যেকোন জ্ঞান, যেকোন গৌরব, যেকোন সাফল্য তাঁর পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত। প্রজ্ঞা এটাও

দেখান, তিনি রাজাদের রাজ্যসকল, ক্ষমতাশালীদের সন্ধিবেচনা, জনপ্রধানদের নাম-করা কর্ম ও পৃথিবীর অধিকারী সেই শাসনকর্তাদের ন্যায্যতা নিজেতে ধারণ করে আছেন। আরও, প্রজ্ঞা দেখান, তিনি শঠতার সঙ্গে মেলামেশা করেন না ও অন্যায় কর্মের অংশী হন না; ও তিনি এসবকিছু করেন যাতে সততা ও ন্যায্যতার যেকোন কর্মে অংশ নিয়ে সেই সকলকে পার্থিব বিষয়ে ও অক্ষয়শীল ধনে পরিপূর্ণ করতে পারেন যারা তাঁকে ভালবাসে। সেজন্য প্রজ্ঞা সর্বপ্রথমে এটা ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন কথা বলবেন যা প্রতিদিনের কথা, পরে প্রতিশ্রুত হন, জগতের আদি থেকে যা কিছু আছে, তাও তিনি ব্যক্ত করায় অবহেলা করবেন না। তবে, যা জগতের আদি থেকে নির্মিত হতে শুরু হয়েছে বলে স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেওয়া, তা যে জগতের আগে নির্মিত হয়েছিল, তেমনটা ভাবা কেমন অবুঝ ব্যবহার! কেননা জগতের আদি থেকে যা কিছু হয়েছে তার মধ্যে যেকোন কর্মই জগতের আদির পরবর্তী কর্ম; কিন্তু, অপরদিকে, যা কিছু জগতের আদির আগে হয়েছে, তা সেই জগৎ-নির্মাণের আগের বস্তু, যে-জগৎ সেগুলোর পরবর্তীকালীন। এইভাবে, জগতের আদি থেকে যা কিছু আছে তা ব্যক্ত করায় অবহেলা করছেন না এমনটা ঘোষণা করে প্রজ্ঞা বলেন, ‘প্রভু আপন পথগুলোর আদির জন্য, আপন কর্মকাণ্ডের জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন’। এখানে আমরা জগতের আদি থেকে নির্মিত বস্তুর একটা দিক-নির্দেশনা পাই: যা কালের পূর্বকালীন বলে ঘোষিত হয়েছিল, সেই প্রজনন নয়, কিন্তু এমন ঐশ্বরিক ব্যবস্থাই প্রকাশিত হয় যা জগতের সঙ্গে শুরু করেছিল।

৪৫। খ্রিস্ট যে ঈশ্বর বলে ‘যুগগুলোর আগে সঞ্জাত’, এবং তিনি যে ‘ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন’, এবিষয়টাও আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। কারণ যেখানে জগতের আদির পূর্বকালীন জন্ম রয়েছে, সেখানে অসীম প্রজননের অসীমতা রয়েছে; কিন্তু যেখানে সেই জন্ম ঈশ্বরের পথগুলোর জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সময়ের আদি থেকে সৃষ্টি বলে উপস্থাপিত, সেখানে সেই জন্ম ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড ও তাঁর পথগুলোকে সৃষ্টি করার কারণ বলে অনুপ্রবিষ্ট। এবং সর্বপ্রথমে, যেহেতু খ্রিস্ট স্বয়ং প্রজ্ঞা, সেজন্য আমাদের দেখতে হবে, তিনি নিজেই হলেন ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের আদি কিনা। কিন্তু আমার মতে এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বাণী এ,

আমিই সেই পথ’ ও ‘পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায় (ক)। একটা পথ হলো গমনকারীদের পথদিশারী, ত্বরান্বিতদের জন্য চিহ্নিত গতিপথ, অজ্ঞদের নিরাপত্তা, ও বলতে গেলে, অজ্ঞাত ও আকাজক্ষিত বিষয়ে শিক্ষাদান। সুতরাং তিনি পথগুলোর আদির জন্য, ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্টি, কারণ তিনি পথ ও তিনি পিতার কাছে চালনা করেন। কিন্তু, এই যে সৃষ্টি যার উৎপত্তি কালের আদি থেকে, সেই সৃষ্টির অর্থ ব্যাখ্যা করা দরকার। কারণ সেটা হলো চরম ব্যবস্থার রহস্য, সেই যে রহস্য দ্বারা খ্রিস্ট দৈহিক আকারে সৃষ্টিও হয়েছেন ও ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের পথ বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আরও, তিনি জগতের আদি থেকে তখনই ঈশ্বরের পথগুলোর জন্য সৃষ্টি হয়েছেন যখন সৃষ্টজীবের দৃশ্যগত রূপ পরিধান করে তিনি সৃষ্টজীবের চেহারা আপন করে নিয়েছেন।

৪৬। সুতরাং এসো, ঈশ্বরের সেই পথ ও ঈশ্বরের সেই কর্মকাণ্ড দেখি যার জন্য প্রজ্ঞা, ঈশ্বর দ্বারা যুগগুলোর আগে সজ্ঞাত হয়েও যুগগুলোর আদি থেকে সৃষ্টি হলেন। আদম এমন একজনের কণ্ঠস্বর শুনলেন যিনি পরমদেশের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন (ক)। তুমি কি এমনটা মনে কর যে, যিনি হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন তিনি সৃষ্টজীবের চেহারা আপন করে না নিলে তাঁর পদক্ষেপ শোনা হলো? অর্থাৎ, যখন শোনা হলো তিনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন তখন তিনি কি কোন না কোন সৃষ্টজীবের রূপের বেশে উপস্থিত ছিলেন না? তিনি যখন কাইন, আবেল ও নোয়ার কাছে কথা বললেন (খ), তখনই যে তিনি কোন্ চেহারা ধারণ করছিলেন আমি তা জিজ্ঞাসা করছি না, এবং তিনি যখন এনোথকে আশীর্বাদ করলেন (গ), তখনই যে তিনি তাঁর কাছে কোন্ রূপের বেশ ধারণ করে হাজির হলেন আমি তাও জিজ্ঞাসা করছি না। এক স্বর্গদূত আগারের কাছে কথা বলেন (ঘ), ও সেই দূত যে স্বয়ং ঈশ্বর এতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তিনি দূতের বেশে দেখা দেন, তখন তিনি কি সেই একই রূপের অধিকারী যে রূপের তিনি সেই স্বরূপেই অধিকারী যার গুণে তিনি ঈশ্বর? অবশ্যই, দূতের রূপ সেখানে প্রকাশিত যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপের কথা উল্লিখিত। কিন্তু এক দূতের কথা বলার অর্থ কি? আব্রাহামের কাছে তিনি মানুষের বেশে আসেন (ঙ)। এমনটা কি হতে পারে যে, মানুষের রূপের বেশে, এই সৃষ্টজীবের বিশিষ্ট চেহারা, সেই খ্রিস্ট সেই একই স্বরূপেই উপস্থিত নন, ঈশ্বর বলে তিনি যার অধিকারী?

এমনকি, তিনি মানুষ হিসাবে কথা বলেন, দেহে উপস্থিত, খাদ্য দ্বারা পুষ্ট : কিন্তু এসমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাঁকে ঈশ্বর বলে আরাধনা করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যিনি দূত ছিলেন, তিনি এখন মানুষও, পাছে আমরা এমনটা ধরে নিতাম যে, তিনি যে নানা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ধারণ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে একটা তাঁর প্রকৃত ঈশ্বরিক রূপ ছিল। আরও, তিনি যাকোবের কাছে মানবীয় রূপে আসেন, এমনকি লড়াইতে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরেন, নিজের হাতে ধরেন, নিজের অঙ্গগুলো দিয়ে বল প্রয়োগ করেন, পাশ বাঁকান ও সেই সমস্ত চলনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করেন যা আমরা করি। কিন্তু পরে তিনি মোশির কাছে দেখা দেন, এবার আগুনের মতই দেখা দেন (৮), যাতে তুমি এটা বিশ্বাস করতে শেখ যে, সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সেই স্বরূপ তাঁর আপন স্বরূপের সত্তা ব্যক্ত করার জন্য নয়, কিন্তু তাঁকে বাহ্যিক চেহারার অধিকারী করার জন্যই অভিপ্রেত। সেসময় তিনি নিজের মধ্যে জ্বলবার অধিকারের অধিকারী ছিলেন, জ্বালাবার সেই অধিকারের অধিকারী ছিলেন না যা আগুনের স্বরূপের স্বকীয় অধিকার। বাস্তবিকই ঝোপে আগুন জ্বলছিল কিন্তু ঝোপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

৪৭। কালের সমস্ত গতির দিকে দৃষ্টিপাত কর, ও দেখ কোন্ বশে তিনি দেখা দিলেন নূনের ছেলে সেই যিশুর কাছে যিনি তাঁর [তথা প্রভু যিশুর] নাম বহনকারী এক নবী ছিলেন (ক); বা সেই ইশাইয়ার কাছে যিনি বলেন তিনি তাঁকে দেখেছিলেন ও যা বিষয়ে সুসমাচারও সাক্ষ্য দেয় (খ); বা সেই এজেকিয়েলের কাছে যিনি পুনরুত্থান-জ্ঞানও পাবার অধিকার পেলেন (গ); বা সেই দানিয়েলের কাছে যিনি যুগগুলোর অনন্তকালীন রাজ্যে উপস্থিত মানবপুত্রকে স্বীকার করেন (ঘ); ও সেই অন্যান্যদের কাছে যাঁদের কাছে তিনি ‘ঈশ্বরের পথগুলোর জন্য ও ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের জন্য’ সৃষ্ট নানা সৃষ্টবস্তুর বশে দেখা দিলেন, অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান শেখাবার জন্য ও আমাদের অনন্তকালীন অবস্থার খাতিরে তিনি দেখা দিলেন। তবে, মানব পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা কেনই বা আপাতত তাঁর অনন্তকালীন জন্মের বিরুদ্ধে এত ভক্তিহীন আক্রমণ জাগায়? হে ভ্রান্তমতপন্থী, যা বিষয়ে তুমি কথা বল, সেই সৃষ্টি তো কালের আদিরই ব্যাপার, কিন্তু খ্রিষ্টের জন্ম অসীম ও কালের পূর্বকালীন ব্যাপার। যখন এক নবী, বা প্রভু বা প্রেরিতদূত, বা [শাস্ত্রের] কোন না কোন বচন ‘সৃষ্টি’ শব্দ দ্বারা তাঁর অনন্তকালীন

ঈশ্বরত্বের জন্ম নির্দেশ করেছে, তখন আমরা যে ঐশবাণীকে বলপ্রয়োগে ব্যবহার করি, তা তুমি তোমার খুশিতেই সমর্থন করে চল। আমরা যত বচন উল্লেখ করে এসেছি, সর্বগ্রাসী আগুন সেই ঈশ্বর সেই অর্থেই সৃষ্টবস্তু বলে উপস্থিত যে, সেই যে অর্থে তিনি যে অধিকার গুণে সৃষ্ট রূপ ধারণ করেছেন সেই একই অধিকার গুণে তা ত্যাগ করতে পারেন। কেননা কেবল দৃষ্ট হবার লক্ষ্যেই যা কিছু অস্তিত্বশীল হয়েছিল, তিনি পরে তা বাতিল করতে পারেন।

৪৮। আরও, প্রেরিতদূত কুমারীতে গর্ভস্থ মাংসের সেই সুখময় ও সত্যকার জন্মকে ‘সৃষ্টি’ ও ‘নির্মাণ’ বলে অভিহিত করেছেন, কারণ সেসময় [খ্রিষ্টে] সৃষ্টজীবের স্বরূপ ও রূপ সেইভাবে জন্ম নিচ্ছিল যেভাবে আমরা সেটার অধিকারী। প্রেরিতদূতের মতে এটা সন্দেহের বাইরে যে, এই ‘সৃষ্টজীব’ সংজ্ঞা মানুষ হিসাবে খ্রিষ্টের সত্যকার জন্মকে মানায়, কারণ তিনি লেখেন, কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে নির্মিত হলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি **(ক)**। তাই, যিনি মানুষের মত নির্মিত ও মানব দ্বারা উৎপন্ন, তিনি হলেন তাঁর পুত্র; এবং তিনি যে নির্মিত হলেন তা শুধু নয়, তিনি সৃষ্টও হলেন, কারণ বলা হয়েছে, সেই সত্য অনুসারে যা যিহুতে নিহিত: সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত কর, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান কর, যে মানুষ ঈশ্বর অনুসারে সৃষ্ট **(খ)**। অতএব, সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে যে মানুষ ঈশ্বর অনুসারে সৃষ্ট। যিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র তিনি মানবপুত্র বলেও সঞ্জাত হয়েছিলেন। কেননা এটা ঈশ্বরত্বের জন্ম ছিল না, কিন্তু ছিল মাংসের সৃষ্টি। ঈশ্বরের অনুরূপে সৃষ্ট সেই নতুন মানুষ যিনি সর্বযুগের আগে সঞ্জাত, তিনি নিজের জাতের নাম [তথা মানুষ] নিলেন। এবং সেই নতুন মানুষ কেন ঈশ্বরের অনুরূপে সৃষ্ট হলেন, তা প্রেরিতদূত দ্বারা তখনই ব্যাখ্যা করা হয় যখন উপরে উল্লিখিত বাণীর পরে তিনি বলে চলেন, ‘যে মানুষ ধর্মময়তা, পুণ্যতা ও সত্যে সৃষ্ট’। তাঁর মধ্যে ছলনা ছিল না, এবং আমাদের খাতিরে তাঁকে ধর্মময়তা ও

পুণ্যতা করা হলো ও তিনি স্বয়ং সত্য। ঈশ্বরের অনুরূপে নতুন মানুষ বলে সৃষ্ট এই খ্রিস্টকেই আমরা পরিধান করি। [তাছাড়া তিনি এজন্যই ঈশ্বরের অনুরূপে সৃষ্ট, কারণ পাপছাড়া মানুষ বলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা, পুণ্যতা ও সত্য অনুযায়ী সৃষ্ট হলেন।] (গ)

৪৯। প্রজ্ঞা বলেন, যা কিছু জগতের আদি থেকে নির্মিত হয়েছে সেবিষয় তাঁর স্মরণ আছে, ও এটাও ঘোষণা করেন যে তিনি ‘ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের জন্য ও ঈশ্বরের পথগুলোর জন্য সৃষ্ট হয়েছেন’। তথাপি, যখন প্রজ্ঞা বলেন, তিনি সৃষ্ট হয়েছেন, তখন এটাই প্রকাশ করেন যে, ‘তিনি যুগগুলোর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন’, পাছে এমনটা ধরে নেওয়া হয় যে তত নানাবিধ ভাবে ও প্রায়ই নেওয়া সেই ইন্দ্রিয়গোচর রূপের রহস্য তাঁর স্বরূপে কোন না কোন পরিবর্তন এনেছে: যে দৃঢ়তায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁর পরিবর্তন ঘটাবার ব্যাপারে কোন বিহ্বলতা মানত না। আরও, অন্যদিকে, তিনি যে [যুগগুলোর আগে] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, পাছে একথা জন্মের চেয়ে আলাদা কিছুই ধরে নেয়, সেজন্য প্রজ্ঞা ঘোষণা করলেন, তিনি ‘সমস্ত কিছুর আগে জনিত হয়েছিলেন’। ব্যাপারটা এমনটা হলে, তবে কেনই বা এখন ‘সৃষ্টি’ শব্দটা জন্মকে লক্ষ করে যখন একথা সত্য যে, যে প্রজ্ঞা ‘সমস্ত কিছুর আগে জনিত হয়েছিলেন’, তিনি ‘সর্বযুগের আগেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন’? যে প্রজ্ঞা সর্বযুগের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরের পথগুলোর আদির জন্য ও তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্যও সৃষ্ট হয়েছিলেন যাতে আমরা সেই পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি যা যুগগুলোর আদি থেকে শুরু করা সৃষ্টির মধ্যে ও যুগগুলো ও সমস্ত কিছুর পূর্ববর্তী জন্মের মধ্যে রয়েছে। অন্তত ভ্রান্তমতের আর কোন অজুহাত নেই যা দ্বারা নিজের অভক্তির কারণ হিসাবে নিজের ভ্রান্তি উপস্থাপন করতে পারে।

৫০। উপলব্ধি-শক্তির দুর্বলতা তেমন ধর্মীয় ধারণা অনুধাবন করা প্রতিরোধ করতে পারে, এর ফলে এই ব্যাখ্যার পরেও ‘সৃষ্টি’ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হতে পারে। তাসত্ত্বেও, যখন প্রেরিতদূত প্রকৃত জন্ম ক্ষেত্রে ‘নির্মাণ’ শব্দটা ব্যবহার করেন, তখন তাঁর বচনের আক্ষরিক অর্থও এমনটা বোঝাতে পারত যে, কোন না কোন প্রকারে (কিন্তু ভক্তিহীন ভাবে নয়) সৃষ্টি শব্দটারও প্রজননে-বিশ্বাসে আনবার কথা ছিল। যখন আমরা

প্রেরিতদূতকে একমাত্র জনক থেকে একমাত্র জনিতজনের জন্ম ঘোষণা করতে, অর্থাৎ মানব আবেগজনিত গর্ভধারণ ছাড়া কুমারী থেকে প্রভুর জন্ম ঘোষণা করতে ব্যস্ত দেখি, তখন এটা স্পষ্ট যে, যাঁর বিষয়ে প্রেরিতদূত এমনটা জানতেন, এমনকি প্রায়ই বলেছিলেন যে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূত তাঁকেই ‘নারী দ্বারা নির্মিত’ বলায় তাঁর অবশ্যই সুনির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য আছে: অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করেন সেই ‘জন্ম’ শব্দটা বাস্তব প্রজননকে লক্ষ্য করবে ও ‘নির্মাণ’ শব্দটা একমাত্র জনক থেকে একমাত্র জনিতজনের জন্ম সপ্রমাণ করবে। কেননা ‘নির্মাণ’ শব্দটা মানব সংসর্গের মাধ্যমে গর্ভধারণ-ধারণা বাতিল করে, কারণ এটা জানা কথা যে, খ্রিষ্ট সেই কুমারী দ্বারা নির্মিত হয়েছিলেন ও এটাও নিশ্চিত যে তিনি জন্ম নিলেন। হে ভ্রান্তমতপন্থী, দেখ তুমি কেমন ভক্তিহীন। কোন নবীর বচন হোক বা কোন সুসমাচার-রচয়িতার বচন হোক বা যেকোন প্রেরিতদূতের বচন হোক, কোন বচন এমনটা বলেনি যে যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বর দ্বারা জনিত না হয়ে বরং সৃষ্টই হলেন; কিন্তু তুমি জন্মটা অস্বীকার কর ও সৃষ্টি সমর্থন কর, কিন্তু প্রেরিতদূতের সেই অর্থ অনুসারে নয় যখন তিনি এই উদ্দেশ্যেই বলেন তিনি নির্মিত হলেন যেন এমনটা না ধরে নেওয়া হয় যে তিনি একমাত্র জনক থেকে একমাত্র সঞ্জাত হননি। তোমার ঘোষণা একেবারে ভক্তিহীন, কারণ তোমার সেই ঘোষণা এমনটা ধরে নেয় যে ঈশ্বর নিজের সত্তাকে স্বরূপদানকারী জন্ম দ্বারা নেন না, বরং এটা সমর্থন করে যে, তিনি এমন সৃষ্টজীব যা শূন্য থেকে অস্তিত্বে এসেছে। তোমার দুর্ভাগা মন মারাত্মক একটা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত: তুমি যে সঞ্জাত একজনকে সৃষ্টজীব বল তা নয়, কিন্তু তুমি যে বিশ্বাসের উপরে জন্ম-ধারণা নয় বরং সৃষ্টি-ধারণা চাপাচ্ছ, এটাই তোমার সেই রোগ। তথাপি, যদিও এব্যাপার দুর্বল উপলব্ধি-শক্তির পরিচয় প্রকাশ করে, তবু তা এখনও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিহীন মানুষকে নির্দেশ করে না, অর্থাৎ, খ্রিষ্ট বিষয়ে তুমি যদি তাঁকে সৃষ্ট বলে থাক যাতে মানুষ ঈশ্বর থেকে তাঁর আবেগবিহীন জন্মকে একমাত্র জনক থেকে একমাত্র জনিতজনের জন্ম বলে স্বীকার করতে পারে, তাহলে তুমি এখনও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিহীন নও।

৫১। কিন্তু, প্রেরিতিক শিক্ষার উপরে স্থাপিত দৃঢ় বিশ্বাস এসমস্ত ধারণার একটাও মানে না। খ্রিষ্ট যে কেমন ঐশ্বরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছেন ও যুগগুলোর কেমন

অনন্ততায় সঞ্জাত হলেন, সেই বিশ্বাস এসমস্ত জানে। আরও, তিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে জন্ম নিলেন, ও তাঁর সত্যকার জন্মের ও তাঁর সিদ্ধ প্রজননের ঈশ্বরত্ব সন্দেহের অতীত। ঈশ্বর ক্ষেত্রে আমাদের দু'টো বিষয় স্বীকার না করে পারি না : তাঁর জন্ম ও তাঁর অনন্ততা। অন্যদিকে, তিনি কোন একটা কিছু পেরে জন্ম নেননি কিন্তু সমস্ত কিছু আগে জন্ম নিলেন, ও সেই জন্ম সত্তার কেবল এক প্রণেতাকে ঘোষণা করে এবং জনিতজন ও সত্তার প্রণেতার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নির্দেশ করে না। আরও, এটা সকলের স্বীকৃতি যে, যেহেতু সেই জন্ম ঈশ্বর থেকে হয়, সেজন্য জন্মটা সত্তার প্রণেতার সম্পর্কের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পদের অবস্থা দাবি করে, কিন্তু সেই প্রণেতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কারণ মানব-ধারণার পক্ষে জন্ম-ঘটনার অতীতে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার পক্ষে অবশ্যই প্রজনন-রহস্যেও প্রবেশ করার দরকার আছে। সুতরাং, ঈশ্বর বিষয়ে একমাত্র ভক্তিময় ভাষা হলো তাঁকে পিতা বলে চিনে নেওয়া : ও তাঁর সঙ্গে, তাঁর থেকে আগত যিনি তাঁকে তথা সেই পুত্রকে চিনে নেওয়া। অবশ্যই, ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা অন্য কিছু জানি না একথা ছাড়া যে, তিনি হলেন একমাত্র জনিত ঈশ্বরের ও স্রষ্টার পিতা। এর ফলে, মানব দুর্বলতা নিজের সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা না করুক ও যে একমাত্র স্বীকারোক্তিতে তার পরিত্রাণ বিরাজিত সেই স্বীকারোক্তি মেনে নিক : মাংসধারণ-রহস্যের আগে সেই মানব দুর্বলতা প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ক্ষেত্রে এই অপরিবর্তনীয় নিশ্চয়তার অধিকারী যে, তিনি জন্ম নিলেন।

৫২। তাই, হে পবিত্র পিতা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যতদিন আমি তোমার মঞ্জুর করা মানবাত্মাকে ভোগ করব ততদিন তোমাকে অনন্তকালীন ঈশ্বর ও অনন্তকালীন পিতা বলে স্বীকার করব। আমি এমন মূর্খতা ও অভক্তিতে পতিত হব না যার ফলে নিজেকে তোমার সর্বশক্তিমত্তা ও তোমার সমস্ত রহস্যের বিচারক হয়ে উঠে আমার এই দুর্বল উপলব্ধি-শক্তিকে তোমার অসীমতা-ধারণার অতীতে ও আমার কাছে প্রকাশিত তোমার অনন্ততা-বিশ্বাসের অতীতে প্রসারিত করব। তুমি যে একসময় প্রজ্ঞা, পরাক্রম, ও তোমার বাণী একমাত্র জনিত আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট বিহীন ছিলে তা আমি ঘোষণা করব না। আমাদের স্বরূপের অনিশ্চিত ও অসিদ্ধ ভাষা তোমার বিষয় সম্পর্কিত আমার চিন্তাসকল এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না যার ফলে ভাষার দীনতা আমার বিশ্বাসকে শ্বাসরুদ্ধ করবে। মানুষ এই

আমরা যদিও এমন এক বাণী ও প্রজ্ঞা ও পরাক্রমের অধিকারী যা আমাদের স্বাধীন আত্মিক গতির ফলাফল, তবু যিনি তোমার বাণী, তোমার প্রজ্ঞা ও তোমার পরাক্রম, তুমিই সেই সিদ্ধ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রজননের অধিকারী ; ও সেইজন্য, তোমার অনন্তকালীন বৈশিষ্ট্যের এ নামসমূহ গুণে [তথা বাণী, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম নাম গুণে] যিনি নিজেকে তোমা থেকে সঞ্জাত বলে প্রকাশ করেন, তাঁকে তোমা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কিন্তু তিনি এমনভাবে নিজেকে সঞ্জাত বলে প্রকাশ করেন যাতে নিজের সত্তার প্রণেতা হিসাবে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখাবেন না। আরও, তিনি এমনভাবে সঞ্জাত যার ফলে নিজের অসীমতা হারাবেন না, কারণ আমরা তো ভালই জানি, তিনি অনন্তকালীন যুগগুলোর আগে সঞ্জাত হয়েছেন।

৫৩। মানবীয় বিষয়াদি ক্ষেত্রে তুমি তো সেধরনের অনেক কিছু উপস্থাপন করে থাক যা সেগুলোর কারণ না জানলেও তবু সেগুলোর ফলাফল জ্ঞাত। এবং যখন অজ্ঞতা আমাদের স্বরূপের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য, তখন বিশ্বাস সমুচিত। এর ফলে, যখন আমি আমার দৃষ্টিশক্তির এই ক্ষীণ চোখ তোমার স্বর্গের দিকে উত্তোলন করি, তখন, সেই স্বর্গ যে তোমার, তা ছাড়া আমার অন্য নিশ্চয়তা নেই। যখন আকাশে জ্যোতিষ্করাজির কক্ষপথ ও সেগুলোর বার্ষিক আবর্তন, এবং সেই কৃত্তিকা, সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল ও প্রভাতী তারাকে লক্ষ করি যেগুলোর উপরে নিজ নিজ স্থিরীকৃত কর্তব্য অনুযায়ী বিশিষ্ট ভূমিকা আরোপিত, তখন, হে ঈশ্বর, এই যে সমস্ত কিছুর অর্থ বুঝি না, সেই সমস্ত কিছুতে তোমার উপস্থিতি চিনে নিই। এবং যখন তোমার সাগরের বিস্ময়কর তরঙ্গমালা লক্ষ করি, তখন আমি যে জলের উৎপত্তি জানতে পারি না তা শুধু নয়, কিন্তু তেমন স্থিরীকৃত আবর্তনের চলাচলও বুঝতে পারি না ; তাসত্ত্বেও, আমার পক্ষে অভেদ্য এমন বিষয়ও বিশ্বাস করার যৌক্তিকতা মেনে নিই, এবং আমার কাছে অজ্ঞাত এসমস্ত কিছুতেও তোমাকে চিনে নিই। আরও, যখন আমি সেই পৃথিবীর দিকে মন ফেরাই যা গুপ্ত ক্ষমতার গুণে গৃহীত যত বীজ বিযুক্ত করে ও সেগুলোকে বিযুক্ত করার পর সঞ্জীবিত করে, ও সেগুলোকে সঞ্জীবিত করার পর সেগুলোর বৃদ্ধি ঘটায়, ও সেগুলোর বৃদ্ধি ঘটাবার পর সেগুলোকে তেজময় করে তোলে, তখন এসমস্ত কিছুতে এমন কিছুই পাই না যা আমার উপলব্ধি-শক্তি ধারণ করতে পারে। কিন্তু এই অজ্ঞতা তোমাকে উপলব্ধি করার জন্য

উপযোগী, কারণ আমার সেবায় রত যে স্বরূপ, আমি তা বুঝতে অক্ষম হলেও তবু তা থেকে আমার কাছে আগত উপকারের অভিজ্ঞতার ফলে আমি তোমাকে উপলব্ধি করি। আমি নিজেকেও জানি না, তথাপি এবিষয়ে এটা অনুভব করি যে : নিজের বিষয়ে অজ্ঞ বলেই আমি তোমার বিষয়ে আরও বেশি বিস্মিত হতে পারি। কেননা ধ্যানধারণা অনুশীলন ক্ষেত্রে আমার মনের গতি ও যৌক্তিকতা ও জীবন না বুঝলেও আমি এসমস্ত কিছু অনুভব করি ; ও অনুভব করতে করতে নিজেকে তোমার প্রতি আবদ্ধ অনুভব করি, কারণ আমি মানব স্বরূপের আদি নিজের কাছে বোঝাতে অক্ষম হলেও তবু তুমি এমনটা হতে দাও, আমি প্রকৃতিকে ও সেটার কমণীয়তাকে অনুভব করার আনন্দ ভোগ করব। এবং অজ্ঞ এই আমি যখন আমার মধ্যে যা কিছু ঘটে তা দ্বারা তোমাকে উপলব্ধি করি, তখন তোমাকে উপলব্ধি করি বলে তোমার সংক্রান্ত সবকিছুতে তোমাকে ভক্তি করি। আমি যে অজ্ঞ, এজন্য যে তোমার সর্বশক্তিমত্তায় আমার বিশ্বাস লঘু করব এমনটা হতে দেব না ; এর ফলে আমার উপলব্ধি-শক্তি তোমার একমাত্র জনিতজনের উৎপত্তি আঁকড়ে ধরতে ও তা নিজের বশীভূত করতে চেষ্টা করবে না ; আমিও এ সত্য অতিক্রম করতে আকাঙ্ক্ষা করব না যে, তিনি আমার সৃষ্টিকর্তা ও আমার ঈশ্বর।

৫৪। তাঁর জন্ম অনন্তকালীন যুগগুলোর পূর্বকালীন। অনন্ততার পূর্ববর্তী এমন কিছু যদি থাকে, তাহলে তা এমন কিছু হবে যা অনন্ততা-ধারণার অতীত। এবং এ কিছুটা তোমারই ও তোমার একমাত্র জনিতজনেরও অধিকার। তিনি যে একটা অংশ বা একটা সম্প্রসারণ তা নয় ; তিনি তোমার কার্যক্ষমতা বোঝাবার জন্য একটা অসার নামও নন ; তিনি বরং পুত্র, এমন পুত্র যিনি সত্যকার পিতা ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত প্রকৃত ঈশ্বর ও তোমার স্বরূপের ঐক্যে তোমা দ্বারা জনিত। তিনি তোমার পরে ও সেইসঙ্গে তোমার সঙ্গে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য, কারণ তুমিই তাঁর অনন্তকালীন উৎপত্তির অনন্তকালীন প্রণেতা। কেননা তোমা থেকে হওয়ায় তিনি তোমার দ্বিতীয়জন, কিন্তু তিনি তোমারই হওয়ায় তোমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তুমি যে এককালে তোমার পুত্র ছাড়া ছিলে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় পাছে তুমি প্রজনন ছাড়া অসিদ্ধ বলে বা প্রজননের পরে অনাবশ্যক বলে গণিত হও। এর ফলে সেই অনন্তকালীন জন্মের প্রকৃত ফলাফল

এ: আমরা যেন এটা জানতে পারি যে তুমি হলে একমাত্র জনিত সেই পুত্রেরই অনন্তকালীন পিতা যিনি তোমা থেকে অনন্তকালীন যুগগুলোর পূর্বে সঞ্জাত।

৫৫। এবং, আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর তোমার সেই একমাত্র জনিত যিশু খ্রিষ্ট যে সৃষ্টজীব নন, আমার বিশ্বাসের ও আমার কণ্ঠের সেবা দ্বারা তা সমর্থন করাই আমার সামান্য অবদান। আমি এটাও মেনে নেব না যে ‘সৃষ্টজীব’ নামটা সেই পবিত্র আত্মাকে আরোপিত হবে যিনি তোমা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন ও পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রেরিত। তোমার সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা মহৎ। আমি জানি, তুমিই সেই যাঁর জন্ম হওয়া সম্ভব নয়; এটাও জানি, সেই একমাত্র জনিতজন তোমা থেকে সঞ্জাত; কিন্তু পবিত্র আত্মা যে জনিত তা আমি বলব না, তিনি যে সৃষ্ট তাও আমি কখনও বলব না (ক)। ‘সৃষ্টজীব’ শব্দ ব্যবহার দ্বারা তোমার বিষয়ে যে অপমান অনুপ্রবিষ্ট হবে তাই আমি ভয় করি, কেননা সেই ‘সৃষ্টজীব’ নাম আমার সঙ্গে ও তোমা দ্বারা শূন্য থেকে সৃষ্ট অন্যান্য বস্তুগুলোর সঙ্গে তাঁকে এক করে তোলে। প্রেরিতদূত অনুসারে, পবিত্র আত্মা তোমার গভীরতা জানেন ও তলিয়ে দেখেন ও তোমার নিকটে আমার সহায়ক বলে আমার পক্ষে অনির্বচনীয় কথা তোমাকে বলেন; এবং আমি যে তাঁকে সৃষ্টজীব নামে নির্দিষ্ট করব না তা শুধু নয়, কিন্তু তোমার একমাত্র জনিতজনের মধ্য দিয়ে তোমা থেকে উদ্ভূত তাঁর সেই অনন্তকালীন স্বরূপের পরাক্রমকেও অপমান করব না। যা তোমারই, তা ছাড়া অন্য কিছুই তোমাকে প্রভেদ করতে পারে না, তোমার অসীম মহিমার গভীরতাও তোমা থেকে ভিন্ন ও পরকীয় পরাক্রম দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। যা তোমাকে প্রভেদ করে সেই সবই তোমার, এবং যা তোমাতে রয়েছে ও তোমাতে তলিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখে, তা তোমার পরকীয় নয়।

৫৬। আরও, আমার পক্ষে যাঁর উচ্চারিত কথা অনির্বচনীয়, তিনিই আমার পক্ষে অনির্বচনীয়। কেননা, যেমন ঐশ্বর্যপ্রকাশে তোমার একমাত্র জনিতজন অনন্ততার আগে তোমা থেকে সঞ্জাত, যখন আমরা ভাষার সমস্ত দ্ব্যর্থতা ও ব্যাখ্যার সমস্ত সমস্যা বাদ দিই তখন এই সত্যই মাত্র থেকে যায় যে তিনি সঞ্জাত, তেমনি, যদিও আমি এটার অর্থ শেষ পর্যন্ত বুঝি না, তবু আমার চেতনা দ্বারা আমি এতে নিশ্চিত যে, তোমার পবিত্র

আত্মা পুত্রের মধ্যে দিয়ে তোমা থেকে উদ্ভূত। তোমার সংক্রান্ত আত্মিক ব্যাপারে আমি তো অবুঝ। কেননা তোমার সেই একমাত্র জনিতজন আমাকে বলেন, আমি যে তোমাকে বললাম, তোমাদের পুনরায় জন্ম নিতে হবে, তাতে তুমি আশ্চর্য হয়ো না। বাতাস যদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়; তুমি তার শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যায়, তা তুমি জান না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে সঞ্জাত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই (ক)। আমার যে পুনরায় জন্ম হবে আমি তা বিশ্বাস করি, কিন্তু তা বুঝতে পারি না, ও যা বুঝি না তা সত্য বলে মানি। আমি যে পুনরায় জন্ম নিই সেসম্পর্কে সচেতন না হয়েই আমার পুনরায় জন্ম হয়, কেননা সেই জন্ম তার নিজের ফলাফলে স্পষ্ট। আরও, আত্মা তো সীমাহীন ও তাঁর যখন ইচ্ছেই, যা ইচ্ছেই ও যেখানে ইচ্ছেই কথা বলেন। আমার চেতনা যদিও আমাকে নিশ্চিত করে যে তিনি উপস্থিত, তবু যে কারণে তিনি এগিয়ে আসেন বা দূরে যান সেই কারণ আমি জানি না; তাসত্ত্বেও আমি কি তাঁর স্বরূপ সৃষ্টবস্তুর মধ্যে রাখব ও তাঁর উৎপত্তির কাল নির্ধারণ করায় তাঁকে সীমাবদ্ধ করব? তোমার সেই যোহন স্পষ্টই বলেন যে সবই সেই পুত্রের দ্বারা হল যিনি আদিতে ঈশ্বর বলে, অর্থাৎ বাণী বলে, ঈশ্বর সেই তোমারই সঙ্গে ছিলেন (খ)। আরও, পল স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁর মধ্যে সৃষ্ট বলেই দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু উল্লেখ করেন (গ)। এবং একথা ব'লে যে সমস্ত কিছু খ্রিষ্টে ও খ্রিষ্টের দ্বারা সৃষ্ট হল, তবু পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে সেই নির্দেশনাই যথেষ্ট মনে করলেন যা অনুসারে তিনি তাঁকে 'তোমার আত্মা' বললেন। তুমি নিজে যাঁদের স্পষ্টভাবে বেছে নিয়েছ, আমি এক্ষেত্রে সেই মানুষদের সঙ্গে একমত হব। এবং তোমার একমাত্র জনিতজন ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ক্রমে আমি যেমন 'তিনি সঞ্জাত' একথা ছাড়া আমার উপলব্ধি-শক্তির অতীত অন্য কিছু বলব না, তেমনি পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ক্রমে, 'তিনি তোমার আত্মা' একথা ছাড়া মানবীয় উপলব্ধি-শক্তির অতীত অন্য কিছু বলব না। আমার ভাগ্য না হোক অনর্থক কথার সংগ্রাম, বরং হোক সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসের নিষ্ঠাবান সাক্ষ্যদান।

৫৭। তোমাকে অনুনয় করি, ধর্মসম্মত আমার এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রক্ষা কর, ও আমার আত্মার প্রস্থান পর্যন্ত আমার বিবেকের এই কণ্ঠ আমাকে শুনতে দাও, যাতে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়ার সময়ে আমি আমার নবজন্মের বিশ্বাস-সূত্রে যা ঘোষণা

করেছি, তার প্রতি যেন সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকি : অর্থাৎ আমি যেন তোমাকে, হে আমাদের পিতা, ও তোমার সঙ্গে তোমার পুত্রকেও আরাধনা করি; এবং যিনি তোমার একমাত্র জনিতজনের মধ্য দিয়ে তোমা থেকে উদ্ভূত, আমি যেন সেই পবিত্র আত্মাকে পাবার যোগ্য হয়ে উঠি। কেননা আমার বিশ্বাস বিষয়ে আমার এমন যথার্থ সাক্ষী আছেন যিনি বলেন: পিতা, যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার (ক) তিনি হলেন আমার প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি তোমাতে অবস্থান করেন, তোমা থেকে উদ্ভূত, ও তোমার সঙ্গে চিরকাল ধরে ঈশ্বর: তিনি যুগযুগ ধরে ধন্য। আমেন।

১ (ক) প্রবচন ৮:২২ দ্রঃ: ‘প্রভু আপন পথগুলোর আদি বলে আমাকে সৃষ্টি করেছেন’: এ বচন ভিত্তি ক’রে আরিউসপস্থীরা যত সমস্যা সৃষ্টি করত, ঠিক এ বচন দ্বারাই সাধু হিলারিউস সেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করেন; অর্থাৎ তিনি, পুত্রের অনন্তকালীন জন্মের গুণে তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পিতার সঙ্গে তাঁর সমসত্তা পুনরায় প্রমাণিত করেন; এবং বচনের অর্থ মানব-খ্রিষ্টে আরোপ করেন। পুস্তকটা পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ নিয়ে শেষ হয়: এবিষয়ে সাধু হিলারিউস বলেন, পবিত্র আত্মা পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন। কিন্তু এসম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় হলো এটা যে, নিকেরা মহাসভার জারীকৃত বিশ্বাস-সূত্র পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শুধু এটা বলে যে, আমরা ‘পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি’। কেবল ৩৮১ সালেই কনস্টান্টিনোপলিস মহাসভা নিকেরার বিশ্বাস-সূত্রের পবিত্র আত্মা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সূত্রটা সংবর্ধিত করে ঘোষণা করে, পবিত্র আত্মা ‘পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’; এ সূত্র এমন যা যোহন ১৫:২৬ থেকে উদ্ধৃত।

৩ (ক) প্রবচন ২২:৮।

(খ) রো ১:২৫।

(গ) রো ১:২৫।

৪ (ক) আদি ১৪:১৯ লাতিন পাঠ্য।

(খ) হো ১৩:৪ লাতিন পাঠ্য।

(গ) ১ পি ৪:১৯।

৫ (ক) রো ৮:১৯-২১।

৬ (ক) খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব সৃষ্ট হয়েও তবু তা ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয় না; প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের স্বরূপে নয় কিন্তু বাণীরই ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বে একটা সৃষ্টজীব উপস্থিত।

এতে আমরা দেখতে পাই, সাধু হিলারিউসের সময়েও ঐশাত্ত্বিক ভাষা অস্থির ও অমিমাংসিত ছিল।

(খ) ফিলি ২:৬ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

৭ (ক) যোহন ৫:২৩।

৮ (ক) সাম ১১০:৫ লাতিন পাঠ্য।

৯ (ক) হো ১২:৪ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাম ৩৪:১৬।

(গ) প্রেরিত ১৩:২২।

(ঘ) বিশেষজ্ঞদের মতে এসমস্ত বাক্য অপ্রামাণিক বলে গণ্য হতে পারে।

১১ (ক) ১ যোহন ৫:১ লাতিন পাঠ্য।

১২ (ক) যোহন ১:৩।

(খ) সাম ১০২:২৬।

(গ) সাম ১৩৮:৮।

১৩ (ক) এফে ২:৩ দ্রঃ।

(খ) ১ পি ২:৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) ইশা ১:২ লাতিন পাঠ্য।

১৪ (ক) যাত্রা ৪:২২।

(খ) মথি ১৭:৫।

(গ) সাম ২২:৩২ লাতিন পাঠ্য।

২০ (ক) কল ২:৮-৯।

(খ) ২ করি ১০:৪-৫।

২৪ (ক) সাধু হিলারিউসের মতে, ঈশ্বর-জ্ঞান পাবার প্রকৃত উৎস হলো মোশি এবং সুসমাচারগুলো, অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নিয়ম; বিশেষভাবে পঞ্চপুস্তক ও সুসমাচারগুলো।

(খ) যোহন ১:১, ১, ৯, ১৮।

(গ) রো ৯:৫।

২৫ (ক) ‘তিনি ‘ছিলেন’ ও তিনি ‘আছেন’, অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্ত।

২৬ (ক) তীত ১:২; ২ তি ১:৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ। পুত্র ‘অনন্তকালীন সর্বযুগের আগেই জন্ম নিলেন’, অর্থাৎ তিনি অনাদিকালেরও পূর্বে বিদ্যমান।

২৭ (ক) তীত ১:২ লাতিন পাঠ্য।

৩১ (ক) ‘এই ঘটনা’: অর্থাৎ, পুত্র ‘অনন্তকালীন সর্বযুগের আগেই জন্ম নিলেন’।

৩৪ (ক) তীত ১:২ লাতিন পাঠ্য।

(খ) আদি ১:১৪ লাতিন পাঠ্য।

(গ) সাম ৭২:৫ লাতিন পাঠ্য।

(ঘ) সাম ৭২:৫ লাতিন পাঠ্য।

৩৫ (ক) প্রবচন ৮:২২ লাতিন পাঠ্য।

৩৭ (ক) প্রবচন ৮:২৫ লাতিন পাঠ্য।

(খ) সাধু হিলারিউসের ও সেকালের অন্যান্য পিতৃগণের মতে, স্বর্গদূতেরা পৃথিবীর সৃষ্টিকালের পূর্বেই সৃষ্ট হয়েছিলেন।

৩৮ (ক) প্রবচন ৮:২৬-৩০।

৩৯ (ক) সাম ৩৩:৬ লাতিন পাঠ্য।

(খ) ইশা ৪৫:১১ লাতিন পাঠ্য।

৪৪ (ক) প্রবচন ৮:২১ লাতিন পাঠ্য।

(খ) প্রবচন ৮:৪-৫।

(গ) প্রবচন ৮:১৫-১৬।

(ঘ) প্রবচন ৮:২০-২১।

৪৫ (ক) যোহন ১৪:৬।

৪৬ (ক) আদি ৩:৮ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) আদি ৪:৬; ৪:৪; ৭:১ ইত্যাদি দ্রঃ।

(গ) আদি ৫:২২ ... দ্রঃ।

(ঘ) আদি ১৬:৯ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ১৮:২ দ্রঃ।

(চ) যাত্রা ৩:২ দ্রঃ।

৪৭ (ক) যোশুয়া ১:১ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১২:১ দ্রঃ।

(গ) এজে ৩৭ দ্রঃ।

(ঘ) দা ৭:১৩ দ্রঃ।

৪৮ (ক) গা ৪:৪-৫ লাতিন পাঠ্য।

(খ) এফে ৪:২১-২৪ লাতিন পাঠ্য।

(গ) বন্ধনীর মধ্যে যে বাক্য, তা সম্ভবত অপ্রামাণিক।

৫৫ (ক) সাধু হিলারিউস পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বিশেষভাবে ২য় পুস্তকে ২৯-৩১ অধ্যায়, ৮ম পুস্তকে ১৯-৩১ অধ্যায়, ও ১২শ পুস্তকে ৫৫-৫৭ অধ্যায়ে কথা বলেন। পবিত্র আত্মা বিষয়টা যে সম্পূর্ণরূপে আলোচিত নয় এর কারণ এটা হতে পারে যে, সাধু হিলারিউস বিশেষভাবে ঐশবাণীর ঈশ্বরত্বকে আরিউসপন্থীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যই অভিপ্রেত ছিলেন, এবং পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত ‘মাকিদনীয়’ দ্রষ্টব্য তখনও আবির্ভূত হয়নি। যাই হোক, সাধু হিলারিউস ঘোষণা করেন, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র থেকে উৎপন্ন (২য় পুস্তক ২৯), বা আরও সূক্ষ্মরূপে, তিনি পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন (৮ম পুস্তক ২০ অধ্যায় ও ১২শ পুস্তক ২৭ অধ্যায়)। তেমন ঘোষণা আপনা আপনিই পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বকে ও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে তাঁর সমসত্ত্বকে স্বীকার করে, এবং পিতা ও পুত্র থেকে তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেও স্বীকার করে।

৫৬ (ক) যোহন ৩:৭-৮।

(খ) যোহন ১:১ ইত্যাদি।

(গ) কল ১:১৬।

৫৭ (ক) যোহন ১৭:১০।